

GOVERNMENT OF INDIA  
ARCHAEOLOGICAL SURVEY OF INDIA

CENTRAL  
ARCHAEOLOGICAL  
LIBRARY

ACCESSION NO. 19841

CALL No. 181.43 - Tax

D.G.A. 79

114

12401  
12402



上卷之三

সাহিত্য-পরিষদগ্রন্থাবলী—সং ৬৩

Gautama  
sutra  
or

গৌতমসূত্র

বা

~~4834~~

Nyayedarśana

ন্যায়দর্শন

and

Vatsyayana's Bhasya

বাৎস্যায়ন ভাষ্য



(বিস্তৃত অনুবাদ, বিবৃতি, টিপ্পন প্রভৃতি সহিত)

দ্বিতীয় খণ্ড

part II

19841

33445/77/33

পণ্ডিত শ্রীবৃদ্ধ কণিষ্ঠমণি তর্কবাগীশ কর্তৃক

অনূদিত, ব্যাখ্যাত ও সম্পাদিত

Phanibhushan

Tarkabagisa

কলিকাতা, ২৪৩১২ আপার মাকুলার রোড,

বঙ্গীষ-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির হইতে

শ্রীরামকমল সিংহ কর্তৃক

Vangiya Sahitya

Parishad Mandir

প্রকাশিত

181.43

বঙ্গাব্দ ১৩২৮

1328

মুদ্রণ পক্ষে—২।

শাখা-সভার

মুদ্রণ পক্ষে—২।

সাধারণ পক্ষে—২।

Calcutta

1328 B.S.





বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক	বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
১০ম সূত্রে—পূর্বসূত্রোক্ত সমাধানে পূর্বপক্ষ- বাহীর দোষ-প্রদর্শন ...	৩৯৩	২৮শ সূত্রে—ঐ উত্তরের খণ্ডন ...	৪৪০
১১শ সূত্রে—ঐ দোষের খণ্ডন ...	৩৯৪	২৯শ সূত্রে—শব্দের নিত্যত্বপক্ষে অস্ত্র হেতু কখন ...	৪৪২
১২শ সূত্রে—অভাব-পদার্থের অস্তিত্ব সমর্থন ৩৯৫ শব্দের অনিত্যত্ব-পরীক্ষারস্ত্রে ভাষ্যে— শব্দবিষয়ে নানাবিধ বিপ্রতিপত্তি প্রদর্শন দ্বারা সংশয় সমর্থন ...	৩৯৭	৩০শ সূত্রে—ঐ হেতুতে ব্যভিচার প্রদর্শন ৪৪৩ ৩১শ সূত্রে—পূর্বসূত্রোক্ত কথায় বাক্চুল প্রদর্শন ...	৪৪৪
১৩শ সূত্রে—শব্দের অনিত্যত্ব পক্ষের সংস্থাপন। ভাষ্যে—সূত্রোক্ত হেতুত্রয়ের ব্যাখ্যা ও উৎপত্তি বর্ণনপূর্বক যৌমাংসক-সম্বন্ধ শব্দের অতিব্যক্তিবাদের খণ্ডন ...	৪০০—৪০৮	৩২শ সূত্রে—ঐ বাক্চুলের খণ্ডন ..	৪৪৬
১৪শ সূত্রে—পূর্বসূত্রোক্ত হেতুত্রয়ে দোষ- প্রদর্শন ...	৪১১	৩৩শ সূত্রে—শব্দের নিত্যত্ব-পক্ষে অস্ত্র হেতু কখন ...	৪৪৮
১৫শ, ১৬শ ও ১৭শ সূত্রে—বাক্যক্রমে ঐ দোষের নিরাস ...	৪১৩—৪১৮	৩৪শ সূত্রে—পূর্বসূত্রোক্ত হেতুর অসাধনত্ব সমর্থন ...	৪৪৯
১৮শ সূত্রে—যৌমাংসক-সম্বন্ধ শব্দের নিত্যত্ব- পক্ষের বাধক প্রদর্শন ...	৪২৫	৩৫শ সূত্রে—পূর্বসূত্রোক্ত হেতুর অনিচ্ছতা সম- র্থন। ভাষ্যে—ঐ অসিদ্ধতা বুঝাইবার জন্ত শব্দের বিনাশের কারণ-বিষয়ে অহুমান প্রদর্শন এবং শব্দের অনিত্যত্ব পক্ষে যুক্তান্তর প্রদর্শন ...	৪৫০
১৯শ ও ২০শ সূত্রে—পূর্বসূত্রোক্ত যুক্তির খণ্ডনে “জাতি” নামক অসহজের কখন ... ..	৪২৯—৪৩২	৩৬শ সূত্রে—বস্তুনিষ্ঠ দ্রব্যে শব্দের নিমিত্তান্তর বেগরূপ সংস্কারের সাধন ...	৪৫৫
২১শ সূত্রে—ঐ উত্তরের খণ্ডন ...	৪৩৩	৩৭শ সূত্রে—বিনাশকারণের প্রত্যক্ষ না হওয়ায় শব্দের নিত্যত্ব সিদ্ধ হইলে, শব্দ শ্রবণের নিত্যত্বাপত্তি কখন ...	৪৫৭
২২শ সূত্রে—যৌমাংসক-সম্বন্ধ শব্দের নিত্যত্ব- পক্ষের হেতু কখন ...	৪৩৫	৩৮শ সূত্রে—শব্দ আকাশের গুণ, বস্তুনিষ্ঠ ভৌতিক দ্রব্যের গুণ নহে, এই সিদ্ধান্ত সমর্থন... ..	৪৫৯
২৩শ ও ২৪শ সূত্রে—পূর্বসূত্রোক্ত হেতুতে ব্যভিচার প্রদর্শন ...	৪৩৬	৪৯শ সূত্রে—শব্দ, রূপ রসাদির সহিত একাধারে অবস্থিত থাকিয়াই অতিব্যক্ত হয়, আকাশে শব্দ-সম্বন্ধের উৎপত্তি হয় না—এই মতের খণ্ডন ...	৪৬০
২৫শ সূত্রে—শব্দের নিত্যত্বপক্ষে অস্ত্র হেতু কখন ...	৪৩৮	৪০শ সূত্রে—বর্ণাত্মক শব্দের বিকার ও আদেশ, এই উত্তর পক্ষে সংশয়-প্রদর্শন ...	৪৬৩
২৬শ সূত্রে—ঐ হেতুর অসিদ্ধতা সমর্থন ...	৪৩৯	ভাষ্যে—নানা যুক্তির দ্বারা বর্ণের বিকার-	
২৭শ সূত্রে—পূর্বসূত্রোক্ত দোষখণ্ডনের জন্ত পূর্বপক্ষবাদীর উত্তর	৪৩৯		



বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
পক্ষের ঋণপূর্বক আদেশপক্ষের সমর্থন ... ৪৬৪—৪৬৮		৫৪শ সূত্রে—বর্ণবিকারবান ঋণে চরম যুক্তি ... ৪২১	
৪১শ সূত্রে—বর্ণবিকার মতের ঋণ ... ৪৭০		৫৫শ সূত্রে—পূর্বসূত্রোক্ত কথার “বাক্‌জল” প্রদর্শন ... ৪২১	
৪২শ সূত্রে—বর্ণবিকারবানীর উত্তর ... ৪৭১		৫৬শ সূত্রে—ঐ “বাক্‌জলে”র ঋণ ... ৪২২	
৪৩শ ও ৪৪শ সূত্রে—ঐ উত্তরের ঋণ ... ৪৭১—৪৭৩		৫৭শ সূত্রে—কারণের উল্লেখপূর্বক বর্ণবিকার ব্যবহারের উপপাদ্য ... ৪২৪	
৪৫শ সূত্রে—বর্ণবিকারবানীর উত্তর ... ৪৭৪		৫৮শ সূত্রে—পদের লক্ষণ ... ৪২৫	
৪৬শ সূত্রে—বর্ণের বিকার হইতে পারে না—এই পক্ষে দুই যুক্তি কথন ... ৪৭৬		৫৯শ সূত্রে—পদার্থ-পদার্থিকার কত ব্যক্তি, আকৃতি ও প্রতি ঐ তিনটিই পদার্থ? অথবা তিন দ্বারা যে কোন একটিই পদার্থ?—এই সংক্ষেপে সমর্থন ... ৪২৮	
৪৭শ সূত্রে—বর্ণের অবিকার পক্ষে যুক্তান্ত প্রদর্শন ... ৪৭৭		৬০শ সূত্রে—কেবল ব্যক্তিই পদার্থ, এই পূর্বপক্ষের সমর্থন ... ৫৩০	
৪৮শ সূত্রে—বর্ণবিকারবানীর উত্তর ৪৭৮		৬১শ সূত্রে—ঐ পূর্বপক্ষের ঋণ ... ৫৩৪	
৪৯শ সূত্রে—পূর্বসূত্রোক্ত উত্তরের ঋণ, আশ্রয়—পূর্বপক্ষবানীর সমর্থনের উল্লেখ ও তাহার ঋণ ... ৪৭৯—৮১		৬২শ সূত্রে—ব্যক্তি পদার্থ না হইলেও, ব্যক্তিবিশেষে শব্দবোলের উপপাদ্য ... ৫৩৫	
৫০শ সূত্রে—বর্ণের রিত্য ও অনিত্য, এই উত্তর পক্ষেই বিকারের অল্পপক্ষ সমর্থন দ্বারা বর্ণবিকারবান ঋণ ... ৪৮০		৬৩শ সূত্রে—কেবল আকৃতিই পদার্থ, এই মতের সমর্থন ... ৫৩৮	
৫১শ সূত্রে—বর্ণের রিত্যপক্ষে বিকারের সমর্থন করিতে “জাতি”-নামক অসম্বন্ধ বিশেষের উল্লেখ। তাহা ঐ উত্তরের ঋণ ... ৪৮৪—৮৫		৬৪শ সূত্রে—ঐ মতের ঋণপূর্বক কেবল জাতিই পদার্থ, এই মতের সমর্থন ৫১০	
৫২শ সূত্রে—বর্ণের অনিত্যপক্ষে বিকারের সমর্থন করিতে “জাতি”-নামক অসম্বন্ধ বিশেষের উল্লেখ। তাহা ঐ উত্তরের ঋণ ... ৪৮৬—৮৭		৬৫শ সূত্রে—ঐ মতের ঋণ ... ৫১৩	
৫৩শ সূত্রে—পূর্বোক্ত “জাতি”-নামক অসম্বন্ধ বিশেষের ঋণ ... ৪৮৯		৬৬শ সূত্রে—ব্যক্তি, আকৃতি ও জাতি—এই তিনটিই পদার্থ, এই নিজ সিদ্ধান্তের প্রকাশ ... ৫১৪	
		৬৭শ সূত্রে—ব্যক্তির লক্ষণ ... ৫১৯	
		৬৮শ সূত্রে—আকৃতির লক্ষণ ... ৫২১	
		৬৯শ সূত্রে—জাতির লক্ষণ ... ৫২৪	





# ন্যায়দর্শন

## বাংলা স্যারান ভাষ্য

### দ্বিতীয় অধ্যায়

ভাষ্য । অত উক্তং প্রমাণাদি-পরীক্ষা, সা চ “বিমুখ্য পক্ষপ্রতি-  
পক্ষাভ্যামর্থাবধারণং নির্ণয়” ইত্যগ্রে বিমর্শ এব পরীক্ষ্যতে ।

অনুবাদ । ইহার পরে অর্থাৎ প্রমাণাদি বোড়শ পদার্থের উদ্দেশ ও লক্ষণের  
পরে ( যথাক্রমে ) প্রমাণাদি পদার্থের পরীক্ষা ( কর্তব্য ), সেই পরীক্ষা কিন্তু “সংশয়  
করিয়া পক্ষ ও প্রতিপক্ষের দ্বারা পদার্থের অবধারণরূপ নির্ণয়” ; এ জন্ত প্রথমে  
( মহর্ষি গৌতম ) সংশয়কেই পরীক্ষা করিতেছেন ।

বিতৃতি । মহর্ষি গৌতম এই ন্যায়দর্শনের প্রথম অধ্যায়ে প্রমাণাদি বোড়শ পদার্থের উদ্দেশ  
( নামোন্মেষ ) করিয়া যথাক্রমে তাহাদিগের লক্ষণ বলিয়াছেন । যে পদার্থের যেরূপ লক্ষণ  
বলিয়াছেন, তদনুসারে ঐ পদার্থ-বিষয়ে যে সকল সংশয় ও অস্বপত্তি হইতে পারে, ত্যাহের দ্বারা,  
বিচারের দ্বারা তাহা নিরাস করিতে হইবে, পর-মত নিরাকরণ পূর্বক নিজ-মত সংস্থাপন করিতে  
হইবে, এইরূপে নিজ সিদ্ধান্ত নির্ণয়ই “পরীক্ষা” । মহর্ষি গৌতম এই দ্বিতীয় অধ্যায় হইতে সেই  
পরীক্ষা আরম্ভ করিয়াছেন । সর্বাগ্রে প্রমাণ পদার্থের উদ্দেশ পূর্বক লক্ষণ বলিয়াছেন, সুতরাং সেই  
ক্রমানুসারে পরীক্ষা করিলে সর্বাগ্রে প্রমাণেরই পরীক্ষা করিতে হয়, কিন্তু সংশয় পরীক্ষা-মাত্রেরই  
অঙ্গ, সংশয় ব্যতীত কোন পরীক্ষাই সম্ভব হয় না, এ জন্ত মহর্ষি সর্বাগ্রে সংশয়েরই পরীক্ষা  
করিয়াছেন ।

টিপ্পনী । যে ক্রমে প্রমাণাদি পদার্থের উদ্দেশ ও লক্ষণ করা হইয়াছে, সেই ক্রমেই তাহাদিগের  
পরীক্ষা কর্তব্য । তাহা হইলে পরীক্ষারস্তে সর্বাগ্রে প্রমাণ পদার্থেরই পরীক্ষা করিতে হয় ; কিন্তু  
মহর্ষি সেই প্রমাণ পদার্থকে ছাড়িয়া এবং প্রমের পদার্থকেও ছাড়িয়া সর্বাগ্রে তৃতীয় পদার্থ সংশয়ের  
পরীক্ষা কেন করিয়াছেন ? মহর্ষি লক্ষণ-প্রকরণে উদ্দেশের ক্রমানুসারে লক্ষণ বলিলেন, কিন্তু



পরীক্ষা-প্রকরণে উদ্দেশ্যের ক্রম লক্ষ্যন করিয়া পরীক্ষারম্ভ করিলেন, ইহার কারণ কি ? এইরূপ প্রশ্ন অবশ্যই হইবে, তাই ভাষ্যকার প্রথমে সেই প্রশ্নের উত্তর দিয়া মহর্ষি গোতমের সংশয়-পরীক্ষা-প্রকরণের অবতারণা করিয়াছেন। ভাষ্যকারের কথার তাৎপর্য্য এই যে, সংশয় পরীক্ষার পূর্বোক্ত, অর্থাৎ পরীক্ষা-মাত্রেরই পূর্বক সংশয় আবশ্যক ; কারণ, মহর্ষি যে ( ১ অং, ১ আং, ৪১ সূত্র ) সংশয় করিয়া পক্ষ ও প্রতিপক্ষের দ্বারা পদার্থের অবধারণকে নির্ণয় বলিয়াছেন, তাহাই পরীক্ষা। ঐ নির্ণয়রূপ পরীক্ষা সংশয়-পূর্বক, সংশয় ব্যতীত উহা সম্ভব হয় না, সন্দিগ্ধ পদার্থেই জ্ঞান-প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। সর্বাঙ্গে প্রমাণ পদার্থের পরীক্ষা করিতে গেলেও তৎপূর্বক তদ্বিষয়ে কোন প্রকার সংশয় প্রদর্শন করিতে হইবে। সংশয় প্রদর্শন করিতে গেলে, কি কারণে সেই সংশয় জন্মে, তাহা বলিতে হইবে। মহর্ষি-কথিত সংশয়ের বিশেষ কারণের মধ্যে কাহারই দ্বারা সংশয় জন্মিতে পারে না, অথবা সংশয়ের কোন দিনই নিবৃত্তি হইতে পারে না, সর্বত্রই সর্বদা সংশয় জন্মিতে পারে, এইরূপ পূর্বপক্ষের নিরাস করিতে হইবে। তাহা করিতে গেলেই সংশয়ের পরীক্ষা করিতে হইল। ফলকথা, সংশয়-পরীক্ষা ব্যতীত মহর্ষি-কথিত সংশয়ের বিশেষ কারণগুলিতে নিঃসংশয় হওয়া যায় না, তদ্বিষয়ে বিবাদ মিটে না ; সুতরাং সংশয়মূলক কোন পরীক্ষাই হইতে পারে না ; এ জন্ত মহর্ষি সর্বাঙ্গে সংশয়-পরীক্ষা করিয়াছেন।

তাৎপর্য্যটাকাঁকার বলিয়াছেন যে, লক্ষণে সংশয়ের কোন উপযোগিতা না থাকায় মহর্ষি উদ্দেশ্য-ক্রমানুসারেই লক্ষণ বলিয়াছেন। কিন্তু পরীক্ষামাত্রই সংশয়-পূর্বক, সংশয় ব্যতীত কোন পরীক্ষাই হয় না, এ জন্ত পরীক্ষা-কার্য্যে সংশয়ই প্রথম গ্রাহ্য, পরীক্ষা-প্রকরণে অর্থাৎ ক্রমানুসারে সংশয়ই সকল পদার্থের পূর্ববর্তী ; সুতরাং পরীক্ষা-প্রকরণে মহর্ষি উদ্দেশ্য-ক্রম অর্থাৎ পাঠক্রম-ত্যাগ করিয়া অর্থাৎ ক্রমানুসারে প্রথমে সংশয়কেই পরীক্ষা করিয়াছেন। পাঠক্রম হইতে অর্থাৎ ক্রম বলবান্, ইহা নীমাংসক-সম্প্রদায়ের সমর্থিত সিদ্ধান্ত। বেমন বেদে আছে, —“অগ্নিহোত্রং জুহোতি যবাগুং পচতি” অর্থাৎ “অগ্নিহোত্র হোম করিবে, যবাগু পাক করিবে”। এখানে বৈদিক পাঠক্রমানুসারে বুঝা যায়, অগ্নিহোত্র হোম করিয়া পরে যবাগু পাক করিবে। কিন্তু অর্থ পর্যালোচনার দ্বারা বুঝা যায়, যবাগু পাক করিয়া পরে তদ্বারা অগ্নিহোত্র হোম করিবে। কারণ, কিসের দ্বারা অগ্নিহোত্র হোম করিবে, এইরূপ আকাজ্জবশতঃই পূর্বোক্ত বেদবাক্যে পরে “যবাগুং পচতি” এই কথা বলা হইয়াছে। সুতরাং ঐ স্থলে বৈদিক পাঠক্রম গ্রহণ না করিয়া অর্থক্রমই গ্রহণ করিতে হইবে। অর্থ-পর্যালোচনার দ্বারা যে ক্রম বুঝা যায়, তাহা অর্থক্রম ; উহা পাঠক্রমের বাধক। নীমাংসা-চার্য্যগণ বহু উদাহরণের দ্বারা যুক্তি-প্রদর্শন পূর্বক ইহা সমর্থন করিয়াছেন<sup>১</sup>। বেদের পূর্বোক্ত

১। “অতীর্থ-পাঠবহানুযায়িত্বাঃ ক্রমাঃ।”—ভট্টাচর্য্য। শ্রোত ক্রমকেই শব্দ ক্রম বলে। যে ক্রম শব্দ-বোধ্য, শব্দের দ্বারা বাহ্য পরিবর্ত্ত, তাহা শব্দ ক্রম। ইহা সর্বাঙ্গপেক্ষা বলবান্। অর্থক্রম বা অর্থক্রম দ্বিতীয়, পাঠক্রম তৃতীয়, হানক্রম চতুর্থ, মুখ্য ক্রম পঞ্চম, প্রাতিষ্ঠিক ক্রম ষষ্ঠ। বড় বিধ ক্রমের মধ্যে প্রথম হইতে পর পরটি দুর্বল। ইহাদিগের বিশেষ বিবরণ নীমাংসা শাস্ত্রে স্তম্ভা। জায়দর্শনের প্রথম সূত্রে যে উদ্দেশ্যক্রম, উহা শ্রোত ক্রম বা শব্দ ক্রম নহে, উহা পাঠক্রম। সুতরাং অর্থক্রম উহার বাধক হইবে। পাঠক্রম হইতে অর্থক্রম প্রবল।



স্থলের স্তায় স্তায়স্বত্রকার মহর্ষি গোতমও তাহার প্রথম সূত্রের পাঠক্রম পরিত্যাগ করিয়া অর্থ ক্রমানুসারে সৰ্বাগ্রে সংশয়েরই পরীক্ষা করিয়াছেন। কারণ, প্রথম সূত্রে প্রমাণ ও প্রমেয়ের পরে সংশয় পঠিত হইলেও পরীক্ষা-মাত্রই যখন সংশয়পূৰ্ব্বক, প্রমাণ-পরীক্ষা-কার্য্যও যখন প্রথমে সংশয় আবশ্যক, তখন পরীক্ষারস্তে সৰ্বাগ্রে সংশয়েরই পরীক্ষা কর্তব্য। পরীক্ষা-প্রকরণে অর্থ ক্রমানুসারে সংশয়ই সকল পদার্থের পূৰ্ব্ববর্তী। সুতরাং উদ্দেশ্যক্রম বা পাঠক্রম অর্থ ক্রমের দ্বারা বাধিত হইয়াছে।

আপত্তি হইতে পারে যে, পরীক্ষা-মাত্রই সংশয়পূৰ্ব্বক হইলে সংশয়-পরীক্ষার পূৰ্বেও সংশয় আবশ্যক, সেই সংশয়ের পরীক্ষা করিতে আবার সংশয় আবশ্যক, এইরূপে অনবস্থা-দোষ হইয়া পড়ে। এতদ্বত্তরে তাৎপর্য্যটীকাকার বলিয়াছেন যে, মহর্ষি তাহার কথিত সংশয়-লক্ষণের পরীক্ষাই এখানে করিয়াছেন, ইহা সংশয়-পরীক্ষা নহে। বস্তুতঃ মহর্ষি যে সংশয়ের পাঁচটি বিশেষ কারণের উল্লেখ করিয়া সংশয়ের পাঁচটি বিশেষ লক্ষণ বলিয়া আসিয়াছেন, সেই কারণগুলিতেই সংশয় ও পূৰ্ব্বপক্ষ উপস্থিত হওয়ায় তাহারই নিরাস করিতে সেই কারণগুলিরই পরীক্ষা করিয়াছেন। তাহাকেই ভাষ্যকার প্রভৃতি সংশয়-পরীক্ষা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। সংশয় সৰ্ব্বজীবের মনোগ্রাহ, সংশয়-স্বরূপে কাহারও কোন সংশয় বা বিবাদ নাই। সুতরাং সংশয়-স্বরূপের পরীক্ষার কোন কারণই নাই। তবে সংশয়ের কারণগুলিতে সংশয় বা বিবাদ উপস্থিত হইলে সেই সেই কারণ-জন্ত সংশয়েও সেইরূপে বিবাদ উপস্থিত হয়; সুতরাং সংশয়ের সেই কারণগুলির পরীক্ষাকে ফলতঃ সংশয়-পরীক্ষা বলা যাইতে পারে। তাই ভাষ্যকার তাহাই বলিয়াছেন। সুতরাং ভাষ্যকারের ঐ কথার কোন আপত্তি বা দোষ নাই। কিন্তু ভাষ্যকারের মূল কথায় একটি গুরুতর আপত্তি এই যে, ভাষ্যকার নির্ণয়-স্বত্রভাষ্যে বলিয়াছেন যে, নির্ণয়মাত্রই সংশয়-পূৰ্ব্বক, এরূপ নিয়ম নাই। প্রত্যক্ষাদি স্থলে ‘সংশয়-রহিত নির্ণয় হইয়া থাকে এবং বাদ-বিচারে ও শাস্ত্রে সংশয়-রহিত নির্ণয় হয়, সেখানে সংশয়পূৰ্ব্বক নির্ণয় হয় না (১অ০, ১আ০, ৪১ স্বত্র-ভাষ্য জটব্য)। এখানে ভাষ্যকার মহর্ষির নির্ণয়-স্বত্রটি উদ্ধৃত করিয়া সেই নির্ণয় পদার্থকেই পরীক্ষা বলিয়া, পরীক্ষামাত্রই সংশয়-পূৰ্ব্বক, এই যুক্তিতে সৰ্বাগ্রে সংশয়-পরীক্ষার কর্তব্যতা সমর্থন করিয়াছেন, ইহা কিরূপে সম্ভব হয়? নির্ণয়মাত্রই যখন সংশয়পূৰ্ব্বক নহে, তখন নির্ণয়রূপ পরীক্ষামাত্রই সংশয়পূৰ্ব্বক, ইহা কিরূপে বলা যায়? পরন্তু মহর্ষি এই শাস্ত্রে যে সকল পরীক্ষা করিয়াছেন, সেগুলি শাস্ত্রগত; শাস্ত্রদ্বারা যে তদনির্ণয়, তাহা কাহারও সংশয়পূৰ্ব্বক নহে, একথা ভাষ্যকারও বলিয়াছেন। তাহা হইলে এই শাস্ত্রীয় পরীক্ষায় সংশয় পূৰ্ব্বাপেক্ষ না হওয়ায় এই শাস্ত্রে পরীক্ষারস্তে সৰ্বাগ্রে সংশয়-পরীক্ষার ভাষ্যকারোক্ত কারণ কোনরূপেই সম্ভব হইতে পারে না। উদ্দেশ্যক্রমানুসারে সৰ্বাগ্রে প্রমাণ-পরীক্ষাই মহর্ষির কর্তব্য। অর্থ ক্রম যখন এখানে সম্ভব নহে, তখন পাঠক্রমকে বাধা দিবে কে?

উদ্যোতকর এই পূৰ্ব্বপক্ষের উত্থাপন করিয়া এতদ্বত্তরে বলিয়াছেন যে, নির্ণয়মাত্রই সংশয়-পূৰ্ব্বক নহে, ইহা সত্য; কিন্তু বিচারমাত্রই সংশয়পূৰ্ব্বক। শাস্ত্র ও বাদে যখন বিচার আছে, তখন অবশ্য তাহার পূৰ্ব্ব সংশয় আছে। সংশয় ব্যতীত নির্ণয় হইতে পারিলেও বিচার কখনই হইতে



পারে না। সংশয়পূর্বকই বিচারের উত্থাপন হইয়া থাকে। সুতরাং এই শাস্ত্রীয় পরীক্ষার যে বিচার করা হইয়াছে, তাহা সংশয়পূর্বক হওয়ার সংশয় তাহার পূর্বাঙ্গ; এই জন্তই মহর্ষি পরীক্ষারস্তে সর্বত্রই সংশয় পরীক্ষা করিয়াছেন। তাৎপর্যটাকাহার বলিয়াছেন যে, ব্যুৎপন্ন বাদী ও প্রতিবাদীর শাস্ত্রে সংশয় নাই বটে, কিন্তু বাঁহারা শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন নছেন, অর্থাৎ বাঁহারা শাস্ত্রার্থে সন্নিহান হইয়া শাস্ত্রার্থ বুঝিতেছেন, এমন বাদী ও প্রতিবাদীর শাস্ত্রেও সংশয়পূর্বক বিচার হইয়া থাকে¹। ফলকথা, সংশয় নির্ণয়রূপ পরীক্ষামাত্রের অঙ্গ না হইলেও নির্ণয়ার্ণ বিচারমাত্রেরই অঙ্গ; কারণ, নির্ণয়ের জন্ত বিচার করিতে গেলে পক্ষ ও প্রতিপক্ষ গ্রহণ করিয়াই বিচার করিতে হইবে; পক্ষ ও প্রতিপক্ষ গ্রহণ করিতে হইলেই সংশয় আবশ্যক। একাধারে সংশয়-বিষয়-বিরুদ্ধ দুইটি ধর্মের একটি পক্ষ, অপরটি প্রতিপক্ষ হইয়া থাকে। এই জন্তই বিচারে প্রথমতঃ বিপ্রতিপত্তি-বাক্যের প্রয়োগ করা হইয়া থাকে² এবং কোন স্থলে সংশয়ের বিরোধী নিশ্চয় থাকিলেও বিচারার্থ ইচ্ছা-

১। "ন নির্ণয় সর্বঃ সংশয়পূর্বকঃ বিচারঃ সর্বঃ এব সংশয়পূর্বকঃ শাস্ত্রব্যবস্থাস্থাতি বিচার ইতি তেনাপি সংশয়-পূর্বকঃ ভবিতব্যম্। শিষ্টায়োক্ত বাহিঃপ্রতিবাদিনোঃ শাস্ত্রে নির্ণয়তাবো ন শিষ্যমাণয়োক্তদ্ব্যবস্থি শাস্ত্রেহপি নির্ণয়পূর্বকঃ বিচার ইতি নিহ্নম্"।—তাৎপর্যটিকা।

২। বাদী ও প্রতিবাদীর সিদ্ধার্থপ্রতিপাদক বাক্যদ্বয়কে ভাব্যকার বাৎস্তারন প্রভৃতি প্রাচীন স্মার্তাচার্য্যগণ বিপ্রতিপত্তি-বাক্য বলিয়াছেন। এই বিপ্রতিপত্তি-বাক্যশ্রবণ মধ্যস্থের মানস সংশয় জন্মে। বাদী, প্রতিবাদী ও মধ্যস্থ প্রভৃতি সকলেরই সেখানে একতর পক্ষের নিশ্চয় আছে, সেখানেও বিচারস্থ সংশয়ের জন্ম বিপ্রতিপত্তি-বাক্য প্রয়োগ করিতে হইবে। তদন্তর সেখানেও ইচ্ছাশ্রবণ সংশয় (আহাৰ্য্য সংশয়) করিয়া বিচার করিতে হইবে। কারণ, বিচারমাত্রই সংশয়পূর্বক। "ঐহৈতসিদ্ধি" গ্রন্থে নবা মনুস্মৃতি সনদ্বর্তী বলিয়াছেন যে, বিপ্রতিপত্তি-জন্ত সংশয় অনুমিতির অঙ্গ হইতে পারে না। কারণ, সংশয় ব্যতিরেকেও বহু স্থলে অনুমিতি জন্মে। পরন্তু সাধানিশ্চয় সবেও অনুমিতির ইচ্ছাশ্রবণ অনুমিতি জন্মে। প্রতিপক্ষে শাস্ত্রসম্মানের দ্বারা আত্মগণার্ধের নিশ্চয়কারী ব্যক্তিকেও আত্মার অনুমিতিরূপ বনন করিতে বলা হইয়াছে। এবং বাদী ও প্রতিবাদী প্রভৃতির একতর পক্ষের নিশ্চয় থাকিলে সেখানে ইচ্ছাশ্রবণ সংশয়কেও (আহাৰ্য্য সংশয়কেও) অনুমিতির কারণ বলা যায় না। তাহা হইলে ঐরূপ লিঙ্গপরিমাণও কোন স্থলে অনুমিতির কারণ হইতে পারে। সুতরাং বিচারে বিপ্রতিপত্তি-বাক্যের আবশ্যকতা নাই। পক্ষ ও প্রতিপক্ষ গ্রহণের জন্তও বিপ্রতিপত্তি-বাক্যের আবশ্যকতা নাই। কারণ, মধ্যস্থের বাক্যের দ্বারা পক্ষ ও প্রতিপক্ষ বুঝা যাইতে পারে; এই জন্ত বিপ্রতিপত্তি-বাক্য নিম্নয়োজন। মনুস্মৃতি সনদ্বর্তী গ্রন্থে এইরূপে বিপ্রতিপত্তি-বাক্যের বিচারস্থানের প্রতিপাদন করিয়া তদন্তরে শেষে বলিয়াছেন যে, তদাপি বিপ্রতিপত্তি-জন্ত সংশয় অনুমিতির অঙ্গ না হইলেও উহার নিরাস কর্তব্য বলিয়া উহা অবশ্যই বিচার্য্য। সুতরাং বিচারের পূর্বে মধ্যস্থই বিপ্রতিপত্তি-বাক্য অবশ্য প্রশ্ন করিবেন (যেমন ঈশ্বরের আশ্রিত নাস্তির বিচারে "কিতিঃ সর্গকৃৎ ন বা" ইত্যাদি, আত্মার নিত্যস্থানিত্যের বিচারে "ঐহা নিত্যো ন বা" ইত্যাদি প্রশ্নের বাক্য প্রশ্ন করিতে হইবে)। মনুস্মৃতি সনদ্বর্তী শেষে ইহাও বলিয়াছেন যে, কোন স্থলে বাদী ও প্রতিবাদীর নিশ্চয়রূপ প্রতিপক্ষবৎতঃ বিপ্রতিপত্তি-বাক্য সংশয়জনক না হইলেও উহার সংশয় জন্মইবার সোপাতা আছে বলিয়া সেরূপ স্থলেও বিপ্রতিপত্তি-বাক্যের প্রয়োগ হয়। পরন্তু সর্বত্রই যে-বাদী প্রভৃতি সকলেরই এক পক্ষের নিশ্চয় থাকিলেই, এমনও নিহন নাই। "নিশ্চয়বিশিষ্ট বাদী ও প্রতিবাদী বিচার করে", এই কথা আভিমানিক নিশ্চয়-তাৎপর্য্যেই প্রাচীনগণ বলিয়াছেন। অর্থাৎ বস্তুতঃ কোন পক্ষের নিশ্চয় না থাকিলেও নিশ্চয় আছে, এইরূপ ভাব করিয়াই বাদী ও প্রতিবাদী বিচার করেন, ইহাই ঐ কথার তাৎপর্য্য।



পূর্বক সংশয় করা হইয়া থাকে। বস্তুতঃ নির্ণয়মাত্র সংশয়পূর্বক না হইলেও বিচারমাত্র সংশয়-পূর্বক বলিয়া এবং এই শাস্ত্রীয় পরীক্ষার বিচার আছে বলিয়া, সেই তাৎপর্য্যেই ভাষ্যকার এখানে ঐরূপ কথা বলিয়াছেন এবং এই তাৎপর্য্যেই নির্ণয়-সুত্রভাষ্যে পরীক্ষা বিষয়ে সংশয়পূর্বক নির্ণয়ের কথাই বলিয়াছেন। যে বাদী ও প্রতিবাদীর শাস্ত্রার্থে কোন সংশয় নাই, তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া শাস্ত্রে সংশয়-রহিত নির্ণয়ের কথা বলিয়াছেন। পরীক্ষা বলিতে বিচার বুঝিলে কিন্তু সহজেই পরীক্ষামাত্রকে সংশয়পূর্বক বলা যায়। জায়কন্দলীকার পরীক্ষাকে বিচারই বলিয়াছেন। “পরি” অর্থাৎ সর্বতোভাবে ঐক্ষা অর্থাৎ নির্ণয় যে যুক্তি বা বিচারের দ্বারা জন্মে, তাহার নাম “পরীক্ষা”। এইরূপ ব্যুৎপত্তিতে “পরীক্ষা” শব্দের দ্বারা যুক্তি বা বিচার বুঝা যায়। ভাষ্যকার বাংলায়ন কিন্তু প্রমাণের দ্বারা নির্ণয়বিশেষকেই পরীক্ষা বলিয়াছেন। “পরি” অর্থাৎ সর্বতোভাবে যে ঐক্ষা অর্থাৎ নির্ণয়, তাহাই ভাষ্যকারের নতে পরীক্ষা।

**সূত্র। সমানানেকধর্ম্মাধ্যবসায়াদন্যতর-**

**ধর্ম্মাধ্যবসায়াদ্ধা ন সংশয়ঃ ॥ ১ ॥ ৬২ ॥**

অনুবাদ। (পূর্বপক্ষ ১) সাধারণ ধর্ম্মের নিশ্চয় জ্ঞান এবং অসাধারণ ধর্ম্মের নিশ্চয় জ্ঞান, এবং সাধারণ ধর্ম্ম ও অসাধারণ ধর্ম্ম, ইহার একতর ধর্ম্মের নিশ্চয় জ্ঞান সংশয় হয় না।

ভাষ্য। সমানস্ত ধর্ম্মাধ্যবসায়ঃ সংশয়ো ন ধর্ম্মমাত্রাৎ। অথবা সমানমনস্কোদ্ধর্ম্মমূলভ ইতি ধর্ম্মধর্ম্মিগ্রহণে সংশয়াভাব ইতি। অথবা সমানধর্ম্মাধ্যবসায়াদর্থাস্তরভূতে ধর্ম্মিণি সংশয়োহনুপপন্নঃ, ন জাতু রূপস্থা-র্থাস্তরভূতস্থাধ্যবসায়াদর্থাস্তরভূতে স্পর্শে সংশয় ইতি। অথবা নাধ্যব-সায়াদর্থাবধারণাদনবধারণজ্ঞানং সংশয় উপপদ্যতে, কার্য্যাকারণয়োঃ সারূপ্যাত্বাদিতি। এতেনানেকধর্ম্মাধ্যবসায়াদিতি ব্যাখ্যাতম্। অন্যতর-ধর্ম্মাধ্যবসায়াদ্ধা সংশয়ো ন ভবতি, ততো অন্যতরাবধারণমেবেতি।

অনুবাদ। (পূর্বপক্ষ ১) সাধারণ ধর্ম্মের নিশ্চয় জ্ঞান সংশয় হয়, ধর্ম্মমাত্রজ্ঞান অর্থাৎ অজ্ঞায়মান সাধারণ ধর্ম্মজ্ঞান সংশয় হয় না। (২) অথবা এই পদার্থদ্বয়ের

এক স্থলবিশেষে সংস্কারবশতঃ নিজ শক্তি প্রবর্ণনের জন্য বাদী প্রতিবাদীরণ নিজের অবলম্বিত পক্ষও অবলম্বন পূর্বক তাহার সমর্থন করেন, ইহাও দেখা যায়। অতরাং বাদী ও প্রতিবাদীর সর্বত্র যে স্ব স্ব পক্ষে নিশ্চয়ই থাকে, ইহাও বলা যায় না। অতএব সর্বত্রই স্বকণ্ঠের দ্বারা সত্য বিপ্রতিপত্তিলাভ প্রবর্ণন করিবেন।

সমান ধর্ম উপলব্ধি করিতেছি, এইরূপে ধর্ম ও ধর্মীর জ্ঞান হইলে সংশয় হয় না। (৩) অথবা সমান ধর্মের নিশ্চয় জ্ঞাত (সেই ধর্ম হইতে) ভিন্ন পদার্থ ধর্মীতে সংশয় উপপন্ন হয় না। ভিন্ন পদার্থ রূপের নিশ্চয় জ্ঞাত ভিন্ন পদার্থ অর্থাৎ রূপ হইতে ভিন্ন পদার্থ স্পর্শে কখনও সংশয় হয় না। (৪) অথবা পদার্থের অবধারণরূপ নিশ্চয় জ্ঞাত (পদার্থের) অনবধারণ জ্ঞানরূপ সংশয় উপপন্ন হয় না, যেহেতু কার্য ও কারণের সরূপতা নাই। ইহার দ্বারা “অনেক-ধর্মাদ্যবসায়াত্” এই কথা অর্থাৎ অসাধারণ ধর্মের নিশ্চয় জ্ঞাত সংশয় হয় না, এই কথা ব্যাখ্যাত হইল। (অর্থাৎ সাধারণ ধর্মের নিশ্চয়-জ্ঞাত সংশয় হয় না, এই পূর্বপক্ষের ব্যাখ্যার দ্বারা অসাধারণ ধর্মের নিশ্চয়-জ্ঞাত সংশয় হয় না, এই পূর্বপক্ষেরও ব্যাখ্যা করা হইল, এই স্থলেও পূর্বোক্ত প্রকার চতুর্বিধ পূর্বপক্ষ বৃদ্ধিতে হইবে)। (৫) অত্যন্ত ধর্মের নিশ্চয়বশতঃও সংশয় হয় না। যেহেতু তাহা হইলে অর্থাৎ একতর ধর্মের নিশ্চয় হইলে একতর ধর্মীর অবধারণই হইয়া যায়।

বিবৃতি। দক্ষ্যাকালে গৃহাভিমুখে ধাবমান পথিকের সম্মুখে একটি হাণু (মুড়ো গাছ) মাল্লবের জায় দণ্ডায়মান রহিয়াছে। পথিক উহাতে হাণু ও মাল্লবের সমান ধর্ম বা সাধারণ ধর্ম উচ্চতা প্রকৃতি দেখিল; তখন তাহার সংশয় হইল, “এটি কি হাণু? অথবা পুরুষ?” এই সংশয় পথিকের সাধারণ ধর্মজ্ঞান-জ্ঞাত সংশয়। মহর্ষি প্রথম অধ্যায়ে সংশয়-লক্ষণ-স্থলে প্রথমেই এই সংশয়ের কথা বলিয়াছেন। কিন্তু মহর্ষির সেই স্বার্থা না বুঝিলে ইহাতে অনেক প্রকার পূর্বপক্ষ উপস্থিত হয়। মহর্ষি পূর্বোক্ত একটি পূর্বপক্ষদ্বয়ের দ্বারা সেই পূর্বপক্ষগুলি ফুটনা করিয়াছেন। ভাষ্যকার তাহা বুঝাইয়াছেন।

প্রথম পূর্বপক্ষের তাৎপর্য এই যে, সাধারণ ধর্মের নিশ্চয় হইলেই তজ্জ্ঞাত সংশয় হইতে পারে। সাধারণ ধর্ম আছে, কিন্তু তাহা জানিলাম না, সেখানে সংশয় হয় না। পথিক যদি তাহার সম্মুখস্থ বস্তুতে হাণু ও পুরুষের সাধারণ ধর্ম না দেখিত, তাহা হইলে কি সেখানে তাহার এইরূপ সংশয় হইত? তাহা কখনই হইত না। সুতরাং সমান ধর্মের উপপত্তি অর্থাৎ বিদ্যমানতাবশতঃ সংশয় জন্মে, এই কথা সঙ্গত অসঙ্গত।

দ্বিতীয় পূর্বপক্ষের তাৎপর্য এই যে, হাণু ও পুরুষের সমান ধর্ম বা সাধারণ ধর্মকে যে ব্যক্তি প্রত্যক্ষ করিয়াছে, তাহার হাণু ও পুরুষরূপ ধর্মীরও প্রত্যক্ষ হইয়াছে, ধর্মীর প্রত্যক্ষ না হইয়া কেবল তাহার ধর্মের প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। যদি হাণু ও পুরুষরূপ ধর্মী ও তাহাদ্বিগের সাধারণ ধর্মের প্রত্যক্ষ হইয়া যায়, তবে আর সেখানে “এটি কি হাণু? অথবা পুরুষ?” এইরূপ সংশয় কিরূপে হইবে? তাহা কখনই হইতে পারে না। সুতরাং সমান ধর্মের উপপত্তি অর্থাৎ জ্ঞান-জ্ঞাত সংশয় হয়, এইরূপ কথাও বলা যায় না।



তৃতীয় পূর্বপক্ষের তাৎপর্য্য এই যে, সমান ধর্মের নিশ্চয় জ্ঞাত্ত তদভিন্ন পদার্থে সংশয় হইতে পারে না। এক পদার্থের নিশ্চয় জ্ঞাত্ত অন্য পদার্থে সংশয় হইবে কিরূপে? তাহা হইলে রূপের নিশ্চয় জ্ঞাত্ত স্পর্শে কোন প্রকার সংশয় হউক? তাহা কখনই হয় না। সুতরাং স্থাপু ও পুরুষের কোন ধর্মের নিশ্চয় জ্ঞাত্ত সেই ধর্মভিন্ন পদার্থ যে স্থাপু ও পুরুষরূপ ধর্মী, তদ্বিবয়ে সংশয় জন্মিতে পারে না।

চতুর্থ পূর্বপক্ষের তাৎপর্য্য এই যে, সমান ধর্মের নিশ্চয় জ্ঞাত্ত সংশয় হইতে পারে না। কারণ, সংশয় অনিশ্চয়াত্মক জ্ঞান, কোন নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান তাহার কারণ হইতে পারে না; কারণের অনুরূপই কার্য্য হইয়া থাকে, সুতরাং নিশ্চয়ের কার্য্য অনিশ্চয় হইতে পারে না।

অনেক ধর্মের উপপত্তিজ্ঞাত্ত সংশয় হয়, এই স্থলেও অর্থাৎ মহর্ষি সংশয়-লক্ষণ-হৃত্রে দ্বিতীয় প্রকার সংশয় যে কারণ-জ্ঞাত্ত বলিয়াছেন, তাহাতেও পূর্বোক্ত প্রকার চতুর্বিধ পূর্বপক্ষ বৃদ্ধিতে হইবে। যথা—(১) অসাধারণ ধর্মের নিশ্চয় না হইলে কেবল সেই ধর্ম বিদ্যমান আছে বলিয়া কখনই তজ্জ্ঞাত্ত সংশয় হয় না। (২) অসাধারণ ধর্মের নিশ্চয় হইলেও তজ্জ্ঞাত্ত সংশয় হইতে পারে না। কারণ, ধর্মের নিশ্চয় হইলে সেখানে ধর্মীরও নিশ্চয় হইবে। ধর্ম ও ধর্মীর নিশ্চয় হইলে, সেই ধর্মীতে আর কিরূপে সংশয় হইবে? (৩) অসাধারণ ধর্মের নিশ্চয় জ্ঞাত্ত সেই ধর্ম হইতে ভিন্ন পদার্থ ধর্মীতে কখনই সংশয় হইতে পারে না। এক পদার্থের নিশ্চয় জ্ঞাত্ত অন্য পদার্থে সংশয় হয় না। (৪) অসাধারণ ধর্মের নিশ্চয় জ্ঞাত্ত অনিশ্চয়াত্মক জ্ঞানরূপ সংশয় জন্মিতে পারে না। কারণ, তাহা কার্য্য, তাহা কারণের অনুরূপই হইয়া থাকে। সুতরাং অনিশ্চয়াত্মক জ্ঞান নিশ্চয়াত্মক জ্ঞানের কার্য্য হইতে পারে না।

পঞ্চম পূর্বপক্ষের তাৎপর্য্য এই যে, যে ছই ধর্মবিবয়ে সংশয় হইবে, তাহার একতর ধর্মীর ধর্মনিশ্চয় জ্ঞাত্ত সংশয় জন্মে, এইরূপ কথাও বলা যায় না। কারণ, একতর ধর্মীর ধর্মনিশ্চয় হইলে সেখানে সেই একতর ধর্মীর নিশ্চয়ই হইয়া যায়। তাহা হইলে আর সেখানে সেই ধর্ম-বিবয়ে সংশয় জন্মিতে পারে না। যেমন স্থাপু বা পুরুষরূপ কোন এক ধর্মীর স্থাপু বা পুরুষ প্রকৃতি কোন ধর্মের নিশ্চয় হইলে, সেখানে স্থাপু বা পুরুষরূপ কোন ধর্মীর নিশ্চয়ই হইয়া বাইবে, সেখানে আর পূর্বোক্ত প্রকার সংশয় জন্মিতে পারে না।

টিপ্পনী। বিচারের দ্বারা যে পদার্থের পরীক্ষা করিতে হইবে, প্রথমতঃ সেই পদার্থ বিবরে কোন প্রকার সংশয় প্রদর্শন করিতে হইবে। তাহার পরে ঐ সংশয়ের কোন এক কোটিকে অর্থাৎ অসিদ্ধান্ত কোটিকে পূর্বপক্ষরূপে গ্রহণ করিতে হইবে। তাহার পরে ঐ পূর্বপক্ষ নিরাস করিয়া উত্তরপক্ষ অর্থাৎ সিদ্ধান্ত সমর্থন করিতে হইবে। যে হৃত্রের দ্বারা পূর্বপক্ষ হুচনা করা হয়, তাহার নাম পূর্বপক্ষ-হৃত্র। যে হৃত্রের দ্বারা সিদ্ধান্ত হুচনা করা হয়, তাহার নাম সিদ্ধান্ত-হৃত্র। মহর্ষি গোতম পূর্বপক্ষ-হৃত্র ও সিদ্ধান্ত-হৃত্রের দ্বারা এবং কোন স্থলে কেবল সিদ্ধান্ত-হৃত্রের দ্বারাই সংশয় ও পূর্বপক্ষ হুচনা করিয়া পদার্থের পরীক্ষা করিয়াছেন। কোন স্থলে পৃথক্ হৃত্রের দ্বারাও পরীক্ষা বা বিচারের পূর্বাপ্ত সংশয় প্রদর্শন করিয়াছেন।



পরীক্ষারস্তে সর্বাগ্রে যে সংশয় পরীক্ষা করিয়াছেন, তাহাতে পৃথক্ সূত্রের দ্বারা সংশয় প্রদর্শন না করিলেও পূর্বপক্ষ-সূত্রের দ্বারাই এখানে বিচার্য্য সংশয় স্থচিত হইয়াছে। সংশয়ের স্বরূপে তাহারও সংশয় নাই। কিন্তু মহর্ষি প্রথমাধ্যায়ে সংশয়-লক্ষণ-সূত্রে (২৩ সূত্রে) সংশয়ের যে পঞ্চবিধ বিশেষ কারণ বলিয়াছেন, সেই কারণ বিবরে সংশয় হইতে পারে। অর্থাৎ সংশয় মহর্ষি-কথিত সেই সাধারণধর্মদর্শনাদি-জ্ঞাত কি না? ইত্যাদি প্রকার সংশয় হইতে পারে। মহর্ষি ঐরূপ সংশয়ের এক কোটিকে অর্থাৎ সংশয় সাধারণধর্ম-দর্শনাদি-জ্ঞাত নহে, এই কোটিকে পূর্বপক্ষরূপে গ্রহণ করিয়া প্রথমে পাঁচটি সূত্রের দ্বারা সেই পূর্বপক্ষগুলি প্রকাশ করিয়াছেন। তদ্বাধ্যে এই প্রথম সূত্রের দ্বারা তাহার পূর্বকথিত প্রথম ও দ্বিতীয় প্রকার সংশয়ের কারণে পূর্বপক্ষ প্রকাশ করিয়াছেন। ( ১ অং, ২৩ সূত্র ব্রটব্য )।

সংশয়-লক্ষণ-সূত্রে প্রথমোক্ত "সমানানেক-ধর্মোপপত্তেঃ" এই বাক্যে যে "উপপত্তি" শব্দটি আছে, তাহার দ্বারা অর্থাৎ বিদ্যমানতা অথবা স্বরূপ অর্থ গ্রহণ করিলে সাধারণ ও অসাধারণ ধর্মকেই সংশয়ের কারণরূপে বুঝা যায়। কিন্তু সাধারণ ও অসাধারণ ধর্মের অধ্যবসায় অর্থাৎ নিশ্চয়াত্মক জ্ঞানই সংশয়বিশেষের কারণ হইতে পারে,—ঐরূপ ধর্মমাত্র সংশয় কারণ হইতে পারে না। ভাষ্যকার প্রথমতঃ এই ভাবেই মহর্ষি-স্থচিত পূর্বপক্ষের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু পূর্বোক্ত "উপপত্তি" শব্দের জ্ঞান অর্থই গ্রহণ করিলে অথবা সংশয়-লক্ষণ-সূত্রোক্ত "ধর্ম" শব্দের দ্বারা ধর্ম-জ্ঞান অর্থই মহর্ষির বিবক্ষিত বলিয়া বুঝিলে ভাষ্যকারের প্রথম ব্যাখ্যাত পূর্বপক্ষ দ্বঙ্গত হয় না এবং মহর্ষির এই পূর্বপক্ষসূত্রে নিশ্চয়ার্থক অধ্যবসায় শব্দের যে ভাবে প্রয়োগ আছে, তাহাতে এই সূত্রের দ্বারা ভাষ্যকারের প্রথম ব্যাখ্যাত পূর্বপক্ষ মহর্ষির বিবক্ষিত বলিয়া সহজে বুঝাও যায় না। এ জ্ঞাত ভাষ্যকার "অথবা" বলিয়া এই সূত্রোক্ত পূর্বপক্ষের ব্যাখ্যাস্তর করিয়াছেন। উদ্যোতকর এই সূত্রোক্ত পূর্বপক্ষ ব্যাখ্যায় শেষে আর একটি কথা বলিয়াছেন যে, সমান ধর্মের জ্ঞান হইলেও অনেক স্থলে সংশয় জন্মে না এবং সমান ধর্মের জ্ঞান না হইলেও অজ্ঞাত কারণবশতঃ অনেক স্থলে সংশয় জন্মে। সুতরাং সমান-ধর্মজ্ঞানকে সংশয়ের কারণ বলা যায় না। বাহা থাকিলেও কোন স্থলে সংশয় হয় না এবং বাহা না থাকিলেও কোন স্থলে সংশয় হয়, তাহা সংশয়ের কারণ হইবে কিরূপে? বাহা থাকিলে সেই কার্য্যটি হয় এবং বাহা না থাকিলে সেই কার্য্যটি হয় না, তাহাই সেই কার্য্যে কারণ হইয়া থাকে। মহর্ষি-কথিত সমানধর্ম জ্ঞান সংশয়-কার্য্যে ঐরূপ পদার্থ না হওয়ার উহা সংশয়ের কারণ হইতে পারে না, ইহাই উদ্যোতকরের মূল তাৎপর্য্য। উদ্যোতকর সর্বশেষে আরও একটি কথা বলিয়াছেন যে, মহর্ষি-কথিত সমান ধর্ম বখন একমাত্র পদার্থ ভিন্ন ভূইটি পদার্থে থাকে না, তখন তাহা সমান ধর্মও হইতে পারে না। তাৎপর্য্য এই যে, যে উচ্চতা প্রকৃতি ধর্ম স্বাণুতে থাকে, ঠিক সেই উচ্চতা প্রকৃতি ধর্মই পূর্ণবে থাকে না, তাহা থাকিতেই পারে না। সুতরাং উচ্চতা প্রকৃতি কোন ধর্মই স্বাণু ও পূর্ণবের সাধারণ ধর্ম হইতে পারে না। যে একটিমাত্র ধর্ম স্বাণু ও পূর্ণব উভয়েই থাকে, তাহাই ঐ উভয়ের সাধারণ ধর্ম হইতে পারে। ফলকথা, যে উচ্চতা প্রকৃতি দেখিয়া এটি কি স্বাণু,

অথবা পুরুষ, এই প্রকার সংশয় জন্মে বলা হইয়াছে, তাহা স্বাণু ও পুরুষের সাধারণ ধর্ম নহে। সুতরাং সমানধর্ম বা সাধারণ ধর্মের জ্ঞানবশতঃ সংশয় জন্মে, এ কথা কোনরূপেই বলা যায় না।

বৃত্তিকার বিখ্যাত প্রভৃতি নবীনগণ এই হুত্রোক্ত পূর্বপক্ষ ব্যাখ্যার বলিয়াছেন যে, সাধারণ ধর্মের জ্ঞান না থাকিলেও কোন স্থলে অসাধারণ ধর্মের জ্ঞানজন্য সংশয় হইরা থাকে এবং অসাধারণ ধর্মের জ্ঞান না থাকিলেও কোন স্থলে সাধারণ ধর্মের জ্ঞানজন্য সংশয় হইরা থাকে। সুতরাং সাধারণ ধর্মের জ্ঞানকে সংশয়ের কারণ বলা যায় না এবং অসাধারণ ধর্মের জ্ঞানকেও সংশয়ের কারণ বলা যায় না। অর্থাৎ পূর্বোক্ত প্রকার ব্যক্তিরক ব্যভিচারবশতঃ সাধারণ ধর্মজ্ঞান এবং অসাধারণ ধর্মজ্ঞান সংশয়ের কারণ হইতে পারে না। যদি বলা যায় যে, সংশয়ের প্রতি সাধারণ ধর্মজ্ঞান ও অসাধারণ ধর্মজ্ঞান এই অত্যন্ত কারণ, অর্থাৎ ঐ দুইটি জ্ঞানের যেকোন একটি কারণ, তাহা হইলে কথঞ্চিৎ পূর্বোক্ত ব্যভিচার বারণ হইতে পারে বটে, কিন্তু তাহা হইলেও মহর্ষি বখন সমান ধর্মের জ্ঞানকে সংশয়ের একটি কারণ বলিয়াছেন, তখন তাহা দ্বন্দ্ব হইতে পারে না। কারণ, সমানধর্ম বলিয়া বুঝিলে ভিন্ন ধর্ম বলিয়াই বুঝা হয়; ভিন্ন পদার্থ ব্যতীত সমান হয় না। পুরুষকে স্বাণুধর্মের সমানধর্মী বলিয়া বুঝিলে স্বাণু-ধর্ম হইতে ভিন্ন-ধর্মী বলিয়াই বুঝা হয়; সুতরাং পুরুষকে তখন স্বাণু হইতে ভিন্ন পদার্থ বলিয়াই বুঝা হয়; তাহা হইলে আর সেখানে স্বাণু ও পুরুষবিষয়ে পূর্বোক্ত প্রকার সংশয় হইতে পারে না। এই পদার্থটি পুরুষ হইতে ভিন্ন, অথবা স্বাণু হইতে ভিন্ন, এইরূপ বোধ জন্মিয়া গেলে কি আর সেখানে "ইহা কি স্বাণু? অথবা পুরুষ?" এইরূপ সংশয় হইতে পারে? তাহা কিছুতেই পারে না। সুতরাং মহর্ষির লক্ষ্যহুত্রোক্ত সমান ধর্মজ্ঞান সংশয়ের জনক হইতেই পারে না, উহা সংশয়ের প্রতিবন্ধক।

মহর্ষির পরবর্তী সিদ্ধান্ত-হুত্রের পর্যালোচনা করিলে বৃত্তিকার প্রভৃতির ব্যাখ্যাত পূর্বপক্ষ মহর্ষির অভিপ্রেত বলিয়া মনে হয় না। তাই মনে হয়, ভাষ্যকার প্রভৃতি প্রাচীনগণ বৃত্তিকার প্রভৃতি নব্যগণের ছায়া এখানে মহর্ষির পূর্বপক্ষের ব্যাখ্যা করেন নাই। বৃত্তিকার প্রভৃতি ব্যাখ্যাত পূর্বপক্ষের উত্তর এই যে, সমান ধর্মজ্ঞানকে সংশয়মাত্রের কারণ বলা হয় নাই। মহর্ষির কথিত সংশয়ের কারণগুলি বিশেষ বিশেষ সংশয়ের কারণ। বিশেষরূপে কার্যাকরণভাব কর্তৃক করিলে পূর্বোক্ত প্রকার ব্যভিচারের আশঙ্কা নাই। সিদ্ধান্তহুত্র-ব্যাখ্যায় দবল কথা পরিষ্কৃত হইবে। ১।

## মূত্র। বিপ্রতিপত্ত্যব্যবস্থাধ্যবসায়াক্ষ ॥ ২ ॥ ৬৩॥

অনুবাদ। (পূর্বপক্ষ) বিপ্রতিপত্তি এবং অব্যবস্থার অধ্যবসায়বশতঃও সংশয় হয় না। অর্থাৎ সংশয়লক্ষণমূত্রোক্ত বিপ্রতিপত্তি-বাক্যের নিশ্চয় এবং উপলব্ধির অব্যবস্থা ও অনুপলব্ধির অব্যবস্থার নিশ্চয়ও সংশয়ের কারণ হইতে পারে না।



ভাষ্য । ন বিপ্রতিপত্তিমাত্রাদব্যবস্থামাত্রায়া সংশয়ঃ । কিং তর্হি ?  
বিপ্রতিপত্তিমূলভমানস্ত সংশয়ঃ, এবমব্যবস্থায়ামপীতি । অথবা  
অস্ত্যান্তেত্যেকো, নাস্ত্যান্তেত্যপরে মন্তন্ত ইত্যুপলক্ষে কথং সংশয়ঃ  
স্তাদিতি । তথোপলক্ষিরব্যবস্থিতা অনুপলক্ষিচ্চাব্যবস্থিতেতি বিভাগেনাধ্য-  
বসিতে সংশয়ো নোপপদ্যত ইতি ।

অনুবাদ । বিপ্রতিপত্তি-মাত্র অথবা অব্যবস্থা-মাত্রবশতঃ সংশয় হয় না ।  
অর্থাৎ অজ্ঞায়মান বিপ্রতিপত্তি-বাক্য এবং অজ্ঞায়মান উপলক্ষির অব্যবস্থা ও  
অনুপলক্ষির অব্যবস্থা হেতুক সংশয় হয় না । ( প্রশ্ন ) তবে কি ? ( উত্তর )  
বিপ্রতিপত্তি-বিষয়ক জ্ঞানবান ব্যক্তির অর্থাৎ বিপ্রতিপত্তি-বাক্যার্থবোদ্ধা ব্যক্তির  
সংশয় হয় । এইরূপ অব্যবস্থা স্থলেও ( জানিবে ) [ অর্থাৎ বিপ্রতিপত্তি-বাক্যার্থ-  
জ্ঞানই সংশয়ের কারণ হয়, বিপ্রতিপত্তি-বাক্য সংশয়ের কারণ হয় না । এইরূপ  
উপলক্ষির অব্যবস্থা ও অনুপলক্ষির অব্যবস্থার জ্ঞানই সংশয়ের কারণ হয়, পূর্বোক্ত  
অব্যবস্থা সংশয়ের কারণ হয় না । সুতরাং সংশয়-লক্ষণ-সূত্রে যে বিপ্রতিপত্তি-বাক্য  
এবং উপলক্ষির অব্যবস্থা ও অনুপলক্ষির অব্যবস্থাকে সংশয়বিশেষের কারণ বলা  
হইয়াছে, তাহা অসঙ্গত । ] অথবা “আত্মা আছে” ইহা এক সম্প্রদায় মানেন,  
“আত্মা নাই” ইহা অপর সম্প্রদায় মানেন, এইরূপ জ্ঞানবশতঃ কিরূপে সংশয় হইবে ?  
[ অর্থাৎ ঐরূপে দুইটি বিরুদ্ধ মতের জ্ঞান সংশয় জন্মাইতে পারে না । সুতরাং  
লক্ষণসূত্রে বিপ্রতিপত্তিবাক্যার্থ জ্ঞানকে সংশয়বিশেষের কারণ বলিলে তাহাও  
অসঙ্গত ] । সেইরূপ উপলক্ষি অব্যবস্থিত অর্থাৎ উপলক্ষির নিয়ম নাই, এবং  
অনুপলক্ষি অব্যবস্থিত অর্থাৎ অনুপলক্ষিরও নিয়ম নাই, ইহা পৃথক্ ভাবে নিশ্চিত  
হইলে সংশয় উৎপন্ন হয় না [ অর্থাৎ উপলক্ষির অব্যবস্থার নিশ্চয় এবং অনুপলক্ষির  
অব্যবস্থার নিশ্চয়ও সংশয়ের কারণ হইতে পারে না—সংশয়-লক্ষণসূত্রে তাহা বলা  
হইলে তাহাও অসঙ্গত ] ।

টীকানী । প্রথমাব্যয়ে সংশয়-লক্ষণসূত্রে বিপ্রতিপত্তি-বাক্য এবং উপলক্ষির অব্যবস্থা ও  
অনুপলক্ষির অব্যবস্থাকে সংশয়বিশেষের কারণ বলা হইয়াছে । সেই সূত্রের দ্বারা তাহাই সহজে  
স্পষ্ট বুঝা যায় । এখন সেই কথার পূর্ণপক্ষ এই যে, বিপ্রতিপত্তি-বাক্য কখনই সংশয়ের কারণ  
হইতে পারে না । এক পদার্থে পরস্পর বিরুদ্ধার্থ-প্রতিপাদক বাক্যদ্বয়কে “বিপ্রতিপত্তি” বলে ।  
যেমন একজন বলিলেন, “আত্মা আছে”, একজন বলিলেন, “আত্মা নাই” । মন্যন্ত ব্যক্তি ঐ বাক্য-  
দ্বয়ের অর্থ বুঝিলে এবং তাহার আত্মাতে অস্তিত্ব বা নাতিত্বরূপ একতর ধর্ম-নিশ্চয়ের কোন কারণ

উপস্থিত না হইলে, তখন আদ্য আছে কি না, তাহার এইরূপ সংশয় হইতে পারে। কিন্তু যিনি ঐ বিপ্রতিপত্তি-বাক্য বুঝেন নাই, তাহার ঐ স্থলে ঐরূপ সংশয় হয় না। বিপ্রতিপত্তি-বাক্য সংশয়ের কারণ হইলে, বিপ্রতিপত্তি-বাক্য বিষয়ে সৰ্ব্বপ্রকারে অজ্ঞ ব্যক্তিরও ঐরূপ সংশয় হইত; তাহা যখন হয় না, তখন অজ্ঞায়মান বিপ্রতিপত্তি-বাক্য সংশয়ের কারণ নহে, ইহা অবশ্য স্বীকার্য। সুতরাং সংশয়-লক্ষণ-হুত্রে বিপ্রতিপত্তি-বাক্যকে যে সংশয়বিশেষের কারণ বলা হইয়াছে, তাহা অসঙ্গত। এইরূপ সেই স্থলে যে উপলব্ধির অব্যবস্থা ও অনুপলব্ধির অব্যবস্থাকে সংশয়বিশেষের কারণ বলা হইয়াছে, তাহাও অসঙ্গত। কারণ, উপলব্ধির অব্যবস্থা বলিতে উপলব্ধির অনিয়ম। বিদ্যমান পদার্থেরও উপলব্ধি হয়, আবার অবিদ্যমান পদার্থেরও ভ্রম উপলব্ধি হয়। সৰ্ব্বত্র বিদ্যমান পদার্থেরই উপলব্ধি হয় অথবা অবিদ্যমান পদার্থেরই উপলব্ধি হয়, এমন নিয়ম নাই। এবং অনুপলব্ধির অব্যবস্থা বলিতে অনুপলব্ধির অনিয়ম। ভূগর্ভ প্রকৃতি হীনস্থিত বিদ্যমান পদার্থেরও উপলব্ধি হয় না এবং সৰ্বত্র অবিদ্যমান পদার্থেরও উপলব্ধি হয় না। এই উপলব্ধির অব্যবস্থা ও অনুপলব্ধির অব্যবস্থাকে যিনি জানেন, তাহার কোন পদার্থ উপলব্ধ হইলে কি বিদ্যমান পদার্থ উপলব্ধ হইতেছে? অথবা অবিদ্যমান পদার্থ উপলব্ধ হইতেছে? এইরূপ সংশয় হইতে পারে। এবং কোন পদার্থ উপলব্ধ না হইলে, কি বিদ্যমান পদার্থ উপলব্ধ হইতেছে না? অথবা অবিদ্যমান পদার্থ উপলব্ধ হইতেছে না? এইরূপ সংশয় হইতে পারে। কিন্তু পূৰ্বোক্ত উপলব্ধির অব্যবস্থা ও অনুপলব্ধির অব্যবস্থা থাকিলেও যিনি ঐ বিষয়ে অজ্ঞ, তাহার ঐ জ্ঞতা ঐ প্রকার সংশয় হয় না। সুতরাং পূৰ্বোক্ত উপলব্ধির অব্যবস্থা ও অনুপলব্ধির অব্যবস্থার জ্ঞানই ঐ প্রকার সংশয়-বিশেষের কারণ বলিতে হইবে। তাহা হইলে সংশয়-লক্ষণ-হুত্রে যে পূৰ্বোক্ত অব্যবস্থাকেই সংশয়-বিশেষের কারণ বলা হইয়াছে, তাহা অসঙ্গত।

যদি বলা যায় যে, সংশয়-লক্ষণ-হুত্রে বিপ্রতিপত্তি-বাক্যের জ্ঞানকেই এবং পূৰ্বোক্ত অব্যবস্থার জ্ঞানকেই সংশয়বিশেষের কারণ বলা হইয়াছে, তাহা সম্ভব, তাহা সম্ভব, তাহাই বক্তার তাৎপর্য্যার্থ বুঝিতে হয়। সুতরাং পূৰ্ব্বব্যাখ্যাত পূৰ্বপক্ষ সম্ভব হয় না। এ জ্ঞতা ভাষ্যকার পরে “অথবা” বলিয়া প্রকারান্তরে এই হুত্রেও পূৰ্বপক্ষের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বস্তুতঃ মহর্ষির এই পূৰ্বপক্ষ-হুত্রে নিশ্চয়ার্থক “অব্যবস্থার” শব্দের প্রয়োগ থাকায় বিপ্রতিপত্তির নিশ্চয় এবং অব্যবস্থার নিশ্চয়-বশতঃ সংশয় হয় না, ইহাই এই হুত্রে দ্বারা সহজে বুঝা যায়। পূৰ্বহুত্রে হইতে “ন সংশয়ঃ” এই অংশের অন্তর্ভুক্তি ঐ হুত্রে হুত্বকারের অভিপ্রেত আছে এবং পরবর্তী পূৰ্বপক্ষ-হুত্রেও ঐ কথার অন্তর্ভুক্তি অভিপ্রেত আছে। এই হুত্রে ভাষ্যকারোক্ত প্রথম প্রকার ব্যাখ্যাত বিপ্রতিপত্তি-বাক্যসমূহ এবং অব্যবস্থাজ্ঞতা সংশয় হয় না; কিন্তু বিপ্রতিপত্তি-বাক্য ও অব্যবস্থার অব্যবস্থার অর্থাৎ নিশ্চয়-জ্ঞানই সংশয় হয়, এইরূপ হুত্বার্থ বুঝিতে হয়। কিন্তু মহর্ষি-হুত্রে দ্বারা ঐরূপ অর্থ সহজে বুঝা যায় না, ঐরূপ ব্যাখ্যার “ন সংশয়ঃ” এই অন্তর্ভুক্ত অংশেরও প্রকৃষ্ট সম্ভাবনা হয় না। তাই ভাষ্যকার শেষে কল্পান্তরে হুত্রে ব্যাখ্যাস্তর করিয়াছেন।



ভাষ্যকারের দ্বিতীয় প্রকার ব্যাখ্যার তাৎপর্য এই যে, বিপ্রতিপত্তি-বাক্যার্গ-জ্ঞানকে সংশয়-বিশেষের কারণ বলিলেও তাহা বলা যায় না। কারণ, একজন বলিলেন, আত্মা আছে; একজন বলিলেন, আত্মা নাই; এই বাক্যদ্বয়ের জ্ঞানপূর্বক তাহার অর্থ বুঝিলে একজন আত্মার অস্তিত্ববাদী, আর একজন আত্মার নাস্তিত্ববাদী, ইহাই বুঝা হয়। তাহার ফলে আত্মা আছে কি না, এইরূপ সংশয় কেন হইবে? বাদী ও প্রতিবাদীর কত কত বিরুদ্ধ মত জানা যাইতেছে, তাহাতে কি সর্কাত সকলের সেই বিরুদ্ধ পদার্থ নিয়ে সংশয় হইতেছে? তাহা যখন হইতেছে না, তখন বিপ্রতিপত্তি-জ্ঞান বা বিপ্রতিপত্তি-বাক্যার্গ-বোঝকে সংশয়বিশেষের কারণ বলা যাইতে পারে না। বাহ্য সংশয়ের কারণ হইবে, তাহা সর্কাতই সংশয় জন্মাইবে, নাচেৎ তাহা সংশয়ের কারণ হইতে পারে না। এইরূপ উপলক্ষির অব্যবস্থা এবং অল্পপলক্ষির অব্যবস্থার জ্ঞান বা নিশ্চয়কে সংশয়বিশেষের কারণ বলিলেও তাহা বলা যায় না। কারণ, উপলক্ষির নিয়ম নাই এবং অল্পপলক্ষিরও নিয়ম নাই, এইরূপ পৃথকভাবে নিশ্চয় থাকিলে তাহার ফলে বিষয়ান্তরে সংশয় হইবে কেন? এইরূপ স্থলে সংশয় উপপন্ন হয় না অর্থাৎ এইরূপ নিশ্চয়-জ্ঞান সংশয় হইবে, এ বিষয়ে কোন যুক্তি নাই। ফলকথা, বিপ্রতিপত্তি-জ্ঞান এবং উপলক্ষির অব্যবস্থা ও অল্পপলক্ষির অব্যবস্থার জ্ঞান বা নিশ্চয়, সংশয়ের কারণ নহে, ইহাই পূর্বপক্ষ ২২।

### সূত্র। বিপ্রতিপত্তৌ চ সম্প্রতিপত্তেঃ ॥৩॥৬৪॥\*

অনুবাদ। (পূর্বপক্ষ) এবং বিপ্রতিপত্তি স্থলে সম্প্রতিপত্তিবশতঃ (সংশয় হয় না) [ অর্থাৎ বাহ্য বিপ্রতিপত্তি, তাহা বাদী ও প্রতিবাদীর স্ব স্ব সিদ্ধান্তের নিশ্চয়রূপ সম্প্রতিপত্তি, সুতরাং তজ্জন্ম সংশয় হইতে পারে না। ]

ভাষ্য। যাক্ষ বিপ্রতিপত্তিং ভবান্ সংশয়হেতুং মন্ততে সা সম্প্রতিপত্তিঃ, সা হি দ্বয়োঃ প্রত্যনৌকধর্মবিবরণা। তত্র যদি বিপ্রতিপত্তেঃ সংশয়ঃ সম্প্রতিপত্তেরেব সংশয় ইতি।

অনুবাদ। এবং যে বিপ্রতিপত্তিকে আপনি সংশয়ের কারণ বলিয়া মানিতেছেন, তাহা সম্প্রতিপত্তি অর্থাৎ তাহা বাদী ও প্রতিবাদীর স্বীকার বা নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান। যেহেতু তাহা উভয়ের (বাদী ও প্রতিবাদীর) বিরুদ্ধ ধর্মবিষয়ক জ্ঞান। তাহা হইলে অর্থাৎ বিপ্রতিপত্তি নামক জ্ঞান বশতঃ সম্প্রতিপত্তি হইলে যদি বিপ্রতিপত্তি-জন্ম সংশয় হয়, (তবে) সম্প্রতিপত্তি-জন্মই সংশয় হয়, [ অর্থাৎ বিপ্রতিপত্তি যখন বশতঃ বাদী ও প্রতিবাদীর স্ব স্ব সিদ্ধান্তের নিশ্চয়রূপ সম্প্রতিপত্তি, তখন

\* ন বিপ্রতিপত্তিরস্তীতি সূত্রার্থঃ।—ভাষ্যাত্মক।

বিপ্রতিপত্তিকে সংশয়ের কারণ বলা যায় না, তাহা বলিলে সম্প্রতিপত্তিকেই সংশয়ের কারণ বলা হয়। বাদী ও প্রতিবাদীর সম্প্রতিপত্তি তাহাদিগের সংশয়ের বাধকই হয় ; সুতরাং তাহা কখনই সংশয়ের কারণ হইতে পারে না ]।

টিপ্পনী। বিপ্রতিপত্তি-বাক্য সংশয়ের কারণ হয় না, এ জন্ত বিপ্রতিপত্তি-জ্ঞানকে সংশয়ের কারণ বলিলে তাহাও বলা যায় না ; কারণ, বিপ্রতিপত্তি-জ্ঞান সংশয়ের কারণ হইবে, এ বিষয়ে কোন যুক্তি নাই, এই পূর্বপক্ষ পূর্বস্থতের দ্বারা সূচিত হইয়াছে। এখন মহর্ষি এই পূর্বপক্ষকে অগ্রাহ্য হেতুর দ্বারা বিশেষরূপে সমর্থন করিবার জন্ত এই সূত্রটি বলিয়াছেন। ভাষ্যকার তাহার তাৎপর্য্য বর্ণন করিয়াছেন যে, বিপ্রতিপত্তি-বাক্যকে সংশয়ের কারণ বলা যায় না বলিয়া যদি বিপ্রতিপত্তি-জ্ঞানকেই সংশয়ের কারণ বলেন, তাহাও বলিতে পারেন না। কারণ, বাদী ও প্রতিবাদীর বিরুদ্ধ-দৃষ্টবিষয়ক জ্ঞানই বিপ্রতিপত্তি। বাদী জানেন, আত্মা আছে, প্রতিবাদী জানেন—আত্মা নাই। উভয়ের আত্মবিষয়ে অস্তিত্ব ও নাতিত্বরূপ বিরুদ্ধ দৃষ্টবিষয়ক জ্ঞানই এই স্থলে বিপ্রতিপত্তি। তাহা হইলে বস্তুতঃ উহা সম্প্রতিপত্তিই হইল। “সম্প্রতিপত্তি” শব্দের অর্থ স্বীকার বা নিশ্চয়াদ্বয়ক জ্ঞান। বাদীর আত্মবিষয়ে অস্তিত্ব নিশ্চয় এবং প্রতিবাদীর আত্মবিষয়ে নাতিত্ব নিশ্চয় তাহাদিগের সম্প্রতিপত্তি। এই সম্প্রতিপত্তি ভিন্ন দেখানে বিপ্রতিপত্তি নামক পৃথক কোন জ্ঞান নাই। বাদী ও প্রতিবাদীর ঐরূপ স্ব স্ব সিদ্ধান্তের নিশ্চয়রূপ সম্প্রতিপত্তি থাকিলে তাহা সংশয়ের বাধকই হইবে, সুতরাং তজ্জন্ত সংশয় জন্মে, এ কথা কখনই বলা যায় না। ফলকথা, বিপ্রতিপত্তি সংশয়ের কারণ হইতে পারে না। কারণ, যাহাকে বিপ্রতিপত্তি বলা হইতেছে, তাহা বস্তুতঃ সম্প্রতিপত্তি ; বিপ্রতিপত্তি নামে পৃথক কোন জ্ঞান নাই। বিপ্রতিপত্তিকে সংশয়ের কারণ বলিলে বস্তুতঃ সম্প্রতিপত্তিকেই সংশয়ের কারণ বলা হয়। তাহা যখন বলা যাইবে না, তখন বিপ্রতিপত্তি-জন্ত সংশয় হয়, এ কথা কোনরূপেই বলা যায় না। ৩ ॥

**সূত্র । অব্যবস্থাত্মনি ব্যবস্থিতত্বাচ্চাব্যবস্থার্যাঃ ॥৪॥৬৫॥\***

অনুবাদ। এবং অব্যবস্থাস্বরূপে ব্যবস্থিত আছে বলিয়া অব্যবস্থাহেতুক সংশয় হয় না [ অর্থাৎ অব্যবস্থা যখন স্ব স্ব রূপে ব্যবস্থিত, তখন তাহা অব্যবস্থাই নহে, সুতরাং অব্যবস্থা সংশয়ের কারণ, এ কথা বলা যায় না। ]

ভাষ্য। ন সংশয়ঃ। যদি তাবদিয়মব্যবস্থা আত্মন্তেব ব্যবস্থিতা, ব্যবস্থানাদব্যবস্থা ন ভবতীতানুপপন্নঃ সংশয়ঃ। অথাব্যবস্থা আত্মনি ন ব্যবস্থিতা, এবমতাদান্ধ্যাদব্যবস্থা ন ভবতীতি সংশয়াভাব ইতি।



অনুবাদ। ( পূর্বপক্ষ ) সংশয় হয় না অর্থাৎ অব্যবস্থা হেতুক সংশয় হয় না। যদি এই অব্যবস্থা (সংশয়লক্ষণসূত্রোক্ত উপলব্ধির অব্যবস্থা ও অনুপলব্ধির অব্যবস্থা) আত্মাতেই অর্থাৎ নিজের স্বরূপেই ব্যবস্থিত থাকে, ( তাহা হইলে ) ব্যবস্থানবশতঃ অর্থাৎ ব্যবস্থিত আছে বলিয়া ( তাহা ) অব্যবস্থা হয় না, এ জন্ত সংশয় অনুপপন্ন [ অর্থাৎ বাহ্য ব্যবস্থিত আছে, তাহাকে অব্যবস্থা বলা যায় না। অব্যবস্থা স্ব স্ব রূপে ব্যবস্থিত থাকিলে তাহা অব্যবস্থাই নহে, সুতরাং অব্যবস্থা হেতুক সংশয় হয়, এ কথা কখনই বলা যায় না। ]

আর যদি অব্যবস্থা স্ব স্ব রূপে ব্যবস্থিত না থাকে, এইরূপ হইলে তাদাত্ত্বের অভাববশতঃ অর্থাৎ তৎস্বরূপতা বা অব্যবস্থাস্বরূপতার অভাববশতঃ অব্যবস্থা হয় না—এ জন্ত ( অব্যবস্থা হইতে ) সংশয় হয় না। [ অর্থাৎ যে পদার্থ স্ব স্ব রূপে ব্যবস্থিত নহে, তাহা তৎস্বরূপই হয় না। অব্যবস্থা স্ব স্ব রূপে ব্যবস্থিত নহে, ইহা বলিলে তাহা অব্যবস্থাস্বরূপই হইল না ; সুতরাং অব্যবস্থাবশতঃ সংশয় জন্মে, এ কথা কোন পক্ষেই বলা যায় না। ]

টীকণী। সংশয়-লক্ষণসূত্রে উপলব্ধির অব্যবস্থা এবং অনুপলব্ধির অব্যবস্থাকে সংশয়বিশেষের কারণ বলা হইয়াছে। অজ্ঞায়মান ঐ অব্যবস্থা সংশয়ের কারণ হইতে পারে না। এ জন্ত ঐ অব্যবস্থার অন্যবসায় অর্থাৎ নিশ্চয়কে সংশয়বিশেষের কারণ বলিলে তাহাও বলা যায় না। কারণ, তদ্বিশেষে কোন বৃত্তি নাই। এই পূর্বপক্ষ দ্বিতীয় সূত্রের দ্বারা সূচিত হইয়াছে। এখন মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা প্রকারান্তরেও ঐ পূর্বপক্ষের সমর্থন করিতেছেন। সংশয়লক্ষণ-সূত্রে মহর্ষির প্রযুক্ত “অব্যবস্থা” শব্দের অর্থ-ক্রমে অর্থাৎ মহর্ষির সেই সূত্রের প্রকৃতার্থ না বুঝিয়াই এইরূপে পূর্বপক্ষের অবতারণা হয়, ইহাই মহর্ষির মূল তাৎপর্য। প্রথম পূর্বপক্ষ-সূত্র হইতে এই সূত্র পর্য্যন্ত “ন সংশয়ঃ” এই অংশের অন্তর্ভুক্তি সূত্রকারের অভিপ্রেত আছে। তাই ভাষ্যকার এই সূত্র-ভাষ্যে প্রথমেই “ন সংশয়ঃ” এই অন্তর্বৃত্ত অংশের উল্লেখ করিয়াছেন। সূত্রের “অব্যবস্থাস্থাঃ” এই কথার সহিত ভাষ্যকারোক্ত “ন সংশয়ঃ” এই কথার যোগ করিতে হইবে। তাহাতে বুঝা যায়, অব্যবস্থা হেতুক সংশয় হয় না। কেন হয় না? তাই মহর্ষি তাহার হেতু বলিয়াছেন,—“অব্যবস্থাস্থানি ব্যবস্থিতস্থানং”। আত্ম-শব্দের অর্থ এখানে স্বরূপ। “অব্যবস্থাস্থানি” ইহার ব্যাখ্যা অব্যবস্থাস্বরূপে। অর্থাৎ যেহেতু অব্যবস্থা স্ব স্বরূপে ব্যবস্থিতা, অতএব অব্যবস্থা-হেতুক সংশয় হয়, এ কথা বলা যায় না।

ভাষ্যকার মহর্ষির তাৎপর্য্য বর্ণন করিয়াছেন যে, বাহ্য ব্যবস্থিতা নহে, তাহাকেই “অব্যবস্থা” বলা যায় ( “ব্যবস্থিতং বা সা ব্যবস্থা, ন ব্যবস্থা অব্যবস্থা” এইরূপ ব্যুৎপত্তিতে )। পূর্বোক্ত অব্যবস্থা যখন স্ব স্ব রূপে ব্যবস্থিতা, তখন তাহাকে অব্যবস্থা বলা যায় না। ফলকথা, অব্যবস্থা

বলিয়া কোন পদার্থই হইতে পারে না। তাহাকে অব্যবস্থা বলা হইয়াছে, তাহাও স্ব স্ব রূপে ব্যবস্থিতা বলিয়া ব্যবস্থাই হইবে, তাহা অব্যবস্থা হইতে পারে না। সুতরাং অব্যবস্থা-হেতুক সংশয় হয় অর্থাৎ অব্যবস্থা সংশয়বিশেষের কারণ, এ কথা কখনই বলা যায় না। যদি বল, অব্যবস্থা স্ব স্ব রূপে ব্যবস্থিতা নহে, সুতরাং উহা অব্যবস্থা হইতে পারে; তাহাও বলিতে পার না। কারণ, যাহা স্ব স্ব রূপে ব্যবস্থিতই নহে, তাহা কোন পদার্থই হইতে পারে না। মুক্তিকালে ঘট জন্মে, কিন্তু ঘাটের উপস্থিতির পূর্বে ঘট স্ব স্ব রূপে ব্যবস্থিতই হয় নাই, এ জ্ঞাত তখন ঘট আছে, এ কথা বলা যায় না। তখন ঘট স্ব স্ব রূপে ব্যবস্থিত না হওয়াতেই মুক্তিকালে ঘট বলা হয় না। যখন মুক্তিকালে ঘট উপস্থিত হইয়া স্ব স্ব রূপে ব্যবস্থিত হইবে, তখনই তাহাকে ঘট বলা হয়। ফলকথা, অব্যবস্থা স্ব স্ব রূপে ব্যবস্থিতা না হইলে তাহাতে অব্যবহার তাদাত্ম্য বা অব্যবস্থা-স্বরূপতা থাকে না অর্থাৎ তাহা অব্যবস্থাই হইতে পারে না। সুতরাং এ পক্ষেও অব্যবস্থা-হেতুক সংশয় জন্মে, এ কথা কোন-রূপেই বলা যায় না। উভয় পক্ষেই যখন অব্যবস্থা বলিয়া কোন পদার্থই নাই, তখন অব্যবহার নিশ্চর অলীক; সুতরাং অব্যবহার নিশ্চয়হেতুক সংশয় জন্মে, এ কথাও কোনরূপে বলা যায় না। বৃত্তিকার বিখ্যাত প্রভৃতি মহর্ষির সংশয়লক্ষণ-সূত্রোক্ত উপলব্ধির অব্যবস্থা ও অমুপলব্ধির অব্যবহার অল্পরূপ ব্যাখ্যা করিলেও ভাষ্যকার ঐ “অব্যবস্থা” শব্দের দ্বারা অনিয়ম অর্থেই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। উপলব্ধির অনিয়মই উপলব্ধির অব্যবস্থা এবং অমুপলব্ধির অনিয়মই অমুপলব্ধির অব্যবস্থা। এবং ভাষ্যকার ঐ অব্যবহার নিশ্চয়কে পৃথকরূপেই সংশয়বিশেষের কারণরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। পরবর্তী উদ্যোতকের প্রভৃতি তাহা না করিলেও ভাষ্যকার মহর্ষি-সূত্রের দ্বারা মহর্ষির ঐরূপ নতই বুঝিয়াছিলেন। মহর্ষি এখানে তাহার পূর্বোক্ত সংশয় কারণগুলিকে গ্রহণ করিয়া পৃথক পৃথক পূর্ণপক্ষের অবতারণা করার অর্থাৎ বিপ্রতিপত্তির নিশ্চয় এবং অব্যবহার নিশ্চয়কেও সংশয়-বিশেষের কারণরূপে পূর্বোক্ত বলিয়া গ্রহণ করিয়া, তাহাতে পূর্ণপক্ষের অবতারণা করার, ভাষ্যকার উপলব্ধির অব্যবস্থা ও অমুপলব্ধির অব্যবহার নিশ্চয়কেও সংশয়বিশেষের পৃথক কারণরূপে মহর্ষি-সম্মত বলিয়া বুঝিতে পারেন। সংশয়লক্ষণ-সূত্র-ব্যাখ্যায় (১ অ০, ২৩ সূত্র) এ সকল কথা ও উদ্যোতকের ব্যাখ্যা বলা হইয়াছে। সেখানে মহর্ষি-সূত্রানুসারে ভাষ্যকার বিপ্রতিপত্তিবাক্য এবং পূর্বোক্ত অব্যবস্থাদ্বয়কে সংশয়বিশেষের কারণরূপে ব্যাখ্যা করিলেও ঐ বিপ্রতিপত্তিবাক্য-নিশ্চয় ও অব্যবস্থাদ্বয়ের নিশ্চয়ই বস্তুতঃ সংশয়ের সাক্ষ্য কারণ হইবে। পরবর্তী সিদ্ধান্ত-সূত্রের দ্বারা মহর্ষির এই তাৎপর্য্য পরিষ্কৃত হইবে। ভাষ্যকারও সেখানে ঐরূপই তাৎপর্য্য ব্যক্ত করিয়াছেন। বিপ্রতিপত্তি-বাক্য ও পূর্বোক্ত অব্যবস্থাদ্বয় সংশয়ের কারণ না হইলেও সংশয়ের প্রয়োজক। মহর্ষি সংশয়লক্ষণসূত্রে দ্বিতীয় ও তৃতীয়—পঞ্চমী বিভক্তির প্রয়োজকত্ব অর্থেই প্রয়োগ করিয়াছেন, ইহা বলা যাইতে পারে। কেহ কেহ তাহাও বুঝিয়াছেন। অথবা মহর্ষি সেই সূত্রে বিপ্রতিপত্তি-জ্ঞান অর্থেই বিপ্রতিপত্তি শব্দ এবং অব্যবহার জ্ঞান অর্থেই অব্যবস্থা শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। প্রাচীনগণ অনেক স্থলে জ্ঞানবিশেষ বুঝাইতে সেই জ্ঞানের বিষয়বোধক শব্দেরই প্রয়োগ করিয়া গিয়াছেন। পরবর্তী সিদ্ধান্তসূত্র-ভাষ্য-ব্যাখ্যায় এ সব কথা পরিষ্কৃত হইবে। এই সূত্রের



ব্যাখ্যায় পরবর্তী নব্যগণ নানা কথা বলিলেও মহর্ষি-স্বত্বের দ্বারা তাৎকালিক ব্যাখ্যাই সহজে বুঝা যায় এবং মহর্ষির সংশয়-লক্ষণ-সূত্রোক্ত অব্যবস্থা শব্দের অর্থ না বুঝিয়াই এই পূর্বপক্ষের অবতারণা হয়, ইহা সর্বপ্রকার ব্যাখ্যাতেই বলিতে হইবে । ৪ ।

## মূত্র । তথাহত্যন্তসংশয়স্তদ্ব্যসাততোপ-

পত্তেঃ ॥৫॥৬৬॥\*

অনুবাদ । ( পূর্বপক্ষ ) সেইরূপ অত্যন্ত সংশয় ( সর্বদা সংশয় ) হইয়া পড়ে; কারণ, তদ্ব্যসের সাততোর অর্থাৎ সংশয়ের কারণরূপে স্বীকৃত সমানধর্মের সার্বকালিকত্বের উপপত্তি ( সত্তা ) আছে ।

ভাষ্য । যেন কল্পেন ভবান্ সমান-ধর্মোপপত্তেঃ সংশয় ইতি মত্বতে, তেন খল্বত্যন্তসংশয়ঃ প্রসজ্যতে । সমান-ধর্মোপপত্তেরনুচ্ছেদাৎ সংশয়ানুচ্ছেদঃ । নায়নতদ্ব্যসাদ্ব্যসী বিমৃশ্যমানো গৃহ্যতে, সততস্ত তদ্ব্যসী ভবতীতি ।

অনুবাদ । যে কল্পে ( প্রথম কল্পে ) আপনি সমান ধর্মের বিদ্যমানতা হেতুক সংশয় হয়, ইহা মানিয়াছেন অর্থাৎ সমান ধর্মের বিদ্যমানতাকে অথবা সমান ধর্মকে সংশয়বিশেষের কারণ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, সেই কল্পে অত্যন্ত সংশয় ( সর্বদা সংশয় ) হইয়া পড়ে । সমান ধর্মের বিদ্যমানতার অথবা সমান ধর্মের অনুচ্ছেদ-বশতঃ সংশয়ের অনুচ্ছেদ হয় । তদ্ব্যসশূন্য অর্থাৎ সমান ধর্মশূন্য এই ধর্মী সন্দিহমান হইয়া জ্ঞানের বিষয় হয় না, কিন্তু সর্বদা ( সেই ধর্মী ) তদ্ব্যসবিশিষ্ট ( সমান ধর্মবিশিষ্ট ) থাকে ।

টিলনী । মহর্ষি সংশয়লক্ষণসূত্রে সমান ধর্মের উপপত্তি এবং অনেক ধর্মের উপপত্তিকে সংশয়-বিশেষের কারণ বলিয়াছেন । ঐ সমান ধর্মের ও অনেক ধর্মের উপপত্তি বলিতে যদি উহার বিদ্যমানতা বা স্বরূপই বুঝি, তাহা হইলে সমান ধর্ম ও অনেক ধর্মকেই মহর্ষি সংশয়বিশেষের কারণ বলিয়াছেন, ইহা বুঝা যায় । “উপপত্তি” শব্দের স্বরূপ বা বিদ্যমানতা অর্থেও প্রাচীনদিগের প্রয়োগ দেখা যায় । মহর্ষি গোতমও অনেক স্থলে “উপপত্তি” শব্দের ঐরূপ অর্থে প্রয়োগ করিয়াছেন । সুতরাং সংশয়লক্ষণসূত্রে সমান ধর্মের উপপত্তি বলিতে সমান ধর্মের বিদ্যমানতা বা সমান ধর্মস্বরূপ অর্থাৎ সমান ধর্ম বুঝিতে পারি । এবং অনেক ধর্মের উপপত্তি বলিতেও ঐরূপ অর্থ বুঝিতে পারি । প্রথম কল্পে মহর্ষি সমান ধর্মের উপপত্তিকে সংশয়বিশেষের কারণ বলিয়া-

\* সমানধর্মাদীন্য সাততাক্রিতঃ সংশয় ইতি সূত্রার্থঃ ।—ভার্যাবর্তিক ।

ছেন। তাহাতে অজ্ঞানমান সমান ধর্ম সংশয়ের কারণ হইতে পারে না, এইরূপ পূর্বপক্ষও ভাষ্যকার প্রথম পক্ষে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। মহাবি এই সূত্রের দ্বারা শেষে অন্তরূপে ঐ পূর্বপক্ষ সমর্থন করিয়াছেন যে, সমান ধর্মই—যদি সংশয়ের কারণ হয়, তাহা হইলে সংশয়ের কোন দিনই নিবৃত্তিও হইতে পারে না, সর্বদাই সংশয় হইতে পারে। কারণ, সেই সমান ধর্ম সেই ধর্মীতে সততই আছে। অর্থাৎ স্বাণু ও পুরুষের সমান ধর্ম উচ্চতা প্রকৃতি সর্বদাই স্বাণু ও পুরুষে আছে। স্বাণু বা পুরুষের কোন বিশেষ ধর্মনিশ্চয় হইলে, তখনও কেন সংশয় হয় না? যাহা সংশয়ের কারণ বলা হইয়াছে, সেই সমান ধর্ম উচ্চতা প্রকৃতি তখনও দেখানে আছে। ভাষ্যকার এই কথাটা বুঝাইতে শেষে বলিয়াছেন যে, যে ধর্মী সন্ধিমান হইয়া অর্থাৎ সন্দেহের বিষয় হইয়া জ্ঞাত হয়, সেই ধর্মী তখন সমান ধর্মশূন্য নহে অর্থাৎ তাহাতে যে সমান ধর্ম থাকে না, কিন্তু সমান-ধর্মবিশিষ্ট বলিয়াই তখন তাহা প্রতীয়মান হয়, ইহা নহে। কিন্তু সেই ধর্মী সর্বদাই সেই সমান ধর্মবিশিষ্ট। যেমন স্বাণু ও পুরুষ সর্বদাই উচ্চতা প্রকৃতি সমান-ধর্মবিশিষ্ট। ভাষ্যকার এই হ্রদ ব্যাখ্যার কেবল সমান ধর্মের কথা বলিলেও তুল্যভাবে উহার দ্বারা এখানে মহাবি-কথিত অনাধারন ধর্মের কথাও বুঝিতে হইবে। উল্লেখ্যতকর মহাবি-সূত্রার্গ-বর্ণনায় এখানে “সমান-ধর্মীনাং” এইরূপ কথাই লিখিয়াছেন। ৫।

ভাষ্য। অস্ত্য প্রতিষেধপ্রপঞ্চস্ত সংক্ষেপেণোদ্ধারঃ।

অনুবাদ। এই প্রতিষেধ-সমূহের সংক্ষেপে উদ্ধার করিতেছেন। অর্থাৎ মহাবি এই সূত্রের দ্বারা পূর্বোক্ত পূর্বপক্ষগুলির সংক্ষেপে উত্তর সূচনা করিয়াছেন।

সূত্র। যথোক্তাধ্যবসায়াদেব তদ্বিশেষাপেক্ষাং  
সংশয়ে নাসংশয়ো নাত্যন্ত-সংশয়ো বা ॥৩৯॥৬৭॥\*

অনুবাদ। (উত্তর) তদ্বিশেষাপেক্ষা অর্থাৎ সংশয়-লক্ষণ-সূত্রে যে বিশেষাপেক্ষা বলিয়াছি, সেই বিশেষাপেক্ষাবৃত্ত যথোক্ত নিশ্চয়বশতঃই অর্থাৎ সেই সূত্রোক্ত সমান-ধর্মাদির নিশ্চয়বশতঃই সংশয় হইলে সংশয়ের অভাব হয় না, অত্যন্ত সংশয়ও হয় না [অর্থাৎ সমান-ধর্মাদির নিশ্চয়কেই সংশয়ের কারণ বলা হইয়াছে; সুতরাং কারণের অভাবে সংশয়ের অনুপপত্তি হয় না, সর্বদা কারণ আছে বলিয়া সর্বদা সংশয়ের আপত্তিও হয় না]।



বিবৃতি। যদি সংশয়-লক্ষণ-হুত্রে ( ১ অং, ২৩ হুত্রে ) সমানধর্মাদি পদার্থকেই সংশয়ের কারণ বলা হইত, তাহা হইলে অজ্ঞায়মান সমানধর্মাদিপদার্থ সংশয়ের কারণ হইতে পারে না বলিয়া, কারণের অভাবে কোন স্থলেই সংশয় হইতে পারে না, এই অল্পপপত্তি হইতে পারিত এবং ঐ সমান-ধর্মাদি পদার্থকে কারণ বলিলে সর্বদাই উহা আছে বলিয়া সর্বদাই সংশয় হউক, এই আপত্তি হইতে পারিত, কিন্তু সংশয়লক্ষণ-হুত্রে সমানধর্মাদির নিশ্চয়কেই সংশয়ের কারণ বলা হইয়াছে, সুতরাং কারণের অভাবে সংশয়ের অল্পপপত্তি এবং সর্বদা কারণ আছে বলিয়া সর্বদা সংশয়ের আপত্তি হইতে পারে না। যে সমান ধর্মের নিশ্চয় সংশয়বিশেষের কারণ, সেই সমান ধর্ম সর্বদা কোন স্থানে থাকিলেও, তাহার নিশ্চয় না হইলে সংশয় হইতে পারে না। আপত্তি হইতে পারে যে, সমানধর্মাদির কোন একটির নিশ্চয় সাধেও অনেক স্থলে বহন সংশয় জন্মে না, তখন সমানধর্মাদির নিশ্চয়কেও সংশয়ের কারণ বলা যায় না। যেমন স্থাপু বা পুরুষ বলিয়া নিশ্চয় হইয়া গেলে, তখনও স্থাপু ও পুরুষের সমান ধর্ম উচ্চতা প্রভৃতির নিশ্চয় থাকে, কিন্তু তখন আর “ইহা কি স্থাপু ? অথবা পুরুষ ?” এইরূপ সংশয় জন্মে না,—স্থাপু বা পুরুষ বলিয়া নিশ্চয় হইয়া গেলে, তখন আর ঐরূপ সংশয় কিছুতেই হইতে পারে না। এতদ্বারা বলা হইয়াছে যে, সংশয়নায়েই বিশেষাণেক্ষা থাকা চাই। অর্থাৎ বিশেষ ধর্মের অল্পপলক্ষি সংশয়নায়েই কারণ। পূর্বোক্ত স্থলে তাহা না থাকায় সংশয়ের সমস্ত কারণ নাই, সুতরাং সেখানে সংশয় হয় না। স্থাপু বা পুরুষের কোন একটির নিশ্চয় হইতে গেলে অবশ্যই সেখানে উহার কোন একটির বিশেষ ধর্মের উপলক্ষি হইবে। যে বিশেষ ধর্ম স্থাপুতেই থাকে, তাহা দেখিলে স্থাপু বলিয়া নিশ্চয় হইয়া যায় এবং যে বিশেষ ধর্ম পুরুষেই থাকে, তাহা দেখিলে পুরুষ বলিয়া নিশ্চয় হইয়া যায়। যেখানে ঐরূপ কোন নিশ্চয় জন্মিয়াছে, সেখানে অবশ্যই ঐরূপ কোন বিশেষ ধর্মের উপলক্ষি হইয়াছে। ফলকথা, বিশেষ ধর্মের অল্পপলক্ষির সহিত সমান ধর্মের নিশ্চয় না থাকায় সেখানে পুনরায় সংশয়ের আপত্তি হয় না। মহর্ষি সংশয়লক্ষণ-হুত্রে “বিশেষাণেক্ষাঃ” এই কথাটির দ্বারা সংশয়নায়ে বিশেষ ধর্মের অল্পপলক্ষিকে কারণ বলিয়া হুচনা করিয়াছেন। অর্থাৎ সংশয়নায়েই পূর্বে বিশেষ ধর্মের উপলক্ষি থাকিবে না, কিন্তু তাহার স্মৃতি থাকা চাই। মূলকথা, পূর্বোক্ত সংশয়-লক্ষণ-হুত্রে অর্থ না বুঝিয়াই সংশয়ের কারণ বিবরণ পূর্বোক্ত প্রকার পুরুষাফের অবতারণা হইয়াছে, ইহাই এই হুত্রে তাৎপর্যার্থ। এইটি সিদ্ধান্ত-হুত্রে।

টিপ্পনী। মহর্ষি সংশয়পরীক্ষার জন্ত যে সকল পুরুষাফের অবতারণা করিয়াছেন, এই হুত্রে দ্বারা সেইগুলির উত্তর হুচনা করিয়া, সিদ্ধান্ত সমর্থন করায়, সংশয়-পরীক্ষা-প্রকরণে এই হুত্রেটি সিদ্ধান্ত-হুত্রে। সংশয়-লক্ষণ-হুত্রে সমানধর্ম, অনেকধর্ম, বিপ্রতিপত্তি, উপলক্ষির অব্যবস্থা এবং অল্পপলক্ষির অব্যবস্থা, এই পাঁচটিকেই এই হুত্রে যথোক্ত শব্দের দ্বারা ধরা হইয়াছে। উহাদ্বিগের অব্যবসায় অর্থাৎ নিশ্চয়ই সংশয়ের কারণ, উহারা সংশয়ের কারণ নহে, ইহা “যথোক্তাব্যবসায়সেব” এই স্থলে “এব” শব্দের দ্বারা প্রকাশ করা হইয়াছে। পূর্বোক্ত সমানধর্মাদি সবগুলির নিশ্চয়ই সর্বত্র সংশয়ের কারণ নহে। পঞ্চবিধ সংশয়ে পৃথক পৃথকরূপে পঞ্চবিধ কারণ বলা

হইয়াছে। অর্থাৎ সমানধর্মনিষ্ঠের অব্যবহিতোত্তরকালজায়মান সংশয়বিশেষের প্রতি সমান-  
ধর্মনিষ্ঠের কারণ, এইরূপে পঞ্চবিধ কার্যাকারণভাবই মহর্ষির বিবক্ষিত, সুতরাং কার্যাকারণভাবে  
ব্যক্তিরের আশঙ্কা নাই। পূর্বেও সমানধর্মাদির নিষ্ঠারূপ সংশয়ের কারণ, নির্বিশেষণ নহে,  
উহার বিশেষণ আছে, ইহা জানাইবার জন্য মহর্ষি এই সূত্রে “তদ্বিশেষাপেক্ষাং” এই বিশেষণবোধক  
বাক্যটির প্রয়োগ করিয়াছেন। অর্থাৎ সেই বিশেষাপেক্ষা দেখানে আছে, এমন সমান ধর্মাদির  
নিষ্ঠাই সংশয়ের কারণ। তাৎপর্যটীকাকার এখানে সূত্রতাত্পর্য বর্ণনায় বলিয়াছেন যে, যদি  
সংশয়ের কারণ নির্বিশেষণ হইত, তাহা হইলে সংশয়ের অনুপপত্তি এবং সর্বদা সংশয়ের আগতি  
হইত; কিন্তু সংশয়ের কারণে যখন বিশেষণ বলা হইয়াছে, তখন আর ঐ অনুপপত্তি ও আগতি  
নাই। তাৎপর্যটীকাকারের এই কথায় বুঝা যায় যে, বিশেষ ধর্মের অনুপলব্ধি বা স্মৃতি পৃথকভাবে  
সংশয়ের কারণ নহে। ঐ বিশেষ ধর্মের অনুপলব্ধি বা স্মৃতিবিশিষ্ট সমান ধর্মাদিনিষ্ঠাই ভিন্ন ভিন্ন  
সংশয়বিশেষের কারণ। ভাষ্যকারও এই সূত্রের ভাষ্যশেষে বলিয়াছেন—“তদ্বিশেষাধ্যবসারঃ বিশেষ-  
স্মৃতি-সহিতাং”। বৃত্তিকার বিঘ্ননাথও “বিশেষাদর্শন-সহিতসাধারণধর্মদর্শনাদিতঃ সংশয়ে স্বীকৃতে”  
এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। নব্য সম্প্রদায় কিন্তু ঐরূপে কার্যাকারণভাব কল্পনা করেন না। ঐরূপে  
কার্যাকারণ-ভাব করনাত্তে তাহারা গোরবদোম প্রদর্শন করেন। তাহাদিগের মতে বিশেষ ধর্মের  
অনুপলব্ধি সংশয়মাত্রের পৃথক কারণ। ভাষ্যকার বিশেষ ধর্মের স্মৃতিকে সংশয়মাত্রের সহকারী কারণ  
বলিবার জন্যও “বিশেষস্মৃতি-সহিতাং” এইরূপ কথা লিখিতে পারেন। তাহার ঐ কথার দ্বারা  
বিশেষধর্মের স্মৃতি সংশয়কারণের বিশেষণ, ইহা না বুঝিতেও পারি। বৃত্তিকার বিঘ্ননাথ সূত্রস্থ  
“তদ্বিশেষাপেক্ষাং” এই স্থলে “অপেক্ষা” শব্দ গ্রহণ করিয়া তদ্বারা অদর্শন অর্থের ব্যাখ্যা করিয়া-  
ছেন। ভাষ্যকার প্রকৃতি কিন্তু “অপেক্ষা” শব্দকে অবলম্বন করিয়াই স্বত্রার্থ বর্ণন করিয়াছেন।  
অপেক্ষা শব্দের আকাঙ্ক্ষা অর্থ আছে। বিশেষধর্মের আকাঙ্ক্ষা বলিতে এখানে বিশেষধর্মের  
জিজ্ঞাসা বুঝিতে হইবে। বিশেষধর্মের উপলব্ধি না হইলেই তাহার জিজ্ঞাসা থাকে; সুতরাং  
ঐ কথার দ্বারা বিশেষধর্মের অনুপলব্ধি পর্য্যন্তই মহর্ষির বিবক্ষিত। বিশেষধর্মের স্মৃতি থাকিবে,  
এই কথা বলিলে, তখন বিশেষধর্মের উপলব্ধি থাকিবে না, ইহা বুঝা যায় এবং বিশেষধর্মের স্মৃতি  
সংশয়ে আবশ্যক, এই জন্য ভাষ্যকার সূত্রোক্ত বিশেষাপেক্ষার কলিতার্থ ব্যাখ্যার “বিশেষস্মৃতি-  
অপেক্ষাং” এই প্রকার কথাই বলিয়াছেন। এখানে তাৎপর্যটীকাকারের কথা সংশয়-  
লক্ষণসূত্র-ব্যাখ্যার বলা হইয়াছে। সেখানে মহর্ষি বিপ্রতিপত্তি প্রভৃতিকে সংশয়ের প্রয়োজকরূপেই  
বলিয়াছেন। অথবা জায়মান বিপ্রতিপত্তি প্রভৃতির সংশয়-কারণত্ব তাৎপর্য্যেই “বিপ্রতিপত্তেঃ”  
ইত্যাদি প্রকার প্রয়োগ করিয়াছেন। সুতরাং পূর্বাপর বিরোধের আশঙ্কা নাই।

ভাষ্য। ন সংশয়ানুৎপত্তিঃ সংশয়ানুচ্ছেদশ্চ প্রসজ্যতে। কথম্ ?  
যত্বেবং সমানধর্মাদ্যবসারঃ সংশয়হেতুর্ন সমানধর্মমাত্রমিতি। এবমেনতৎ,  
কস্মাদেবং নোচ্যত ইতি, “বিশেষাপেক্ষা” ইতি বচনাং সিদ্ধেঃ। বিশেষ-



স্থাপেক্ষা আকাঙ্ক্ষা, সা চানুপলভ্যমানে বিশেষে সমর্থ। ন চোক্তং সমানধর্ম্যাপেক্ষ ইতি, সমানে চ ধর্ম্যে কথমাাকাঙ্ক্ষা ন ভবেৎ ? বদ্যম্ প্রত্যক্ষঃ স্থাৎ । এতেন সামর্থ্যেন বিজ্ঞারতে সমানধর্ম্মাধ্যবসায়াদিতি ।

অনুবাদ । সংশয়ের চানুপপত্তি এবং সংশয়ের অনুচ্ছেদ প্রসক্ত হয় না— অর্থাৎ সংশয়ের অনুপপত্তি এবং সর্বদা সংশয়ের আপত্তি হয় না । ( প্রশ্ন ) কেন ? ( উত্তর ) যেহেতু সমানধর্ম্মের অধ্যবসায় ( নিশ্চয় ) সংশয়ের কারণ, সমানধর্ম্মমাত্র সংশয়ের কারণ নহে । ( প্রশ্ন ) ইহা এইরূপ অর্থাৎ সমানধর্ম্মের নিশ্চয়ই সংশয়ের কারণ, সমানধর্ম্ম সংশয়ের কারণ নহে ; সুতরাং সংশয়ের অনুপপত্তি ও সর্বদা সংশয়ের আপত্তি হয় না, ইহা বুঝিলাম । ( কিন্তু জিজ্ঞাসা করি ), কেন এইরূপ বলা হয় নাই ? অর্থাৎ সংশয়লক্ষণসূত্রে সমানধর্ম্মের নিশ্চয়কে কেন কারণ বলা হয় নাই ? ( উত্তর ) যেহেতু “বিশেষ্যাপেক্ষ” এই কথা বলাতেই সিক্তি হইয়াছে অর্থাৎ সংশয়লক্ষণ-সূত্রে বিশেষ্যাপেক্ষ, এই কথা বলাতেই সমান ধর্ম্মের নিশ্চয় সংশয়ের কারণ ( সমান ধর্ম্ম নহে ), ইহা প্রকটিত হইয়াছে । ( ঐ কথার দ্বারা কিরূপে তাহা বুঝা যায়, তাহা বুঝাইতেছেন ) বিশেষ ধর্ম্মের অপেক্ষা কি না আকাঙ্ক্ষা, অর্থাৎ বিশেষ-ধর্ম্মের জিজ্ঞাসা, তাহা বিশেষধর্ম্ম উপলভ্যমান না হইলেই সমর্থ হয়, অর্থাৎ যেখানে বিশেষ ধর্ম্মের উপলব্ধি নাই, সেইখানেই বিশেষ ধর্ম্মের জিজ্ঞাসা জন্মিতে পারে । এবং “সমানধর্ম্ম্যাপেক্ষ” এই কথা বলেন নাই । সমানধর্ম্মে কেন আকাঙ্ক্ষা ( জিজ্ঞাসা ) হয় না ? যদি ইহা প্রত্যক্ষ হয়, [ অর্থাৎ সমানধর্ম্মের নিশ্চয় জন্মিলেই তদ্বিশয়ে জিজ্ঞাসা জন্মে না, সুতরাং সমানধর্ম্ম্যাপেক্ষ, এই কথা বলিলে সমানধর্ম্মের নিশ্চয় নাই, ইহা বুঝা যাইতে পারে । কিন্তু মহর্ষি যখন তাহাও বলেন নাই, পরন্তু বিশেষ্য-পেক্ষ, এই কথা বলিয়াছেন, তখন সমান-ধর্ম্মের নিশ্চয়কেই ( সমানধর্ম্মকে নহে ) তিনি সংশয়বিশেষের কারণ বলিয়াছেন, ইহা বুঝা যায় ] এই সামর্থ্যবশতঃ অর্থাৎ মহর্ষি-কথিত বিশেষ্যাপেক্ষ, এই কথার সামর্থ্যবশতঃ সমানধর্ম্মের নিশ্চয় জ্ঞাত ( সংশয় জন্মে ), ইহা বুঝা যায় ।

টিপ্পনী । মহর্ষি সংশয়লক্ষণসূত্রে সমান ধর্ম্মের উপলব্ধি-জ্ঞাত সংশয় হয়, এই কথা বলিয়াছেন ; সমান ধর্ম্মের উপলব্ধিরূপ নিশ্চয়-জ্ঞাত সংশয় হয়, এ কথা বলেন নাই । অবশ্য তাহা বলিলে পূর্বোক্ত প্রকার অনুপপত্তি ও আপত্তি হয় না । কিন্তু মহর্ষি সেখানে যখন তাহা বলেন নাই, তখন কি করিয়া তাহা বুঝা যায় ? আর মহর্ষির তাহাই বিবক্ষিত হইলে, কেন সেখানে তাহা বলেন নাই ?

এতদ্বারা ভাষ্যকার এখানে বলিয়াছেন যে, সেই সূত্রে “বিশেষ্যপেক্ষঃ” এই কথা বলাতেই মহর্ষির ঐ কথা বলা হইয়াছে; সুতরাং উহা আর স্পষ্ট করিয়া বলা তিনি আবশ্যক মনে করেন নাই। বিশেষ্যপেক্ষা বলিতে বিশেষ ধর্মের জিজ্ঞাসা, তাহা যেখানে থাকে, সেখানে বিশেষ ধর্মের অনুপলব্ধিই থাকে। বিশেষ ধর্মের উপলব্ধি থাকিলে, ঐ বিশেষ ধর্মকে উপলব্ধি করিবার ইচ্ছা হয় না। সুতরাং ঐ কথার দ্বারা বিশেষ ধর্মের উপলব্ধি নাই, কেবল তাহার স্মৃতি আছে, অর্থাৎ সংশয়ের পূর্বে তাহাই থাকা আবশ্যক, ইহা বুঝা যায়। তাহা হইলে ঐ কথার দ্বারা সমান ধর্মের উপলব্ধি থাকা চাই, ইহাও বুঝা যায়। বিশেষ ধর্মের উপলব্ধি থাকিবে না, এ কথা বলিলে সামান্য ধর্মের উপলব্ধি থাকিবে, এই কথা বলা হয়। অর্থাৎ ঐ কথার দ্বারা ঐরূপ তাৎপর্য্যই বুঝিতে হয় এবং বুঝা যায়। অবশ্য যদি “সমানধর্ম্যপেক্ষঃ” এই কথা বলিতেন, তাহা হইলে পূর্বোক্ত যুক্তিতে সমানধর্মের উপলব্ধি থাকিবে না, ইহাও বুঝা যাইত; কিন্তু মহর্ষি তাহা বলেন নাই, তিনি “বিশেষ্যপেক্ষঃ” এই কথাই বলিয়াছেন। সুতরাং মহর্ষির ঐ কথার সাধারণতঃ নিঃসংশয়ে বুঝা যায় যে, তিনি সমানধর্মের উপলব্ধিরূপ নিশ্চয়কেই সংশয়ের কারণ বলিয়াছেন; সমানধর্মকে সংশয়ের কারণ বলেন নাই।

**ভাষ্য। উপপত্তিবচনাদ্বা।** সমানধর্মোপপত্তিরিত্যুচ্যতে, ন চান্তা সদ্ধাবসংবেদনাদৃতে সমানধর্মোপপত্তিরস্তি। অনুপলভ্যমানসদৃভাবো হি সমানো ধর্মোহবিদ্যমানবদভবতীতি। বিষয়শব্দেন বা বিষয়িণঃ প্রত্যয়স্যাভিধানং—যথা লোকে ধূমেনাগ্নিরনুমীয়ত ইত্যুক্তে ধূমদর্শনেনাগ্নিরনুমীয়ত ইতি জ্ঞায়তে।—কথম? দৃষ্টা হি ধূমমথাগ্নিমনু-মিনোতি নাদৃষ্টেতি। ন চ বাক্যে দর্শনশব্দঃ শ্রুয়তে, অনুজানাতি চ বাক্য-স্যার্থপ্রত্যায়কত্বং, তেন মন্ত্যামহে বিষয়শব্দেন বিষয়িণঃ প্রত্যয়ন্যাভিধানং বোদ্ধাহনুজানাতি, এবমিহাপি সমানধর্মশব্দেন সমানধর্মাদ্যবসায়মাহেতি।

**অনুবাদ।** অথবা “উপপত্তি” শব্দবশতঃ—[ অর্থাৎ “উপপত্তি” শব্দের প্রয়োগ করাতেই সমানধর্মের নিশ্চয়-জ্ঞান সংশয় হয়, ইহা বলা হইয়াছে ] বিশদার্থ এই যে, ( সংশয়লক্ষণসূত্রে ) “সমানধর্মের উপপত্তিহেতুক” এই কথা বলা হইয়াছে, সদ্ধাবসংবেদন ব্যতীত ( সমানধর্মের সদ্ধাব কি না বিদ্যমানতার জ্ঞান ব্যতীত ) সমানধর্মের উপপত্তি পূর্বক নাই, অর্থাৎ সমানধর্মের বিদ্যমানতার জ্ঞানই সমানধর্মের উপপত্তি। যেহেতু যে সমানধর্মের সদ্ধাব কি না বিদ্যমানতা উপলব্ধ হইতেছে না, এমন সমানধর্ম অবিদ্যমানের জ্ঞান হয়—[ অর্থাৎ তাহা প্রকৃত কার্য্যকারী না হওয়ায়, থাকিয়াও না থাকার মত হয়। সুতরাং সমানধর্মের উপপত্তি



বলিতে তাহার জ্ঞানই বুঝিতে হইবে]। অথবা বিষয়বোধক শব্দের দ্বারা বিষয়ী জ্ঞানের কথন হইয়াছে, ( অর্থাৎ সংশয়লক্ষণসূত্রে “সমানধর্ম্য” শব্দের দ্বারা মহর্ষি সমানধর্ম্যবিষয়ক জ্ঞানই বলিয়াছেন ) যেমন লোকে ধূমের দ্বারা অগ্নিকে অনুমান করিতেছে, এই কথা বলিলে ধূমদর্শনের দ্বারা অগ্নিকে অনুমান করিতেছে, ইহা বুঝা যায়। ( প্রশ্ন ) কেন ? ( উত্তর ) যেহেতু ধূমকে দর্শন করিয়া অনন্তর অগ্নিকে অনুমান করে, দর্শন না করিয়া করে না ( অর্থাৎ ধূম থাকিলেও তাহাকে না দেখিলে বহির অনুমান হয় না )। বাক্যে ( ধূমের দ্বারা “অগ্নিকে অনুমান করিতেছে” এই পূর্বোক্ত বাক্যে ) “দর্শন” শব্দ শ্রুত হইতেছে না ( অর্থাৎ ‘ধূমদর্শনের দ্বারা’ এই কথা সেখানে বলা হয় নাই, ‘ধূমের দ্বারা’ এই কথাই বলা হইয়াছে )। বাক্যের অর্থাৎ “ধূমের দ্বারা অগ্নিকে অনুমান করিতেছে” এই পূর্বোক্ত বাক্যের অর্থবোধকত্বও ( বোদ্ধা ব্যক্তি ) স্বীকার করেন। অতএব বুঝিতেছি, ( ঐ স্থলে ) বিষয়বোধক শব্দের দ্বারা বিষয়ী জ্ঞানের কথন বোদ্ধা স্বীকার করেন। এইরূপ এই স্থলেও ( সংশয়লক্ষণসূত্রেও ) “সমানধর্ম্য” শব্দের দ্বারা ( মহর্ষি ) সমানধর্ম্যের নিশ্চয় বলিয়াছেন।

টিপ্পনী। ভাষ্যকার প্রথমে বলিয়াছেন যে, মহর্ষি সংশয়লক্ষণসূত্রে “বিশেষ্যাপেক্ষঃ” এই কথা বলতেই, তিনি যে সমানধর্ম্যের নিশ্চয়কেই ( সমানধর্ম্যকে নহে ) সংশয়ের কারণ বলিয়াছেন, ইহা বুঝা যায়। ইহাতে আপত্তি হইতে পারে যে, “বিশেষ্যাপেক্ষঃ” এই কথার দ্বারা সংশয়ের পূর্বোক্ত বিশেষ শব্দের উপলব্ধি থাকিবে না, এই পর্য্যন্তই বুঝা যাইতে পারে; কিন্তু উহার দ্বারা সমান ধর্ম্যের উপলব্ধি থাকা চাই, ইহা নিঃসংশয় বুঝা যায় না। পরন্তু সেই হুত্রে “বিশেষ্যাপেক্ষঃ” এই কথাটি পদ্ধতিবিশেষেই বলা হইয়াছে। যদি “বিশেষ্যাপেক্ষঃ” এই কথার দ্বারা সমানধর্ম্যের উপলব্ধি থাকা চাই, ইহা বুঝা যায়, তাহা হইলে সর্ববিধ সংশয়েই সমানধর্ম্যের উপলব্ধি কারণ হইয়া পড়ে এবং ঐ কথার দ্বারা তাহাই বলা হয়; সুতরাং ভাষ্যকারের পূর্বোক্ত যুক্তি কোনরূপেই গ্রাহ্য নহে; এই জন্য ভাষ্যকার পূর্বে কয় পরিত্যাগ করিয়া, কল্পান্তরে বলিয়াছেন যে, মহর্ষি সংশয়লক্ষণসূত্রে “সমানানেকধর্ম্যোপপত্তেঃ” এই স্থলে উপপত্তি শব্দের প্রয়োগ করাতেই, সমানধর্ম্যের নিশ্চয়বোধক জ্ঞানই সংশয়বিশেষের কারণ, ইহা বলা হইয়াছে। অর্থাৎ মহর্ষি কেন সমানধর্ম্যের নিশ্চয়কে সংশয়বিশেষের কারণ বলেন নাই? এই পূর্বোক্ত প্রশ্ন হইতেই পারে না; কারণ, মহর্ষি তাহাই বলিয়াছেন। “উপপত্তি” শব্দের দ্বারা তাহা কিরূপে বুঝা যায়? এ জন্য ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, সমানধর্ম্যের বিদ্যমানতার জ্ঞান ব্যতীত সমানধর্ম্যের উপপত্তি আর কিছুই নহে। ভাষ্যকারের গূঢ় তাৎপর্য্য এই যে, যদিও “উপপত্তি” শব্দের অর্থ সত্তা বা বিদ্যমানতা, তাহা হইলেও “উপপত্তি” বলিতে ঐ স্থলে ঐ বিদ্যমানতার জ্ঞানই বুঝিতে হইবে। কারণ, সমানধর্ম্যের বিদ্যমানতা

থাকিলেও, ঐ বিদ্যমানতার উপলক্ষি না হওয়া পর্য্যন্ত ঐ সমানবর্ষ না থাকার মতই হয়, অর্থাৎ উহা প্রকৃত কার্য্যকারী হয় না। সুতরাং সমানবর্ষের বিদ্যমানতার জ্ঞানই সমানবর্ষের উপপত্তি বলিতে বুঝিতে হইবে। ফলকথা, সমানবর্ষের নিশ্চয়ই সমানবর্ষের উপপত্তি, তাহাকেই মহর্ষি প্রথম প্রকার সংশয়ের কারণ বলিয়াছেন।

উদ্যোতকর প্রথনাম্বারে সংশয়লক্ষণস্থত্র-বাস্তিকে ভাষ্যকারের দ্বারা এই সকল কথাই উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি প্রথম করে বলিয়াছেন যে, সমানবর্ষের উপলক্ষিই সমানবর্ষের উপপত্তি। মহর্ষি সমানবর্ষের উপলক্ষি না বলিলেও, “বিশেষ্যপেক্ষঃ” এই কথা বলাতেই উহা বুঝা যায়; সেই জন্তই মহর্ষি উহা বলা নিম্প্রয়োজন মনে করিয়াছেন। সেখানে তাৎপর্য্যটীকাকার উদ্যোতকরের তাৎপর্য্য বর্ণন করিয়াছেন যে, যদিও এই “উপপত্তি” শব্দ সত্তা অর্ণের বাচক, তথাপি “বিশেষ্যপেক্ষঃ” এই কথাটি থাকার “উপপত্তি” শব্দের দ্বারা তাহার উপলক্ষিই মহর্ষির বিবক্ষিত, ইহা বুঝা যায়।

উদ্যোতকর দ্বিতীয় করে বলিয়াছেন যে, অথবা “উপপত্তি” শব্দটি উপলক্ষি অর্ণের বাচক। প্রশ্নের দ্বারা উপলক্ষিকেই “উপপত্তি” বলে। উদ্যোতকর ভাষ্যকারের দ্বারা এখানে শেষে ইহাও বলিয়াছেন যে, তাহার বিদ্যমানতা উপলক্ষি হইতেছে না, তাহা অব্যয়মানের দ্বারা হয়। উদ্যোতকর শেষে আবার এ কথা বলেন কেন? ইহা বুঝাইতে তাৎপর্য্যটীকাকার বলিয়াছেন যে, “উপপত্তি” শব্দটি সত্তা ও উপলক্ষি, এই উভয় অর্ণেরই বাচক। তাহা হইলে এখানে যে উহার দ্বারা উপলক্ষি অর্ণই বুঝিব, সত্তা অর্ণ বুঝিব না, এ বিষয় কারণ কি? এতদ্বারা উদ্যোতকর শেষে ঐ কথা বলিয়াছেন। অর্থাৎ সমানবর্ষের সত্তা থাকিলেও তাহার উপলক্ষি না হওয়া পর্য্যন্ত যখন ঐ সমানবর্ষ অব্যয়মানের দ্বারা হয়, তখন সমানবর্ষের উপপত্তি বলিতে এখানে সমানবর্ষের উপলক্ষিই বুঝিতে হইবে। তাহা হইলে উদ্যোতকর ও তাৎপর্য্যটীকাকারের কথাবল্যারে দ্বিতীয় করে ভাষ্যকারও উপপত্তি শব্দের দ্বারা উপলক্ষিরূপ বুঝাৰ্ণই গ্রহণ করিয়াছেন, তাহারও ঐরূপই তাৎপর্য্য, ইহা বলা বাইতে পারে।

কিন্তু যদি উপপত্তি শব্দের সত্তা অর্ণে প্রচুর প্রয়োগবশতঃ উপপত্তি শব্দকে সত্তা অর্ণেরই বাচক বলিতে হয়, তাহা হইলে মহর্ষি সংশয়লক্ষণস্থত্রে “সমানবর্ষ” শব্দের দ্বারা সমানবর্ষবিষয়ক জ্ঞানই বলিয়াছেন, ইহাই বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ সমানবর্ষবিষয়ক যে জ্ঞান, তাহার উপপত্তি কি না সত্তাবশতঃ সংশয় জন্মে, ইহাই মহর্ষির বাক্যার্থ। ভাষ্যকার এখানে তৃতীয় করে তাহাই বলিয়াছেন। ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য এই যে, “উপপত্তি” শব্দটি সত্তা অর্ণের বাচক হইলে, সংশয়লক্ষণস্থত্রে “সমানবর্ষ” শব্দের দ্বারা সমানবর্ষবিষয়ক জ্ঞান বুঝিতে হইবে। সমানবর্ষটি সমানবর্ষবিষয়ক জ্ঞানের বিষয়, সুতরাং সমানবর্ষ শব্দটি সমানবর্ষবিষয়ক জ্ঞানের বিষয়-বোধক শব্দ। বিষয়-বোধক শব্দের দ্বারা বিষয় জ্ঞানের কথন হইয়া থাকে। মহর্ষি গোতমের ঐ হইলে তাহাই অভিপ্রেত। অর্থাৎ সেই স্থত্রে “সমানবর্ষ” শব্দের সমানবর্ষবিষয়ক জ্ঞান অর্ণে লক্ষণাই মহর্ষির অভিপ্রেত। লৌকিক বাক্যস্থলেও ঐরূপ লক্ষণ দেখা যায়, ইহা দেখাইতে ভাষ্যকার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন যে, “যদের দ্বারা অগ্নিকে অগ্নমান করিতেছে”, এইরূপ বাক্য বলিলে বোদ্ধা ব্যক্তি সেখানে



“ধূম” শব্দের দ্বারা ধূম জ্ঞান বা ধূমদর্শনই বুঝিয়া থাকেন। কারণ, ধূমজ্ঞানই অগ্নির অনুমানের কারণ হইতে পারে। পূর্কোক্ত বাক্যের দ্বারা ধূমের বোদ্ধার অর্থবোধ হয়, ইহা দর্শনবীজত, তখন ঐ স্থলে ধূম শব্দের ধূমজ্ঞান অর্থে লক্ষণা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। এইরূপ সংশয়-সম্বাদলক্ষণসূত্রে সমানধর্ম শব্দের দ্বারা সমানধর্ম-বিষয়ক জ্ঞান অর্থাৎ মহাবির দিব্যজ্ঞিত। ঐরূপ ভাষনিক প্রয়োগ অনেক স্থলেই দেখা যায়, মহাবির তাহাই করিয়াছেন। এখানে ভাষ্যকারের কথায় বুঝা যায়, “ধূমাৎ” এই বহুবচনস্থলেও তিনি “ধূম” শব্দের ধূমজ্ঞান অর্থে লক্ষণা স্বীকার করিতেন। তদ্বিচ্ছিন্নানবিকার গম্ভৈর্য তাহাই বলিয়াছেন<sup>১</sup>। দীপ্তিবিচার নব্য নৈয়ায়িক বসুনাথ শিরোমণি এই মতের খণ্ডন করিয়াছেন।

ভাষ্যকারিক উল্লেখ্যতকরণ ভাষ্যকারের দ্বারা তৃতীয় করে লক্ষণা শব্দের উল্লেখ করিয়াছেন। তবে “সমানধর্মোপপত্তি” শব্দের দ্বারা তদ্বিচারক জ্ঞান বুঝিতে হইবে, এই কথা তিনি বলিয়াছেন। ভাষ্যকার “সমানধর্ম” শব্দের দ্বারা সমানধর্ম-বিষয়ক জ্ঞান বুঝিতে হইবে, বলিয়াছেন।

ভাষ্যকারিকের ব্যাখ্যায় তাৎপর্যটীকাকার “উপপত্তি” শব্দেরই উপপত্তি-বিষয়জ্ঞানে লক্ষণার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। “সমানধর্মোপপত্তি” শব্দটি বাক্য। নব্য নৈয়ায়িকগণ বাক্যে লক্ষণা খণ্ডন করিয়াছেন। কিন্তু উল্লেখ্যতকরণ ও তাৎপর্যজ্ঞানের কথায় বুঝা যায়, তাহার দীর্ঘাংশকদিগের দ্বারা বাক্যে লক্ষণা স্বীকার করিতেন। মনে হয়, পরবর্তী তাৎপর্যটীকাকার তাহা সংগত মনে না করিয়াই ঐ স্থলে “উপপত্তি” শব্দেই লক্ষণার ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

মূলকথা, “উপপত্তি” শব্দের সত্তা অর্থে প্রয়োগ থাকাতাই মহাবির “সমানানেকধর্মোপপত্তেঃ” এখানে উপপত্তি শব্দের জ্ঞান অর্থ বুঝিতে না পারিয়া, পূর্কপক্ষের অবতারণা হইয়াছে। ভাষ্যকার এখানে ঐ পূর্কপক্ষ নিরাসের জন্য নানা কথা বলিলেও, বস্তুতঃ মহাবির ঐ স্থলে জ্ঞান অর্থেই “উপপত্তি” শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। “উপপত্তি” শব্দের জ্ঞান অর্থ প্রসিদ্ধই আছে। ভাষ্যকারেরও ঐ স্থলে ঐ অর্থই মহাবির অভিপ্রেত বলিয়া অভিমত। ভাষ্যকার ইহা জানাইবার জন্যই সংশয়লক্ষণসূত্র-ভাষ্যের শেষে “সমানধর্মোপপত্তিমাৎ” এই কথায় দ্বারা সমানধর্মের জ্ঞানই যে মহাবির-সূত্রোক্ত “সমান-ধর্মোপপত্তি”, ইহা প্রকাশ করিয়াছেন ( ১ অ., ২৩ সূত্র-ভাষ্য জটব্য )।

ভাষ্য। যদোহিত্বা সমানমনয়োধর্মমুপলভে ইতি ধর্ম-ধর্মগ্রহণে সংশয়াভাব ইতি। পূর্কদৃষ্টবিষয়মেতৎ। যাবহমর্থো পূর্কমদ্রাক্ষং তয়োঃ সমানং ধর্মমুপলভে বিশেষং নোপলভ ইতি কথং নু বিশেষং পশ্চেষ্টয়ং যেনান্তরমবধারণেরমিতি। ন চৈতৎ সমানধর্মোপলব্ধৌ ধর্মধর্মগ্রহণমাত্রেন নিবর্তত ইতি।

১। “বহুবচন জ্ঞানে লক্ষণা লক্ষণা লিখিতাহেতুত্বেন বহুবচনজ্ঞানানবিকার, তদৈবাক্ষাণিকানিবৃত্তঃ”—

তদ্বিচ্ছিন্নানবি, অবয়বসমকরণ।

অনুবাদ। আর যে বলা হইয়াছে ( অর্থাৎ আর একটি যে পূর্বপক্ষ বলা হইয়াছে ), এই পদার্থদ্বয়ের সমানধর্ম উপলব্ধি করিতেছি, এইরূপে ধর্ম ও ধর্মীর জ্ঞান হইলে সংশয় হয় না, অর্থাৎ পদার্থদ্বয়ের সমানধর্ম উপলব্ধি করিলে, ধর্ম ও ধর্মীর জ্ঞান হওয়ায়, সংশয় হইতে পারে না ( ইহার উত্তর বলিতেছি )।

ইহা অর্থাৎ পূর্বোক্তপ্রকার সমানধর্ম জ্ঞান পূর্বদৃষ্টবিষয়ক। বিশদার্থ এই যে, আমি যে দুইটি পদার্থ পূর্বে দেখিয়াছিলাম, সেই পদার্থদ্বয়ের সমানধর্ম উপলব্ধি করিতেছি, বিশেষ ধর্ম উপলব্ধি করিতেছি না। কেমন করিয়া বিশেষ ধর্ম দর্শন করিব, বাহার দ্বারা একতরকে অবধারণ করিতে পারিব। সমানধর্মের উপলব্ধি হইলে এই জ্ঞান অর্থাৎ পূর্বোক্তপ্রকার অনবধারণরূপ সংশয়জ্ঞান ধর্ম ও ধর্মীর জ্ঞানদ্বয়ের দ্বারা নিবৃত্ত হয় না।

তিননী। ভাষ্যকার প্রথম পূর্বপক্ষ-সূত্র-ভাষ্যে দ্বিতীয় প্রকার পূর্বপক্ষ ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, পদার্থদ্বয়ের সমানধর্ম উপলব্ধি করিলে ধর্ম ও ধর্মীর নিশ্চয় হওয়ায় সংশয় হইতে পারে না। যেনন হাণ্ড ও পুরুষের সমানধর্ম উপলব্ধি করিলে, দেখানে হাণ্ড ও পুরুষ এবং তাহারিণের ধর্মের জ্ঞান হয়। সুতরাং দেখানে আর সংশয় হইবে কিরূপে? ভাষ্যকার তাঁহার ব্যাখ্যাত প্রথম প্রকার পূর্বপক্ষের মহক্তি-সূচিত উত্তরের ব্যাখ্যা করিয়া, এখন পূর্বোক্ত দ্বিতীয় প্রকার পূর্বপক্ষের উত্তর ব্যাখ্যার জন্য ঐ পূর্বপক্ষের উল্লেখপূর্বক তত্ত্বেরে ধনিয়াছেন যে, ঐ সমানধর্মজ্ঞান পূর্বদৃষ্টবিষয়ক, অর্থাৎ আমি এই যে ধর্মীকে উপলব্ধি করিতেছি, তাহারই ধর্ম উপলব্ধি করিতেছি, এইরূপে কেহ বুঝে না। কিন্তু আমি পূর্বে যে হাণ্ড ও পুরুষ, এই পদার্থদ্বয়কে দেখিয়াছিলাম, এই দৃষ্টমান বস্তুতে সেই হাণ্ড ও পুরুষের সমানধর্ম দেখিতেছি, এইরূপেই বুঝিয়া থাকে এবং ঐ স্থলে সমানধর্ম দেখিয়া "বিশেষধর্ম দেখিতেছি না, কি করিয়া বিশেষধর্ম দেখিব, বাহার দ্বারা আমি হাণ্ড বা পুরুষ, ইহার একতর নিশ্চয় করিব", এইরূপ জ্ঞান হয়। সুতরাং ঐ স্থলে দৃষ্টমান পদার্থেই তাহার বিশেষধর্ম উপলব্ধি করিয়া, দেখানে হাণ্ড বা পুরুষরূপ ধর্মীর নিশ্চয় এবং তাহার ধর্ম নিশ্চয় হয় না। দৃষ্টমান পদার্থে পূর্বদৃষ্ট হাণ্ড ও পুরুষের সমানধর্মেরই দেখানে উপলব্ধি হয়। তাহাতে সমাজতঃ যে ধর্ম ও ধর্মীর জ্ঞান হয়, তাহা পূর্বোক্তপ্রকার সংশয়কে নিবৃত্ত করে না। বিশেষধর্ম-নিশ্চয় ব্যতীত হাণ্ড বা পুরুষরূপ ধর্মের এবং তজ্জপে হাণ্ড বা পুরুষরূপ ধর্মীর নিশ্চয় হইতে পারে না। সেইরূপ নিশ্চয় ব্যতীত সমাজতঃ ধর্ম ও ধর্মীর জ্ঞান ঐ স্থলে সংশয়-নিবর্তক হইতে পারে না।

যে উচ্চতা প্রকৃতি ধর্ম হাণ্ডতে থাকে, ঠিক সেই উচ্চতা প্রকৃতি ধর্মই পুরুষে থাকে না। সুতরাং উচ্চতা প্রকৃতি ধর্ম হাণ্ড ও পুরুষের সমানধর্ম হইতে পারে না; এই কথা বলিয়া



উল্লেখ্যতকর শেষে যে পূর্বপক্ষের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, এখানে ভাষ্যকারের কথার তাহারও পরিহার হইয়াছে (এ কথা উল্লেখ্যতকরও এখানে লিখিয়াছেন) অর্থাৎ সমানবর্ষ বলিতে এখানে একবর্ষ নহে, সদৃশ বর্ষই সমানবর্ষ। স্বাণুগত উচ্চতা প্রভৃতি পুরুষে না থাকিলেও, তাহার সদৃশ উচ্চতা প্রভৃতি বর্ষ পুরুষে আছে। পূর্বদৃষ্ট স্বাণু ও পুরুষের সেই সমানবর্ষ কোন পদার্থে দেখিলে, বিশেষবর্ষ নিশ্চয় না হওয়া পর্য্যন্ত তাহাতে পূর্বোক্ত প্রকার সংশয় জন্মে।

বৃত্তিকার বিঘ্ননাথ প্রথম পূর্বপক্ষস্থল-ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন যে, কোন পদার্থকে স্বাণু-বর্ষের সমানবর্ষী বলিয়া বুঝিলে অথবা পুরুষবর্ষের সমানবর্ষী বলিয়া বুঝিলে, তাহাতে স্বাণু অথবা পুরুষের ভেদ নিশ্চয় হওয়ায়, ইহা স্বাণু কি না, অথবা ইহা পুরুষ কি না, এইরূপ সংশয় জন্মিতে পারে না। ভাষ্যকার ও বার্তিককারের ব্যাখ্যায় এই পূর্বপক্ষ নাই। কারণ, দৃষ্টমান পদার্থকে সামান্যতঃ স্বাণু ও পুরুষের সমানবর্ষী বলিয়া বুঝিলে সংশয় হয়, এ কথা তাঁহারা বলেন নাই; দৃষ্টমান পদার্থকে পূর্বদৃষ্ট স্বাণু ও পুরুষের সমানবর্ষী বলিয়া বুঝিয়াই সংশয় হয়। পুরোবর্তি কোন পদার্থবিশেষে পূর্বদৃষ্ট স্বাণু ও পুরুষের ভেদ নিশ্চয় হইলেও তাহাতে স্বাণুভাব ও পুরুষ-ভাবের ভেদ নিশ্চয় হয় না। ততরাং সেখানে ঐরূপ সংশয় হইবার কোন বাধা নাই। পূর্বদৃষ্ট স্বাণু ও পুরুষ হইতে ভিন্ন হইলেও তাহা স্বাণু বা পুরুষ হইতে পারে। ফলকথা, ভাষ্যকার প্রভৃতি প্রাচীনদিগের মতে সংশয়লক্ষণ-হয়ে “সমান” শব্দের অর্থ সদৃশ। সদৃশ বর্ষকেই তাঁহারা ঐ স্থলে সাধারণ বর্ষ বলিতেন। উভয় পদার্থগত এক বর্ষকে সমানবর্ষ বলিলে, স্বাণু ও পুরুষের উচ্চতা প্রভৃতি বর্ষ সেইরূপ না হওয়ায়, ইহা সমানবর্ষ হইতে পারে না। কোন স্থলে উভয় পদার্থগত এক বর্ষও সমানবর্ষ হইবে; তাহাতেও অভিন্নরূপ সমানতা থাকিবে; তাহাকেও হ্যোক্ত সমান-বর্ষের মধ্যে গ্রহণ না করিলে, তাহার জ্ঞানে তলবিশেষে যে সংশয় হয়, তাহার উপপত্তি হয় না।

ভাষ্য। যচ্চোক্তং নার্থান্তরাধ্যবসায়াদন্যত্র সংশয় ইতি  
যো স্বার্থান্তরাধ্যবসায়মাত্রং সংশয়হেতুপাদনীয় ন এবং বাচ্য ইতি।

যৎ পুনরেতৎ কার্য্যাকারণয়োঃ সাক্ষপ্যাভাবাদিত্তি কারণস্ত  
ভাবাভাবয়োঃ কার্য্যস্ত ভাবাভাবৌ কার্য্যাকারণয়োঃ সাক্ষপ্যং, যচ্চোৎ-  
পাদাৎ যত্বেপদ্যতে যস্ত চানুৎপাদাৎ যমোৎপদ্যতে তৎ কারণং,  
কার্য্যমিতরদিত্যোতৎ সাক্ষপ্যং, অস্তি চ সংশয়কারণে সংশয়ে চৈতদিত্তি।  
এতেনানেকবর্ষার্থাধ্যবসায়াদিত্তি প্রতিবেধঃ পরিস্কৃত ইতি।

অনুবাদ। আর যে বলা হইয়াছে, “পদার্থান্তরের নিশ্চয়বশতঃ অন্য পদার্থে সংশয় হয় না”। যিনি কেবল পদার্থান্তরের নিশ্চয়কে সংশয়ের হেতু বলিয়া গ্রহণ করিবেন অর্থাৎ যিনি কেবল ভিন্ন পদার্থের নিশ্চয়কে ভিন্ন পদার্থে সংশয়ের কারণ

বলিবেন, তাহাকে এইরূপ বলা যায় ( অর্থাৎ ঐরূপ বলিলেই ঐরূপ পূর্বপক্ষের অবতারণা হয়, মহাবি তাহা বলেন নাই )।

আর এই যে ( বলা হইয়াছে ), কার্য ও কারণের সাক্ষ্য না থাকায় ( সংশয় হইতে পারে না ) [ ইহার উত্তর বলিতেছি ]।

কারণের ভাব ও অভাবে কার্যের ভাব ও অভাব কার্য এবং কারণের সাক্ষ্য। বিশদার্থ এই যে, যাহার উৎপত্তিবশতঃ যাহা উৎপন্ন হয় এবং যাহার অনুৎপত্তিবশতঃ যাহা উৎপন্ন হয় না, তাহা কারণ—অপরটি কার্য, ইহা ( কার্য ও কারণের ) সাক্ষ্য, সংশয়ের কারণ এবং সংশয়ে ইহা অর্থাৎ পূর্বোক্ত সাক্ষ্য আছেই। ইহার দ্বারা অর্থাৎ পূর্বোক্ত প্রকার উত্তরের দ্বারা অনেক ধর্মের অধ্যাক্ষয়বশতঃ ( সংশয় হয় না ), এই প্রতিবেদন পরিস্কৃত হইয়াছে।

টিকনী। ভাষ্যকার প্রথম পূর্বপক্ষ-হৃতব্যাক্যের যে চতুর্বিধ পূর্বপক্ষ-ব্যাক্য করিয়াছেন, তন্মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয় পূর্বপক্ষের উল্লেখপূর্বক তাহার উত্তর বলিয়াছেন। এখন তৃতীয় পূর্বপক্ষের এবং তাহার পর চতুর্থ পূর্বপক্ষের উল্লেখপূর্বক তাহারও উত্তর বলিতেছেন। তৃতীয় পূর্বপক্ষ এই যে, ভিন্ন পদার্থের নিশ্চয়বশতঃ ভিন্ন পদার্থে সংশয় হইতে পারে না। কখনও রূপের নিশ্চয়বশতঃ ভিন্ন পদার্থে সংশয় হয় না। এতদ্বারা ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, কেবল ভিন্ন পদার্থের নিশ্চয়কে ভিন্ন পদার্থে সংশয়ের কারণ বলিলে ঐরূপ পূর্বপক্ষের অবতারণা হইতে পারে। কিন্তু তাহা ত বলা হয় নাই। কোন ধর্মীতে কোন পদার্থের সমানধর্মের নিশ্চয় হইলে এবং সেখানে বিশেষ ধর্মের নিশ্চয় না হইলে সংশয় হয়, ইহাই বলা হইয়াছে। ফলকথা, মহাবির হুজুর না বুঝিয়াই ঐরূপ পূর্বপক্ষের অবতারণা হয়, ইহাই ভাষ্যকারের তাৎপর্য।

ভাষ্যকারের ব্যাখ্যাত চতুর্থ পূর্বপক্ষ এই যে, কার্য ও কারণের সাক্ষ্য থাকা আবশ্যক। কারণের অল্পরূপই কার্য হইয়া থাকে; সংশয় অবধারণ জ্ঞান, সমানধর্মের নিশ্চয়রূপ অবধারণ-জ্ঞান তাহার কারণ হইতে পারে না। এতদ্বারা ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, কারণ থাকিলে কার্য হয়, কারণ না থাকিলে কার্য হয় না, ইহাই কার্য-কারণের সাক্ষ্য। সমানধর্মের নিশ্চয়রূপ কারণ থাকিলে তজ্জন বিশেষ সংশয়টি জন্মে, তাহা না থাকিলে উহা জন্মে না; হুতরাং পূর্বোক্ত কার্য-কারণের সাক্ষ্য সংশয় এবং তাহার কারণে আছেই।

উল্লেখ্যতকর বলিয়াছেন যে, সংশয়ের কারণ সমানধর্ম-নিশ্চয় হলে বেদন বিশেষধর্মের অবধারণ থাকে না, তাহার কার্য সংশয়হলেও তজ্জন বিশেষধর্মের অবধারণ থাকে না। এই বিশেষধর্মের অবধারণই সংশয় ও তাহার কারণের সাক্ষ্য। কারণ থাকিলে কার্য হয়, তাহা না থাকিলে কার্য হয় না, ইহা সাক্ষ্য নির্দেশ নহে, উহা কার্য ও কারণের ধর্মনির্দেশ। তাৎপর্যভীকাকার উল্লেখ্যতকরের এই কথার তাৎপর্য বর্ণন করিয়াছেন যে, ভাষ্যকার কার্য ও কারণের যে সাক্ষ্য



বলিয়াছেন, তাহা সেইরূপ বুদ্ধিতে হইবে না। অর্থাৎ ভাষ্যকার যে কার্য ও কারণের সাক্ষ্যই বলিয়াছেন, তাহা বুদ্ধিতে হইবে না। কারণ, যে সকল পদার্থের উৎপত্তি নাই, সেই নিত্য পদার্থও কারণ হইয়া থাকে। সুতরাং কারণের উৎপত্তিবশতঃ কার্যের উৎপত্তি হয়, এইরূপ কথা বলিয়া ভাষ্যকার কার্যাকারণের উৎপত্তিকে তাহার সাক্ষ্য বলিতে পারেন না। অতএব বুদ্ধিতে হইবে যে, ভাষ্যে “সাক্ষ্য” শব্দটি কার্য ও কারণের সাক্ষ্যের নির্দেশ নহে—উহা কার্য ও কারণের অময়-ব্যতিরেক-তাৎপর্যে অর্থাৎ কারণ থাকিলে কার্য হয়, তাহা না থাকিলে কার্য হয় না, এই তাৎপর্যে বলা হইয়াছে।

উদ্যোতকর প্রভৃতির কথার বক্তব্য এই যে, কার্য ও কারণের সাক্ষ্য প্রশংসা করিয়াই ভাষ্যকার এখানে পূর্ণপক্ষ নিরাস করিয়াছেন। ভাষ্যকার তাহা না বলিয়া অল্প কথা বলিলে পূর্ণপক্ষ নিরাস হয় না এবং তিনি স্পষ্ট ভাষাতেই এখানে কার্য ও কারণের সাক্ষ্য নির্দেশ করিয়াছেন। তাহার কথার অন্তরূপ তাৎপর্য কিছুতেই মনে আসে না।

ভাষ্যকারের তাৎপর্য ইহাই মনে হয় যে, কারণ থাকিলে কার্য হয়, কারণ না থাকিলে কার্য হয় না, ইহাই অর্থাৎ কার্য-কারণের এই সম্বন্ধবিশেষই তাহার সাক্ষ্য। এতদ্বিধি আর কোন সাক্ষ্য কার্যের উৎপত্তিতে আবশ্যক হয় না। পরন্তু যিজাতীর কারণ হইতেও ভিন্নজাতীর কার্য জন্মিয়া থাকে। যৎকিঞ্চিৎ সাক্ষ্য আবশ্যক বলিলে তাহাও সর্বত্র থাকে। বস্তুতঃ বাহ্য থাকিলে কার্য হয় এবং না থাকিলে কার্য হয় না, এমন পদার্থ অবশ্যই কারণ হইবে। সুতরাং সমানবশেষের নিশ্চয়রূপ জ্ঞানকে কোন সংশয়রূপ অনিশ্চয়াদ্বয় জ্ঞানের কারণ বলিতেই হইবে। তাহা হইলে ঐ কারণের ভাব ও অভাবে ঐ সংশয়বিশেষের ভাব ও অভাবে অর্থাৎ ঐ উভয়ের ঐরূপ সম্বন্ধ-বিশেষকে তাহার সাক্ষ্য বলা যায়। এইরূপ সাক্ষ্য কার্য-কারণ-কালানুগ পদার্থন্যত্বেই থাকার প্রকৃত স্থলেও তাহা আছে, সুতরাং কার্য ও কারণের সাক্ষ্য না থাকার সংশয় হইতে পারে না, এই পূর্ণপক্ষের নিরাস হইয়াছে। ফলকথা, ভাষ্যকার কার্য-কারণের সাক্ষ্যের ব্যাখ্যা করিতে অনিত্য কারণকেই গ্রহণ করিয়াছেন। কারণ, প্রকৃত স্থলে সংশয়ের অনিত্য কারণের বহিত সাক্ষ্যই তিনি প্রদর্শন করিয়াছেন। সুতরাং বাহ্য উৎপত্তিপ্রযুক্ত বাহ্য উৎপত্তি হয়, এইরূপে কারণের স্বরূপব্যাখ্যা ভাষ্যকারের অনন্ত হইবে। অনিত্য কারণকে লক্ষ্য করিয়াই ভাষ্যকার ঐ কথা বলিয়াছেন। কারণন্যত্বে লক্ষ্য করিয়া কারণের স্বরূপ ব্যাখ্যা করিতে হইলে, বাহ্য থাকিলে বাহ্য উৎপত্তি হয়, বাহ্য না থাকিলে বাহ্য উৎপত্তি হয় না, তাহা সেই কার্যে কারণ, এইরূপ কথাই বলিতে হইবে। ত্রীতীয ভাষ্যকারের তাৎপর্য বিচার করিবেন।

সমানবশেষের উপপত্তি-অল্প সংশয় হয়, এই প্রথম কথার ভাষ্যকার চতুর্লিখ পূর্ণপক্ষের ব্যাখ্যা করিয়াই, অনেকবশেষের উপপত্তি-অল্প সংশয় হয়, এই কথাত্তেও পূর্কোক্ত প্রকারেই চতুর্লিখ পূর্ণপক্ষের প্রকাশ করিয়াছেন। সুতরাং প্রথম পক্ষের পূর্ণপক্ষগুলির দ্বৈত উত্তর বলিয়াছেন, দ্বিতীয় পক্ষের পূর্ণপক্ষগুলির উত্তরও সেইরূপই হইবে। তাই ভাষ্যকার প্রথম পক্ষের চতুর্লিখ পূর্ণপক্ষের উত্তর ব্যাখ্যা করিয়া শেষে বলিয়াছেন যে, অনেকবশেষের নিশ্চয়-অল্প সংশয় হয় না, এই দ্বিতীয়

পক্ষে যে চতুর্বিধ পূর্বপক্ষ, তাহারও পরিহার হইল। অর্থাৎ প্রথম পক্ষে যাহা উত্তর, দ্বিতীয় পক্ষেও তাহাই উত্তর বুঝিয়া নষ্টবে।

ভাষা। যৎ পুনরেতচ্ছবং বিপ্রতিপত্ত্যব্যবস্থাব্যবসায়াক্ষ  
ন সংশয় ইতি পৃথকপ্রবাদয়োর্বাহতমর্থমুপলভে, বিশেষক ন জানামি,  
নোপলভে, যেনান্তরমবধারণেয়ং তৎ, কোহত্র বিশেষঃ সাদৃষ্যেনৈকতর-  
মবধারণেয়মিতি সংশয়ো বিপ্রতিপত্তিজনিতোহয়ং ন শক্যো বিপ্রতিপত্তি-  
সংপ্রতিপত্তিমাत्रेण निवर्तयितुमिति। এবমুপলক্ষ্যানুপলক্ষ্যব্যবস্থাকৃতে  
সংশয়ে বেদিতব্যমিতি।

অনুবাদ। আর এই যে বলা হইয়াছে অর্থাৎ দ্বিতীয় সূত্রের দ্বারা যে পূর্বপক্ষ বলা হইয়াছে—“বিপ্রতিপত্তি এবং অব্যবস্থার নিশ্চয়-জন্মও সংশয় হয় না”, ( ইহার উত্তর বলিতেছি। )

বিভিন্ন দুইটি বাক্যের বিরুদ্ধ অর্থ উপলব্ধি করিতেছি এবং বিশেষ ধর্ম জানিতেছি না, যাহার দ্বারা একতরকে নিশ্চয় করিতে পারি, তাহা উপলব্ধি করিতেছি না, এখানে অর্থাৎ এই ধর্ম্মাতে বিশেষ ধর্ম্ম কি থাকিতে পারে, যাহার দ্বারা একতরকে নিশ্চয় করিতে পারি, বিপ্রতিপত্তি-বাক্য-প্রযুক্ত এই সংশয়কে কেবল বিপ্রতিপত্তি-বিষয়ক সম্প্রতিপত্তি ( কেবল বাদী ও প্রতিবাদীর দুইটি বিরুদ্ধ জ্ঞান আছে, এইরূপ নিশ্চয় ) নিবৃত্ত করিতে পারে না।

এইরূপ উপলব্ধির অব্যবস্থা ও অনুপলব্ধির অব্যবস্থা-প্রযুক্ত সংশয়ে জানিবে [ অর্থাৎ উপলব্ধির অব্যবস্থা-প্রযুক্ত এবং অনুপলব্ধির অব্যবস্থা-প্রযুক্ত যে বিবিধ সংশয় জন্মে, সেখানেও বিশেষ ধর্ম্মের নিশ্চয় না থাকায় অন্য কোনরূপ নিশ্চয় তাহাকে নিবৃত্ত করিতে পারে না। ]

উদাহরণ। হৃৎকর মহর্ষি এই সংশয়পরীক্ষা-প্রকরণে দ্বিতীয় সূত্রের দ্বারা যে পূর্বপক্ষ হৃৎনা করিয়াছেন, ভাষ্যকার বিতীয় করে তাহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, বাদী ও প্রতিবাদীর দুইটি বিরুদ্ধ মত জানিলে সংশয় হইতে পারে না। এক সম্প্রদায় বলেন—আত্মা আছে; অন্য সম্প্রদায় বলেন—আত্মা নাই; ইহা জানিলে সংশয় হইবে কেন? পরন্তু ঐরূপ বিরুদ্ধ জ্ঞানের নিশ্চয় সংশয়ের বাধকই হইবে। এবং উপলব্ধির নিয়ম নাই এবং অনুপলব্ধিরও নিয়ম নাই, ইহা নিশ্চিত থাকিলে সংশয় হইতে পারে না; ঐরূপ নিশ্চয় সংশয়ের বাধকই হইবে। ভাষ্যকারে এখানে এই পূর্বপক্ষের উল্লেখপূর্বক তত্ত্বতরে বলিয়াছেন যে, দুইটি বাক্যের বিরুদ্ধ অর্থ উপলব্ধি করিলে,



সেখানে যদি বিশেষধর্মের নিশ্চয় না থাকে, তবে অবশ্যই সংশয় হইবে। যেমন বাদী বলিলেন—আম্বা আছে, প্রতিবাদী বলিলেন—আম্বা নাই। মধ্যস্থ ব্যক্তি যদি এখানে আম্বাতে অস্তিত্ব বা নাতিত্বের নিশ্চায়ক কোন বিশেষধর্ম নিশ্চয় করিতে না পারেন, তাহা হইলে সেখানে তিনি এইরূপ চিন্তা করেন যে, বাদী ও প্রতিবাদীর দুইট বাক্যের বিরুদ্ধ অর্থ বুঝিতেছি, কিন্তু কোন বিশেষ ধর্ম-নিশ্চয় করিতেছি না; যে ধর্মের দ্বারা আম্বাতে অস্তিত্ব বা নাতিত্বরূপ কোন একটি ধর্মকে নিশ্চয় করিতে পারি, এমন কোন বিশেষ ধর্ম আম্বাতে নিশ্চয় করিতে পারিতেছি না। এখানে ঐ মধ্যস্থ ব্যক্তির “আম্বা আছে কি না”, এইরূপ সংশয় অবশ্যই হইয়া থাকে। ঐ সংশয় বাদী ও প্রতিবাদীর পূর্বোক্ত বিপ্রতিপত্তি-বাক্য-প্রযুক্ত অর্থাৎ বাদীর বাক্য ও প্রতিবাদীর বাক্যের বিরুদ্ধার্থ জ্ঞান-জন্ম। বাদী ও প্রতিবাদীর বিরুদ্ধ জ্ঞান আছে, এইরূপ নিশ্চয়ের দ্বারা ঐ সংশয় নিবৃত্ত হয় না; বিশেষ ধর্ম নিশ্চয়ের দ্বারাই উহা নিবৃত্ত হয়। তাই ভাব্যকার বলিয়াছেন যে, বিপ্রতিপত্তি-বিষয়ক যে সম্প্রতিপত্তি অর্থাৎ নিশ্চয়, তাহাই কেবল ঐ সংশয়কে নিবৃত্ত করিতে পারে না। বাদীর এই মত এবং প্রতিবাদীর এই মত, ইহা জানিলে কেবল তদ্বারা মধ্যস্থ ব্যক্তির ঐ হলে সংশয় নিবৃত্ত হইবে কেন? তাহা কিছুতেই হয় না; বিশেষ ধর্মের নিশ্চয় হইলেই তদ্বারা ঐ সংশয় নিবৃত্ত হয়। তাহা “বিপ্রতিপত্তিসম্প্রতিপত্তিান্বয়েণ” এই হলে “বিপ্রতিপত্তি” শব্দের দ্বারা বাদী ও প্রতিবাদীর বিরুদ্ধ জ্ঞানরূপ মুখ্যার্থই বুঝিতে হইবে। “বিপ্রতিপত্তি” শব্দের উহাই মুখ্য অর্থ; বাক্যবিশেষরূপ অর্থ গৌণ (সংশয়লক্ষণ-সূত্রচাষ-টীপনী দ্রষ্টব্য)। বাদী ও প্রতিবাদীর বিরুদ্ধার্থ-প্রতিপাদক বাক্যদ্বয়ই ভাব্যকার প্রভৃতি প্রাচীনগণের মতে বিপ্রতিপত্তি-বাক্য। তৎপ্রযুক্ত মধ্যস্থ ব্যক্তির সংশয় জন্মে। বিপ্রতিপত্তি-বাক্যপ্রযুক্ত সংশয়বশতঃ তৎসম্মুখীন হইয়া, তাহার পূর নিত্যের দ্বারা তত্ত্বনির্ণয় হয়। এই জন্ত ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যও “অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা” এই ব্রহ্মজ-ভাব্যের শেষে ব্রহ্মজিজ্ঞাসা বা আত্মজিজ্ঞাসা সমর্থন করিতে আদ্যবিষয়ের অনেক প্রকার বিপ্রতিপত্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। আদ্যবিষয় পানাত্তমঃ বিপ্রতিপত্তি না থাকিলেও বিশেষ বিপ্রতিপত্তি অনেক প্রকারই আছে। এইরূপ কোন বস্তুর উপলব্ধি করিলে, সেখানে যদি উপলব্ধির অব্যবহার নিশ্চয় উপস্থিত হয়, অর্থাৎ বিদ্যমান পদার্থেরও উপলব্ধি হয়, আবার অব্যবহার পদার্থেরও ভ্রম উপলব্ধি

১। অদ্বৈতমঃ প্রতি বিপ্রতিপত্তেঃ। সেহমাকং তৈত্তর্য্যবিশিষ্টমাত্ত্বমিতি প্রাকৃত্যঃ সনা লোকান্তরিত্যাদি প্রতিপত্তাঃ। ইন্দ্রিয়গোচরং সেনান্যাত্ত্বমাত্ত্বমতঃ। মন ইত্যতঃ। বিজ্ঞানমাত্ত্বম্ কথিকমিত্যতঃ। শূন্যমিত্যতঃ। অগ্নি দেহাদি-বাতিরিক্তঃ সংসারী সত্ত্বী ভৌতিকত্বমতঃ। ভৌতিকং কেবলং ন কঠোরত্বমতঃ। অগ্নিঃ শুদ্ধাতিরিক্তঃ ইত্যতঃ সর্বজ্ঞঃ সর্বশক্তিমিতি কেতিব। আত্মা ন লৌকিকত্বমতঃ। এবং বহুভাৱে বিপ্রতিপত্তাঃ বুদ্ধিবাক্য-ভাব্যভাব্যমত্যাঃ সন্তাঃ। ভাব্যভাব্যে ৭৭ কিঞ্চিৎ প্রতিপত্ত্যমাত্ত্বো নিঃশ্রেয়সাৎ প্রতিহতক্যানর্থকোহাৎ।—সারীরক-ভাষ্য।

তদনেন বিপ্রতিপত্তিঃ সাধকবাক্যপ্রমাণভাৱে সতি সংশয়বীজমুৎপাদ্য। ততঃ সংশয়ঃ জিজ্ঞাসোপপদ্যত ইতি ভাষ্যঃ। বিবাসাধিকরণং ৭৭ী সর্বত্রানুসিদ্ধান্তসিদ্ধোক্তোপপত্ত্যঃ, অজ্ঞায়া সনাতন্যঃ ভিন্নাশ্রয়া বা বিপ্রতিপত্তয়ো ন হ্য। বিজ্ঞা হি অতিপত্তয়ো বিপ্রতিপত্তয়ো। ন চান্যত্রায়ঃ প্রতিপত্তয়ো ভবন্তি, অন্যায়মহাংশয়ে। ন হি ভিন্নাশ্রয়া বিরুদ্ধা, ন ভ্রমিত্যা বুদ্ধিঃ, নিজা আত্মেতি অতিপত্তিঃ-বিপ্রতিপত্তী।—ভাষ্যটী।

হয় : হতরাং উপলব্ধির কোন ব্যবস্থা বা নিয়ম নাই, এইরূপ জ্ঞান যদি উপস্থিত হয় এবং সেখানে যদি সেই বস্তুর বিদ্যমানত্ব বা অবিদ্যমানত্বরূপ কোন একটি ধর্মের নিশ্চায়ক কোন বিশেষ ধর্মের নিশ্চয় না হয়, তাহা হইলে সেখানে 'কি বিদ্যমান পদার্থ উপলব্ধি করিতেছি ? অথবা অবিদ্যমান পদার্থ উপলব্ধি করিতেছি ?' এইরূপ সংশয় হইবেই। এইরূপ কোন পদার্থ উপলব্ধি না করিলে, সেখানে যদি অল্পলব্ধির অব্যবহার নিশ্চয় উপস্থিত হয়, অর্থাৎ অনেক বিদ্যমান পদার্থের উপলব্ধি হয় না, আবার অবিদ্যমান পদার্থেরও উপলব্ধি হয় না, হতরাং অল্পলব্ধির কোন নিয়ম নাই, এইরূপ জ্ঞান যদি উপস্থিত হয় এবং সেখানেও যদি অল্পলব্ধিকারী সেই বস্তুর বিদ্যমানত্ব বা অবিদ্যমানত্বরূপ কোন একটি ধর্মের নিশ্চায়ক কোন বিশেষ ধর্মের নিশ্চয় না হয়, তাহা হইলে সেখানে 'কি বিদ্যমান পদার্থ উপলব্ধি করিতেছি না ? অথবা অবিদ্যমান পদার্থ উপলব্ধি করিতেছি না, এইরূপ সংশয় হইবেই। পূর্কোক্ত দ্বিবিধ ফলেই দ্বিবিধ সংশয় অসম্ভবগন্ধি। উপলব্ধির অব্যবহার নিশ্চয় এবং অল্পলব্ধির অব্যবহার নিশ্চয় ঐ সংশয়ের কারণ। হতরাং উহা ঐ সংশয়ের নিবর্তক হইতে পারে না ; বিশেষ-ধর্ম-নিশ্চয়ই উহার নিবর্তক হইতে পারে। বিশেষ-ধর্ম-নিশ্চয় না হওয়া পর্য্যন্ত ঐরূপ সংশয় আর কোন নিশ্চয়ের দ্বারা নিবৃত্ত হয় না। হতরাং উপলব্ধির অব্যবহার নিশ্চয়-জ্ঞাত এবং অল্পলব্ধির অব্যবহার নিশ্চয়-জ্ঞাত সংশয় হইতে পারে না, এই পূর্বপক্ষ অযুক্ত।

উদ্যোতকের প্রতীতি মহা নৈরায়িকগণ উপলব্ধির অব্যবস্থা ও অল্পলব্ধির অব্যবস্থাকে পৃথক্-ভাবে সংশয়-বিশেষের প্রয়োজক বলেন নাই। উদ্যোতকের ভাষ্যবর্তিকে ভাষ্যকারের সূত্রার্থ-ব্যাখ্যা ধওন করিয়া, অল্পরূপে সূত্রার্থ বর্ণন করিয়াছেন। তাঁহার দ্বিতে সংশয়-লক্ষণ-সূত্রে উপলব্ধির অব্যবস্থা বলিতে সাধক প্রমাণের অভাব এবং অল্পলব্ধির অব্যবস্থা বলিতে বানক প্রমাণের অভাব। ঐ দুইটি সংশয়নাত্রেই কারণ। দ্বিবিধ সংশয়ের তিনটি লক্ষণেই ঐ দুইটিকে নিবিষ্ট করিতে হইবে, তাহাই মহর্ষির অভিপ্রেত।

ভাষ্যকারের ব্যাখ্যাধওনে উদ্যোতকের বিশেষ মুক্তি এই যে, যদি ভাষ্যকারোক্ত উপলব্ধির অব্যবস্থা সংশয়বিশেষের পৃথক্ কারণ হয়, তাহা হইলে সর্বত্রই সংশয় জন্মে, কোন ফলেই সংশয়ের নিবৃত্তি হইতে পারে না। কারণ, যে বিশেষ-ধর্মের নিশ্চয়-জ্ঞাত সংশয়ের নিবৃত্তি হইবে, সেই বিশেষ-ধর্মের উপলব্ধি হইলেও তাহাতে ভাষ্যকারোক্ত উপলব্ধির অব্যবস্থা-প্রযুক্ত 'কি বিদ্যমান বিশেষ-ধর্ম উপলব্ধি হইতেছে ? অথবা অবিদ্যমান বিশেষ-ধর্ম উপলব্ধি হইতেছে ?' এইরূপ সংশয় জন্মিবে। এইরূপে সর্বত্রই ভাষ্যকারোক্ত উপলব্ধির অব্যবস্থা এবং অল্পলব্ধির অব্যবহার নিশ্চয়-জ্ঞাত সংশয় জন্মিলে, কোন ফলেই সংশয়ের নিবৃত্তি হওয়া সম্ভব নহে।

ভাষ্যকারের পক্ষে বলব্য এই যে, সর্বত্রই ঐরূপ উপলব্ধির অব্যবহার নিশ্চয় এবং অল্পলব্ধির অব্যবহার নিশ্চয় জন্মে না এবং সর্বত্রই উহা সংশয়ের কারণ হয় না। যে পদার্থের পুনঃ পুনঃ উপলব্ধি হইতেছে, অথবা যে পদার্থের পুনঃ পুনঃ উপলব্ধি হয় নাই, অর্থাৎ প্রথম একবার কোন পদার্থ উপলব্ধি করিলে অথবা কোন পদার্থের প্রথম একবার অল্পলব্ধি স্থলে যথাক্রমে পূর্কোক্ত উপলব্ধির অব্যবহার নিশ্চয়-জ্ঞাত এবং অল্পলব্ধির অব্যবহার নিশ্চয়-জ্ঞাত সংশয় জন্মে।



ভাষ্যকারের পক্ষে এই ভাবের কথা বলিয়া উল্লেখ্যকরের অন্য কথার অবতারণা করিয়াছেন। পূর্ণোক্ত উপলক্ষির অব্যবহার নিশ্চয়-জ্ঞত এবং অল্পপলক্ষির অব্যবহার নিশ্চয়-জ্ঞত যেখানে সংশয় জন্মে, সেখানেও বিশেষ বর্ণের বখার্ব নিশ্চয় হইলে, এই সংশয়ের নিবৃত্তি হয়। প্রকৃত প্রমাণের দ্বারা বিশেষ বর্ণের পূন্য পূন্য উপলক্ষি করিলে এবং এই উপলক্ষি-জ্ঞত প্রাপ্তি সকল হইয়াছে, ইহা বুঝিলে, এই উপলক্ষির বখার্বতা নিশ্চয় হওয়ায়, উপলভ্যমান সেই বিশেষ-বর্ণের বিদ্যমানত্ব নিশ্চয় হইয়া যায়। প্রত্যয়-বোধে আর এই বিশেষ বর্ণের বিদ্যমানত্ব সংশয়ের সম্ভাবনা নাই। উপলক্ষির অব্যবহা অথবা অল্পপলক্ষির অব্যবহার নিশ্চয় উপস্থিত হইলেও পদার্থের বিদ্যমানত্ব বা অবিদ্যমানত্বের নিশ্চয় জন্মিলে, সংশয়ের প্রতিবন্ধক থাকার আর সেখানে বিদ্যমানত্ব বা অবিদ্যমানত্বের সংশয় কোনরূপেই হইতে পারে না। বিশেষ-বর্ণের বিদ্যমানত্ব নিশ্চয়ের কারণ থাকিলে এই নিশ্চয় অন্বিতেই। তাহা হইবে আর সেখানে উপলক্ষির অব্যবহার নিশ্চয় উপস্থিত হইলেও সংশয় জন্মাইতে পারিবে না। ফলকথা, উপলক্ষির অব্যবহা ও অল্পপলক্ষির অব্যবহারকে পৃথকভাবে বিবিধ সংশয়ের প্রয়োজক বলিলে সর্বত্র সংশয় হয়, কোন স্থানেই সংশয়ের নিবৃত্তি হইতে পারে না, ইহা ভাষ্যকার মনে করেন নাই। পরন্তু মহর্ষি-সূত্রোক্ত উপলক্ষি ও অল্পপলক্ষির অব্যবহা বলিতে উপলক্ষি ও অল্পপলক্ষির ব্যবহা না থাকা অর্থাৎ নিয়মের অভাবই মহত্ব বুঝা যায়। উল্লেখ্যকর উহার যে অর্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাতে কষ্ট-কল্পনা আছে। এবং সূত্রকার মহর্ষি এই সংশয়-পরীক্ষা-প্রকরণে সংশয়-লক্ষণ-সূত্রোক্ত সংশয়ের কারণবলত্বনে প্রধানরূপে পাঁচটি পূর্ণপক্ষেরই সূচনা করায়, ভাষ্যকার পলাবিধ সংশয়ই মহর্ষির অভিপ্রায় বুঝিয়া, সেইরূপেই সূত্রার্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। উল্লেখ্যকর শেষে বলিয়াছেন যে, উপলক্ষির অব্যবহা ও অল্পপলক্ষির অব্যবহারে সমান-বস্ত্রাদির নিশ্চয়-জ্ঞতই সংশয় জন্মে। উপলক্ষির অব্যবহা ও অল্পপলক্ষির অব্যবহারকে পৃথকভাবে সংশয়বিশেষের প্রয়োজক বলা নিদ্রাশ্রোজন, ভাষ্যকার ইহাও চিন্তা করিয়াছিলেন। কিন্তু সংশয়ের পক্ষবিদ্যুতই মহর্ষি-সূত্রে ব্যক্ত বুঝিয়া, সংশয়-লক্ষণ-সূত্র তাহা বলিয়াছেন যে, সমান-বস্ত্র এবং অসামান্য-বস্ত্র জ্ঞেয়গত, উপলক্ষি ও অল্পপলক্ষি জ্ঞাতগত, এইটুকু বিশেষ করিয়াই মহর্ষি উপলক্ষির অব্যবহা ও অল্পপলক্ষির অব্যবহারকে পৃথকভাবে সংশয়ের প্রয়োজক বলিয়াছেন।

তাত্ত্বিক-রক্ষাকার বরদরাজ সংশয়-ব্যাখ্যার বলিয়াছেন যে, কেহ কেহ উপলক্ষি ও অল্পপলক্ষিকে পৃথকভাবে সংশয়ের কারণ বলেন। যেমন কূপ খননের পরে জল দেখিয়া কাহারও সংশয় হয় সে, এই জল কি পূর্ণ হইতেই বিদ্যমান ছিল, এখন অভিব্যক্ত হওয়ার দেখিতেছি, অথবা এই জল পূর্ণ ছিল না, খনন-ব্যাপার হইতে এখনই উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাই দেখিতেছি। এবং পিশাচের উপলক্ষি না হওয়ার কারণও সংশয় হয় যে, পিশাচ কি থাকিয়াও কোন কারণে উপলব্ধ হইতেছে না, অথবা পিশাচ নাই, সে জন্ত উপলব্ধ হইতেছে না? ভাষ্যকারের ব্যাখ্যা ও উদাহরণ হইতে তাত্ত্বিক-রক্ষাকারের কথার একটু বিশেষ বুঝা গেলেও, তাত্ত্বিক-রক্ষাকার উল্লেখ্যকরের কথার দ্বারা শেষে এই মতের অনৈতিকতা সূচনা করায়, তিনিও ভাষ্যকারের মতকেই এই ভাবে ব্যাখ্যা

করিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, ইহা বলা হইতে পারে। তार्কিক-রক্ষার টীকাকার মণিনাথ কিন্তু ঐ স্থলে লিখিয়াছেন যে, গ্রন্থকার ভাস্কর্যের সমস্ত সংশয়ের পক্ষবিধত্ব মতকে নিরাকরণ করিবার জন্য এখানে তাহার অশুভবাদ করিয়াছেন। কলকথা, সংশয়ের পক্ষবিধত্ব-মত কেবল ভাষ্যকারেরই মত নহে; প্রাচীন কালে ঐ মত অস্ত্রেরও পরিগৃহীত ছিল, ইহা মণিনাথের কথায় বুঝা যায়।

ভাষ্য। যৎ পুনরতঃ “বিপ্রতিপত্তৌ চ সম্প্রতিপত্তে”-  
রিতি। বিপ্রতিপত্তিশব্দস্য যোহর্থস্তদধ্যবসায়ো বিশেষাপেক্ষঃ সংশয়-  
হেতুস্তস্য চ সমাখ্যাস্তরেণ ন নিবৃত্তিঃ। সমানেহধিকরণে ব্যাহতার্থো  
প্রবাদো বিপ্রতিপত্তিশব্দস্যর্থঃ, তদধ্যবসায়ো বিশেষাপেক্ষঃ সংশয়হেতুঃ,  
ন চাস্ত্য সম্প্রতিপত্তিশব্দে সমাখ্যাস্তরে যোজ্যমাণে সংশয়হেতুত্বং  
নিবর্ততে, তদিদমকৃতবুদ্ধিসম্মোহনমিতি।

অশুভবাদ। আর এই যে ( বলা হইয়াছে ), বিপ্রতিপত্তি হইলে সম্প্রতিপত্তি-  
বশতঃ সংশয় হয় না ( ইহার উত্তর বলিতেছি )।

“বিপ্রতিপত্তি” শব্দের যে অর্থ, তাহার নিশ্চয় বিশেষাপেক্ষ হইয়া সংশয়ের  
কারণ হয়, নামাস্তরবশতঃ তাহার নিবৃত্তি হয় না।

বিশদার্থ এই যে, এক অধিকরণে বিরুদ্ধার্থ বাক্যব্যয় “বিপ্রতিপত্তি” শব্দের অর্থ,  
তাহার নিশ্চয় বিশেষাপেক্ষ হইয়া অর্থাৎ বিশেষ ধর্মের স্মরণ মাত্র সহিত হইয়া সংশ-  
য়ের কারণ হয়। সম্প্রতিপত্তি-শব্দরূপ নামাস্তর যোগ করিলে অর্থাৎ বিপ্রতিপত্তিকে  
“সম্প্রতিপত্তি” এই নামাস্তরে উল্লেখ করিলেও ইহার ( পূর্বোক্ত বিপ্রতিপত্তি শব্দার্থ  
নিশ্চয়ের ) সংশয়-কারণের নিবৃত্তি হয় না। সুতরাং ইহা অকৃতবুদ্ধিদিগের সম্মোহন  
[ অর্থাৎ বিপ্রতিপত্তি যখন সম্প্রতিপত্তি, তখন তাহা সংশয়ের কারণ হইতে পারে না,  
এই পূর্বোক্ত পূর্বপক্ষ, বাঁহারা সংশয়-লক্ষণ-সূত্রোক্ত বিপ্রতিপত্তি শব্দের অর্থ বোধ  
করেন নাই, সেই অকৃতবুদ্ধি ব্যক্তিগণের ভ্রমের উৎপাদক। বিপ্রতিপত্তি শব্দের  
বিরুদ্ধিত অর্থ বুঝিলে ঐরূপ ভ্রম হয় না; সুতরাং ঐরূপ পূর্বপক্ষের আশঙ্কা নাই ]।

টিপ্পনী। মহর্ষি সংশয়-পরীক্ষা-প্রকরণে তৃতীয় সূত্রের দ্বারা পূর্বপক্ষ হচনা করিয়াছেন যে,  
বিপ্রতিপত্তিপ্রযুক্ত সংশয় হইতে পারে না। কারণ, বিপ্রতিপত্তি বলিতে এক অধিকরণে বাদী ও  
প্রতিবাদীর বিরুদ্ধ পদার্থের জ্ঞান। উহা বাদী ও প্রতিবাদীর স্ব স্ব সিদ্ধান্তের স্বীকার না  
নিশ্চয়ায়ক জ্ঞানরূপ সম্প্রতিপত্তি, সুতরাং উহা সংশয়ের বাধকই হইবে, উহা সংশয়ের কারণ



হইতে পারে না। ভাষ্যকার যথাক্রমে মহৰ্ষির ঐ পূৰ্ব্বপক্ষের উল্লেখ করিয়া তাহার উত্তর ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, সংশয়-লক্ষণ-সূত্রে যে “বিপ্রতিপত্তি” শব্দ আছে, উহার অৰ্থ বাদী ও প্রতিবাদীর বিরুদ্ধ পদাৰ্থবিষয়ক জ্ঞান নহে; এক অধিকরণে বিরুদ্ধাৰ্থবোধক বাক্যদ্বয়ই ঐ সূত্রে বিপ্রতিপত্তি শব্দের অৰ্থ বুঝিতে হইবে (১ অঃ, ২৩ সূত্র-ভাষ্য-টিপ্পনী দ্রষ্টব্য)। বাদী ও প্রতিবাদীর বাক্যদ্বয়কে এক অধিকরণে বিরুদ্ধাৰ্থবোধক বলিয়া নিঃসংশয়ে বুঝিলে, সেখানে যদি “বিশেষাপেক্ষা” থাকে অর্থাৎ বিশেষ ধর্মের উপলব্ধি না থাকিয়া, বিশেষ ধর্মের স্মৃতি থাকে, তাহা হইলে পূৰ্ব্বোক্ত বিপ্রতিপত্তি-বাক্য-নিশ্চয় জ্ঞাত মধ্যস্থ ব্যক্তির সংশয় হয়। বিপ্রতিপত্তি হলে বাদী ও প্রতিবাদীর সম্প্রতিপত্তি অর্থাৎ স্ব স্ব পক্ষের স্বীকার বা নিশ্চয় থাকে বলিয়া যদিও বিপ্রতিপত্তিকে “সম্প্রতিপত্তি” এই নামে উল্লেখ করা যায়, তাহাতে পূৰ্ব্বোক্ত বিপ্রতিপত্তি-বাক্য নিশ্চয়ের সংশয়-কারণ বল যায় না। কারণ, পূৰ্ব্বোক্ত বিপ্রতিপত্তি-বাক্যের নিশ্চয়রূপ পদাৰ্থ, বিশেষাপেক্ষ হইলে সংশয়ের কারণ হয়, ইহা অসম্ভববিন্দু। উদ্যোতকর তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, নামের অল্পপ্রকারতা-বশতঃ পদাৰ্থের অল্পপ্রকারতা হয় না, নিমিত্তাস্তরবশতঃ বিপ্রতিপত্তির “সম্প্রতিপত্তি” এই নাম করিলেও, তাহাতে বিপ্রতিপত্তি নাই, ইহা বলা যায় না। তাৎপর্য্যটীকাকার বলিয়াছেন যে, বিরুদ্ধাৰ্থ-জ্ঞানরূপ বিপ্রতিপত্তির বিষয় যখন দুইটি পরস্পর বিরুদ্ধ পদাৰ্থ, তখন বিষয় ধরিয়া উহাকে বিপ্রতিপত্তি বলিতেই হইবে, এবং উহার স্বরূপ ধরিয়া ঐ বিপ্রতিপত্তিকেই সম্প্রতিপত্তি বলা যায়।\* বস্তুতঃ মহৰ্ষি সংশয়-লক্ষণ-সূত্রে বিপ্রতিপত্তি-বাক্যকেই বিপ্রতিপত্তি শব্দের দ্বারা প্রকাশ করিয়া, তৎপ্রযুক্ত তৃতীয় প্রকার সংশয়ের কথা বলিয়াছেন। তাৎপর্য্যটীকাকারও মহৰ্ষি-বর্ণিত সংশয়-প্রয়োজক বিপ্রতিপত্তিকে সেখানে ঐরূপেই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ভাষ্যকার এখানে বাক্যবিশেষরূপ বিপ্রতিপত্তির নিশ্চয়কেই সংশয়বিশেষের কারণ বলায়, সংশয়-লক্ষণ-সূত্রে “বিপ্রতিপত্তিঃ” এই স্থলে পক্ষনী বিভক্তির দ্বারা প্রয়োজকত্ব অৰ্ণই গ্রাহ্য, ইহা বুঝা যায়। বিপ্রতিপত্তি-বাক্যের নিশ্চয় সংশয়বিশেষের কারণ হইলে, ঐ বাক্য তাহার প্রয়োজক হয়। পূৰ্ব্বোক্ত প্রকার বাক্যদ্বয়রূপ বিপ্রতিপত্তির নিশ্চয় করিতে হইলে বাদী ও প্রতিবাদীর সেই বিরুদ্ধাৰ্থপ্রতিপাদক বাক্যদ্বয়ের পূৰ্বক্ ভাবে অৰ্ণ নিশ্চয় আবশ্যক হয়। কারণ, তাহা না হইলে ঐ বাক্যদ্বয়কে এক অধিকরণে পরস্পর-বিরুদ্ধ পদাৰ্থের বোধক বলিয়া বুঝা যায় না। তাহা না বুঝিলেও ঐ বাক্যদ্বয়কে বিপ্রতিপত্তি বলিয়া বুঝা যায় না। সুতরাং যে মধ্যস্থের বিপ্রতিপত্তিবাক্য-নিশ্চয় জন্মিবে, উহার ঐ বাক্যদ্বয়ের অৰ্ণবোধ সেখানে থাকিবেই। সুতরাং বিপ্রতিপত্তি বাক্যার্থ নিশ্চয় না হইলে কেবল বিপ্রতিপত্তিবাক্য-নিশ্চয় সংশয়ের কারণ হইতে পারে না, এই আশঙ্কাও কারণ নাই। এজ্ঞ ভাষ্যকার বিপ্রতিপত্তি-বাক্য-নিশ্চয়কে সংশয়ের কারণ বলা আবশ্যক মনে করেন নাই। বিপ্রতিপত্তি বাক্যের নিশ্চয়কে সংশয়বিশেষের কারণ বুঝিলে সে পক্ষে লাভবও আছে। ফলকথা, সংশয়-লক্ষণ-সূত্রোক্ত “বিপ্রতিপত্তি” শব্দের দ্বারা যে অৰ্ণ বিবক্ষিত, তাহা পূৰ্ব্বোক্তরূপ বিপ্রতিপত্তি-বাক্য, তাহার নিশ্চয়ই বিশেষাপেক্ষ হইলে সংশয়-বিশেষের কারণ হয়। ঐ বিপ্রতিপত্তি শব্দের বিবক্ষিত অৰ্ণ না বুঝিয়া, উহাকে সম্প্রতিপত্তি

বলিয়া যে পূর্বপক্ষ বলা হইয়াছে, তাহা অজ্ঞতা বা ভ্রমমূলক এবং উহা অবোক্ত ব্যক্তির ভ্রমজনক, ইহাই ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য।

ভাষ্য। যৎ পুনঃ “ব্যবস্থাস্থানি ব্যবস্থিতত্বাক্ষাব্যবস্থায়” ইতি সংশয়হেতোরর্থস্থাপতিষেধাদব্যবস্থানুপলক্ষ্যো নিমিত্তান্তরেন শব্দান্তরকল্পনা ব্যর্থ্য। শব্দান্তরকল্পনা—ব্যবস্থা খল্ব্যব্যবস্থা ন ভবত্য-ব্যবস্থাস্থানি ব্যবস্থিতত্বাদিতি, নানয়োপলক্ষ্যানুপলক্ষ্যোঃ সদনদ্বিবয়ঃ বিশেষাপেক্ষং সংশয়হেতুর্ন ভবতীতি প্রতিষিধ্যতে, যাবতা চাব্যবস্থাস্থানি ব্যবস্থিতা ন তাবতাস্থানং জহাতি, তাবতা হনুজ্ঞাতাব্যবস্থা, এবমিয়ং ক্রিয়মাণাপি শব্দান্তরকল্পনা নার্থান্তরং সাধয়তীতি।

অনুবাদ। আর যে ( বলা হইয়াছে ), অব্যবস্থা স্বরূপে ব্যবস্থিত আছে বলিয়াও অব্যবস্থা প্রযুক্ত সংশয় হয় না, ( ইহার উত্তর বলিতেছি )।

সংশয়ের কারণপদার্থের প্রতিষেধ না হওয়ায় এবং অব্যবস্থা স্বীকৃত হওয়ায় নিমিত্তান্তর-প্রযুক্ত শব্দান্তরকল্পনা ব্যর্থ্য। বিশদার্থ এই যে, অব্যবস্থা স্বরূপে ব্যবস্থিত-বশতঃ অব্যবস্থা হয় না, ব্যবস্থাই হয়, ইহা শব্দান্তরকল্পনা ( অর্থাৎ অব্যবস্থাতে যে “ব্যবস্থা” এই নামান্তরের কল্পনা ); এই শব্দান্তর কল্পনার দ্বারা উপলক্ষি ও অনুপলক্ষির বিশেষাপেক্ষ বিজ্ঞমান-বিষয়কত্ব ও অবিজ্ঞমান-বিষয়কত্ব ( পূর্বোক্ত প্রকার উপলক্ষির অব্যবস্থা ও অনুপলক্ষির অব্যবস্থা ) সংশয়ের কারণ হয় না, এই প্রকারে নিষিদ্ধ হয় না [ অর্থাৎ পূর্বোক্ত অব্যবস্থাতে নিমিত্তান্তরবশতঃ “ব্যবস্থা” এই নামান্তরের প্রয়োগ করিলেও, তাহাতে ঐ অব্যবস্থা সংশয়ের প্রয়োজক নহে, ইহা বলা হয় না। ] এবং অব্যবস্থা যখন স্বস্বরূপে ব্যবস্থিতা, তখন স্বস্বরূপকে ত্যাগ করে না। তাহা হইলে অব্যবস্থা স্বীকৃতই হইল। এইরূপ হইলে অর্থাৎ অব্যবস্থাকে স্বীকার করিলে, এই শব্দান্তরকল্পনা ক্রিয়মাণ হইয়াও পদার্থান্তর সাধন করে না [ অর্থাৎ অব্যবস্থাকে নিমিত্তান্তরবশতঃ ব্যবস্থা নামে উল্লেখ করিলেও, তাহাতে উহা অব্যবস্থা না হইয়া, ব্যবস্থারূপ পদার্থান্তর হইয়া যায় না। ]

১। প্রচলিত সমস্ত পুস্তকেই “নানয়োপলক্ষ্যানুপলক্ষ্যোঃ” এইরূপ পাঠ আছে। কিন্তু “নানয়োপলক্ষ্যানু-পলক্ষ্যোঃ” এইরূপ পাঠই প্রকৃত বলিয়া মনে হওয়ায়, তাহাই হলে গৃহীত হইল। “অনয়া শব্দান্তরকল্পনা...ন...প্রতিষিধ্যতে” এইরূপ যোজনাই ভাষ্যকারের অভিপ্রেত বলিয়া বুঝা যায়। পূর্বে যে “শব্দান্তরকল্পনা” বলা হইয়াছে, পরে “অনয়া” এই কথার দ্বারা তাহারই গ্রহণ হইয়াছে।



টিপনী। মহর্ষি চতুর্থ সূত্রের দ্বারা পূর্ণপক্ষ স্থচনা করিয়াছেন যে, উপলব্ধির অব্যবস্থা ও অমুপলব্ধির অব্যবস্থা প্রযুক্ত সংশয় হইতে পারে না। কারণ, ঐ অব্যবস্থা যখন স্বরূপে ব্যবস্থিতই বলিতে হইবে, তখন উহাকে অব্যবস্থা বলা যায় না; বাহ্য ব্যবস্থিতা, তাহা অব্যবস্থা হয় না, তাহাকে ব্যবস্থাই বলিতে হয়। ভাষ্যকার যথাক্রমে এই পূর্ণপক্ষের উল্লেখ করিয়া, এখানে তাহার উদ্ভব ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, অব্যবস্থা স্বরূপে ব্যবস্থিতই বটে, তজ্জন্ত তাহাকে ব্যবস্থা বলা যাইতে পারে। বাহ্য ব্যবস্থিত আছে, তাহাকে ঐ অর্থে “ব্যবস্থা” নামেও উল্লেখ করা যাইবে। কিন্তু তাহাতে উপলব্ধির অব্যবস্থা ও অমুপলব্ধির অব্যবস্থা যে সংশয়বিশেষের হেতু বা প্রয়োজক হয়, তাহার নিষেধ হয় না এবং অব্যবস্থা বলিয়া কোন পদার্থই নাই, ইহাও প্রতিপন্ন হয় না; পরন্তু অব্যবস্থা পদার্থ স্বীকার করাই হয়। সুতরাং অব্যবস্থাতে “ব্যবস্থা” এই নামান্তর করনা ব্যর্থ। অর্থাৎ স্বরূপে ব্যবস্থিত আছে বলিয়া ঐ অর্থে অব্যবস্থাকে “ব্যবস্থা” এই নামে উল্লেখ করিলেও, তাহাতে যখন ঐ অব্যবস্থার সংশয়-প্রয়োজক নাই, ইহা সিদ্ধ হইবে না এবং অব্যবস্থা বলিয়া কোন পদার্থই নাই, ইহাও সিদ্ধ হইবে না, পরন্তু অব্যবস্থা আছে—ইহাই স্বীকৃত হইবে, তখন ঐ অব্যবস্থাতে ‘ব্যবস্থা’ এই নামান্তর করনা করিয়া পূর্ণপক্ষবাদীর কোন ফল নাই। ভাষ্যকার “শব্দান্তরকরনা ব্যর্থ” ইত্যন্ত ভাষ্যের দ্বারা সংক্ষেপে এই কথা বলিয়া, পরে “শব্দান্তরকরনা” ইত্যাদি ভাষ্যের দ্বারা স্থপন বর্ণনপূর্বক তাহার পূর্ণকথার বিশদার্থ বর্ণন করিয়াছেন। পূর্ণ-পক্ষবাদী অব্যবস্থা স্বরূপে ব্যবস্থিতা আছে, এই নিমিত্তান্তরবশতঃ অব্যবস্থাতে ‘ব্যবস্থা’ এই নামান্তর করনা করিয়াছেন, এই কথা “শব্দান্তরকরনা” ইত্যাদি সন্দর্ভের দ্বারা প্রথমে প্রকাশ করিয়া, ঐ নামান্তরকরনা যে উপলব্ধির অব্যবস্থা ও অমুপলব্ধির অব্যবস্থার সংশয়-প্রয়োজক ন্যে নিষেধ করে না, ইহা বুঝাইয়াছেন। তাহা বুঝাইতে বলিয়াছেন যে, উপলব্ধির বিদ্যমান-বিষয় ও অবিদ্যমান-বিষয়ই উপলব্ধির অব্যবস্থা এবং অমুপলব্ধির বিদ্যমান-বিষয় ও অবিদ্যমান-বিষয়ই অমুপলব্ধির অব্যবস্থা, উহা বিশেষাপেক্ষ হইলে অর্থাৎ যেখানে বিশেষ ধর্মের উপলব্ধি নাই, বিশেষ ধর্মের স্মৃতি আছে, এমন হইলে সংশয়বিশেষের প্রয়োজক হইবেই, ঐ অব্যবস্থাতে ‘ব্যবস্থা’ এই নামান্তর করনা করিলে, তাহাতে উহার সংশয়-প্রয়োজক হইতে পারে না। উদ্যোক্তকরও বলিয়াছেন যে, নামের অল্পপ্রকারতায় পদার্থের অল্পপ্রকারতা হয় না; যে পদার্থ যে প্রকার, তাহার নামান্তর করিলেও সেই পদার্থ সেই প্রকারই থাকিবে। পূর্বোক্ত প্রকার অব্যবস্থা যখন সংশয়বিশেষের প্রয়োজক, তখন তাহার “ব্যবস্থা” এই নামান্তর করিলেও, তাহা সংশয়প্রয়োজকই থাকিবে। দ্বিতীয় কথা এই যে, অব্যবস্থাকে ব্যবস্থা বলিলেও অব্যবস্থা পদার্থ স্বীকার করিতেই হইবে। ভাষ্যকার ইহা বুঝাইতে শেষে বলিয়াছেন যে, অব্যবস্থা তাহার আত্মাতে অর্থাৎ স্বরূপে ব্যবস্থিত আছে বলিয়া উহা অব্যবস্থাই নহে, উহা ব্যবস্থা—ইহা বলা যায় না। কারণ, অব্যবস্থা পদার্থ না থাকিলে তাহাকে স্বরূপে ব্যবস্থিত বলা যায় না। বাহ্য স্বরূপে ব্যবস্থিত, তাহা স্বরূপে ভাগ করে না, তাহার অস্তিত্ব আছে, ইহা অবশ্য স্বীকার্য। সুতরাং অব্যবস্থা স্বরূপে ব্যবস্থিত আছে, ইহা স্বীকার করিতে গেলে, অব্যবস্থা বলিয়া পদার্থ আছে, ইহা অবশ্যই স্বীকার

করিতে হইবে। ঐ অব্যবস্থা স্বরূপে ব্যবহৃত আছে, এ জন্ম (ব্যবতিষ্ঠিতে বা না—এইরূপ ব্যুৎপত্তিতে) উহাকে ‘ব্যবস্থা’ এই নামান্তরে উল্লেখ করিলেও, তাহাতে উহা বস্তুতঃ অব্যবস্থা পদার্থ না হইয়া ব্যবস্থাকরণ পদার্থ হয় না, উহা অব্যবস্থা পদার্থ ই থাকে। পদার্থমাত্রই স্বরূপে ব্যবহৃত আছে। যাহা অলীক, তাহার সম্বন্ধই নাই, তাহা স্বরূপে ব্যবহৃত নাই। যে পদার্থ তাহার যে স্বরূপে ব্যবহৃত আছে, সেই স্বরূপে তাহার অস্তিত্ব অবস্থাই আছে। অব্যবস্থাস্বরূপে অব্যবস্থার অস্তিত্বও স্তূতরাং আছে। অতএব অব্যবস্থা বলিয়া কোন পদার্থই নাই; স্তূতরাং উহাকে সংশয়ের প্ররোজক বলা যায় না, এই পূর্বপক্ষ সর্বথা অযুক্ত; অজ্ঞতাবশতই ঐরূপ পূর্বপক্ষের অবতারণা হয়। ভাষ্যকারের মতে পূর্বোক্ত প্রকার উপলব্ধির নিয়ম থাকা এবং অনুপলব্ধির নিয়ম না থাকাই যথাক্রমে উপলব্ধির অব্যবস্থা ও অনুপলব্ধির অব্যবস্থা। উহার নিশ্চয়ই সংশয়বিশেষের কারণ। ঐ অব্যবস্থা সংশয়বিশেষের প্ররোজক। সংশয়-সামান্ত-লক্ষণসূত্রে ঐ স্থলে প্ররোজকত্ব অর্থেই পঞ্চমী বিভক্তির প্রয়োগ হইয়াছে। অথবা সেখানে অব্যবস্থার নিশ্চয় অর্থেই মহর্ষি অব্যবস্থা শব্দের লাক্ষণিক প্রয়োগ করিয়াছেন।

ভাষ্য। যৎ পুনরেতৎ “তথাত্যন্তসংশয়স্তদ্ব্যস্মাত-  
ত্যাপপত্তে”রিতি। নায়ং সমানধর্মাদিত্য এব সংশয়ঃ, কিং তর্হি ?  
তদ্ব্যবস্থাধ্যবসায়াত্ বিশেষস্মৃতিসহিতাদিত্যতো নাত্যন্তসংশয় ইতি।  
অন্যতরধর্মাদ্যবসায়াদ্বা ন সংশয় ইতি তন্ন যুক্তং, “বিশেষা-  
পেক্ষো বিমর্শঃ সংশয়” ইতি বচনাৎ। বিশেষচান্যতরধর্মো ন তদ্ব্যব-  
স্থাধবসায়মানে বিশেষাপেক্ষা সম্ভবতীতি।

অনুবাদ। আর এই যে (বলা হইয়াছে), “সেইরূপ অত্যন্ত সংশয় হয়; কারণ, সেই ধর্মের অর্থাৎ সাধারণ ধর্ম ও অসাধারণ ধর্মের সাতত্য (সর্বকালীনত্ব) আছে”, (ইহার উত্তর বলিতেছি)। সমানধর্মাদি হইতেই এই সংশয় হয় না, অর্থাৎ অজ্ঞায়মান সমানধর্মাদি পদার্থই সংশয়ের কারণ বলা হয় নাই। (প্রশ্ন) তবে কি? (উত্তর) বিশেষধর্মের স্মৃতি সহিত সমান-ধর্মাদি-বিষয়ক নিশ্চয় জ্ঞাত সংশয় হয়, অতএব অত্যন্ত সংশয় (সর্বদা সংশয়) হয় না।

(আর যে বলা হইয়াছে) “একতর ধর্মের নিশ্চয় জ্ঞাতও সংশয় হয় না”,—তাহা যুক্ত নহে। কারণ, “বিশেষাপেক্ষা বিমর্শ সংশয়” এই কথা বলা হইয়াছে। একতর ধর্ম, বিশেষ ধর্ম, তাহা নিশ্চায়মান হইলে অর্থাৎ সেই একতর ধর্মরূপ বিশেষ ধর্মের নিশ্চয় হইলে বিশেষাপেক্ষা সম্ভব হয় না [অর্থাৎ বিশেষ ধর্মের উপলব্ধি থাকিবে না, কেবল তাহার স্মৃতি থাকিবে, এই বিশেষাপেক্ষা যখন সংশয়-



মাত্রেই আবশ্যক বলা হইয়াছে, তখন একতর ধর্মরূপ বিশেষধর্মের নিশ্চয় জন্ম সংশয় হয়, ইহা কিছুতেই বলা হয় নাই, বুঝিতে হইবে। যাহা বলা হয় নাই, তাহা বুঝিয়া পূর্বপক্ষ করিলে, তাহা পূর্বপক্ষই হয় না ; তাহা অযুক্ত ]।

টিপ্পনী। মহর্ষি সংশয়পরীক্ষাপ্রকরণে পঞ্চম সূত্রের দ্বারা শেষ পূর্বপক্ষ সূচনা করিয়াছেন যে, সমানধর্মের বিদ্যমানতা থাকিলেই বহিঃ সংশয় হয়, তাহা হইলে সর্বদাই সংশয় হইতে পারে। কারণ, সমানধর্ম সর্বদাই বিদ্যমান আছে। ভাষ্যকার সিদ্ধান্তসূত্রভাষ্যের প্রারম্ভেই এই পূর্বপক্ষের উত্তর ব্যাখ্যা করিলেও মহর্ষির পঞ্চম সূত্রে এই পূর্বপক্ষের স্পষ্ট সূচনা থাকায়, স্তত্র-ভাবে তাহার উত্তর ব্যাখ্যা করিবার জন্য এখানে মহর্ষির পঞ্চম পূর্বপক্ষ-সূত্রটির উল্লেখ করিয়া, তদন্তরে বলিয়াছেন যে, সমানধর্মাদিকেই সংশয়ের কারণ বলা হয় নাই ; সমানধর্মাদিবিষয়ক নিশ্চয়কেই সংশয়ের কারণ বলা হইয়াছে। সুতরাং সমানধর্মটি সর্বদা বিদ্যমান আছে বলিয়া সর্বদা সংশয় হইত, এই আপত্তি হইতে পারে না। সমানধর্ম বিদ্যমান থাকিলেও তাহার নিশ্চয় সর্বদা বিদ্যমান না থাকায়, সর্বদা সংশয়ের কারণ নাই। বিশেষধর্মের নিশ্চয় হইলে, সেখানে সমানধর্মের নিশ্চয় থাকিলেও আর সংশয় হয় না ; এ জন্ম সংশয়নায়েই “বিশেষাপেক্ষা” থাকা আবশ্যক, ইহা বলা হইয়াছে। “বিশেষাপেক্ষা” কথার দ্বারা বিশেষ ধর্মের উপলব্ধি না থাকিয়া, তাহার স্মৃতিই তাৎপর্য্য বুঝিতে হইবে। তাই ভাষ্যকার এখানে “বিশেষস্মৃতিসাহিত্যং” এই কথার দ্বারা বিশেষধর্মের স্মৃতি সহিত সমানধর্মাদি-বিষয়ক নিশ্চয়কেই সংশয়ের কারণ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। যেখানে বিশেষধর্মের উপলব্ধি জন্মিয়াছে, সেখানে বিশেষধর্মের উপলব্ধি না থাকিয়া, কেবল তাহার স্মৃতি নাই, সুতরাং সেখানে সংশয়ের কারণ না থাকায় সংশয় হইতে পারে না, সুতরাং সর্বদা সংশয়ের আপত্তি নাই। সংশয়লক্ষণ-সূত্রোক্ত “বিশেষাপেক্ষা” এই কথা দ্বারা সংশয়নানে যে “বিশেষাপেক্ষা” থাকা আবশ্যক বলিয়া স্মৃতি হইয়াছে, উহার ফলিতার্থ—বিশেষ স্মৃতি, ইহা ভাষ্যকার সেই সূত্রভাষ্যের শেষে এবং এই সূত্রভাষ্যের শেষে স্পষ্ট করিয়া বলিয়া গিয়াছেন। সংশয়স্থলে বিশেষধর্মের উপলব্ধি থাকিবে না, পূর্বদৃষ্ট বিশেষধর্মের স্মৃতি থাকিবে, ইহাই ঐ কথার তাৎপর্য্য বুঝিতে হইবে। এবং সেই সূত্রে সমানধর্ম প্রভৃতি পাঁচটি পদার্থের নিশ্চয়ই যে পঞ্চবিধ সংশয়ের কারণ বলা হইয়াছে, ঐ পাঁচটি পদার্থকেই সংশয়ের কারণ বলা হয় নাই, ইহাও ভাষ্যকার এখানে স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন। মহর্ষিসূত্রের দ্বারা তাহা কিরূপে বুঝা যায়, তাহাও ভাষ্যকার পূর্বে বলিয়া আসিয়াছেন। সেখানে বিষয়বোধক শব্দের দ্বারা বিষয়ী জ্ঞানের কখন হইয়াছে, এই কথাও কল্পান্তরে তিনি বলিয়াছেন। “উপপত্তি” শব্দের “নিশ্চয়” অর্থ গ্রহণ করিলে মহর্ষিসূত্রের দ্বারা সহজেই সমানধর্মের নিশ্চয় ও অসাধারণ ধর্মের নিশ্চয়কে সংশয়বিশেষের কারণ বলিয়া পাওয়া যায়। কিপ্রতিপত্তি প্রভৃতি তিনটির নিশ্চয়বোধক কোন শব্দ সেই সূত্রে না থাকিলেও প্রয়োজনক অর্থে পঞ্চমী বিভক্তির প্রয়োগ হইলে কিপ্রতিপত্তি প্রভৃতি তিনটিকে সংশয়ের প্রয়োজনরূপে বুঝা গাইতে পারে। তাহা হইলে ঐ তিনটিরও নিশ্চয়কেই সংশয়ের

কারণ বলিয়া বুঝা যায়। বিদ্যরোবক শব্দের দ্বারা বিবর্তী জ্ঞানের কথন হইলে, বিপ্রতিপত্তি প্রভৃতি শব্দের দ্বারাই তাহাদিগের জ্ঞান পর্য্যন্ত বিবক্ষিত, ইহাও বলা বাইতে পারে। ভাষ্যকার এখানে “সমানধর্মাদিত্যাঃ” এবং “তদ্বিষয়াধ্যবসায়ঃ” এইরূপ কথার দ্বারা সমানধর্মাদি পাঁচটির নিশ্চয়কেই গ্রহণ করিয়াছেন। মহর্ষির সিদ্ধান্ত-সূত্রেও “যথোক্তাধ্যবসায়ঃ” এই কথার দ্বারা ভাষ্যকারের মতে সংশয়লক্ষণসূত্রোক্ত সমানধর্মাদি পাঁচটির নিশ্চয়ই গৃহীত হইয়াছে।

মহর্ষি প্রথম পূর্বপক্ষসূত্রে শেষে আর একটি পূর্বপক্ষ সূচনা করিয়াছেন যে, যে ছই ধর্মবিষয়ে সংশয় হইবে, তাহার কোন একটির ধর্মনিশ্চয় জ্ঞান সংশয় হয় না। কারণ, সেইরূপ ধর্মনিশ্চয় হইলে, সেখানে একতর ধর্মীর নিশ্চয়ই হইয়া যায়। ভাষ্যকার সর্বশেষে ঐ পূর্বপক্ষের উল্লেখ করিয়া, তত্বতরে বলিয়াছেন যে, সংশয়লক্ষণসূত্রে একতর ধর্মের নিশ্চয় জ্ঞান সংশয় হয়, এমন কথা বলা হয় নাই। কারণ, সেই সূত্রে “বিশেষাপেক্ষ বিমর্শ সংশয়” এইরূপ কথা বলা হইয়াছে। সংশয় বিষয়-ধর্মবিষয়ের কোন এক ধর্মীর ধর্ম, বিশেষধর্মই হইবে। তাহার নিশ্চয় হইলে সেখানে বিশেষধর্মের নিশ্চয়ই হইল। তাহা হইলে আর সেখানে মহর্ষিসূত্রোক্ত বিশেষাপেক্ষা থাকা সম্ভব হয় না। কারণ, বিশেষধর্মের উপলব্ধি না থাকিয়া বিশেষধর্মের স্মৃতিই বিশেষাপেক্ষা। বিশেষ ধর্মের উপলব্ধি হইলে আর তাহা কিরূপে থাকিবে? সুতরাং যখন বিশেষাপেক্ষা সংশয়মাত্রই আবশ্যক বলা হইয়াছে, তখন বিশেষ ধর্মরূপ একতর ধর্মের নিশ্চয় জ্ঞান সংশয় হয়, এ কথা বলা হয় নাই, ইহা অবশ্যই বুঝিতে হইবে। তাহা হইলে পূর্বোক্ত পূর্বপক্ষের অবতারণা কোনরূপেই করা যায় না। মহর্ষির সূত্রার্গ না বুকিলেই ঐরূপ পূর্বপক্ষের অবতারণা হইয়া থাকে। মহর্ষিও তাহার সূত্রের তাৎপর্য্যার্গ বিশদরূপে প্রকটিত করিবার জন্তই সূত্রার্গ না বুকিলে যে সকল অসম্মত পূর্বপক্ষের অবতারণা হইতে পারে, সেগুলিরও উল্লেখ করিয়াছেন। তাই উদ্যোতকর সেগুলির উত্তর ব্যাখ্যা করিতে অনেক স্থলে লিখিয়াছেন,—“ন সূত্রার্থপরিস্কানঃ”। ফল কথা, মহর্ষি তাহার নিজের কথা পরিস্ফুট করিবার জন্ত নানারূপ পূর্বপক্ষের অবতারণা করিয়াছেন এবং সিদ্ধান্তসূত্রের দ্বারা সকল পূর্বপক্ষেরই উত্তর সূচনা করিয়াছেন। ভাষ্যকার যথাক্রমে মহর্ষিসূচিত পূর্বপক্ষগুলির যে উত্তরগুলি ব্যাখ্যা করিয়াছেন, সেই উত্তরগুলি মহর্ষি সিদ্ধান্তসূত্রের দ্বারা সূচনা করিয়া গিয়াছেন, ভাষ্যকার তাহারই ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—তাহা না বলিলে মহর্ষির ন্যূনতা থাকে। তিনি যে সকল পূর্বপক্ষের পৃথকভাবে অবতারণা করিয়াছেন, একটি সিদ্ধান্তসূত্রের দ্বারা সেই সমস্তেরই উত্তর সূচনা করিয়াছেন। সূচনার জন্তই সূত্র এবং সেই সূচিত অর্থের প্রকাশের জন্তই ভাষ্য। সূত্রে বহু অর্থের সূচনা থাকে; উহা সূত্রের লক্ষণ; এ কথা প্রাচীনগণও বলিয়া গিয়াছেন। ৩।

১। “সূত্রক বহুবর্গসূচনাদ্ভবতি। যথাহুঃ—

“লগ্নি সূত্রার্থানি স্বাক্ষরশব্দাদি চ।

সর্বত্র সারভূতানি সূত্রাণ্যাহবনীবিণঃ”।—ভাসরী।

উক্তসূত্র, অমাপ-ভাষ্যভাষ্যতর শেষ ভাগ।



সূত্র । যত্র সংশয়স্তত্ৰৈবমুত্তরোত্তরপ্রসঙ্গঃ । ৭।৬৮॥

অনুবাদ । যে স্থলে সংশয় হইবে, সেই স্থলে এই প্রকার উত্তরোত্তর প্রসঙ্গ করিতে হইবে [ অর্থাৎ প্রতিবাদী যেখানে সংশয়বিষয়ে পূর্বোক্ত পূর্বপক্ষগুলির অবতারণা করিবেন, সেখানেই পরীক্ষক পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তসূত্র-সূচিত উত্তরগুলি বলিবেন ] ।

ভাষ্য । যত্র যত্র সংশয়পূর্বিকা পরীক্ষা শাস্ত্রে কথায় বা, তত্র তত্রৈব সংশয়ে পরেণ প্রতিষিদ্ধে সমাধিব্যাজ্য ইতি । অতঃ সর্বপরীক্ষা ব্যাপিত্বাৎ প্রথমং সংশয়ঃ পরীক্ষিত ইতি ।

অনুবাদ । যে যে স্থলে শাস্ত্রে অথবা কথাতে অর্থাৎ বাদবিচারে সংশয়পূর্বক পরীক্ষা হইবে, সেই সেই স্থলে এই প্রকারে অর্থাৎ পূর্বোক্ত পূর্বপক্ষাবলম্বনে প্রতিবাদীকর্তৃক সংশয় প্রতিষিদ্ধ হইলে, এই প্রকারে ( সিদ্ধান্তসূত্রোক্ত প্রকারে ) সমাধি (উত্তর) বক্তব্য । অতএব সর্বপরীক্ষা-ব্যাপকত্ববশতঃ অর্থাৎ সকল পদার্থের পরীক্ষাই সংশয়পূর্বক বলিয়া (মহর্ষি) প্রথমে সংশয়কে পরীক্ষা করিয়াছেন ।

টিপ্পনী । মহর্ষি সংশয়পরীক্ষার শেষে এই প্রকরণেই শিষ্য-শিক্ষার জন্য এই সূত্রের দ্বারা বলিয়াছেন যে, সর্বপরীক্ষাই যখন সংশয়পূর্বক, তখন পদার্থ পরীক্ষা করিতে ইচ্ছুক বাদী, বাদ-বিচারেও বিচার্য্য সংশয় প্রদর্শন করিবেন । কিন্তু ঐ সংশয়ে তিনি স্বয়ং পূর্বোক্ত কোন পূর্বপক্ষের অবতারণা করিবেন না । প্রতিবাদী বাদীর প্রদর্শিত সংশয়ে পূর্বোক্ত পূর্বপক্ষের উল্লেখ করিলে, বাদী পূর্বোক্ত সিদ্ধান্ত-সূত্রসূচিত উত্তর বলিবেন । উদ্যোতকর এই সূত্রের এইরূপই তাৎপর্য্য বর্ণন করিয়াছেন । ভাষ্যকারের "পরেণ প্রতিষিদ্ধে" ইত্যাদি কথা দ্বারা তাহারও ঐরূপ তাৎপর্য্যই বুঝা যায় ।

বুদ্ধিকার বিশ্বনাথ প্রভৃতি নব্যগণ এই সূত্রের তাৎপর্য্য বর্ণন করিয়াছেন যে, "প্রয়োজন" প্রভৃতি যে সকল পদার্থের পরীক্ষা মহর্ষি করেন নাই, সেই সকল পদার্থেও যদি কোন বিশেষ সংশয় হয়, তাহা হইলে তাহাতেও ঐরূপে অর্থাৎ পূর্বোক্ত প্রকারে উত্তরোত্তর প্রসঙ্গ—কি না উক্তি-প্রত্যুক্তি-রূপ প্রসঙ্গ অর্থাৎ তজপ পরীক্ষা করিতে হইবে । মহর্ষি সংশয় পরীক্ষার দ্বারা সংশয় হইলে প্রয়োজন প্রভৃতি পদার্থেরও এই ভাবে পরীক্ষা করিতে হইবে, ইহাই শেষে বলিয়াছেন । মহর্ষির সূত্র পাঠ করিলেও এই তাৎপর্য্যই সহজে বুঝা যায় । কিন্তু ঐ কথাই মহর্ষির বক্তব্য হইলে,

১। "কোৎসহ সূত্রার্থঃ ? স্বয়ং ন সংশয়ঃ প্রতিষিদ্ধব্যঃ, পরেণ তু সংশয়ে প্রতিষিদ্ধে এবমুত্তরঃ ব্যাজ্যমিতি শিষ্য-শিক্ষার্থঃ ।"—ভাষ্যকারঃ ।

তিনি এখানে তাহা বলিবেন কেন ? প্রমাণ ও প্রমের পরীক্ষার শেষেই “সংশয় হইলে প্রয়োজন প্রকৃতি পদার্থগুলিরও এইরূপে পরীক্ষা করিবে”, এই কথা তাহার বলা সম্ভব। এখানে এই কথা বলা সম্ভব কি না, ইহা চিন্তনীয়। নব্য চিন্তাকার রাধামোহন গোস্বামিতট্টাচার্য্য ইহা চিন্তা করিয়াছিলেন। তাই তিনি বিখ্যাতের ব্যাখ্যার অনুবাদ করিয়া শেষে বলিয়াছেন যে, যদিও এই কথা এই সংশয়-পরীক্ষার অঙ্গ নহে, তথাপি সংশয়-পরীক্ষার অধীন বলিয়া মহর্ষি প্রসঙ্গতঃ এই প্রকরণেই এই কথা বলিয়াছেন।

ভাষ্যকার প্রকৃতি প্রাচীনগণ এই স্বত্রের যেকণ তাৎপর্য্য বর্ণন করিয়াছেন, তাহাতে সংশয়-পরীক্ষা-প্রকরণে এই স্বত্র বলা অসম্ভব হয় নাই। কারণ, মহর্ষি প্রথমোক্ত প্রমাণ ও প্রমের পদার্থকে উল্লঙ্ঘন করিয়া সর্বত্রই সংশয় পদার্থেরই পরীক্ষা করিয়াছেন কেন ? এই প্রশ্নের উত্তর স্বচনার জন্তই মহর্ষি এখানে এই স্বত্র বলিয়াছেন। মহর্ষির গূঢ় তাৎপর্য্য এই যে, এই শাস্ত্রে বিচার দ্বারা প্রমাণাদি পদার্থের পরীক্ষা করিতে গেলেই বিচারে সংশয় সূচনা করিতে হইবে। সেই সংশয়ে পূর্বোক্ত প্রকারে পূর্বপক্ষ উপস্থিত হইলে অর্থাৎ কোন প্রতিবাদী যদি সেখানে পূর্বোক্তপ্রকারে সংশয় খণ্ডন করেন, তাহা হইলে এইরূপে তাহার সমাধান করিবে। নচেৎ কোন পদার্থেরই পরীক্ষা করা যাইবে না। পরীক্ষানামেই বধন বিচারের জন্ত সংশয় আবশ্যক হইবে, তখন সংশয় সর্ব-পরীক্ষার ব্যাপক। অর্থাৎ যে কোন পদার্থের পরীক্ষা করিতে গেলে, প্রতিবাদী যদি সংশয়ের পূর্বোক্ত কারণগুলি খণ্ডন করিয়া, সংশয়কেই খণ্ডন করেন, তাহা হইলে তাহার সমাধান করিয়া সংশয় সমর্থন করিতে হইবে। নচেৎ সংশয়পূর্বক বস্তুর পরীক্ষা সেখানে কোনরূপেই হইতে পারে না। তাই সর্বত্রই সংশয় পরীক্ষা করা হইয়াছে। এখন কোন প্রতিবাদী প্রমাণাদি পদার্থের পরীক্ষায় বিচারে সংশয়কে প্রতিবেদন করিলে, সিদ্ধান্ত-স্বত্র-সূচিত সমাধান হেতুর দ্বারা তাহার সমাধান করিতে পারিবে। সংশয়ের কারণ সমর্থন করিয়া সংশয় সমর্থন করিতে পারিলে, তখন প্রতিবাদীর নিকটে প্রমাণাদি সকল পদার্থের পরীক্ষা করিতে পারিবে। ফলকথা, পরীক্ষানামেই পূর্বে সংশয় আবশ্যক বলিয়া সর্বত্রই মহর্ষি সংশয়-পরীক্ষাই করিয়াছেন এবং শেষে এই স্বত্রের দ্বারা মহর্ষি সেই কথা বলিয়া গিয়াছেন। ভাষ্যকারও এই স্বত্র-ভাষ্যের শেষে মহর্ষির ঐ তাৎপর্য্য ব্যক্ত করিয়াছেন। সর্বত্রই মহর্ষি সংশয় পরীক্ষাই কেন করিয়াছেন, তাহার হেতুই যে এই স্বত্রে মহর্ষির বক্তব্য, তাহা ভাষ্যকার শেষে ব্যক্ত করিয়াছেন। ভাষ্যকার সংশয়-পরীক্ষা-প্রকরণের ভাষ্যান্তেও এই কথা বলিয়া আসিয়াছেন। নির্ণয়মাত্রই সংশয়পূর্বক নহে। বাদ এবং শাস্ত্রে কাহারও সংশয়পূর্বক নির্ণয় হয় না। ভাষ্যকার নির্ণয়-স্বত্রভাষ্যে এ কথা বলিলেও শাস্ত্র ও বাদে যে বিচার আছে, তাহা সংশয়পূর্বক। সংশয় ব্যতীত বিচার হইতে পারে না, এই তাৎপর্য্যই ভাষ্যকার এখানে সংশয়কে সর্বপরীক্ষার ব্যাপক বলিয়াছেন। উদ্যোতকর ও বাচস্পতিমিশ্রের এই সমাধান পূর্বেই বলা হইয়াছে। ভাষ্যে “শাস্ত্রে কথায় বা” এই স্থলে “কথা” শব্দের দ্বারা “বাদ”-বিচারকেই ভাষ্যকার লক্ষ্য করিয়াছেন, ইহা তাৎপর্য্যটীকা-কার বলিয়াছেন। তাহাতে তবনির্ণয় বা বস্তুর পরীক্ষা উদ্দেশ্য নহে, সেই “জ্ঞান” ও “বিতত্ত্বা” নামক কথা এখানে গ্রহণ করা হয় নাই, ইহাই তাৎপর্য্যটীকা-কারের



কথার দ্বারা বুঝা যায়। মূলকথা, ভাষ্যকার প্রকৃতি প্রাচীনদিগের মতে সংশয়পূর্বক পরীক্ষামাত্রই পরীক্ষক নিজে সংশয়কে পূর্বোক্ত হেতুর দ্বারা প্রতিবেশ করিবেন না, কিন্তু প্রতিবাদী পূর্বোক্তরূপে সংশয়ের খণ্ডন করিতে গেলে পূর্বোক্ত হেতুর দ্বারা তাহার সমাধান করিয়া, সংশয় সমর্গনপূর্বক বস্তু পরীক্ষা করিবেন, ইহাই মহাবির হৃদয়<sup>১</sup>।

সংশয়পরীক্ষা-প্রকরণ সমাপ্ত। ১।

ভাষ্য। অথ প্রমাণপরীক্ষা

অনুবাদ। অনন্তর প্রমাণপরীক্ষা—অর্থাৎ সংশয়পরীক্ষার পরে অবসরতঃ উদ্দেশ্যের ক্রমানুসারে মহাবির প্রমাণ পরীক্ষা করিয়াছেন।

সূত্র। প্রত্যক্ষাদীনামপ্রামাণ্যং ত্রৈকাল্য-

সিদ্ধেঃ ॥৮॥৩৯॥

অনুবাদ। (পূর্বপক্ষ) ত্রৈকাল্যসিদ্ধিবশতঃ প্রত্যক্ষ প্রভৃতির প্রামাণ্য নাই। [অর্থাৎ প্রত্যক্ষ প্রভৃতি যে চারিটিকে প্রমাণ বলা হইয়াছে, তাহারা প্রমাণ হইতে পারে না। কারণ, তাহারা কালত্রেয় অর্থাৎ কোন কালেই পদার্থ প্রতিপাদন করে না।]

ভাষ্য। প্রত্যক্ষাদীনাং প্রমাণত্বং নাস্তি, ত্রৈকাল্যাসিদ্ধেঃ, পূর্বাপর-সহভাবানুপপত্তেরিতি।<sup>১</sup>

অনুবাদ। প্রত্যক্ষ প্রভৃতির প্রামাণ্য নাই, যেহেতু (উহাদিগের) ত্রৈকাল্যসিদ্ধি আছে (অর্থাৎ) পূর্বভাব, অপরভাব ও সহভাবের উপপত্তি নাই।

টিপ্পনী। মহাবির গৌতম প্রমাণ পদার্থেরই সর্বাগ্রে উদ্দেশ্য করিয়াছেন। উদ্দেশ্যক্রমানুসারে পরীক্ষা-প্রকরণে সর্বাগ্রে প্রমাণ পদার্থেরই পরীক্ষা করা কর্তব্য। কিন্তু পরীক্ষামাত্রই সংশয়পূর্বক বলিয়া অর্থাৎ ক্রমানুসারে সর্বাগ্রে সংশয় পরীক্ষাই করিয়াছেন। সংশয় পরীক্ষা হইয়াছে, এখন আর উদ্দেশ্য ক্রমের কোন বাবক নাই, তাই অবসর সংগতিতে এখন উদ্দেশ্যক্রমানুসারেই প্রেমের প্রকৃতি পদার্থ পরীক্ষার পূর্বে প্রমাণ পরীক্ষা করিতেছেন। তাহার মধ্যেও প্রথমে প্রমাণ-সামান্য-লক্ষণ পরীক্ষা করিতেছেন। কারণ, প্রমাণের বিশেষ লক্ষণগুলি তাহার সামান্য লক্ষণপূর্বক। সামান্য লক্ষণ না বুঝিলে বিশেষ লক্ষণ বুঝা যায় না। প্রমাণ অর্থাৎ বস্তু অহুভূতির সাংঘন্যই

১। সংশয়পূর্বকত্বং সর্বপরীক্ষাণ্যঃ পরিচিক্ষিব্যবশ্যং সংশয় আক্ষেপপ্রভৃতির প্রতিবেশকঃ,—অপি তু পরৈবেবাসিদ্ধঃ সংশয় উৎকঃ সমাধানহেতুঃ সমাধেয়ঃ ।—ভাষ্যপরীক্ষা।

প্রমাণের সামান্য লক্ষণ স্মৃতিত হইয়াছে এবং প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, শব্দ, এই চারিটি নামে চারিটি বিশেষ প্রমাণ বলা হইয়াছে। যদি ঐ চারিটিতে পূর্বোক্ত প্রমাণাদিরূপ প্রমাণের সামান্য লক্ষণ না থাকে, তাহা হইলে উহাদিগকে প্রমাণ বলা যাইতে পারে না। উহাদিগের প্রামাণ্য না থাকিলে প্রমাণ বলিয়া কোন পদার্থও আর থাকিতে পারে না। কারণ, ঐ চারিটিকেই প্রমাণ বলা হইয়াছে। প্রমাণের সম্বন্ধে পরীক্ষণীয় কি, এই প্রশ্নোত্তরে উদ্যোতকর বলিয়াছেন যে, প্রথমে সম্ভবই পরীক্ষণীয়। তাহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, প্রমাণের সম্ভব অর্থাৎ প্রমাণ আছে কি না, ইহাই প্রথমে পরীক্ষণীয়। সংশয় ব্যতীত বিচার-সাধ্য পরীক্ষা হইতে পারে না, এ জন্ত উদ্যোতকর এখানে বলিয়াছেন যে, সম্ভবপার্থ ও অসম্ভবপার্থের সমান ধর্ম যে প্রমেয়দ্ব, তাহা প্রমাণে আছে। প্রমাণে ঐ সমান ধর্ম-জ্ঞান হইতেছে, কোন বিশেষ দর্শন হইতেছে না, সুতরাং প্রমাণ সম্ভব অথবা অসম্ভব, এইরূপ সংশয় হইতেছে। মহর্ষি প্রমাণ পরীক্ষার জন্ত প্রথমে পূর্বোক্ত সংশয় বিবরণ দ্বিতীয় পক্ষকে গ্রহণ করিয়াই অর্থাৎ প্রমাণ অসম্ভব, প্রত্যক্ষাদি যে চারিটিকে প্রমাণ বলা হইয়াছে, তাহাদিগের প্রামাণ্য নাই, এই পক্ষ অবলম্বন করিয়াই পূর্বপক্ষ প্রকাশ করিয়াছেন। প্রমাণ নাই অর্থাৎ প্রত্যক্ষাদির প্রামাণ্য নাই, ইহাই মহর্ষির পূর্বপক্ষ। প্রমাণ আছে অর্থাৎ প্রত্যক্ষাদির প্রামাণ্য আছে, ইহাই তাহার উত্তর-পক্ষ। তাৎপর্যটীকাকার বাচস্পতি মিশ্র এই পূর্বপক্ষকে শূন্যবাদী বৌদ্ধ মাধ্যমিকের সিদ্ধান্তরূপ পূর্বপক্ষ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি এখানে মাধ্যমিকের অভিলক্ষি বর্ণন করিয়াছেন যে, যদিও প্রমাণ নামে কোন পদার্থ বস্ত্তঃ নাই, তাহা হইলেও লোকে বাহ্যদিককে প্রমাণ বলে, সেগুলি বিচারসহ নহে, ইহা প্রমাণেরই অপরূপ, আমার অপরূপ নহে। লোকসিদ্ধ প্রমাণগুলি যখন কাগজরূপে পদার্থ প্রতিপাদন করে না, তখন তাহাদিগকে প্রমাণ বলিয়া ব্যবহার করা যায় না, ইহাই মাধ্যমিকের তাৎপর্য<sup>১</sup>। মাধ্যমিক পরে বাহ্য বলিয়াছেন, মহর্ষি গোতম বহু কাল পূর্বেই সেই পূর্বপক্ষের উদ্ভাবন ও সমর্থন করিয়া তাহার খণ্ডনের দ্বারা প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের প্রামাণ্য সমর্থন করিয়া গিয়াছেন, ইহাই বাচস্পতি মিশ্রের অভিলক্ষি। মহর্ষি প্রত্যক্ষাদির প্রামাণ্য নাই, এই পূর্বপক্ষ সাধনে হেতু বলিয়াছেন “ত্ৰৈকাল্যাসিদ্ধি”। “ত্ৰৈকাল্য” বলিতে কালত্রয়বর্তিতা। ত্ৰৈকাল্যের অসিদ্ধি কি না কালত্রয়বর্তিতার অভাব। ভাব্যকার ইহার ব্যাখ্যা বলিয়াছেন, “পূর্বাগম সহজাবের অস্বপপত্তি।” পূর্বভাব, অপরভাব এবং সহজাব, এই তিনটিকেই এক কথায় বলা হইয়াছে “পূর্বাগম-সহজাব”। প্রমাণে প্রমেয়ের পূর্বভাব অর্থাৎ পূর্বকালবর্তিতা নাই এবং অপরভাব অর্থাৎ উত্তরকালবর্তিতা নাই এবং সহজাব অর্থাৎ সমকালবর্তিতা নাই, ইহাই প্রমাণের পূর্বাগমসহজাবাস্বপপত্তি। ইহাকেই বলা হইয়াছে, প্রমাণের “ত্ৰৈকাল্যাসিদ্ধি”। ফলকথা, প্রমাণ প্রমেয়ের পূর্বকালে থাকে না এবং উত্তরকালে থাকে না এবং সমকালেও থাকে না অর্থাৎ ঐ কালত্রয়েই প্রমেয় সাধন করে না, এ জন্ত তাহার প্রামাণ্য নাই। মহর্ষি ইহার পরেই তিন সূত্রের দ্বারা পূর্বোক্ত “ত্ৰৈকাল্যাসিদ্ধি” ব্যুৎপাদন করিয়াছেন। ৮।

১। প্রত্যক্ষাদিগে ন প্রমাণের বাবহর্ষবাঃ কাগজরূপার্থপ্রতিপাদকবাঃ। ফলকথা ন তৎ প্রমাণেই বাবহর্ষবাঃ, ইহাঃ শব্দ-বিধাঃ তথা চৈতৎ তস্মাত্ত্বমিতি।—তাৎপর্যটীকা।



ভাষ্য । অস্ত সামান্ত্যবচনস্তার্থবিভাগঃ ।

অনুবাদ । এই সামান্ত্যবাক্যের অর্থবিভাগ করিতেছেন [ অর্থাৎ মহর্ষি পূর্বের যে “শ্রুতকাল্যাসিদ্ধিহেতুক প্রত্যক্ষাদির প্রামাণ্য নাই” এই সামান্ত্য বাক্যটি বলিয়াছেন, এখন তিন সূত্রের দ্বারা বিশেষ করিয়া তাহার অর্থ বুঝাইতেছেন । ]

সূত্র । পূর্বং হি প্রমাণসিদ্ধৌ নেন্দ্রিয়ার্থসম্বন্ধকর্ষাৎ  
প্রত্যক্ষোৎপত্তিঃ ॥৯॥৭০॥

অনুবাদ । যেহেতু পূর্বের প্রমাণসিদ্ধি হইলে অর্থাৎ প্রমের পদার্থের পূর্বের যদি প্রমাণের উৎপত্তি হয়, তাহা হইলে, ইন্দ্রিয় ও বিষয়ের সম্বন্ধকর্ষহেতুক প্রত্যক্ষের উৎপত্তি হয় না ।

ভাষ্য । গন্ধাদিবিষয়ঃ জ্ঞানং প্রত্যক্ষং, তদ্বদি পূর্বং, পশ্চাদ্গন্ধা-  
দীনাং সিদ্ধিঃ, নেদং গন্ধাদিসম্বন্ধকর্ষাৎপদ্যত ইতি ।

অনুবাদ । গন্ধাদি-বিষয়ক জ্ঞান প্রত্যক্ষ, সেই গন্ধাদি প্রত্যক্ষ যদি পূর্বের অর্থাৎ গন্ধাদির পূর্বের হয়, পরে গন্ধাদির সিদ্ধি হয়, ( তাহা হইলে ) এই গন্ধাদি প্রত্যক্ষ গন্ধাদি বিষয়ের সহিত সম্বন্ধকর্ষ হেতুক উৎপন্ন হয় না [ অর্থাৎ যদি গন্ধাদি প্রত্যক্ষের পূর্বের গন্ধাদি বিষয় না থাকে, তাহা হইলে গন্ধাদি বিষয়ের সহিত জ্ঞানাদি ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ-বিশেষ হেতুক গন্ধাদির প্রত্যক্ষ জন্মে, এই কথা বলা যায় না, তাহা হইলে প্রত্যক্ষ-লক্ষণ-সূত্রে বাহ্য বলা হইয়াছে, তাহা ব্যাহত হয় । ]

টিপ্পনী । পূর্বোক্ত পূর্বপক্ষ-সূত্রের দ্বারা সামান্ত্যতঃ বলা হইয়াছে যে, বাহ্যদিকে প্রমাণ বলা হইয়াছে, সেই প্রত্যক্ষাদি যখন প্রমের পূর্বকাল, উত্তরকাল, সমকাল, ইহার কোন কালেই থাকে না অর্থাৎ উহার কোন কালে থাকিরাই প্রমের সিদ্ধি করে না, তখন তাহাদিগের প্রামাণ্য নাই । এখন মহর্ষি তাহার পূর্বোক্ত সামান্ত্য বাক্যকে বিশেষ করিয়া বুঝাইবার জন্ত প্রমাণ, প্রমের পূর্বকালে কেন থাকে না, ইহাই প্রথমে এই সূত্রের দ্বারা বলিয়াছেন । মহর্ষি বলিয়াছেন যে, যেহেতু প্রমের পূর্বের প্রমাণের সিদ্ধি হইলে ইন্দ্রিয় ও বিষয়ের সম্বন্ধকর্ষ হেতুক প্রত্যক্ষের উৎপত্তি হয় না, অতএব প্রমাণে প্রমের পূর্বকালবর্তিতা স্বীকার করা যায় না । মহর্ষির গূঢ় তাৎপর্য্য এই যে, গন্ধাদি বিষয়ের সহিত জ্ঞানাদি ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধকর্ষ হেতুক প্রত্যক্ষ উৎপন্ন হয়, একথা প্রত্যক্ষ-লক্ষণ সূত্রে বলা হইয়াছে । এখন যদি বলা যায় যে, গন্ধাদি প্রত্যক্ষের পরেই গন্ধাদি বিষয়ের সিদ্ধি হয় অর্থাৎ গন্ধাদিরূপ যে প্রমের, তাহার পূর্বেরই যদি তাহার প্রত্যক্ষ জন্মে, তাহা হইলে ঐ প্রত্যক্ষ গন্ধাদি বিষয়ের সহিত জ্ঞানাদি ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধকর্ষ-জন্ম হয় না । কারণ, যে গন্ধাদি বিষয়ের সহিত জ্ঞানাদি

ইঞ্জিরের সন্নিবর্ষ হইবে, সেই গন্ধাদি বিষয় তাহার প্রত্যক্ষের পূর্বে ছিল না, ইহাই বলা হইয়াছে। তাহা হইলে প্রত্যক্ষলক্ষণ-সূত্রে যে ইঞ্জির ও বিষয়ের সন্নিবর্ষ হেতুক প্রত্যক্ষ জন্মে বলা হইয়াছে, তাহা ব্যাহত হয়। কিন্তু ইঞ্জির ও বিষয়ের সন্নিবর্ষ হেতুক যে লৌকিক প্রত্যক্ষ জন্মে, এই সূত্রের অপলাপ হইতে পারে না। সুতরাং বলিতে হইবে যে, গন্ধাদি-প্রত্যক্ষের পূর্বেও গন্ধাদি বিষয় থাকে এবং তাহার সহিত জ্ঞাপাদির সন্নিবর্ষ-জন্মই তাহার প্রত্যক্ষ জন্মে। তাহা হইলে প্রমেয়ের পূর্বেই প্রমাণ থাকে, পরে প্রমের সিদ্ধি হয়, এ কথা আর বলা যায় না। গন্ধাদি-বিষয়ক প্রত্যক্ষের পূর্বে গন্ধাদি বিষয় না থাকিলে তাহার সহিত জ্ঞাপাদি ইঞ্জিরের সন্নিবর্ষ হইতে না পারায়, তাহার প্রত্যক্ষই তখন হইতে পারে না। সুতরাং প্রমাণে প্রমের বিষয়ের পূর্বকালবর্হিতা থাকা কোন মতেই সম্ভব হয় না। ভাষ্যকার এখানে মহর্ষি-সূত্রার্থ বর্ণন করিতে প্রত্যক্ষ জ্ঞানরূপ প্রমাণই গ্রহণ করিয়াছেন। তাৎপর্যটীকাकारও এখানে ঐরূপ তাৎপর্য বর্ণন করিয়াছেন<sup>১</sup>। ইঞ্জির অথবা ইঞ্জিয়ার্গ-সন্নিবর্ষরূপ প্রমাণকে গ্রহণ করিয়াও পূর্বেকালরূপে পূর্বপক্ষ ব্যাখ্যা করিতে হইবে। কারণ, গন্ধাদিবিষয়রূপ প্রমের পূর্বে না থাকিলে তাহার সহিত পূর্বে ইঞ্জির-সন্নিবর্ষ থাকাও অসম্ভব। ইঞ্জির পূর্বে থাকিলেও বিষয় পূর্বে না থাকিলে তাহার সহিত ইঞ্জিরের সন্নিবর্ষ হইতে না পারায় পূর্ববর্তী ঐ ইঞ্জিরও তখন প্রমাণরূপে থাকে না। কারণ, বিষয়ের সহিত সন্নিবৃত্ত ইঞ্জিরই প্রমাণ-পদব্যাচ্য হইয়া থাকে।

পরবর্তী নব্য টীকাकारগণ প্রমার পূর্বে প্রমাণ থাকে না, এইরূপেই সূত্রার্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। প্রমাণজন্ম যে স্বার্থ অসুভূতি জন্মে, তাহাকে বলে “প্রমা”। সেই প্রমা না হওয়া পর্যন্ত তাহার সাধনকে প্রমাণ বলা যায় না, ইহাই তাহাদিগের মূল তাৎপর্য। ভাষ্যকার কিন্তু প্রমেয়ের পূর্বে প্রমাণ থাকে না, প্রমাণ প্রমেয়ের পূর্বকালীন হইতে পারে না, এইরূপই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কারণ, পরবর্তী সূত্রে “প্রমাণ হইতে প্রমেয় সিদ্ধি হয় না” এইরূপ কথাই আছে। প্রমাণে প্রমেয়ের পূর্বাগর সহভাব উপপন্ন হয় না, ইহাই পূর্বপক্ষ-সূত্রে মহর্ষির কথা বলিয়া ভাষ্যকার বুঝিয়াছেন। পরবর্তী সূত্রে ইহা পরিস্ফুট হইবে।

ভাষ্যকার এখানে কেবল প্রত্যক্ষ প্রমাণের প্রমেয়পূর্বকালবর্হিতা থাকিতে পারে না, এই ব্যাখ্যা করিলেও, এই প্রশানীতে অহুমানাদি প্রমাণত্রয়েরও প্রমেয়পূর্বকালপূর্ববর্হিতা সম্ভব নহে, ইহাও তাৎপর্য বলিয়া বুঝিতে হইবে। মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা তাহাও সূচিত করিয়াছেন। তবে মহর্ষি স্পষ্ট ভাষায় এখানে প্রত্যক্ষমাত্রের কথা বলায় ভাষ্যকারও কেবল প্রত্যক্ষকে অবলম্বন করিয়াই সূত্রার্থ বর্ণন করিয়াছেন। বৃত্তিকার বিঘ্ননাথ প্রভৃতি নব্যগণ সূত্রার্থ ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন যে, প্রমার পূর্বে প্রমাণ সিদ্ধি হইলে অর্থাৎ প্রমাণ থাকিলে ইঞ্জিয়ার্গ-সন্নিবর্ষহেতুক অর্থাৎ ইঞ্জিয়ার্গ-সন্নিবর্ষ প্রভৃতি হেতুক প্রত্যক্ষের উৎপত্তি হয় না অর্থাৎ প্রত্যক্ষ প্রভৃতি প্রমিতির উৎপত্তি হয় না। এই সূত্রে “প্রমাণসিদ্ধৌ” এই হলে সামান্ততঃ সকল প্রমাণবোধক “প্রমাণ” শব্দ আছে

১। জ্ঞানঃ হি প্রমাণঃ, তৎসংস্পৃশ্যঃ প্রমেয়মিতি চ শব্দ ইতি চ ভবতি। তৎসংস্পৃশ্যঃ পূর্বে প্রমেয়বর্হিতত্ব-পনাতঃ, তস্মৈ প্রমাণাৎ পূর্বা নানাবর্ধ ইতি ইঞ্জিয়ার্গত্যানিহনব্যাখ্যাতঃ।—তাৎপর্যটীকা।



বলিয়াই তাঁহার ঐরূপ সূত্রার্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এবং প্রমাণমাত্রের ত্রৈকাল্যসিদ্ধি ব্যাখ্যানই মহাবির কৰ্ত্তব্য; সুতরাং মহাবি এই সূত্রে প্রমাণ শব্দের দ্বারা সকল প্রমাণ ও প্রত্যক্ষ শব্দের দ্বারা প্রত্যক্ষাদি প্রমিত্তি গ্রহণ করিয়াছেন, ইহাই বৃত্তিকার প্রকৃতির ধারণা হইয়াছিল। কিন্তু ভাষ্যকার এই সূত্রে কেবল “প্রত্যক্ষ” শব্দ দেখিয়া বৃত্তিকার প্রকৃতির জ্ঞায় ব্যাখ্যা না করিলেও তাঁহার মতে প্রত্যক্ষ প্রমাণে যেমন প্রমেয়ের পূর্বকালবর্তিতা নাই, তদ্রূপ অনুমানাদি প্রমাণেও ঐরূপে প্রমেয়ের পূর্বকালবর্তিতা নাই, ইহা বুঝিতে হইবে। মহাবি কেবল প্রত্যক্ষ প্রমাণে প্রমের পূর্বকাল-বর্তিতা থাকিতে পারে না, ইহা বলিয়া অস্ত্রের প্রমাণেও উহা থাকিতে পারে না, ইহা সূচনা করিয়া গিয়াছেন, মতান্তররূপে বৃত্তিকারও এই ভাবের কথা বলিয়াছেন। ২।

## সূত্র। পশ্চাৎ সিদ্ধৌ ন প্রমাণেভ্যঃ প্রমেয়- সিদ্ধিঃ ॥১০॥৭১॥

অনুবাদ। পশ্চাৎ সিদ্ধি হইলে অর্থাৎ প্রমেয়ের পরে প্রমাণের উৎপত্তি হইলে প্রমাণ হইতে প্রমেয়সিদ্ধি হয় না [ অর্থাৎ প্রমেয়ের পূর্বের প্রমাণ না থাকিলে প্রমাণ হইতে প্রমেয়সিদ্ধি হয়, এ কথা বলা যায় না। তাহা পূর্বের নাই, তাহা হইতে পরে প্রমেয়সিদ্ধি হইবে কিরূপে ? ]

ভাষ্য। অসতি প্রমাণে কেন প্রমীয়মাণোহর্থঃ প্রমেয়ঃ স্মাৎ।  
প্রমাণেন খলু প্রমীয়মাণোহর্থঃ প্রমেয়মিত্যেতৎ সিদ্ধান্তি।

অনুবাদ। প্রমাণ না থাকিলে অর্থাৎ প্রমেয়ের পূর্বের প্রমাণ না থাকিলে পদার্থ কাহার দ্বারা প্রমীয়মাণ হইয়া (যথার্থরূপে অনুভূয়মান হইয়া) প্রমেয় হইবে? পদার্থ প্রমাণের দ্বারাই প্রমীয়মাণ হইয়া “ইহা প্রমেয়” এইরূপে সিদ্ধ (জ্ঞাত) হয় [ অর্থাৎ প্রমাণের দ্বারা অনুভূয়মান হইলেই সেই পদার্থ প্রমেয়রূপে সিদ্ধ হয়। যদি সেই পদার্থের পূর্বের প্রমাণ না থাকে, তাহার পরেই প্রমাণসিদ্ধি হয়, তাহা হইলে আর উহা প্রমেয়রূপে সিদ্ধ হইতে পারে না। উহাকে আর প্রমেয় বলিয়া বুঝা যায় না। ]

টীকণী। প্রমেয়ের পূর্বে প্রমাণ সিদ্ধি হইতে পারে না কেন, তাহা পূর্বসূত্রে বলা হইয়াছে। এখন এই সূত্রের দ্বারা প্রমেয়ের পরে প্রমাণ সিদ্ধি হইতে পারে না কেন, তাহা বলা হইতেছে। তাৎপর্য্য এই যে, যদি প্রমেয়ের পরে প্রমাণ সিদ্ধি হয়, তাহা হইলে প্রমেয়ের পূর্বে প্রমাণ থাকে না, ইহা স্বীকার করা হইল, তাহা হইলে আর প্রমাণ হইতে প্রমেয়সিদ্ধি হইতে পারিল না। প্রমাণ যদি প্রমেয়ের পূর্বে না থাকিয়া পরেই থাকিল, তাহা হইলে উহা প্রমেয়ের সাক্ষক হইবে কিরূপে, উহা হইলে প্রমেয়সিদ্ধি হয়, এ কথা বলা যায় কিরূপে? আপত্তি হইতে পারে যে, প্রমের বিরয়টি

প্রমাণের পূর্বেই আছে ; কারণ, তাহা প্রমাণের অধীন নহে, তদ্বিষয়ে প্রমাজ্ঞানই প্রমাণের অধীন । ঐ প্রমাজ্ঞানের পূর্বে প্রমাণ না থাকিলে উহা জন্মিতে পারে না, সুতরাং প্রমাণকে ঐ প্রমাজ্ঞানের পরকালবর্তী বলিলে, প্রমাণ হইতে প্রমাজ্ঞানের সিদ্ধি হইতে পারে না, এই কথাই বলা সম্ভব । প্রমাণ হইতে প্রমেয়সিদ্ধি হইতে পারে না, এ কথা বলা যায় না । তাৎপর্য্যটীকাকার এই আশঙ্কির হুচনা করিয়া বলিয়াছেন যে, যদিও প্রমেয়বস্তুর স্বরূপ প্রমাণের অধীন নহে, তাহা হইলেও ঐ বস্তুর প্রমেয় স্বরূপ প্রমাণের অধীন ; সেই প্রমেয়ত্বও যদি প্রমাণের পূর্বে থাকে, তাহা হইলে উহা আর প্রমাণের অধীন হয় না' । তাৎপর্য্য এই যে, প্রমাণের দ্বারা প্রমীয়মাণ হইলে তখন 'সেই বস্তুকে প্রমেয় বলে । পূর্বে প্রমাণ না থাকিলে তখন সেই বস্তু প্রমীয়মাণ না হওয়ায়, তখন তাহাকে প্রমেয় বলা যায় না । প্রমাজ্ঞানবিষয়কই প্রমেয়ত্ব । প্রমাণ ব্যতীত যখন প্রমাজ্ঞান জন্মিতে পারে না, তখন প্রমাণের পূর্বসিদ্ধ বস্তু পূর্বে প্রমাজ্ঞানের বিষয় না হওয়ায় পূর্বে প্রমেয় সংজ্ঞা লাভ করে না এবং তখন তাহার প্রমেয়ত্বও থাকে না । উদ্যোতকরও এই তাৎপর্য্য বলিয়াছেন যে, প্রমেয় সংজ্ঞা প্রমাণনিমিত্তক । পূর্বে প্রমাণ না থাকিলে তখন বস্তুর প্রমেয় সংজ্ঞা হইতে পারে না । ভাষ্যকারও পরে এই কথা-প্রসঙ্গে প্রমেয়সংজ্ঞার কথাই বলিয়াছেন । ফলকথা এই যে, প্রমেয় বস্তুর স্বরূপ প্রমাণের পূর্বে সিদ্ধ থাকিলেও উহা প্রমেয় নামে প্রমেয়স্বরূপে পূর্বে সিদ্ধ থাকে না । কারণ, প্রমাণই বস্তুকে ঐ ভাবে সিদ্ধ করে । অতএব প্রমাণ প্রমেয়ের পরকালবর্তী হইলে অর্থাৎ প্রমেয়ের পূর্বে না থাকিলে, প্রমাণ হইতে প্রমেয় সিদ্ধি হয় না, এই কথা বলা অসম্ভব হয় নাই । প্রমাণ পূর্বে না থাকিলে তাহা হইতে প্রমেয়স্বরূপে প্রমেয় সিদ্ধি হয় না, ইহাই ঐ কথার তাৎপর্য্য । তাহা হইলে প্রমাণ হইতে প্রমাজ্ঞানের সিদ্ধি হয় না, এই কথাই ফলন্তঃ বলা হইয়াছে । ভাষ্যকার মহর্ষির এই সূত্রে প্রমাণ হইতে প্রমেয়সিদ্ধি হয় না, এইরূপ কথা থাকায় প্রমাণ ও প্রমেয়ের পূর্বাধার সহজাবের অল্পপত্তিই ব্যাখ্যা করিয়াছেন ; নব্য টীকাকারগণের দ্বারা প্রমাজ্ঞান ও প্রমাণের পূর্বাধার সহজাবের অল্পপত্তির ব্যাখ্যা করেন নাই । ১০ ।

## সূত্র । যুগপৎ সিদ্ধৌ প্রত্যর্থনিয়তত্বাৎ ক্রম- বৃত্তিত্বাভাবো বুদ্ধীনাম্ ॥ ১১ ॥ ৭২ ॥

অনুবাদ । যুগপৎ সিদ্ধি হইলে অর্থাৎ একই সময়ে প্রমাণ ও প্রমেয়ের সিদ্ধি হইলে জ্ঞানগুলির প্রতিবিষয়ে নিয়তবশতঃ ক্রমবৃত্তিও থাকে না । [ অর্থাৎ যদি বলা যায় যে, প্রমাণ প্রমেয়ের পূর্বকালীনও নহে, উত্তরকালীনও নহে, কিন্তু সমকালীন, তাহা হইলে প্রতিবিষয়ে জ্ঞানগুলি একই সময়ে হইতে পারে, উহারে যে ক্রমশঃ উৎপন্ন হয়, এই সিদ্ধান্ত ব্যাহত হইয়া যায় । ]

১০. বদাপি স্বরূপঃ ন প্রমাণাধীনঃ তদাপি তন্ত প্রমেয়ত্বং তদধীনঃ তদপি তৎ প্রমাণাৎ পূর্বা ন প্রমাণযোগ-  
নিবন্ধনঃ প্রতীতিত্বাৎ । — তাৎপর্য্যটীকা ।



ভাব্য। যদি প্রমাণং প্রমেয়ক যুগপদভবতঃ, এবমপি গন্ধাদি-  
বিস্ত্রিয়ার্থেষ্ণু জ্ঞানানি প্রত্যর্থনিয়তানি যুগপৎ সম্ভবন্তীতি। জ্ঞানানাং  
প্রত্যর্থনিয়তত্বাৎ ক্রমবৃদ্ধিস্থাভাবঃ। যা ইমা বুদ্ধয়ঃ ক্রমেণার্থেষ্ণু বর্তন্তে  
তাসাং ক্রমবৃদ্ধিঃ ন সম্ভবতীতি। ব্যাঘাতশ্চ “যুগপজ্ঞানানু-  
পত্তির্মনসো লিঙ্গ”মিতি।

এতাবাংশ্চ প্রমাণপ্রমেয়য়োঃ সদ্ভাববিষয়ঃ, স চানুপপন্ন ইতি, তস্যাৎ  
প্রত্যক্ষাদীনাং প্রমাণত্বং ন সম্ভবতীতি।

অনুবাদ। যদি প্রমাণ ও প্রমেয় যুগপৎ অর্থাৎ একই সময়ে হয়, এইরূপ  
হইলেও গন্ধ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ার্থ বিষয়ে প্রত্যর্থনিয়ত অর্থাৎ প্রতিবিষয়ে নিয়ত জ্ঞানগুলি  
একই সময়ে সম্ভব হয়। জ্ঞানগুলির প্রত্যর্থনিয়তবশতঃ অর্থাৎ জ্ঞানগুলি প্রতি-  
বিষয়ে নিয়ত আছে বলিয়া তাহাদিগের ক্রমবৃদ্ধি (ক্রমিকত্ব) থাকে না।  
(বিশদার্থ) এই যে, জ্ঞানগুলি ক্রমশঃ বিষয়সমূহে জন্মিতেছে, তাহাদিগের ক্রম-  
বৃদ্ধি সম্ভব হয় না। অর্থাৎ গন্ধাদি-বিষয়ক জ্ঞানগুলি সকলে একই সময়ে জন্মে  
না, উহারা ক্রমে ক্রমেই জন্মে, ইহা অনুভবসিদ্ধ। কিন্তু প্রমাণ ও প্রমেয় যদি একই  
সময়ে জন্মে, তাহা হইলে ঐ জ্ঞানগুলিও একই সময়ে জন্মে বলিতে হয়। তাহা  
হইলে উহাদিগের ক্রমিকত্ব বাহা দৃষ্ট, সেই দৃষ্ট ব্যাঘাত হইয়া পড়ে] এবং  
“একই সময়ে অনেক জ্ঞানের উৎপত্তি না হওয়া মনের লিঙ্গ” এই কথারও ব্যাঘাত  
হইয়া পড়ে [ অর্থাৎ একই সময়ে অনেক জ্ঞান উৎপন্ন হইতে পারে, ইহা স্বীকার  
করিলে যুগপৎ অনেক জ্ঞানের উৎপত্তি হয় না, এই কথা যে সূত্রে বলা  
হইয়াছে, সেই সূত্রের ব্যাঘাত হইয়া পড়ে। ]

এই পর্য্যন্তই প্রমাণ ও প্রমেয়ের সম্ভাবের বিষয় [ অর্থাৎ পূর্বকাল, উত্তরকাল  
এবং সমকাল, এই কালত্রয়ই প্রমাণ ও প্রমেয়ের থাকিবার স্থান, ইহা ভিন্ন আর কোন  
কাল নাই, সুতরাং আর কোন কালে প্রমাণ ও প্রমেয় থাকার সম্ভাবনাই নাই। ]  
সেই কালত্রয়ই অনুপপন্ন, অর্থাৎ প্রমাণ প্রমেয়ের পূর্বকাল, উত্তরকাল ও সমকাল,  
ইহার কোন কালেই থাকিতে পারে না, অতএব প্রত্যক্ষ প্রভৃতির প্রমাণত্ব সম্ভব  
হয় না।

টিপ্পনী। প্রমাণ প্রমেয়ের পূর্বকালেও থাকে না, উত্তরকালেও থাকে না, ইহা পূর্বোক্ত হই  
সূত্রের দ্বারা বুঝান হইয়াছে। এখন এই সূত্রের দ্বারা প্রমাণ ও প্রমেয়ের সমকালবর্তিতা বলিলে যে-

সেই হয়, তাহা বলিয়া উহাদিগের সমকালবর্তিতা বশুণ করিতেছেন। গন্ধ প্রভৃতি পদার্থগুলিকে “ইন্দ্রিয়গোচর” বলা হইয়াছে। বাগাদি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ক্রমশঃ ঐ গন্ধাদির প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। একই সময়ে গন্ধ প্রত্যক্ষ এবং রূপাদির প্রত্যক্ষ হয় না, ইহা নিশ্চয়। মহর্ষি গোতম এই জন্তই মনকে অতি সূক্ষ্ম বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। ইন্দ্রিয়-জ্ঞান প্রত্যক্ষে ইন্দ্রিয়ের সহিত মনের সংযোগ আবশ্যক। মন অতি সূক্ষ্ম বলিয়াই যখন প্রাণেন্দ্রিয়ের সংযুক্ত থাকে, তখন চক্ষুরাদি কোন ইন্দ্রিয়ারে সংযুক্ত থাকিতে পারে না। সুতরাং প্রাণেন্দ্রিয়ের দ্বারা গন্ধ-প্রত্যক্ষকালে চক্ষুরাদির দ্বারা রূপাদির চাক্ষুষ প্রভৃতি কোন প্রত্যক্ষ জন্মিতে পারে না। প্রাণেন্দ্রিয়ের মন প্রাণেন্দ্রিয় হইতে চক্ষুরাদি কোন ইন্দ্রিয়ারে যাইয়া সংযুক্ত হইলে, তখন চাক্ষুষ প্রভৃতি কোন প্রত্যক্ষ জন্মে। তাহা হইলে গন্ধাদি প্রত্যক্ষরূপ জ্ঞানগুলি একই সময়ে জন্মে না। উহার কালবিলাসে ক্রমশঃই জন্মে, ইহাই নিশ্চয় হইল। প্রমাণ ও প্রমের সমকালবর্তী হইলে ঐ জ্ঞানগুলির বোগপদ্য হইয়া পড়ে, উহাদিগের ক্রমিকত্ব থাকে না। অর্থাৎ উহার একই সময়ে উৎপন্ন হইলে উহাদিগের ক্রমবৃত্তি-নিশ্চয় থাকে না। উহাদিগের ক্রমবৃত্তিই নষ্ট বা অসুভবসিদ্ধ, তাহা না থাকিলে দৃষ্ট-ব্যাঘাত-দোষ হয়, ইহাই এখানে মহর্ষির মূল বক্তব্য। প্রমাণ ও প্রমের সমকালবর্তী হইলে জ্ঞানগুলির ক্রমবৃত্তি থাকে না কেন? মহর্ষি ইহার হেতু বলিয়াছেন—“প্রত্যগনিবৃত্ত”। জ্ঞানগুলি গন্ধাদি প্রত্যেক বিষয়ে নিবৃত্ত অর্থাৎ নিরমবদ্ধ হইয়া থাকিলেই জ্ঞানগুলিকে “প্রত্যগনিবৃত্ত” বলা যায়। মহর্ষির গূঢ় তাৎপর্য এই যে, যদি প্রমাণের সমকালেই প্রমের থাকে, তাহা হইলে সেখানে গন্ধ পদার্থে প্রাণেন্দ্রিয়ের সন্নিবিষ্ট আছে এবং রূপপদার্থেও চক্ষুেন্দ্রিয়ের সন্নিবিষ্ট আছে, সেখানে গন্ধগ্রাহক প্রমাণ ও রূপগ্রাহক প্রমাণ থাকায়, তাহার সমকালে গন্ধ ও রূপ প্রমের হইয়াই আছে। তাহা হইলে সেই একই সময়ে গন্ধবিষয়ক প্রত্যক্ষ জ্ঞান এবং রূপবিষয়ক প্রত্যক্ষ জ্ঞান, এই দুই জ্ঞানই আছে বলিতে হইবে। কারণ, প্রমাণ-জ্ঞান যে জ্ঞান অর্থাৎ প্রমা, তাহার বিষয় না হইলে কোন বস্তুই প্রমের-পদব্যাচ্য হইতে পারে না; প্রমার বিষয় না হওয়া পর্য্যন্ত বস্তুর প্রমের বা প্রমের সংজ্ঞা হইতে পারে না। যদি প্রমাণের সমকালেই প্রমের থাকে, তাহা হইলে তখন তদ্বিষয়ে প্রমা-জ্ঞানও থাকে বলিতে হইবে। গন্ধাদি প্রত্যেক বস্তুর প্রমাণ উপস্থিত হইলে, তৎকালেই যদি ঐ গন্ধাদি প্রমের-পদব্যাচ্য হইয়া সেখানে থাকে, তাহা হইলে ঐ গন্ধাদি প্রত্যেক বিষয়ে তখন তাহার প্রমা-জ্ঞানগুলি আছেই বলিতে হইবে। তাহা হইলে ঐ জ্ঞানগুলিকে প্রত্যগনিবৃত্ত বলিতে হইল। বাহ্য প্রমাণের সমকালে প্রতিবিষয়ে আছেই, তাহা “প্রত্যগনিবৃত্ত”। তাহা হইলে গন্ধাদি-প্রত্যক্ষের বোগপদ্য স্বীকার করিতে হইল। প্রমাণের সমকালেই যখন উহাদিগের সত্য জানিতে হইল, মতে প্রমাণ-সমকালে প্রমেরের সত্য জানা যায় না, তখন উহাদিগের ক্রমিকত্ব-নিশ্চয় বস্তু হইল না। ঐ নিশ্চয়ের অপলাপ করিলে প্রথমাদ্যে যে, “সুগমজ্ঞান-সুগমনির্ভরনো সিদ্ধং” ( ১৬ ছন্দ ) এই সত্যটি বলা হইয়াছে, তাহার ব্যাঘাত হইল। ঐ সত্যে একই সময়ে অনেক জ্ঞানের উৎপত্তি না হওয়াই মনের লিঙ্গ বলা হইয়াছে। একই সময়ে অনেক জ্ঞান হয় না, এই নিশ্চয় বাক্য জন্তই মনকে অতি সূক্ষ্ম বলা হইয়াছে। একই সময়ে অনেক



জ্ঞান না হওয়াই তাৎপ্য অতি সূক্ষ্ম মনের সাধক। এখন একই সময়ে অনেক জ্ঞানের উৎপত্তি স্বীকার করিলে পূর্বোক্ত এই সূত্রটিও ব্যাহত হইয়া যায়।

ভাষ্যকার যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে এই ভাব ভিন্ন আর কোন ভাব বুঝা যায় না। অত্র ভাবে ভাষ্যকারের কথা প্রকৃত হলে সম্ভব বলিয়া বুঝা যায় না। উদ্যোতকর বলিয়াছেন যে, গন্ধাদি ইন্দ্রিয়গণগুলি এবং তাহাদিগের জ্ঞানগুলি উপস্থিত হইলে জ্ঞানের যৌগপদ্য হয়, সুতরাং জ্ঞানগুলির ক্রমবৃত্তিও যাহা দৃষ্ট, তাহার ব্যাখ্যাত হয়। উদ্যোতকরও পূর্বোক্ত তাৎপর্য্যে এই কথা বলিয়াছেন, বুঝিতে হয়। নচেৎ জ্ঞানগুলির যৌগপদ্যের আপত্তি হইবে কিরূপে? এই আপত্তি সম্বন্ধে কল্পিতে হইলে পূর্বোক্ত ভাবেই কল্পিতে হইবে।

বৃত্তিকার বিধনাৎ প্রকৃতি নব্যগণ এই সূত্রোক্ত আপত্তি সম্বন্ধে কল্পিত করিবার জন্য অস্বাভাবিক ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বৃত্তিকার বলিয়াছেন যে, জ্ঞানগুলি অর্গবিশেষনিয়ত অর্থাৎ জ্ঞানের বিষয় ভিন্ন ভিন্ন পরাধিকারক। সুতরাং জ্ঞানের যৌগপদ্য নাই, ক্রমবৃত্তিই আছে। প্রমাণ ও প্রমাণ যদি একই কালে থাকে, তাহা হইলে জ্ঞানের এই ক্রমবৃত্তি থাকে না। যেমন পরজ্ঞানরূপ প্রমাণ শব্দ-বিষয়ক প্রত্যক্ষ, তৎকাল শব্দবোধরূপ প্রমাজ্ঞান পরাধিকার-বিষয়ক এবং পরোক্ষ। এই বিভাজ্য প্রমাণ ও প্রমাজ্ঞান জ্ঞানদ্বয়ের যৌগপদ্য সম্ভব হয় না। কারণের পরেই কার্য্য হইয়া থাকে, সুতরাং পরজ্ঞানের পরেই শব্দবোধ হইবে। এইরূপ ব্যাপ্তিজ্ঞান প্রকৃতি প্রমাণ ও অস্বাভাবিক প্রকৃতি প্রমাণেও এইরূপ যৌগপদ্যের আপত্তি বুঝিতে হইবে। এই প্রমাণ ও প্রমাজ্ঞান জ্ঞানদ্বয়ের কার্য্য-কারণতাব্যবহার কখনই উদাহরণের যৌগপদ্য সম্ভব হয় না। প্রমাণ ও প্রমার সমকালবৃত্তিতা স্বীকার করিলে উদাহরণের যৌগপদ্যের আপত্তি হয়, ক্রমবৃত্তি থাকে না। বৃত্তিকার এই সূত্র এবং ইহার পূর্বসূত্রটিকে অস্বাভাবিক প্রমাণ-স্থলেই সংগত বলিয়াছেন। বৃত্তিকারের ব্যাখ্যায় সূত্রোক্ত প্রত্যগনিয়ত এই হেতু জ্ঞানের ক্রমবৃত্তিদের সাধক, ক্রমবৃত্তিস্বাভাবের সাধক নহে। মহর্ষি-সূত্রের দ্বারা সরলভাবে কিছ্র এই হেতুকে ক্রমবৃত্তিস্বাভাবেরই সাধকরূপে বুঝা যায়। পরন্তু বৃত্তিকার সূত্রোক্ত “প্রত্যগনিয়ত” শব্দের দ্বারা যে অর্থের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাও সরলভাবে বুঝা যায় না। এবং বৃত্তিকারোক্ত অর্গবিশেষ-নিয়তত্বমাত্র জ্ঞানের ক্রমবৃত্তিদের সাধক হয় কিরূপে, ইহাও চিন্তনীয়। এবং বৃত্তিকারের ব্যাখ্যাসূত্রের মহর্ষি প্রমাণ-সামান্য-পরীক্ষার প্রণালীক প্রত্যক্ষ প্রমাণ তাগ করিয়া, অস্বাভাবিক স্থলেই পূর্বোক্ত দুইটি পূর্বপক্ষ-দ্বয় বলিলে, তাহার ন্যূনতা হয় কি না, ইহাও চিন্তনীয়। সুদীপন এ সব কথা চিন্তা করিবেন।

ভাষ্যকার এখানে কেবল প্রত্যক্ষ হলে পূর্বপক্ষ ব্যাখ্যা করিলেও, ইহার দ্বারা এই ভাবে অস্বাভাবিক হলেও পূর্বপক্ষ ব্যাখ্যাত হইয়াছে। কারণ, অস্বাভাবিক প্রকৃতি জ্ঞানেরও যৌগপদ্য জ্ঞানতত্ত্ববিশেষ সম্ভব নহে। একই সময়ে কোন প্রকার জ্ঞানদ্বয়ই জ্ঞান না। অস্বাভাবিক প্রমাণ ও তাহার প্রমাজ্ঞান সমকালবৃত্তি বলিলে, যেখানে অস্বাভাবিক প্রমাণ আছে, সেখানে তৎকালেই তাহার প্রমাজ্ঞান আছে, সুতরাং অস্বাভাবিক প্রকৃতি প্রমাজ্ঞানও তৎকালে আছে, ইহা বলিতে হইবে, নচেৎ তখন প্রমাজ্ঞান থাকিতে পারে না। প্রমা জ্ঞানের বিষয় না হইলে তাহা প্রমাজ্ঞান-পদব্যাচ

হয় না। তাহা হইলে অল্পমানাদি প্রমাণরূপ বে-কোন জাতীয় জ্ঞান এবং, তজ্জন্ত অহমিতি প্রভৃতি প্রমাজ্ঞান, এই উভয় জ্ঞানের যোগপদ্য হইয়া পড়ে। তাহা হইলে উহাদিগের জন্মবৃত্তি-সিদ্ধান্ত থাকে না। ফলতঃ ভাব্যকারের ব্যাখ্যাহুসারে প্রমাণনাত্রেই এই হুত্রোক্ত আপত্তি সম্ভব হয়। ভাব্যকার প্রমাণ ও প্রমেয়ের সমকালবর্ত্তিতা-পক্ষ ধরিয়াই হুত্রার্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কেন করিয়াছেন, তাহা পূর্কহুত্রে বলা হইয়াছে। বৃত্তিকার প্রভৃতি নব্যগণ প্রমাণ ও প্রমা-জ্ঞানের সমকালবর্ত্তিতা-পক্ষ ধরিয়া হুত্রার্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

বৃত্তিকার শেষে বলিয়াছেন যে, কেহ কেহ এই হুত্রের ব্যাখ্যা করেন,—প্রমাণ ও প্রমেয়ের যুগপৎ সিদ্ধি অর্থাৎ একই সময়ে জ্ঞান হয় না। কারণ, তাহা হইলে জ্ঞানগুলির অধ্বিশেষ-নিষত্ববশতঃ বে জন্মবৃত্তি আছে, তাহা থাকে না। যেমন ঘট-প্রত্যক্ষে চক্ষুঃ প্রমাণ, ঘট প্রমেয়। ঐ চক্ষুরূপ প্রমাণের জ্ঞান এবং ঘটের জ্ঞান একই সময়ে হইতে পারে না। কারণ, চক্ষুর জ্ঞান অহমিতি, ঘটের জ্ঞান প্রত্যক্ষ, অহমিতি ও প্রত্যক্ষের যোগপদ্য সম্ভব হয় না। এই ব্যাখ্যায় হুত্র “সিদ্ধি” শব্দের অর্থ জ্ঞান। এই ব্যাখ্যায় বক্তব্য এই যে, প্রমাণ ও প্রমেয়ের যুগপৎ জ্ঞান হয় না, এ কথা এখানে অন্যবশ্যক। প্রমাণের ত্রৈকাল্যানিদ্ধি বুঝাইতেই মহর্ষি এই হুত্রের দ্বারা প্রমাণ ও প্রমেয়ের সমকালবর্ত্তিতাই বণ্ডন করিয়াছেন। বৃত্তিকার প্রভৃতি এ ব্যাখ্যা গ্রহণ করেন নাই।

ভাব্যকার হুত্রের ব্যাখ্যা করিয়া উপসংহারে বলিয়াছেন যে, প্রমাণ, প্রমেয়ের পূর্ককাল, উত্তরকাল এবং সমকাল, এই কালত্রয়েই বণ্ডন থাকে না, অর্থাৎ ঐ কালত্রয়ের কোন কালেই বণ্ডন পদার্থ প্রতিপাদন করে না, আর কোন কালও নাই, যেখানে থাকিয়া পদার্থ প্রতিপাদন করিবে, হুত্রাং প্রমাণের প্রামাণ্য সম্ভব হয় না, প্রমাণ নামে কোন পদার্থ বক্তব্য নাই, উহা অলীক, ইহাই পূর্কপক্ষ।

ভাষ্য। অস্ম সমাধিঃ। উপলক্ষিহেতোরূপলক্ষিবিসয়স্য চার্খস্য পূর্বাপরসহভাবানিয়মাদ্যবাদর্শনং বিভাগবচনম্।

কচিছুপলক্ষিহেতুঃ পূর্কঃ, পশ্চাছুপলক্ষিবিসয়ঃ, যথাদিত্য প্রকাশ উৎপদ্যমানানাম্। কচিৎ পূর্কযুপলক্ষিবিসয়ঃ পশ্চাছুপলক্ষিহেতুঃ, যথাহবস্থিতানাম্ প্রদীপঃ। কচিছুপলক্ষিহেতুরূপলক্ষিবিসয়শ্চ সহ ভবতঃ, যথা ধূমেনাগ্নেগ্রহণমিতি। উপলক্ষিহেতুশ্চ প্রমাণং প্রমেয়যুপলক্ষি-বিসয়ঃ। এবং প্রমাণপ্রমেয়য়োঃ পূর্কপারসহভাবোহনিয়তে যথাহর্খো দৃশ্যতে তথা বিভজ্য বচনীয় ইতি। তত্রৈকাস্থেন প্রতিবেদানুপপত্তিঃ সামান্যেন খলু বিভজ্য প্রতিবেদ উক্ত ইতি।



অনুবাদ। এই পূর্বপক্ষের সমাধি অর্থাৎ সমাধান ( বলিতেছি )।

উপলক্ষির হেতু এবং উপলক্ষির বিষয় পদার্থের অর্থাৎ প্রমাণ ও প্রমেয়ের পূর্বাপর সহভাবের নিয়ম না থাকায় যে রূপ দেখা যায়, তদনুসারে বিভাগ করিয়া ( বিশেষ করিয়া ) বলিতে হইবে। বিশদার্থ এই যে, কোন স্থলে উপলক্ষির হেতু পূর্বে থাকে, উপলক্ষির বিষয় পরে থাকে, যেমন জায়মান পদার্থের সম্বন্ধে সূর্য্যের প্রকাশ। কোন স্থলে উপলক্ষির বিষয় পূর্বে থাকে, উপলক্ষির হেতু পরে থাকে, যেমন অবস্থিত পদার্থের সম্বন্ধে প্রদীপ। কোন স্থলে উপলক্ষির হেতু এবং উপলক্ষির বিষয় মিলিত হইয়া অর্থাৎ এক সময়েই থাকে, যেমন ধূমের দ্বারা অগ্নির জ্ঞান হয়। উপলক্ষির হেতুই প্রমাণ, উপলক্ষির বিষয় কিন্তু প্রমেয়। প্রমাণ ও প্রমেয়ের পূর্বাপর সহভাব এই প্রকার অনিয়ত হইলে, অর্থাৎ সামান্ততঃ প্রমাণ-মাত্রই প্রমেয়ের পূর্বকালবর্তী অথবা উত্তরকালবর্তী অথবা সমকালবর্তী, এইরূপ নিয়ম না থাকায় অর্ধেক অর্থাৎ প্রমেয়কে যে প্রকার দেখা যাইবে, সেই প্রকারে বিভাগ করিয়া ( বিশেষ করিয়া ) বলিতে হইবে [ অর্থাৎ যেখানে প্রমেয় প্রমাণের পরকালবর্তী, সেখানে তাহাই বলিতে হইবে; যেখানে পূর্বকালবর্তী, সেখানে তাহাই বলিতে হইবে; যেখানে সমকালবর্তী, সেখানে তাহাই বলিতে হইবে। যে প্রমেয়-পদার্থকে যে রূপ দেখা যাইবে, পৃথক করিয়া তাহাকে সেইরূপই বলিতে হইবে, সামান্ততঃ প্রমেয়মাত্রকে প্রমাণের পূর্বকালবর্তী অথবা উত্তরকালবর্তী অথবা সমকালবর্তী বলা যাইবে না, কারণ, ঐরূপ কোন নিয়ম নাই ] তাহা হইলে একান্ততঃ প্রতিষেধের উপপত্তি হয় না, সামান্তের দ্বারাই অর্থাৎ সামান্ততঃ প্রমেয় পদার্থকে অবলম্বন করিয়াই ( পূর্বপক্ষনুত্রে ) বিশেষ করিয়া প্রতিষেধ বলা হইয়াছে, [ অর্থাৎ কোন প্রমেয় যখন কোন স্থলে প্রমাণের পরকালবর্তী হয়, কোন প্রমেয় প্রমাণের পূর্বকালবর্তী হয়, আবার কোন প্রমেয় কোনও স্থলে প্রমাণের সমকালবর্তীও হয়, তখন একান্তই যে প্রমেয়ে প্রমাণের পূর্বকালবর্তিতা নাই এবং উত্তরকালবর্তিতা নাই এবং সমকালবর্তিতা নাই, এইরূপ নিষেধ করা যায় না। প্রমেয়-সামান্তকে অবলম্বন করিয়া বিভাগপূর্বক অর্থাৎ তাহাতে প্রমাণের উত্তরকালবর্তিতা নাই, পূর্বকালবর্তিতা নাই এবং সমকালবর্তিতা নাই, এইরূপে যে নিষেধ করা হইয়াছে, তাহা উপপন্ন হয় না। ]

তিলনী। মহাবি প্রমাণ-সামান্ত পরীক্ষার অত্র প্রথমে যে পূর্বপক্ষ বদধন করিয়াছেন, পরে তাহার সমাধান করিয়াছেন। ভাব্যকার এখানেই মহাবি-সুচিত সমাধানের বিশদ বর্ণন করিয়া,

তাহার ব্যাখ্যাত পূৰ্বপক্ষের নিরাস করিতেছেন। ভাস্ক্যকারের কথাই তাৎপর্য্য এই যে, প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের অপ্রামাণ্য সাধন করিতে যে ত্রৈকাল্যাসিদ্ধি হেতু বলা হইয়াছে, তাহা প্রমাণে নাই, উহা অসিদ্ধ, সুতরাং হেতুভ্রান্ত, হেতুভ্রান্তের দ্বারা সাধ্য সাধন করা যায় না। ত্রৈকাল্যাসিদ্ধি প্রমাণে নাই কেন? ইহা বুঝাইতে ভাস্ক্যকার বলিয়াছেন যে, প্রমাণ উপলব্ধির সাধন, প্রমের উপলব্ধির বিষয়। উপলব্ধির সাধন এবং উপলব্ধির বিষয় পদার্থের পূৰ্ব্বাপর সহভাবের নিয়ম নাই। অর্থাৎ কোন স্থলে উপলব্ধির সাধন পদার্থ পূৰ্ব্ববর্তী হইয়াও পরজাত পদার্থের উপলব্ধি সাধন করে; যেমন স্বর্ঘ্যের আলোক তাহার পরজাত পদার্থের উপলব্ধির সাধন হইতেছে। কোন স্থলে উপলব্ধির সাধন পদার্থ তাহার পূৰ্ব্ব হইতেই অবস্থিত পদার্থের উপলব্ধি সাধন করে। যেমন প্রদীপ তাহার পূৰ্ব্ব হইতেই অবস্থিত বস্তুদি পদার্থের উপলব্ধির সাধন হইতেছে। এবং কোন স্থলে উপলব্ধির সাধন-পদার্থ তাহার সমকালীন পদার্থের উপলব্ধি সাধন করে। যেমন জায়মান ঘুম তাহার সমকালীন অগ্নির উপলব্ধির সাধন হইতেছে। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, উপলব্ধির সাধন-পদার্থ যে উপলব্ধির বিষয়-পদার্থের পূৰ্ব্বকালবর্তীই হয়, অথবা উত্তরকালবর্তীই হয়, অথবা সমকালবর্তীই হয়, এমন কোন নিয়ম নাই। যেখানে যেমন দেখা যায়, তদনুসারে বিশেষ করিয়াই উহাদিগের পূৰ্ব্বাপর সহভাব বলিতে হইবে। তাহা হইলে উপলব্ধির সাধন-পদার্থে যে উপলব্ধির বিষয়-পদার্থের পূৰ্ব্বকালীনত্ব অথবা উত্তরকালীনত্ব, অথবা সমকালীনত্ব, ইহার কোনটি কুত্রাপি একান্তই নাই, ইহা বলা গেল না। সুতরাং উপলব্ধির সাধন প্রমাণ-পদার্থেও উপলব্ধির বিষয় প্রমের-পদার্থের পূৰ্ব্বকালীনত্বাদির ঐকান্তিক নিবেদন বলা যায় না। বলবিশেষে প্রমাণে প্রমের পূৰ্ব্বকালীনত্বাদি থাকিলে, সামান্ততঃ প্রমাণ ও প্রমের দ্বিবিধ ত্রৈকাল্যাসিদ্ধি বলা যায় না। পূৰ্ব্বপক্ষী সামান্ততঃ প্রমের পদার্থকে অবলম্বন করিয়া সামান্ততঃ প্রমাণ-পদার্থে প্রমের-সামান্ততঃ পূৰ্ব্বকালীনত্বাদি বিশেষ করিয়া নিবেদন করিয়াছেন, সুতরাং ঐ নিবেদন উপপন্ন হয় না। প্রমাণে প্রমের পূৰ্ব্বকালীনত্বাদির ঐকান্তিক নিবেদন করিতে না পারায় ত্রৈকাল্যাসিদ্ধি হেতু তাহাতে নাই, সুতরাং উহা অসিদ্ধ। স্মারবাস্তিকে উদ্যোতকর এখানে পূৰ্ব্বপক্ষীর অস্থানে স্বতন্ত্র-ভাবে কয়েকটি দোষ প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, প্রত্যক্ষ প্রভৃতি যদি পদার্থ সাধন না করে, তাহা হইলে দেখলিও অসিদ্ধ, তাহাদিগকে "প্রত্যক্ষ প্রভৃতি" বলিয়া গ্রহণ করাই যায় না। তাহাদিগকে পদার্থ-সাধক বলিয়া স্বীকার করিলে আর তাহাদিগের অপ্রামাণ্য বলা যায় না এবং প্রত্যক্ষাদির প্রামাণ্য নিবেদন করিলেও প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের স্বরূপ নিবেদন হয় না। ধর্মের নিবেদন হইলেও তাহার দ্বারা ধর্মী অলৌক হইতে পারে না। ধর্ম ও ধর্মীকে অভিন্ন বলিলে "প্রত্যক্ষানোং" এই স্থলে বস্তু বিভক্তির উপপত্তি হয় না এবং "প্রামাণ্য" এই স্থলে ভাবার্থে তদ্বিত প্রত্যয়েরও উপপত্তি হয় না। পূর্বোক্ত স্থলে বস্তু বিভক্তি এবং ভাবার্থ তদ্বিত প্রত্যয়ের দ্বারা প্রমাণ এবং তাহার ধর্ম ভিন্ন পদার্থ বলিয়াই সিদ্ধ হয় এবং প্রত্যক্ষাদির প্রামাণ্য নাই বলিলে অল্প প্রমাণ স্বীকৃত বলিয়া বুঝা যায়। অল্প প্রমাণ স্বীকার করিলে তাহাতে অপ্রামাণ্য না থাকায় ত্রৈকাল্যাসিদ্ধিকে অপ্রামাণ্যের সাধক বলা যায় না। অল্প প্রমাণ স্বীকার



না করিলে প্রত্যক্ষাদির অপ্রামাণ্য সাধন করা যায় না। কারণ, প্রমাণ ব্যতীত কিছুই সিদ্ধ হয় না এবং অল্প প্রমাণ না থাকিলে “প্রত্যক্ষাদীনাং” এই কথা নিরর্থক হয়। “প্রমাণ নাই” এইরূপ কথাই বলা উচিত হয় এবং ত্রৈকাল্যানিচ্ছি মে হেতু বলা হইয়াছে, তাহা প্রমাণে থাকে না। কারণ, ত্রিকালের ভাবই ত্রৈকাল্য, তাহার অসিদ্ধি প্রমাণে থাকিবে কেন? যদি বল, “ত্রৈকাল্যানিচ্ছি” শব্দের দ্বারা ভাবপর্যায় বৃদ্ধিতে হইবে—কালত্রেয়ে পদার্থের অপ্রতিপাদকত্ব, তাহাই হেতু, তাহা প্রমাণে আছে। তাহা হইলে হেতু ও সাধ্যার্থ একই হইয়া পড়িল। কারণ, বাহ্যকে কলে কালত্রেয়ে পদার্থের অপ্রতিপাদকত্ব, তাহাকেই বলে অপ্রামাণ্য। বাহ্যই সাধ্যবর্ষ, তাহাই হেতু হইতে পারে না, তাহাতে “সাধ্যাবিশেষ” দোষ হয়। ভাব্যকারের ব্যাঘাতেও “ত্রৈকাল্যানিচ্ছি” বলিতে কালত্রেয়ে পদার্থের অপ্রতিপাদকত্বই বৃদ্ধিতে হইবে। ভাব্যকার এখানে ঐ হেতু প্রমাণে নাই, উহা অসিদ্ধ, ইহাই দেখাইয়া গিয়াছেন।

ভাব্য। সমাখ্যাহেতোত্বৈকাল্যযোগাত্তথাভূতা সমাখ্যা। যৎ পুনরিদং পশ্চাৎ সিদ্ধাবসতি প্রমাণে প্রমেয়ং ন সিধ্যতি, প্রমাণেন প্রমীয়মাণোহর্থঃ প্রমেয়মিতি বিজ্ঞায়ত ইতি। প্রমাণমিত্যেতচ্ছাঃ সমাখ্যায়া উপলক্ষি-হেতুত্বং নিমিত্তং, তস্মৈ ত্রৈকাল্যযোগঃ। উপলক্ষি-মকার্যোং, উপলক্ষিঃ করোতি, উপলক্ষিঃ করিষ্যতীতি, সমাখ্যাহেতোত্বৈকাল্যযোগাৎ সমাখ্যা তথাভূতা। প্রমিতোহমেনার্থঃ প্রমীয়তে প্রমাস্ততে ইতি প্রমাণং। প্রমিতং প্রমীয়তে প্রমাস্ততে ইতি চ প্রমেয়ং। এবং সতি ভবিষ্যত্যাগ্নিন্ হেতুত উপলক্ষিঃ, প্রমাস্ততেহয়মর্থঃ প্রমেয়মিদমিত্যেতৎ সর্বং ভবতীতি। ত্রৈকাল্যানভ্যনুজ্ঞানে চ ব্যবহারানুপপত্তিঃ। যশ্চৈবং নাভ্যানুজ্ঞানীয়াৎ তস্মৈ পাচকমানয় পক্ষ্যতি, লাভকমানয় লবিষ্যতীতি ব্যবহারো নোপপদ্যত ইতি।

অনুবাদ। সমাখ্যার হেতুর ত্রৈকাল্য যোগবশতঃ অর্থাৎ “প্রমাণ” ও “প্রমেয়” এই সংজ্ঞার হেতু কালত্রেয়েই থাকে বলিয়া সেই প্রকার সংজ্ঞা (হইয়াছে)।

(বিশদার্থ) আর এই যে (পূর্ব্বপক্ষী বলিয়াছেন) পশ্চাৎ সিদ্ধি হইলে অর্থাৎ প্রমাণ প্রমেয়ের উত্তরকালবর্তী হইলে (পূর্ব্ব) প্রমাণ না থাকিলে “প্রমেয়” সিদ্ধ হয় না; প্রমাণের দ্বারা প্রমীয়মাণ হইয়া অর্থাৎ প্রমাজ্ঞানের বিষয় হইয়াই পদার্থ “প্রমেয়” এই নামে জ্ঞাত হয়। (এই পূর্ব্বপক্ষের উত্তর বলিতেছি)। “প্রমাণ” এই সংজ্ঞার নিমিত্ত অর্থাৎ হেতু উপলক্ষিহেতুত্ব, অর্থাৎ উপলক্ষির হেতু

বলিয়াই “প্রমাণ” বলা হয়। সেই উপলব্ধিহেতুবরূপ নিমিত্তের ত্রৈকাল্য সম্বন্ধ আছে। উপলব্ধি করিয়াছিল, উপলব্ধি করিতেছে, উপলব্ধি করিবে। [ অর্থাৎ উপলব্ধি জন্মাইয়াছে, উপলব্ধি জন্মাইতেছে, উপলব্ধি জন্মাইবে, এইরূপ প্রতীতিরবশতঃ বুঝা যায়, “প্রমাণ” এই সংজ্ঞার হেতু যে উপলব্ধিহেতুব, তাহা কালত্রয়েই থাকে ] সমাখ্যার হেতুর অর্থাৎ “প্রমাণ” এই সংজ্ঞার নিমিত্ত যে উপলব্ধি-হেতুব, তাহার ত্রৈকাল্যযোগ (কালত্রয়বস্তিতা) থাকায় সমাখ্যা সেই প্রকার হইয়াছে। (এখন পূর্বোক্ত প্রকারে “প্রমাণ” ও “প্রমেয়” এই সমাখ্যার ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন করিতেছেন)। ইহার দ্বারা পদার্থ প্রমিত (যথার্থ অনুভূতির বিষয়) হইয়াছে, প্রমিত হইতেছে, প্রমিত হইবে, এই অর্থে “প্রমাণ”। প্রমিত হইয়াছে, প্রমিত হইতেছে, প্রমিত হইবে, এই অর্থে “প্রমেয়” অর্থাৎ পূর্বোক্ত সকল অর্থেই “প্রমাণ” ও “প্রমেয়” এই সংজ্ঞা হইয়াছে। এই প্রকার হইলে— এই পদার্থ-বিষয়ে হেতুর দ্বারা উপলব্ধি হইবে, এই পদার্থ প্রমিত হইবে, ইহা প্রমেয়, এই সমস্ত হয় [ অর্থাৎ বাহ্য পরে প্রমাণবোধিত হইবে, তাহাও পূর্বোক্ত ব্যুৎপত্তিতে “প্রমেয়” নামে অভিহিত হইতে পারিলে, সেই পদার্থের সম্বন্ধে এতদ্বিষয়ে হেতুর দ্বারা উপলব্ধি হইবে, ইহা প্রমিত হইবে, ইহা প্রমেয়, এই সমস্ত কথাই বলা যায় ]।

ত্রৈকাল্য স্বীকার না করিলেও ব্যবহারের উপপত্তি হয় না। বিশদার্থ এই যে, যিনি এই প্রকার স্বীকার করেন না অর্থাৎ যিনি ত্রৈকালিক প্রমাণ-প্রমেয় ব্যবহার স্বীকার করেন না, তাহার “পাচককে আনয়ন কর, পাক করিবে, ছেদককে আনয়ন কর, ছেদন করিবে” ইত্যাদি ব্যবহার উপপন্ন হয় না, [ অর্থাৎ যে পরে পাক করিবে এবং যে পরে ছেদন করিবে, তাহাকে পূর্ববৈ পাচক ও ছেদক বলা যায় কিরূপে? যদি তাহা বলা যায়, তাহা হইলে বাহ্য পরে উপলব্ধি জন্মাইবে, তাহাকেও পূর্ব “প্রমাণ” বলা যায় এবং বাহ্য পরে প্রমিত হইবে, তাহাকেও পূর্ব “প্রমেয়” বলা যায়। ]

উত্তরী। ভাষ্যকার পূর্বোক্ত পূর্বপক্ষের উত্তরে বলিয়াছেন যে, প্রত্যক্ষাদির অপ্রামাণ্যসাধনে যে “ত্রৈকাল্যমিচ্ছিকি” হেতু বলা হইয়াছে, তাহা প্রত্যক্ষাদিতে নাই, তাহা অসিদ্ধ। কারণ, কোন প্রমাণ কোন স্থলে কোন প্রমেয়ের পূর্বকালবর্তী হয়, কোন প্রমাণ কোন স্থলে কোন প্রমেয়ের উত্তরকালবর্তী হয়, কোন প্রমাণ কোন স্থলে কোন প্রমেয়ের সমকালবর্তী হয়; সুতরাং সামান্যতঃ কোন প্রমাণই কোন প্রমেয়ের পূর্বকালীনবাদি কিছুই নাই, ইহা বলা যায় না।



এখন এই কথার পূর্বপক্ষীয় বক্তব্য এই যে, কোন প্রমাণ যদি প্রমের উত্তরকালবর্তী হয়, তাহা হইলে পূর্বে তাহাকে “প্রমাণ” বলা যায় কিরূপে ? এবং যে পদার্থ সেখানে পরে প্রমাণ-জ্ঞান প্রাপ্ত হইবে, তাহাকে পূর্বে “প্রমের” বলা যায় কিরূপে ? ঐরূপ হলে যখন “প্রমাণ” ও “প্রমের” এই সংজ্ঞাই বলা যায় না, তখন প্রমাণ প্রমের উত্তরকালবর্তীও হয়, এ কথা কখনই বলা যাইতে পারে না। ভাষ্যকার এতদ্বারা এখানে বলিয়াছেন যে, সংজ্ঞার হেতুটি কালক্রমে বর্তমান থাকে বলিয়া, ঐরূপ সংজ্ঞা সেখানেও হইতে পারে। ভাষ্যকার প্রথমে সংক্ষেপে এই মূল কথাটি বলিয়া পরে “নং পুনরিতং” ইত্যাদি ভাষ্যের দ্বারা পূর্বোক্ত শব্দ বর্ণন করতঃ তাহার উহরুটি বিশদরূপে বুঝাইয়াছেন। ভাষ্যকারের কথা এই যে, উপলব্ধির হেতু বলিয়াই তাহাকে “প্রমাণ” বলে। ঐ উপলব্ধি-হেতুকেই “প্রমাণ” এই সংজ্ঞার নিমিত্ত, তাহা কালক্রমেই থাকে ; সুতরাং কালক্রমেই “প্রমাণ” এই সংজ্ঞা হইতে পারে। যাহা উপলব্ধি জন্মাইয়াছিল, তাহাতে অতীত কালে অর্থাৎ পূর্বকালে উপলব্ধি-হেতু ছিল এবং যাহা উপলব্ধি জন্মাইতেছে, তাহাতে বর্তমান কালে অর্থাৎ উপলব্ধির সমকালে উপলব্ধি-হেতু আছে এবং যাহা উপলব্ধি জন্মাইবে, তাহাতে ভবিষ্যৎকালে অর্থাৎ উত্তরকালে উপলব্ধি-হেতু থাকিবে। তাহা হইলে যাহা প্রমাণজ্ঞান জন্মাইয়াছে, তাহাতেও পূর্বকালে উপলব্ধি-হেতু ছিল বলিয়া তাহাকেও “প্রমাণ” বলা যায়। এবং যাহা পরে প্রমাণজ্ঞান জন্মাইবে, তাহাতেও পরে উপলব্ধি-হেতু থাকিবে বলিয়া তাহাকেও “প্রমাণ” বলা যায়। কল কথা, যাহার দ্বারা পদার্থ প্রসিদ্ধ হইয়াছে, অথবা প্রসিদ্ধ হইতেছে, অথবা প্রসিদ্ধ হইবে, তাহা “প্রমাণ,” ইহাই “প্রমাণ” এই সংজ্ঞার ব্যুৎপত্তি। তাহা হইলে যেখানে প্রমাণ, প্রমের পরকালবর্তী হইয়া ভবিষ্যে প্রমাণজ্ঞান জন্মাইবে, সেখানেও পূর্বোক্ত ব্যুৎপত্তিতে তাহাকে “প্রমাণ” বলা যাইতে পারে। এবং যাহা প্রমাণের দ্বারা বোধিত হইয়াছে, অথবা প্রমাণের দ্বারা বোধিত হইতেছে, অথবা প্রমাণের দ্বারা বোধিত হইবে, তাহা “প্রমের,” ইহাই “প্রমের” এই সংজ্ঞার ব্যুৎপত্তি। তাহা হইলে পূর্বোক্ত স্থলে সেই পদার্থটি পরে প্রমাণের দ্বারা বোধিত হইবে বলিয়া পূর্বোক্ত ব্যুৎপত্তি অনুসারে পূর্বেও তাহাকে “প্রমের” বলা যাইতে পারে। ভাষ্যকার এখানে “প্রমাণ” ও “প্রমের” এই সংজ্ঞার প্রস্তুত ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন করিয়া পূর্বপক্ষীয় (দশন সূত্রোক্ত) পূর্বপক্ষ-বীজকে নিখূল করিয়া গিয়াছেন।

শেষে এই কথার সূত্র সমর্থনের জন্ত বলিয়াছেন যে, এই ত্রৈকালিক প্রমাণ-প্রমের ব্যবহার পূর্বপক্ষবাদীকেও স্বীকার করিতে হইবে। অর্থাৎ যাহা পরে প্রমাণজ্ঞান জন্মাইবে, তাহাতেও পূর্বে “প্রমাণ” শব্দের ব্যবহার এবং যাহা পরে প্রমাণ-জ্ঞান প্রাপ্ত হইবে, তাহাতেও পূর্বে “প্রমের” শব্দের ব্যবহার সকলেরই স্বীকার্য। যিনি ইহা স্বীকার করিবেন না, তিনি যে ব্যক্তি পরে পাক করিবে, তাহাতে “পাচক” শব্দের ব্যবহার করেন কিরূপে ? এবং যে ব্যক্তি পরে ছেদন করিবে, তাহাতে পূর্বে “ছেদক” শব্দের ব্যবহার করেন কিরূপে ? সুতরাং বলিতে হইবে যে, পাক বা ছেদন না করিলেও পাক বা ছেদনের যোগ্যতা আছে বলিয়াই পূর্বে পাচক ও ছেদক শব্দের ব্যবহার হইয়া থাকে। ঐরূপ প্রমাণজ্ঞান না জন্মাইলেও উহা জন্মাইবার যোগ্যতা পরিমিত

“প্রমাণ” শব্দের ব্যবহার হইয়া থাকে এবং প্রমাজ্ঞানের বিষয় না হইলেও প্রমাজ্ঞানের বিষয়তার যোগ্যতা ধরিয়াই “অমের” শব্দের ব্যবহার হইয়া থাকে।

ভাষ্য। “প্রত্যক্ষাদীনামপ্রামাণ্যং ত্রৈকাল্যাদিক্”রিত্যেবমাদি-  
বাক্যং প্রমাণ-প্রতিষেধঃ। তত্রায়ং প্রকৃত্যঃ,—অথানেন প্রতিষেধেন  
ভবতা কিং ক্রিয়ত ইতি, কিং সম্ভবো নিবর্ত্যতে? অথাসম্ভবো জ্ঞাপ্যত  
ইতি। তদ্যদি সম্ভবো নিবর্ত্যতে সতি সম্ভবে প্রত্যক্ষাদীনাম্ প্রতি-  
ষেধানুপপত্তিঃ। অথাসম্ভবো জ্ঞাপ্যতে প্রামাণলক্ষণং প্রাপ্তস্তর্হি  
প্রতিষেধঃ, প্রমাণাসম্ভবস্তোপলক্ষিহেতুত্বাদিতি।

অনুবাদ। “ত্রৈকাল্যাদিক্ হেতুক অর্থাৎ কালত্রয়েও পদার্থ সাধন করে না  
বলিয়া প্রত্যক্ষ প্রভৃতির প্রামাণ্য নাই” ইত্যাদি বাক্য প্রমাণের প্রতিষেধ। তদ্বিষয়ে  
এই প্রতিষেধকারীকে অর্থাৎ পূর্বোক্ত বাক্যবাদীকে প্রশ্ন করিব। এই প্রতিষেধের  
দ্বারা অর্থাৎ পূর্বোক্ত বাক্যের দ্বারা তুমি কি করিতেছ? কি সম্ভবকে অর্থাৎ  
প্রত্যক্ষাদির সত্যকে নিবৃত্ত করিতেছ? অথবা অসম্ভবকে অর্থাৎ প্রত্যক্ষাদিতে সিদ্ধ  
যে অসম্ভা, তাহাকে জ্ঞাপন করিতেছ? তদ্বোধে যদি সম্ভবকে নিবৃত্ত কর,  
(তাহা হইলে) সম্ভব থাকিলে অর্থাৎ প্রত্যক্ষাদির সত্য থাকিলে প্রত্যক্ষাদির  
প্রতিষেধের উপপত্তি হয় না। আর যদি অসম্ভবকে জ্ঞাপন কর, অর্থাৎ পূর্বোক্ত  
প্রতিষেধ যদি প্রত্যক্ষাদির অসম্ভব বা অসম্ভার জ্ঞাপক হয়, তাহা হইলে প্রতিষেধ  
অর্থাৎ পূর্বোক্ত ঐ প্রতিষেধ-বাক্য প্রামাণলক্ষণ প্রাপ্ত হইল অর্থাৎ উহা প্রমাণ  
বলিয়া স্বীকার করিতে হইল, যেহেতু (ঐ প্রতিষেধে) প্রমাণাসম্ভবের উপলক্ষি-  
হেতুত্ব আছে [ অর্থাৎ ঐ প্রতিষেধের দ্বারা যদি প্রমাণের অসম্ভার উপলক্ষি হয়, তাহা  
হইলে উহা প্রমাণই হইল। উপলক্ষির হেতু হইলেই তাহাকে প্রমাণ বলিতে হইবে।  
প্রমাণ স্বীকার করিতে হইলে আর পূর্বপক্ষবাদীর (শূন্যবাদীর) কথা টিকে না। ]

টীকানী। ভাষ্যকার শেষে এখানে প্রতিষেধ-বাক্যের প্রতিপাদ্য বিচারপূর্বক তাহার খণ্ডন  
করিয়া, পূর্বোক্ত পূর্বপক্ষের সর্বথা অস্থাপত্তি প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। ভাষ্যকার পূর্বপক্ষ-  
বাদীকে (পূর্বপক্ষ-স্বত্রটির উল্লেখ করিয়া) প্রশ্ন করিয়াছেন যে, প্রত্যক্ষাদির প্রামাণ্য নাই, এই  
কথার দ্বারা তুমি কি করিতেছ? তুমি কি উহার দ্বারা প্রত্যক্ষাদির সত্যকে নিবৃত্ত করিতেছ? অথবা  
উহার দ্বারা প্রত্যক্ষাদির অসম্ভাকে জ্ঞাপন করিতেছ? অর্থাৎ তোমার ঐ কথা কি প্রত্যক্ষাদির  
সম্ভাব নিবর্তক? অথবা প্রত্যক্ষাদির অসম্ভার জ্ঞাপক? যদি বল, ঐ বাক্যের দ্বারা আমি প্রত্যক্ষাদির



সত্তাকেই নিবৃত্ত কৰিতেছি, তাহা বলিতে পার না; কাৰণ, প্রত্যক্ষাদিৰ সত্তাকে নিবৃত্ত কৰিতে হইলে ঐ সত্তাকে স্বীকার কৰিতে হয়। তাহা অসং, তাহার কখনও নিবৃত্তি করা যায় না; যে ঘট নাই, তাহাকে কি মূলধৰ-প্রহারের দ্বারা নিবৃত্ত করা যায়? প্রত্যক্ষাদিৰ সত্তাকে নিবৃত্ত কৰিতে হইলে, তাহাকে মানিতে হইবে। তাহা হইলে ঐ কথা বলিতে বাধ্য প্রত্যক্ষাদি প্রমাণকে স্বীকার কৰাই হইল। আর যদি বল, প্রত্যক্ষাদি প্রমাণে যে অসত্তা সিদ্ধ আছে, তাহাকেই ঐ বাক্যের দ্বারা জ্ঞাপন কৰিতেছি। সেই অসত্তা সিদ্ধ পদার্থ, তাহা অসং নহে, সূতরাং তাহার জ্ঞাপন হইতে পারে। এই পক্ষে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, তাহা হইলেও তুমি প্রমাণ স্বীকার কৰিলে। কাৰণ, তোমার ঐ বাক্যই প্রমাণ-লক্ষণাক্রান্ত হইয়া পড়িল। উপলব্ধি-হেতুই প্রমাণের লক্ষণ। তোমার ঐ প্রতিবেদ-বাক্যকে যখন তুমিই প্রমাণের অদ্বৈত জ্ঞাপক অর্থাৎ উপলব্ধিহেতু বলিলে, তখন উহাকে তুমি প্রমাণ বলিয়া স্বীকার কৰিতে বাধ্য হইলে। তাহা হইলে প্রমাণের অদ্বৈত জ্ঞাপন কৰিতে বাধ্য যখন নিজ বাক্যকেই প্রমাণ বলিয়া স্বীকার কৰিতে হইল, তখন আর প্রমাণ নাই, এ কথা বলিতে পার না। ভাষ্যকারের হইটি প্রথমোক্ত প্রথমটির তাৎপৰ্য্য বুঝিতে হইবে, পূৰ্ব্বপক্ষবাদীৰ প্রমাণ-প্রতিবেদ-বাক্য কি প্রত্যক্ষাদিৰ অভাবের কারক? নিবৃত্তি বলিতে এখানে অভাব। প্রত্যক্ষাদিৰ সত্তার নিবৃত্তক অর্থাৎ প্রত্যক্ষাদিৰ অভাবের জনক। এ পক্ষে ঐ বাক্য প্রমাণ-লক্ষণাক্রান্ত হয় না। প্রত্যক্ষাদি থাকিলে তাহার অভাব কেহ কৰিতে পারে না। প্রতিবেদ-বাক্যের এমন সামর্থ্য নাই, যাহার দ্বারা তিনি বিদ্যমান পদার্থকে অবিদ্যমান কৰিয়া দিতে পারেন। প্রত্যক্ষাদি একেবারে অলৌক হইলেও তাহার অভাব করা যায় না। কেহ গগন-কুহলের অভাব কৰিতে পারে না, ইহাই প্রথম পক্ষে দোষ। প্রতিবেদ-বাক্যকে প্রত্যক্ষাদিৰ অভাবের জ্ঞাপক বলিলে, ঐ প্রতিবেদ-বাক্য প্রমাণ হইয়া পড়ে। ইহাই দ্বিতীয় পক্ষে দোষ ১১১।

ভাষ্য। কিঞ্চাতঃ—

সূত্র। ত্ৰৈকাল্যাসিদ্ধিঃ প্রতিষেধানুপপত্তিঃ ॥১২॥৭৩॥

অনুবাদ। অপি চ এই ত্ৰৈকাল্যাসিদ্ধিহেতুক অর্থাৎ যে ত্ৰৈকাল্যাসিদ্ধিহেতুক প্রত্যক্ষাদিৰ অপ্ৰামাণ্য সাধন করা হইতেছে, সেই ত্ৰৈকাল্যাসিদ্ধিহেতুক প্রতিষেধেরও (প্রত্যক্ষাদিৰ প্রতিষেধরূপ বাক্যেরও) অনুপপত্তি হয়।

ভাষ্য। অস্ত তু বিভাগঃ, পূৰ্ব্বং হি প্রতিষেধসিদ্ধাবলম্বিত প্রতিষেধে কিমনেন প্রতিবিধাতে? পশ্চাৎ সিদ্ধৌ প্রতিষেধ্যাসিদ্ধিঃ প্রতিষেধা-ভাবাদিতি। যুগপৎসিদ্ধৌ প্রতিষেধসিদ্ধ্যানুজ্ঞানাদনর্থকঃ প্রতিষেধ ইতি। প্রতিষেধলক্ষণে চ বাক্যোহনুপপদ্যমানে সিদ্ধং প্রত্যক্ষাদীনাং প্রামাণ্য-মিতি।

অনুবাদ। ইহার বিভাগ ( করিতেছি ) অর্থাৎ মহত্বের এই সামান্যবাক্যের অর্থ বিশেষ করিয়া বুঝাইতেছি। পূর্ববর্তী প্রতিষেধ সিদ্ধি হইলে অর্থাৎ প্রতিষেধ-বাক্য যদি প্রতিষেধ্য পদার্থের পূর্ববর্তী থাকে, তাহা হইলে, প্রতিষেধ্য পদার্থ ( পূর্ব ) না থাকিলে, এই প্রতিষেধ-বাক্যের দ্বারা কাহাকে প্রতিষেধ করা হইবে ? পশ্চাৎ সিদ্ধি হইলে অর্থাৎ প্রতিষেধ্য পদার্থের পরে যদি প্রতিষেধ-বাক্য থাকে, তাহা হইলে ( পূর্ব ) প্রতিষেধ-বাক্য না থাকায় প্রতিষেধ্য পদার্থের অসিদ্ধি হয়। যুগপৎ সিদ্ধি হইলে অর্থাৎ যদি প্রতিষেধ-বাক্য এবং প্রতিষেধ্য পদার্থ সমকালবর্তী হয়, একই সময়ে প্রতিষেধ-বাক্য ও তাহার প্রতিষেধ্য পদার্থ সিদ্ধ হয়, তাহা হইলে প্রতিষেধ্য সিদ্ধির স্বীকারবশতঃ—প্রতিষেধ-বাক্য নিরর্থক হয়। [ অর্থাৎ পূর্বপক্ষবাদীর “প্রত্যক্ষাদির প্রামাণ্য নাই” ইত্যাদি প্রতিষেধ-বাক্য তাহার প্রতিষেধ্য পদার্থের পূর্বকালবর্তী অথবা উত্তরকালবর্তী অথবা সমকালবর্তী হইতে না পারায়, উহাও কোন কালেই প্রতিষেধ্য সিদ্ধি করিতে পারে না। সুতরাং পূর্বপক্ষবাদীর ঐ বাক্যও ত্রৈকাল্যাসিদ্ধি-হেতুক অসামর্থ্য, ঐ প্রতিষেধ-বাক্যও পূর্বোক্ত প্রকারে উপপন্ন হয় না ] প্রতিষেধরূপ ( পূর্বোক্ত ) বাক্য উপপন্ন না হইলে প্রত্যক্ষাদির প্রামাণ্য সিদ্ধ হইল।

উত্তর। মহর্ষি প্রমাণ-পরীক্ষারস্তে পূর্বপক্ষ বলিয়াছেন যে, “তৈকাল্যাসিদ্ধি হেতুক প্রত্যক্ষাদির প্রামাণ্য নাই” অর্থাৎ প্রত্যক্ষাদি যখন কালত্রয়েও পদার্থ প্রতিপাদন করে না, তখন উহারা প্রমাণ হইতে পারে না। মহর্ষি তিন স্থলের দ্বারা প্রত্যক্ষাদির ঐ ত্রৈকাল্যাসিদ্ধি বুঝাইয়া, পূর্বোক্ত পূর্বপক্ষ দমর্জন করিয়া, এখন এই স্থলের দ্বারা ঐ পূর্বপক্ষের উত্তর বলিতেছেন। সিদ্ধান্তদমর্জন স্থল বলিয়া এই স্থলকে সিদ্ধান্ত-স্থলই বলিতে হইবে। “জ্ঞানতত্ত্বান্যোকে” বাচস্পতি মিশ্র এবং বৃত্তিকার বিশ্বনাথও তাহাই বলিয়াছেন। ভাষ্যকার “কিতাতঃ” এই কথায় যোগে এই স্থলের অবতারণা করিয়াছেন। ভাষ্যকারের “অতঃ” এই কথায় সহিত স্থলের প্রথমোক্ত “তৈকাল্যাসিদ্ধিঃ” এই কথায় যোজন্য বুঝিতে হইবে। “অতঃ তৈকাল্যাসিদ্ধিঃ” অর্থাৎ যে ত্রৈকাল্যাসিদ্ধি-হেতুক প্রত্যক্ষাদির প্রামাণ্য উপপন্ন হয় না বলিতেছে, সেই ত্রৈকাল্যাসিদ্ধি-হেতুক তোমার প্রতিষেধ-বাক্যও উপপন্ন হয় না, ইহাই ভাষ্যকারের বিবক্ষিত। ভাষ্যকার পূর্বস্থলভাষ্যের শেষে পূর্বোক্ত পূর্বপক্ষের মহর্ষি-সূচিত উত্তর-বিশেষের বর্ণন করিয়া, শেষে “কিঞ্চ” এই কথায় দ্বারা মহর্ষির এই স্থলোক্ত উত্তরোত্তর উপস্থিত করিয়াছেন। উদ্যোতকর এই স্থলোক্ত উত্তরের তাৎপর্য্য বর্ণনা করিয়াছেন যে, ত্রৈকাল্যাসিদ্ধি-হেতুক প্রত্যক্ষাদির প্রামাণ্য নাই, এই প্রতিষেধবাক্য বলিতে গেলে, পূর্বপক্ষবাদীর স্বকন্যাব্যবাহার হইয়া পড়ে। কারণ, যাহা কোন কালে পদার্থ সাধন করে না, তাহা অসামর্থ্য, এই কথা বলিলে প্রতিষেধবাক্যও অসামর্থ্য, ইহা নিজের কথায় দ্বারা স্বীকার করা হয়। কারণ, পূর্বপক্ষবাদীর ঐ প্রতিষেধ-বাক্যও কোন কালে প্রতিষেধ সাধন করে না। পূর্বোক্ত প্রকারে উহাতেও ত্রৈকাল্যাসিদ্ধি



আছে। ফলকথা, যে যুক্তিতে প্রত্যক্ষাদির প্রামাণ্য উপগম হয় না বলা হইতেছে, সেই যুক্তিতেই পূর্ণপক্ষবাদীর প্রতিবেদ-বাক্য অমূল্য হয় হইবে। প্রতিবেদ-বাক্যের অমূল্যপত্তি হইলে প্রত্যক্ষাদির প্রামাণ্য সিদ্ধই থাকিবে, উহাকে প্রতিবেদ করা যাইবে না। মূলকথা, মূলকথাকেই হেতুর দ্বারা সাধ্যানিদ্ধি করিতে হইবে; বিনা হেতুতে কেহই কিছু বলিতে পারিবেন না। এখন সেই হেতু যদি সাব্যস্ত পূর্বকাল, উত্তরকাল ও সমকাল, ইহার কোন কালেই থাকিরা সাধ্য সাধন করিতে না পারে, তাহা হইলে কুজাপি হেতুর দ্বারা কোন সাধ্যানিদ্ধি হইতে পারে না। যিনি এই কথা বলিয়া পূর্ণপক্ষ অবলম্বন করিবেন, তাঁহারও সাধ্যানিদ্ধি হয় না। সুতরাং পূর্ণপক্ষবাদীর এইরূপ কথা সহ্যের নহে, উহা “জাতি” নামক অসহ্যের। মহর্ষি পোতন জাতি নিরূপণ-প্রসঙ্গে উহাকে “অহেতুদন” নামক জাতি বলিয়া, উহার পূর্ণোক্তরূপ উত্তর বলিয়াছেন ( ৪অ., ১অ., ১৮/১৯/২০ হৃত্র দ্রষ্টব্য। )

ভাষ্যকার মহর্ষির এই সূত্রের বিভাগ করিয়াছেন। “বিভাগ” বলিতে সংক্ষিপ্ত নামান্তর বাক্যের অর্থ বিশেষ করিয়া ব্যাখ্যা করা; ইহার নান অর্থ-বিভাগ; চলিত কথায় তাহাকে বলে, ভাঙিয়া বুঝাইয়া দেওয়া। এই সূত্রে প্রতিবেদের অমূল্যপত্তি বলিতে যুক্তিতে হইবে—প্রতিবেদ-বাক্যের অমূল্যপত্তি। ভাষ্যকারের ব্যাখ্যার দ্বারাও তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়। যে বাক্যের দ্বারা প্রতিবেদ করা হয় অর্থাৎ কোন পদার্থের অস্তিত্ব জ্ঞাপন করা হয়, সেই বাক্যও এই অর্থে “প্রতিবেদ” বলা যায়। “ত্বেকাল্যানিদ্ধি-হেতুক প্রত্যক্ষাদির প্রামাণ্য নাই” এই বাক্যটি পূর্ণপক্ষবাদীর প্রতিবেদ-বাক্য। এই বাক্য দ্বারা প্রত্যক্ষাদিতে প্রামাণ্যের প্রতিবেদ করা হইয়াছে, তজ্জন্ত প্রামাণ্য উহার প্রতিবেদ্য। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, এই প্রতিবেদ-বাক্য তাহার প্রতিবেদ্য পদার্থের পূর্বকালবর্তী অথবা উত্তরকালবর্তী অথবা সমকালবর্তী? এই প্রতিবেদ-বাক্যটি কোন সময়ে সিদ্ধ থাকিরা তাহার প্রতিবেদ্য সিদ্ধি করিবে, অর্থাৎ প্রত্যক্ষাদির প্রামাণ্য নাই, ইহা প্রতিপন্ন করিবে? যদি এই প্রতিবেদ-বাক্যটি পূর্বেই সিদ্ধ থাকে, অর্থাৎ পূর্বেই যদি বলা হয় যে, প্রত্যক্ষাদির প্রামাণ্য নাই, তাহা হইলে এই বাক্যের প্রতিবেদ্য যে প্রামাণ্য, তাহা না থাকার, উহার দ্বারা কাহার প্রতিবেদ হইবে? বাহা নাই অর্থাৎ বাহা অলীক, তাহার কি প্রতিবেদ হইতে পারে? আর যদি বলা যায় যে, প্রত্যক্ষাদির প্রামাণ্য পূর্বে থাকে, পূর্বোক্ত প্রতিবেদ-বাক্যটি পশ্চাৎ সিদ্ধ হইয়া উহার প্রতিবেদ করে, তাহা হইলে প্রতিবেদ্য-সিদ্ধি হয় না অর্থাৎ প্রত্যক্ষাদির প্রামাণ্য যদি পূর্বনিদ্ধি থাকে, তাহা হইলে উহা প্রতিবেদ্য হইতে পারে না; বাহা স্বীকৃত পদার্থ, তাহাকে প্রতিবেদ্য বলা যাইতে পারে না। সুতরাং প্রত্যক্ষাদির প্রামাণ্য প্রতিষেধারণে সিদ্ধ হয় না অর্থাৎ প্রত্যক্ষাদির প্রামাণ্যকে পূর্বে মানিয়া লইয়া, পরে প্রত্যক্ষাদির প্রামাণ্য নাই, এই প্রতিবেদ-বাক্য বলা যায় না। পূর্বে যখন প্রতিবেদ-বাক্য নাই, তখন পূর্বে প্রত্যক্ষাদির প্রামাণ্যকে প্রতিবেদ্য বলা যায় না। আর যদি বলা যায় যে, প্রতিবেদ-বাক্য ও প্রতিবেদ্য পদার্থ এক সময়েই সিদ্ধ হয়, তাহা হইলে প্রতিবেদ্যসিদ্ধি প্রতিবেদ-বাক্যকে অপেক্ষা করে না, ইহা স্বীকার করা হয়। তাহা হইলে প্রতিবেদ্যসিদ্ধির জন্ত আর প্রতিবেদ-বাক্যের প্রয়োজন কি? প্রতিবেদ-বাক্য পূর্বে না থাকিলেও তাহার সমকালেই যখন প্রতিবেদ্যসিদ্ধি স্বীকার

করা হইল, তখন প্রতিবেদ-বাক্য নিরর্থক। এইরূপ প্রতিবেদ-বাক্যও দ্বৈতকাল্যাসিদ্ধি প্রদান করিয়া ভাষ্যকার শেষে বলিয়াছেন যে, পূর্ণগন্ধবাদীর পূর্বোক্ত প্রকারে প্রতিবেদ-বাক্যও যখন উপপন্ন হয় না, তখন প্রত্যক্ষাদির প্রামাণ্যের প্রতিবেদ হইতে পারে না, সুতরাং প্রত্যক্ষাদির প্রামাণ্য সিদ্ধই আছে। ভাষ্যকার এখানে কেবলপে প্রতিবেদ-বাক্যের দ্বৈতকাল্যাসিদ্ধি ব্যাখ্যা করিয়াছেন, উদ্যোতকর প্রতিতি কেহই তাহা ব্যক্ত করেন নাই। উদ্যোতকর নিজের এখানে পূর্ণগন্ধবাদের বিকল্পে অর্থাৎ উত্তরপক্ষে কতকগুলি কথা বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, প্রত্যক্ষাদি পদার্থ সাধন করে না, ইহা কি প্রত্যক্ষাদির সামর্থ্য প্রতিবেদ অথবা তাহার অস্তিত্বের প্রতিবেদ ? (১) প্রত্যক্ষাদির সামর্থ্য প্রতিবেদ হইলে প্রত্যক্ষাদির স্বরূপ নিবেদন হয় না, তাহা হইলে প্রত্যক্ষাদির স্বরূপ স্বীকার করিতেই হয়। (২) প্রত্যক্ষাদির অস্তিত্ব নিবেদন হইলে উহা বিশেষ নিবেদন অথবা বিশেষ-নিবেদন, তাহা বলিতে হয়। সামান্য-নিবেদন হইলে প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ নাই, এইরূপ বিশেষ-নিবেদন সম্ভব হয় না। সামান্যতঃ “প্রমাণ নাই” এইরূপ কথাই বলা উচিত। বিশেষ-নিবেদন হইলে অর্থাৎ প্রত্যক্ষাদির প্রামাণ্য নিবেদন হইলে, প্রামাণ্যত্বের স্বীকার আনিয়া পড়ে। কারণ, সামান্য স্বীকার না করিলে বিশেষ-নিবেদন হইতে পারে না। পরন্তু প্রত্যক্ষাদির প্রামাণ্য নাই, এই কথার দ্বারা একেবারে প্রামাণ্য পরাধাই নাই—উহা অলীক, ইহা বুঝা যায় না ; যাহা কুজাপি নাই—যাহা অলীক, তাহার অভাব বলা যায় না ; গৃহে ঘট নাই, বলিলে যেমন গট অন্তর আছে, কিন্তু গৃহে তাহার অভাব আছে, ইহাই বুঝা যায়, তদ্রূপ প্রত্যক্ষাদির প্রামাণ্য নাই, এই কথা বলিলে, প্রামাণ্য অন্তর আছে, প্রত্যক্ষাদিতে তাহা নাই, ইহাই বুঝা যায়। তাহা হইলে প্রমাণ স্বীকার করিতেই হইল। প্রমাণ একেবারেই নাই—উহা অলীক, ইহা বলা গেল না। যে কোন নামে প্রমাণ-পদার্থ স্বীকার করিলেই আর পূর্ণগন্ধবাদের কথা টিকিল না। পরন্তু দ্বিতীয় এই যে, দ্বৈতকাল্যাসিদ্ধি-হেতুক প্রত্যক্ষাদির প্রামাণ্য নাই এবং দ্বৈতকাল্যাসিদ্ধি-হেতুক প্রত্যক্ষাদির প্রামাণ্য আছে, এই বাক্যদ্বয় একাধিক অথবা তির্যক ? একাধিক হইলে দ্বৈতকাল্যাসিদ্ধি-হেতুক প্রত্যক্ষাদির প্রামাণ্য আছে, এই কথাই পূর্ণগন্ধবাদী বলেন না কেন ? এই বাক্যদ্বয়কে তির্যক বলিলে কিসের দ্বারা তাহা বুঝা যায়, তাহা বলিতে হইবে। যদি প্রমাণের দ্বারা এই বাক্যদ্বয়কে তির্যক বলিয়া বুঝা যায়, তাহা হইলে ত প্রমাণ পদার্থ স্বীকার করাই হইল। আর যদি অন্য কোন পদার্থের দ্বারা উহা বুঝা যায়, তাহা হইলেও সেই পদার্থকে পদার্থ-সাধকরূপে স্বীকার করি, প্রমাণ স্বীকার করাই হইল। যে কোন নামে পদার্থ-সাধক বলিয়া কিছু স্বীকার করিলেই প্রমাণ স্বীকার করা হয়, কেবল সংজ্ঞা-ভেদ মাত্র হরণ সংজ্ঞা নাইবা কোন বিবাদ নাই। সমস্তকথা একেবারে প্রমাণ-পদার্থ না মানিলে পূর্ণগন্ধবাদী কিছুই বলিতে পারেন না। সামান্যতঃ প্রমাণ অসম্ভব, কেঁকাহাকে কিরূপে প্রতিপাদন করিবেন ? প্রতিপাদ্য ব্যক্তি এবং প্রতিপাদক ব্যক্তি এবং প্রতিপাদক হেতু অর্থাৎ যাহাকে বুঝাইবেন এবং যিনি বুঝাইবেন এবং যে হেতুর দ্বারা বুঝাইবেন, এই তিনটির ভেদজ্ঞান আবশ্যক। প্রমাণের দ্বারা এই ভেদজ্ঞান হইয়া থাকে, সুতরাং প্রমাণকে একেবারে অলীক বলা যাইবে না ১১২।



## সূত্র । সর্বপ্রমাণ-প্রতিবেদ্যকু প্রতিবেদানুপ-

পত্তিঃ ॥ ১৩ ॥ ৭৪ ॥

অনুবাদ । এবং সর্বপ্রমাণের প্রতিবেদনশতঃ প্রতিবেদের উপপত্তি হয় না অর্থাৎ প্রমাণ ব্যতীত যখন কিছুই সিদ্ধি হয় না, প্রতিবেদসিদ্ধিও প্রমাণ-সাপেক্ষ, তখন একেবারে কোন প্রমাণ না মানিলে প্রতিবেদসিদ্ধিও হইতে পারে না ।

ভাষ্য । কথম্ ? ত্রৈকাল্যাসিদ্ধিরিত্যস্ত হেতোর্যদ্বাদাহরণমুপাদীয়াতে হেতুস্ত সাধকত্বং দৃষ্টান্তে দর্শয়িতব্যমিতি ন চ তর্হি প্রত্যক্ষাদীনা-  
মপ্রামাণ্যম্ । অথ প্রত্যক্ষাদীনামপ্রামাণ্যং, উপাদীয়াতমানমুপাদাহরণং  
নার্থং সাধয়িত্যুচ্যতি । সোহয়ং সর্বপ্রমাণৈক্যাহতো হেতুরহেতুঃ,  
“সিদ্ধান্তমভ্যুপেত্য তদ্বিরোধী বিরুদ্ধ” ইতি । বাক্যার্থো হ্যস্ত সিদ্ধান্তঃ,  
ন চ বাক্যার্থঃ প্রত্যক্ষাদীনামি নার্থং সাধয়ন্ত্যিতি । ইদঞ্চাবয়বানামুপাদান-  
মর্থস্য সাধনায়েতি । অথ নোপাদীয়াতে, অপ্রদর্শিতং হেতুর্থস্য দৃষ্টান্তেন  
সাধকত্বমিতি নিবেদ্যো নোপপদ্যাতে হেতুত্বাসিদ্ধিরিতি ।

অনুবাদ । (প্রশ্ন) কেন ? অর্থাৎ সর্বপ্রমাণের নিবেদন হইলে প্রতিবেদের  
অনুপপত্তি হইবে কিরূপে ? (উত্তর) (১) দৃষ্টান্তে অর্থাৎ কোন দৃষ্টান্ত পদার্থে  
হেতু পদার্থের সাধকত্ব (সাধ্যসাধনত্ব) দেখাইতে হইবে, এ জন্ত যদি “ত্রৈকাল্য-  
সিদ্ধেঃ” এই হেতুবাক্যের উদাহরণবাক্য গ্রহণ কর, তাহা হইলে প্রত্যক্ষাদির  
অপ্রামাণ্য হয় না । (কারণ) যদি প্রত্যক্ষাদির অপ্রামাণ্য হয়, (তাহা হইলে)  
উদাহরণ-বাক্য গৃহ্যমাণ হইয়াও পদার্থ সাধন করে না; সুতরাং সেই এই হেতু  
অর্থাৎ পূর্বপক্ষবাদীর গৃহীত ত্রৈকাল্যাসিদ্ধিরূপ হেতু সর্বপ্রমাণের দ্বারা ব্যাহত  
হওয়ায়, অহেতু অর্থাৎ উহা হেতুই হয় না, উহা বিরুদ্ধ নামক হেত্বাভাস। সিদ্ধান্তকে  
স্বীকার করিয়া তাহার বিরোধী পদার্থ “বিরুদ্ধ” অর্থাৎ ইহাই বিরুদ্ধ নামক  
হেত্বাভাসের লক্ষণ । বাক্যার্থই ইহার (পূর্বপক্ষবাদীর) সিদ্ধান্ত । “প্রত্যক্ষাদি  
পদার্থ সাধন করে না” ইহাই সেই বাক্যার্থ । অবয়বসমূহের এই উপাদানও পদার্থের  
সাধনের নিমিত্ত । [ অর্থাৎ পূর্বপক্ষবাদী প্রতিজ্ঞা, হেতু ও উদাহরণ প্রভৃতি  
অবয়ব গ্রহণ করিয়া, তাহার বাক্যার্থরূপ সিদ্ধান্ত সাধন করিতেছেন, কিন্তু তাহার  
প্রযুক্ত ত্রৈকাল্যাসিদ্ধিরূপ হেতু তাহার সিদ্ধান্তের স্বাভাবিক । কারণ, প্রত্যক্ষাদির

প্রামাণ্য না থাকিলে তাহার ঐ হেতু-সাধ্য-সাধন করিতে পারে না—হেতুর দ্বারা কোন সাধ্য-সাধন করিতে গেলেই প্রত্যক্ষাদির প্রামাণ্য মানিতে হয়।]

(২) আর যদি গ্রহণ না কর অর্থাৎ যদি ত্রৈকাল্যাসিক্তিরূপ হেতুর উদাহরণ গ্রহণ না কর, (তাহা হইলে) দৃষ্টান্তের দ্বারা হেতু-পদার্থের সাধকত্ব প্রদর্শিত হয় না, এ ক্ষণ্ড নিষেধ উপপন্ন হয় না; কারণ, (তাদৃশ পদার্থে) হেতুত্বের সিক্তি নাই [অর্থাৎ যে পদার্থকে দৃষ্টান্তে দেখাইয়া, তাহার সাধকত্ব দেখান হয় না, সেই পদার্থ হেতুই হয় না। সুতরাং তাহার দ্বারা প্রত্যক্ষাদির প্রামাণ্য-নিষেধরূপ সাধ্য-সিক্তি হইতে পারে না।]

টিপ্পনী। মহাবি এই স্বত্বের দ্বারা পূর্বপক্ষের আরও এক প্রকার উত্তর বলিয়াছেন যে, যদি কোন প্রমাণই স্বীকার না করা যায়, তাহা হইলে প্রত্যক্ষাদির প্রামাণ্য নাই, এই প্রতিবেদনেরও উপপত্তি হয় না। ভাষ্যকার মহাবি-স্বত্বের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, পূর্বপক্ষবাদী প্রত্যক্ষাদির অপ্রামাণ্যত্বপক্ষে ত্রৈকাল্যাসিক্তিকে হেতুরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। ঐ হেতু যেখানে যেখানে আছে, সেখানেই অপ্রামাণ্য আছে, ইহা বুঝাইতে অর্থাৎ ঐ হেতু-পদার্থ যে অপ্রামাণ্যের সাধক, ইহা বুঝাইতে দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতে হইবে। প্রতিজ্ঞা-বাক্যের পরে হেতু-বাক্যের প্রয়োগ করিয়া হেতু-পদার্থে সাধ্যপদার্থের ব্যাপ্তি প্রদর্শনের জন্য উদাহরণ-বাক্য প্রয়োগ করিতে হয় (প্রমাণ্যম্বে অবয়ব-প্রকরণ স্তম্ভা)। উদাহরণ-বাক্যযোগ্য দৃষ্টান্ত-পদার্থে হেতু-পদার্থের সাধ্য-সাধকত্ব বুঝা যায়। ঐ উদাহরণ-বাক্য প্রত্যক্ষপ্রমাণমূলক। প্রতিজ্ঞাদি অবয়বের মূলে চারিটি প্রমাণ আছে, এ কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে (নিগমন-স্বত্ব স্তম্ভা, ১অঃ, ৩৯ স্বত্ব)। তাহা হইলে পূর্বপক্ষবাদী যদি তাহার হেতু-পদার্থে সাধ্য-সাধকত্ব প্রদর্শন করিতে হেতু-বাক্যের পরে উদাহরণ-বাক্য প্রয়োগ করিলেন, তাহা হইলেই তিনি প্রত্যক্ষ প্রমাণ স্বীকার করিলেন। এইরূপে অন্তমানাদি প্রমাণও তাহাকে মানিতে হইবে। কারণ, কেবল উদাহরণ-বাক্য প্রয়োগ করিয়াই তাহার সাধ্য প্রতিপাদন হইবে না, প্রতিজ্ঞাদি পক্ষাবয়বকেই গ্রহণ করিতে হইবে। প্রতিজ্ঞা ও হেতু-বাক্য না বলিয়া উদাহরণ-বাক্য বলা যায় না; সুতরাং দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতে অর্থাৎ দৃষ্টান্ত-পদার্থে হেতু-পদার্থের সাধ্য-সাধকত্ব প্রদর্শন করিবার জন্য উদাহরণ-বাক্য প্রয়োগ করিতে হইলে পূর্বে প্রতিজ্ঞা ও হেতু-বাক্যেরও প্রয়োগ করিতে হইবে। তাহা হইলে প্রত্যক্ষাদির প্রামাণ্য স্বীকার করিতেই হইবে। কারণ, প্রত্যক্ষাদির প্রামাণ্য না থাকিলে উদাহরণ-বাক্য গ্রহণ করিলেও তাহা পদার্থ-সাধন করিতে পারে না; তাহার মূলীভূত প্রমাণকে না মানিলে তাহা পদার্থ-সাধন করিবে কিরূপে? পূর্বপক্ষবাদী প্রত্যক্ষাদির অপ্রামাণ্যরূপ পদার্থ-সাধন করিতেই প্রতিজ্ঞাদি অবয়ব গ্রহণ করিয়াছেন, সুতরাং ঐ প্রতিজ্ঞাদি অবয়বের মূলীভূত সর্ব-প্রমাণই তাহার স্বীকার্য। তাহা হইলে তাহার প্রযুক্ত ত্রৈকাল্যাসিক্তিরূপ হেতু সর্বপ্রমাণ-



ব্যাহত হওয়ার বিরুদ্ধ হইয়াছে। সর্বপ্রমাণ স্বীকার করিয়া, তাহার নিষেধের অন্তর্গত এই হেতু প্রয়োগ করিলে, উহা “বিরুদ্ধ” নামক হেতুভাঙ্গ হইবে। ভাষ্যকার ইহা বুঝাইতে শেষে এখানে মহর্ষির পক্ষাভাস “বিরুদ্ধ” নামক হেতুভাঙ্গের গণনাগুলি ( ১মঃ, ২মঃ, ৩য়ঃ ) উদ্ধৃত করিয়াছেন। সিদ্ধান্তে স্বীকার করিয়া তাহার ব্যাহতক হেতু অর্থাৎ স্বীকৃত সিদ্ধান্তের বিরোধী পদার্থ বিরুদ্ধ নামক হেতুভাঙ্গ। প্রত্যক্ষাদির প্রামাণ্য নাই, এই বাক্যের অর্থ অর্থাৎ প্রত্যক্ষাদির অপ্রামাণ্যই পূর্বপক্ষবাদের সিদ্ধান্ত। ঐ সিদ্ধান্ত সাধন করিতে যে হেতু প্রয়োগ করা হইয়াছে, তাহা উহার ব্যাহতক। কারণ, হেতুর দ্বারা সাধনসাধন করিতে হইলেই পক্ষাবলম্ব প্রয়োগ করিয়া তাহার দৃষ্টান্ত সর্বপ্রমাণ মানিতে হইবে। তাহা হইলে পূর্বপক্ষবাদের এই হেতু তাহার স্বীকৃত সিদ্ধান্তকে অর্থাৎ প্রত্যক্ষাদির অপ্রামাণ্যকে ব্যাহত করিতেছে। প্রত্যক্ষাদির অপ্রামাণ্য স্বীকার করিয়া যদি তাহাই সাধন করিতে প্রত্যক্ষাদির প্রামাণ্য স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে সেখানে ঐ হেতু সফলসাধন হয় না, পরন্তু ঐ হেতু সেখানে সাধনের অভাবেরই সাধন হয় : সুতরাং উহা হেতু নহে, উহা বিরুদ্ধ নামক হেতুভাঙ্গ। তাৎপর্যটীকাকার ব্যক্তিকের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন যে, পূর্বপক্ষবাদের প্রযুক্ত হেতুটি সর্বপ্রমাণ-প্রতিষেধ হওয়াতে “বান্ধিত” হইয়াছে ( ১মঃ, ২মঃ, ৩য়ঃ ) এবং বিরুদ্ধও হইয়াছে। বিরুদ্ধ কেন হইয়াছে, ইহা দেখাইতে মহর্ষির শ্রুতি উদ্ধৃত হইয়াছে। বস্তুতঃ পূর্বপক্ষবাদীকেও যদি প্রত্যক্ষাদির প্রামাণ্য স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে তাহার একক হেতু বান্ধিত ও বিরুদ্ধ হইবেই, উহা হেতুভাঙ্গ হইয়া প্রমাণভাঙ্গই হইবে, উহা সাধনসাধক হইবে না।

পূর্বপক্ষবাদী যদি তাহার হেতুর উদাহরণ প্রদর্শন না করেন, তাহা হইলেও তাহার হেতু সাধনসাধক হইবে না। দৃষ্টান্ত-পদার্থে হেতু-পদার্থের সাধনসাধক বা সাধনের ব্যাপ্তি প্রদর্শন না করিলে তাহা হেতুই হয় না। ১০।

সূত্র। তৎপ্রামাণ্যে বা ন সর্বপ্রমাণ-বিপ্রতি-

ষেধঃ ॥ ১৪॥৭৫॥

অনুবাদ। পক্ষান্তরে তাহাদিগের প্রামাণ্য থাকিলে সর্বপ্রমাণের বিশেষরূপে প্রতিষেধ হয় না অর্থাৎ যদি পূর্বপক্ষবাদের নিজবাক্যাশ্রিত প্রমাণগুলির প্রামাণ্য মানিতে হয়, তাহা হইলে তুল্য যুক্তিতে পরবাক্যাশ্রিত প্রমাণগুলিরও প্রামাণ্য অবশ্য মানিতে হইবে, সুতরাং সর্বপ্রমাণ-প্রতিষেধ বাহ্য পূর্বপক্ষবাদের সাধ্য, তাহা কেন মতেই সিদ্ধ হয় না।

ভাষ্য। প্রতিষেধলক্ষণে স্ববাক্যে তেনামবয়ববাপ্তিতানাং প্রত্যক্ষাদিনাং প্রামাণ্যেহভ্যনুজ্ঞাপ্যমানে পরবাক্যেহপ্যবয়ববাপ্তিতানাং প্রামাণ্যং

প্রসঙ্গ্যতে অবিশেষাদিতি। এবং ন সর্বানি প্রমাণানি প্রতিবিধ্যন্ত ইতি। “বিপ্রতিষেধ” ইতি “বী”ত্যয়মূপসর্গঃ সম্প্রতিপত্যর্থো ন ব্যাঘাতেহর্থ্যভাবাদিতি।

অনুবাদ। প্রতিষেধরূপ নিজ বাক্যে অর্থাৎ পূর্বপক্ষবাদের “ত্ৰৈকাল্যাসিদ্ধি-  
হেতুক প্রত্যক্ষাদির প্রামাণ্য নাই” এই নিজ বাক্যে অবয়বাপ্রতি (প্রতিজ্ঞাদি  
অবয়বের মূলীভূত) সেই প্রত্যক্ষাদির প্রামাণ্য স্বীকার করিলে, পরবাক্যেও  
 (“প্রত্যক্ষাদির প্রামাণ্য আছে” এই সিদ্ধান্তবাদের বাক্যেও) অবয়বাপ্রতি প্রত্যক্ষাদির  
প্রামাণ্য প্রসক্ত হয় অর্থাৎ তাহারও প্রামাণ্য স্বীকার করিতে হয়,—কারণ, বিশেষ  
নাই [ অর্থাৎ নিজ বাক্যে অবয়বাপ্রতি প্রত্যক্ষাদির প্রামাণ্য স্বীকার করিব, পর-  
বাক্যে তাহাদিগের প্রামাণ্য স্বীকার করিব না, নিজবাক্য হইতে পরবাক্যে এইরূপ  
কোন বিশেষ নাই ]। এইরূপ হইলে অর্থাৎ যদি অবিশেষ বা তুল্যমুক্তিবশতঃ নিজ-  
বাক্যাপ্রতি ও পরবাক্যাপ্রতি সকল প্রমাণেরই প্রামাণ্য স্বীকার করিতে হইল, তাহা  
হইলে সকল প্রমাণ প্রতিবিদ্ধ হইল না অর্থাৎ তুল্যমুক্তিতে সমস্ত প্রমাণই মানিতে  
হইল। “বিপ্রতিষেধ” এই স্থলে “বি” এই উপসর্গটি সম্প্রতিপত্তি অর্থাৎ স্বীকার বা  
অনুজ্ঞা অর্থে (প্রযুক্ত হইয়াছে), ব্যাঘাত অর্থে অর্থাৎ বিরোধ বা অতাব অর্থে  
(প্রযুক্ত) হয় নাই; কারণ, ( তাহা হইলে ) অর্থের অতাব হয় [ অর্থাৎ মহাবি-সূত্রে  
“বিপ্রতিষেধ” এই স্থলে “বি” শব্দের দ্বারা বিশেষ অর্থ বুদ্ধিতে হইবে, ব্যাঘাত  
অর্থ বুদ্ধিলে “বিপ্রতিষেধ” শব্দের দ্বারা প্রতিষেধ পদার্থের অতাব বা অপ্রতিষেধ  
বুঝা যায়, সে অর্থ এখানে সংগত হয় না। ]

টীকানী। পূর্বসূত্রে বলা হইয়াছে যে, পূর্বপক্ষবাদী একবারে কোন প্রমাণ না মানিলে  
প্রমাণের প্রতিষেধ করিতে পারেন না। কারণ, প্রতিজ্ঞাদি অবয়বের মূলীভূত প্রমাণগুলিকে  
না মানিলে, সেই অবয়বগুলির দ্বারা কোন পদার্থ সাধন করা যায় না। পূর্বপক্ষবাদী—প্রত্যক্ষাদির  
অপ্রামাণ্য সাধন করিতে প্রতিজ্ঞা, হেতু ও উদাহরণ প্রভৃতি পঞ্চাবয়ব অথবা প্রতিজ্ঞাদি অবয়বের  
অবস্তা গ্রহণ করিবেন। এখন শূত্রবাদী মাধ্যমিক (পূর্বপক্ষবাদী) যদি বলেন যে, আমি আমার  
নিজবাক্যে প্রতিজ্ঞাদি অবয়বের মূলীভূত প্রমাণগুলি মানিয়া লইয়া, অবিকারিত-নির্দিষ্ট ঐগুলির  
দ্বারাই অপরদের প্রামাণ্য খণ্ডন করিব, এই জন্ত মহাবি এই সূত্রের দ্বারা ঐ পক্ষেরও অবজ্ঞারূপা  
করিয়া, তৎকালে বলিয়াছেন যে, যদি নিজ বাক্যে অবয়বাপ্রতি প্রত্যক্ষাদির প্রামাণ্য স্বীকার করিতে  
হয়, তাহা হইলে আর সর্বপ্রমাণের প্রতিষেধ হয় না। কারণ, সেই অবয়বাপ্রতি প্রমাণগুলিরই  
প্রামাণ্য স্বীকার করা হইতেছে। সূত্রে “বা” শব্দটি পক্ষান্তরদ্ব্যাতক। পরন্তু শূত্রবাদী যে তাহার



অবরোধিত প্রমাণগুলিকে “অবিচারিত-সিদ্ধ” বলিবেন, ঐ অবিচারিত-সিদ্ধ বলিতে কি বুঝিব ? যাহা বিচারসহ নহে, অর্থাৎ যাহা বিচার করিলে ঠিক না, তাহাই অবিচারিত-সিদ্ধ ? অথবা সর্বজন-সিদ্ধ বলিয়া বাহ্যতে কোন সংশয়ই নাই, তাহাই অবিচারিত-সিদ্ধ ? যাহা বিচারসহ নহে অর্থাৎ বাহ্যর বাস্তব সত্য নাই, এমন পদার্থের দ্বারা অস্ত্রের প্রামাণ্য প্রদান করা যায় না। লোক-প্রতীতি-সিদ্ধ ঐগুলিকে মানিয়া গইয়া, উহার দ্বারা প্রামাণ্য প্রদান করিব, ইহা কেবল শূন্যবাদীর কথামাত্রই হয়। বস্তুতঃ যদি সেই অবরোধিত প্রমাণগুলির প্রামাণ্য না থাকে, তাহা হইলে উহাদিগের দ্বারা কোন পদার্থ-সত্যই হইতে পারে না, সুতরাং “অবিচারিত-সিদ্ধ” বলিতে যাহা সর্বজনসিদ্ধ বলিয়া সন্দেহোৎপাদ নহে, তাহাই বলিতে হইবে। তাহা হইলে আর সর্বপ্রমাণের প্রতিবেদ হইল না। কারণ, পূর্ণপক্ষবাদী তাহার অবরোধিত যে প্রমাণগুলিকে অবিচারিত-সিদ্ধ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, সেইগুলিরই প্রামাণ্য আছে। তাৎপর্য্যটীকাকার এই ভাবে এই সূত্রের উক্তি-বীজ ও খুঁড় তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ভাব্যকার তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, নিজ ব্যাধি অবরোধিত প্রমাণগুলির প্রামাণ্য স্বীকার করিলে, পর-ব্যাধিও তাহা স্বীকার করিতে হইবে। কারণ, কোন বিশেষ নাই। তাহা হইলে সর্বপ্রমাণ প্রতিবেদ হইল না। উদ্যোক্তকরও বলিয়াছেন যে, নিজব্যাক্যপ্রিত প্রমাণ স্বীকারে যে যুক্তি, পর-ব্যাক্যপ্রিত প্রমাণ স্বীকারেও তাহাই যুক্তি, সুতরাং নিজব্যাক্যপ্রিত প্রমাণ ব্যতিরেকে অন্য প্রমাণ মানি না, এ কথা বলা যায় না; তুল্য-যুক্তিতে সর্বপ্রমাণই মানিতে হইবে।

মহর্ষি পূর্ণসূত্র বলিয়াছেন, “সর্বপ্রমাণ-প্রতিবেদ”; এই সূত্রে বলিয়াছেন, “সর্বপ্রমাণ-বিপ্রতিবেদ”। এই সূত্র “বিপ্রতিবেদ” এই শব্দে “বি” এই উপসর্গটির প্রয়োগ কেন এবং অর্থ কি, এই প্রশ্ন অবশ্যই হইবে। যদি এখানে “বি” শব্দের ব্যাখ্যাত অর্থ হয়, তাহা হইলে “বিপ্রতিবেদ” শব্দের দ্বারা বুঝা যায়—প্রতিবেদের ব্যাখ্যাত অর্থাৎ অপ্রতিবেদ বা প্রতিবেদের অভাব। তাহা হইলে “সর্বপ্রমাণ-বিপ্রতিবেদ” এই কথার দ্বারা বুঝা যায়, সর্বপ্রমাণের প্রতিবেদের অভাব। তাহা হইলে সূত্রোক্ত “ন সর্বপ্রমাণবিপ্রতিবেদঃ” এই কথার দ্বারা বুঝা যায়, সর্বপ্রমাণের অপ্রতিবেদ হয় না অর্থাৎ সর্বপ্রমাণের প্রতিবেদ হয়। কিন্তু সে অর্থ এখানে সংগত হয় না। সর্বপ্রমাণের প্রতিবেদ হয় না, ইহাই মহর্ষির বিবক্তিত, মহর্ষি তাহাই পূর্বে বলিয়াছেন। এখানে আবার সর্বপ্রমাণের প্রতিবেদ হয়, এ কথা বলিলে পূর্ণাপর ব্যাধ্যের বিরোধ হয়; এই কথাগুলি মনে করিয়া ভাষ্যকার শেষে বলিয়াছেন যে, “বিপ্রতিবেদ” এই শব্দে “বি” এই উপসর্গটি ব্যাখ্যাত অর্থে প্রযুক্ত হয় নাই; উহা সম্প্রতিপত্তি অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। সম্প্রতিপত্তি বলিতে স্বীকার বা অস্বীকার। তাহে তাৎপর্য্যটীকাকার তাৎপর্য্য বর্ণন করিয়াছেন যে, “প্রতিবেদ” শব্দের পূর্ববর্তী “বি” শব্দটি প্রতিবেদ শব্দার্থকেই অস্বীকার করিতেছে অর্থাৎ বিশেষ অর্থের বোধক হইয়া বিশেষ প্রতিবেদই বুঝাইতেছে, প্রতিবেদ ভিন্ন আর কোন অর্থ বুঝাইতেছে না অর্থাৎ উহা এখানে ব্যাখ্যাত অর্থের বাচক নহে; ব্যাখ্যাত অর্থের বাচক হইলে “বিপ্রতিবেদ” শব্দের দ্বারা প্রতিবেদ ভিন্ন অপ্রতিবেদই বুঝা যায়। বিশেষ অর্থের বাচক হইলে প্রতিবেদ ভিন্ন আর কোন অর্থ বুঝা যায় না। উহা

প্রতিবেদ শব্দার্থকেই অতুচ্ছা করিয়া বিশেষ প্রতিবেদই বুঝায়। তাই উদ্যোক্তকরও ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, “বি” এই উপসর্গটি বিশেষ প্রতিবেদ বুঝাইতেই প্রযুক্ত; ব্যাখ্যাত বুঝাইতে প্রযুক্ত নহে। অর্থাৎ সর্বপ্রমাণে বিশেষ প্রতিবেদ এবং সর্বপ্রমাণবিপ্রতিবেদ, ইহা একই কথা। তাহা হইলে “ন সর্বপ্রমাণবিপ্রতিবেদঃ” এই কথার দ্বারা কি বলা হইয়াছে? এই প্রশ্ন করিয়া উদ্যোক্তকর বলিয়াছেন যে, নিজ ব্যাক্যাস্থিত প্রমাণগুলিকে মানিব, আর পর-ব্যাক্যাস্থিত প্রমাণগুলিকে মানিব না, এই যে সর্বপ্রমাণের মধ্যে বিশেষ প্রতিবেদ, তাহা হয় না। নিজ-ব্যাক্যাস্থিত প্রমাণ মানিলে, পর-ব্যাক্যাস্থিত প্রমাণকেও সেই দৃষ্টিতে মানিতে হয়। মহর্ষি এই অর্থবিশেষ প্রকাশ করিবার জন্যই এই সূত্রে প্রতিবেদ না বলিয়া “বিপ্রতিবেদ” বলিয়াছেন।

এই সূত্রটি তাৎপর্যটীকাকার সূত্ররূপে পাই উল্লেখ না করিলেও, উদয়নাচার্য্য তাৎপর্যপরি-  
তৃষ্টিতে এইটিকে সূত্র বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ভাদ্রহট্টানিবন্ধেও এইটি সূত্রমধ্যে  
উল্লিখিত দেখা যায়। ইহার পূর্ববর্তী সূত্রটিকে (১০ সূত্র) পরবর্তী কেহ কেহ সূত্ররূপে গণ্য না  
করিলেও ভাদ্রহট্টানিবন্ধে সূত্র-নামেই উল্লিখিত আছে। ভাষ্যতত্ত্বালোক ও বিখনাথ-দৃষ্টিতেও  
ব্যাখ্যাত আছে [১৪]

## সূত্র। ত্রৈকাল্যপ্রতিবেদশ্চ শব্দাদাতোদ্য- সিদ্ধিবৎ তৎসিদ্ধেঃ ॥১৫॥৭৩॥

অনুবাদ। ত্রৈকাল্যের অভাবও নাই, যেহেতু শব্দ হইতে আত্মোদ্যের  
(মুদ্রাদি বাদ্যযন্ত্রের) সিদ্ধির দ্বারা তাহার (প্রমেয়ের) সিদ্ধি হয়। অর্থাৎ  
পশ্চাৎসিদ্ধ শব্দের দ্বারা পূর্বসিদ্ধ মুদ্রাদির যেমন জ্ঞান হয়, তদ্রূপ পশ্চাৎসিদ্ধ  
প্রমাণের দ্বারা পূর্বসিদ্ধ প্রমেয়ের জ্ঞান হয়; সুতরাং প্রমাণে যে প্রমেয়ের  
ত্রৈকাল্যই অসিদ্ধ, ইহাও বলা যায় না।

ভাষ্য। কিমর্থঃ পুনরিদমুচ্যতে? পূর্বোক্তনিবন্ধনার্থম্। যতাবৎ  
পূর্বোক্ত “মুপলঙ্ঘিতোরুপলঙ্ঘিবিসয়ত্যাচার্থস্ত পূর্বাপরসহভাবানিরমাদ-  
যথাদর্শনঃ বিভাগবচন”মিতি তদিতঃ সমুত্থানং যথা বিজ্ঞায়েত। অনিরমদর্শী  
ধ্বনয়ুর্বিনিরমেন প্রতিবেদঃ প্রত্যচক্ষে, ত্রৈকাল্যস্ত চাস্মকুঃ প্রতিবেদ  
ইতি। তত্রৈক্যং বিধায়ুদাহরতি “শব্দাদাতোদ্যসিদ্ধিবৎ”মিতি। যথা  
পশ্চাৎসিদ্ধেন শব্দেন পূর্বসিদ্ধমাতোদ্যমমুমীরতে, সাধ্যতাতোদ্যং  
সাধনক শব্দঃ, অন্তর্হিতে হাতোদ্যে স্বনতোহনুমানং তবতীতি। বীণা  
বাদ্যতে বেণুঃ পূর্য্যতে ইতি স্বনবিশেষণ আতোদ্যবিশেষঃ প্রতিপদ্যতে,



তথা পূর্বসিদ্ধমুপলব্ধিবিষয়ঃ পশ্চাৎসিদ্ধেনোপলব্ধিহেতুনা প্রতিপদ্যত ইতি । নিদর্শনার্থত্বাচ্চাস্ত শেষয়োর্বিধয়োর্ব্যখ্যোক্তমুদাহরণং বৈদিতব্য-  
মিতি । কস্মাৎ পুনরিহ তমোচ্যতে ? পূর্বোক্তমুপপাদ্যত ইতি । সর্বথা  
তাবদন্বয়মর্থঃ প্রকাশয়িতব্যঃ, স ইহ বা প্রকাশ্যেত তত্র বা, ন কশ্চিদ্ধিশেষ  
ইতি ।

অনুবাদ । ( পূর্বপক্ষ ) কি জ্ঞাত এই সূত্র বলিতেছি ? অর্থাৎ স্বতন্ত্রভাবে  
যখন এই সূত্রের অর্থ পূর্বোক্ত একাদশ সূত্রের ভাষ্যে বলিয়াছি, তখন আর এই  
সূত্রপাঠ নিম্প্রয়োজন । ( উত্তর ) পূর্বোক্ত জ্ঞাপনের জ্ঞাত । বিশদার্থ এই যে,  
“উপলব্ধির হেতু এবং উপলব্ধির বিষয়-পদার্থের পূর্বাপরসহভাবের নিয়ম না থাকার  
বেরূপ দেখা যায়, তদনুসারে বিশেষ করিয়া বলিতে হইবে” এই বাহা পূর্বে  
( ১১ সূত্র-ভাষ্যে ) বলিয়াছি, তাহার এই সূত্র হইতে উত্থান ( প্রকাশ ) বেরূপে  
বুঝিতে পারে [ অর্থাৎ পূর্বে বাহা বলিয়াছি, এই সূত্রের দ্বারা মহাবি নিজেই তাহা  
বলিয়াছেন, মহাবির এই সূত্রের অর্থই সেখানে বলা হইয়াছে, ইহা বাহাতে সকলে  
বুঝিতে পারে, এই জ্ঞাতই এখানে মহাবির এই সূত্রটি উল্লেখ করিতেছি । ] এই অবি  
( স্মারসূত্রকার গোতম ) অনিয়মদর্শী, এ জ্ঞাত<sup>১</sup> ত্রৈকাল্যের প্রতিবেদন অব্যুক্ত, এই  
কথার দ্বারা নিয়ম প্রযুক্ত প্রতিবেদকে প্রত্যাখ্যান করিতেছেন [ অর্থাৎ প্রমাণ,  
প্রমেয়ের পূর্বে অথবা পরে অথবা সমকালেই সিদ্ধ হয়, এইরূপ নিয়ম আশ্রয় করিয়া  
ঐ পক্ষত্রয়েরই খণ্ডনের দ্বারা পূর্বপক্ষবাদী যে ত্রৈকাল্যের প্রতিবেদ বলিয়াছেন,  
সেই প্রতিবেদকে মহাবি এই সূত্রের দ্বারা নিরাস করিয়াছেন । ] তন্মধ্যে অর্থাৎ  
প্রমাণে প্রমেয়ের পূর্বকালীনত্ব, উত্তরকালীনত্ব ও সমকালীনত্বের মধ্যে ( মহাবি )  
“শব্দ হইতে আতোদ্য-সিদ্ধির স্মার” এই কথার দ্বারা একটি প্রকারকে ( প্রমাণে  
প্রমেয়ের উত্তরকালীনত্বকে ) প্রদর্শন করিতেছেন ।

যেমন পশ্চাৎসিদ্ধ শব্দের দ্বারা পূর্বসিদ্ধ আতোদ্যকে ( বীণাদি বাদ্যযন্ত্রকে )  
অনুমান করে; এখানে সাধ্য আতোদ্য এবং সাধন শব্দ, যেহেতু অন্তর্হিত ( অদৃশ্য )

১। স্বাতন্ত্র্যেণ তদন্ত হৃত্তার্থঃ পূর্ববৃত্তঃ কৃত্ত হৃত্তপাঠোক্তার্থঃ । পরিহারতি পূর্বোক্তেতি । ন তদ্ব্যতিক্রম-  
হৃত্তমপি তু হৃত্তার্থ এবোক্ত জ্ঞাপনার্থ হৃত্তপাঠোক্তমাকসিদ্ধার্থঃ ।—তাৎপর্ষ্যটীকা ।

২। নিয়মেন বা প্রতিবেদঃ পূর্বমেব বা পশ্চাদেব বা সইব সেন্তি তৎ প্রতিবেদতি অন্তর্যমতি । বস্তুকস্মাৎহয়-  
বস্তুকর্থে, বস্তুবিনিদ্রদর্শনী নতিঃ ।—তাৎপর্ষ্যটীকা ।

আতোদ্য-বিষয়ে শব্দের দ্বারা অনুমান হয়। বীণা বাজাইতেছে, বেণু পূর্ণ করিতেছে অর্থাৎ বংশী বাজাইতেছে, এইরূপে শব্দবিশেষের দ্বারা আতোদ্যবিশেষকে (পূর্বোক্ত বীণা-ও বংশীকে) অনুমান করে, সেইরূপ পূর্বসিদ্ধ উপলব্ধির বিষয়কে অর্থাৎ প্রমেয়কে পশ্চাৎসিদ্ধ উপলব্ধির হেতুর দ্বারা অর্থাৎ প্রমাণের দ্বারা জানে। ইহার নিদর্শনার্থবিশেষতঃ অর্থাৎ মহাবি যে এই সূত্রে “শব্দ হইতে আতোদ্য-সিদ্ধির জ্ঞায়” এই কথাটি বলিয়াছেন, ইহা কেবল একটি দৃষ্টান্ত প্রদর্শনের জন্ত বলিয়া শেষ দুইটি প্রকারের অর্থাৎ প্রমাণে প্রমেয়ের পূর্বকালীনর ও সমকালীনত্বের যথোক্ত (একাদশ সূত্র-ভাষ্যোক্ত) উদাহরণ জানিবে। (পূর্বপক্ষ) কেন এখানে তাহা কলা হইতেছে না? অর্থাৎ পূর্বোক্ত উদাহরণরূপ এখানে কেন কলা হয় নাই? সেই ভাষ্য এখানে বলাই উচিত। (উত্তর) পূর্বোক্তকে উপপাদন করা হইতেছে [অর্থাৎ পূর্বে যাহা বলিয়াছি, তাহা যে এই সূত্রের দ্বারা মহাবিই বলিয়াছেন, ইহা দেখাইয়া, পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তের উপপাদনের জন্তই এখানে এই সূত্রের উল্লেখ করিতেছি] এই অর্থ অর্থাৎ মহাবির এই সূত্রের প্রতিপাদ্য পদার্থ সর্বপ্রকারে প্রকাশ করিতে হইবে, তাহা এখানেই প্রকাশ করি অথবা সেখানেই প্রকাশ করি, (ইহাতে) কোন বিশেষ নাই।

টিপ্পনী। দ্বৈতাল্যাসিদ্ধি-হেতুক প্রত্যক্ষাদির প্রামাণ্য নাই, এই পূর্বপক্ষ নিরাস করিতে মহাবি প্রথমে বলিয়াছেন যে, যে দ্বৈতাল্যাসিদ্ধি প্রমাণে আছে, সেইরূপ দ্বৈতাল্যাসিদ্ধি পূর্বপক্ষবাদীর প্রতিষেধ-বাক্যেও আছে। সুতরাং তুল্য যুক্তিতে প্রতিষেধবাক্যও প্রামাণ্যের প্রতিষেধ সাধন করিতে পারে না। এবং দ্বৈতাল্যাসিদ্ধিকে হেতু বলিলে তাহার উদাহরণ প্রদর্শন করিতে হইবে; সুতরাং উদাহরণাদির মূলীভূত প্রত্যক্ষাদির প্রামাণ্য অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে, একেবারে কোন প্রমাণ না মানিলে উদাহরণাদি প্রদর্শন অসম্ভব। সুতরাং দ্বৈতাল্যাসিদ্ধিরূপ হেতুর দ্বারা প্রত্যক্ষাদির অপ্রামাণ্য সাধন করা অসম্ভব। পূর্বপক্ষবাদীর প্রতিজ্ঞাদি অবয়বের মূলীভূত অথবা হেতু ও উদাহরণ-বাক্যের মূলীভূত প্রমাণের প্রামাণ্য থাকিলে তুল্য যুক্তিতে সর্বপ্রমাণেরই প্রামাণ্য থাকিবে। ফলকথা, প্রমাণ বলিয়া কোন পদার্থ একেবারে না মানিলে অপ্রামাণ্য সাধন করাও সম্ভব। প্রমাণ ব্যতীত কিছুই সিদ্ধ হইতে পারে না, নিম্নপ্রমাণে কেবল মুখের কথাই একটা সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিলে, সকলেই নিজ নিজ ইচ্ছা ও বুদ্ধি অনুসারে সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিতে পারেন। তাহা হইলে প্রকৃত সিদ্ধান্ত নির্ণয় কোন দিনই হইতে পারে না এবং কেহই কোন সিদ্ধান্ত স্বীকার করিতে কোন দিনই বাধ্য হয় না। সুতরাং যিনি বাহ্য সিদ্ধান্ত বলিবেন, তাঁহাকে ঐ সিদ্ধান্তের প্রমাণ দেখাইতে হইবে। যিনি প্রমাণ বলিয়া কোন পদার্থ ই মানিবেন না, তিনি “প্রমাণ নাই” এইরূপ সিদ্ধান্তও বলিতে পারিবেন না। মহাবি পূর্বোক্ত তিন সূত্রের দ্বারা এই



সকল ভবের হুচনা করিয়া, শেষে এই স্বত্রের দ্বারা পূর্বোক্ত পূর্বপক্ষের মূলোচ্ছেদ করিয়াছেন। মহাবির উত্তর-পক্ষের শেষ কথাটি এই যে, যে ত্রৈকাল্যাসিদ্ধিকে হেতু করিয়া প্রত্যক্ষাদির অপ্রামাণ্য সাধন করিবে, ঐ ত্রৈকাল্যাসিদ্ধি প্রত্যক্ষাদি প্রমাণে নাই, উহা অসিদ্ধ; সুতরাং উহা হেতুই নহে—উহা হেতুভাঙ্গ। প্রমাণব্যাজে প্রমেয়মাত্রের ত্রৈকাল্য না থাকিলেও কোন প্রমাণে কোন প্রমেয়ের পূর্বকালীনত্ব আছে, কোন প্রমাণে কোন প্রমেয়ের উত্তরকালীনত্ব আছে, কোন প্রমাণে কোন প্রমেয়ের সমকালীনত্ব আছে; সুতরাং প্রমাণে প্রমেয়ের ত্রৈকাল্যই নাই, এ কথা বলা হইবে না। প্রমাণ সর্বত্র প্রমেয়ের পূর্বকালীনই হইবে, অথবা উত্তরকালীনই হইবে, অথবা সমকালীনই হইবে, এমন কোন নিয়ম নাই। সুতরাং ঐরূপ নিয়মকে ধরিয়া লইয়া, তাহার খণ্ডনের দ্বারা যে প্রমাণে প্রমেয়ের ত্রৈকাল্যের প্রতিবেদ, তাহা অযুক্ত। উপলব্ধি-বিষয়-পদার্থ যে উপলব্ধি-সাধন-পদার্থের পূর্বসিদ্ধও থাকে, অর্থাৎ পশ্চাত্তনিক প্রমাণের দ্বারাও যে কোন স্থলে পূর্বসিদ্ধ প্রমেয়ের জ্ঞান হয়, মহাবির ইহার দৃষ্টান্ত বলিয়াছেন,—শব্দ হইতে আত্মদ্যাসিদ্ধি। বীণাদি বাদ্যযন্ত্রের নাম “আত্মদ্য”। বীণাদি দেখিতেছি না, উহা আমার দূরত্ব অদৃশ্য, কিন্তু কেহ বীণাদি বাজাইলে, ঐ শব্দ শ্রবণ করিয়া তাহার অহুমান করি। এখানে উপলব্ধির সাধন শব্দ-পূর্বসিদ্ধ নহে, উহা পশ্চাত্তনিক। বীণাদি বাদ্যযন্ত্র ঐ শব্দের পূর্বসিদ্ধই থাকে, পশ্চাত্তনিক ঐ শব্দের দ্বারা পূর্বসিদ্ধ বীণাদি যন্ত্রের অহুমান হয়। শ্রবণেন্দ্রিয়-দ্বারা শব্দবিশেষ শ্রবণেন্দ্রিয়েই থাকে, উহার সহিত বীণাদি বাদ্য-যন্ত্রের কোন সম্বন্ধ না থাকায় কিরূপে অহুমান হইবে? এই জন্ত শেষে আবার ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, বীণা বাজাইতেছে, বংশী বাজাইতেছে, এইরূপে শব্দ-বিশেষের দ্বারা বীণাদি যন্ত্রবিশেষকে অহুমান করে। ভাষ্যকারের গূঢ় আত্মপক্ষ এই যে, বীণা বাজাইতেছে, এইরূপে শব্দবিশেষের অনাবারণ দ্বারা যে বীণা-নিমিত্তকত্ব, তাহার উপলব্ধি করিয়া “ইহা বীণাশব্দ” এইরূপে অহুমান করে, ঐরূপেই বীণার অহুমান হয়। বীণা-ধ্বনির দ্বারা বিশেষ—দ্বারা বৈশিষ্ট্য, তাহা যিনি জ্ঞানেন, তিনি বীণাধ্বনি শ্রবণ করিলে তাহার অনাবারণ দ্বয়টিও তাহাতে উপলব্ধি করেন; তাহার ফলে বীণা বাজাইতেছে অর্থাৎ “ইহা বীণাধ্বনি” এইরূপে অহুমান হয়। এইরূপে বংশীধ্বনি শ্রবণ করিয়াও বংশীর অহুমান হয়। এই সকল স্থলে বীণা ও বংশী প্রকৃতি-বৃত্ত শব্দও ঐরূপে উপলব্ধির সাধন এবং বীণা বংশী প্রকৃতি বাদ্যযন্ত্রও উপলব্ধির বিষয় হয়। উদ্যোক্তকর এবং বাচস্পতি মিশ্রও এইরূপে বলিয়াছেন<sup>১</sup>।

প্রশ্ন হইতে পারে যে, ভাষ্যকার পূর্বোক্ত একাদশ স্বত্র-ভাষ্যের শেষে মহাবির এই স্বত্রোক্ত শেষ উত্তর স্বতন্ত্র ভাবে বলিয়া আসিয়াছেন, অর্থাৎ মহাবির এই স্বত্রার্থ পূর্বোই ব্যাখ্যাত

১। তত্র বীণাদিকং বাসমানক্য মুরজাদিকন্।

বংশাদিকন্ তত্রিকং কাংস্ততালাদিকং তদনন্।

চতুর্ধিধমিকং বাবং বাসিজাত্যোদ্যানানকন্।—অমরকোষ, বর্গবর্গ,—৭ম পরিচ্ছেদ।

২। অহং শব্দো ধর্মো বীণাধ্বনিসংযোগজনকপূর্ব ইতি সাব্যো ধর্মো তদনিমিত্তানাবারণবর্ধবদ্যো

পূর্বোপলব্ধবীণাদিনিমিত্তকনিবং।—আত্মপক্ষিকা।

হইয়াছে ; সুতরাং এই স্বত্রের পৃথক ভাষ্য করা আর প্রয়োজন নাই। তাহা হইলে এখানে ভাষ্যকার এই স্বত্রের উল্লেখ করিয়াছেন কেন ? ভাষ্যকার প্রথমে নিজেই এই প্রশ্ন করিয়া, তত্বতঃ বলিয়াছেন যে, পূর্বে বাহা বলিয়াছি, তাহা নিজের কথাই বলি নাই, মহর্ষির এই স্বত্রার্থই সেখানে বলিয়াছি। সেখানে মহর্ষি-স্বত্রোক্ত পূর্বপক্ষের ব্যাখ্যা করিয়া, শেষে মহর্ষির এই স্বত্রোক্ত প্রকৃত উত্তরটি বলিয়া আসিয়াছি। পূর্বোক্ত সেই কথা যে মহর্ষিরই কথা, ইহা জানাইবার জন্যই এখানে এই স্বত্রের উল্লেখপূর্বক ইহার ভাষ্য করিতেছি। উপলব্ধির সাধন-পদার্থ ও উপলব্ধির বিষয়-পদার্থের পূর্বাপর সহত্যাবের নিয়ম নাই, এ কথা ভাষ্যকার পূর্বে বলিয়াছেন। পূর্বপক্ষবাদী ঐরূপ নিয়ম স্বীকার করিয়াই প্রমাণে প্রমোদের ত্রৈকাল্যের প্রতিবেদন করিয়াছেন। কিন্তু ঐরূপ নিয়ম না থাকিলে ঐ প্রতিবেদন করা যায় না। বস্তুতঃ ঐরূপ নিয়মের অভাব বা অনিয়মই স্বীকার্য। মহর্ষি ঐরূপ অনিয়মদর্শী বলিয়াই পূর্বপক্ষবাদীর স্বীকৃত নিয়মমূলক প্রতিবেদনের নিরাস করিয়াছেন। মহর্ষি “ত্রৈকাল্যপ্রতিবেদন” এই অংশের দ্বারা পূর্বপক্ষবাদীর কথিত ত্রৈকাল্য-প্রতিবেদনের নিবেদন করিয়া, স্বত্রের অঙ্গর অংশের দ্বারা পূর্বোক্তরূপ অনিয়ম সমর্থন করিতে এক প্রকার উদাহরণের উল্লেখ করিয়াছেন।

যেমন পশ্চাৎসিদ্ধ শব্দের দ্বারা পূর্বসিদ্ধ আতোদ্যের সিদ্ধি অর্থাৎ অহুমান হয়, এই কথার দ্বারা মহর্ষি দেখাইয়াছেন যে, প্রমাণ কোন স্থলে প্রমোদের পরকালবর্জ্য হয়। ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, এখানে যখন এই কথা মহর্ষির হৃদয়স্থ অনিয়মের দৃষ্টান্ত প্রদর্শনের জন্য, তখন উহার দ্বারা অল্প ছুই প্রকার উদাহরণও সূচিত হইয়াছে। একাদশ স্বত্রভাষ্যের শেষে তাহা বলিয়া আসিয়াছি। অর্থাৎ কোন স্থলে পূর্বসিদ্ধ বস্তু হইতেও পশ্চাৎসিদ্ধ বস্তুর উপলব্ধি হয়, যেমন পূর্বসিদ্ধ সূর্য্যালোকের দ্বারা উত্তরকালীন বস্তুর জ্ঞান হয়। এবং কোন স্থলে উপলব্ধির সাধন ও উপলব্ধির বিষয়-পদার্থ সমকালবর্জ্য হয়। যেমন বহির সমকালীন ধূম দেখিয়া বহির অহুমান হয়। এখানে বহির উপলব্ধির সাধন ধূম বা ধূম-জ্ঞান অথবা জ্ঞায়মান ধূম অহুমিত্তিরূপ উপলব্ধির বিষয় বহির সমকালীন। এই উদাহরণদ্বয় পূর্বেই বলা হইয়াছে। এখানে ভাষ্যকার ঐ উদাহরণদ্বয় কেন বলেন নাই ? এতদুত্তরে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, পূর্বে বাহা বলা হইয়াছে, তাহাই মহর্ষি-স্বত্রের দ্বারা উপপাদন করিবার জন্যই এখানে এই স্বত্রের উল্লেখপূর্বক তাহার অর্পণ বর্ণন করা হইতেছে। পূর্বোক্ত উদাহরণদ্বয় যখন পূর্বেই বলা হইয়াছে, তখন আর এখানে তাহা বলা নিম্প্রয়োজন। সেই উদাহরণ এখানেই বলিতে হইবে, এমন কোন বিশেষ নাই। উদ্যোতকর “এই স্বত্রটি ইহার পূর্বেই কেন বলা হয় নাই” এইরূপ প্রশ্ন করিয়া তত্বতঃ

১। ভাষ্যতত্ত্বালোকে নব্য বাচস্পতি মিশ্র “ত্রৈকাল্যপ্রতিবেদন” এই অংশকে স্বত্রভাষ্যে গ্রহণ না করিলেও ভাষ্যকার “এতচ্ছব্দে” এই কথার উল্লেখপূর্বক ঐ অংশের ব্যাখ্যা করায় এবং জায়পুত্রী-নিকটের স্বত্রপাঠ এবং তৎপদার্থসিদ্ধির স্বত্রপাঠ দ্বারাও বৃত্তিকার বিধানগত প্রকৃতির স্বত্রপাঠ দ্বারাও ব্যাখ্যাহুদ্যে ঐ অংশ স্বত্রভাষ্যেই গৃহীত হইয়াছে। ভাষ্যবার্ত্তিকে “তৎসিদ্ধে” এই অংশ স্বত্রভাষ্যে উল্লিখিত হয় নাই। কিন্তু বৃত্তিত বার্ত্তিক গ্রন্থ উদ্ধৃত স্বত্র ঐ অংশও বেলা যায়। কোন নব্য সীকার “তৎসিদ্ধিঃ” এইরূপ পাঠই গ্রহণ করিয়াছেন।



বলিয়াছেন যে, এই সূত্র সেখানেই বলিতে হইবে অথবা এখানেই বলিতে হইবে, ইহার নিয়ামক কোন বিশেষ নাই। এই সূত্রোক্ত পদার্থ সর্বথা প্রকাশ করিতে হইবে, তাহা ভাষ্যকার পূর্বেই (একাদশ সূত্র-ভাষ্যের শেষে) প্রকাশ করিয়াছেন। মহর্ষির পাঠ-ক্রম লক্ষণ করিয়া সেখানেই এই সূত্রের ও ইহার ভাষ্যের কথন তিনি নিম্নরোজন মনে করিয়াছেন। ভাষ্যকারের প্রশ্ন-বাক্যের দ্বারা উদ্যোতকরের কথা বুঝা যায় না। ভাষ্যকার পূর্বোক্ত উদাহরণস্বরের কথা বলিয়াই প্রশ্ন করিয়াছেন—“কেন তাহা এখানে বলা হইতেছে না?” উদ্যোতকর প্রশ্ন করিয়াছেন,—“কেন সেখানেই এই সূত্র বলা হয় নাই?” তাৎপর্য্যটীকাকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, পাঠক্রম লক্ষণ করিয়া সেখানেই কেন এই সূত্র বলা হয় নাই? মহর্ষি-সূত্রের পাঠক্রম লক্ষণ করিয়া, পূর্বে এই সূত্রের উল্লেখ করা যায় কিরূপে, ইহা চিন্তনীয়। ভাষ্যকারের প্রশ্নে এ চিন্তা নাই। উদ্যোতকরের প্রশ্ন-ব্যাখ্যার শেষে তাৎপর্য্যটীকাকার বলিয়াছেন যে, “এখানেই সেই ভাষ্য কেন বলা হয় নাই?” এই প্রশ্নও বুঝিতে হইবে।

বস্তুতঃ মহর্ষির এই সূত্রোক্ত উত্তরই পূর্বোক্ত পূর্বপক্ষের চরম উত্তর। এ জন্তই মহর্ষি এই সূত্রটি শেষে বলিয়াছেন। বৃত্তিকার বিশ্বনাথ প্রভৃতি নব্যগণ বলিয়াছেন যে, যদি শূন্যবাদী বলেন যে, আমার মতে বিশ্ব শূন্য, প্রমাণ-প্রমেয়ভাব, আমার মতে বাস্তব নহে, সূত্ররাং প্রমাণের দ্বারা বস্তু সিদ্ধি করা বা কোন সিদ্ধান্ত করা আমার আবশ্যক নাই। প্রমাণবাদী আত্মিকের পক্ষে প্রমাণে প্রমেয়ের ত্রৈকাল্য না থাকায়, প্রমাণের দ্বারা প্রমেয়সিদ্ধি হইতে পারে না, অর্থাৎ তাহাদিগের মতানুসারেই প্রমাণ বলিয়া কোন পদার্থ হইতে পারে না,—ইহাই বলিতেছি, আমি কোন পক্ষস্থাপন করিতেছি না; সূত্ররাং আমার প্রমাণ প্রদর্শন অনাবশ্যক; আত্মিকের সিদ্ধান্ত তাহাদিগের মতানুসারেই সিদ্ধ হয় না, ইহা দেখাইয়াছি। এই জন্ত শেষে মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা বলিয়াছেন যে, প্রমাণে যে প্রমেয়ের ত্রৈকাল্য নাই বলা হইয়াছে, তাহা ঠিক নহে; প্রমাণে প্রমেয়ের ত্রৈকাল্য প্রতিবেদ করা যায় না। সূত্ররাং ত্রৈকাল্যাসিদ্ধি হেতুই অসিদ্ধ। উহার দ্বারা কোন মতেই প্রত্যক্ষদির অপ্রামাণ্য সাধন করা যায় না। মহর্ষির তাৎপর্য্য পূর্বেই ব্যক্ত করা হইয়াছে ৷১৫৥

ভাষ্য। প্রমাণং প্রমেয়মিতি চ সমাখ্যা সমাবেশেন বর্ততে সমাখ্যা-নিমিত্তবশাৎ। সমাখ্যানিমিত্তন্তু পলঙ্কিসাধনং প্রমাণং, উপলঙ্কিবিষয়ঃ চ প্রমেয়মিতি। যদা চোপলঙ্কিবিষয়ঃ কশ্চিৎপলঙ্কিসাধনং তবতি, তদা প্রমাণং প্রমেয়মিতি চৈকোহর্থোহভিধীয়তে। অস্ত্যর্থস্তাবদ্যোতনর্থমিদ-মুচ্যতে।

অনুবাদ। “প্রমাণ” এবং “প্রমেয়” এই সংজ্ঞা সংজ্ঞার নিমিত্তবশতঃ সমাবেশ-বিশিষ্ট হইয়া থাকে [ অর্থাৎ “প্রমাণ” ও “প্রমেয়” এই দুইটি সংজ্ঞার নিমিত্ত থাকিলে এক পদার্থেও এই দুইটি সংজ্ঞা সমাবিষ্ট (মিলিত) হইয়া থাকে ]। সংজ্ঞার

নিমিত্ত কিন্তু উপলব্ধির সাধন প্রমাণ এবং উপলব্ধির বিষয় প্রমেয়, অর্থাৎ উপলব্ধি-সাধনইহা “প্রমাণ” এই নামের নিমিত্ত এবং উপলব্ধি-বিষয়ইহা “প্রমেয়” এই নামের নিমিত্ত। যে সময়ে উপলব্ধির বিষয় (পদার্থটি) কোনও পদার্থের উপলব্ধির সাধন হয়, তখন একই পদার্থ “প্রমাণ” ও “প্রমেয়” এই নামে অভিহিত হয়। এই পদার্থের প্রকাশের জন্ত এই সূত্রটি (পরবর্তী সূত্রটি) বলিতেছেন।

### সূত্র। প্রমেয়া চ তুলা প্রামাণ্যবৎ ॥১৬ ॥ ৭৭॥

অনুবাদ। যেমন প্রামাণ্যে অর্থাৎ প্রামাণ্য নিশ্চয় করিতে হইলে তখন তুলা (দ্রব্যের গুরুত্বের ইয়ত্তা-নিশ্চায়ক দ্রব্য) প্রমেয়ও হয়, [সেইরূপ অত্যান্ত সমস্ত প্রমাণও প্রামাণ্যে অর্থাৎ তাহাদিগের প্রামাণ্য নিশ্চয় করিতে হইলে তখন প্রমেয়ও হয়।]

টীকা। প্রমাণ-পরীক্ষা-প্রকরণে মহর্ষি পূর্বোক্ত পূর্বপক্ষের নিরাস করিয়া এখন আবশ্যক-বোধে এই হৃত্তের দ্বারা আর একটি কথা বলিয়াছেন। ভাষ্যকার মহর্ষির এই কথার সার মর্ম ব্যক্ত করিয়া এই হৃত্তের অবতারণা করিয়াছেন। ভাষ্যকারের কথার মর্ম এই যে, উপলব্ধির সাধনকে “প্রমাণ” বলে এবং উপলব্ধির বিষয়কে “প্রমেয়” বলে। “প্রমাণ” এই নামের নিমিত্ত যে উপলব্ধির সাধনই এবং “প্রমেয়” এই নামের নিমিত্ত যে উপলব্ধি-বিষয়ই, এই দুইটি নিমিত্ত এক পদার্থ থাকিলে, সেই নিমিত্তবশতঃ সেই এক পদার্থও “প্রমাণ” ও “প্রমেয়” এই নামদ্বয়ে অভিহিত হইতে পারে। সংজ্ঞার নিমিত্ত থাকিলে এক পদার্থেরও অনেক সংজ্ঞা হইয়া থাকে। তাহাতে সেই পদার্থের স্বরূপ নষ্ট হয় না। উপলব্ধির বিষয় প্রমেয় পদার্থ কোন পদার্থের উপলব্ধির সাধন হইলে, তখন তাহার ‘প্রমাণ’ এই সংজ্ঞা হইবে। আবার উপলব্ধির সাধন প্রমাণ পদার্থ উপলব্ধির বিষয় হইলে, তখন তাহার ‘প্রমেয়’ এই সংজ্ঞা হইবে। ভাষ্যকার ইহাকেই বলিয়াছেন,—প্রমাণ ও প্রমেয়, এই সংজ্ঞাদ্বয়ের সমাবেশ। উদ্যোতকর এই সমাবেশের কথা বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—“সমাবেশোহনিয়মঃ”, অর্থাৎ “প্রমাণ” ও “প্রমেয়” এই সংজ্ঞাদ্বয়ের নিয়ম নাই। তাৎপর্য্য এই যে, বাহ্য প্রমাণ, তাহা যে চিরকাল “প্রমাণ” এই নামেই কথিত হইবে এবং বাহ্য প্রমেয়, তাহা যে চিরকাল “প্রমেয়” এই নামেই কথিত হইবে, এরূপ নিয়ম নাই। এই সংজ্ঞাদ্বয় পূর্বোক্তরূপ নিয়মবদ্ধ নহে। বাহ্য প্রমাণ, তাহাও কোন সময়ে প্রমেয় নামের নিমিত্তবশতঃ প্রমেয় নামে কথিত হয় এবং বাহ্য প্রমেয়, তাহাও কোন সময়ে প্রমাণ নামের নিমিত্তবশতঃ প্রমাণ নামে কথিত হয়। সংজ্ঞাটি সংজ্ঞার নিমিত্তের অধীন, সুতরাং নিমিত্ত-ভেদে সংজ্ঞার ভেদ হইতে পারে। সংজ্ঞা কোন নিয়মবদ্ধ হইতে পারে না। তাৎপর্য্য-টীকাকার এই অনিরনকে গ্রহণ করিয়া একটি পূর্বপক্ষের অবতারণা করতঃ তাহার উত্তর-স্বরূপে মহর্ষির এই হৃত্তটির উত্থাপন করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, বাহ্য অনিয়ত অর্থাৎ বাহ্য নিয়ম



নাই, তাহা বাস্তব পদার্থ নহে;—যেমন রজ্জ্বতে আরোপিত সর্প। সেই রজ্জ্বকেই তখনই কেহ সর্পরূপে করনা করিতেছে, কেহ ঋজুধারারূপে করনা করিতেছে, আবার একই ব্যক্তি কোন দমনে সেই রজ্জ্বকে সর্পরূপে করনা করিয়া, পরে ঋজুধারারূপে করনা করিতেছে। প্রমাণ-প্রমেয় ভাবও যখন এইরূপ অনিরত, অর্থাৎ যাহা প্রমাণ, তাহা কখন প্রমেয়ও হইতেছে, আবার যাহা প্রমেয়, তাহা কখন প্রমাণও হইতেছে, প্রমাণ চিরকাল প্রমাণরূপেই জ্ঞাত হইবে এবং প্রমেয় চিরকাল প্রমেয়রূপেই জ্ঞাত হইবে, এরূপ যখন নিয়ম নাই, তখন প্রমাণ-প্রমেয় ভাবও রজ্জ্বতে করিত সর্প ও ঋজুধারার জ্ঞার বাস্তব পদার্থ নহে। এই পূর্বপক্ষের উত্তর হুচনার জন্মই মহর্ষি এই হুক্তটি বলিয়াছেন। বৃত্তিকার বিখ্যাতও প্রথমে এইরূপ পূর্বপক্ষের উত্থাপন করিয়া তাহার উত্তর-সূত্ররূপে এই সূত্রের উল্লেখ করিয়াছেন। বৃত্তিকার বিখ্যাত প্রভৃতি নব্যগণ “প্রমেয়তা চ তুলাপ্রামাণ্যবৎ” এইরূপ হুক্তপাঠ গ্রহণ করিয়াছেন। জায়বার্তিকে সূত্রকভেদে “প্রমেয়তা চ” এবং “প্রমেয়া চ” এই দ্বিবিধ পাঠ দেখা গেলেও, তাৎপর্যটীকাকারের উদ্ধৃত বার্তিকের পাঠে “প্রমেয়া চ” এইরূপ পাঠই দেখা যায়। তাৎপর্যটীকাকার নিজেরও “প্রমেয়া চ তুলাপ্রামাণ্যবৎ” এইরূপ পাঠ গ্রহণ করিয়াছেন। জায়হট্টানিবন্ধে এবং জায়তদ্বালোকেও এইরূপ হুক্তপাঠই গৃহীত হইয়াছে। তাৎপর্যটীকাকার এই সূত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, ত্রব্যের গুরুত্বের পরিমাণ নির্ধারণ করিতে “তুলা” যে কেবল প্রমাণই হয়, তাহা নহে। যখন ঐ তুলাতে প্রামাণ্য-সংশয় হয়, তখন প্রমাণ বলিয়া নিশ্চিত অস্ত্র তুলার দ্বারা পরীক্ষিত যে সুবর্ণাদি, তাহার দ্বারা ঐ তুলা প্রমেয়ও হয়। যেমন প্রামাণ্যে অর্থাৎ তুলার প্রামাণ্য নিশ্চয় করিতে হইলে, তখন তুলা প্রমেয়ও হয়, সেইরূপ অস্ত্র সমস্ত প্রমাণও তাহাদিগের প্রামাণ্য নিশ্চয় করিতে হইলে তখন প্রমেয়ও হয়। যে ত্রব্যের দ্বারা অস্ত্র ত্রব্যের গুরুত্বের পরিমাণ বা ইয়তা নির্ধারণ করা হয়, তাহাই এখানে “তুলা” শব্দের দ্বারা গ্রহণ করা হইয়াছে; তাহা তুলানওও হইতে পারে, এইরূপ অস্ত্র কোন সুবর্ণাদি জব্যও হইতে পারে। যখন ঐ তুলার দ্বারা কোন ত্রব্যের গুরুত্বের পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়, তখন উহা প্রমাণ। কারণ, তখন উহা উপলব্ধির সাধন। আবার যখন ঐ তুলাটি খাটি আছে কি না, ইহা বুঝিবার প্রয়োজন হয়, তখন অস্ত্র একটি পরীক্ষিত তুলার দ্বারা তাহা বুঝিয়া লওয়া হয়। সুতরাং তখন ঐ তুলাই উপলব্ধির বিষয় হইয়া প্রমেয়ও হয়। তুলার এই প্রামাণ্য ও প্রমেয়ত্ব যখন সর্বনিম্ন, ইহার অপলাপ করিলে ত্রয়বিক্রয় ব্যবহারই চলে না, লোকবাজার উচ্ছেদ হয়, তখন ঐ দ্বিধ দৃষ্টান্তে অস্ত্র সমস্ত প্রমাণেরও প্রামাণ্য ও প্রমেয়ত্ব অবশ্য স্বীকার্য। প্রমাণে প্রামাণ্য ও প্রমেয়ত্বের জ্ঞান রজ্জ্বতে সর্পত্বাদি

১। অস্ত্র চার্ঘ্যত জাপনার্থে সূত্র প্রমেয়া চ তুলাপ্রামাণ্যবতি। ন কেবলমাত্র প্রমাণ সমাহারগুরুত্ব তুলা, বলা পুনরস্ত্রাং নলমহো ভবতি প্রামাণ্যে অতি, তদা সিদ্ধপ্রমাণভাবেন তুলাজ্ঞরূপে পরীক্ষিতঃ যৎ সুবর্ণাদি তেন প্রমেয়া চ তুলা প্রামাণ্যবৎ। যথা প্রামাণ্যে তুলা প্রমেয়া চ, তথা অস্ত্রবলি সর্বং প্রমাণং প্রামাণ্যে প্রমেয়ামিহাৰ্থঃ।— তাৎপর্যটীকা। এই ব্যাখ্যাতে ‘প্রামাণ্যে ইব’ এই অর্থে “অস্ত্র অস্ত্রবৎ” এই পাণিনি-সূত্র দ্বারা (তদ্বিত্ত-প্রকরণ, ৪।১।১১৩ সূত্র) বতি প্রত্যয়ে সূত্রের “প্রামাণ্যবৎ” এই পদটি সিদ্ধ হইয়াছে এবং সূত্রে “তুলা” এইটি পৃথক্ পদ। ‘যথা প্রামাণ্যে তুলা প্রমেয়া চ, তথা অস্ত্রবলি সর্বং প্রমাণং প্রামাণ্যে প্রমেয়া’ এইরূপে সূত্রার্থ বুঝিতে হইবে।

জ্ঞানের জ্ঞান ভ্রমজ্ঞান নহে। অনিহিত পদার্থ হইলেই তাহা সর্বত্র অবাস্তব পদার্থ হইবে, এইরূপ নিয়ম হইতে পারে না। তাহা হইলে তুলাও অবাস্তব পদার্থ হইয়া পড়ে। কারণ, তুলাও অস্ত্র প্রমাণের জ্ঞান কোন সময়ে প্রমাণও হয়, কোন সময়ে প্রমেয়ও হয়। তুলাকে অবাস্তব পদার্থ বলিলে ক্রয়-বিক্রয় ব্যবহারের উচ্ছেদ হইয়া লোকস্বার্থের উচ্ছেদ হইয়া পড়ে। তাৎপর্যটীকাকারের মতে সূত্রকার মহর্ষির ইহাই গুঢ় তাৎপর্য। বৃত্তিকার বিশ্বনাথ প্রথমে এই সূত্রের তাৎপর্য বর্ণন করিয়াছেন যে, যেমন তুলা স্বর্ণাদি দ্রব্যের গুরুত্বের ইয়ত্তা-নির্ধারণক হওয়ায়, তখন তাহাতে প্রমাণ ব্যবহার হয় এবং অস্ত্র তুলার দ্বারা ঐ পূর্বোক্ত তুলার গুরুত্বের ইয়ত্তা নির্ধারণ করিলে, তখন তাহাতে প্রমেয় ব্যবহার হয়, এইরূপ নিমিত্তক-সমাবেশবশতঃ ইন্দ্রিয় প্রভৃতি প্রমাণেও প্রমাণ ব্যবহার ও প্রমেয় ব্যবহার হয়। বৃত্তিকার শেষে এই ব্যাখ্যা সঙ্গত নহে না করিয়া কল্পান্তরে বলিয়াছেন যে, অথবা প্রমাজ্ঞান জন্মিলেই প্রমাণ ও প্রমেয় হইতে পারে, প্রমাজ্ঞান না হওয়া পর্য্যন্ত কাহাকেও প্রমাণ ও প্রমেয় বলা যায় না, এই বাহা পূর্বে আশঙ্কা করা হইয়াছে, তাহারই উত্তর হুচনার জন্ত মহর্ষি এই সূত্রটি বলিয়াছেন। এই সূত্রের তাৎপর্য্য এই যে, যেমন যে-কোন সময়ে দ্রব্যের গুরুত্বের ইয়ত্তা-নির্ধারণক হওয়াতেই সর্বদা তুলাতে প্রমাণ ব্যবহার হয়, তদ্রূপ ইন্দ্রিয়াদি যে কোন সময়ে উপলব্ধির সাধন হয় বলিয়া তাহাতেও প্রমাণ ব্যবহার হইতে পারে এবং কোন সময়ে উপলব্ধির বিষয় হয় বলিয়া ঘটাদি পদার্থে প্রমেয় ব্যবহার হইতে পারে। বখনই প্রমাজ্ঞান জন্মে, তৎকালেই তাহার সাধনকে প্রমাণ এবং তাহার বিষয়কে প্রমেয় বলা যায়, অস্ত্র সময়ে তাহা বলা যায় না, এ কথা সঙ্গত নহে। তাহা হইলে দ্রব্যের গুরুত্বের ইয়ত্তা নির্ধারণ করিতে প্রমাণ বলিয়া কেহ তুলাকে গ্রহণ করিত না; কারণ, তখন ঐ তুলা প্রমাণ-পদবাচ্য নহে। ফলকথা, বাহা পরেও প্রমাজ্ঞান জন্মাইবে, তাহাও পূর্বে প্রমাণ-পদবাচ্য হইবে। বৃত্তিকার এই সূত্রের ব্যাখ্যার দ্বারা পূর্বোক্ত পূর্বপক্ষের যে সমাধান বলিয়াছেন, তাৎকালিক স্বতন্ত্রভাবে তাহা পূর্বে বলিয়াছেন ( ১১ সূত্রভাষ্য দ্রষ্টব্য )।

এই সূত্রে মহর্ষি তুলাকে প্রমেয় বলিয়া উল্লেখ করাতে আত্মাদি দ্বাদশ প্রকার বিশেষ প্রমেয় ভিন্ন প্রমাজ্ঞানের বিবরণ-পদার্থ-মাত্রকেও মহর্ষি প্রমেয় বলিতেন, ইহা সুব্যক্ত হইয়াছে এবং তুলাকে প্রমাণ বলিয়া উল্লেখ করাতে প্রমাজ্ঞানের কারণমাত্রকেই তিনি প্রমাণ বলিতেন, ইহাও সুব্যক্ত হইয়াছে। বাহা প্রমাজ্ঞানের অর্থাৎ বর্থাৎ অহুভূতির সাধকতম অর্থাৎ চরম কারণ, তাহাই মুখ্য প্রমাণ। ঐ অহুভূতির কারণমাত্রও প্রমাণ শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। মহর্ষির এই সূত্রদ্বারা ভাষ্যকার প্রভৃতিও ঐরূপ প্রয়োগ করিয়াছেন ( ১ অঃ, তৃতীয় সূত্র ও নবম সূত্রের ভাষ্যটীকায় দ্রষ্টব্য )।

ভাষ্য। গুরুত্বপরিমাপজ্ঞানসাধনং তুলা প্রমাণং, জ্ঞানবিষয়ো গুরু দ্রব্যং স্বর্ণাদি প্রমেয়ম্। যদা স্বর্ণাদিনা তুলান্তরং ব্যবস্থাপ্যতে তদা তুলান্তরপ্রতিপত্তৌ স্বর্ণাদি প্রমাণং, তুলান্তরং প্রমেয়মিতি। এব-  
মনবয়বেন তন্ত্রার্থ উদ্ভিক্টো বেদিতব্যঃ। আত্মা তাবদুপলব্ধিবিসয়হাং



প্রমেরে পরিপাঠিতঃ। উপলক্ষৌ স্বাতন্ত্র্যাৎ প্রমাতা। বুদ্ধিরূপলক্ষি-  
 সাধনত্বাৎ প্রমাণং, উপলক্ষিবিষয়ত্বাৎ প্রমেয়ং, উভয়াভাবাৎ প্রমিতিঃ।  
 এবমর্থবিশেষে সমাখ্যাসমাবেশো যোজ্যঃ। তথা চ কারকশব্দা  
 নিমিত্তবশাৎ সমাবেশেন বর্তন্ত ইতি। বুদ্ধিস্তিষ্ঠতীতি স্বস্থিতৌ বুদ্ধঃ  
 স্বাতন্ত্র্যাৎ কর্তা। বুদ্ধং পশ্যতীতি দর্শনেনাপ্তুমিচ্ছ্যমাণতমত্বাৎ কর্ম।  
 বুদ্ধেন চক্ষুরসং জ্ঞাপয়তীতি জ্ঞাপকস্ত সাধকতমত্বাৎ করণম্। বুদ্ধায়ো-  
 দকমাসিদ্ধতীতি আসিচ্চ্যমানেনোদকেন বুদ্ধমভিপ্রৈতীতি সম্প্রদানম্।  
 বুদ্ধাৎ পর্ণং পততীতি “ক্রবমপায়েহপাদান”মিত্যপাদানম্। বুদ্ধে  
 বয়াংসি সন্তীতি “আধারোহধিকরণ”মিত্যধিকরণম্। এবঞ্চ সতি ন  
 দ্রব্যমাত্রং কারকং ন ক্রিয়ামাত্রম্। কিং তর্হি? ক্রিয়াসাধনং ক্রিয়া-  
 বিশেষযুক্তং কারকম্। যৎ ক্রিয়াসাধনং স্বতন্ত্রং স কর্তা, ন দ্রব্যমাত্রং  
 ন ক্রিয়ামাত্রম্। ক্রিয়য়াব্যাপ্তুমিচ্ছ্যমাণতমং কর্ম, ন দ্রব্যমাত্রং ন ক্রিয়া-  
 মাত্রম্। এবং সাধকতমাদিস্যপি। এবঞ্চ কারকার্থাত্মাখ্যানং যথৈব  
 উপপত্তিত এবং লক্ষণতঃ, কারকাহাখ্যানমপি ন দ্রব্যমাত্রে ন ক্রিয়ায়াং  
 বা। কিং তর্হি? ক্রিয়াসাধনে ক্রিয়াবিশেষযুক্ত ইতি। কারক-  
 শব্দচায়াং প্রমাণং প্রমেয়মিতি, স চ কারকধর্ম্মং ন হাতুমর্হতি।

অনুবাদ। গুরুত্বের পরিমাণ-জ্ঞানের সাধন তুলা প্রমাণ, অর্থাৎ বাহার দ্বারা  
 কোন দ্রব্যের গুরুত্ব কি পরিমাণ, তাহা নিশ্চয় করা যায়, সেই তুলা প্রমাণ; জ্ঞানের  
 বিষয় অর্থাৎ ঐ গুরুত্ব-পরিমাণ-জ্ঞানের বিষয় (বিশেষ্য) সূবর্ণ প্রভৃতি গুরু দ্রব্য  
 প্রমেয়। যে সময়ে সূবর্ণ প্রভৃতির দ্বারা অর্থাৎ “সূবর্ণ” প্রভৃতি তুলা-দ্রব্যের  
 দ্বারা অগ্ন তুলাকে ব্যবস্থাপন করা হয় অর্থাৎ তাহাকে প্রমাণ বলিয়া বুদ্ধিয়া  
 লওয়া হয়, সেই সময়ে (সেই) অগ্ন তুলার জ্ঞানে (সেই) সূবর্ণ প্রভৃতি প্রমাণ,  
 (সেই) অন্য তুলাটি প্রমেয়। সম্পূর্ণরূপে উদ্ধিষ্ট অর্থাৎ প্রথম সূত্রে প্রমাণাদি  
 নামোক্তে কথিত শাস্ত্রার্থ (ন্যায়শাস্ত্রপ্রতিপাদ্য প্রমাণাদি বোড়শ পদার্থ)  
 এইরূপ জানিবে [ অর্থাৎ সূবর্ণাদি তুলা-দ্রব্যের যে প্রমাণত্ব ও প্রমেয়ত্ব প্রদর্শন  
 করিলাম, উহা একটা উদাহরণ মাত্র, মহাবি-কথিত প্রমাণাদি বোড়শ পদার্থেই  
 প্রমাণত্ব ও প্রমেয়ত্বের সমাবেশ আছে ] উপলক্ষিবিষয়ক হেতুক আত্মা “প্রমেয়ে”

অর্থাৎ মহাবি-কথিত দ্বিতীয় পদার্থ “প্রমেয়”মধ্যে পঠিত হইয়াছে। উপলব্ধিতে স্বাতন্ত্র্যবশতঃ অর্থাৎ উপলব্ধির কর্তা বলিয়া (আত্মা) প্রমাতা। উপলব্ধির সাধনত্ব-হেতুক বুদ্ধি প্রমাণ, উপলব্ধির বিষয়ত্ব-হেতুক প্রমেয় [ অর্থাৎ বুদ্ধি বা জ্ঞানরূপ “প্রমেয়” পদার্থ কোন পদার্থের উপলব্ধির সাধন হইলে, তখন প্রমাণ হইবে, উপলব্ধির বিষয় হইলে তখন প্রমেয় হইবে ] ; উভয়ের অভাব হেতুক প্রমিতি [ অর্থাৎ বুদ্ধি-পদার্থে উপলব্ধি-সাধনত্ব না থাকিলে এবং উপলব্ধি-বিষয়ত্ব না থাকিলে তখন বুদ্ধি কেবল প্রমিতি হইবে ]। এইরূপ পদার্থ-বিশেষে সমাখ্যার অর্থাৎ প্রমাণাদি সংজ্ঞার সমাবেশ যোজন্য করিবে অর্থাৎ অন্ত্যাত্ম পদার্থেও এইরূপে প্রমাণাদি সংজ্ঞার সমাবেশ বুঝিয়া লইবে। সেই প্রকার অর্থাৎ প্রমাণাদি সংজ্ঞা যেরূপ সমাবিষ্ট হইয়া থাকে, সেইরূপ কারক শব্দগুলি ( কর্তৃ কর্ম প্রভৃতি কারক-বোধক শব্দগুলি) নিমিত্তবশতঃ অর্থাৎ সেই সেই কারক-সংজ্ঞার নিমিত্তবশতঃ সমাবেশবিশিষ্ট হইয়া থাকে। (উদাহরণ প্রদর্শনের দ্বারা ইহা বুঝাইতেছেন) “বৃক্ষ অবস্থান করিতেছে” এই স্থলে নিজের স্থিতিতে স্বাতন্ত্র্যবশতঃ বৃক্ষ কর্তা। “বৃক্ষকে দর্শন করিতেছে” এই স্থলে দর্শনের দ্বারা প্রাপ্তির নিমিত্ত ইচ্ছামাণতম বলিয়া অর্থাৎ দর্শনক্রিয়ার বিষয় করিতে বৃক্ষই ঐ স্থলে প্রধানতঃ ইচ্ছার বিষয় বলিয়া (বৃক্ষ) কর্ম (কর্মকারক)। “বৃক্ষের দ্বারা চন্দ্রকে বুঝাইতেছে” এই স্থলে জ্ঞাপকের (বৃক্ষের) সাধকতমত্ববশতঃ অর্থাৎ বৃক্ষ ঐ স্থলে চন্দ্রকে বুঝাইতে সাধকতম বলিয়া করণ (করণকারক)। “বৃক্ষ উদ্দেশ্যে জল সেক করিতেছে” এই স্থলে আসিচ্যমান জলের দ্বারা অর্থাৎ বৃক্ষে যে জলের সেক করিতেছে, সেই জলের দ্বারা বৃক্ষকে উদ্দেশ্য করিতেছে, এ জন্য (বৃক্ষ) সম্প্রদান (সম্প্রদান-কারক)। “বৃক্ষ হইতে পত্র পড়িতেছে” এই স্থলে অপায় হইলে (বিশ্লেষ বা বিভাগ হইলে) ঐ অর্থাৎ নিম্নচল অথবা যাহা হইতে বিভাগ হয়, এমন পদার্থ অপাদান, এই জন্য (বৃক্ষ) অপাদান (অপাদান-কারক)। “বৃক্ষে পক্ষিগণ আছে” এই স্থলে আধার অর্থাৎ কর্তা ও কর্মের দ্বারা ক্রিয়ার আধার অধিকরণ, এই জন্য (বৃক্ষ) অধিকরণ (অধিকরণকারক)। এইরূপ হইলে দ্রব্যমাত্র কারক নহে, ক্রিয়ামাত্র কারক নহে। (প্রশ্ন) তবে কি ? (উত্তর) ক্রিয়ার সাধন হইয়া ক্রিয়াবিশেষযুক্ত কারক, অর্থাৎ যে পদার্থ প্রধান ক্রিয়ার সাধন হইয়া, অবাস্তব ক্রিয়া-বিশেষ-যুক্ত হয়, তাহাই কারক পদার্থ ; কেবল দ্রব্যমাত্র অথবা কেবল অবাস্তব ক্রিয়া কারক-পদার্থ নহে।



( কারকের সামান্য লক্ষণ বলিয়া বিশেষ লক্ষণ বলিতেছেন ) । বাহ্য ক্রিয়ার সাধন হইয়া স্বতন্ত্র অর্থাৎ অনাকারক-নিরপেক্ষ, তাহা কর্তা ( কর্তৃকারক ), দ্রব্যমাত্র ( কর্তা ) নহে, ক্রিয়ামাত্র ( কর্তা ) নহে । ক্রিয়ার দ্বারা প্রাপ্তির নিমিত্ত ইন্দ্ৰিয়মাণতম ( পদার্থ ) কৰ্ম্ম, অর্থাৎ বাহ্য ক্রিয়ার বিষয় করিতে প্রধানতঃ ইচ্ছার বিষয়, এমন পদার্থ কৰ্ম্মকারক, দ্রব্যমাত্র ( কৰ্ম্ম ) নহে, ক্রিয়ামাত্র ( কৰ্ম্ম ) নহে । এইরূপ সাধকতম প্রভৃতিতেও জানিবে [ অর্থাৎ করণ প্রভৃতি কারকেরও এইরূপে লক্ষণ বুঝিতে হইবে, দ্রব্যমাত্র অথবা ক্রিয়ামাত্র করণ প্রভৃতি কারক নহে ] । এইরূপ অর্থাৎ পূর্বোক্তরূপ কারক-পদার্থ ব্যাখ্যা যেমনই যুক্তির দ্বারা হয়, এইরূপ লক্ষণের দ্বারা হয় অর্থাৎ পাণিনি-সূত্রের দ্বারাও কারক পদার্থের ঐরূপ ব্যাখ্যা বা লক্ষণ বুঝা যায় । ( অতএব ) কারক শব্দও দ্রব্যমাত্রে ( প্রযুক্ত ) হয় না অথবা ক্রিয়ামাত্রে ( প্রযুক্ত ) হয় না । ( প্রশ্ন ) তবে কি ? অর্থাৎ কারক শব্দ কোন অর্থে প্রযুক্ত হয় ? ( উত্তর ) ক্রিয়ার সাধন হইয়া ক্রিয়াবিশেষযুক্ত পদার্থে অর্থাৎ বাহ্য প্রধান ক্রিয়ার সাধন হইয়া অবাস্তরক্রিয়া-বিশেষযুক্ত, এমন পদার্থে ( কারক শব্দ প্রযুক্ত হয় ) । “প্রমাণ” ও “প্রমেয়” ইহাও অর্থাৎ এই দুইটি শব্দও কারক শব্দ, ( স্তবরাং ) তাহাও কারকের ধৰ্ম্ম ত্যাগ করিতে পারে না ।

টীকানী । “তুলা” শব্দের অনেক অর্থ আছে । কোষকার অমরসিংহ বৈশ্ববর্ণের বলিয়াছেন,— “তুলাহস্তিয়াং পলশতং” অর্থাৎ তুলা শব্দের দ্বারা শত পল ( চারি শত তোলা পরিমাণ ) বুঝায় । মহর্ষি এই সূত্রে এই অর্থে বা অন্য কোন অর্থে “তুলা” শব্দের প্রয়োগ করেন নাই । ভাষ্যকার সূত্রোক্ত তুলা শব্দের অর্থ ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন যে, বাহার দ্বারা গুরুত্বের পরিমাণ বুঝা যায়, তাহা তুলা । গুরুত্বের পরিমাণ বলিতে এখানে “নাথ”, “পল” প্রভৃতি শাস্ত্র-বর্ণিত পরিমাণ-বিশেষ । মনুসংহিতার অষ্টমাধ্যায়ে এবং অমরকোষের বৈশ্ববর্ণের ইহাদিগের বিবরণ আছে । কল কণা, তুলাদণ্ড, তুলাসূত্র প্রভৃতিকেও তুলা বলে । মনুসংহিতার ৮ অঃ, ১০৫ শ্লোকে ভাষ্যকার মেধাতিথি তুলা-সূত্রের কথা বলিয়াছেন । তুলাতে হৃত চন্দনকে “তুলা চন্দন” বলা হয় । ( জ্ঞানসূত্র, ২ অঃ, ২ অঃ, ৬২ সূত্রের ভাষ্য দ্রষ্টব্য ) । এখানে চন্দনের গুরুত্ব পরিমাণ নির্ধারণ করিতে বাহাতে চন্দন রাখা হয়, সেই চন্দনাধার পাত্র অথবা চন্দনের গুরুত্ব পরিমাণ নির্ধারণক তুলাদণ্ড প্রভৃতিকেই “তুলা” শব্দের দ্বারা বুঝিতে হইবে, নচেৎ “তুলা চন্দন” এই কথাটির প্রকৃতার্থ বুঝা হইবে না । বাহার দ্বারা দ্রব্যের গুরুত্ব পরিমাণ নির্ণয় করা বাহ, তাহাকে তুলা বলিলে “স্ববর্ণ” প্রভৃতিকেও তুলা বলা যায় । পুংলিঙ্গ “স্ববর্ণ” শব্দের দ্বারা এক তোলা পরিমিত

১ । পলি কুললকো নাবস্তে স্ববর্ণস্ত গোড়প ।

পলঃ স্ববর্ণাশ্চকারঃ পল্যানি ধরণা যম ।—মনুসংহিতা, ৮ অঃ, ১০৫-৩৫ ।

স্বর্ণ বুঝা যায়। ঐ স্বর্ণের দ্বারা অল্প ভ্রাবের এক তোলা পরিমাণ নির্ধারণ করিয়া লওয়া যায়। তাহা হইলে ঐ স্বর্ণকেও “তুলা” বলা যায় এবং ঐরূপ “পল” প্রভৃতি পরিমাণযুক্ত বস্তুর দ্বারাও অল্প বস্তুর ঐরূপ গুরুত্ব পরিমাণ নির্ধারণ করা যায় বলিয়া সেগুলিকেও পূর্কোক্ত অর্থে “তুলা” বলা যায়। তাই ভাষ্যকার এখানে বলিয়াছেন যে, যে সময়ে স্বর্ণাদির দ্বারা তুলাস্তরের ব্যবহাৰণ করে, তখন ঐ তুলাস্তরের জ্ঞানে স্বর্ণাদি প্রমাণ হইবে। ভাষ্যকার এখানে “তুলাস্তর” শব্দ প্রয়োগ করিয়া পূর্কোক্ত অর্থে স্বর্ণাদিও যে “তুলা”, ইহা ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। মূল কথা, যাহা প্রমাণ, তাহাও কখন প্রমেয় হয় এবং যাহা প্রমেয়, তাহাও কখনও প্রমাণ হয়, ইহা দেখাইবার জন্যই ভাষ্যকার এখানে মহর্ষি-স্বত্রানুসারে বলিয়াছেন যে, তুলার দ্বারা যখন স্বর্ণাদির গুরুত্ব পরিমাণ নির্ণয় করা হয়, তখন ঐ তুলাটি প্রমাণ। কারণ, তখন উহা বার্থ অহত্বতির কারণ এবং ঐ স্থলে সেই স্বর্ণাদি সেই প্রমাণ-জ্ঞাত অহত্বতির বিষয় বলিয়া প্রমেয়। আবার যখন সেই স্বর্ণ প্রভৃতি তুলার দ্বারা পূর্কোক্ত (প্রমাণ) তুলার গুরুত্ব পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়, তখন ঐ স্বর্ণাদি প্রমাণই হয় এবং পূর্কোক্ত তুলাটি প্রমেয় হয়। কারণ, তখন উহা প্রমাণ-জ্ঞাত জ্ঞানের বিষয় হইয়াছে। ভাষ্যকার শেষে বলিয়াছেন যে, এইরূপ ত্রাশাস্ত্র-প্রতিপাদ্য সকল পদার্থেই (প্রমাণাদি সোড়শ পদার্থেই) প্রমাণত্বাদির সমাবেশ আছে। আত্মা প্রমেরমধ্যে কথিত হইলেও প্রমাজ্ঞানের কর্তা বলিয়া আত্মা প্রমাতাও হয়। বুদ্ধি অর্থাৎ জ্ঞান, প্রমাণও হয়, প্রমেয়ও হয়, প্রমিতিও হয়। এইরূপ অজ্ঞাত পদার্থেও প্রমাণাদি সংজ্ঞার সমাবেশ বুঝিয়া লইতে হইবে। তাৎপর্য্যটীকাকার ভাষ্যকারের কথা বুঝাইতে বলিয়াছেন যে, কোন পদার্থে প্রমাত্ব, প্রমেয়ত্ব এবং প্রমাণত্বের সমাবেশ আছে। যেমন আত্মাতে প্রমাত্ব আছে এবং প্রমেয়ত্ব আছে এবং প্রমিত আত্মার দ্বারা ঐ আত্মগত গুণাস্তরের অনুমানে ঐ আত্মাতে প্রমাণত্বও আছে। এইরূপ বুদ্ধি-পদার্থে প্রমাণত্ব, প্রমেয়ত্ব এবং প্রমাণ-করণের অর্থাৎ প্রমিতিত্বের সমাবেশ আছে এবং সংশয়াদি সকল পদার্থেই প্রমাণত্ব ও প্রমেয়ত্বের সমাবেশ আছে। প্রমাজ্ঞানের কারণমাত্রকে প্রমাণ বলিলে, ঐ অর্থে সকল পদার্থেই প্রমাণত্ব থাকিতে পারে। প্রমাজ্ঞানের করণরূপ দুখ্য প্রমাণত্ব সকল পদার্থে থাকে না। কিন্তু মহর্ষি-স্বত্রানুসারে প্রাচীনগণ প্রমাজ্ঞানের কারণমাত্রকেই প্রমাণ সংজ্ঞার ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন। কলকথা, প্রমাণাদি সংজ্ঞার নিমিত্ত থাকিলে সকল পদার্থেই প্রমাণাদি সংজ্ঞার ব্যবহার হইতে পারে এবং তাহা হইয়া থাকে। তাহা হইলে প্রমাণ ও প্রমেয় বলিলেই সকল পদার্থ বলা হয়, মহর্ষি সংশয়াদি চতুর্দশ পদার্থের পৃথক্ উল্লেখ করিয়াছেন কেন? এই পূর্বপক্ষের উত্তর ভাষ্যকার প্রথম স্বত্বভাষ্যেই বিশদরূপে বলিয়া আসিয়াছেন।

১। জ্যেষ্ঠতত্ত্বাচাৰ্য্যের “এবমবস্থানে” কার্য্যতেন “তদ্ব্যর্থঃ” শাস্ত্রার্থ ইতি। কচিং প্রমাত্ব-প্রমেয়-প্রমাণত্বাদীনাম সমাবেশো বদ্যন্তানি। স হি প্রমাতা, প্রমীহমানশ্চ প্রমেয়, তেন তু প্রমিতেন তদ্ব্যর্থতত্ত্বাচাৰ্য্যানুসারে প্রমাণত্ব। কচিং পুনঃ প্রমাণত্ব-প্রমেয়ত্বসংস্থানাম সমাবেশো বদ্যন্তো। কচিং পুনঃ প্রমাণত্ব-প্রমেয়ত্বয়োঃ সমা-সংশয়াদৌ। সেহ সমাবেশতঃ তদ্ব্যর্থবাস্তবিরূপিতি।—তাত্পৰ্য্যটীকা।



ভাষ্যকার শেষে বলিয়াছেন যে, সেইরূপ কর্তৃকর্ম প্রভৃতি কারকবোধক সংজ্ঞাগুলিও ঐ কারক-সংজ্ঞার ভিন্ন ভিন্ন নিমিত্তবশতঃ এক পদার্থে সমাবিষ্ট হয়। যেমন একই বৃক্ষ বিভিন্ন ক্রিয়াতে কর্তৃকারক, কর্মকারক, করণকারক, সন্তাদানকারক, অপাদানকারক এবং অধিকরণকারক হয়। “বৃক্ষ অবহান করিতেছে” এই স্থলে অবহান-ক্রিয়াতে বৃক্ষের স্বাতন্ত্র্য থাকার বৃক্ষ কর্তৃকারক। মহর্ষি পাণিনি কর্তৃকারকের লক্ষণ বলিয়াছেন—“স্বতন্ত্র্যঃ কর্তা”, পাণিনি-হৃত, ১।৪।৫৪। অর্থাৎ যাহা ক্রিয়াতে স্বতন্ত্ররূপে বিবক্ষিত, এমন পদার্থ কর্তৃকারক<sup>১</sup>। ক্রিয়াতে বস্তুতঃ স্বাতন্ত্র্য না থাকিলেও স্বতন্ত্ররূপে বিবক্ষিত হইলে, তাহাও কর্তৃকারক হইবে, এই অর্থই “হানী পততি,” “কাষ্ঠং পততি” ইত্যাদি প্রয়োগে হানী ও কাষ্ঠ প্রভৃতিও কর্তৃকারক হইয়া থাকে। বৈয়াকরণগণ এই স্বাতন্ত্র্যের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন—প্রধান-ক্রিয়ার আশ্রয়<sup>২</sup> অর্থাৎ কর্তৃপ্রত্যয় হলে যে পদার্থ প্রধান ক্রিয়ার আশ্রয়রূপে বিবক্ষিত, তাহাই কর্তৃকারক। উদ্যোতক বলিয়াছেন যে, কারকাস্তর-নিরূপণস্থলই স্বাতন্ত্র্য। কোন স্থলে কর্তৃকারক অত্র কারকে বস্তুতঃ অপেক্ষা করিলেও, উহা অত্র কারক-নিরূপণরূপে বিবক্ষিত হওয়ায় কর্তৃকারক হয়। “বৃক্ষ অবহান করিতেছে” এই স্থলে অবহান-ক্রিয়াতে অত্র কোন কারকই নাই; সুতরাং ঐ স্থলে বৃক্ষে কারকাস্তর-নিরূপণস্থলরূপ স্বাতন্ত্র্য সন্নিবিষ্ট আছে। তাই ঐ স্থলে বৃক্ষ কর্তৃকারক হইয়াছে।

“বৃক্ষকে দর্শন করিতেছে” এই স্থলে বৃক্ষ দর্শন-ক্রিয়ার কর্মকারক হইয়াছে। কারণ, মহর্ষি পাণিনি কর্মকারকের লক্ষণ বলিয়াছেন—“কর্তৃরীপিততমং কর্ম”, (পাণিনি-হৃত, ১।৪।৪৯) অর্থাৎ ক্রিয়ার দ্বারা প্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত যে পদার্থ কর্তার প্রধান ইষ্ট বা ইচ্ছার বিষয়, তাহা কর্মকারক<sup>৩</sup>। এখানে দর্শনক্রিয়ার দ্বারা প্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত বৃক্ষই কর্তার প্রধান ইষ্ট অর্থাৎ বৃক্ষই ঐ স্থলে দর্শনক্রিয়ার প্রধান বিষয়, এ অত্ৰ বৃক্ষ-দর্শনক্রিয়ার কর্মকারক হইয়াছে। “দ্রুমের দ্বারা অন্ন ভোজন করিতেছে” এই স্থলে দ্রুম ভোজনকর্তার প্রধানরূপে দৈর্ঘ্যিত নহে। কারণ, দ্রুম সেখানে উপকরণ মাত্র; ভোজনকর্তী সেখানে কেবল দ্রুম পানের দ্বারা সন্তুষ্ট হন না। সুতরাং ঐ স্থলে দ্রুম, ভোজনকর্তার দৈর্ঘ্যিততম না হওয়ায় কর্মকারক হয় না। অবশ্য যদি দ্রুম সেখানে পান-কর্তার দৈর্ঘ্যিততম হয়, তবে কর্মকারক হইবেই। ভাষ্যকার পাণিনি-সূত্রানুসারে তাহার প্রদর্শিত স্থলে বৃক্ষের কর্মকারকত্ব দেখাইতে “দর্শনেনাপু দিয়ানাপতনদ্বাং” এইরূপ কথাই লিখিয়াছেন। কর্তার দৈর্ঘ্যিততম পদার্থের জায় ক্রিয়াবৃত্ত অনীপিত পদার্থও কর্মকারক হয়। এই অর্থই মহর্ষি

১। ক্রিয়ায় স্বাতন্ত্র্য বিবক্ষিতোহর্থঃ কর্তা ইত্যং।—সিদ্ধান্তকৌমুদী।

২। এখানেীভূতবর্ষাশ্রয়ঃ স্বাতন্ত্র্য। অর্থাৎ ঐ স্বাতন্ত্র্যক্রিয়ায় নিত্য কারকে কর্তৃত্বসাথে ইতি। স্বাভাবিকঃ স্বতন্ত্র্যাত্মকঃ পি স্বাতন্ত্র্য পততি কাষ্ঠানি যথোপোপিত বাহুরূপেতি জননম্ভি বিবক্ষিতোহর্থ ইতি।—তৎবাদিনী টীকা।

৩। কর্তৃঃ ক্রিয়ায় আপু মিষ্টকং কারকং কর্মসাধ্যং ত্বং। কর্তৃঃ কিং, মায়েবম্ঃ ব্যপাতি। কর্তৃপ ইতিভা মাহা ন তু কর্তৃঃ। তদবগ্রহণং কিং, গরম্ ওষম্ঃ ভুজ্যতে।—সিদ্ধান্তকৌমুদী।

পানিনি পরে আবার স্বত্র বলিয়াছেন,—“তথা যুক্তানীপিতম্” ১।৪।৫০।<sup>১</sup> যেমন গ্রামে গমন করতঃ তৃণ-স্পর্শ করিতেছে, অন্ন ভোজন করতঃ বিদ ভোজন করিতেছে ইত্যাদি প্রয়োগে তৃণ ও বিদ প্রভৃতি কর্তার অনীপিত হইয়াও ক্রিয়া-সদ্ব্যবহৃতঃ কর্মকারক হয়। উদ্যোতকর ক্রিয়া-বিষয়কেই কর্মে কারক শব্দার্থ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, যে পদার্থ ক্রিয়ার বিষয়-ভাবে ব্যবহৃত থাকে, তাহা কর্ম। শেষে বলিয়াছেন যে, এই কর্মলক্ষণের দ্বারা “তথায়ুক্তানীপিতম্” এই কর্মলক্ষণ সংগৃহীত হয়। যে পদার্থ অত্র পদার্থের ক্রিয়াস্বত্ব ফলশালী, তাহাকেই উদ্যোতকর ক্রিয়াবিষয় বলিয়াছেন। তাৎপর্যটীকাকার এইরূপে উদ্যোতকরোক্ত কর্মলক্ষণের ব্যাখ্যা করিয়া বিভিন্ন প্রকার উদাহরণে ঐ কর্মলক্ষণের সংগতি দেখাইয়াছেন। কলকথা, দ্বৈশিত ও অনীপিত, এই বিবিধ কর্মেই একরূপ কর্মলক্ষণ বলা যায়। নব্যগণ তাহা বিশদরূপে দেখাইয়াছেন।

“বৃক্ষের দ্বারা চন্দ্রকে বুঝাইতেছে” এই স্থলে বোদ্ধা বৃক্ষকে বুঝিয়া, তাহার পরেই চন্দ্রকে বুঝিতেছে; এ জন্ত বৃক্ষ করণ কারক হইতেছে। মহর্ষি পানিনি স্বত্র বলিয়াছেন,—“সাধকতমং করণং” ১।৪।৪২। অর্থাৎ ক্রিয়া-সিদ্ধিতে যে কারক প্রকৃষ্ট উপকারক, তাহাই সাধকতম, তাহাই করণকারক হইবে<sup>২</sup>, অন্তান্ত কারকগুলি ক্রিয়ার সাধক হইলেও সাধকতম না হওয়ার করণ-কারক হইবে না। অবশ্য সাধকতমরূপে বিবক্ষিত হইলে, তাহাও করণ-কারক হইবে। উদ্যোতকর বলিয়াছেন যে, যাহার অনন্তরই কার্য জন্মে, এমন কারণই সাধকতম<sup>৩</sup>। উদ্যোতকরের মতে চরম কারণই মুখ্য কারণ। “বৃক্ষের দ্বারা চন্দ্র দেখাইতেছে” এই স্থলে বৃক্ষ দেখিবার পরেই চন্দ্রদর্শন হওয়ার চন্দ্রের জ্ঞাপকগুলির মধ্যে বৃক্ষই ঐ স্থলে প্রদান। কারণ, ঐ বৃক্ষ-জ্ঞানের পরেই চন্দ্রদর্শন হয়, সুতরাং ঐ স্থলে বৃক্ষই চন্দ্রের জ্ঞাপন-ক্রিয়ার সাধকতম হওয়ার করণ-কারক হইয়াছে। “বৃক্ষ উদ্দেশ্যে জলসেক করিতেছে” এই প্রয়োগে বৃক্ষ সম্প্রদানকারক। কারণ, মহর্ষি পানিনি স্বত্র বলিয়াছেন—“কর্মণা বসতিপ্রতি স সম্প্রদানং” ১।৪।৩২। কর্মকারকের দ্বারা যাহাকে উদ্দেশ্য করা হয় অর্থাৎ কর্মকারকের দ্বারা সম্বন্ধ করিবার নিমিত্ত যে পদার্থ দ্বৈশিত হয়, তাহা সম্প্রদান-কারক। “ব্রাহ্মণকে গোদান করিতেছে” এই স্থলে কর্মকারক গোপদার্থের দ্বারা দাতা ব্রাহ্মণকে সম্বন্ধ করার ব্রাহ্মণ সম্প্রদান-কারক। ভাব্যকারের প্রদর্শিত স্থলে সেক-ক্রিয়ার কর্মকারক জলের দ্বারা বৃক্ষ অভিপ্রীত হওয়ার অর্থাৎ বৃক্ষই ঐ স্থলে সিচ্যমান জলের দ্বারা সম্বন্ধ করিতে কর্তার অভীষ্ট হওয়ার সম্প্রদান-কারক হইয়াছে। কেহ কেহ পানিনি-স্বত্রের “কর্মণা” এই কথা দ্বারা দানক্রিয়ার কর্মকারককেই গ্রহণ করিয়া, যে পদার্থ দানক্রিয়ার উদ্দেশ্য, তাহাকেই সম্প্রদান-কারক বলিয়াছেন। ইহাদিগের মতে “সম্প্রদীয়তে বৈধ” এইরূপ ব্যুৎপত্তি অল্পমাত্রায় সম্প্রদান সংজ্ঞাট

১। দ্বৈশিতমতঃ ক্রিয়া-বৃক্ষানীপিতমপি কারকঃ কর্মসংজ্ঞাঃ তাৎ। গ্রামে যজ্ঞংকৃত্য স্পৃশতি। ওদন্তে ভুজ্জনে বিধং ভুজ্জক।—সিদ্ধান্তকৌমুদী।

২। ক্রিয়াবিধৌ প্রকৃষ্টোপকারকঃ কারকঃ করণসংজ্ঞাঃ তাৎ। ওদন্তগ্রহণ্য কি? বলায়া যোয।—সিদ্ধান্তকৌমুদী।

৩। আনন্তর্য্যপ্রতিপত্তিঃ করণত সাধকতমস্বার্থঃ।—ভাষ্যার্থিক।





ভাষ্যকার বাংলায়ন এখানেও “আধারোহিকরণম্” ১।৪।৪৫। এই পাণিনি-সূত্রে উদ্ধৃত করিয়া পূর্বোক্ত প্রয়োগে বৃক্ষের অধিকরণ প্রদর্শন করিয়াছেন। ঐ স্থলে পক্ষিগণের বিদ্যমানতারূপ ক্রিয়ার কর্তার আধার হওয়াতেই বৃক্ষ ঐ ক্রিয়ার আধার হওয়ার অধিকরণ-কারক হইয়াছে। কারণ, পাণিনি-সূত্রে আধার শব্দের দ্বারা ক্রিয়ার আধারই নির্বক্ষিত। অধিকরণ-কারক সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ক্রিয়ার আধার হওয়া সম্ভব নহে বলিয়া, ঐ ক্রিয়ার কর্তা অথবা কর্ম, ইহার কোন একটির আধারই পরম্পরায় ক্রিয়ার আধার হওয়ার, তাহাই অধিকরণ-কারক বলিয়া পাণিনি-সূত্রের দ্বারা বুঝিতে হয়<sup>১</sup>। এই অধিকরণ-কারকের লক্ষণ নিরূপণে বহু সমস্যা আছে। খণ্ডনখণ্ডাদ্য গ্রন্থে শ্রীহর্ষ অধিকরণের লক্ষণ নির্বাচন অসম্ভব বলিয়াছেন। কারকচক্র গ্রন্থে ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশও এ সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছেন। বাহ্য-ভরে সে সকল কথা উল্লেখ না করিয়া, প্রাচীনদিগের ব্যাখ্যাই সংক্ষেপে প্রকাশিত হইল।

ভাষ্যকার একই বৃক্ষের বিভিন্ন ক্রিয়াসম্বন্ধবশতঃ সর্কবিধ কারক প্রদর্শন করিয়া শেষে বলিয়াছেন যে, এইরূপ হইলে অর্থাৎ ক্রিয়াবিশেষের সম্বন্ধবশতই কারক হইলে কেবল জব্যের স্বরূপমাত্র কারক নহে এবং ঐ জব্যের অবাস্তব ক্রিয়ামাত্রও কারক নহে। ভাষ্যকারের গূঢ় অভিপ্রেতি<sup>২</sup> এই যে, শূত্রবাদী মাধ্যমিক যে বলিয়াছেন, জব্যস্বরূপ কারক নহে, তাহা আমরাও স্বীকার করি। তবে তিনি যে কারককে কাল্পনিক বলিয়াছেন অর্থাৎ বাহ্য অনিয়ত, তাহা বাস্তব পদার্থ নহে, যেমন রজ্জুতে কল্পিত সর্প। কারক যখন অনিয়ত (অর্থাৎ বাহ্য কর্তৃকারক, তাহা চিরকাল কর্তৃকারকই হইবে, এরূপ নিয়ম নাই, বাহ্য কর্তৃকারক হয়, তাহা কর্মাদিকারকও হয়), তখন রজ্জু সর্পের মত কারকও বাস্তব পদার্থ নহে; হস্তরাং প্রমাণ ও প্রমের-পদার্থও কারক পদার্থ বলিয়া বাস্তব পদার্থ নহে—উহা কাল্পনিক, মাধ্যমিকের এই কথা স্বীকার করি না। কারণ, কারকের বাহ্য সামান্য লক্ষণ এবং যেগুলি বিশেষ লক্ষণ, তাহা ক্রিয়াভেদে বিভিন্ন স্থলে এক পদার্থে থাকে, উহা থাকিবার কোন বাধা নাই; রজ্জু সর্পের মত উহা প্রমাণ-বোধিত নহে। কারকের সামান্য লক্ষণ বলিবার জন্য ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, কেবল জব্যস্বরূপই কারক নহে, ক্রিয়ামাত্রও কারক নহে। ক্রিয়ার সাধন হইয়া ক্রিয়াবিশেষবৃত্ত পদার্থই কারক। জ্ঞাপার্থ্যটীকাকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, অবাস্তব ক্রিয়ামাত্র কারক নহে। বাহ্য প্রধান ক্রিয়ার সাধন হইয়া, অবাস্তব ক্রিয়াবিশেষবৃত্ত, তাহাই কারক। “সেবদন্ত কুঠারের দ্বারা কাষ্ঠ ছেদন করিতেছে” এই স্থলে ছেদনই প্রধান ক্রিয়া। কর্তা সেবদন্তের কুঠারের উদ্যমন ও নিপাতন অবাস্তব ক্রিয়া। কাষ্ঠের সহিত কুঠারের বিলক্ষণ সংযোগ কাষ্ঠের অবাস্তব ক্রিয়া বা ব্যাপার।

যস্মাৎবাং পতন্তাসৌ। তস্তাপ্যন্ত পতনে কৃত্যাবিক্রিয়াতে। সেবান্তক্রিয়ালেভববিধিঃ পৃথক্ পৃথক্।  
সেবদন্তোঃ স্বক্রিয়াপেক্ষঃ কর্তৃবৎ পৃথক্ পৃথক্।—বাক্যপটীয়া।

১। কর্তৃকর্তব্যাদি তুচ্ছক্রিয়া আধারঃ কারকমধিকরণলক্ষ্যং ত্রাং।—সিদ্ধান্তকৌমুদী।

২। তেন ন ত্রাশব্দভাবঃ কারকমিতি বহুস্তং মাধ্যমিকেন তদ্রূপকমভিন্নতমেন, কাল্পনিকস্ত কারকঃ ন সুবাদ্যং ইত্যেনোভিসন্ধিনা ভাষ্যকারেণোক্তং একম্ সত্তীতি।—জ্ঞাপার্থ্যটীকা।



কারণ, ঐ বিলক্ষণ সংযোগের দ্বারাই কার্ত্তের অবয়ব-বিভাগরূপ বৈধীভাব ( বাহ্য প্রদান বল ) হয় । এখানে দেবদত্ত স্বরূপতাই কার্ত্ত ছেদনের কর্তৃকারক নহে, তাহা হইলে দেবদত্ত কখনও কার্ত্ত ছেদন না করিলেও তাহাকে ছেদনের কর্ত্তা বলা যায় । কারণ, দেবদত্তের স্বরূপ ( বাহ্য কর্তৃকারক বলিতেছে ) সকল অবস্থাতেই আছে এবং দেবদত্তের কুঠার-গোড়র উদ্যমন ও নিপাতনাদিও কর্তৃকারক বলা যায় না । সুতরাং অবাস্তুর ব্যাপারমাত্রকে কারক বলা যায় না । ঐ অবাস্তুর ব্যাপার বিশেষযুক্ত এবং প্রধান ক্রিয়া ছেদনের সাধন দেবদত্ত কুঠার ও কার্ত্তই ঐ স্থলে কারক । ঐরূপ অর্থেই “কারক” শব্দের প্রয়োগ হয় । উদ্যোতকর এখানে বিশদ ভাষার ভাষ্যকারের কথা বুঝাইয়াছেন যে, “কারক” শব্দটি ক্রিয়ামাত্রের প্রযুক্ত হয় না, দ্রব্যমাত্রেরও প্রযুক্ত হয় না, কেবলমাত্র দ্রব্য অথবা কেবলমাত্র ক্রিয়াতে কেহ কারক শব্দের প্রয়োগ করে না । যে সময়ে ক্রিয়ার সহিত দ্রব্যের সম্বন্ধ বুঝা গাইবে, তখনই সেখানে সামান্ততঃ “কারক” এই শব্দের প্রয়োগ হইবে । ক্রিয়ানিমিত্তত্বই কারকসমূহের সামান্ত দর্ম্ম । বিশেষ বিবক্ষা না করিয়া কেবল ঐ ক্রিয়ানিমিত্তত্ব বিবক্ষিত হইলে সামান্ততঃ “কারক” এই শব্দের প্রয়োগ হয় । কারকের বিশেষ বিবক্ষা করিলে তখন কর্ত্ত্ব প্রভৃতি বিশেষ দর্ম্মবিশিষ্ট পদার্থ, কর্ত্ত্ব কর্ম্ম করণ ইত্যাদি কারক-বিশেষবোধক শব্দের দ্বারা কথিত হইবে । অর্থাৎ ঐরূপ পদার্থে কর্ত্ত্ব কর্ম্ম করণ প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগ হইবে । তাই শেবে ভাষ্যকার কর্ত্ত্ব প্রভৃতি কারকের বিশেষ লক্ষণও সংক্ষেপে প্রকাশ করিয়াছেন । উদ্যোতকর ঐ বিশেষ লক্ষণ-বোধক ভাষ্যের ব্যাখ্যার জন্যই বিশেষ দর্ম্ম বিবক্ষার কথা বলিয়াছেন । ফল কথা, কর্ত্ত্ব কর্ম্ম প্রভৃতি কারকও কেবল দ্রব্যস্বরূপ অথবা ক্রিয়ামাত্র নহে । যাহা ক্রিয়ার সাধন হইয়া স্বতন্ত্র, তাহাই কর্তৃকারক, ইত্যাদি প্রকারে পাণিনির লক্ষণানুসারেই কর্ত্ত্ব প্রভৃতি কারকবিশেষের বিশেষ লক্ষণ বুঝিতে হইবে ।

প্রশ্ন হইতে পারে যে, কারকের সামান্ত লক্ষণ বলিতে যাহা ক্রিয়ার সাধন অথবা ক্রিয়াবিশেষ-যুক্ত, ইহার কোন একটি বলিলেই হয়—ক্রিয়াসাধন ও ক্রিয়াবিশেষযুক্ত, এই দুইটি কথা বলা কেন ? এতদ্বারা উদ্যোতকর বলিয়াছেন যে, সকল কারকেরই স্বক্রিয়া-নিমিত্ত কর্ত্ত্বব্যপদেশ আছে । প্রধান ক্রিয়ানাপেক্ষই কারক শব্দের প্রয়োগ । তাৎপর্য্যটাকার এ কথার তাৎপর্য্য বর্ণন করিয়াছেন যে, যদি অবাস্তুর ক্রিয়ার সাধনমাত্রকে কারক বলা যায়, তাহা হইলে অবাস্তুর ক্রিয়াতে সকল কারকেরই কর্ত্ত্ব থাকায়, কারকের বৈচিত্র্য থাকে না । অর্থাৎ সকল কারকই নিজের নিজের অবাস্তুর ক্রিয়ার কর্তৃকারক হওয়ার, অবাস্তুর ক্রিয়ার সাধনমাত্রই কারক, এ কথা বলিলে উহা স্ব স্ব ক্রিয়ার কর্তৃকারকেরই লক্ষণ বলা হয় ; উহাতে কর্ত্ত্ব কর্ম্ম প্রভৃতি সকল কারকের সামান্ত লক্ষণ ব্যক্ত হয় না । প্রধান ক্রিয়ার সাধনই কারক, এই মাত্র বলিলেও অবাস্তুর ব্যাপার ব্যতীত সকল কারকের বৈচিত্র্য সম্ভব হয় না, এ জন্য বলা হইয়াছে—প্রধান ক্রিয়ার সাধন হইয়া যাহা অবাস্তুর ক্রিয়াবিশেষযুক্ত, তাহাই কারক । কারকমাত্রই স্ব স্ব অবাস্তুর ক্রিয়ার স্বতন্ত্র বলিয়া “কর্ত্তা” হইলেও অথবা স্ব স্ব ব্যাপার দ্বারা স্বতন্ত্রভাবে ক্রিয়াজনক বলিয়া কর্ত্তা হইলেও ব্যাপারবিশেষকে অপেক্ষা করিয়া কর্ম্ম করণ প্রভৃতিও হইতে পারে । ভর্তৃহরিরও এই কথা

বলিয়াই সমাধান করিয়া গিয়াছেন। মূল কথা, কারকমাত্রই স্ব স্ব অবাস্তব ক্রিয়ার দ্বারা প্রবান ক্রিয়ার সাধন হয়, তাই ভাষ্যকার কারকের সামান্য লক্ষণ বলিয়াছেন—প্রবান ক্রিয়ার সাধন ও অবাস্তব ক্রিয়াবিশেষযুক্ত। অর্থাৎ অবাস্তব ক্রিয়াবিশেষযুক্ত হইয়া বাহা প্রবান ক্রিয়ার সাধন বা নিষ্পাদক হয়, তাহাই কারক। ভাষ্যকার শেষে বলিয়াছেন যে, পূর্বোক্তরূপ কারকার্থের অস্বাভাব্য অর্থাৎ কারক-শব্দার্থ নিরূপণ যুক্তির দ্বারা যেমন হয়, লক্ষণের দ্বারাও অর্থাৎ মহর্ষি পাণিনির কারক-লক্ষণ সূত্রের দ্বারাও সেইরূপই বৃত্তিতে হইবে। তাৎপর্য্য এই যে, পাণিনিরও এইরূপ লক্ষণ অতিমত। ভাষ্যকার “লক্ষণতঃ” এই কথার দ্বারা মহর্ষি পাণিনির কারক-প্রকল্পের “কারক” (১।১।২৩) এই সূত্রটিকে লক্ষ্য করিয়াছেন। উদ্যোতকরও ভাষ্যকারের “লক্ষণতঃ” এই কথার ব্যাখ্যার জন্য “এবঞ্চ শাস্ত্রং” বলিয়া মহর্ষি পাণিনির ঐ সূত্রটির উল্লেখ করিয়াছেন। এবং শেষে “জনকে নির্বাক্তকে” এই কথার দ্বারা ঐ সূত্রের ব্যাখ্যা প্রকাশ করিয়াছেন। অর্থাৎ মহর্ষি পাণিনি ঐ সূত্রে “কারক” শব্দের দ্বারা কারকের সামান্য লক্ষণ সূচনা করিয়াছেন। কারক শব্দের দ্বারা বুঝা যায়—ক্রিয়ার জনক। মহাভাষ্যকারও “করোতি ক্রিয়াং নির্বাক্তকতি” এইরূপ ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন করিয়া মহর্ষি পাণিনি-সূত্রোক্ত কারক শব্দার্থ নির্বচনপূর্বক কারকের ঐরূপই লক্ষণ সূচনা করিয়াছেন। তদনুসারে উদ্যোতকরও পাণিনি-সূত্রের ঐরূপ ব্যাখ্যা প্রকাশ করিয়া শেষে বলিয়াছেন যে, ইহা স্ব স্ব অবাস্তব ক্রিয়ামাত্রকে অপেক্ষা করিয়া মহর্ষি পাণিনি বলেন নাই, প্রবান ক্রিয়াকে অপেক্ষা করিয়াই বলিয়াছেন। অর্থাৎ স্ব স্ব অবাস্তব ক্রিয়াবিশেষযুক্ত হইয়া বাহা প্রবান ক্রিয়ার সাধন হয়, পাণিনি “কারক” শব্দের দ্বারা তাহাকেই কারক বলিয়া সূচনাকরিয়াছেন। কল কথা, যুক্তির দ্বারা কারক-শব্দার্থ বেরূপ বুঝা যায়, মহর্ষি পাণিনি-সূত্রের দ্বারাও তাহাই বৃত্তিতে হইবে, ইহাই ভাষ্যকারের এখানে মূল বক্তব্য। ভাষ্যকার শেষে বলিয়াছেন যে, “কারক” এই অস্বাভাব্য ও (সমাখ্যাত) অর্থাৎ কারক শব্দও সূত্ররূপে কেবল জব্যমাত্রে এবং ক্রিয়ামাত্রে প্রযুক্ত হয় না, অবাস্তব ক্রিয়াবিশেষযুক্ত হইয়া প্রবান ক্রিয়ার সাধন-পদার্থেই কারক শব্দ প্রযুক্ত হয়। আগতি হইতে পারে যে, যদি ক্রিয়াসম্বন্ধ প্রযুক্তই কারক শব্দের প্রয়োগ হয়, তাহা হইলে যে ব্যক্তি পাক করিতেছে, সেই ব্যক্তিতেই তৎকালে “পাচক” শব্দের প্রয়োগ হইতে পারে। যে ব্যক্তি পাক করিয়াছিল এবং যে ব্যক্তি পাক করিবে, সেই ব্যক্তিতে “পাচক” শব্দের প্রয়োগ হইতে পারে না। কারণ, সেই ব্যক্তিতে তখন পাক-ক্রিয়ার সম্বন্ধ নাই। বস্তুতঃ কিন্তু ঐরূপ ব্যক্তিতেও “পাচক” শব্দের প্রয়োগ হইয়া থাকে। উদ্যোতকর এই আগতির উল্লেখ করিয়া সমাধান করিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি পাক করিয়াছে অথবা পাক করিবে, তাহাতে পাক-ক্রিয়ার সম্বন্ধ না থাকিলেও তখন পাক-ক্রিয়ার শক্তি আছে। শক্তি কালক্রমেই থাকে। ঐ শক্তিকে গ্রহণ করিয়াই ঐরূপ ব্যক্তিতে “পাচক” প্রভৃতি কারক শব্দের প্রয়োগ হয়। ক্রিয়ার সামর্থ্য ও উপায়-জ্ঞানই শক্তি। ক্রিয়া বলিতে এখানে বাস্তুর্গ, তাহা গুণ পদার্থও হইতে পারে। যে পদার্থে ক্রিয়া-সম্বন্ধ ও শক্তি, উভয়ই আছে, তাহাতে “কারক” শব্দ-প্রয়োগ মুখ্য। যেখানে ক্রিয়া সম্বন্ধ নাই, কেবল সামর্থ্য ও



উপায়পরিজ্ঞানরূপ শক্তি আছে, সেখানে “কারক” শব্দের প্রয়োগ ঘোঁষ। যে ব্যক্তি পাক করিতেছে না, পূর্বে করিয়াছিল অথবা পরে করিবে, তাহাতে “পাচক” শব্দের প্রয়োগ মুখ্য নহে। ভাষ্যকার মুখ্য কারকের লক্ষণ বলিতেই “ক্রিয়াবিশেষবৃত্ত” এইরূপ কথা বলিয়াছেন।

ভাষ্যকার এত কথা বলিয়া, শেষে উহার প্রকৃত বক্তব্যের সহিত ইহার সৌজন্য করিয়াছেন যে, “প্রমাণ” ও “প্রমেয়” শব্দও যখন কারক শব্দ, তখন তাহাতেও কারক-ধর্ম থাকিবে, তাহা কারক-ধর্ম ত্যাগ করিতে পারে না। উদ্যোক্তকরও ঐরূপ কথা বলিয়া প্রকৃত বক্তব্যের যোজনা করিয়া তাৎপর্য বর্ণন করিয়াছেন যে, যেমন “পাচক” প্রভৃতি কারক শব্দ ক্রিয়াবিশেষের সম্বন্ধ থাকিলে মুখ্যরূপে প্রযুক্ত হয়, ক্রিয়াবিশেষের সম্বন্ধবশতঃই পাচক প্রভৃতি কারক শব্দ, সেইরূপ ক্রিয়াবিশেষের (প্রমাজ্ঞানের) সম্বন্ধবশতঃ “প্রমাণ” ও “প্রমেয়” শব্দও কারক শব্দ। অর্থাৎ প্রমাজ্ঞানরূপ ক্রিয়ার করণকারক অর্থেই মুখ্য প্রমাণ শব্দ প্রযুক্ত হয় এবং প্রমাজ্ঞানরূপ ক্রিয়ার বিষয়রূপ কর্মকারক অর্থেই মুখ্য প্রমেয় শব্দ প্রযুক্ত হয়। সুতরাং প্রমাণ শব্দ ও প্রমেয় শব্দ কারক-শব্দ বা কারকবোধক শব্দ। কারকবোধক শব্দ নিয়মতঃ চিরকাল একবিধ কারক বুঝাইতেই প্রযুক্ত হয় না। নিমিত্ত-ভেদে উহা বিভিন্ন কারক বুঝাইতেও প্রযুক্ত হয়। কর্মকারকও করণকারক হয়, করণকারকও কর্মাদি কারক হয়। একই বৃত্ত ক্রিয়াভেদে সর্বপ্রকার কারকই হইয়া থাকে। এক কারকের বোধক হইয়া নিমিত্তভেদে অল্প কারকের বোধকর কারক শব্দের ধর্ম। ভাষ্যকার উহাকেই বলিয়াছেন—কারক-ধর্ম। প্রমাণ ও প্রমেয় শব্দও কারক-শব্দ বলিয়া পূর্বোক্ত কারক-ধর্ম ত্যাগ করিতে পারে না। কারণ, তাহা হইলে উহা কারক-শব্দই হইতে পারে না। মূলকথা, প্রমাণ ও প্রমেয় কারক-পদার্থ বলিয়া, উহা কখনও অন্তবিধ কারকও হয়, অর্থাৎ প্রমাণও প্রমেয় হয়, প্রমেয়ও প্রমাণ হয়। নিমিত্তভেদে একই পদার্থ প্রমাণ ও প্রমেয় হইতে পারে, তাহাতে উহা অনিয়ত বলিয়া রজ্জু সর্পাদির ভায় অবাস্তব, ইহা বলা যায় না। কারক-পদার্থ ঐরূপ অনিয়ত। ঐরূপ অনিয়ত হইলেই যে তাহা অবাস্তব হইবে, এ বিষয়ে কোন প্রমাণ নাই। সুতরাং শূন্যবাদী বাধ্যমিকের ঐ পূর্বপক্ষ গ্রাহ্য নহে ॥ ১৬ ॥

ভাষ্য। অস্তি ভোঃ—কারকশব্দানাং নিমিত্তবশাৎ সমাবেশঃ, প্রত্যক্ষাদীনি চ প্রমাণানি, উপলব্ধিহেতুহাৎ, প্রমেয়কোপলব্ধিবিষয়হাৎ। সংবেদ্যানি চ প্রত্যক্ষাদীনি, প্রত্যক্ষেনোপলভে, অনুমানেনোপলভে, উপমানেনোপলভে, আগমেনোপলভে, প্রত্যক্ষং মে জ্ঞানং, আনুমানিকং মে জ্ঞানং, উপমানিকং মে জ্ঞানং, আগমিকং মে জ্ঞানমিতি বিশেষা গৃহ্যন্তে। লক্ষণতশ্চ জ্ঞাপ্যমানানি জ্ঞায়ন্তে বিশেষণে “দ্বিয়ার্থসম্বন্ধবোধো-পন্নং জ্ঞান”মিত্যেবমাদিনা। সেয়মুপলব্ধিঃ, প্রত্যক্ষাদিবিষয়া কিং প্রমাণান্তরতোহধাস্তরেণ প্রমাণান্তরমসাধনেতি।

অনুবাদ। কারক শব্দগুলির (কর্তৃ কর্ম প্রভৃতি কারকবোধক সংজ্ঞা-গুলির) নিমিত্তবশতঃ অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন কারক-সংজ্ঞার ভিন্ন ভিন্ন নিমিত্তবশতঃ সমাবেশ আছে। উপলব্ধির হেতু বলিয়া প্রত্যক্ষ প্রভৃতি প্রমাণ, এবং উপলব্ধির বিষয় বলিয়া (প্রত্যক্ষ প্রভৃতি) প্রমেয়। যেহেতু প্রত্যক্ষের দ্বারা উপলব্ধি করিতেছি, অনুমানের দ্বারা উপলব্ধি করিতেছি, উপমানের দ্বারা উপলব্ধি করিতেছি, আগম অর্থাৎ শব্দপ্রমাণের দ্বারা উপলব্ধি করিতেছি, (এইরূপে) প্রত্যক্ষ প্রভৃতি সংবেদ্য অর্থাৎ জ্ঞানের বিষয় হয়। (এবং) আমার প্রত্যক্ষ জ্ঞান, আমার আনুমানিক জ্ঞান, আমার ঔপমানিক অর্থাৎ উপমান-প্রমাণ-জ্ঞান, আমার আগমিক অর্থাৎ শব্দপ্রমাণ-জ্ঞান, এইরূপে বিশেষ অর্থাৎ প্রত্যক্ষ প্রভৃতি জ্ঞানবিশেষ গৃহীত (উপলব্ধির বিষয়) হইতেছে। ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সন্নিবর্তন জ্ঞান উৎপন্ন জ্ঞান (প্রত্যক্ষ) ইত্যাদি লক্ষণের দ্বারাও জ্ঞাপ্যমান (প্রত্যক্ষ প্রভৃতি) বিশেষরূপে গৃহীত হইতেছে।

[অর্থাৎ এ সমস্তই স্বীকার করিলাম, কিন্তু এখন জিজ্ঞাস্য এই যে] প্রত্যক্ষাদি-বিষয়ক সেই এই উপলব্ধি কি প্রমাণান্তরের দ্বারা অর্থাৎ গোতমোক্ত প্রত্যক্ষাদি চতুর্বিধ প্রমাণ হইতে ভিন্ন কোন প্রমাণের দ্বারা হয়? অথবা প্রমাণান্তর ব্যতীত “অসাধন”? অর্থাৎ প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ-বিষয়ক যে উপলব্ধি হয়, তাহা কোন সাধন বা প্রমাণ-জ্ঞান নহে, উহা প্রমাণ ব্যতীতই হয়?

উত্তর। এখন পূর্বপক্ষবাদী পূর্বোক্ত সিদ্ধান্ত স্বীকার করিয়া প্রকারান্তরে অল্প পূর্বপক্ষের অবতারণা করিতেছেন। তাৎপর্যাটীকাকারও উল্লেখ্যকরের “অস্তি ভোঃ” ইত্যাদি বাক্তিকের এইরূপেই অবতারণা বুঝাইয়াছেন। ভাষ্যে “ভোঃ” এই কথার দ্বারা সিদ্ধান্তবাদীকে সন্ধান করিয়া পূর্বপক্ষবাদিরূপে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, করণ ও কর্ম প্রভৃতি কারকবোধক সংজ্ঞাগুলির ভিন্ন ভিন্ন নিমিত্তবশতঃ একত্র সমাবেশ আছে’ অর্থাৎ উহা স্বীকার করিলাম। প্রমাণ শব্দটি করণ-কাৎক-বোধক শব্দ, প্রমের শব্দটি কর্মকারক-বোধক শব্দ। নিমিত্তবশতঃ যখন করণ-কারকও কর্মকারক হইতে পারে, তখন প্রমাণও প্রমের হইতে পারে। উপলব্ধির হেতুইই প্রমাণ সংজ্ঞার নিমিত্ত। প্রত্যক্ষ প্রভৃতি উপলব্ধির হেতু, স্তবরাং তাহাদিগকে প্রমাণ বলা হয় এবং উপলব্ধির বিষয়ইই প্রমের সংজ্ঞার নিমিত্ত। প্রত্যক্ষ প্রভৃতি উপলব্ধির বিষয়ও হয়, এ জন্ম তাহাদিগকে প্রমেরও বলা যায়। প্রত্যক্ষ প্রভৃতি উপলব্ধির হেতু, ইহা কিরূপে বুঝিব? এই জন্ম বলিয়াছেন, “সংবেদ্যানি চ” ইত্যাদি। এখানে “চ” শব্দটি হেতুর্বাচক। অর্থাৎ যেহেতু প্রত্যক্ষের দ্বারা উপলব্ধি



করিতেছি, ইত্যাদি প্রকারে প্রত্যক্ষাদি সংবেদ্য বা বোধের বিষয় হইতেছে, অতএব প্রত্যক্ষাদি উপলব্ধির হেতু। উহাদিগের দ্বারা উপলব্ধি করিতেছি, ইহা বুঝিলে উহাদিগকে উপলব্ধির হেতু বলিয়াই বুঝা হয়। প্রত্যক্ষাদি উপলব্ধির বিষয় হয়, ইহা কিরূপে বুঝিব? এ জ্ঞান বলিয়াছেন, “প্রত্যক্ষং মে জ্ঞানং” ইত্যাদি। অর্থাৎ আমার প্রত্যক্ষ জ্ঞান, ইত্যাদি প্রকারে যখন প্রত্যক্ষাদির উপলব্ধি হইতেছে, তখন উহারা উপলব্ধির বিষয় হয়, ইহা অবশ্য স্বীকার্য। এবং প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের লক্ষণের দ্বারাও বিশেষরূপে ঐ প্রত্যক্ষাদির উপলব্ধি হইতেছে। ফল কথা, প্রত্যক্ষ প্রভৃতি উপলব্ধির হেতু বলিয়া প্রমাণ হইলেও, উহারা যখন উপলব্ধির বিষয় হয়, তখন উহারা প্রমেয়ও হয়, ইহা স্বীকার করিলাম, কিন্তু এখন প্রশ্ন এই যে, সেই প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ-বিষয়ক যে উপলব্ধি হয়, তাহা কি উহা হইতে ভিন্ন কোন প্রমাণের দ্বারা হয়? অথবা ঐ উপলব্ধি প্রমাণ ব্যতীতই হয়? উহাতে কোন প্রমাণ আবশ্যক হয় না।

ভাষ্য। কশ্চাত্ত বিশেষঃ?

অনুবাদ। ইহাতে বিশেষ কি? অর্থাৎ প্রত্যক্ষ প্রভৃতি প্রমাণবিষয়ক যে উপলব্ধি হয়, তাহা অথ কোন প্রমাণের দ্বারা হইলে অথবা বিনা প্রমাণে হইলে, এই উভয় পক্ষে বিশেষ কি? উহার যে-কোন পক্ষ অবলম্বন করিলে দোষ কি?

মূত্র। প্রমাণতঃ সিদ্ধেঃ প্রমাণানাং প্রমাণান্তর-  
সিদ্ধিপ্রসঙ্গঃ ॥১৭॥৭৮॥

অনুবাদ। প্রমাণগুলির প্রমাণের দ্বারা সিদ্ধি হইলে [ অর্থাৎ যদি বল, প্রত্যক্ষ প্রভৃতি প্রমাণবিষয়ে যে উপলব্ধি হয়, তাহা প্রমাণের দ্বারাই হয়, তাহা হইলে ] তজ্জাত প্রমাণান্তরের সিদ্ধির প্রসঙ্গ হয় অর্থাৎ প্রত্যক্ষাদি প্রমাণচতুষ্টয়ের ভিন্ন অথ প্রমাণ স্বীকারের আপত্তি হয়।

ভাষ্য। যদি প্রত্যক্ষাদীনি প্রমাণেনোপলভ্যন্তে, যেন প্রমাণেনোপলভ্যন্তে তৎ প্রমাণান্তরমস্মীতি প্রমাণান্তরসম্ভাবঃ প্রসজ্যত ইতি অনবস্থামাহ তস্তাপ্যন্তেন তস্তাপ্যন্তেনেতি। ন চানবস্থা শক্যাহ-  
নুজাতুমনুপপত্তেরিতি।

অনুবাদ। যদি প্রত্যক্ষ প্রভৃতি ( প্রমাণচতুষ্টয় ) প্রমাণের দ্বারা উপলব্ধ হয়, ( তাহা হইলে ) যে প্রমাণের দ্বারা উপলব্ধ হয়, সেই প্রমাণান্তর আছে, এ জন্য প্রমাণান্তরের অস্তিত্ব প্রসঙ্গ হয় [ অর্থাৎ তাহা হইলে প্রত্যক্ষাদি প্রমাণচতুষ্টয়ের

উপলক্ষিসাধন অতিরিক্ত প্রমাণ স্বীকার করিতে হয়] এই কথাই দ্বারা (মহর্ষি) অনবস্থা অর্থাৎ অনবস্থা নামক দোষ বলিয়াছেন। (কিছুতে অনবস্থা-দোষ হয়, তাহা ভাষ্যকার বলিতেছেন) সেই প্রমাণাস্তরেরও অন্য প্রমাণের দ্বারা উপলক্ষি হয়, সেই অন্য প্রমাণেরও অন্য অর্থাৎ তদ্বিন্ন প্রমাণের দ্বারা উপলক্ষি হয়। অনবস্থা-দোষকে (এখানে) অনুমোদন করিতেও পারা যায় না; কারণ, উপপত্তি (যুক্তি) নাই।

টিপ্পনী। পূর্ণপক্ষবাদীর নিকটে প্রশ্ন হইয়াছে যে, প্রত্যক্ষাদি প্রমাণচতুষ্টয়-বিষয়ক যে উপলক্ষি হয়, তাহা যদি প্রমাণের দ্বারা হয়, অথবা বিনা প্রমাণেই হয়, এই উভয় পক্ষে দোষ কি? ভাষ্যকার মহর্ষি-সূত্রের অবতারণা করিয়া এই প্রশ্নের উত্তর প্রকাশ করিয়াছেন। মহর্ষি এই সূত্র ও ইহার পরবর্তী সূত্র, এই দুইটি পূর্ণপক্ষ-সূত্রের দ্বারা পূর্বোক্ত উভয় পক্ষের দোষ প্রদর্শন করতঃ তাহার যুক্তির পূর্ণপক্ষটি প্রকাশ করিয়াছেন। এই সূত্রে বলা হইয়াছে যে, যদি প্রমাণের দ্বারা প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ-চতুষ্টয়ের উপলক্ষি স্বীকার কর, তাহা হইলে সেই প্রমাণকে প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ-চতুষ্টয় হইতে অতিরিক্ত প্রমাণ বলিয়াই স্বীকার করিতে হইবে। কারণ, নিজের নিজের উপলক্ষি সাধন হইতে পারে না। প্রত্যক্ষাদি প্রমাণকে উপলক্ষি করিতে হইলে, তাহা হইতে ভিন্ন কোন প্রমাণের দ্বারা তাহা করিতে হইবে। তাহা হইলে ঐ অতিরিক্ত প্রমাণের উপলক্ষির জন্তও আবার তাহা হইতে ভিন্ন আর একটি প্রমাণ স্বীকার করিতে হইবে। এইরূপ সেই অতিরিক্ত প্রমাণটির উপলক্ষির জন্ত আবার তাহা হইতে ভিন্ন আর একটি প্রমাণ স্বীকার করিতে হইবে। এইরূপে অসংখ্য ভিন্ন ভিন্ন প্রমাণ স্বীকারের আপত্তি হওয়ায়, এ পক্ষে অনবস্থা নামক দোষ হইয়া পড়ে। ফলস্বরূপ, মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা প্রথম পক্ষে অনবস্থা-দোষেরই সূচনা করিয়াছেন। ভাষ্যকার সূত্রার্থ বর্ণনায় “মহর্ষি অনবস্থা বলিয়াছেন” এই কথা বলিয়া, শেষে কিছুতে অনবস্থা-দোষ হয়, তাহাও দেখাইয়াছেন। যেখানে বাধ্য হইয়া উভয় পক্ষেরই অনবস্থা স্বীকার করিতে হয়, সেখানে উহা স্বীকারের যুক্তি থাকায়, সেই প্রামাণিক অনবস্থা উভয় পক্ষই অনুমোদন করিয়া থাকেন এবং যুক্তি থাকায় তাহা করিতে পারেন। কিন্তু এখানে পূর্বোক্ত অনবস্থা স্বীকারের কোন যুক্তি না থাকায়, উহা অনুমোদন করা যায় না। ভাষ্যকার শেষে এই কথা বলিয়া মহর্ষি-

১। অনবস্থা পুনরাপ্রামাণিকানন্তপ্রমাণবুল্যপ্রসঙ্গঃ। বধ্যা ঘটক্যং যদি বাবদ্যটকেতুযুক্তি স্তাদ্ভটকজন্তুযুক্তি ন স্তাবিতি।—তর্কসাগরীণী। যেস্বপ্ন আপত্তি-প্রবাহের অন্ত নাই অর্থাৎ তুল্য যুক্তিতে যেস্বপ্ন আপত্তি ধারাবাহিক চলিবে, কোন দিনই তাহার নিবৃত্তি হইবে না, ঐরূপ আপত্তির নাম অনবস্থা। নবামতে উহা এক প্রকার তর্ক। ই অনবস্থা প্রামাণিক হইলে উহা যৌব বা অনবস্থাই হয় না। যেমন স্বীকার কর্তব্য ব্যতিরেকে সন্দেহ হয় না এবং সন্দেহ ব্যতিরেকেও কর্তব্য অনস্বয়। সূত্ররূপে ঐ সন্দেহ ও কর্তব্যের প্রবাহ ও উহাদ্বয়ের পরস্পর কার্যকারণ ভাবপ্রবাহ অনাবি বলিয়াই প্রামাণিক হইয়াছে। এ সন্দেহ ও কর্তব্যের কার্যকারণ-ভাবে অনবস্থা প্রামাণিক হওয়ায় উহা যৌব নহে—উহা স্বীকার্য। জলদীপের লক্ষণানুসারে উহা অনবস্থাই নহে।



স্থিতি পূৰ্বপক্ষের সমর্থন করিয়াছেন। তাহা হইলে দাঁড়াইল যে, প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ-চতুষ্টয়-বিষয়ক যে উপলব্ধি হয়, তাহা প্রমাণের দ্বারাই হয়, এই প্রথম পক্ষ বলা যায় না; ঐ পক্ষে অনবস্থা-দোষ অনিবার্হ । ১৭।

**ভাষ্য।** অস্ত তর্হি প্রমাণান্তরমন্তরেণ নিঃসাধনেতি ।

অনুবাদ। তাহা হইলে অর্থাৎ প্রথম পক্ষে অনবস্থা-দোষ হইলে ( প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ-চতুষ্টয়বিষয়ক উপলব্ধি ) প্রমাণান্তর ব্যতীত নিঃসাধন অর্থাৎ সাধনশূন্য হউক ?

**সূত্র।** তদ্বিনিয়ন্তেৰ্হা প্রমাণসিদ্ধিবং প্রমেয়-  
সিদ্ধিঃ ॥১৮॥৭৯॥

অনুবাদ। তাহার নিবৃত্তি হইলে অর্থাৎ প্রত্যক্ষাদি প্রমাণবিষয়ক উপলব্ধিতে প্রমাণান্তরের নিবৃত্তি বা অভাব স্বীকার করিলে, প্রমাণ-সিদ্ধির স্থায় প্রমেয়-সিদ্ধি হয় [ অর্থাৎ তাহা হইলে প্রমেয়বিষয়ক উপলব্ধিতেও প্রমাণ স্বীকারের আবশ্যকতা থাকে না। প্রমাণের উপলব্ধির স্থায় প্রমেয়ের উপলব্ধিও বিনা প্রমাণে হইতে পারে ] ।

**ভাষ্য।** যদি প্রত্যক্ষাদ্যুপলব্ধৌ প্রমাণান্তরং নিবর্ততে, আন্তেত্বুপ-  
লব্ধাবপি প্রমাণান্তরং নিবর্ত্ত্যন্ত্যবিশেষাৎ । এবঞ্চ সৰ্ব্বপ্রমাণবিলোপ  
ইত্যত আহ—

অনুবাদ। যদি প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের উপলব্ধিতে প্রমাণান্তর নিবৃত্ত হয় অর্থাৎ যদি বিনা প্রমাণেই প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের উপলব্ধি হয়—এই পক্ষ স্বীকার কর, তাহা হইলে আত্মা প্রভৃতির ( প্রমেয় পদার্থের ) উপলব্ধিতেও প্রমাণান্তর নিবৃত্ত হইবে। কারণ, বিশেষ নাই অর্থাৎ তাহা হইলে প্রমেয়বিষয়ক উপলব্ধির জন্তও কোন প্রমাণ স্বীকারের আবশ্যকতা থাকে না। এইরূপ হইলে অর্থাৎ প্রমাণবিষয়ক উপলব্ধির স্থায় প্রমেয়বিষয়ক উপলব্ধিতেও কোন প্রমাণ স্বীকার আবশ্যক না হইলে, সকল প্রমাণের লোপ হয়, এই জন্ত অর্থাৎ পূর্বোক্ত পূর্বপক্ষের সমাধানের জন্ত (মহদি পরবর্তী সূত্রটি) বলিয়াছেন ।

টীকণী। প্রমাণের দ্বারাই প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের উপলব্ধি হয়, এই প্রথম পক্ষে অনবস্থা-দোষ-বশতঃ যদি বিনা প্রমাণেই প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের উপলব্ধি হয়, এই দ্বিতীয় পক্ষ গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে সৰ্ব্বপ্রমাণের লোপ হইয়া যায়। কারণ, যদি প্রমাণ ব্যতীতও প্রমাণের উপলব্ধি হইতে পারে, তবে প্রমেয়ের উপলব্ধিও প্রমাণ ব্যতীত হইতে পারে। প্রমাণের উপলব্ধিতে

প্রমাণ আবশ্যক হয় না; কিন্তু প্রমের উপলক্ষিতে প্রমাণ আবশ্যক হয়, প্রমাণ ও প্রমেয়ে এমন বিশেষত কিছু নাই। প্রমাণ ব্যতীত প্রমেরসিদ্ধি হয় না বলিয়া, আত্মা প্রভৃতি প্রমের সিদ্ধির জন্ত প্রমাণ পদার্থ স্বীকার করা হইয়াছে। কিন্তু ঐ প্রমাণরূপ-প্রমেরসিদ্ধি যদি বিনা প্রমাণেই হইতে পারে, তাহা হইলে তাহার জ্ঞান আত্মা প্রভৃতি প্রমেরসিদ্ধিই বা বিনা প্রমাণে কেন হইতে পারিবে না? সুতরাং বিনা প্রমাণে প্রমাণসিদ্ধি স্বীকার করিলে, প্রমেরসিদ্ধিও বিনা প্রমাণে স্বীকার করিতে হইবে। তাহা হইলে প্রমাণ বলিয়া কোন পদার্থই নাই, ইহাই স্বীকার করা হইল। ইহারই নাম সর্বপ্রমাণবিলোপ। প্রমাণ বলিয়া কোন পদার্থ না থাকিলে, প্রমাণের দ্বারা আর কোন পদার্থ সিদ্ধ করা যাইবে না। সুতরাং শূন্যবাদই স্বীকার করিতে হইবে, ইহাই এখানে শূন্যবাদী পূর্বপক্ষীর চরম গৃহ্য অভিসন্ধি। অর্থাৎ প্রমাণের দ্বারাই প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের উপলক্ষি স্বীকার করিলে, বহন পূর্বোক্ত প্রকারে অনবস্থা-দোষ হইয়া পড়িবে, তখন বিনা প্রমাণেই প্রমাণসিদ্ধি মানিতে হইবে, তাহা হইলে আর কুত্রাপি বস্তৃসিদ্ধির জন্ত প্রমাণ স্বীকারের আবশ্যকতা না থাকায়, প্রমাণের বলে বস্তৃসিদ্ধি হয়, এ কথা বলা যাইবে না। বস্তৃসিদ্ধি না হইলেই শূন্যবাদ আসিয়া পড়িল, ইহাই পূর্বপক্ষবাদীর বিবক্ষিত চরম বক্তব্য। ভাষ্যে "আত্মত্বপলক্ষ্যাবপি" এই স্থলে 'ইতি' শব্দটি 'আদি' অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে অর্থাৎ আত্মা প্রভৃতি যে দাবশবিশ প্রমের দ্বারা হইয়াছে (বাহ্যাদিগের তত্ত্বজ্ঞানের জন্ত প্রমাণ স্বীকৃত), তাহাদিগের উপলক্ষিও বিনা প্রমাণে কেন হইবে না? ইতি শব্দের 'আদি' অর্থ কোথায় বর্ণিত আছে? ১৮।

### সূত্র। ন প্রদীপপ্রকাশসিদ্ধিবৎ তৎসিদ্ধেঃ ॥১৯॥৮০॥

অনুবাদ। (উত্তর) না অর্থাৎ পূর্বোক্ত পূর্বপক্ষ হয় না। কারণ, প্রদীপালোকের সিদ্ধির জায় তাহাদিগের (প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের) সিদ্ধি হয় [অর্থাৎ যেমন প্রদীপালোক প্রত্যক্ষ প্রমাণ হইলেও চক্ষুঃসম্বন্ধরূপ প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারা তাহার উপলক্ষি হয়, তদ্রূপ প্রত্যক্ষ প্রভৃতি প্রমাণের প্রত্যক্ষাদি প্রমাণান্তরের দ্বারাই সিদ্ধি বা উপলক্ষি হয়, তাহাতে অতিরিক্ত কোন প্রমাণ স্বীকার আবশ্যক হয় না]।

বিস্তৃতি। মহর্ষি এই সিদ্ধান্ত-সূত্রের দ্বারা পূর্বোক্ত পূর্বপক্ষের সমাধান হুচনা করিয়াছেন। মহর্ষির সিদ্ধান্ত এই যে, প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের দ্বারাই প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের সিদ্ধি বা উপলক্ষি হয়, সুতরাং পূর্বোক্ত পূর্বপক্ষে যে অনবস্থা-দোষ অথবা সর্বপ্রমাণ-বিলোপ, তাহা হয় না। মহর্ষি একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়া তাহার ঐ সিদ্ধান্তের হুচনা ও সমর্থন করিয়াছেন। প্রদীপালোক প্রত্যক্ষের সাধন হওয়ায়, প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলিয়া কথিত হয়। উদাহরণ সিদ্ধি বা উপলক্ষি চক্ষুঃসম্বন্ধরূপ প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারাই হইতেছে। সুতরাং সঙ্গতীয় প্রমাণের দ্বারা সঙ্গতীয় প্রমাণান্তরের



উপলব্ধি সকলেরই স্বীকার্য। প্রমাণের উপলব্ধির জন্ত বিজাতীয় অতিরিক্ত প্রমাণ স্বীকারের কোনই আবশ্যকতা নাই, সুতরাং ঐ অতিরিক্ত প্রমাণের উপলব্ধির জন্ত আরও বিজাতীয় অতিরিক্ত প্রমাণ স্বীকার করিতে বাধ্য হওয়ার, অনবস্থানোন্মেষের প্রসঙ্গও নাই। এবং বস্তুনিষ্ঠতামাত্রই প্রমাণের আবশ্যকতা স্বীকার করার, সর্বপ্রমাণের বিলোপও নাই। ফলকথা, পদার্থমাত্রেরই উপলব্ধিতে প্রমাণ আবশ্যক। প্রমাণের উপলব্ধিও প্রমাণের দ্বারাই হয়। প্রত্যক্ষ প্রকৃতি যে চারিটি প্রমাণ স্বীকৃত হইয়াছে, তাহাদিগের উপলব্ধি তাহাদিগের দ্বারাই হয়। তাহাতে অতিরিক্ত কোন প্রমাণ স্বীকার আবশ্যক হয় না।

আপত্তি হইতে পারে যে, বাহ্য উপলব্ধির বিষয়, তাহাই ঐ উপলব্ধির সাধন হইতে পারে না। প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারাই প্রত্যক্ষ প্রমাণের উপলব্ধি কখনই হইতে পারে না। কোন পদার্থ কি নিজেই নিজের গ্রাহক হইতে পারে? এতদ্বত্তরে বক্তব্য এই যে, প্রত্যক্ষ প্রমাণ-পদার্থ বহু আছে। তন্মধ্যে কোন একটি প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারা তজ্জাতীয় অল্প প্রত্যক্ষ প্রমাণের উপলব্ধি হইতে পারে, তাহার কোন বাধ্য নাই; বস্তুতঃ তাহাই হইয়া থাকে। প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারা প্রত্যক্ষ প্রমাণ-মাত্রেরই উপলব্ধি হয় না, এইরূপ নিয়ম বলা যায় না। তাহা হইলে চক্ষুঃসমিকর্ষরূপ প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারা প্রদীপালোকরূপ প্রত্যক্ষ প্রমাণের উপলব্ধি হইতেছে কেন? সুতরাং সজাতীয় প্রমাণের দ্বারা সজাতীয় প্রমাণান্তরের উপলব্ধি হয়, ইহা অবশ্য স্বীকার্য। এইরূপ অহুমানাদি প্রমাণেরও সজাতীয় অল্প অহুমানাদি প্রমাণের দ্বারা উপলব্ধি হয় এবং তাহা হইতে পারে। যেমন কোন জলাশয় হইতে উদ্ধৃত জলের দ্বারা "সেই জলাশয়ের জল এই প্রকার" ইহা অহুমান করা যায়। ঐ স্থলে জলাশয় হইতে উদ্ধৃত জল, ঐ জলাশয়ে অবস্থিত জল হইতে ভিন্ন এবং তাহার সজাতীয়। জলাশয়ে যে জল অবস্থিত আছে, উদ্ধৃত জল ঠিক সেই জলই নহে, কিন্তু উহাও সেই জলাশয়ের জলই বটে। তাহা হইলেও উহা ঐ জলাশয়স্থ জলবিষয়ক উপলব্ধিবিষয়ের সাধন হইতেছে।

পরন্তু বাহ্য জ্ঞানের বিষয়, তাহা ঐ জ্ঞানের সাধন হয় না অর্থাৎ কোন পদার্থই নিজে নিজের গ্রাহক হয় না, এইরূপ নিয়মও স্বীকার করা যায় না। কারণ, আমি স্থবী, আমি জংঘী, এইরূপে আত্মা নিজেই নিজের উপলব্ধি করিতেছেন। এখানে আত্মা নিজে গ্রাহক হইয়াও গ্রাহক হইতেছেন এবং মনঃপদার্থের যে অহুমিতিরূপ জ্ঞান হয়, তাহাতে মনও সাধন। মনের দ্বারা মনঃপদার্থের অহুমিতিরূপ উপলব্ধি হওয়ার, সেখানে মনঃপদার্থ গ্রাহক হইয়া গ্রাহকও হইতেছে।

ফলকথা, প্রত্যক্ষ প্রকৃতি যে চারিটি প্রমাণ স্বীকার করা হইয়াছে, বিবরণস্বরূপে তাহাদিগের দ্বারাই সকল পদার্থের উপলব্ধি হয়। ঐ চারিটি প্রমাণের কোনটিরই বিবরণ হয় না, এমন কোন পদার্থ নাই। সুতরাং উহা হইতে অতিরিক্ত কোন প্রমাণ স্বীকার নিষ্পত্তোজ্জন। প্রত্যক্ষ প্রকৃতি চারিটি প্রমাণও যথাসম্ভব উহাদিগের সজাতীয় বিজাতীয় ঐ চারিটি প্রমাণেরই বিষয় হয়, উহাদিগের উপলব্ধি নিষাধন নহে, উহা হইতে অতিরিক্ত কোন প্রমাণ সাধ্যও নহে, সুতরাং পূর্ণোক্ত পূর্ণপক্ষ হয় না।

টপননী। মহর্ষি এই হৃত্রের দ্বারা পূর্বোক্ত পূর্বপক্ষের প্রতিবেশ করিয়া সিদ্ধান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন, সুতরাং এইট মহর্ষির সিদ্ধান্তহৃত্র। পূর্বোক্ত দুইটি পূর্বপক্ষ-হৃত্র। পূর্বোক্ত দুইটি হৃত্র উদ্যোতকর প্রকৃতি উদ্ধৃত করিয়াছেন, জ্ঞায়তবালোকে বাচস্পতি মিশ্র উদ্ধৃত করিয়াছেন, জ্ঞায়তটীনিবন্ধেও হৃত্ররূপে ঐ দুইটি উল্লিখিত হইয়াছে। জ্ঞায়তবালোকে বাচস্পতি মিশ্র “প্রদীপপ্রকাশবৎ তৎসিদ্ধোঃ” এইরূপ হৃত্র-পাঠ উল্লেখ করিয়াছেন। কোন পুস্তকে “ন দীপপ্রকাশবৎ তৎসিদ্ধোঃ” এইরূপ হৃত্র-পাঠ দেখা যায়। বুদ্ধিকার প্রভৃতি নব্যগণ “ন প্রদীপপ্রকাশবৎ তৎসিদ্ধোঃ” এইরূপই হৃত্র-পাঠ অবলম্বন করিয়াছেন। কিন্তু প্রাচীন উদ্যোতকর “ন প্রদীপপ্রকাশসিদ্ধিবৎ তৎসিদ্ধোঃ” এইরূপ হৃত্র-পাঠ উল্লেখ করায় এবং জ্ঞায়তটীনিবন্ধেও ঐরূপ হৃত্র-পাঠ থাকায় এবং ঐরূপ হৃত্র-পাঠই অসংগত বোধ হওয়ায়, ঐরূপ হৃত্র-পাঠই গৃহীত হইয়াছে। হৃত্রে “সিদ্ধি” শব্দের অর্থ জ্ঞান বা উপলব্ধি। যেমন প্রদীপ প্রকাশের অর্থাৎ প্রদীপরূপ আলোকের সিদ্ধি, তরুণ তৎসিদ্ধি অর্থাৎ প্রমাণ-সিদ্ধি। এইরূপ সাদৃশ্যই অসংগত ও হৃত্রকার মহর্ষির অভিপ্রেত মনে হয়। নব্য ব্যাখ্যাকারগণের মধ্যে কাহারও কাহারও মতে এই হৃত্রে পূর্বোক্ত সপ্তদশ হৃত্র হইতে “প্রমাণাস্তরসিদ্ধিপ্রদঃ” এই অংশের অন্তর্ভুক্তিই মহর্ষির অভিপ্রেত। ঐ অংশের সহিত এই হৃত্রের আদিশ্লিষ্ট “ন”-কারের যোগ করিয়া ব্যাখ্যা হইবে যে, প্রমাণাস্তর সিদ্ধি প্রদত্ত হয় না অর্থাৎ প্রমাণ সিদ্ধির জন্ত প্রমাণাস্তর স্বীকার আবশ্যক। ইহাদিগের অভিপ্রায় এই যে, প্রমাণ ব্যতীতই প্রমাণের সিদ্ধি হয়, ইহা বধন কিছুতেই বলা যাইবে না, (তাহা বলিলে প্রমাণ-সিদ্ধিও বিনা প্রমাণে হইতে পারে; প্রমাণ স্বীকারের কুজাপি আবশ্যকতা থাকে না, সর্বপ্রমাণ বিলোপ হয়) তখন প্রমাণের দ্বারাই প্রমাণ-সিদ্ধি হয়, এই পক্ষই স্বীকার করিতে হইবে। তাহা হইলে প্রমাণ-সিদ্ধির জন্ত প্রমাণাস্তর স্বীকার আবশ্যক। কারণ, প্রমাণ নিজেই নিজের গ্রাহক বা বোধক হইতে পারে না। প্রমাণ জ্ঞানের জন্ত আবার তত্ত্বের কোন প্রমাণ আবশ্যক। এই ভাবে সেই প্রমাণাস্তর জ্ঞানের জন্ত আবার অতিরিক্ত প্রমাণ আবশ্যক হওয়ায়, অনবহা-দোষ অনিবার্য। ঐ অনবহাই পূর্বোক্ত পূর্বপক্ষ। মহর্ষি এই হৃত্রের দ্বারা উহারই নিরাস করিয়াছেন। মহর্ষি এই হৃত্রে বলিয়াছেন যে, না, প্রমাণাস্তর-সিদ্ধির আপত্তি হয় না অর্থাৎ অনবহাদোষের কারণ নাই। তাৎপর্যটীকাকার এই ভাবে পূর্বপক্ষ ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের উপলব্ধির কি কোন সাধন আছে? অথবা উহার কোন সাধন নাই? সাধন থাকিলেও কি ঐ সকল প্রমাণই উপলব্ধির সাধন? অথবা প্রমাণাস্তরই উহাদিগের উপলব্ধির সাধন? উহাদিগের উপলব্ধিতে উহারাই সাধন, এ পক্ষেও কি সেই প্রমাণের দ্বারা ঠিক সেই প্রমাণপদার্থটিরই উপলব্ধি হয়, অথবা তত্ত্বের প্রমাণ পদার্থের উপলব্ধি হয়? সেই প্রমাণের দ্বারাই সেই প্রমাণের উপলব্ধি কখনই হইতে পারে না। কারণ, কোন পদার্থেরই নিজের স্বরূপে নিজের কোন জিহ্বা হয় না। সেই অনিবার্য দ্বারা সেই অনিবার্যই ক্ষেদ্র হইতে পারে না। অজ্ঞ প্রমাণের দ্বারা প্রমাণের উপলব্ধি স্বীকার করিলে, অতিরিক্ত প্রমাণের স্বীকারবশতঃ মহর্ষির প্রমাণ-বিভাগ-হৃত্র ব্যাখ্যাত হয়। কারণ, মহর্ষি



সেই ক্ষেত্রে কেবল প্রত্যক্ষ, অতুমান, উপমান ও শব্দ, এই চারটি প্রমাণেরই উল্লেখ করিয়াছেন এবং প্রমাণের উপলব্ধির জন্য প্রমাণান্তর স্বীকার করিলে, তাহার উপলব্ধির জন্য আবার প্রমাণান্তর স্বীকার আবশ্যক হওয়ার, ঐ ভাবে অনন্ত প্রমাণ স্বীকার-মূলক অনবস্থা-সেই হয়। সুতরাং প্রমাণের উপলব্ধির কোন সাধন নাই, ইহাই বলিতে হইবে। তাহা হইলে প্রমাণের উপলব্ধিরও কোন সাধন নাই, ইহা বলা যায়। প্রমাণবিষয়ক যে উপলব্ধি হইতেছে, প্রমাণবিষয়ক উপলব্ধির জ্ঞান তাহারও কোন সাধন নাই, ইহাই স্বীকার্য। তাৎপর্যাত্মকতার এই ভাবে পূর্ণগত ব্যাখ্যা করিয়া, উত্তর-পক্ষের ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের উপলব্ধির সাধন আছে, অতিরিক্ত কোন প্রমাণও উহার সাধন নহে। প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের সঙ্গতীয় ঐ প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের দ্বারা তাহাদিগের উপলব্ধি হয়। ঠিক সেই প্রমাণটির দ্বারা সেই প্রমাণটির উপলব্ধি স্বীকার করি না; সুতরাং তজ্জাত কোন দোষ হইবে না এবং এই সিদ্ধান্তে অনবস্থা-সেই হয় না। কারণ, কোন প্রমাণ-পদার্থ নিজের জ্ঞানের দ্বারা অন্য পদার্থের জ্ঞানের সাধন হয়,—যেমন ধূম প্রভৃতি। ধূম প্রভৃতি অতুমান-পদার্থের জ্ঞানই বহিঃপ্রভৃতি অতুমানের পদার্থের অনুমিতিতে আবশ্যক হয়। অজ্ঞাত ধূম বহির অতুমানক হয় না এবং কোনও প্রমাণ পদার্থ অজ্ঞাত থাকিয়াও জ্ঞানের সাধন হয়;—যেমন চকুরাদি। চাকুরাদি প্রত্যক্ষে চক্ষুঃ প্রভৃতির জ্ঞান আবশ্যক হয় না। বিষয়ের সহিত উহাদিগের সঙ্গিকবিশেষ হইলেই প্রত্যক্ষ জন্মে। চকুরাদি প্রমাণের জ্ঞানে কাহারও ইচ্ছা হইলে, তিনি অতুমানাদি দ্বারা তাহারও উপলব্ধি করিতে পারেন। চকুরাদি প্রমাণেরও উপলব্ধি হইতে পারে। অতুমানাদি প্রমাণই তাহার সাধন হয়, তাহাও নিঃসমাধা বা নিঃসাধন নহে। প্রকৃত হলে অনবস্থাসেই বোধ্য বিষয়ে যুক্তি এই যে, যদি প্রমাণের জ্ঞান প্রমাণসাপেক্ষ হয়, তাহা হইলে সেই প্রমাণান্তরের জ্ঞানেও আবার প্রমাণান্তর আবশ্যক, তাহার জ্ঞানেও আবার প্রমাণান্তর আবশ্যক, এই ভাবে সর্বত্রই যদি প্রমাণের দ্বারা প্রমাণের জ্ঞান আবশ্যক হইল, তাহা হইলে কোন দিনই প্রমাণের জ্ঞান হইতে পারিল না। কারণ, প্রমাণ-বিষয়ক প্রথম জ্ঞান করিতে যে প্রমাণ আবশ্যক হইবে, তাহার জ্ঞান আবশ্যক, তাহাতে আবার প্রমাণান্তরের জ্ঞান আবশ্যক, এই ভাবে অনন্ত প্রমাণের জ্ঞান আবশ্যক হইলে অনন্ত কালেও তাহা সম্ভব হয় না; সুতরাং কোন প্রমাণেরই কোন কালে উপলব্ধি হইতে পারে না। কিন্তু যদি প্রমাণের জ্ঞানে সর্বত্রই প্রমাণ আবশ্যক হইলেও, প্রমাণের জ্ঞান সর্বত্র আবশ্যক হয় না, ইহাই সত্য হয়, তাহা হইলে পূর্ণোক্ত অনবস্থা-বোধের সম্ভাবনা নাই, বস্তুতঃ তাহাই সত্য। প্রমাণের দ্বারা বস্তুর উপলব্ধি হলে সর্বত্রই প্রমাণের জ্ঞান আবশ্যক হয় না, প্রমাণই আবশ্যক হয়। অনেক প্রমাণ অজ্ঞাত থাকিয়াও প্রমাণের উপলব্ধি জন্মায়। যে সকল প্রমাণ নিজের জ্ঞানের দ্বারা উপলব্ধি-সাধন হয়, সেইগুলির জ্ঞান আবশ্যক হইলেও, আবার সেই জ্ঞানের জ্ঞান বা তাহার সাধন প্রমাণের জ্ঞান আবশ্যক হয় না। অবশ্য যে সকল জ্ঞানেরও সাধন আছে, ইচ্ছা করিলে প্রমাণের দ্বারা সেই সকল জ্ঞান হইতে পারে। কিন্তু যদি প্রমাণের জ্ঞানে প্রমাণজ্ঞানের দ্বারা আবশ্যক না হয় অর্থাৎ এক প্রমাণের জ্ঞান করিতে অনন্ত প্রমাণের জ্ঞান আবশ্যক না হয়, তাহা হইলে পূর্ণোক্ত অনবস্থা-

দোষ এখানে হইবে কেন ? তাহা হইতে পারে না। প্রমাণের প্রামাণ্য নিশ্চয় না হইলে, প্রমাণের দ্বারা বস্তু বুঝিয়াও ভবিষ্যে প্রবৃত্তি হয় না ; সুতরাং প্রামাণ্য নিশ্চয়ের অল্প প্রমাণান্তরের অপেক্ষা হইলে, পূর্বোক্ত প্রকারে অনবস্থা-দোষ হইয়া পড়ে, এ কথাও বলা যায় না। কারণ, প্রমাণের প্রামাণ্য নিশ্চয় না হইলেও অথবা প্রামাণ্য সংশয় থাকিলেও তত্ত্বারা বস্তুবোধ হইয়া থাকে এবং সেই বস্তুবোধের পরে প্রবৃত্তিও হইয়া থাকে। প্রবৃত্তির প্রতি সর্বত্র প্রমাণের প্রামাণ্য নিশ্চয় আবশ্যক নহে। প্রবৃত্তির পরে সকল প্রবৃত্তিজনকর হেতুর দ্বারা প্রমাণে প্রামাণ্য নিশ্চয় হয়। কোন কোন প্রমাণে সকল-প্রবৃত্তিজনক-সঙ্গাতীয়র হেতুর দ্বারা পূর্বোক্ত প্রামাণ্য নিশ্চয় হয়। অদৃষ্টার্শক বেনাদি শব্দপ্রমাণে পূর্বোক্ত প্রামাণ্য নিশ্চয় হয়, পরে বাগাদি বিষয়ে প্রবৃত্তি হয়। শব্দ-প্রমাণের মধ্যে যেগুলি সকল প্রবৃত্তিজনক বলিয়া নিশ্চিত হইয়াছে, সেইগুলির সঙ্গাতীয়র হেতুর দ্বারা অল্পাংশ অদৃষ্টার্শক শব্দপ্রমাণে পূর্বোক্ত প্রামাণ্য নিশ্চয় হইয়া থাকে। এ সকল কথা প্রথমাবস্থার প্রারম্ভে বলা হইয়াছে। প্রমাণের দ্বারা বস্তুবোধ হইলে প্রবৃত্তির সফলতা অথবা প্রবৃত্তির সফলতা হইলে প্রমাণ দ্বারা বস্তুবোধ, ইহার কোনটি পূর্ব এবং কোনটি পর ? এই দুইটি পরস্পর-সাপেক্ষ হইলে অজ্ঞোক্তাশ্রয়-দোষ হয়, এই কথার উত্তরে উদ্যোতকর বার্তিকারস্তে বলিয়াছেন যে, এই সংসার বধন অনানি, তখন ঐ দোষ হইতে পারে না। অনানি কাল হইতেই প্রমাণের দ্বারা বস্তুবোধ হইতেছে।

রসিকার বিখ্যাত প্রভৃতি নবাগণ এই শব্দের তাৎপর্য্য বর্ণন করিয়াছেন যে, যেমন প্রদীপালোক ঘটাদি পদার্থের প্রকাশক হয়, তদ্রূপ প্রমাণ প্রমেয়ের প্রকাশক হয়। অতথা প্রদীপ ঘাটের প্রকাশক, প্রদীপের প্রকাশক চক্ক, চক্কর প্রকাশক অল্প প্রমাণ, এইরূপে অনবস্থা-দোষ হয় বলিয়া, প্রদীপও ঘাটের প্রকাশক না হইত ? যদি বল, ঘট প্রত্যক্ষে তাহার প্রকাশকদিগের সকলেরই অপেক্ষা করে না, সুতরাং অনবস্থা-দোষ নাই, তাহা হইলে প্রকৃত স্থলেও তাহাই সত্য। প্রমাণের দ্বারা প্রমেয়নিক্তিতে প্রমাণসিদ্ধি বা প্রমাণের জ্ঞান আবশ্যক হয় না। প্রদীপের দ্বারা ঘাটের প্রত্যক্ষে কি প্রদীপের জ্ঞান আবশ্যক হইয়া থাকে ? প্রদীপই আবশ্যক হইয়া থাকে। যে সময়ে প্রমাণের দ্বারা বস্তুসিদ্ধিতে প্রমাণের জ্ঞান আবশ্যক হয়, যে সময়ে সেখানে অসুমনাদি প্রমাণের দ্বারাই সেই প্রমাণ-জ্ঞান হইবে, সুতরাং অতিরিক্ত প্রমাণ করনা বা অনবস্থা-দোষ নাই। কারণ, সর্বত্র প্রমাণ-জ্ঞান আবশ্যক হয় না। যদিও কোন স্থলে প্রমাণ-জ্ঞানের দ্বারা আবশ্যক হয়, তাহাতেও ক্ষতি নাই। কারণ, বীজাকুরের জায় স্থলপ্রবাহ অনাদি বলিয়া, ঐরূপ স্থলে অনবস্থা প্রামাণিক—উহা দোষ নহে। ভাষ্যকার বাংলায়ন প্রভৃতি প্রাচীনগণ কিন্তু এই ভাবে স্বার্থার্থ বর্ণন করেন নাই। ভাষ্য-বাখ্যায় পরে ইহা ব্যক্ত হইবে।

মহর্ষি এই শব্দে একটি দৃষ্টান্তমাত্র প্রদর্শন দ্বারা তাহার সিদ্ধান্ত-সম্বন্ধিক যে জ্ঞানের সূচনা করিয়াছেন, উদ্যোতকর তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন<sup>১</sup>। কেবল একটা দৃষ্টান্তমাত্রের দ্বারা কোন সিদ্ধান্ত

১। দৃষ্টান্তমাত্রমতঃ কোহম জ্ঞায় ইতি। অয়ং জ্ঞায় উচ্যতে। প্রত্যক্ষাদানি খোলসকৌ প্রমাণান্তরাপ্রত্যক্ষাদানি পরিকল্পনামনবাং প্রদীপবৎ, যথা প্রদীপঃ পরিকল্পনামনবাং খোলসকৌ ন প্রমাণান্তরং প্রত্যক্ষাদানীতি তথা প্রমাণানি।



মাধন করা যায় না। মহর্ষির অভিমত সিদ্ধান্তসারক জায় কি, তাহা অবশ্য বুঝিতে হইবে। প্রচলিত ভাংপর্যায়টাকা গ্রহে এই স্থলের উল্লেখ এবং ইহার ব্যক্তিকের অনেক উপযোগী কথার ব্যাখ্যা বা আলোচনা দেখা যায় না। এখানেও যে কোনও কারণে ভাংপর্যায়টাকা গ্রহের অনেক অংশ মুদ্রিত হয় নাই, ইহা মনে হয়।

ভাষ্য। যথা প্রদীপপ্রকাশঃ প্রত্যক্ষাদ্ব্যং দৃশ্যদর্শনে প্রমাণং, স চ প্রত্যক্ষান্তরেণ চক্ষুঃ সন্নির্কর্ষণে গৃহ্যতে। প্রদীপভাবাবয়বো-  
দর্শনস্ত তথাভাবাদর্শনহেতুরনুমীয়তে, তমসি প্রদীপমুপাদদীখা  
ইত্যাণ্ডোপদেশোনাপি প্রতিপদ্যতে। এবং প্রত্যক্ষাদীনাং যথাদর্শনং  
প্রত্যক্ষাদিভিরেবোপলব্ধিঃ। ইন্দ্রিয়াণি তাবৎ স্ববিষয়গ্রহণে-  
নৈবানুমীয়ন্তে, অর্থাৎ প্রত্যক্ষতো গৃহ্যন্তে, ইন্দ্রিয়ার্থসন্নির্কর্ষণাবরণেন  
লিপ্সেয়ানুমীয়ন্তে, ইন্দ্রিয়ার্থসন্নির্কর্ষণেপন্নং জ্ঞানমাস্ত্রমনসোঃ সংযোগ-  
বিশেবাদাস্ত্রসমবায়াক্ত স্বধাদিবদগৃহ্যতে। এবং প্রমাণবিশেষো  
বিভজ্য বচনীয়ঃ। যথা চ দৃশ্যঃ সন্ প্রদীপপ্রকাশো দৃশ্যাস্ত্রাণাং  
দর্শনহেতুরিতি দৃশ্যদর্শনব্যবস্থাং লভতে এবং প্রমেয়ং সং কিঞ্চিদর্ধজাত-  
মুপলব্ধিহেতুত্বাৎ প্রমাণ-প্রমেয়-ব্যবস্থাং লভতে। সেয়ং প্রত্যক্ষাদিভিরেব  
প্রত্যক্ষাদীনাং যথাদর্শনমুপলব্ধির্ন প্রমাণান্তরতো ন চ প্রমাণমন্তরেণ  
নিঃসাদনেতি।

অনুবাদ। যেমন প্রদীপালোক প্রত্যক্ষের অঙ্গ বলিয়া অর্থাৎ স্থলবিশেষে  
চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের সহকারী কারণ বলিয়া দৃশ্য বস্তুর দর্শনে প্রমাণ, সেই প্রদীপালোক  
আবার চক্ষুঃসন্নির্কর্ষণ প্রত্যক্ষ প্রমাণান্তরের দ্বারা জ্ঞাত হয়।

প্রদীপের সত্তা ও অসত্তাতে দর্শনের তথাভাব ( সত্তা ও অসত্তা )-বশতঃ অর্থাৎ  
প্রদীপ থাকিলেই সেখানে দর্শন হয়, প্রদীপ না থাকিলে দর্শন হয় না, এ জন্ত  
( প্রদীপ ) দর্শনের হেতুরূপে অনুমিত হয়। অঙ্ককারে “প্রদীপ গ্রহণ কর” এইরূপ  
আপ্তবাক্যের দ্বারাও প্রতিপন্ন হয়, অর্থাৎ প্রদীপকে দৃশ্য দর্শনের হেতু বলিয়া বুঝা

তন্ত্রাং তান্তপি প্রমাণান্ত্রাণ্ডোষকানীতি দিক্। সামান্তবিশেষবদ্ব্যক্তং নং সামান্যবিশেষবৎ তৎ যোপলব্ধৌ ন  
প্রত্যক্ষাদিভিরেকি প্রমাণং প্রয়োজ্যমিতি যথা প্রদীপ ইতি। সংবেদ্যত্বং নং সংবেদ্যঃ তৎ প্রত্যক্ষাদিভিরেকি  
প্রমাণান্ত্রাণ্ডোষকং যথা প্রদীপ ইতি। আদিত্বাৎ করণত্বাৎ ইত্যেবমিতি। প্রদীপবিশিষ্টত্বাৎপ্রয়োজ্যি প্রত্যক্ষাদ্ব্যং  
প্রত্যক্ষাদিভিরেকি প্রমাণান্ত্রাণ্ডোষকং ইতি সমানং।—মাহবাহিক ।

যায়। এইরূপ প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের বখাদর্শন অর্থাৎ যেখানে ঘেরূপ দেখা যায়, তদনুসারে প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের দ্বারাই উপলব্ধি হয়। ইন্দ্রিয়গুলি নিজের বিষয়-জ্ঞানের দ্বারাই অনুমিত হয় [ অর্থাৎ রূপাদি বিষয়গুলির যখন জ্ঞান হইতেছে, তখন অবশ্য এই সকল বিষয়-জ্ঞানের সাধন বা করণ আছে, এইরূপে ইন্দ্রিয়গুলির অনুমান প্রমাণের দ্বারাই উপলব্ধি হয় ] অর্থগুলি অর্থাৎ রূপ রস প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ার্থগুলি প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারা জ্ঞাত হয়। ইন্দ্রিয়ের সহিত অর্থের সন্নিবিষ্ট কিন্তু আবরণ অর্থাৎ ব্যবধানরূপ হেতুর দ্বারা অনুমিত হয় [ অর্থাৎ আবৃত বা ব্যবহিত বস্তুর যখন প্রত্যক্ষ হয় না, তখন তদ্বারা বুঝা যায়, ইন্দ্রিয়ের সহিত তাহার গ্রাহ্য বস্তুর সন্নিবিষ্টবিশেষ প্রত্যক্ষের কারণ ] ইন্দ্রিয়ের সহিত অর্থের সন্নিবিষ্টবশতঃ উৎপন্ন জ্ঞান, আত্মা ও মনের সংযোগ-বিশেষ-হেতুক এবং আত্মার সমসার-সম্বন্ধ-হেতুক সুখাদির জ্ঞান গৃহীত ( প্রত্যক্ষের বিষয় ) হয়। এইরূপ প্রমাণবিশেষকে বিভাগ করিয়া অর্থাৎ বিশেষরূপে ব্যাখ্যা করিয়া বলিতে হইবে [ অর্থাৎ অত্যাশ্রয় প্রমাণবিশেষও যে যে প্রমাণের দ্বারা উপলব্ধি হয়, তাহা বুঝিয়া লইতে হইবে ]।

এবং ঘেরূপ প্রদীপালোক দৃশ্য হইয়া দৃশ্যাস্তরের দর্শনের হেতু, এ জ্ঞাত দৃশ্য দর্শন ব্যবস্থা লাভ করে, অর্থাৎ প্রদীপ যেমন দৃশ্য বা দর্শন-ক্রিয়ার কর্তৃক হইয়াও “দর্শন” অর্থাৎ দর্শন-ক্রিয়ার সাধন বা করণ হইতেছে, এইরূপ কোন পদার্থসমূহ প্রমেয় হইয়া উপলব্ধির হেতুবশতঃ অর্থাৎ উপলব্ধির বিষয় হইয়াও উহা আবার উপলব্ধির হেতু হয় বলিয়া, প্রমাণ প্রমেয় ব্যবস্থা লাভ করে, অর্থাৎ ঐ পদার্থ প্রমেয়ও হয়, প্রমাণও হয়। সেই এই প্রত্যক্ষ প্রভৃতি প্রমাণের উপলব্ধি বখাদর্শন অর্থাৎ ঘেরূপ দেখা যায়, তদনুসারে প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের দ্বারাই হয়—প্রমাণাস্তরের দ্বারা হয় না, প্রমাণ ব্যতীত নিসোধনও নহে।

টিপ্পনী। ভাষ্যকার মহর্ষি-স্বত্রোক্ত “প্রদীপপ্রকাশসিদ্ধিবৎ” এই দৃষ্টান্ত-বাক্যটির ব্যাখ্যার জন্ত প্রথমে বলিয়াছেন যে, যেমন প্রদীপালোক হলবিশেষে প্রত্যক্ষের সহকারী কারণ বলিয়া দৃশ্য দর্শনে প্রকাশ অর্থাৎ প্রত্যক্ষ প্রমাণ, ঐ প্রদীপালোকরূপ প্রত্যক্ষ প্রমাণকে আবার চক্ষুঃসম্বন্ধরূপ প্রত্যক্ষ প্রমাণাস্তরের দ্বারা প্রত্যক্ষ করা যায়। ভাষ্যকারের এই ব্যাখ্যার দ্বারা বুঝা যায় যে, “প্রদীপপ্রকাশসিদ্ধিবৎ” ইহাই তাহার সমস্ত পার্থ, এবং সজাতীয় প্রমাণের দ্বারা সজাতীয় অতঃ প্রমাণের উপলব্ধি হইয়া থাকে, ইহা সর্বসম্বৎ, ইহাই ভাষ্যকারের মতে মহর্ষি ঐ দৃষ্টান্ত-বাক্যের দ্বারা সূচনা করিয়াছেন। প্রদীপালোক প্রত্যক্ষ প্রমাণ, চক্ষুঃসম্বন্ধও প্রত্যক্ষ



প্রমাণ। চক্ৰবর্তিরূপের দ্বারা প্রদীপের জ্ঞান হইলে, প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারাও প্রত্যক্ষ প্রমাণের জ্ঞান হয়, ইহা সকলেরই স্বীকার্য। ঐ দলে প্রদীপালোকরূপ প্রত্যক্ষ প্রমাণ হইতে চক্ৰবর্তিরূপ প্রত্যক্ষ প্রমাণ ভিন্ন, কিন্তু উহাও প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলিয়া প্রদীপালোকের সমজাতীয়। প্রদীপালোক প্রত্যক্ষ প্রমাণ কিভাবে হইবে, তাহাতে প্রশ্ন কি, ইহা বলিতে হইবে। তাই ভাষ্যকার সূত্রোক্ত দৃষ্টান্ত-বাক্যের ব্যাখ্যা করিয়াই মধ্যে বলিয়াছেন যে, প্রদীপ থাকিলে দর্শন হয় (অমর), প্রদীপ না থাকিলে দর্শন হয় না (ব্যতিরেক), এই অমর ও ব্যতিরেকবশতঃ স্থলবিশেষে প্রদীপকে দর্শনের হেতু বলিয়া অনুমান করা যায়। এবং “অনুকারে প্রদীপ গ্রহণ কর” এইরূপ শব্দ-প্রমাণের দ্বারাও প্রদীপ যে দর্শনের হেতু, তাহা বুঝা যায়। ফলস্বরূপ, অনুমান-প্রমাণ ও শব্দ-প্রমাণের দ্বারা প্রদীপকে যখন দর্শনের হেতু বলিয়া বুঝা যায়, তখন প্রদীপ প্রত্যক্ষ প্রমাণ, ইহা বুঝা গেল। যথার্থ জ্ঞানের কারণই মুখ্য প্রমাণ হইলেও যথার্থ জ্ঞানের কারণমাত্রকেই প্রাচীনগণ “প্রমাণ” বলিতেন। বহু স্থলেই ইহা পাওয়া যায়। মহর্ষির এই সূত্রে প্রদীপ-প্রকাশের প্রমাণরূপে গ্রহণ চিত্রা করিলেও তাহা বুঝা যায়। ভাষ্যকারও প্রদীপালোককে স্পষ্ট ভাষায় এখানে প্রমাণ বলিয়াছেন। প্রদীপালোক দৃষ্ট দর্শনের হেতু, ইহা অনুমান ও শব্দ-প্রমাণের দ্বারা বুঝা যায়, সুতরাং উহা প্রত্যক্ষ প্রমাণ। উহা যথার্থ প্রত্যক্ষের কারণরূপ মুখ্য প্রমাণ না হইলেও, তাহার সহকারী হওয়ায়, সৌম প্রত্যক্ষ প্রমাণ, ইহাই প্রাচীনদিগের সিদ্ধান্ত। তাহা হইলে প্রমাতা ও প্রমের প্রকৃতিও প্রমাণ হইয়া পড়ে। এতদ্বারা প্রাচীনদিগের কথা এই যে, যথার্থ জ্ঞানের কারণই মুখ্য প্রমাণ, তাহাকেই এখানে প্রমের প্রকৃতি হইতে পুণর্ক উল্লেখ করা হইয়াছে। প্রমের প্রকৃতিও যথার্থ জ্ঞানের কারণরূপ সৌম প্রমাণ হইবে। তাহাতেও প্রমাণ শব্দের সৌম প্রয়োগ সূচিকাল হইতেই দেখা যায়। এখানে ভাষ্যকারের পরবর্তী কথার দ্বারাও এই কথা পাওয়া যায়। উদ্যোতকদের কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে (প্রথম পঃ, তৃতীয় সূত্র ঐষ্টব্য)।

ভাষ্যকার সূত্রোক্ত দৃষ্টান্তের ব্যাখ্যা করিয়া, শেষে সূত্রোক্ত “তৎসিদ্ধাঃ” এই কথার ব্যাখ্যা করিতে বলিয়াছেন যে, এইরূপ প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের, প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের দ্বারাও উপলব্ধি হয়। প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের মধ্যে কোন প্রমাণের দ্বারা কোন প্রমাণের উপলব্ধি হয়? এ দ্বন্দ্ব বলিয়াছেন— “দগদর্শনঃ” অর্থাৎ উহাদিগের মধ্যে যে প্রমাণের দ্বারা যে প্রমাণের উপলব্ধি দেখা যায় বা বুঝা যায়, তদনুসারেই উহা বলিতে হইবে। যে প্রত্যক্ষ প্রমাণের প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারা উপলব্ধি হয়— ইহা বুঝা যায়, তাহার উপলব্ধি প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারা হয়, ইহা বলিতে হইবে। এইরূপ অন্যান্য প্রমাণ সকলও বলিতে হইবে। ভাষ্যকার পরে, প্রমাণের দ্বারা যে প্রমাণের উপলব্ধি হয়, ইহা বিশেষ করিয়া দেখাইবার জন্য প্রত্যক্ষ প্রমাণকে গ্রহণ করিয়া বলিয়াছেন যে, ইন্দ্রিয়গুলির অর্গাৎ ইন্দ্রিয়গুলি প্রত্যক্ষ প্রমাণের অনুমান প্রমাণের দ্বারা উপলব্ধি হয়। রূপ, রস প্রভৃতি পদার্থগুলি ইন্দ্রিয়ারে বিধর। ইন্দ্রিয়ার দ্বারা উহাদিগের প্রত্যক্ষ জ্ঞান করে। ঐ রূপাদি বিষয়গুলির যে জ্ঞান হইতেছে, ইহা বর্ণনাত্মক। তাহা হইলে ঐ জ্ঞানের অবস্থা করণ আছে, ইহা অনুমানের দ্বারা বুঝা যায়। স্বর জ্ঞানমাত্রেরই করণ আছে। রূপাদিবিষয়ক জ্ঞান প্রত্যক্ষও জ্ঞান জ্ঞান বলিয়া,

তাহার করণও অবশ্য স্বীকার্য। অত্বে রূপ প্রত্যক্ষ হয় না, সুতরাং রূপ প্রত্যক্ষে চক্ষুঃ আবশ্যক, এই ভাবে রূপাবিব্যক্ত প্রত্যক্ষের দ্বারা ইন্দ্রিয়রূপ প্রত্যক্ষ প্রমাণের অনুমান হয়। রূপাবিব্যক্ত লৌকিক প্রত্যক্ষে রূপাদি অর্থ (ইন্দ্রিয়ার্থ) গুলিও কারণ। বস্তুার্থ প্রত্যক্ষের কারণমাত্রকে প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করিলে, ঐ অর্থগুলিকেও গ্রহণ করিতে হয় এবং উহারিসেরও উপলব্ধি কেনে প্রমাণের দ্বারা হয়, তাহা বলিতে হয়। তাই ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, অর্থগুলির অর্থান্ধ রূপাদি ইন্দ্রিয়ার্থগুলির প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারা উপলব্ধি হয়। এবং ইন্দ্রিয়ার্থের সহিত ঐ অর্থের অর্থান্ধ রূপাদি বিষয়ের সমীকরণ বা সম্বন্ধবিশেষ প্রত্যক্ষে সাফাৎ কারণ, তাহা বুঝা প্রত্যক্ষ প্রমাণ। উহার উপলব্ধি অনুমান-প্রমাণের দ্বারা হয়। কোন বস্তু আকৃত বা ব্যবহিত থাকিলে তাহার লৌকিক প্রত্যক্ষ হয় না, সুতরাং বুঝা যায়, বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ার্থের সম্বন্ধবিশেষ লৌকিক প্রত্যক্ষে কারণ। পুরোক্ত হলে ব্যবহিত বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ার্থের সেই সম্বন্ধবিশেষ না হওয়ায়, ঐ প্রত্যক্ষ হয় না। অজ্ঞাত কারণ সত্ত্বেও যখন পুরোক্ত হলে লৌকিক প্রত্যক্ষ জন্মে না, তখন ইন্দ্রিয়ার্থ-সমীকরণ বে ঐ প্রত্যক্ষের কারণ, ইহা অনুমানসিদ্ধ। ইন্দ্রিয়ার্থ-সমীকরণোৎপন্ন জ্ঞানও প্রমাণ হইবে, এ কথা প্রমাণ-স্বভাব্যে (১ অঃ, ৩ স্বভাব্যে) বলা হইয়াছে। ঐ জ্ঞানের কোন প্রমাণের দ্বারা উপলব্ধি হয়, ইহাও শেষে ভাষ্যকার বলিয়াছেন। আত্মা ও মনের সংযোগবশতঃ এবং আত্মার সহিত মনস্বর সম্বন্ধ-বশতঃ যেমন স্বপ্ন প্রকৃতির প্রত্যক্ষ জন্মে, তরূপ পুরোক্ত প্রত্যক্ষ জ্ঞানেরও ঐ কারণবশতঃ প্রত্যক্ষ জন্মে। অর্থান্ধ প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারাই প্রত্যক্ষ জ্ঞানরূপ প্রত্যক্ষ প্রমাণের উপলব্ধি হয়। ভাষ্যকার এখানে প্রত্যক্ষ প্রমাণের উপলব্ধি-সাধন প্রমাণের উল্লেখ করিয়া, শেষে বলিয়াছিলেন যে, এইরূপ অজ্ঞাত প্রমাণগুলিরও কোন হলে কোন প্রমাণের দ্বারা উপলব্ধি হয়, তাহা বিভাগ করিয়া (বিশেষরূপে ব্যাখ্যা করিয়া) বলিতে হইবে। তুলকথা, তাহিয়া বলিতে হইবে : স্বর্গীগণ তাহা বলিবেন। বস্তুার্থ প্রত্যক্ষের কারণমাত্রকে প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করিলে, ইন্দ্রিয়ার্থরূপ প্রত্যক্ষের দ্বারা প্রমাতা প্রকৃতি কারণেরও প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের দ্বারা উপলব্ধি বুঝিতে হইবে ও বলিতে হইবে। ভাষ্যকার শেষে মহর্ষি-সূত্র-সূচিত অত্র একটি তত্ত্বের ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, প্রত্যক্ষ হইয়াও তাহা প্রমাণ হইতে পারে, তাহাতে অধাবস্থা বা অনিয়মের কোন আশঙ্কা নাই। যে পদার্থ উপলব্ধির বিষয় হইয়া “প্রত্যক্ষ” হইবে, তাহাই আত্মার উপলব্ধির হেতু হইলে, তখন “প্রমাণ” হইবে, এইরূপ ব্যবস্থাবশতঃ “প্রত্যক্ষ” প্রমাণ-প্রত্যক্ষ-ব্যবস্থা লাভ করে। যেমন প্রদীপালোক দৃষ্ট হইয়াও দর্শন-ক্রিয়ার হেতু বলিয়া তাহাকে “দর্শন” অর্থাৎ (দৃষ্টতাহেনে এইরূপ ব্যুৎপত্তিতে) দর্শনক্রিয়ার সাধন বলা হয়। প্রদীপালোককে যখন প্রত্যক্ষ করা যায়, তখন তাহা “দৃষ্ট”, আবার যখন উহার দ্বারা অত্র দৃষ্ট পদার্থ দেখা যায়, তখন তাহা “দর্শন”,—ইহাই উহার “দৃষ্টদর্শন-ব্যবস্থা”। এইরূপ প্রত্যক্ষ হইয়াও উপলব্ধির হেতু হইলে, তখন তাহা প্রমাণও হইতে পারে, এইরূপ ব্যবস্থাই প্রত্যক্ষের “প্রমাণ-প্রত্যক্ষ-ব্যবস্থা”। ইহা স্বীকার না করিলে প্রদীপকেও “দৃষ্ট” ও “দর্শন” বলিয়া স্বীকার করা যায় না, তাহা কিন্তু সকলেই স্বীকার করেন। এই জন্য ঐ স্বীকৃত সত্যকেই দৃষ্টদর্শনরূপে উল্লেখ করা হইয়াছে। ভাষ্যকার শেষে এই ভাবেও সূত্রকারের তাৎপর্য বর্ণন করিয়া, উপসংহারে



সূত্রকারের মূল বিবক্ষিত বক্তব্যটি বলিয়াছেন যে, প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের দ্বারাই প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের উপলব্ধি হয়; উহা প্রমাণাত্মকের দ্বারাও হয় না, বিনা প্রমাণেও হয় না। সুতরাং পূর্বোক্ত অনবস্থাদোষ বা সর্বপ্রমাণ-বিলোপ হয় না। ইহাই চরম বক্তব্য বুদ্ধিতে হইবে।

ভাষ্য। তেনৈব তস্যাগ্রহণমিতি চেৎ? নার্থভেদস্য লক্ষণসামান্যাত্। প্রত্যক্ষাদীনাং প্রত্যক্ষাদিভিরেব গ্রহণমিত্যুক্তং, অন্তেন হি অন্যস্ত গ্রহণং দৃষ্টমিতি—নর্থভেদস্ত লক্ষণসামান্যাত্। প্রত্যক্ষ-লক্ষণেনানেকোহর্থঃ সংগৃহীতস্তত্র কেনচিৎ কস্তচিদ্গ্রহণমিত্যদোষঃ। এবমনুমানাদিষ্পীতি, যথোক্ত তেনোদকেনাশয়স্বস্ত গ্রহণমিতি।

অনুবাদ। (পূর্বপক্ষ) তাহার দ্বারাই তাহার জ্ঞান হয় না, ইহা যদি বল? (উত্তর) না, অর্থাৎ তাহা বলিতে পার না। কারণ, অর্থভেদের অর্থাৎ প্রত্যক্ষ প্রমাণরূপ ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের লক্ষণের সমানতা আছে। বিশদার্থ এই যে, (পূর্বপক্ষ) প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের দ্বারাই প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের জ্ঞান হয়, ইহা অমুক্ত। কারণ, অন্য পদার্থের দ্বারাই অন্য পদার্থের জ্ঞান দেখা যায়। (উত্তর) না,—কারণ, অর্থভেদের লক্ষণের সমানতা আছে। বিশদার্থ এই যে, প্রত্যক্ষ প্রমাণের লক্ষণের দ্বারা অনেক পদার্থ সংগৃহীত আছে, তন্মধ্যে কোনটির দ্বারা কোনটির অর্থাৎ কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারা তত্ত্বাত্তীয় অন্য প্রত্যক্ষ প্রমাণের জ্ঞান হয়, এ জ্ঞান দোষ নাই। এইরূপ অনুমানাদি প্রমাণেও বুদ্ধিবে। (অর্থাৎ অনুমানাদি প্রমাণেরও কোন একটির দ্বারা তত্ত্বাত্তীয় অন্য প্রমাণের উপলব্ধি হয়) যেমন উক্ত জলের দ্বারা আশয়স্থের অর্থাৎ জলাশয়ে অবস্থিত জলের জ্ঞান হয়।

টীকণী। পূর্বোক্ত কথা না বুঝিয়া আপত্তি হইতে পারে যে, একই পদার্থ গ্রাহ ও গ্রাহক হইতে পারে না। যে পদার্থের উপলব্ধি করিতে হইবে, সেই পদার্থের দ্বারাই তাহার উপলব্ধি কখনই হয় না, গ্রাহ ও গ্রাহক বা সাধ্য ও সাধন একই পদার্থ হয় না, ভিন্ন পদার্থের দ্বারাই ভিন্ন পদার্থের গ্রহণ হইয়া থাকে। সুতরাং প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের দ্বারাই প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের উপলব্ধি হয়—এ কথা অমুক্ত। ভাষ্যকার এই আপত্তি বা পূর্বপক্ষের অবতারণা করিয়া, তত্ত্বকারে বলিয়াছেন যে, সেই প্রমাণের দ্বারাই সেই প্রমাণের উপলব্ধি হয় অর্থাৎ একই পদার্থ গ্রাহ ও গ্রাহক হয়, এ কথা ত বলি নাই, এক প্রমাণের দ্বারা তত্ত্বাত্তীয় অন্য প্রমাণের উপলব্ধি হয়, ইহাই বলিয়াছি। চক্ষুসেন্নিকবরূপ প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারা প্রদীপালোকরূপ প্রত্যক্ষ প্রমাণের উপলব্ধি হয়, এই কথা বলিয়া তাহাই প্রকাশ করিয়াছি। প্রত্যক্ষ প্রমাণ পদার্থ একটিমাত্র নহে, উহা অনেক,—উদাহরণের সকলের লক্ষণ সমান অর্থাৎ এক। সেই একটি লক্ষণের দ্বারা অনেক

প্রত্যক্ষ প্রমাণ-পদার্থ সংগৃহীত আছে অর্থাৎ প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলিলে অনেক পদার্থ বুঝা যায়। সুতরাং প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারা প্রত্যক্ষ প্রমাণের উপলব্ধি হয়, এই কথা বলিলে একই পদার্থ গ্রাহ্য ও গ্রাহক হয়, ইহা না বুঝিয়া, কোন একটি প্রত্যক্ষ প্রমাণ তজ্জাতীয় অথবা প্রত্যক্ষ প্রমাণের গ্রাহক হয়, ইহাও বুঝা যায়। বস্তুতঃ তাহাই সংগত ও সম্ভব বলিয়া পূর্বোক্ত কথায় তাহাই বুঝিতে হইবে। সুতরাং পূর্বোক্ত আপত্তি বা দোষ হয় না। এইরূপ অনুমানাদি প্রমাণের মধ্যেও কোন একটি প্রমাণের দ্বারা তজ্জাতীয় অথবা প্রমাণের উপলব্ধি হইয়া থাকে এবং তাহা হইতে পারে। ভাষ্যকার অনুমান-প্রমাণ স্থলে ইহার দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন যে, যেমন কোন জলাশয় হইতে জল উদ্ধৃত করিয়া, ঐ জলের দ্বারা “ঐ জলাশয়ে অবস্থিত জল এইরূপ” ইহা বুঝা যায় অর্থাৎ অনুমান করা যায়; ঐ স্থলে জলাশয়ের জল হইতে উদ্ধৃত জল গ্রাহক, ঐ জলাশয়ে অবস্থিত জল গ্রাহ্য। ঐ দুই জল সেই জলাশয়ের জল হইলেও উহাদিগের ব্যক্তিগত ভেদ আছে। তাই উদ্ধৃত জল তাহার সজাতীয় ভিন্ন জলের গ্রাহক হইতেছে। ভাষ্যকার সজাতীয় প্রমাণের দ্বারা সজাতীয় ভিন্ন প্রমাণের উপলব্ধি হইয়া থাকে এবং তাহাই পূর্বে বলা হইয়াছে, এই কথাই এখানে স্পষ্টরূপে বর্ণন করিয়াছেন। বস্তুতঃ কিন্তু সর্বত্রই সজাতীয় প্রমাণের দ্বারাই সজাতীয় প্রমাণের উপলব্ধি হয় না। প্রত্যক্ষাদি প্রমাণচক্রের মধ্যে বিজাতীয় প্রমাণের দ্বারাও বিজাতীয় প্রমাণের উপলব্ধি হয়। যেমন অনুমান-প্রমাণের দ্বারা চন্দ্রাদি প্রত্যক্ষ প্রমাণের উপলব্ধি হয় এবং প্রত্যক্ষ প্রমাণবিশেষের দ্বারা অনুমানাদি প্রমাণের উপলব্ধি হয়, ইত্যাদি বুঝিয়া লইতে হইবে।

ভাষ্য। জ্ঞাতৃমনসোচ্চ দর্শনাৎ। অহং সুখী অহং দুঃখী চেতি তেনৈব জ্ঞাত্বা তন্তৈব গ্রহণং দৃশ্যতে। “যুগপজ্জ্ঞানানুৎপত্তির্মনসো লিন্গ”মিতি চ তেনৈব মনসা তন্তৈবানুমানং দৃশ্যতে। জ্ঞাতুর্জ্ঞেয়স্ত চাভেদো গ্রহণস্ত গ্রাহস্ত চাভেদ ইতি।

অনুবাদ। পরন্তু যেহেতু জ্ঞাতা অর্থাৎ আত্মাও মনে দেখা যায়, অর্থাৎ আত্মা ও মনে গ্রাহক ও গ্রাহক, এই দুই ধর্মই দেখা যায়। বিশদার্থ এই যে, আমি সুখী এবং আমি দুঃখী, এই প্রকারে সেই আত্মা কর্তৃকই সেই আত্মারই জ্ঞান দেখা যায়। এবং একই সময়ে জ্ঞানের (বিজাতীয় একাধিক প্রত্যক্ষের) অনুৎপত্তি মনের লিন্গ (সাধক), এই জ্ঞাত অর্থাৎ এই সুত্রোক্ত যুক্তি অনুসারে সেই মনের দ্বারাই সেই মনেরই অনুমান দেখা যায়। (পূর্বোক্ত দুই স্থলে যথাক্রমে) জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয়ের অভেদ (এবং) গ্রহণ অর্থাৎ জ্ঞানের সাধন ও জ্ঞেয়ের অভেদ।

টিপ্পনী। কোন পদার্থ নিজেরই নিজের গ্রাহ্য ও গ্রাহক হয় না, এই কথা স্বীকার করিয়াই ভাষ্যকার পূর্বে পূর্বপক্ষের উত্তর দিয়াছেন। শেষে বলিতেছেন যে, এইরূপ নিয়মও নাই অর্থাৎ



তাহা গ্রাহ্য, তাহাই যে তাহার নিজের গ্রাহক বা জ্ঞানের সাধন হয় না, এরূপ নিয়ম বলা যায় না। কারণ, কোন স্থলে তাহাও দেখা যায়। দৃষ্টান্তরূপে বলিয়াছেন যে, আত্মা নিজের নিজের গ্রাহক হয়। আমি স্থবী, আমি চুখী ইত্যাদিরূপে সেই আত্মাই সেই আত্মাকে গ্রহণ করেন, সুতরাং সেখানে সেই আত্মাই জ্ঞাতা ও সেই আত্মাই গ্রাহ্য বা জ্ঞেয়। এখানে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের অভেদ, এবং একই সময়ে বিজ্ঞাতীয় নানা প্রত্যক্ষের উৎপত্তি হয় না, এ জন্ত মন নামে একটি পদার্থ যে স্বীকার করা হইয়াছে অর্থাৎ প্রথমাদ্যায়ের ১৬শ সূত্রে মর্শ্বি মনের যে অহুমান হুচনা করিয়াছেন, ঐ অহুমান মনের দ্বারা হয়, মনও উহার কারণ। সুতরাং মনের অহুমানরূপ জ্ঞান মনের দ্বারা হয় বলিয়া, সেখানে মন গ্রাহ্য হইয়াও গ্রহণ অর্থাৎ নিজের ঐ জ্ঞানের সাধন হইতেছে। এখানে গ্রহণ অর্থাৎ জ্ঞানের সাধক বা গ্রাহক ও গ্রাহ্যের অভেদ। তাহা হইলে কোন প্রদর্শন নিজের নিজের গ্রাহক হয় না, এইরূপ নিয়ম স্বীকার করা যায় না। তাৎপর্যাটীকাকার এখানে বার্তিকের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন যে, আত্মাকে যে জ্ঞেয় বলা হইয়াছে, তাহাতে আত্মা তাহার জ্ঞানের কর্মকারক, ইহা অভিপ্রেত নহে। কারণ, যে ক্রিয়া (দাক্ষর্ষ্য) জন্ত পদার্থ থাকে, সেই ক্রিয়াজন্ত ফলশালী পদার্থই কর্মকারক হয়। আত্মার জ্ঞানক্রিয়া বধন আত্মাতেই থাকে, তখন আত্মা তাহার কর্মকারক হইতে পারেন না। সুতরাং আমি স্থবী, আমি চুখী ইত্যাদি প্রকারে আত্মার যে জ্ঞান হয়, তাহাতে আত্মাবশ্ব স্থবাদিই কর্মকারক হইবে; আত্মা প্রকাশনান, বিবক্ষাদেশতঃই তাহাকে জ্ঞেয় বলা হইয়াছে। মন কিন্তু তাহার জ্ঞানের প্রতি করণও হইবে, কণ্ডও হইবে। কারণ, মনোবিষয়ক ঐ জ্ঞান মনের মর্শ্ব নহে, উহা মন হইতে ভিন্ন পদার্থ—আত্মারই বশ্ব। সুতরাং মন ঐ জ্ঞানের কর্মকারক হইতে পারে। অতএব জ্ঞেয়ব্ব ও জ্ঞানসাবনব্ব, এই দুই বশ্ব মনে থাকিতে পারে, তাহাতে কোন দোষ হয় না। মনের জ্ঞানে মনই সাধন, মনের জ্ঞান সাধন নহে অর্থাৎ মনোপদার্থ বুঝিতে মন আবশ্যক হয়, কিন্তু মনোপদার্থের জ্ঞান আবশ্যক হয় না, সুতরাং মনের জ্ঞানে আত্মাশ্রয় দোষেরও সম্ভাবনা নাই। মনের জ্ঞানে কারণরূপে পূর্বে মনের জ্ঞান আবশ্যক হইলে, আত্মাশ্রয়-দোষ হইত, বস্তুতঃ তাহা আবশ্যক হয় না।

নব্য নৈয়ায়িকগণ জ্ঞানরূপ ক্রিয়া (দাক্ষর্ষ্য) স্থলে ঐ জ্ঞানের বিষয়কেই কর্মকারক বলিয়াছেন। জ্ঞানের বিষয়বিশেষ কর্মকারক হইলে “আত্মাকে জানিতেছি” এইরূপ প্রতীতিবশতঃ আত্মাও তাহার জ্ঞানক্রিয়ার কর্মকারক হয়, ইহা স্বীকার্য। সর্বত্রই ক্রিয়াজন্ত ফলশালী পদার্থকে কর্মকারক বলা যায় না। কারণ, জ্ঞানাদি ক্রিয়াস্থলে ঐ ক্রিয়াজন্ত সেই ফলবিশেষ (যে ফলবিশেষ কর্মকারকের লক্ষণে নির্বিষ্ট হইবে) নাই। সুতরাং জ্ঞানাদি ক্রিয়াস্থলে কর্মের লক্ষণ পৃথক্ বলিতে হইবে। নব্যগণ তাহাই বলিয়াছেন। সংস্কার বা “জাততা” নামক ফলবিশেষ বরিত্তা জ্ঞানক্রিয়ার কর্মলক্ষণ-সম্বন্ধ দ্বারা করিয়াছেন, নব্য নৈয়ায়িকগণ তাহাদিগের মত গণন করিয়াছেন (বুদ্ধশক্তিপ্রকাশিকার কর্মপ্রকরণ স্তম্ভবা।) উদয়নাচার্যের স্মারকরমাজলিতেও (চতুর্থ স্তম্ভকে) উদয়ন “জাততা” পদার্থের গণন দেখা যায়। তিনিও জ্ঞানক্রিয়ার কর্মলক্ষণে নব্য মতেরই সমর্থক, ইহা সেখানে বুঝা যায়। তবে ক্রিয়াজন্ত ফলবিশেষশালী কর্মই যে মুখ্য কর্ম, ইহা নব্যগণেরও লক্ষ্য। সুতরাং

নব্যমতেও আত্মা জ্ঞানক্রিয়ার মুখ্য কর্মী নহে। • কিন্তু “আমি আমাকে জানিতেছি” এইরূপ প্রয়োগে আত্মার যে-কোনরূপ কর্মতা স্বীকার করিতেই হইবে, নচেৎ এইরূপ প্রয়োগ কেন হইতেছে? তাৎপর্যটীকাকারের যুক্তি ইহাই মনে হয় যে, আমি স্থবী, আমি জীবী ইত্যাদি প্রকারেই যখন আত্মার মানস প্রত্যক্ষ হয়, সুখাদি গুণযোগ ব্যতীত আত্মার আর কোনরূপেই লৌকিক প্রত্যক্ষ হইতে পারে না, তখন আত্মার এই মানস প্রত্যক্ষে আত্মগত সুখাদি ধর্মকেই কর্মকারক বলা যাইতে পারে। আত্মা এই প্রত্যক্ষে প্রকাশমান, তাহাকে কর্মরূপে বিবক্ষা করিয়াই জ্ঞেয় বলা হইয়া থাকে। বস্তুতঃ আত্মা এই জ্ঞানক্রিয়ার কর্মকারক হয় না। আত্মা এই স্থলে স্বগত ক্রিয়াজ্ঞ কলশালী হওয়ার কর্মকারক হইতে পারে না। অপর পদার্থগত ক্রিয়াজ্ঞ কলবিশেষশালী পদার্থই কর্ম। এতদ্বিধ অতরূপ কর্মলক্ষণ নাই, উহা নিশ্চয়োজন। তাৎপর্যটীকাকার ভায়মত ব্যাখ্যাতোও আত্মাকে কেন জ্ঞেয় বলেন নাই, আত্মমানসপ্রত্যক্ষের কর্মকারক বলেন নাই,—ইহা চিন্তনীয়। পরন্তু তাৎপর্যটীকাকারের তথাকথিত কর্মলক্ষণানুসারে আত্মমানস প্রত্যক্ষে আত্মগত সুখাদি ধর্মই বা কিরূপে কর্মকারক হইবে, তাহাও চিন্তনীয়। আত্মগত সুখাদি হইতে আত্মা ভিন্ন পদার্থ। এই সুখাদি আত্মগত জ্ঞানক্রিয়াজ্ঞ বিষয়তাবিশেষরূপ কলশালী হওয়ার কর্মকারক হয়, ইহা তাৎপর্যটীকাকারের অতিপ্রস্তুত বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। কিন্তু বিষয়তা প্রভৃতি যে-কোনরূপ ক্রিয়াজ্ঞ কল ধরিয়া কর্মের লক্ষণ সমন্বয় করিতে গেলে, অজ্ঞান অনেক দাতৃস্থলে যাহা কর্ম নহে, তাহাও ক্রিয়াজ্ঞ যে-কোন একটা কলশালী হওয়ার কর্মলক্ষণাক্রান্ত হইয়া পড়ে। সুতরাং পূর্বোক্ত কর্মলক্ষণে যেরূপ কলবিশেষের নিবেশ করিতে হইবে, তাদৃশ কোন কল আত্মমানস-প্রত্যক্ষস্থলে আত্মগত সুখাদি ধর্মে আছে, কিরূপে এই স্থলে তাৎপর্যটীকাকার আত্মগত সুখাদি ধর্মকেই কর্মকারক বলিয়াছেন, ইহা নৈয়ায়িক সুধীগণের বিশেষরূপে চিন্তনীয়। বাহ্য-ভয়ে এখানে এ সব কথাই বিশেষ আলোচনা পরিত্যক্ত হইল।

ভাষ্য। নিমিত্তভেদোহত্রেতি চেৎ সমানং । ন নিমিত্তান্তরেণ  
বিনা জ্ঞাতা জ্ঞানং জানীতে, ন চ নিমিত্তান্তরেণ বিনা মনসা মনো গৃহত  
ইতি সমানমেতৎ, প্রত্যক্ষাদিভিঃ প্রত্যক্ষাদীনাং গ্রহণমিত্যত্রোপাখ্য-  
ভেদো ন গৃহত ইতি ।

অনুবাদ। ( পূর্বপক্ষ ) এই স্থলে অর্থাৎ পূর্বোক্ত আত্মকর্তৃক আত্মজ্ঞান  
ও মনের দ্বারা মনের জ্ঞানে নিমিত্তভেদ ( নিমিত্তান্তর ) আছে, ইহা যদি বল—  
( উত্তর ) সমান। বিশদার্থ এই যে, নিমিত্তান্তর ব্যতীত আত্মা আত্মাকে জানে না  
এবং নিমিত্তান্তর ব্যতীত মনের দ্বারা মন জ্ঞাত ( জ্ঞানের বিষয় ) হয় না—ইহা  
সমান। ( কারণ ) প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের দ্বারা প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের জ্ঞান হয়, এই



স্থলেও অর্থাৎ এই পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তেও (নিমিত্তান্তর ব্যতীত) অর্থভেদ অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন প্রমাণ পদার্থ গৃহীত (জ্ঞানের বিষয়) হয় না।

টিরনী। পূর্বোক্ত কথাই আপত্তি হইতে পারে যে, আত্মা যে আত্মাকে গ্রহণ করে এবং মনের দ্বারা যে মনের জ্ঞান হয়, ইহাতে নিমিত্তান্তর আছে। নিমিত্তান্তর ব্যতীত আত্মকর্তৃক আত্মজ্ঞান ও মনের দ্বারা মনের জ্ঞান হয় না। আত্মকর্তৃক আত্মজ্ঞানে আত্মাতে স্থখাদি সম্বন্ধ আবশ্যক। স্থখাদি কোন প্রত্যক্ষ গুণের উৎপত্তি ব্যতীত আত্মার লৌকিক প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। এবং মনের দ্বারা মনের অহুমানরূপ জ্ঞানে ব্যাপ্তিজ্ঞান প্রভৃতি নিমিত্তান্তর আবশ্যক। এই নিমিত্তান্তর-বশতঃ ভাষ্যকারোক্ত আত্মা কর্তৃক আত্মার লৌকিক প্রত্যক্ষ ও মনের দ্বারা মনের অহুমান জ্ঞান হইয়া থাকে, কিন্তু প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের দ্বারা প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের উপলব্ধি হইবে কিরূপে? তাহাতে ত কোন নিমিত্তান্তর নাই? ভাষ্যকার এই আপত্তি বা পূর্বপক্ষের অবতারণা করিয়া, তত্ত্বত্তরে বলিয়াছেন যে, ইহা তুল্য। কারণ, প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের দ্বারা যে প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের জ্ঞান হয়, তাহাতেও নিমিত্তান্তর আছে। সুতরাং পূর্বোক্ত আত্মকর্তৃক যে আত্মজ্ঞান ও মনের দ্বারা যে মনের জ্ঞান, তাহা প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের দ্বারা প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের তুল্যই হইয়াছে, উহা বিসদৃশ হয় নাই। উদ্যোতকের এই তুল্যতার ব্যাখ্যা করিতে বলিয়াছেন যে, যেমন আত্মা স্থখাদি সম্বন্ধকে অপেক্ষা করিয়া, সেই স্থখাদিবিশিষ্ট আত্মাকে “আমি স্থখী, আমি দুঃখী” ইত্যাদি প্রকারে গ্রহণ (প্রত্যক্ষ) করেন অর্থাৎ আত্মা যেমন নিমিত্তান্তরবশতঃ এই অবস্থার জ্ঞেয়ও হন, তদ্রূপ প্রমাণ ও প্রমাণের বিবরণ-ভাবে অরহিত হইয়া সেই সময়ে প্রমোদ হয়। আত্মা প্রত্যক্ষের বিষয় হইতে যেমন নিমিত্তান্তর আবশ্যক হয়, তদ্রূপ প্রমাণ ও প্রমাণের বিষয় হইতে নিমিত্তান্তর আবশ্যক হয়। সেই নিমিত্তান্তর উপস্থিত হইলেই সেখানে প্রমাণের দ্বারা প্রমাণের উপলব্ধি হয়। ফলকথা, আত্মকর্তৃক আত্মার প্রত্যক্ষাদি স্থলে যেমন নিমিত্ত-ভেদ আছে, প্রমাণের দ্বারা প্রমাণের উপলব্ধি স্থলেও তদ্রূপ নিমিত্ত-ভেদ আছে; সুতরাং এই উভয় স্থল সমান। কোন কোন ভাষ্যপুস্তকে “অর্থ-ভেদো গৃহ্যতে” এইরূপ পাঠ দেখা যায়। তাহাতে অর্থভেদ কি না—বিভিন্ন প্রমাণ পদার্থের জ্ঞান হয়, এইরূপ অর্থ বুঝা যায়। প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের মধ্যে একটি প্রমাণের দ্বারা তদ্বিত্তি কোন প্রমাণেরই যখন জ্ঞান হয়, তখন সেখানে কোন নিমিত্তভেদের অপেক্ষা না মানিলেও চল, কিন্তু ভাষ্যকার পূর্বপক্ষবাদীর কথা মানিয়া লইয়াই এখানে যখন উভয় স্থলের তুল্যতার কথা বলিয়াছেন, তখন প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের দ্বারা প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের জ্ঞানেও নিমিত্তভেদ আছে, নিমিত্তান্তর ব্যতীত ভিন্ন ভিন্ন প্রমাণ পদার্থও জ্ঞানের বিষয় হয় না, ইহাই ভাষ্যকারের কথা বলিয়া বুঝা যায়। নচেৎ উভয় স্থলে তুল্যতার সমর্থন হয় না। প্রচলিত ভাষ্য-পুস্তকে এখানে পরবর্তী সন্দর্ভে “নিমিত্তান্তরং বিনা” এইরূপ কথা না থাকিলেও উহা বুঝিয়া লইতে হইবে। পরবর্তী সন্দর্ভে পূর্বোক্ত “নিমিত্তান্তরং বিনা” এই কথাই লোপও ভাষ্যকারের অভিপ্রেত হইতে পারে। উদ্যোতকের তুল্যতার ব্যাখ্যাত্তেও ভাষ্যকারের এই ভাব বুঝা যায়। তাৎপর্য-টীকাকার এখানে কোন কথাই বলেন নাই।

ভাষ্য। প্রত্যক্ষাদীনাঞ্চাবিষয়স্যানুপপত্তেঃ। যদি স্তাৎ  
কিঞ্চিদর্থজাতং প্রত্যক্ষাদীনামবিষয়ঃ যৎ প্রত্যক্ষাদিভিন্ন শক্যং গ্রহীতুং,  
তন্ত গ্রহণায় প্রমাণাস্তরমুপাদীয়েত, তন্তু ন শক্যং কেনচিৎপাদয়িতুমিতি  
প্রত্যক্ষাদীনাম্ বখাদর্শনমেবেদং সচ্চাসচ্চ সর্বং বিষয় ইতি।

অনুবাদ। প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের অবিষয়েরও উপপত্তি নাই। বিশদার্থ এই  
যে, যদি প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের অবিষয় কোন পদার্থ থাকিত, যাহা প্রত্যক্ষাদি  
প্রমাণের দ্বারা গ্রহণ করা যায় না,—তাহার অর্থাৎ সেইরূপ পদার্থের জ্ঞানের জন্য  
প্রমাণাস্তর গ্রহণ ( স্বীকার ) করিতে হইত, কিন্তু তাহা অর্থাৎ ঐরূপ পদার্থ কেহই  
উপপাদন করিতে পারেন না। বখাদর্শনই অর্থাৎ যেমন দেখা যায়, তদনুসারেই এই  
সমস্ত সৎ ও অসৎ ( ভাব ও অভাব পদার্থ ) প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের বিষয় হয়।

টিপ্পনী। আগতি হইতে পারে যে, আত্মা—প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের উপলক্ষি না হয় প্রত্যক্ষাদি  
প্রমাণের দ্বারাই হইল, তজ্জন্ম আর পৃথক্ কোন প্রমাণ স্বীকারের আবশ্যকতা নাই, ইহা স্বীকার  
করিলাম। কিন্তু যে পদার্থ প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ-চতুষ্টয়ের বিষয়ই হয় না, প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ  
চারিটির দ্বারা যাহা বুঝাই যায় না, তাহা বুঝিতে অতিরিক্ত প্রমাণ স্বীকার করিতে হইবে।  
সেই প্রমাণের বোধের জন্য আবার অতিরিক্ত প্রমাণ স্বীকার করিতে হইবে, এইরূপে পূর্বোক্ত  
প্রকারে আবার অনবস্থা-দোষ হইয়া পড়িবে। ভাষ্যকার শেষে এই আপত্তি নিরাসের জন্য  
বলিয়াছেন যে, এমন কোন পদার্থ নাই, যাহা প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ-চতুষ্টয়েরই বিষয় হয় না, যাহার  
বোধের জন্য প্রমাণাস্তর স্বীকার করিতে হইবে, ঐরূপ পদার্থ কেহই উপপাদন করিতে পারেন না।  
ভাব ও অভাব সমস্ত পদার্থই প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ-চতুষ্টয়ের বিষয় হয়। সকল পদার্থই ঐ চারিটি  
প্রমাণের অত্যেকেরই বিষয় হয়, ইহা তাৎপর্য্য নহে। ঐ চারিটি প্রমাণের মধ্যে কোন  
প্রমাণেরই বিষয় হয় না, এমন পদার্থ নাই। ভাব ও অভাব যত পদার্থ আছে, সে সমস্তই ঐ  
প্রমাণচতুষ্টয়ের কোন না কোন প্রমাণের বিষয় হইবেই, ইহাই তাৎপর্য্য। ফলকথা, ঐ প্রমাণ-  
চতুষ্টয় হইতে অতিরিক্ত কোন প্রমাণ স্বীকারের আবশ্যকতা নাই, সুতরাং অনবস্থাদোষেরও সম্ভাবনা  
নাই। অল্প দস্তাবেজ-সম্বত প্রমাণাস্তরগুলিরও প্রমাণাস্তর স্বীকারে আবশ্যকতা নাই। সেগুলি  
গোতমোক্ত প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ-চতুষ্টয়েই অন্তর্ভুক্ত আছে, এ কথা নহিঁ এই অধ্যায়ের দ্বিতীয়  
আহিকের প্রারম্ভেই বলিয়াছেন। ১২।

ভাষ্য। কেচিত্ত্ব দুর্দান্তমপরিগৃহীতং হেতুনা বিশেষহেতুমন্তরেণ  
মাধ্যমাধনায়োপাদদতে—বখা প্রদীপপ্রকাশঃ প্রদীপাস্তরপ্রকাশমন্তরেণ  
গৃহ্যতে, তথা প্রমাণানি প্রমাণাস্তরমন্তরেণ গৃহ্যন্ত ইতি—স চার্য্যঃ



সূত্র । কচিন্নিবৃত্তির্দর্শনাদনিবৃত্তির্দর্শনাচ্চ কচিদনে-  
কান্তঃ ॥২০॥৮১॥

অনুবাদ । কেহ কেহ কিস্ত বিশেষ হেতু ব্যতীত অর্থাৎ কোন হেতুবিশেষকে গ্রহণ না করিয়া, হেতু দ্বারা অপরিগৃহীত দৃষ্টান্তকে (অর্থাৎ কেবল প্রদীপালোকরূপ দৃষ্টান্তকেই) সাধ্য সাধনের নিমিত্ত গ্রহণ করেন । ( সে কিরূপ, তাহা বলিতেছেন ) যেমন প্রদীপপ্রকাশ প্রদীপাস্তর-প্রকাশ ব্যতীত গৃহীত হয়, তক্রূপ প্রমাণগুলি প্রমাণাস্তর ব্যতীত গৃহীত হয়, অর্থাৎ বিনা প্রমাণেই প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের জ্ঞান হয় । সেই ইহা অর্থাৎ পূর্বোক্তরূপ ব্যাখ্যাত এই দৃষ্টান্ত—

কোন পদার্থে নিবৃত্তি দর্শন প্রযুক্ত এবং কোন পদার্থে অনিবৃত্তি দর্শন প্রযুক্ত অনেকান্ত ( অনিয়ত ) [ অর্থাৎ প্রদীপাদি পদার্থে যেমন প্রদীপাস্তরের নিবৃত্তি ( অপেক্ষা ) দেখা যায়, তক্রূপ ঘটাди পদার্থে প্রমাণাস্তরের অনিবৃত্তি ( অপেক্ষা ) দেখা যায় । তজ্জন্য প্রদীপের ন্যায় প্রমাণকে প্রমাণাস্তর-নিরপেক্ষ বুঝিব অথবা ঘটাदि পদার্থের ন্যায় প্রমাণাস্তর-সাপেক্ষ বুঝিব ? ইহাতে কোন বিশেষ হেতু গ্রহণ না করায় ঐ দৃষ্টান্ত অনিয়ত, সুতরাং উহা সাধ্য-সাধক হইতে পারে না ] ।

ভাষ্য । যথাহয়ং প্রসঙ্গো নিবৃত্তির্দর্শনাৎ প্রমাণসাধনারোপাদীয়তে, এবং প্রমেয়সাধনার্যাপ্যপাদেয়োহবিশেষহেতুত্বাৎ । যথা চ স্থালাদিক্রূপ-গ্রহণে প্রদীপপ্রকাশঃ প্রমেয়সাধনারোপাদীয়তে, এবং প্রমাণসাধনার্যাপ্যপাদেয়ো বিশেষহেতুত্বাবাৎ ; সোহয়ং বিশেষহেতুপরিগ্রহমস্তরেণ দৃষ্টান্ত একশ্লিষ্ট পক্ষে উপাদেয়ো ন প্রতিপক্ষ ইত্যনেকান্তঃ । এক-শ্লিষ্ট পক্ষে দৃষ্টান্ত ইত্যনেকান্তো বিশেষহেতুত্ববাদিতি ।

অনুবাদ । যেমন নিবৃত্তি দর্শন প্রযুক্ত অর্থাৎ প্রদীপের দ্বারা বস্তুবোধ স্থলে প্রদীপাস্তরের নিবৃত্তি দেখা যায়, প্রদীপ প্রদীপাস্তরকে অপেক্ষা করে না, ইহা দেখা যায়, এ জন্ম প্রমাণ জ্ঞানের নিমিত্ত এই প্রসঙ্গ অর্থাৎ প্রদীপের দ্বারা প্রমাণেরও প্রমাণাস্তর-নিরপেক্ষত্ব প্রসঙ্গ গ্রহণ করা হইতেছে, এইরূপ প্রমেয় জ্ঞানের নিমিত্তও

১। যথাহয়ং প্রসঙ্গঃ প্রমাণসাধনারোপাদীয়তে প্রদীপে প্রদীপাস্তরনিরপেক্ষতা প্রকাশকদর্শনাৎ প্রমাণসাধনার্যাপ্যপাদেয়োহবিশেষহেতুত্বাৎ প্রমাণানি যৎকচ্ছি এবমর্থবুদ্ধ্যদীয়তে প্রসঙ্গঃ, প্রমেয়সাধনার্যাপ্যপাদেয়ো বিশেষহেতুত্বাৎ-বস্তুবোধসাধনঃ, তথাচ প্রমাণাস্তর ইত্যর্থঃ ।—ভাষ্যার্থটীকা ।

( এই প্রসঙ্গ ) গ্রাহ্য ; কারণ, বিশেষ হেতু নাই [ অর্থাৎ যদি প্রদীপ দৃষ্টান্তে প্রমাণকে প্রমাণান্তর-নিরপেক্ষ বলা যায়, তাহা হইলে প্রমেয়কেও প্রমাণ-নিরপেক্ষ বলিতে হয় । প্রমাণ-জ্ঞানে প্রমাণের অপেক্ষা নাই, কিন্তু প্রমেয়-জ্ঞানে প্রমাণের অপেক্ষা আছে ; এইরূপ সিদ্ধান্তের সাধক কোন হেতু নাই । সাধ্য-সাধক হেতু গ্রহণ না করিয়া কেবল এক পক্ষে একটি দৃষ্টান্ত মাত্র গ্রহণ করিলে, তদ্বারা সাধ্য-সিদ্ধি হয় না । প্রমাণের স্তায় প্রমেয়কেও প্রমাণ-নিরপেক্ষ বলিলে সর্বপ্রমাণ বিলোপ হয় । ]

এবং যেরূপ স্থানী প্রকৃতির রূপের প্রত্যক্ষে প্রদীপ প্রকাশ—প্রমেয় জ্ঞানের নিমিত্ত ( ঐ রূপপ্রত্যক্ষের নিমিত্ত ) গ্রহণ করা হইতেছে, এইরূপ প্রমাণ জ্ঞানের নিমিত্তও গ্রাহ্য । কারণ, বিশেষ হেতু নাই [ অর্থাৎ যদি স্থানী প্রকৃতি দ্রব্যকে দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করিয়া, প্রমেয়কে প্রমাণ-সাপেক্ষ বলা হয়, তাহা হইলে ঐ দৃষ্টান্তে প্রমাণকেও প্রমাণ-সাপেক্ষ বলিতে হইবে । কেবল প্রমেয়ই প্রমাণ-সাপেক্ষ, এই সিদ্ধান্তের কোন হেতু নাই । কেবল একটা দৃষ্টান্ত অবলম্বন করিলে তাহা উভয় পক্ষেই করা যাইবে ] ।

বিশেষ হেতু পরিগ্রহ ব্যতীত অর্থাৎ সাধ্যসাধক কোন প্রকৃত হেতুর গ্রহণ না করায়, সেই এই দৃষ্টান্ত ( পূর্বোক্ত প্রদীপ দৃষ্টান্ত ) এক পক্ষে গ্রাহ্য, প্রতিপক্ষে গ্রাহ্য নহে, এ জ্ঞাত অনেকান্ত । একই পক্ষে অর্থাৎ কেবল প্রমাণ-জ্ঞান পক্ষেই দৃষ্টান্ত, এ জ্ঞাত অনেকান্ত ; কারণ, বিশেষ হেতু নাই ।

টিপনী । প্রদীপের প্রত্যক্ষে এবং প্রদীপের দ্বারা অজ্ঞ বস্তুর প্রত্যক্ষে যেমন প্রদীপান্তর আবিস্কৃত হয় না, তরুণ প্রমাণের জ্ঞানে প্রমাণান্তর আবিস্কৃত হয় না । প্রমাণ, প্রদীপের স্তায় প্রমাণান্তর-নিরপেক্ষ হইয়াই সিদ্ধ হয় । এই কথা দ্বারা বলিতেন অথবা বলিবেন, তাহাদিগের কথিত ঐ দৃষ্টান্ত অনিযত, ইহা বলিবার জ্ঞাত “কচিমিত্ত্বনির্দেশনাং” ইত্যাদি হুজুট বলা হইয়াছে । বৃত্তিকার বিঘ্ননাথ উহা ভাষ্যকারের উক্তি বলিয়াই উদ্ধৃত করিয়াছেন । বিঘ্ননাথের কথাছলারে বুঝা যায় যে, ভাষ্যকার বাংলায়নের পূর্বে বা সনকালে দ্বারা পূর্বোক্ত “ন প্রদীপপ্রকাশবৎ তৎসিদ্ধেঃ” এই হুজুটের পূর্বোক্তরূপ তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিতেন অর্থাৎ প্রমাণ প্রদীপের স্তায় প্রমাণ-নিরপেক্ষ হইয়াই সিদ্ধ হয়, ইহাই মহর্ষি গোতমের সিদ্ধান্ত বলিতেন, তাহাদিগের ঐ ব্যাখ্যা স্বত্ত্বন করিতেই ভাষ্যকার “কচিমিত্ত্বনির্দেশনাং” ইত্যাদি বাক্য বলিয়াছেন । অবশ্য ভাষ্যকার বাংলায়নের পূর্বে

১ । তৎকাল প্রদীপদৃষ্টান্তগ্রহণের অনায়াসতারজনসমুদ্ভূত হালান্দিবৃত্তিকোশাগানে তু প্রকাশস্থাপি অনায়াসরূপেণ ইত্যাহ “যথা চ হালান্দিবৃত্তগগ্রহণ” ইতি :—ভাংগখণ্ডিকা ।



বা সমকালে তায়স্বরের যে নানাবিধ ব্যাখ্যাস্বর হইয়াছে, তাহা বুঝিবার আরও অনেক কারণ পাওয়া যায়। তায়বার্ত্তিকে উদ্যোতকর এখানে লিখিয়াছেন যে<sup>১</sup>, অপর সম্প্রদায় হেতুবিশেষ গ্রহণ না করিয়া “প্রদীপপ্রকাশ” সূত্রের দ্বারা কেবল দৃষ্টান্তমাত্রই গ্রহণ করিতেন। তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া “কচিগ্রন্থবিশদর্শনাং” ইত্যাদি বলা হইয়াছে। উদ্যোতকরের কথার দ্বারাও ঐটি মহর্ষির সূত্র নহে, উহা ভাষ্যকারেরই কথা, ইহা বুঝিতে পারা যায়। তাৎপর্য্যটীকাকার বাচস্পতি মিশ্র এখানে বলিয়াছেন যে<sup>২</sup>, প্রমাণ প্রদীপের তায় প্রমাণাস্তর-নিরপেক্ষ হইয়াই সিদ্ধ হয়, ইহা যে সকল “আচার্য্যদেবদীপ” দিগের মত, তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া “কচিগ্রন্থবিশদর্শনাং” ইত্যাদি বলা হইয়াছে। তাৎপর্য্যটীকাকার এইটি সূত্ররূপেই উদ্ধৃত হইয়াছে এবং তায়সূচীনিবন্ধেও বাচস্পতি মিশ্র এইটিকে গোতমের সূত্রমধ্যেই পরিগণিত করিয়াছেন। ঐ গ্রন্থে প্রমাণনামান্ত-পরীক্ষা প্রকরণে জরোদশটি সূত্র পরিগণিত হইয়াছে। তন্মধ্যে এইটিই শেষ সূত্র<sup>৩</sup>। বাচস্পতি মিশ্রের মতামুসারে এই গ্রন্থেও ঐটি গোতমের সূত্ররূপেই উল্লিখিত হইয়াছে। তাৎপর্য্যটীকাকার বাচস্পতি মিশ্রের মতামুসারে মহর্ষি গোতমও কোন প্রাচীন মতবিশেষের জন্ত ঐ সূত্রটি বলিতে পারেন। তাহার সময়েও প্রমাণ বিষয়ে নানা মতভেদের প্রচার ছিল। প্রমাণের সংখ্যা বিষয়েও মতভেদের সূচনা করিয়া, গোতম তাহার খণ্ডন করিয়া গিয়াছেন। অথবা গোতমের পূর্ব্বোক্ত সূত্রের প্রকৃত-তর্প না বুঝিয়া, বাহ্যরা প্রদীপের তায় প্রমাণকে প্রমাণ-নিরপেক্ষ বলিয়াই বুঝিবে, উহাই মহর্ষির পূর্ব্বোক্ত সূত্রস্থতিত সিদ্ধান্ত বলিয়া ভুল বুঝিবে, মহর্ষি তাহাদিগের ভ্রম নিরাসের জহই “কচিগ্রন্থবিশদর্শনাং” ইত্যাদি সূত্রটি বলিতে পারেন। পরবর্ত্তী কালে কোন সম্প্রদায় ঐকগ সিদ্ধান্তই বুঝিয়াছিলেন, তাহারা দরল ভাবে মহর্ষি-সূত্রের দ্বারা প্রদীপপ্রকাশের তায় প্রমাণ, প্রমাণাস্তরকে অপেক্ষা করে না, এই সিদ্ধান্তেরই ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। তাৎপর্য্যটীকাকার তাহাদিগকেই “আচার্য্যদেবদীপ” বলিয়া উল্লেখ করিতে পারেন। উদ্যোতকর বাহা বলিয়াছেন, তাহারও এই ভাব বুঝিবার বাবা নাই। তাৎপর্য্যটীকাকার উদ্যোতকরের ব্যক্তিকর ব্যাখ্যা করিতেও পূর্ব্বোক্ত সন্দর্ভকে মহর্ষি-সূত্ররূপে উদ্ধৃত করার, তিনি এ বিষয়ে উদ্যোতকরের কোন বিরুদ্ধ মত বুঝেন নাই, ইহা বুঝিতে

১। অপর তু হেতুবিশেষপরিগ্রহমন্তরণে দৃষ্টান্তমাত্রঃ প্রদীপপ্রকাশসূত্রেণোপাধরতে.....তান্ প্রতীক্ষমুচ্যতে।—  
তায়বার্ত্তিক।

২। যে তু প্রদীপপ্রকাশো যথা ন একাশাস্তরমপেক্ষতে.....ইআচার্য্যদেবদীপা মন্ততে তান্ প্রতীক্ষ।—  
তাৎপর্য্যটীকা।

৩। তায়সূচীনিবন্ধে সূত্র “কচিৎ” এইরূপ পাঠ বেদ্য যায়। কিন্তু এইরূপ পাঠ ভাব্যি কোন গ্রন্থেই বেদ্য যায় না এবং “কচিৎ” এখানে “তু” শব্দ এরোধের কোন সার্থকতাও বুঝা যায় না। পরতাবে যেমন “কচিৎ” এইরূপ পাঠই আছে, তদ্রূপ এখানেও “কচিৎ” এইরূপ পাঠই প্রকৃত বলিয়া মনে হয়। তাই ভাব্যি গ্রন্থে প্রচলিত পাঠই সূত্ররূপে এই গ্রন্থে গ্রহণ করা হইয়াছে। তবে তায়সূচীনিবন্ধের শেষে তায়সূত্রসমূহের যে সংখ্যা নির্দিষ্ট আছে, তদনুসারে যদি “কচিৎ” এইরূপ পাঠই গ্রহণ করিতে হয়, তাহা হইলে বাচস্পতি মিশ্রের মতে ঐরূপ সূত্রপাঠই গ্রহণ করিতে হইবে।

পারা যায়। মূল কথা, তাৎপর্যটীকাকার বাচস্পতি মিশ্রের মতামুসারে ভাষ্যকার “কচিদিবৃদ্ধি-দর্শনাৎ” ইত্যাদি গোতম-সূত্রেরই উদ্ধার করিয়া তাহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন, বুঝা যায়।

স্বতঃপ্রামাণ্য বা প্রমাণের স্বতোঃপ্রামাণ্যবাদী সম্প্রদায় প্রমাণের জ্ঞানকে প্রমাণ-সাপেক্ষ বলেন না। তাঁহারা বলেন, প্রমাণ প্রমাণাস্তরকে অপেক্ষা না করিয়া স্বতঃই সিদ্ধ বা জ্ঞাত হয়। ভাষ্যকার “কেচিৎ” এই কথার দ্বারা তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিতে পারেন। ভাষ্যকারী মহর্ষি গোতম স্বতঃপ্রামাণ্যবাদী নহেন, তিনি পক্ষঃপ্রামাণ্যবাদী, ইহাও ভাষ্যকারের সমর্থন করিতে হইবে। স্বতরাং মহর্ষির সিদ্ধান্ত-সূত্রে যে স্বতঃপ্রামাণ্যবাদই সমর্থিত হয় নাই, ইহা তাঁহাকে দেখাইতে হইবে। তাই ভাষ্যকার এখানে বলিয়াছেন যে, কেহ কেহ অর্থাৎ অল্প সম্প্রদায়বিশেষ হেতু-ব্যতীত অর্থাৎ হেতুবিশেষকে গ্রহণ না করিয়া হেতুর দ্বারা অপরিগৃহীত দৃষ্টান্তকে সাধ্য-সাধনের জন্ত গ্রহণ করেন। সে কিরূপ? ইহা পরে স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন। কোন সাধ্য সাধনের জন্ত প্রকৃত হেতু গ্রহণ করিয়া, ঐ হেতু যে প্রকৃত সাধ্যের ব্যাপ্য, ইহা বুঝাইবার জন্ত যে দৃষ্টান্তকে গ্রহণ করা হয়, তাহাই হেতুর দ্বারা পরিগৃহীত দৃষ্টান্ত। কিন্তু কোন হেতুবিশেষ গ্রহণ না করিয়া, এক পক্ষে একটা দৃষ্টান্তমাত্র বলিলে, তাহা হেতুর দ্বারা অপরিগৃহীত, তাহা সাধ্য-সাধক হয় না, তাহা দৃষ্টান্তই হয় না। যেমন প্রকৃত হলে “প্রমাণঃ প্রমাণাস্তর-নিরপেক্ষরূপঃ প্রদীপবৎ” এইরূপে বাহার হেতুবিশেষ গ্রহণ না করিয়া, প্রমাণে প্রমাণাস্তর-নিরপেক্ষরূপ সাধ্য সাধনের নিমিত্ত কেবল প্রদীপরূপ একটা দৃষ্টান্তমাত্র গ্রহণ করেন, তাঁহাদিগের ঐ দৃষ্টান্ত “অনেকান্ত” অর্থাৎ অনিয়ত। এ জন্ত উহা তাঁহাদিগের সাধ্যসাধক হয় না। ভাষ্যকার সূত্রের উল্লেখপূর্বক ইহাই দেখাইয়াছেন। ভাষ্যে “স চারং” এই কথার দ্বারা পূর্বব্যাখ্যাত প্রদীপরূপ দৃষ্টান্তকেই গ্রহণ করিয়াছেন এবং ঐ কথার সহিত পরবর্তী সূত্রের “অনেকান্তঃ” এই কথার বোঝনা ভাষ্যকারের অভিপ্রায়। ভাষ্যকার সূত্রার্থ বর্ণন করিতে প্রথমে বলিয়াছেন যে, যেমন এই প্রদীপকে অর্থাৎ প্রমাণের প্রমাণ-নিরপেক্ষ প্রদীপকে প্রমাণ-সাধনের নিমিত্ত গ্রহণ করা হইতেছে, তজ্জপ প্রমেয় সাধনের জন্তও গ্রহণ করিতে হইবে। কারণ, বিশেষ হেতু নাই। প্রদীপে নিবৃদ্ধি দেখা যায় বলিয়া অর্থাৎ প্রদীপাস্তরের অপেক্ষা না করিয়া প্রদীপ বস্তু প্রকাশ করে এবং নিজের প্রকাশিত হয়, ইহা দেখা যায় বলিয়া ঐ দৃষ্টান্তে যদি প্রমাণকেও ঐরূপ প্রমাণ-নিরপেক্ষ বলা যায়, তাহা হইলে ঐ দৃষ্টান্তে প্রমেয়কেও প্রমাণ-নিরপেক্ষ বলিতে পারি। কারণ, বিশেষ হেতু নাই। প্রমাণ-গুলি প্রদীপের জায়, প্রমেয়গুলি প্রদীপের জায় নহে, এ বিষয়ে হেতু বলা হয় নাই। স্বতরাং প্রদীপের জায় প্রমেয়গুলিও প্রমাণনিরপেক্ষ হইয়া সিদ্ধ হইলে প্রমাণ-পদার্থের কোন আবশ্যকতা থাকে না, নরকপ্রমাণের অভাবই স্বীকার করিতে হয়।

ভাষ্যকার প্রথমে প্রদীপ দৃষ্টান্তকে আশ্রয় করিলে, নকল প্রমাণের অভাব প্রদীপ হয়, ইহা বলিয়া শেষে বলিয়াছেন যে, যদি হালী প্রভৃতি দৃষ্টান্ত গ্রহণ করা, তাহা হইলে প্রমেয় যেমন হালী প্রভৃতির জায় প্রমাণ-সাপেক্ষ, প্রমাণও তজ্জপ ঐ দৃষ্টান্তে প্রমাণসাপেক্ষ হইবে। অর্থাৎ যদি বলা, প্রমেয় প্রমাণসাপেক্ষ, যেমন হালী প্রভৃতির রূপ। হালী প্রভৃতির রূপদর্শনে প্রদীপের



আবশ্যকতা আছে, তরুণ প্রেমের জ্ঞানে প্রমাণের আবশ্যকতা আছে। এইরূপ বলিলে ঐ দৃষ্টান্তে প্রমাণের জ্ঞানেও প্রমাণের আবশ্যকতা আছে, ইহাও সিদ্ধ হইবে। প্রদীপ দৃষ্টান্তে প্রমাণ—প্রমাণ-নিরপেক্ষই হইবে, স্থানী দৃষ্টান্তে প্রমাণ-সাপেক্ষ হইবে না, এইরূপ নিয়মের কোন হেতু নাই। তাৎপর্যটীকার এই ভাবে ভাষ্যকারের দুইটি পক্ষ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। উদ্যোতকরও এইরূপ ভাবেই তাৎপর্য বর্ণন করিয়াছেন। উদ্যোতকর বলিয়াছেন যে, প্রমাণগুলি প্রদীপের জ্ঞান, কিন্তু স্থানী প্রকৃতির রূপের জ্ঞান নহে, এ বিষয়ে নিয়ম হেতু কি? স্থানী প্রকৃতির রূপ প্রকাশে প্রদীপালোক আবশ্যক, প্রমাণের জ্ঞানে প্রমাণ আবশ্যক নহে কেন? এই প্রদীপ দৃষ্টান্ত-প্রমাণ-পক্ষে গ্রাহ্য, প্রেমের পক্ষে গ্রাহ্য নহে কেন? প্রদীপালোকই প্রমাণ পক্ষে দৃষ্টান্ত, স্থানী প্রকৃতি কেন দৃষ্টান্ত নহে? এই সমস্ত বিষয়ে বিশেষ হেতু বলিতে হইবে। সেই নিয়ম হেতু বধন বল নাই, তখন ঐ প্রদীপ দৃষ্টান্ত একই পক্ষে গৃহীত হওয়ার উদ্য অনেকান্ত। “অনেকান্ত” বলিতে এখানে বুঝিতে হইবে অনিয়ত। তাই ভাষ্যকার শেষে আবার উদ্যের ঐ অর্থ ব্যাখ্যা করিবার জন্ত বলিয়াছেন যে, একই পক্ষে দৃষ্টান্ত, এ জন্ত উদ্য অনেকান্ত। “অন্ত” শব্দটি নিয়ম অর্থেও প্রযুক্ত দেখা যায়। যাহার এক পক্ষে অন্ত অর্থাৎ নিয়ম আছে, তাহা একান্ত; যাহার এক পক্ষে নিয়ম নাই, তাহা অনেকান্ত। উদ্যোতকর প্রকৃতি প্রাচীন আচার্যগণ এখানে দৃষ্টান্তকেই পুরোক্তরূপ অনেকান্ত অর্থাৎ অনিয়ত বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু বৃত্তিকার বিবন্ধাত্ম প্রকৃতি “কচিমিবৃত্তিবর্ণনাৎ” ইত্যাদি সন্দর্ভকে ভাষ্যকারের উক্তি বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে হেতুকেই অনেকান্ত বলিয়াছেন। বৃত্তিকারের ব্যাখ্যায় বিশেষ দৃষ্টব্য এই যে, যাহারা প্রদীপ দৃষ্টান্তে প্রমাণকে প্রমাণনিরপেক্ষ বলিতেন, তাহারা ঐ দ্বন্দ্ব সাবনে কোন হেতু পরিগ্রহ করেন নাই, ইহা ভাষ্যকারের নিজের কথাতোই ব্যক্ত আছে। উদ্যোতকর ও বাচস্পতি নিশ্চয় সেইরূপ কথা বলিয়া গিয়াছেন। তাহা হইলে ভাষ্যকার তাহাদিগের হেতুকে অনেকান্ত বলিয়া ঐ মত ধণ্ডন করিতে পারেন না। হেতু পরিগ্রহ ব্যতীত তাহাদিগের গৃহীত দৃষ্টান্ত অনেকান্ত, ইহাই ভাষ্যকার বলিয়াছেন। দৃষ্টান্তকে হেত্বাত্মকরূপ অনেকান্ত বলা যায় না, তাই ঐ অনেকান্ত শব্দের অর্থ বুঝিতে হইবে অনিয়ত। স্থানীগণ বৃত্তিকারের ভাষ্য-ব্যাখ্যা দেখিবেন।

**ভাষ্য।** বিশেষহেতুপরিগ্রহে সত্যুপসংহারাত্মজ্ঞানাদ-  
প্রতিষেধঃ। বিশেষহেতুপরিগ্রহীতস্ত দৃষ্টান্ত একস্মিন পক্ষে  
উপসংহ্রিয়মাণো ন শক্যোহননুজ্ঞাতুং। এবঞ্চ সত্যনেকান্ত ইত্যয়ং  
প্রতিষেধো ন ভবতি।

অমুবাদ। বিশেষ হেতুর গ্রহণ হইলে উপসংহারের অনুজ্ঞাবশতঃ অর্থাৎ  
এক পক্ষে নিয়মের স্বীকারবশতঃ প্রতিষেধ হয় না। বিশদার্থ এই যে, বিশেষ  
হেতুর দ্বারা পরিগৃহীত (স্বতন্ত্রাৎ) এক পক্ষে উপসংহ্রিয়মাণ (স্বীকৃতমাণ)

দৃষ্টান্তকে কিন্তু অস্বীকার করিতে পারা যায় না। এইরূপ হইলে অর্থাৎ বিশেষ হেতু-পরিগৃহীত এক পক্ষে নিয়ত দৃষ্টান্তকে স্বীকার করিতে বাধ্য হইলে “অনেকান্ত” এই দোষ হয় না অর্থাৎ তাহা হইলে যে দোষ প্রদর্শন করিয়াছি, তাহা অবশ্য হইবে না, কিন্তু অন্য দোষ হইবে।

টিয়নী। বাদী কোন বিশেষ হেতু গ্রহণ না করিয়া প্রমাণের প্রমাণনিরপেক্ষভাবে প্রদীপরূপ দৃষ্টান্তমাত্রকে গ্রহণ করায়, ঐ দৃষ্টান্ত অনেকান্ত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু বাদী যদি তাহার সাধ্যসাধনে বিশেষ হেতু গ্রহণ করেন, অর্থাৎ বাদী যদি বলেন,—“প্রমাণঃ প্রমাণান্তরনিরপেক্ষঃ প্রকাশকত্বাৎ প্রদীপবৎ”, তাহা হইলে তিনি প্রমাণপক্ষে প্রদীপকে দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করিতে পারেন। প্রদীপও প্রকাশক পদার্থ, প্রমাণও প্রকাশক পদার্থ। প্রদীপ যেমন প্রকাশক পদার্থ বলিয়া প্রদীপান্তরকে অপেক্ষা করে না, তদ্রূপ প্রমাণও প্রকাশক পদার্থ বলিয়া প্রমাণান্তরকে অপেক্ষা করে না। বাদী প্রকাশকত্ব প্রভৃতি বিশেষ হেতুর দ্বারা প্রদীপকে দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করিলে, ঐ দৃষ্টান্ত বিশেষহেতু-পরিগৃহীত হইল, সুতরাং উহা একমাত্র প্রমাণপক্ষেই গ্রহণ হইল; প্রমাণপক্ষে ঐ দৃষ্টান্তকে গ্রহণ করা যায় না। কারণ, স্থানী প্রভৃতি প্রমাণের প্রকাশকত্ব হেতু নাই; তাহা প্রদীপাদির দ্বারা অস্ত বস্ত প্রকাশ করে না। তাহা হইলে পূর্বোক্তরূপে প্রকাশকত্ব প্রভৃতি বিশেষ হেতুর দ্বারা পরিগৃহীত ঐ প্রদীপ দৃষ্টান্ত এক পক্ষে নিয়ত বলিয়া স্বীকৃত হওয়ায়, উহাকে আর অনেকান্ত বলিয়া নিষেধ করা যায় না। সুতরাং অনেকান্ত বলিয়া যে দোষ বলা হইয়াছে, তাহা হয় না। উদ্যোতকের এই ভাবে তাৎপর্য বর্ণন করিয়াছেন। উদ্যোতকের তাৎপর্য ব্যাখ্যায় তাৎপর্যটীকাকার বলিয়াছেন যে, বাদী ঐরূপে বিশেষ হেতু পরিগ্রহ করিলে, পূর্বপ্রদর্শিত “অনেকান্ত” এই দোষ হয় না, দোষান্তর কিন্তু হয়, ইহাই বার্ষিককার উদ্যোতকের অভিপ্রায়। উদ্যোতক লিখিয়াছেন, “অনেকান্ত ইত্যং দোষো ন ভবতি”। ভাষ্যকার লিখিয়াছেন, “অনেকান্ত ইত্যং প্রতিষেধো ন ভবতি”। তাৎপর্যটীকাকারের ব্যাখ্যাত তাৎপর্যাত্মকভাবে বুঝা যায়, “অনেকান্ত” এই দোষটিই হয় না, অস্ত দোষ কিন্তু হয়, ইহা ভাষ্যকারেরও ঐ কথার তাৎপর্য। অস্ত দোষ কি হয়? ইহা প্রকাশ করিবার জন্ত তাৎপর্যটীকাকার বলিয়াছেন যে, প্রদীপ তাহার প্রত্যক্ষ-জ্ঞানে চক্ষুঃসমিকর্ষাদিকে অবশ্য অপেক্ষা করে, সুতরাং প্রদীপকে একেবারে নিরপেক্ষ বলা যাইবে

১। প্রচলিত ভাষাপুস্তকে “ন শক্যো জ্ঞাতুং” এইরূপ পাঠ দেখা যায়। কিন্তু এই পাঠ প্রকৃত বলিয়া মনে হয় না। কোন কোন প্রাচীন পুস্তকে “ন শক্যোহনুজ্ঞাতুং” এইরূপ পাঠ পাওয়া যায়। উদ্যোতক লিখিয়াছেন, “ন শক্যো প্রতিষেধুঃ”। “অনুজ্ঞাতুং” এই কথার ব্যাখ্যায় “প্রতিষেধুঃ” এইরূপ কথা বলা যায়। অনুপূর্বক “জা” দাত্তর অর্থ স্বীকার; সুতরাং “অনুজ্ঞাতুং ন শক্যো” এই কথার দ্বারা অস্বীকার করিতে পারা যায় না, এইরূপ অর্থ বুঝা যাইতে পারে। প্রতিষেধ করিতে পারা যায় না, ইহাই ঐ কথার কলিতার্থ হইতে পারে। উদ্যোতক তাহাই বলিয়াছেন। বস্তুতঃ প্রকৃত হলে তাহাই বস্তুতঃ। সুতরাং “ন শক্যোহনুজ্ঞাতুং” এইরূপ ভাষ্য-পাঠই এখানে প্রকৃত বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে।



না। প্রদীপ নিজের প্রত্যেক প্রদীপাস্তরকে অপেক্ষা করে না, ইহা সত্য, তজ্জন্য প্রদীপকে সজাতীয়াস্তরানপেক্ষ বলা যাইতে পারে। তাহা হইলে প্রকাশক হেতুর দ্বারা প্রদীপকে দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করিয়া, প্রমাণে সজাতীয়াস্তরানপেক্ষ সাধ্য করিতে হইবে। অর্থাৎ প্রমাণ প্রদীপের দ্বায় সজাতীয়াস্তরকে অপেক্ষা করে না, ইহাই বলিতে হইবে। একেবারে কাহাকেও অপেক্ষা করে না, ইহা বলা যাইবে না। কারণ, তাহা বলিলে প্রদীপ দৃষ্টান্ত হইবে না। এখন বাদী যদি ঐরূপ সাধ্য গ্রহণ করিতেই বাধ্য হইলেন, তবে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিব যে, তিনি “সজাতীয়” বলিয়া কিরূপ সজাতীয় বলিয়াছেন,—অত্যন্ত সজাতীয় অথবা কোনপ্রকারে সজাতীয়? অত্যন্ত সজাতীয় বলিতে পারেন না। কারণ, আমার মতেও চক্ষুরাদি প্রমাণ তাহার নিজের জানে তাহার অত্যন্ত সজাতীয় চক্ষুরাদিকে অপেক্ষা করে না। সুতরাং বাদী যে প্রমাণকে অত্যন্ত সজাতীয়কে অপেক্ষা করে না—ইহা বলিয়াছেন, উহা সাধন করিতেছেন, তাহা আমার মতে সিদ্ধ, তাহা আমিও মানি, সুতরাং বাদীর উহা সিদ্ধসাধন হইতেছে; উহাতে বাদীর ইষ্টসাধন হইতেছে না।

সিদ্ধসাধনের ভয়ে বাদী যদি বলেন যে, প্রমাণ তাহার জানে কোন প্রকারে সজাতীয় পদার্থাস্তরকে অপেক্ষা করে না, ইহাই আমার সাধ্য, তাহা হইলে প্রদীপ দৃষ্টান্ত হইতে পারে না। কারণ, প্রদীপে ঐ সাধ্য নাই। প্রদীপ নিজের জানে চক্ষুরাদিকে অপেক্ষা করে, প্রদীপও প্রকাশক পদার্থ, চক্ষুরাদিও প্রকাশক পদার্থ। সুতরাং প্রকাশকত্বরূপে এবং আরও বতরূপে চক্ষুরাদিও প্রদীপের সজাতীয় পদার্থ। কোন প্রকারে সজাতীয় পদার্থ বলিলে চক্ষুরাদিও যে প্রদীপের ঐরূপ সজাতীয় পদার্থ, এ বিষয়ে কাহারও বিবাদ নাই। সুতরাং প্রদীপ যখন চক্ষুরাদি সজাতীয় পদার্থকে অপেক্ষা করে, তখন তাহা বাদীর পূর্ণোক্ত সাধ্যসাধনে দৃষ্টান্ত হইতে পারে না। তাৎপর্যটীকাকার এই ভাবে বাদীর অহুমান খণ্ডন করিয়া বলিয়াছেন যে, এই অভিপ্রায়েই বার্ষিককার বলিয়াছেন যে, ‘অনেকান্ত’ এই দোষ হয় না অর্থাৎ দোষাত্মক বাহ্য আছে, তাহা উহাতেও হইবে, তাহার নিরাস হইবে না। কেবল অনেকান্ত এই দোষেরই উহাতে নিরাস হয়। তাৎপর্যটীকাকারের বর্ণিত তাৎপর্য উদ্যোতকর ও বাস্তবতার দ্বন্দ্বের নিগূঢ় ছিল, তাহার উহা স্পষ্ট করিয়া প্রকাশ করেন নাই। বাদীর অহুমানে পূর্বব্যাখ্যাত দোষাত্মক সুদীপন বুদ্ধিরা যাইতে পারিবেন, ইহা মনে করিয়াও তাহার উহা বলা আবশ্যক মনে করেন নাই, ইহাই তাৎপর্যটীকাকারের মনের ভাব। কিন্তু যে মতের খণ্ডনকে বিশেষ আবশ্যক মনে করিয়া ভাষ্যকার উত্থাপন করিয়াছেন, তাহার খণ্ডনে নিজের প্রদর্শিত দোষবিশেষকে নিরাস করিয়া, আর কিছু না বলা—প্রকৃত দোষের উল্লেখ না করা ভাষ্যকারের পক্ষে সংগত মনে হয় না।

বৃত্তিকার বিখনাথ এই ভাষ্যের যে অবিশদ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাও সুসংগত মনে

১। বহি পুনঃ প্রদীপপ্রকাশো দৃষ্টান্তো বিশেষতঃ তুনা প্রকাশয়ামিনা নংগৃহীতঃ? ওত একস্মিন পক্ষেভ্যাস্ত-  
জ্ঞায়মানো ন শব্দ্যঃ প্রতিবেদ্যবিত্তমেকান্ত ইত্যম্ব যোযো ন ভবতি।—ভাষ্যবৃত্তিক। তন্মেনোভিত্ত্যপ্রণে  
বার্ষিককৃতোক্তং—“অনেকান্ত ইত্যম্বো যোযো ন ভবতি”। দোষাত্মকত্ব ভবতীত্যাঃ।—তাৎপর্যটীকা।

হয় না এবং ঐ ব্যাখ্যা প্রাচীনদিগের অনুমোদিত নহে। সুতরাং তাৎপর্যটীকাকারের তাৎপর্যানুসারে বলিতে হইবে যে, বাহারা কোন হেতুবিশেষ গ্রহণ না করিয়াই কেবল প্রদীপকে দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করিয়া পূর্বোক্ত সিদ্ধান্ত সমর্থন করিতেন, ভাষ্যকার তাহাদিগের ঐ দৃষ্টান্তকে অনেকান্ত বলিয়া বণ্ডন করিয়াছেন। তাহাদিগের মত বণ্ডনে ভাষ্যকারের আর কোন বক্তব্য নাই। তবে বাহারা হেতুবিশেষ পরিগ্রহ করিয়া প্রদীপকে দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করিতেন, তাহাদিগের ঐ দৃষ্টান্ত “অনেকান্ত” হইবে না। মহর্ষি তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া এই সূত্রের দ্বারা তাহাদিগের ঐ দৃষ্টান্তকে “অনেকান্ত” বলেন নাই, ইহা ভাষ্যকারের বক্তব্য। নচেৎ মহর্ষির সূত্রে অথবা ভাষ্যকারের কথার কেহ না বুঝিয়া দোষ দেখিতে পারেন, তাই ভাষ্যকার শেষে বলিয়া গিয়াছেন যে, বিশেষ হেতু গ্রহণ করিয়া যদি প্রদীপকে দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে সে দৃষ্টান্ত অনেকান্ত হয় না অর্থাৎ তাহাতে অনেকান্ত, এই দোষটি হয় না। অল্প দোষ বাহা হয়, তাহার আর-উল্লেখ করেন নাই। কারণ, তিনি যে মতের বণ্ডন করিতে দৃষ্টান্তকে অনেকান্ত বলিয়াছেন, তাহার সেই প্রস্তাবিত মতে অল্প দোষের কীর্তন করা অনাবশ্যক। প্রকাশকল্প হেতুর দ্বারা প্রদীপ দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিয়া যদি কেহ পূর্বপক্ষ সমর্থন করেন, তবে সে পক্ষে দোষ স্বধীগণ দেখিতে পাইবেন। তাৎপর্যটীকাকার তাহা দেখাইয়া গিয়াছেন।

এখানে উদ্যোতকর ও বাচস্পতি মিশ্রের কথানুসারে ভাষ্যকারের তাৎপর্য ব্যাখ্যাত হইল। কিন্তু ভাষ্যে “ন শক্যো জ্ঞাতুং” এইরূপ পাঠই প্রকৃত বলিয়া গ্রহণ করিলে ভাষ্যকারের তাৎপর্য বুঝা যাইতে পারে যে, বিশেষ হেতু ব্যতীত এক পক্ষে উপসংহ্রিয়মান দৃষ্টান্ত অনেকান্ত। বিশেষ হেতু পরিগৃহীত এক পক্ষে উপসংহ্রিয়মান দৃষ্টান্ত হইলে তাহা অবশ্য অনেকান্ত নহে। কিন্তু তাদৃশ দৃষ্টান্ত (ন শক্যো জ্ঞাতুং) বুঝিতে পারা যায় না। অর্থাৎ তাদৃশ দৃষ্টান্ত জ্ঞান অসম্ভব। কারণ, প্রমাণে প্রমাণনিরপেক্ষসাধনে কোন বিশেষ হেতু বা প্রকৃত হেতু নাই। প্রকাশকল্প ঐহিককে হেতুরূপে গ্রহণ করা যায় না। কারণ, প্রদীপাদি প্রকাশক পদার্থও নিজের জ্ঞানে চক্ষুরাদি প্রমাণকে অপেক্ষা করায়, ঐ স্থলে ঐ সাধ্যসাধনে প্রকাশকল্প হেতুই হইতে পারে না। প্রমাণ প্রদীপের দ্বারা নজাতীয়াস্তরকে অপেক্ষা করে না, এইরূপ কথাও বলা যাইবে না। কেন বলা যাইবে না, তাহা পূর্বে বলা হইয়াছে। সুতরাং পূর্বোক্ত সাধ্যসাধনে বাদী কোন প্রকৃত হেতু গ্রহণ করিতে না পারায় বিশেষ হেতু-পরিগৃহীত দৃষ্টান্ত নাই। এইরূপ দৃষ্টান্ত থাকিলে অবশ্য তাহা অনেকান্ত হয় না। কিন্তু পূর্বোক্ত সাধ্যসাধনে ঐরূপ দৃষ্টান্ত নাই। ফলকথা, প্রথমে কিরূপ দৃষ্টান্ত অনেকান্ত, তাহা বলিয়া, শেষে কিরূপ দৃষ্টান্ত অনেকান্ত নহে ইহাও প্রকাশ করিয়া “এবম সতি” ইত্যাদি সম্বোধনের দ্বারা, “এইরূপ হইলে অর্থাৎ পূর্বোক্তরূপ বিশেষ হেতু-পরিগৃহীত দৃষ্টান্ত হইলে, সেখানে তাহা অনেকান্ত হয় না। কিন্তু তাহা নহে, প্রদীপরূপ যে দৃষ্টান্ত গ্রহণ করা হইয়াছে তাহা ঐরূপ নহে। সুতরাং তাহা অনেকান্ত, ইহাই ভাষ্যকার বলিয়াছেন, ইহা এই পক্ষে বুঝিতে হইবে। এ পক্ষে ভাষ্যকারের বক্তব্যের কোন ন্যূনতা থাকে না। স্বধীগণ উভয় পক্ষের সমালোচনা করিয়া ভাষ্যকারের তাৎপর্য বিচার করিবেন।



ভাষ্য । প্রত্যক্ষাদীনাং প্রত্যক্ষাদিভিরূপলব্ধাবনবস্থেতি  
 চেৎ ন, সংবিদ্বিষয়নিমিত্তানামুপলব্ধ্য ব্যবহারোপপত্তেঃ ।  
 প্রত্যক্ষার্থমুপলভে, অনুমানোর্থমুপলভে, উপমানোর্থমুপলভে,  
 আগমোর্থমুপলভে ইতি, প্রত্যক্ষং মে জ্ঞানমানুমানিকং মে জ্ঞান-  
 মৌপমানিকং মে জ্ঞানমাগমিকং মে জ্ঞানমিতি সংবিত্তিবিষয়ঃ সংবিত্তি-  
 নিমিত্তকোপলভমানস্ত ধর্ম্মার্থস্থাপবর্গপ্রয়োজনস্তৎপ্রত্যনৌকপরিবর্ত্তন-  
 প্রয়োজনশ্চ ব্যবহার উপপদ্যতে, সৌহৃৎ তাবতোব নিবর্ত্ততে, ন চান্তি  
 ব্যবহারান্তরমনবস্থাসাধনীয়ং যেন প্রযুক্তোহনবস্থামুপাদদৌতেতি ।

অনুবাদ । ( পূর্ববাক্য ) প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের দ্বারা প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের  
 উপলব্ধি হইলে “অনবস্থা” হয়, ইহা যদি বল, ( উত্তর ) না, অর্থাৎ অনবস্থা  
 হয় না । কারণ, সংবিত্ত অর্থাৎ স্বার্থ জ্ঞানের বিষয় ও নিমিত্তগুলির উপলব্ধির দ্বারা  
 ব্যবহারের উপপত্তি হয় । বিশদার্থ এই যে, প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারা পদার্থ উপলব্ধি  
 করিতেছি, অনুমান-প্রমাণের দ্বারা পদার্থ উপলব্ধি করিতেছি, উপমান-প্রমাণের  
 দ্বারা পদার্থ উপলব্ধি করিতেছি, শব্দপ্রমাণের দ্বারা পদার্থ উপলব্ধি করিতেছি,  
 এইরূপে ( এবং ) আমার প্রত্যক্ষ জ্ঞান, আমার আনুমানিক ( অনুমানপ্রমাণ-জ্ঞান )  
 জ্ঞান, আমার উপমানিক ( উপমান-প্রমাণ-জ্ঞান ) জ্ঞান, আমার আগমিক ( শব্দ-  
 প্রমাণ-জ্ঞান ) জ্ঞান, এইরূপে সংবিত্তির বিষয়কে ( প্রমেয়কে ) এবং সংবিত্তির  
 নিমিত্তকে ( প্রমাণকে ) উপলব্ধিকারী ব্যক্তির অর্থাৎ যে ব্যক্তি পূর্বোক্তরূপে  
 প্রমাণের দ্বারা প্রমেয়কে ও প্রমাণকে জানে, তাহার ধর্ম্মার্থ, ধন্যার্থ, সুখার্থ ও  
 মোক্ষার্থ, ( অর্থাৎ চতুর্বিধকলক ) এবং সেই ধর্ম্মাদির বিরোধি পরিহারার্থ ব্যবহার  
 উপপন্ন হয় । সেই এই ব্যবহার তাবন্মাত্রেই নিবৃত্ত হয় [ অর্থাৎ প্রমেয় জ্ঞান ও  
 প্রমাণের জ্ঞানেই তুচ্ছব্যবহারের সমাপ্তি হয় । পূর্বোক্তরূপ ব্যবহারের  
 নির্বাহের জন্য প্রমাণ-সাধন প্রমাণের জ্ঞানাদি প্রয়োজন হয় না ] অনবস্থাসাধনীর  
 অর্থাৎ অনবস্থা দোষ দ্বারার সাধনীয়, যে ব্যবহার অনবস্থা-দোষের সাধন করিতে  
 পারে, এমন অন্য ব্যবহারও নাই, দ্বারার দ্বারা প্রযুক্ত হইয়া অর্থাৎ যে ব্যবহাররূপ  
 প্রয়োজকবশতঃ অনবস্থাকে গ্রহণ করিবে ।

টীকানী । প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের দ্বারা প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের উপলব্ধি হয়, এই সিদ্ধান্তে অনবস্থা-  
 দোষ হয় না । কেন হয় না, পূর্বে ত্র্যপ্যটীকাকারের বর্ণনার উল্লেখ করিয়া তাহা বলা হইয়াছে ।

কিন্তু ভাষ্যকার পূর্বে অনবস্থা-দোষের উদ্ধার করেন নাই। তাহার কারণ এই যে, যদি প্রমাণ প্রদীপের দ্বারা প্রমাণান্তর-নিরপেক্ষ হইয়াই সিদ্ধ হয়, তাহা হইলে অনবস্থা-দোষের সম্ভাবনাই থাকে না। বাহ্যিক প্রমাণকে প্রদীপের দ্বারা প্রমাণান্তর-নিরপেক্ষ বলেন, তাহাদিগের নত খণ্ডন করিয়া, ভাষ্যকার পরে তাহার পূর্বোক্ত সিদ্ধান্ত অর্থাৎ প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের দ্বারা প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের উপলব্ধি হয়, এই সিদ্ধান্ত সমর্থন করায়, এখন অনবস্থা-দোষের আশঙ্কা হইতে পারে। তাই ভাষ্যকার এখানেই শেষে ঐ পূর্বপক্ষের অবতারণা করিয়া, তাহার উত্তর বলিয়া গিয়াছেন। পূর্বোক্ত স্বত্বের (১২ স্বত্বের) ভাষ্যে এই পূর্বপক্ষের উল্লেখ করেন নাই। যে সিদ্ধান্তে এই পূর্বপক্ষের আশঙ্কা হইতে পারে, পরস্বত্বের (২০ স্বত্বের) দ্বারা সেই সিদ্ধান্তের শেষ সমর্থন করিয়াই ভাষ্যকার এই পূর্বপক্ষের অবতারণা হ্রসংগত মনে করিয়াছিলেন। দ্বারসূচী-নিবন্ধানুসারে এখন পূর্বোক্ত “কচিদ্বিবিদিশনাং” ইত্যাদি বাক্যকে গোতমের সূত্র বলিয়াই গ্রহণ করা হইয়াছে, তখন সে পক্ষে হইয়াই বলিতে হইবে।

যদি প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের দ্বারা প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের উপলব্ধি হয়, তাহা হইলে প্রমাণের উপলব্ধি-সাধন সেই প্রমাণগুলিরও অন্য প্রমাণের দ্বারা উপলব্ধি হয় বলিতে হইবে। এইরূপ সেই প্রমাণ-গুলিরও অন্য প্রমাণের দ্বারা উপলব্ধি হয় বলিতে হইবে। এইরূপে প্রমাণের উপলব্ধিতে অনন্ত প্রমাণের উপলব্ধি আবশ্যক হইলে, কোন দিনই কোন প্রমাণের উপলব্ধি হইতে পারে না। প্রমাণ-জ্ঞানে অনন্ত প্রমাণের আবশ্যকতা হইলে অনবস্থা-দোষ হয়, তাহা হইলে প্রথম-প্রমাণ-জ্ঞান কিছুতেই হইতে পারে না। আর প্রমাণ-জ্ঞানে প্রমাণ আবশ্যক না হইলে প্রথম-প্রমাণ-জ্ঞান নিশ্চয় হইয়া পড়ে। কলকথা, স্বীকৃত প্রত্যক্ষাদি প্রমাণচতুষ্টয়ের দ্বারা উহাদিগের উপলব্ধি স্বীকার করিলেও সেই উপলব্ধি-সাধন প্রমাণগুলির উপলব্ধিতেও উহার আবশ্যক হওয়ায়, পূর্বোক্তরূপে অনবস্থা-দোষ হইয়া পড়ে। ভাষ্যকার এই তাৎপর্য্যে অনবস্থা-দোষের আপত্তি করিয়া, তত্ত্বেরে বলিয়াছেন যে, অনবস্থা-দোষ হয় না। কারণ, প্রমাণ ও প্রমের উপলব্ধির দ্বারা সকল ব্যবহারের উপপত্তি হয়, অনবস্থার দ্বারা কোন ব্যবহার নাই।

প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারা এই পদার্থকে উপলব্ধি করিতেছি, অল্পমান-প্রমাণের দ্বারা এই পদার্থকে উপলব্ধি করিতেছি ইত্যাদি প্রকারে সংবিত্তির বিষয় অর্থাৎ প্রমেরকে উপলব্ধি করে। এবং আমার প্রত্যক্ষ জ্ঞান, আমার আত্মমানিক জ্ঞান ইত্যাদি প্রকারে সংবিত্তির নিমিত্ত অর্থাৎ প্রমাণকে উপলব্ধি করে। ইহার পরে ব্যবহার অর্থাৎ কার্যের জন্ত আর কোন উপলব্ধি আবশ্যক হয় না। পূর্বোক্ত প্রকার প্রমের ও প্রমাণের উপলব্ধির দ্বারা সকল ব্যবহার অর্থাৎ ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এবং ইহাদিগের বিরোধি পরিবর্তন যে ব্যবহারের প্রয়োজন, এমন ব্যবহার উপপন্ন হয়। পূর্বোক্ত-প্রকার উপলব্ধির জন্ত যে ব্যবহার, তাহা তাবদ্ব্যজ্ঞেই নিবৃত্ত হয়। অর্থাৎ প্রমের ও প্রমাণের উপলব্ধি ছাড়া আর কোন প্রকার উপলব্ধি (উপলব্ধির উপলব্ধি, তাহার উপলব্ধি প্রভৃতি) কোন ব্যবহারে আবশ্যক হয় না; প্রমের ও প্রমাণের উপলব্ধিতেই পূর্বোক্ত সকল ব্যবহারের নিবৃত্তি বা সমাপ্তি। এমন কোন ব্যবহার নাই, বাহ্যতে প্রমাণের উপলব্ধি এবং তাহার দ্বারা প্রমাণের



উপলব্ধি এবং তাহার সাধন-প্রমাণের উপলব্ধি প্রভৃতি অনন্ত উপলব্ধি আবশ্যক হয়, তজ্জন্ত অনবস্থা-দোষ হয় ও তজ্জন্ত কোন প্রমাণেরই উপলব্ধি হইতে পারে না। সুতরাং কোন ব্যবহারপ্রযুক্ত অনবস্থা-দোষ বলিবে ? অনবস্থা-প্রয়োজক কোন ব্যবহার নাই; সুতরাং অনবস্থা-দোষের সম্ভাবনা নাই।

জ্ঞান্যকারের মূলকথা এই যে, প্রমাণের দ্বারা প্রমের বুদ্ধিমা জীব যে ব্যবহার করিতেছে, ঐ ব্যবহারে প্রমের উপলব্ধি এবং বুদ্ধিবিশেষে ঐ উপলব্ধির সাধন-প্রমাণের উপলব্ধি; এই পর্য্যন্তই আবশ্যক হয়। তাহাতে ঐ প্রমাণের উপলব্ধি-সাধন যে প্রমাণ, তাহার উপলব্ধি এবং তাহার সাধন-প্রমাণের উপলব্ধি প্রভৃতি আবশ্যক হয় না। সুতরাং অনবস্থা-দোষের কারণ নাই। গুঢ় তাৎপর্য্য এই যে, প্রমাণের দ্বারা প্রমের বিবরণি প্রকাশিত হয়। তাহার পরে “আমি এই পদার্থকে জানিতেছি” অথবা প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারা এই পদার্থকে উপলব্ধি করিতেছি, ইত্যাদি প্রকারে ঐ পূর্বজাত “ব্যবহার” নামক জ্ঞানের মানস প্রত্যক্ষ হয়, উহার নাম “অনুব্যবহার”। ঐ অনুব্যবহারের দ্বারা পূর্বজাত “ব্যবহার” জ্ঞানটি প্রকাশিত হয়। তবেদ্বারাছেই সকল ব্যবহারের উপপত্তি হয়; সুতরাং পরজাত “অনুব্যবহার” নামক দ্বিতীয় জ্ঞানটির প্রকাশ অনাবশ্যক হওয়ায়, তজ্জন্ত আর কোন জ্ঞানান্তরের নিয়ত অপেক্ষা নাই, তাহা হইলে আর কোন জ্ঞানান্তরের জন্ত প্রমাণান্তরেরও আবশ্যকতা নাই। সুতরাং অনবস্থা-দোষের কারণ নাই ৥২০৥

ভাষ্য। সামান্যেন প্রমাণানি পরীক্ষা বিশেষণে পরীক্ষ্যন্তে, তত্র—

অনুবাদ। সামান্ততঃ প্রমাণগুলিকে পরীক্ষা করিয়া, বিশেষতঃ পরীক্ষা করিতেছেন। তন্মধ্যে—

সূত্র। প্রত্যক্ষলক্ষণানুপপত্তিরসমগ্রবচনাৎ ॥২১॥৮-২॥

অনুবাদ। (পূর্বপক্ষ) প্রত্যক্ষ লক্ষণের উপপত্তি হয় না। কারণ, অসমগ্র-কথন হইয়াছে।

ভাষ্য। আত্মমনঃসম্বন্ধকর্ষো হি কারণান্তরং নোক্তমিতি।

অনুবাদ। যে হেতু আত্মমনঃসম্বন্ধকরূপ কারণান্তর বলা হয় নাই।

টিপ্পনী। সামান্ততঃ প্রমাণ-পরীক্ষার দ্বারা প্রমের সাধন প্রমাণ-নামক পদার্থ আছে, ইহা বুঝা গিয়াছে। এখন সামান্ততঃ জ্ঞাত ঐ প্রমাণের বিশেষ পরীক্ষা করিতেছেন। প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ, এই চারিটিকেই মহাবি প্রমাণবিশেষ বলিয়াছেন। তন্মধ্যে প্রত্যক্ষই সর্বাগ্রে বলিয়াছেন। এ জন্ত এই প্রমাণবিশেষপরীক্ষার সর্বাগ্রে প্রত্যক্ষেরই পরীক্ষা করিয়াছেন। প্রত্যক্ষ পরীক্ষায় প্রথমে ঐ প্রত্যক্ষের লক্ষণ পরীক্ষা করিয়াছেন। তাহাতে পূর্বপক্ষের অবতারণা করিয়াছেন যে, পূর্বোক্ত প্রত্যক্ষ-লক্ষণ অর্থাৎ প্রথম অধ্যায়ে চতুর্থ স্বত্বের দ্বারা যে প্রত্যক্ষ-লক্ষণ

বলা হইয়াছে, তাহা উপপন্ন হয় না। কারণ, অসমগ্রকথন হইয়াছে। ভাব্যাকার এই অসমগ্রকথন বুঝাইতে বলিয়াছেন যে, আত্মমনঃসম্বন্ধকরণ যে কারণান্তর, তাহা বলা হয় নাই। তাৎপর্য্য এই যে, প্রত্যক্ষ-লক্ষণে ইন্দ্রিয়ের বহিত বিষয়ের সম্বন্ধ-কর্তৃক উৎপন্ন জানকে প্রত্যক্ষ বলা হইয়াছে। কিন্তু প্রত্যক্ষে ইন্দ্রিয়-সম্বন্ধের দ্বারা আত্মমনঃসম্বন্ধকরণ কারণ, তাহা ত প্রত্যক্ষের লক্ষণে বলা হয় নাই; সুতরাং প্রত্যক্ষের সমগ্র কারণ তাহার লক্ষণে বলা হয় নাই। প্রত্যক্ষের কারণের দ্বারা তাহার লক্ষণ বলিলে, সমগ্র কারণই তাহাতে বলা উচিত। তাহা না বলিয়া কেবল একটিনাত্র কারণের উল্লেখ করিয়া যে প্রত্যক্ষ-লক্ষণ বলা হইয়াছে, তাহা উপপন্ন হয় না। জায়বান্তিকে উল্লেখ্যতকর এই ভাবে পূর্ণপক্ষ ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, পূর্বোক্ত প্রত্যাকলক্ষণ-সূত্রের দ্বারা কি প্রত্যক্ষের স্বরূপ অর্থাৎ লক্ষণ বলা হইয়াছে অথবা প্রত্যক্ষের কারণ বলা হইয়াছে? প্রত্যক্ষের কারণ বলা হইয়াছে, ইহা বলা যায় না। কারণ, প্রত্যক্ষের অগ্রান্ত কারণও (আত্মমনঃসংযোগ প্রকৃতি) আছে, তাহা ঐ সূত্রে বলা হয় নাই। প্রত্যক্ষের লক্ষণ বলা হইয়াছে, ইহাও বলা যায় না। কারণ, ঐ সূত্রে প্রত্যক্ষের উৎপত্তির কারণমাত্র কথিত হইয়াছে। বস্তুর কারণমাত্র-কথন তাহার লক্ষণ হইতে পারে না। উল্লেখ্যতকর এই ভাবে পূর্ণপক্ষ ব্যাখ্যা করিয়া তদন্তরে বলিয়াছেন যে, প্রত্যক্ষ-সূত্রের দ্বারা প্রত্যক্ষের লক্ষণ বলা হইয়াছে, ইহাও বলিতে পারি, প্রত্যক্ষের কারণ বলা হইয়াছে, ইহাও বলিতে পারি। উভয় পক্ষেই কোন দোষ নাই। প্রত্যক্ষের কারণ বলিলে তাহার অসাধারণ কারণই বলা হইয়াছে। প্রত্যক্ষে এতাবদ্বাত্র কারণ, এইরূপে কারণ অবগারণ করা হয় নাই। যেটি প্রত্যক্ষে অসাধারণ কারণ, তাহাই ঐ সূত্রে বলা হইয়াছে। এবং লক্ষণ বলিলেও কোন দোষ হয় না। কারণ, প্রত্যক্ষের অসাধারণ কারণের দ্বারা তাহার লক্ষণ বলা হইতে পারে। যাহা সম্ভাব্য ও বিজাতীয় পদার্থ হইতে বস্তুকে পৃথক্ করে, তাহাই তাহার লক্ষণ হয়। প্রত্যক্ষের অসাধারণ কারণ যে, ইন্দ্রিয়-সম্বন্ধকরণ (অর্থাৎ যাহা আর কোন প্রকারে জানে কারণ নহে), তাহার দ্বারা প্রত্যক্ষের যে লক্ষণ বলা হইয়াছে, তাহা প্রকৃত লক্ষণই হইয়াছে। তাৎপর্য্যটিকাঙ্কার এখানে বলিয়াছেন যে, এখানে প্রত্যক্ষের লক্ষণ-পক্ষই নিষ্কান্তরূপে উল্লেখ্যতকরের অভিমত। পূর্বোক্ত প্রত্যাক-সূত্রের দ্বারা প্রত্যক্ষের কারণ বলা হইয়াছে, ইহাও বলিতে পারি, ইহাতেও কোন দোষ নাই, এই যে কথা উল্লেখ্যতকর বলিয়াছেন, উহা তাহার প্রোচিবাদমাত্র। বস্তুতঃ পূর্বোক্ত প্রত্যাক-লক্ষণ-সূত্রের দ্বারা প্রত্যক্ষের লক্ষণই বলা হইয়াছে। সেই লক্ষণেরই অল্পপদ্ধতিরূপ পূর্ণপক্ষ মহর্ষি নিজেই উল্লেখ করিয়াছেন। এই পূর্ণপক্ষের উত্তর পরে মহর্ষি-সূত্রের পাণ্ডুরা যাইবে ১২১।

ভাষ্য। ন চাসংবুদ্ধে দ্রব্যে সংযোগজ্ঞানস্য গুণন্যোৎপত্তিরিতি।  
জ্ঞানোৎপত্তিদর্শনাদাত্মমনঃসম্বন্ধকরণং। মনঃসম্বন্ধানপেক্ষস্য  
চেন্দ্রিয়ার্থসম্বন্ধকরণস্য জ্ঞানকারণত্বে যুগপদ্ব্যুৎপাদ্যরন্ বুদ্ধয় ইতি  
মনঃসম্বন্ধকরণোহপি কারণং, তদনিং সূত্রং পুরস্তাৎ কৃতভাষ্যং।



অনুবাদ। অসংযুক্ত দ্রব্যে সংযোগ-জন্য গুণের উৎপত্তি হয় না। জ্ঞানের উৎপত্তি দেখা যায়, অর্থাৎ আত্মাতে প্রত্যক্ষ জ্ঞান জন্মে, এ জন্য আত্মার সহিত মনের সন্নিবর্ত (সংযোগবিশেষ) কারণ [অর্থাৎ ইন্দ্রিয়-মনঃসংযোগ-জন্য গুণ যে প্রত্যক্ষ জ্ঞান, তাহা যখন আত্মাতে জন্মে, তখন তাহাতে আত্মার সহিত মনের সংযোগবিশেষও কারণ বলিতে হইবে। আত্মা মনের সহিত অসংযুক্ত হইলে, তাহাতে সংযোগ-জন্য গুণ যে প্রত্যক্ষ জ্ঞান, তাহা জন্মিতে পারে না] মনঃসন্নিবর্তনিরপেক্ষ ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিবর্তের জ্ঞান-কারণতা (প্রত্যক্ষ-কারণতা) হইলে, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ার্থ সহিত বিষয়ের সন্নিবর্ত-বিশেষই যদি প্রত্যক্ষে কারণ বলা হয়, ইন্দ্রিয়ার্থ সহিত মনের সন্নিবর্ত তাহাতে যদি অনাবশ্যক বলা হয়, তাহা হইলে জ্ঞানগুলি (চাক্ষুর্গোচর নানাজাতীয় প্রত্যক্ষগুলি) একই সময়ে উৎপন্ন হইতে পারে, এ জন্য মনের সন্নিবর্তও অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ার্থ সহিত মনের সংযোগও (প্রত্যক্ষে) কারণ। সেই এই সূত্র অর্থাৎ “নান্দ্রিয়মনসোঃ সন্নিবর্তাভাবে” ইত্যাদি পরবর্তী (২২শ) সূত্র পূর্বের কৃতভাষ্য হইল অর্থাৎ ঐ সূত্র-পাঠের পূর্ববর্তী উহার ভাষ্য করিলাম।

**সূত্র।** নান্দ্রিয়মনসোঃ সন্নিবর্তাভাবে প্রত্যক্ষোৎপত্তিঃ ॥২২॥৮৩॥

অনুবাদ। আত্মা ও মনের সন্নিবর্তের অভাবে প্রত্যক্ষের উৎপত্তি হয় না।

ভাষ্য। নান্দ্রিয়মনসোঃ সন্নিবর্তাভাবে নোৎপদ্যতে প্রত্যক্ষমিন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিবর্তাভাববদিত্তি।

অনুবাদ। ইন্দ্রিয়ার্থ সহিত বিষয়ের সন্নিবর্তের অভাবে যেমন প্রত্যক্ষ জন্মে না, তরুণ আত্মা ও মনের সন্নিবর্তের অভাবে প্রত্যক্ষ জন্মে না।

টিপ্পনী। পূর্বোক্ত পূর্বপক্ষ-সূত্রের দ্বারা মহর্ষি ইহাই মাত্র বলিয়াছেন যে, প্রত্যক্ষ-লক্ষণের উৎপত্তি হয় না। কারণ, অবশ্য-কথন হইয়াছে। এই পূর্বপক্ষ বৃত্তিতে হইলে প্রত্যক্ষের লক্ষণে আর কিছের উল্লেখ করা কর্তব্য ছিল, যাহার অন্তর্ভুক্ত অসমগ্র-কথন হইয়াছে, ইহা বৃত্তিতে হইবে এবং সেই পদার্থের উল্লেখ করা কেন কর্তব্য, তাহাও বৃত্তিতে হইবে। এ জন্য মহর্ষি “নান্দ্রিয়মনসোঃ সন্নিবর্তাভাবে প্রত্যক্ষোৎপত্তিঃ” এই পরবর্তী সূত্রের দ্বারা পূর্বোক্ত পূর্বপক্ষের মূল প্রকাশ করিয়াছেন। আত্মা ও মনের সন্নিবর্ত না হইলে প্রত্যক্ষ হয় না, এই কথা মহর্ষি ঐ সূত্রের দ্বারা বলিয়াছেন। তাহাতে আত্মমনঃসন্নিবর্ত প্রত্যক্ষে কারণ, ইহাই বলা হইয়াছে।

পূর্বোক্ত প্রত্যক্ষ-লক্ষণ-স্বত্রে প্রত্যক্ষের কারণ উল্লেখ করিয়াও এই কারণটি বলা হয় নাই, সুতরাং অসমগ্র-কথন হইয়াছে, ইহাই ঐ স্বত্রে দ্বারা চরমে প্রকটিত হইয়াছে। পূর্বস্বত্রেও "অসমগ্র-কথন"রূপে হেতুটি প্রতিপাদন করাই এই স্বত্রে দ্বারা উদ্দেশ্য।

আত্মমনঃসৈরিকর্ষকে প্রত্যক্ষে কারণ বলিতে হইবে কেন, তাহা ভাষ্যকার "ন চাসংযুক্তে ভ্রম্যে" ইত্যাদি ভাষ্যের দ্বারা বুঝাইয়াছেন। ঐ ভাষ্য পূর্বোক্ত স্বত্রে ভাষ্য বলিয়াই বুঝা যায়। কারণ, পরবর্তী স্বত্রে-পাঠের পূর্বেই ঐ ভাষ্য কথিত হইয়াছে। কিন্তু তাৎপর্যটীকাকার ত্রিমু-বাচস্পতি মিশ্র এখানে লিখিয়াছেন যে, ভাষ্যকার "নাহ্মনসোঃ সন্নিবর্ত্যভাবে" ইত্যাদি স্বত্রে-পাঠের পূর্বেই "ন চাসংযুক্তে ভ্রম্যে" ইত্যাদি ভাষ্যের দ্বারা ঐ স্বত্রে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ভাষ্যকারও পরে "তদ্বিদং স্বত্রে পুরস্তাং কৃতভাষ্যং" বলিয়া ইহা স্পষ্ট প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। অবশ্য ভাষ্যকারের ঐ কথার দ্বারা ইহাও বুঝা যায় যে, এই স্বত্রে অর্থাৎ "প্রত্যক্ষলক্ষণগুণপরিণামগ্র-বচনাং" এই পূর্বোক্ত স্বত্রে পূর্বেই কৃতভাষ্য হইয়াছে। কারণ, পূর্বোক্ত প্রত্যক্ষ-লক্ষণ-স্বত্রে (১ম, ৪ স্বত্রে) ভাষ্যে মহর্ষির এই স্বত্রেও পূর্বপক্ষের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, তাহাতেই এই স্বত্রে বিশদরূপে প্রকটিত হইয়াছে। এখানে আত্মমনঃসৈরিকর্ষও প্রত্যক্ষে কারণ এবং তাহার যুক্তি প্রকাশ করা হইল। কারণ, পরবর্তী স্বত্রে আত্মমনঃসৈরিকর্ষ প্রত্যক্ষে কারণ, ইহা মহর্ষি বলিয়াছেন। মহর্ষির ঐ সিদ্ধান্তের যুক্তি প্রদর্শন আবশ্যক।

এই ভাবে ভাষ্যকারের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করা গেলেও "ন চাসংযুক্তে ভ্রম্যে" ইত্যাদি সন্দর্ভ পরবর্তী স্বত্রে ভাষ্য হইলেই সুসংগত হয়। কারণ, ঐ ভাষ্যেও কথ্যগুলি পরবর্তী স্বত্রেই কথ্য। পূর্বস্বত্রে ভাষ্যে ঐ কথ্যগুলি বলা সুসংগত হয় না, এই জন্য তাৎপর্যটীকাকার "ন চাসংযুক্তে ভ্রম্যে" ইত্যাদি ভাষ্য পরবর্তী স্বত্রে ভাষ্য বলিয়াই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। স্বত্রে-পাঠের পূর্বেও সেই স্বত্রে ভাষ্য বলা বাইতে পারে, প্রথমমাধ্যমে "সিদ্ধান্ত"-প্রকরণে এক স্থলেও ভাষ্যকার তাহা বলিয়াছেন, ইহা তাৎপর্যটীকাকার সেখানেও লিখিয়াছেন।

আত্মমনঃসৈরিকর্ষ প্রত্যক্ষে কারণ কেন, ইহা বুঝাইতে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, অসংযুক্ত ভ্রম্যে মথবাগ-জন্ম গুণপদার্থের উৎপত্তি হয় না। তাৎপর্যটীকাকার ঐ কথার তাৎপর্য বর্ণন করিতে বলিয়াছেন যে, সমস্ত কারণই কার্যজ্ঞানের নিমিত্ত পরস্পর সম্বন্ধে আপেক্ষা করে, অত্রথা যে-কোন স্থানে অবস্থিত কারণ হইতেও কার্য জন্মিতে পারে। অন্তএব আত্মতে যে জ্ঞানরূপ কার্য জন্মে, তাহা মনসেবদ্ধ আত্মাতেই জন্মে, ইহা বলিতে হইবে। কারণ, আত্মাতে যে জ্ঞান জন্মে, তাহাতে মনও কারণ। মন না থাকিলে কোন জ্ঞানই জন্মিতে পারে না। মন ও আত্মা, এই উভয় যদি জ্ঞানমাত্রের কারণ হয়, তাহা হইলে ঐ উভয়ের সমবগন বা সমজ্ঞ অবশ্যই তাহাতে আবশ্যক হইবে। আত্মা ও মনের সমযোগবিশেষই সেই সমবগন বা সমজ্ঞ। আত্মা ও মন, এই দুইটি দ্বারা অসংযুক্ত থাকিলে, তাহাতে জ্ঞানরূপ গুণের উৎপত্তি হইতে পারে না। আত্মাতে যখন জ্ঞানের উৎপত্তি হইতেছে, তখন তাহাতে মনসেব্যাগ অবশ্য কারণ বলিতে হইবে। বস্তুতঃ ভাষ্যকার যে জ্ঞানের উৎপত্তির কথা বলিয়াছেন, তদ্বারা প্রত্যক্ষ জ্ঞানই তাহার অভিপ্রেত।



কারণ, প্রত্যক্ষ জ্ঞানে আত্মমনঃসংযোগের কারণত্বই এখানে তাঁহার সম্বন্ধীয়। ভাষ্যকারের ভাবগম্য বুঝা যায় যে, প্রত্যক্ষ জ্ঞান ইন্দ্রিয়-মনঃসংযোগ-জন্ত, সূত্রসং উহা সংযোগ-জন্ত গুণ। তাহা হইলে ঐ গুণ যে দ্রব্যে (আত্মাতে) ইহা আছে, সেই আত্মার সহিতও মনের সংযোগ ঐ গুণের উৎপত্তিতে আবশ্যক। কারণ, যে দ্রব্য অসংযুক্ত, তাহাতে সংযোগ-জন্ত গুণ জন্মে না। কেবল ইন্দ্রিয় ও মনের সংযোগকে প্রত্যক্ষ কারণ বলিলে অর্থাৎ আত্মার সহিত ঐ বিজ্ঞাতীয় সংযোগ কারণরূপে স্বীকার না করিলে আত্মাতে প্রত্যক্ষ জন্মিতে পারে না। সূত্রসং ইন্দ্রিয়-মনঃসংযোগের জ্ঞান আত্মমনঃসংযোগও প্রত্যক্ষ কারণ, ইহা স্বীকার্য।

ভাষ্যকারের পূর্বকথায় অপত্তি হইতে পারে যে, প্রত্যক্ষে ইন্দ্রিয়ের সহিত মনের সংযোগকে কারণ বলা নিত্যাশ্রয়ন। ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সঙ্গিকর্ম হইলেই প্রত্যক্ষ জন্মে, তাহা প্রত্যক্ষ জন্মাইতে মনসংযোগকে অপেক্ষা করে না। যদি ইহাই হয়, তাহা হইলে আত্মাতে যে প্রত্যক্ষ জন্মে, তাহা সংযোগ-জন্ম গুণ হয় না। দেবের প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়-সংযোগ-জন্ম হইলেও সমস্ত জন্ম-প্রত্যক্ষ সংযোগ-জন্ম গুণ নহে। তাহা হইলে জন্ম-প্রত্যক্ষমাত্রকেই সংযোগ-জন্ম গুণ বলিয়া, তাহার আশার দ্রব্য আত্মাতে মনের সংযোগ আবশ্যক; আত্মমনঃসংযোগে জন্ম-প্রত্যক্ষমাত্রে কারণ, এই কথা বলা যায় না। এই জন্ম ভাষ্যকার শেষে ইন্দ্রিয়ার্গসঙ্গিকর্ম যে ইন্দ্রিয়মনঃসংযোগকে অপেক্ষা করিয়াই প্রত্যক্ষেও কারণ হয় অর্থাৎ জন্ম প্রত্যক্ষমাত্রেই যে ইন্দ্রিয়ের সহিত মনের সংযোগও কারণ, ইহা সমর্থন করিয়াছেন। একই সময়ে চাক্ষুষাদি নানাজাতীয় বুদ্ধি (প্রত্যক্ষ) জন্মে না, এ জন্ম প্রত্যক্ষে ইন্দ্রিয়ের সহিত মনের সংযোগকে কারণ বলিতে হইবে। ঐ বুদ্ধিতেই মন নামে অতি হৃদয় অত্মরিন্দ্রিয় স্বীকার করা হইয়াছে। অতি হৃদয় মনের সহিত একই সময়ে একাধিক ইন্দ্রিয়ের সংযোগ হইতে না পারায়, একই সময়ে একাধিক প্রত্যক্ষ হইতে পারে না (১ম অঃ, ১৩শ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

অতঃপর্যন্তীকার বলিয়াছেন যে, জ্ঞান সংযোগ-জন্ত, ইহা স্বীকার করি। তাহা হইলে জ্ঞানের আধার-জন্ম যে আত্মা, তাহা সংযুক্ত হওয়া আবশ্যিক; অসংযুক্ত জন্মো সংযোগ-জন্ত জ্ঞানের উৎপত্তি হয় না, ইহাও স্বীকার্য। কিন্তু তাহাতে আত্মমনঃসংযোগকে প্রত্যক্ষের প্রতি কারণ বলা নিশ্চয়োক্ত। বিষয়, ইন্দ্রিয় ও আত্মা, এই তিনের সংযোগকেই প্রত্যক্ষে কারণ বলিব। তাহা হইলেই আত্মা ইন্দ্রিয়াদির সহিত সংযুক্ত হওয়ার আর অসংযুক্ত জন্ম হইল না। এই কথা কেহ বলিতে পারেন, এ অস্ত্র ভাষ্যকার পরে "মনঃসৈবিকর্মানপেক্ষত" ইত্যাদি মনভেদের দ্বারা প্রত্যক্ষে মনঃ সংযোগও যে কারণ বলিতে হইবে, ইহা সন্দেহ করিয়াছেন। মূলকথা, প্রত্যক্ষে ইন্দ্রিয়ার্জ-সদ্বিকল্পের দ্বারা আত্মমনঃসংযোগও কারণ, সত্তরাং পূর্ণোক্ত প্রত্যাক লক্ষণে তাহাও বক্তব্য। তাহা না বলার প্রত্যাক-লক্ষণের অনুলপত্তি, ইহাই পূর্ণপক্ষ ২২।

ভাষ্য । সতি চেন্দ্রিয়ার্থসমীকর্ষে জ্ঞানোৎপত্তিদর্শনাং কারণভাবঃ  
ব্রহ্মতে ।

অনুবাদ । ইন্দ্রিয়ার্থ-সম্বন্ধে থাকিলে জ্ঞানের (প্রত্যক্ষের) উৎপত্তি দেখা যায়, এ জ্ঞান (কেহ কেহ প্রত্যক্ষে ইন্দ্রিয়ার্থ-সম্বন্ধের) কারণ বলেন<sup>১</sup> ।

**সূত্র ।** দিগ্দেশকালাকাশেষপ্যেবং প্রসঙ্গঃ॥২॥৮৪॥

অনুবাদ । এইরূপ হইলে অর্থাৎ যদি ইন্দ্রিয়ার্থ-সম্বন্ধে প্রত্যক্ষের পূর্বে থাকাতোই তাহার কারণ হয়, তাহা হইলে দিক্, দেশ, কাল ও আকাশেও প্রসঙ্গ অর্থাৎ প্রত্যক্ষের কারণতাপত্তি হয় ।

ভাব্য । দিগাদিষু সংস্থ জ্ঞানভাবাং তান্যপি কারণানীতি । অকারণ-ভাবেহপি জ্ঞানোৎপত্তির্দিগাদিসম্বন্ধেবর্জনীয়হাং । যদাপ্যাকারণং দিগাদীনি জ্ঞানোৎপত্তৌ, তদাপি সংস্থ দিগাদিষু জ্ঞানেন ভবিতব্যং, ন হি দিগাদীনাং সম্বন্ধিঃ শব্দাঃ পরিবর্জ্যমিত্যুচ্যতে । তত্র কারণভাবে হেতু-বচনং, এতস্মাক্ষেতোর্দিগাদীনি জ্ঞানকারণানীতি ।

অনুবাদ । দিক্ প্রভৃতি (দিক্, দেশ, কাল ও আকাশ) থাকিলে জ্ঞান হয়, এ জ্ঞান তাহারাও (জ্ঞানের) কারণ হউক ? [ দিক্ প্রভৃতি জ্ঞানের কারণই হইবে, উহারা জ্ঞানের কারণ নহে কেন ? ইহার উত্তর এখন ভাব্যকার বলিতেছেন ] অকারণ হইলেও জ্ঞানের উৎপত্তি হয় । যেহেতু দিক্ প্রভৃতির সম্বন্ধান অবর্জনীয় । বিশদার্থ এই যে, যদিও দিক্ প্রভৃতি জ্ঞানের উৎপত্তিতে কারণ নহে, তাহা হইলেও দিক্ প্রভৃতি থাকিলে জ্ঞান হইবে, অর্থাৎ জ্ঞানোৎপত্তির পূর্বে দিক্ প্রভৃতি পদার্থ থাকিবেই, যেহেতু দিক্ প্রভৃতির সম্বন্ধি (সভা) বর্জন করিতে পারা যায় না । তাহাতে জ্ঞানের কারণ থাকিলে অর্থাৎ দিক্ প্রভৃতিকেও জ্ঞানের কারণরূপে স্বীকার করিলে “এই হেতুবশতঃ দিক্ প্রভৃতি জ্ঞানের কারণ” এইরূপে হেতুবচন কর্তব্য, অর্থাৎ উহারা জ্ঞানের কারণ কেন, ইহার প্রমাণ বলা আবশ্যক । কেবল পূর্বসম্ভাব্যবশতঃ কেহ কারণ হয় না ।

টিপ্পনী । প্রত্যক্ষে ইন্দ্রিয়ার্থ-সম্বন্ধে কারণ, ইহা প্রথমাব্যয়ে প্রত্যাক-লক্ষণ-সূত্রে সূচিত হইয়াছে । পরে ইহা সমর্থিত হইবে । বাহারা বলেন যে, ইন্দ্রিয়ার্থ-সম্বন্ধে পূর্বে বিদ্যমান থাকিলে যেহেতু প্রত্যাক জ্ঞান, অতএব ইন্দ্রিয়ার্থ-সম্বন্ধে প্রত্যাক কারণ অর্থাৎ প্রত্যাকের পূর্বে ইন্দ্রিয়ার্থ-সম্বন্ধে অবশ্য থাকে বলিয়াই উহা প্রত্যাকের কারণ হয় । মহর্ষি এইরূপ যুক্তিবাদী-

১। যে চ সতি ভাব্য কারণভাবঃ বর্জ্যন্তি, যস্মাৎ কিং ইন্দ্রিয়ার্থসম্বন্ধে সতি জ্ঞানং ভবতি তস্মাদিন্দ্রিয়ার্থ-সম্বন্ধঃ কারণমিতি চেদাং—“দিগ্দেশকালাকাশেষপ্যেবং প্রসঙ্গঃ” —ভাষ্যবার্ত্তিক ।



নিগের অথবা বাহ্যার ঐরূপ হুল বুঝিবেন, তাহাদিগের ভ্রম নিবাসের জন্ম এই স্বপ্নের দ্বারা বলিয়াছেন যে, এইরূপ হইলে দিক্, দেশ, কাল এবং আকাশও জ্ঞানের কারণ হইয়া পড়ে ; তাহাদিগকেও জ্ঞানের কারণ বলিতে হয়। কারণ, জ্ঞানোৎপত্তির পূর্বে দিক্ প্রভৃতিও অবশ্য বিদ্যমান থাকে। যদি কার্যের পূর্বে বিদ্যমান থাকিলেই তাহা, সেই কার্যের কারণ হয়, তাহা হইলে দিক্ প্রভৃতিও জ্ঞান-কার্যের কারণ হইয়া পড়ে। যদি বলা, দিক্ প্রভৃতিও জ্ঞানের কারণ ; তাহারা যে জ্ঞানের কারণ নহে, ইহা কোন্ যুক্তিতে সিদ্ধ আছে ? ঐ আপত্তি ইহঁই বলিব, দিক্ প্রভৃতিকেও জ্ঞানের কারণ বলিয়া স্বীকার করিব। এ জন্ত ভাষ্যকার সূত্রার্থ বর্ণন পূর্বক হস্তোক্ত আপত্তি যে ইষ্টোপস্থি নহে অর্থাৎ দিক্ প্রভৃতি যে জ্ঞানের কারণরূপে স্বীকৃত হইতে পারে না, ইহা বুঝাইয়া দিয়াছেন।

ভাষ্যকারের সেই কথাগুলির তাৎপর্য্য এই যে, কেবল “অবয়” মাত্রবশতঃ কোন পদার্থের কারণস্থ সিদ্ধ হয় না। “অবয়” ও “ব্যতিরেক” এই উভয়ের দ্বারাই কারণস্থ সিদ্ধ হয়। সেই পদার্থ থাকিলে সেই পদার্থ হয়, ইহা “অবয়”। সেই পদার্থ না থাকিলে সেই পদার্থ হয় না, ইহা “ব্যতিরেক”। চক্ষুঃসম্বন্ধে থাকিলেই চাক্ষুশ প্রত্যক্ষ হয়, তাহা না থাকিলে হয় না, এ জন্ত চাক্ষুশ প্রত্যক্ষে চক্ষুঃসম্বন্ধের অবয়ব ও ব্যতিরেক উভয়ই থাকায়, চাক্ষুশ প্রত্যক্ষে চক্ষুঃসম্বন্ধ কারণরূপে সিদ্ধ হইয়াছে। এইরূপ সর্বত্রই অবয়ব ও ব্যতিরেক প্রযুক্তই কারণস্থ সিদ্ধ হইয়াছে। জ্ঞান কার্যে দিক্ প্রভৃতি পদার্থের অবয়ব ও ব্যতিরেক না থাকায় উহা কারণ হইতে পারে না। দিক্ প্রভৃতি জ্ঞানোৎপত্তির পূর্বে অবস্থ থাকে—ইহা সত্য, হুতরাং তাহাতে অবয়ব আছে, ইহা স্বীকার্য্য। কিন্তু দিক্ প্রভৃতি না থাকিলে জ্ঞান হয় না, এ কথা কিছুতেই বলা হইবে না। কারণ, দিক্ প্রভৃতি সর্বত্রই আছে, উহাদিগের না থাকা একটা পদার্থই নাই। হুতরাং “ব্যতিরেক” না থাকায় দিক্ প্রভৃতি জ্ঞান কার্যে কারণ হইতে পারে না। দিক্ প্রভৃতির সন্নিধি বা সত্তা সর্বত্রই থাকায়, উহা যখন কৃত্রাপি বর্জন করা অসম্ভব, তখন দিক্ প্রভৃতি না থাকায় জ্ঞান জন্মে নাই, এমন হুল অসম্ভব। হুতরাং অবয়ব ও ব্যতিরেক, এই উভয় না থাকায় দিক্ প্রভৃতি জ্ঞানকার্যে কারণ হইতে পারে না। দিক্ প্রভৃতিকে জ্ঞানকার্যে কারণ বলিতে হইলে, কোন্ হেতু বা প্রমাণবশতঃ তাহা কারণ, তাহা বলা আবশ্যক। কিন্তু ঐ বিষয়ে কোন হেতু বা প্রমাণ না থাকায়, তাহা বলা হইবে না। আত্মনসংযোগ থাকিলে জ্ঞান হয়, উহা না থাকিলে জ্ঞান হয় না, এ জন্ত অবয়ব ও ব্যতিরেক, এই উভয়ই থাকায়, উহা জন্তজ্ঞানমাত্র কারণ। এইরূপ ইন্দ্রিয়ার্থ-সম্বন্ধ এবং ইন্দ্রিয়-নসংযোগ প্রত্যক্ষ কার্যে অবয়ব ও ব্যতিরেকবশতঃ কারণরূপে সিদ্ধ। পরে ইহা ব্যক্ত হইবে।

তাৎপর্য্যটীকাকার বাচস্পতি মিশ্র এই হৃতকে পূর্বপক্ষ-হৃতরূপে প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, পূর্বোক্ত ছই হৃতের দ্বারা পূর্বপক্ষ প্রকটিত হইলে, পার্থক্য ব্যক্তি ভ্রমবশতঃ

১। তবেই ভাষ্যকার সূত্রার্থে পূর্বপক্ষিতে সতি—ভাষ্যকারেণ ইন্দ্রিয়ার্থ-সম্বন্ধবিশীলনেন কারণস্থত্বসিদ্ধি বহুমানঃ পার্থক্যঃ প্রত্যক্ষভিত্তিতে সতি ভেদিত্যর্থঃ। ন সতি ভাষ্যকারেণ কারণস্থা, আকাশাদীনামপি কারণস্থ-এসম্বন্ধঃ কামুনশাস্ত্রবশংসংযোগ ইন্দ্রিয়ান্নসংযোগশ্চেতি ন কারণস্থত্বমিত্যর্থঃ।—তাৎপর্য্যটীকা।

পূর্বপক্ষের অবতারণা করিতেছেন যে, ইঞ্জিয়ার্গ-সম্বন্ধ প্রভৃতি প্রত্যক্ষের পূর্বে থাকতেই যদি তাহা প্রত্যক্ষের কারণ হয়, তাহা হইলে দিক্ প্রভৃতিও প্রত্যক্ষের কারণ হইয়া পড়ে। সুতরাং প্রত্যক্ষের পূর্বে থাকতেই ইঞ্জিয়ার্গ-সম্বন্ধকে কারণ বলা যায় না। তাহা হইলে আত্মনঃ-সংযোগ এবং ইন্দ্রিয়ানুসংযোগও প্রত্যক্ষের কারণ হইতে পারে না। কারণ, কেবল কার্যের পূর্বসম্ভাব্যতাই কোন পদার্থ কারণ বলিয়া সিদ্ধ হয় না। তাৎপর্যটীকাকারের কথায় বুঝা যায়, মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা পার্থক্য স্নাত্ত ব্যক্তির যে পূর্বপক্ষ প্রকাশ করিয়াছেন, ভাষ্যকার নিজে তাহার নিরাস করিয়াছেন। ভাষ্যকার প্রথমে “সতি চ” ইত্যাদি সন্দর্ভের দ্বারা সেই পূর্বপক্ষের মূল প্রকাশপূর্বক পূর্বপক্ষ-সূত্রের অবতারণা করিয়াছেন। কিন্তু এইরূপ ব্যাখ্যায় মহর্ষি ঐ পূর্বপক্ষের কোন সূত্রের দ্বারা নিরাস করিয়াছেন, ইহা চিন্তনীয়। মহর্ষি পূর্বপক্ষের প্রকাশ করিয়াও তাহার উত্তর বলেন নাই, ভাষ্যকার তাহার উত্তর ব্যাখ্যা করিয়া মহর্ষির ন্যূনতা পরিহার করিয়াছেন, এইরূপ কল্পনা সমীচীন মনে হয় না। উদ্যোতকর যে তাবে এই সূত্রের উত্থাপন করিয়াছেন, তাহাতে এই সূত্রটিকে পূর্বপক্ষ-সূত্র বলিয়া বুঝিবারও কারণ নাই। ইঞ্জিয়ার্গ-সম্বন্ধ প্রত্যক্ষের পূর্বে থাকে বলিয়াই, উহা প্রত্যক্ষের কারণ, এই কথা বাহারা বলেন বা ভ্রমবশতঃ কখনও বলিয়াছিলেন, তাহাদিগের ভ্রম নিরাস করিতেই মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা ঐ পক্ষ অনিষ্ট আশঙ্কি প্রকাশ করিয়াছেন। অর্থাৎ বাহারা ঐরূপ বলেন, তাহাদিগের মতে দিক্, দেশ প্রভৃতিও জ্ঞান-কার্যের কারণ হইয়া পড়ে। ইহাই উদ্যোতকরের কথায় সরলভাবে বুঝা যায়। ভাষ্যকারও “কারণভাবঃ ক্রবতে” এই কথার দ্বারা ঐ ভাবই প্রকাশ করিয়াছেন মনে হয়। নচেৎ “ক্রবতে” এইরূপ বাক্য প্রয়োগের কোন প্রয়োজন দেখা যায় না। উদ্যোতকরও “যে চ বর্ণশক্তি” এইরূপ বাক্য দ্বারা ভাষ্যকারের “ক্রবতে” এই কথারই ব্যাখ্যা করিয়াছেন মনে হয়। সুবীক্ষণ তাৎপর্যটীকাকারের ব্যাখ্যায় সমালোচনা করিবেন। এবং এই সূত্রের দ্বারা পার্থক্য স্নাত্ত ব্যক্তির পূর্বপক্ষ প্রকাশিত হইলে, পরবর্তী সূত্রের দ্বারা ইহার বিরূপ উত্তর প্রকাশিত হইয়াছে, ইহা চিন্তা করিবেন। পূর্বপক্ষ-সূত্র বলিলে তাহার উত্তরসূত্র মহর্ষি বলেন নাই, ইহা সম্ভব নহে। বৃত্তিকার বিবনাথ এই সূত্রকে পূর্বপক্ষ-সূত্ররূপেই গ্রহণ করিয়া, পরিবর্তী সূত্রের দ্বারা ইহার উত্তর ব্যাখ্যা করিয়াছেন। পরবর্তী সূত্রে আত্মনঃসংযোগের জ্ঞান-কারণকে যুক্তি হুচিত হইয়াছে।

বৃত্তিকার সেই যুক্তির ব্যাখ্যা করিতে বলিয়াছেন যে, আত্মা জ্ঞানের সমবাদিকারণ। দিক্ প্রভৃতি জ্ঞানের কারণ হয় না। অর্থাৎ জ্ঞান-জ্ঞানরূপে জ্ঞান-জ্ঞানমাত্রে দিক্ প্রভৃতি অন্তর্থা-সিদ্ধ, সুতরাং উহা তাহাতে কারণ নহে। আত্মা জ্ঞানের সমবাদিকারণ হইলে তাহার সহিত মনের সংযোগ যে জ্ঞানজ্ঞানমাত্রের অসমবাদিকারণ, ইহাও অর্থতঃ সিদ্ধ হয়। কলকথা, পরবর্তী সূত্রের আত্মাকে জ্ঞানের কারণরূপে যুক্তির দ্বারা হত্যা করার, দিক্ প্রভৃতি পদার্থে জ্ঞান-কারণের কোন যুক্তি নাই, ইহাও হুচিত হইয়াছে। সুতরাং পরবর্তী সূত্রের দ্বারা এই সূত্রোক্ত পূর্বপক্ষের নিরাস হইয়াছে, ইহাই বৃত্তিকারের তাৎপর্য। অবশ্য যদি মহর্ষি পরবর্তী কএকটি সূত্রের দ্বারা আত্মনঃসংযোগ প্রভৃতির কারণ বিধরে যুক্তি প্রদর্শন করিয়া, দিক্ প্রভৃতি পদার্থের কারণ



বিষয়ে কোন দ্বিধা নাই, ইহাও সূচনা করিয়া থাকেন, মহর্ষির ঐরূপই সূত্র তাৎপর্য থাকে, তাহা হইলে এইটিকে পূর্বপক্ষ-সূত্ররূপেও গ্রহণ করা যাইতে পারে। কিন্তু ইহার পরবর্তী সূত্র পাঠ করিলে তাহা যে এই সূত্রোক্ত পূর্বপক্ষ নিরাসের জন্য কথিত হইয়াছে, ইহা মনে হয় না। প্রকৃত কথা ইহাই মনে হয় যে, বাচস্পতি মিশ্র তাৎপর্যটীকা রচনাকালে পূর্বোক্ত “দিগ্দেশ-কালাকালেশেষোৎপাদঃ” এইটিকে সূত্ররূপে গ্রহণ করেন নাই। তিনি ঐ দ্বলে সমস্ত অংশই ভাষ্যরূপে গ্রহণ করিয়া “সতি চ” ইত্যাদি ভাষ্যকেই পার্থক্য ভাস্ত্র ব্যক্তির পূর্বপক্ষ-ভাষ্যরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। “দিগ্দেশকালাকালেশবু” ইত্যাদি সূত্রের সূত্রক বিধয়ে অন্য বিশেষ প্রমাণও নাই। তবে তারুচটানিবন্ধে বাচস্পতি মিশ্র উহাকেও সূত্রমধ্যে গ্রহণ করিয়াছেন। সুধীগণ বাচস্পতি মিশ্রের অভিপ্রায় চিন্তা করিবেন ॥২৩॥

ভাষ্য। আত্মমনঃসম্বন্ধকর্তৃত্বপসংখ্যেয় ইতি তত্রৈবমুচ্যতে—

অনুবাদ। তাহা হইলে আত্মমনঃসংযোগ উপসংখ্যেয় (বক্তব্য), তন্নিমিত্ত ইহা (পরবর্তী সূত্রটি) বলিতেছেন [ অর্থাৎ আত্মমনঃসংযোগ যদি জ্ঞানের কারণ হয়, তাহা হইলে উহা প্রত্যক্ষেরও কারণ হইবে। সুতরাং প্রত্যক্ষ-লক্ষণে উহারও উল্লেখ করা কর্তব্য, এই পূর্বপক্ষ নিরাসের জন্য মহর্ষি পরবর্তী সূত্রটি বলিয়াছেন ]।

সূত্র। জ্ঞানলিঙ্গত্বাদাত্মনো নানবরোধঃ ॥২৪॥২৮॥

অনুবাদ। জ্ঞানলিঙ্গত্ববশতঃ আত্মার অসংগ্রহ নাই। [ অর্থাৎ জ্ঞান আত্মার লিঙ্গ, ইহা বলা হইয়াছে, তাহাতেই আত্মাও আত্মমনঃসংযোগ জ্ঞানের কারণ, ইহা বুঝা যায়, তাহাতেই জ্ঞানের কারণরূপে আত্মারও সংগ্রহ হওয়ায়, প্রত্যক্ষ-লক্ষণে আত্মমনঃসংযোগের উল্লেখ করা হয় নাই ]।

ভাষ্য। জ্ঞানমাত্মলিঙ্গং তদগুণত্বাৎ, ন চাসংযুক্তে দ্রব্যে সংযোগ-জস্য গুণস্তোৎপত্তিরস্তুতীতি।

\* নব্যপণের অর্থাৎ অনেক এই সূত্র ও ইহার পরবর্তী সূত্রকে স্মারদগত বলিয়া গ্রহণ করেন নাই। কিন্তু প্রাচীনগণ ঐ দুইটিকে সূত্ররূপেই গ্রহণ করিয়াছেন। তারুচটানিবন্ধেও ঐ দুইটি সূত্রমধ্যে গৃহীত হইয়াছে। কোন মহা-টীকাকার এই সূত্রে “আত্মনো নাবরোধঃ” এইরূপ পাঠ গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু “নানবরোধঃ” এইরূপ পাঠই প্রাচীন-মত। প্রাচীন কালে সাংখ্য অর্থে “অবরোধ” শব্দেরও প্রয়োগ হইত। সুতরাং “অনবরোধ” বলিলে অসংগ্রহ বুঝা যায়। নবীন বৃত্তিকার বিঘ্ননাশও ঐরূপ অর্থের বাখা করিয়াছেন। তাৎপর্য-পরিপ্রকৃতিতে উদয়নের কথার দ্বারাও এই সূত্র ও ইহার পরবর্তী সূত্রকে মহর্ষির সূত্র বলিয়া বুঝা যায়। বলা—“নতু নাস্তদমনসোঃ সম্বন্ধকর্তৃত্বেন প্রত্যেকোৎপত্তি-বিত্তি পূর্বপক্ষ-সূত্র তদুপপাদকত্বেন ভাষ্যকৃত্য ব্যাখ্যাতব্যং। সিদ্ধান্তসূত্রে চ “জ্ঞানলিঙ্গত্বাদাত্মনো নানবরোধঃ”, “তদগুণত্বাৎ লিঙ্গত্বাৎ ন মনসঃ” ইতি সূত্রসম্বন্ধকমাগম্যেত পূর্বোক্তং সত্যার্থত্বং ইত্যাদি।—প্রাপ্ত্য-পরিপ্রকৃতি।

অনুবাদ। তাহার ( আত্মার ) গুণবশতঃ জ্ঞান আত্মার লিঙ্গ ( অনুমাপক )  
[ অর্থাৎ জ্ঞান আত্মার গুণ, এ জন্ত ইহা আত্মার সাধক ] অসংযুক্ত দ্রব্যে সংযোগ-  
জন্ত গুণের উৎপত্তি নাই।

টিপ্পনী। প্রত্যক্ষপরীক্ষা-প্রকরণে পূর্বপক্ষ বলা হইয়াছে যে, প্রথমাদ্যায়েক্ত প্রত্যক্ষ-লক্ষণের  
উপপত্তি হয় না। কারণ, আত্মমনঃসংযোগানিও প্রত্যক্ষ কারণ, তাহা প্রত্যক্ষ-লক্ষণে বলা হয়  
নাই; কেবল ইন্দ্রিয়ার্গ-সম্বন্ধরূপ কারণেরই উল্লেখ করা হইয়াছে। এই পূর্বপক্ষ সমর্থন  
করিতে নহবি পরন্তু আত্মমনঃসংযোগ যে প্রত্যক্ষ কারণ, তাহা বলিয়াছেন। এখন ঐ আত্ম-  
মনঃসংযোগ প্রত্যক্ষ-লক্ষণে কেন বলা হয় নাই, ইহা বলিয়া পূর্কোক্ত পূর্বপক্ষের এক প্রকার  
উত্তর বলিতেছেন। নহবি এই সূত্রের দ্বারা বলিয়াছেন যে, আত্মা, জ্ঞানলিঙ্গ অর্থাৎ জ্ঞান আত্মার  
লিঙ্গ বা সাধক। সুতরাং প্রত্যক্ষের কারণের মধ্যে আত্মার সংগ্রহই আছে। আত্মার অনবরণ  
অর্থাৎ অসংগ্রহ নাই। নহবি তাৎপর্য্য এই যে, জ্ঞান আত্মার লিঙ্গ—ইহা প্রথমাদ্যায়ে দশম সূত্রে  
বলা হইয়াছে। তাহাতেই জন্ত জ্ঞানমাত্রে আত্মা সদ্ব্যাপ্ত কারণ, ইহাই বলা হইয়াছে। এবং  
আত্মমনঃসংযোগ যে জন্ত জ্ঞানমাত্রে অসদ্ব্যাপ্ত কারণ, ইহাও ঐ কথা দ্বারা বুঝা যায়। সুতরাং  
আত্মমনঃসংযোগ যে প্রত্যক্ষ জ্ঞানও কারণ, ইহাও ঐ কথা দ্বারা বুঝা যায়। এই জন্তই প্রত্যক্ষ-  
লক্ষণে আর উহাকে বলা হয় নাই; কেবল ইন্দ্রিয়ার্গ-সম্বন্ধকেই বলা হইয়াছে। আত্মা জ্ঞান-  
লিঙ্গ ( জ্ঞানং লিঙ্গং যত ) অর্থাৎ জ্ঞান বধন ভাবকার্য্য, তখন তাহার অবশ্য সদ্ব্যাপ্ত কারণ আছে,  
তাহা ক্ষতি প্রভৃতি কোন অর্ক দ্রব্য হইতে পারে না, এইরূপে অহমানের দ্বারা দেহাদি-ভিন্ন  
আত্মার সিদ্ধি হয়; এ জন্ত জ্ঞানকে আত্মার লিঙ্গ বলা হইয়াছে। জ্ঞান আত্মার লিঙ্গ কেন? ভাব্যকার  
ইহার হেতু বলিয়াছেন—“তৎগুণত্বাৎ”। অর্থাৎ যেহেতু জ্ঞান আত্মার গুণ, অতএব জ্ঞান আত্মার  
লিঙ্গ। আমি স্থবী, আমি ভূমী ইত্যাদি প্রতীতির দ্বারা “আমি জানিতেছি” এইরূপ প্রতীতির দ্বারা  
জ্ঞান যে আত্মার গুণ, ইহা বুঝা যায়। উদ্যোতকর ইহা সমর্থন করিয়াছেন। জ্ঞান আত্মার গুণ  
বলিয়াই উহা আত্মার লিঙ্গ অর্থাৎ সাধক হয়?।

জ্ঞানকে আত্মার লিঙ্গ বলাতেই আত্মাকে জ্ঞানের কারণ বলিয়া বুঝা যায়, কিন্তু তাহাতে আত্ম-  
মনঃসংযোগ জ্ঞানের কারণ, ইহা বুঝা যাইবে কিরূপে? এ জন্ত ভাব্যকার শেষে তাহার পূর্কোক্ত  
বুদ্ধির উল্লেখ করতঃ বলিয়াছেন যে, অসংযুক্ত দ্রব্যে সংযোগ-জন্ত গুণের উৎপত্তি হয় না।  
তাৎপর্য্যটীকাকার এখানে বলিয়াছেন যে, আত্মা সদাতন, সর্বকালেই আত্মা বিদ্যমান আছে, কিন্তু  
সর্বকালে তাহাতে জ্ঞান জন্মে না। সুতরাং ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য যে, আত্মা জ্ঞানের উৎপাদনে  
কোন সংযোগবিশেষকে অপেক্ষা করে; উহাই আত্মমনঃসংযোগ। আত্মা জ্ঞানের কারণ,

১। জ্ঞানং তাৎপ কর্মমনিজাত্যাদ্ব্যবতৎ। কট্টং সমবেক্ত কার্য্যাদ্ব্যবতৎ। ন চ তৎ পৃথিব্যাদিত্য বানস-  
প্রত্যক্ষত্বাৎ। নং পুনঃ পৃথিব্যাদিত্য। ইতঃ প্রত্যক্ষত্ববোধমাত্মকমেব বা, ন চ তৎজ্ঞানং। ত্র্যাব্যতিক্রিতিক-  
ত্রিতঃ তত্রাত্মত্বং ত্র্যব্যতিক্রিতঃ সমব্যতিক্রিতত্বাৎ। গুণজাতীয়া জ্ঞানং তত্রীতে সতি বিকৃতবাসবদ্যাদ-  
বাক্যং।—ভাব্যপরীক্ষা।



ইহা বুঝিলে আত্মমনঃসংযোগও যে জ্ঞানের কারণ, তাহা পূর্বোক্ত যুক্তিতে বুঝা যায়। সুতরাং মহর্ষি প্রত্যক্ষ-লক্ষণে আত্মমনঃসংযোগের উল্লেখ করেন নাই। আত্মমনঃসংযোগ প্রত্যক্ষে কারণ কেন? এ বিষয়ে তাৎপর্যটীকাকারের যুক্তান্তর পূর্বে বলা হইয়াছে।

এই সূত্রের দ্বারা প্রত্যক্ষ-লক্ষণে আত্মমনঃসংযোগ কেন বলা হয় নাই, ইহার কারণ বলা হইয়াছে, ইহাই প্রাচীনদিগের সম্মত বুঝা যায়। পরন্তু এই সূত্রের দ্বারা জ্ঞানমাত্রে আত্মমনঃসংযোগ কারণ কেন? ইহা বলিয়া মহর্ষি পূর্বোক্ত পূর্বপক্ষেরই পুনর্বীর সমর্থন করিয়াছেন এবং পরে মূল পূর্বপক্ষের এক প্রকারই উত্তর বলিয়াছেন, ইহাও বুঝা যাইতে পারে। এবং অম্বর ও ব্যতিরেক উত্তর না থাকিতে যদি দিক্, কাল প্রভৃতি জ্ঞানের কারণ না হইতে পারে, তাহা হইলে আত্মাই বা কিরূপে জ্ঞানের কারণ হইবে? আত্মাও ত দিক্, কাল ও আকাশের দ্বারা সর্বব্যাপী নিত্য পদার্থ, সুতরাং তাহারও ত ব্যতিরেক নাই? এই পূর্বপক্ষেরও এই সূত্রের দ্বারা উত্তর হুচিত হইতে পারে। সে উত্তর এই যে, আত্মা যখন জ্ঞানের লিঙ্গ, তখন উহা জ্ঞানের সমবাসি কারণরূপেই সিদ্ধ। জ্ঞান জ্ঞানমাত্রের প্রতি তাদাত্মা সহকে আত্মা কারণ। সুতরাং বাহ্য আত্মা নহে, তাহা জ্ঞানবান্ নহে, এইরূপেই ব্যতিরেক জ্ঞান হইবে। স্ববীণণ এ সব কথা চিন্তা করিবেন ॥২৪॥

**সূত্র। তদযৌগপদ্যালিঙ্গত্বাচ্চ ন মনসঃ ॥২৫॥৮৩॥**

অনুবাদ। এবং তাহার (জ্ঞানের) অযৌগপদ্যালিঙ্গত্ববশতঃ অর্থাৎ একই সময়ে নানা জ্ঞান বা নানা প্রত্যক্ষের অনুৎপত্তি মনের লিঙ্গ (সাধক), এ জন্ম মনের অসংগ্রহ নাই [ অর্থাৎ “যুগপৎ জ্ঞানের অনুৎপত্তি মনের লিঙ্গ” এই কথা বলাতেই ইন্দ্রিয়-মনঃসংযোগ প্রত্যক্ষে কারণ, ইহা বুঝা যায় ]।

ভাষ্য। “অনবরোধ” ইত্যনুবর্ততে। “যুগপৎ জ্ঞানানুৎপত্তির্মনসৌ লিঙ্গ”মিত্যুচ্যামানে সিধ্যাত্যেব মনঃসম্বিকর্ষাপেক্ষ ইন্দ্রিয়ার্থ-সম্বিকর্ষো জ্ঞান-কারণমিতি।

অনুবাদ। “অনবরোধঃ” এই কথা অনুবৃত্ত হইতেছে [ অর্থাৎ পূর্বসূত্র হইতে “অনবরোধঃ” এই কথার এই সূত্রে অনুবৃত্তি সূত্রকারের অভিপ্রেত আছে ], যুগপৎ জ্ঞানের অনুৎপত্তি অর্থাৎ একই সময়ে নানা প্রত্যক্ষ না হওয়া মনের লিঙ্গ, ইহা বলিলে মনঃসম্বিকর্ষাপেক্ষ ইন্দ্রিয়ার্থ-সম্বিকর্ষ জ্ঞানের (প্রত্যক্ষের) কারণ, ইহা সিদ্ধই হয় অর্থাৎ ইহা বুঝাই যায়।

টীকনী। আত্মমনঃসংযোগের দ্বারা ইন্দ্রিয়মনঃসংযোগও প্রত্যক্ষে কারণ, সুতরাং প্রত্যক্ষ-লক্ষণসূত্রে তাহার উল্লেখ করা কর্তব্য। মহর্ষি কেন তাহা করেন নাই, ইহার এক প্রকার উত্তর মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা বলিয়াছেন। মহর্ষির কথা এই যে, প্রথমশাস্ত্রের ষোড়শ সূত্রে একই

দম্বে নানা জ্ঞান বা নানা প্রত্যক্ষের অল্পপত্তি মনের লিঙ্গ, এই কথা বলা হইয়াছে। তাহাতেই ইন্দ্রিয়মনঃসংযোগ যে প্রত্যক্ষ কারণ, ইহা বুঝা যায়। হুতরাং প্রত্যক্ষ-লক্ষণ-সূত্রে ইন্দ্রিয়মনঃ-সংযোগের উল্লেখ করা হয় নাই। আপত্তি হইতে পারে যে, যে সূত্রের দ্বারা যুগপৎ জ্ঞানের অল্পপত্তি মনের লিঙ্গ বলা হইয়াছে, ঐ সূত্রের দ্বারা মনঃপদার্থের স্বরূপ প্রতিপাদনই উদ্দেশ্য। কারণ, প্রমের পদার্থের অন্তর্গত মনঃপদার্থের লক্ষণ বলিতেই ঐ সূত্রটি বলা হইয়াছে। উহার দ্বারা মনঃ জ্ঞানের কারণ এবং ইন্দ্রিয়মনঃসংযোগ প্রত্যক্ষ কারণ, ইহা বলা উদ্দেশ্য নহে। উদ্যোতকর এই আপত্তির উল্লেখ করিয়া এতদ্বতের বলিয়াছেন যে, যদিও সাঙ্গাৎসম্বন্ধে সেই সূত্রে মনকে জ্ঞানের কারণ বলা হয় নাই, তথাপি সেই সূত্রে যে যুক্তির উল্লেখ করা হইয়াছে, তদ্বারা মন জ্ঞানের কারণ, ইহা বুঝা যায়। জ্ঞান ও চক্ষুরাদি স্বতন্ত্র নহে। জ্ঞান নিজের কারণ মনকে অপেক্ষা করে এবং চক্ষুরাদিও জ্ঞানের উৎপত্তিতে জ্ঞানের কারণ মনকে অপেক্ষা করে। তাহা না হইলে একই সময়ে নানা প্রত্যক্ষের উৎপত্তি হইত। ভাষ্যকারও বলিয়াছেন যে, “যুগপৎ জ্ঞানের অল্পপত্তি মনের লিঙ্গ” ইহা বলিলে ইন্দ্রিয়ার্ণ-সম্বন্ধকে যে মনঃসম্বন্ধকে অপেক্ষা করিয়াই প্রত্যক্ষের কারণ হয়, ইহাই বুঝা যায়। অর্থাৎ ঐ সূত্রোক্ত যুক্তি-সামর্থ্যবশতাই উহা সিদ্ধ হয়। এখন মূল কথা এই যে, ইন্দ্রিয়মনঃসংযোগ যে প্রত্যক্ষ কারণ, ইহা পূর্বোক্তরূপে সিদ্ধ হওয়ার প্রত্যক্ষ-লক্ষণ-সূত্রে মহর্ষি তাহার উল্লেখ করেন নাই। আত্মমনঃসংযোগ ও ইন্দ্রিয়মনঃসংযোগ জ্ঞানের কারণ, ইহা পূর্বোক্তরূপে অর্থাগোপ্য হওয়ার সূত্রকার প্রত্যক্ষ-লক্ষণ-সূত্রে ঐ দুইটিরও উল্লেখ করেন নাই। তাৎপর্যাটীকাকারও উপসংহারে এই কথা বলিয়া দুই সূত্রের মূল তাৎপর্য বর্ণন করিয়াছেন। উদ্যোতকরের কথাত্তেও এই ভাব ব্যক্ত আছে। যুক্তিকার বিশ্বনাথ বলিয়াছেন যে, আত্মার সহিত শরীরাদির সংযোগই কেন জ্ঞানের অসমবাগি কারণ হয় না, এ জন্ত মনের প্রাধান্য প্রদর্শন করিতেই মহর্ষি এই সূত্রটি বলিয়াছেন। বস্তুতঃ মহর্ষির এই সূত্রকেও তাহার পূর্বোক্ত পূর্বপক্ষ-সমর্থক বলিয়া বুঝা যাইতে পারে। প্রত্যক্ষ-লক্ষণ-সূত্রে ইন্দ্রিয়মনঃসংযোগের কেন উল্লেখ হয় নাই, তাহাও ত প্রত্যক্ষের কারণ, এই কথা সমর্থন করিতে হইলে ইন্দ্রিয়মনঃসংযোগ প্রত্যক্ষ কারণ কেন, ইহা বলা আবশ্যক হয়। মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা তাহাও বলিতে পারেন। প্রথম সূত্রোক্ত মূল পূর্বপক্ষের প্রকৃত উত্তর মহর্ষি শেষেই বলিয়াছেন। পরে তাহা ব্যক্ত হইবে।

এই সূত্রে “তৎ” শব্দের দ্বারা পূর্বসূত্রোক্ত জ্ঞানই বুঝিবে। পূর্বসূত্রে যে “মনবায়োঃ” এই কথাটি আছে, এই সূত্রে “মনসঃ” এই কথার পরে উহার অল্পপত্তি করিয়া ব্যাখ্যা করিতে হইবে। এই সূত্রে “ন মনসঃ” এই স্থলে “মনসঃ” এইরূপ পাঠও তাৎপর্যাগরিভুক্তি প্রভৃতি কোন কোন গ্রন্থে পাওয়া যায়। এই পাঠ পক্ষে পূর্বসূত্র হইতে “নানবায়োঃ” এই পর্য্যন্ত বাক্যই অল্পপত্তি হইবে। কিন্তু এই পাঠ ভাষ্যকারের সম্মত বলিয়া বুঝা যায় না ॥ ২৫ ॥

**সূত্র ।** প্রত্যক্ষনিমিত্তত্বাচ্ছেন্দ্রিয়ার্থয়োঃ সন্নিবর্তন  
স্বশব্দেন বচনং ॥২৬॥৮৭॥



অনুবাদ। এবং প্রত্যক্ষেরই কারণবশতঃ ইন্দ্রিয়ও অর্থের সন্নিবর্তনের স্বশক্তির দ্বারা উল্লেখ হইয়াছে। [ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিবর্তন প্রত্যক্ষের অসাধারণ কারণ বলিয়া প্রত্যক্ষ-লক্ষণ-সূত্রে “ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিবর্তন” এই শব্দের দ্বারা তাহারই উল্লেখ করা হইয়াছে ]।

ভাষ্য। প্রত্যক্ষানুমানোপমানশাস্ত্রানাং নিমিত্তমাত্মনঃসন্নিবর্তনং, প্রত্যক্ষস্বৈবেন্দ্রিয়ার্থসন্নিবর্তনং ইত্যনুমানোপমানশাস্ত্রাণ্যত্র গ্রহণং।

অনুবাদ। আত্মনঃসন্নিবর্তন প্রত্যক্ষ, অনুমিতি, উপমিতি এবং শাস্ত্র বোধের অর্থাৎ জ্ঞানজানমাত্রের কারণ, ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিবর্তন কেবল প্রত্যক্ষের কারণ, এ জ্ঞান অসমান অর্থাৎ উহা প্রত্যক্ষের অসাধারণ কারণ, অসমানবশতঃ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিবর্তন প্রত্যক্ষের অসাধারণ কারণ বলিয়া ( প্রত্যক্ষ-লক্ষণ-সূত্রে ) তাহার গ্রহণ হইয়াছে।

টিপ্পনী। এই সূত্রের দ্বারা মহর্ষি পূর্বোক্ত পূর্বপক্ষের প্রকৃত উত্তর বলিয়াছেন। এইটি নিষ্কণ্টক-সূত্র। পূর্বে বাহ্য বলা হইয়াছে, তাহাতে আপত্তি হইতে পারে যে, আত্মনঃসংযোগ ও ইন্দ্রিয়নঃসংযোগ বেন পূর্বোক্তরূপে যুক্তির দ্বারা প্রত্যক্ষের কারণ বলিয়া বুঝা যায়, তজ্জন ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিবর্তনও প্রত্যক্ষের কারণ, ইহাও যুক্তির দ্বারা বুঝা যায়। তবে আর প্রত্যক্ষ-লক্ষণ-সূত্রে ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিবর্তনেরই বা উল্লেখ করা কেন হইয়াছে? যদি প্রত্যক্ষের কোন একটি কারণের উল্লেখ করিয়াই প্রত্যক্ষের লক্ষণ বক্তব্য হয়, তাহা হইলে আত্মনঃসংযোগ অথবা ইন্দ্রিয়নঃসংযোগকেই প্রত্যক্ষ-লক্ষণ-সূত্রে কেন বলা হয় নাই? শব্দের দ্বারা ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিবর্তনেরই কেন উল্লেখ করা হইয়াছে? মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা এই আপত্তির নিরাস করিয়া পূর্বোক্ত পূর্বপক্ষের পরম সমাধান বলিয়াছেন। উক্তোক্তকর প্রতীতি এই ভাবেই এই সূত্রের উৎপত্তি করিয়াছেন। আত্মপরিচয়কার এই সূত্রের আত্মপরিচয় বর্ণন করিয়াছেন যে, প্রত্যক্ষ-লক্ষণে প্রত্যক্ষের কোন কারণেরই উল্লেখ না করিলে প্রত্যক্ষের লক্ষণই বলা হয় না। তন্মধ্যে যদি আত্মনঃসংযোগরূপ কারণেরই উল্লেখ করা যায়, তাহা হইলে অসম্ভবতঃ জ্ঞানও প্রত্যক্ষ-লক্ষণাক্রান্ত হইয়া পড়ে। কারণ, সে সমস্ত জ্ঞানও আত্মনঃসংযোগ জ্ঞান। আত্মনঃসংযোগ জ্ঞানজানমাত্রেরই কারণ। এবং ইন্দ্রিয়নঃসংযোগরূপ প্রত্যক্ষকারণের উল্লেখ করিয়া প্রত্যক্ষের লক্ষণ বলিলে মানস প্রত্যক্ষ এই লক্ষণাক্রান্ত হয় না। কারণ, মানস প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়নঃসংযোগ কারণ নহে। সুতরাং আত্মনঃসংযোগ অথবা ইন্দ্রিয়নঃসংযোগরূপ কারণের উল্লেখ না করিয়া ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিবর্তনরূপ কারণের উল্লেখ করিয়াই প্রত্যক্ষের লক্ষণ বলা হইয়াছে। ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিবর্তন জ্ঞানপ্রত্যক্ষমাত্রের অসাধারণ কারণ। আত্মনঃসংযোগ জ্ঞানজানমাত্রের সাধারণ কারণ। ভাষ্যকার প্রত্যক্ষ, অনুমিতি, উপমিতি ও শাস্ত্র বলিয়া জ্ঞান অসম্ভবতঃ জ্ঞানের উল্লেখ করিলেও উহার দ্বারা জ্ঞান জানমাত্রই

বুঝিতে হইবে। ইঞ্জিয়ার্গসম্বন্ধকে কেবল প্রত্যক্ষেরই কারণ বলিয়া ভাব্যকার তাহাকে অসমান বলিয়াছেন। অসমান বলিতে অসাধারণ। অসাধারণ কারণ বলিয়াই প্রত্যক্ষ-লক্ষণে ইঞ্জিয়ার্গ-সম্বন্ধেরই গ্রহণ হইয়াছে। “ইঞ্জিয়ার্গ-সম্বন্ধ” এই শব্দের দ্বারা ই প্রত্যক্ষ-লক্ষণে তাহার উল্লেখ করা হইয়াছে, উহা প্রকারান্তরে যুক্তির দ্বারা প্রকাশ করা হয় নাই। ইহাই মহর্ষি “বিশ্বদেব বচনঃ” এই কথা দ্বারা বলিয়াছেন। অবাধক শব্দই “স্বশব্দ”। হুত্রে “প্রত্যক্ষনিবিশ্বদেবঃ” এই কথা দ্বারা ইঞ্জিয়ার্গসম্বন্ধ প্রত্যক্ষের অসাধারণ কারণ, উহা অসমানানি জ্ঞানের কারণ নহে, ইহাই প্রকাশ করা হইয়াছে। এবং সেই হেতুতেই প্রত্যক্ষ-লক্ষণ-হুত্রে “ইঞ্জিয়ার্গ-সম্বন্ধ” শব্দের দ্বারা তাহার উল্লেখ করা হইয়াছে, ইহাই মহর্ষি বলিয়াছেন। ইঞ্জিয়মনঃসংযোগও প্রত্যক্ষের অসাধারণ কারণ; তাহার উল্লেখ কেন করা হয় নাই, ইহার উত্তরে তাৎপর্যটীকাকার দ্বারা বলিয়াছেন, তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। ভাব্যকার প্রত্যক্ষ-লক্ষণ-হুত্রে-ভাবে উহার অন্তরূপ উক্তর বলিয়াছেন এবং পরে ইঞ্জিয়মনঃসংযোগের অপেক্ষায় ইঞ্জিয়ার্গ-সম্বন্ধের প্রাধান্য সমর্থন পূর্বক ইঞ্জিয়ার্গ-সম্বন্ধই যে প্রত্যক্ষ-লক্ষণে বক্তব্য, ইহা সমর্থন করিয়াছেন।

মহর্ষি পূর্বোক্ত হুত্ববস্তুর দ্বারা পূর্বোক্ত পূর্বপক্ষের সমাধানই বলিয়াছেন। কিন্তু তাহা পরব সমাধান নহে, এই হুত্বোক্ত সমাধানই পরম সমাধান, ইহা তাৎপর্যটীকাকার বলিয়াছেন। এই মতভ্রমারেই পূর্বোক্ত হুত্ববস্তুর তাৎপর্য ব্যাখ্যাত হইয়াছে। উদ্যোতকরণও ঐরূপ তাৎপর্য বুঝা যায়। কিন্তু পূর্বোক্ত হুত্ববস্তুর মহর্ষির পূর্বপক্ষ-সমর্থকরূপেও বুঝা গাইতে পারে। সেই ভাবে ভাব্যেরও সংগতি হইতে পারে, ইহা চিন্তনীয়। আয়মনঃসংযোগ ও ইঞ্জিয়মনঃসংযোগ প্রত্যক্ষ কারণ, ইহা বাক্যক্রমে হুই হুত্বের দ্বারা সমর্থন করিয়া, ঐ উক্তকে প্রত্যক্ষ-লক্ষণে উল্লেখ করা কর্তব্য, ইহাই মহর্ষি সমর্থন করিয়া, শেষে এই হুত্বের দ্বারা পূর্বোক্ত পূর্বপক্ষের সমাধান বলিয়াছেন, ইহাও বুঝা গাইতে পারে এবং সরলভাবে তাহাই বুঝা যায়। পরন্তু আয়মনঃসংযোগ-জ্ঞাত জ্ঞানকে প্রত্যক্ষ বলিলে, অসমানানি জ্ঞানও প্রত্যক্ষ-লক্ষণাক্রান্ত হইয়া পড়ে এবং ইঞ্জিয়মনঃসংযোগ-জ্ঞাত জ্ঞানকে প্রত্যক্ষ বলিলে মানস প্রত্যক্ষ প্রত্যক্ষ-লক্ষণাক্রান্ত হয় না, এ কথা বধন তাৎপর্যটীকাকারও বলিয়াছেন, তখন ঐ কারণদ্বয় অন্তঃহুত্বের সাধ্যায়ে যুক্তির দ্বারা বুঝা যায় বলিয়া উহাদিগের উল্লেখ করা হয় নাই, এইরূপ পূর্বোক্ত সমাধান কিন্তু সংগত হয়, ইহা অস্বীকার চিন্তা করিবেন। বৃত্তিকার বিধনাথ পূর্বোক্ত হুই হুত্বকে সমাধান-হুত্ব বলেন নাই। উদ্যোতকরণ, বাচস্পতি মিশ্র ও উদয়নাথ্য এই হুত্বকে সমাধান-হুত্বরূপে প্রকাশ করার এবং এই হুত্বোক্ত সমাধান মহর্ষির অপর বক্তব্য বলিয়া ইহা মহর্ষির হুত্ব বলিয়াই গ্রাহ্য। কেহ কেহ যে ইহাকে হুত্ব না বলিয়া ভাষ্যই বলিয়াছেন, তাহা গ্রাহ্য নহে। কেহ কেহ এই হুত্রে “শুশ্রূষ্যচনঃ” এইরূপ পাঠ গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু “বিশ্বদেব বচনঃ” এইরূপ পাঠই উদ্যোতকরণ প্রভৃতির সম্মত ১২৬।

সূত্র। সুপ্তব্যাসক্তমনসাঃ ইঞ্জিয়ার্গয়োঃ সম্বন্ধ-  
নিমিত্তত্বাৎ ॥২৭॥৮-৮॥



অনুবাদ। এবং বেহেতু সুপ্তমনা ও ব্যাসক্তমনা ব্যক্তিদিগের (জ্ঞানোৎপত্তির) ইন্দ্রিয় ও অর্থের সন্নিবর্তন নিমিত্তকর আছে, [ অর্থাৎ সুপ্তমনা ও ব্যাসক্তমনা ব্যক্তিদিগের যে, সময়বিশেষে জ্ঞানবিশেষ জন্মে, তাহাতে ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিবর্তনই প্রধান কারণ, ইহা বুঝা যায়, স্বতরাং প্রধান কারণ বলিয়া প্রত্যক্ষ-লক্ষণে ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিবর্তনেরই গ্রহণ হইয়াছে—আত্মমনঃসংযোগের গ্রহণ হয় নাই। ]

ভাষ্য । ইন্দ্রিয়ার্থসমিকর্ষস্তত্র গ্রহণং নান্নমনসোঃ সমিকর্ষশ্চেতি ।  
 একদা স্বল্পরং প্রবোধকালং প্রণিধায় স্বপ্নঃ প্রণিধানবশাৎ প্রবৃত্ত্যতে ।  
 যদা তু তীত্রৌ ধ্বনিম্পার্শো প্রবোধকারণং ভবতঃ, তদা প্রস্তুপ্তশ্চেন্দ্রিয়-  
 সমিকর্ষনিমিত্তং প্রবোধজ্ঞানমুৎপদ্যতে, তত্র ন জ্ঞাতুর্গনসম্ভ সনিকর্ষস্ত  
 প্রাধাত্যং ভবতি । কিং তর্হি ? ইন্দ্রিয়ার্থয়োঃ সমিকর্ষস্ত । ন হ্যাত্মা  
 জিজ্ঞাসমানঃ প্রযত্নেন মনস্তদা প্রেরয়তীতি ।

একদা খল্লং বিদ্যাসুত্ৰাসক্তমনাঃ সংকল্পবশা বিদ্যাসুত্ৰং জিজ্ঞাসমানঃ  
 প্রবক্তৃপ্রেরিতেন মনসা ইন্দ্রিয়ং সংযোজ্য তদবিদ্যাসুত্ৰং জানীতে ।  
 যদা তু খল্লং নিঃসংকল্পস্য নির্জিজ্ঞাসস্য চ ব্যাসক্তমনসো বাহুবিষয়োপ-  
 নিপাতনাজ্জ্ঞানমুৎপদ্যতে, তদেন্দ্রিয়ার্থসম্বন্ধস্য প্রাধান্যং, ন হস্তাসৌ  
 জিজ্ঞাসমানঃ প্রবক্তেন মনঃ প্রেরয়তীতি । প্রাধান্যাচ্ছেন্দ্রিয়ার্থ-সম্বন্ধস্য  
 গ্রহণং কার্যং, গুণস্বাম্যাস্তমনসোঃ সম্বন্ধশ্চেতি ।

অসুবাদ। ইন্দ্রিয়ার্থ-সম্বন্ধের গ্রহণ হইয়াছে, আত্মমনঃসংযোগের গ্রহণ হয় নাই (অর্থাৎ এই সূত্রোক্ত হেতুবশতঃ প্রত্যক্ষ-লক্ষণ-সূত্রে ইন্দ্রিয়ার্থসম্বন্ধকে গ্রহণ করা হইয়াছে, আত্মমনঃসংযোগকে গ্রহণ করা হয় নাই)।

[ এখন এই সুত্রোক্ত সুপ্তমনা ব্যক্তির জ্ঞানবিশেষে ইন্দ্রিয়ার্থনির্ভর প্রধান  
 কেন, তাহা বুঝাইতেছেন । ]

একদা এই জ্ঞাতা অর্থাৎ কোন সময়ে কোন ব্যক্তি জাগরণের সময়ে সংকল্প করিয়া (অর্থাৎ আমি প্রদোবে নিদ্রিত হইয়া অর্জুনাগ্রে উঠিব, এইরূপ সংকল্পপূর্বক) স্তম্ভ হইয়া প্রাণিবানবশতঃ অর্থাৎ পূর্বসংকল্পবশতঃ জাগরিত হয়। কিন্তু যে সময়ে তীব্র ধ্বনি ও স্পর্শ জাগরণের কারণ হয়, সেই সময়ে প্রস্তুত

১। অধিব্যয় সংযুক্তা প্রদেয়ে অংকুহর্ষরাজের অধ্যাপকসমিতি দেওহর্ষরাজ এগাদবুখতে। প্রণোদনাসমিতি  
প্রণোদনে নিরাশ্রিতদের নীতি ব্রাহ্মসংলগ্ন সাক্ষার প্রণোদন সমিতির। —(তৎপরিচয়)।

ব্যক্তির ইন্দ্রিয়সম্বন্ধ-নিমিত্তক প্রবোধ জ্ঞান অর্থাৎ নিভাবিচ্ছেদ হইলে সহসা ভ্রম-স্পর্শাদির জ্ঞান উৎপন্ন হয়। সেই স্থলে জ্ঞাতা ও মনের সম্বন্ধের অর্থাৎ আত্মমনঃ-সংযোগের প্রাধান্য হয় না। (প্রশ্ন) তবে কি? (উত্তর) ইন্দ্রিয় ও অর্থের সম্বন্ধের (প্রাধান্য হয়)। যেহেতু সেই সময়ে আত্মা জানিতে ইচ্ছা করতঃ প্রবোধের দ্বারা মনকে প্রেরণ করে না।

[সূত্রোক্ত ব্যাসক্তমনা ব্যক্তির জ্ঞানবিশেষে ইন্দ্রিয়ার্থসম্বন্ধের প্রাধান্য ব্যাখ্যা করিতেছেন]

একদা এই জ্ঞাতা অর্থাৎ কোন সময়ে কোন ব্যক্তি বিষয়াস্তরে আসক্তচিত্ত হইয়া সংকল্পবশতঃ অণু বিষয়কে জানিতে ইচ্ছা করতঃ প্রবোধের দ্বারা প্রেরিত মনের সহিত ইন্দ্রিয়কে (চক্ষুরাদিকে) সংযুক্ত করিয়া সেই বিষয়াস্তরকে জানে। কিন্তু যে সময়ে সংকল্পশূণ্য, জিজ্ঞাসাশূণ্য এবং (বিষয়াস্তরে) ব্যাসক্তচিত্ত এই ব্যক্তির বাহ্য বিষয়ের উপনিপাতবশতঃ অর্থাৎ কোন বাহ্য বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ উপস্থিত হওয়ায় জ্ঞান (প্রত্যক্ষ) উৎপন্ন হয়, সেই সময়ে ইন্দ্রিয়ার্থ-সম্বন্ধের প্রাধান্য হয়। যেহেতু এই স্থলে (পূর্বোক্ত প্রত্যক্ষবিশেষ স্থলে) এই ব্যক্তি জানিতে ইচ্ছা করতঃ প্রবোধের দ্বারা মনকে প্রেরণ করে না।

প্রাধান্যবশতঃ অর্থাৎ প্রত্যক্ষে ইন্দ্রিয়ার্থ-সম্বন্ধ প্রদান কারণ বলিয়া (প্রত্যক্ষ-লক্ষণে) ইন্দ্রিয়ার্থ-সম্বন্ধের গ্রহণ কর্তব্য, শুণ্ডক অর্থাৎ অপ্ৰাধান্যবশতঃ আত্মা ও মনের সংযোগের গ্রহণ কর্তব্য নহে।

টিপ্পনী। প্রত্যক্ষের কারণের মধ্যে আত্মমনঃসংযোগের অপেক্ষার ইন্দ্রিয়ার্থ-সম্বন্ধই প্রধান, ইহা বুঝাইতে মন্বি এই স্থত্রটি বলিয়াছেন। স্থত্রে “জানোৎপত্তেঃ” এই বাক্যের অধ্যাহার মন্বির অভিপ্রেত। তাই তাৎপর্যটীকাকার লিখিয়াছেন,—“জানোৎপত্তিরিতি স্বতশ্চেৎ”। অর্থাৎ যেহেতু সুপ্তমনা ও ব্যাসক্তমনা ব্যক্তিদিগের জ্ঞানবিশেষ বা প্রত্যক্ষবিশেষের উৎপত্তি ইন্দ্রিয়ার্থ-সম্বন্ধ-নিমিত্তক, অতএব বুঝা যায়, ইন্দ্রিয়ার্থ-সম্বন্ধই প্রধান। অতএব প্রত্যক্ষ-লক্ষণে ইন্দ্রিয়ার্থ-সম্বন্ধই গ্রহণ হইয়াছে, আত্মমনঃসংযোগের গ্রহণ হয় নাই। ভাষ্যকার মন্বি-স্থত্রোক্ত হেতুর এই চরম সাধ্যটি ভাষ্যরূপে উল্লেখ করিয়া স্থত্রে মূল প্রতিপাদ্য বর্ণন করিয়াছেন। পরে যথাক্রমে স্থত্রোক্ত সুপ্তমনা ও ব্যাসক্তমনা ব্যক্তিদিগের প্রত্যক্ষবিশেষের উৎপত্তি যে ইন্দ্রিয়ার্থ-সম্বন্ধ-নিমিত্তক, তাহাতে ইন্দ্রিয়ার্থ-সম্বন্ধই প্রধান, ইহা ব্যাখ্যা করিয়া স্থত্রার্থ বুঝাইয়াছেন। উদ্যোতকর প্রতীতি প্রাচীনগণ সকলেই এই স্থত্রকেও তাবৎস্থত্ররূপে উল্লেখ করিয়াছেন।



ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, কোন সময়ে যদি কোন ব্যক্তি "আমি প্রদোষে নিদ্রিত হইয়া অর্দ্ধরাত্রে উঠিয়া" এইরূপ সংকল্প করিয়া নিদ্রিত হয়, তাহা হইলে ঐ ব্যক্তি পূর্বসংকল্পবশতঃ অর্দ্ধরাত্রে উঠিয়া পড়ে। কিন্তু যদি কোন সময়ে তীব্র কোন ধনি অথবা তীব্র কোন স্পর্শের সহিত তাহার ইন্দ্রিয়-সঙ্গিকর্ষ হয়, তাহা হইলে তৎকাল তাহার নিদ্রাতত্ত্ব হইয়া ঐ স্পর্শাদির প্রত্যক্ষ হয়, তখন কিন্তু সেই ব্যক্তি ঐ স্পর্শাদিকে জানিতে ইচ্ছা করতঃ প্রবৃত্তির দ্বারা আত্মাকে মনের সহিত সংযুক্ত করে না; সহসা ইন্দ্রিয়ের সহিত সেই তীব্র ধনি বা স্পর্শের সঙ্গিকর্ষ হওয়াতেই তাহার নিদ্রাতত্ত্ব হইয়া, ঐ ধনি বা স্পর্শের জ্ঞান জন্মে; সুতরাং বুঝা যায়, তাহার ঐ প্রত্যক্ষ-বিশেষের উৎপত্তিতে ইন্দ্রিয়ের সহিত বিদ্যের সঙ্গিকর্ষই প্রধান কারণ; আত্মমনঃসংযোগ সেখানে প্রধান কারণ নহে।

এবং বিদ্যাস্তরাসক্তচিত্ত কোন ব্যক্তি সেখানে সংকল্পবশতঃ বিদ্যাস্তরকে জানে, সেখানে বিদ্যাস্তরকে জানিতে ইচ্ছা করতঃ প্রবৃত্তির দ্বারা চক্ষুরাদি কোন ইন্দ্রিয়কে মনের সহিত সংযুক্ত করিয়াই সেই বিদ্যাস্তরকে জানে। কিন্তু সেখানে ঐ ব্যক্তির বিদ্যাস্তর জানিবার জন্ত পূর্বসংকল্প নাই, তখন কোন ইচ্ছাও নাই এবং বিদ্যাস্তরেই তাহার মন আসক্ত আছে, সেখানে সহসা কোন বাহ্য বিদ্যের সহিত তাহার কোন ইন্দ্রিয়ের সঙ্গিকর্ষ হইলে, ঐ বাহ্য বিদ্যের প্রত্যক্ষ জন্মিয়াই যায়। সেখানে ঐ ব্যক্তি ঐ বিদ্য জ্ঞানিবার ইচ্ছাবশতঃ প্রবৃত্তি করিয়া আত্মার সহিত মনকে সংযুক্ত করে না। সহসা ইন্দ্রিয়ের সহিত ঐ বাহ্য বিদ্যটির সঙ্গিকর্ষ হওয়াতেই তাহার প্রত্যক্ষ হইয়া যায়। সুতরাং বুঝা যায়, তাহার ঐ প্রত্যক্ষবিশেষের উৎপত্তিতে ইন্দ্রিয়ের সহিত বিদ্যের সঙ্গিকর্ষই প্রধান কারণ; আত্মমনঃসংযোগ সে সময়ে কারণরূপে থাকিলেও তাহা প্রধান কারণ নহে ॥ ২৭ ॥

ভাষ্য। প্রাধান্তে চ হেতুস্তরম্

অনুবাদ। ( ইন্দ্রিয়ার্থ-সঙ্গিকর্ষের ) প্রাধান্তে আর একটি হেতু—

সূত্র। তৈশ্চাপদেশো জ্ঞানবিশেষাণাং ॥২৮॥৮৯॥

অনুবাদ। এবং সেই ইন্দ্রিয়সমূহের দ্বারা ও অর্থ ( গন্ধাদি ) সমূহের দ্বারা জ্ঞানবিশেষগুলির ( বিভিন্ন প্রকার প্রত্যক্ষগুলির ) অপদেশ অর্থাৎ ব্যপদেশ বা নামকরণ হয়।

ভাষ্য। তৈরিন্দ্রিয়ৈরর্থৈশ্চ ব্যপদিশ্যন্তে জ্ঞানবিশেষাঃ। কথম্ ? ভ্রাণেন জিহ্বাতি, চক্ষুশা পশ্যতি, রসনয়া রসয়তীতি। ভ্রাণবিজ্ঞানং, চক্ষুর্বিজ্ঞানং, রসনাবিজ্ঞানমিতি। গন্ধবিজ্ঞানং, রূপবিজ্ঞানং, রস-বিজ্ঞানমিতি চ।

ইন্দ্রিয়বিষয়বিশেষাচ্চ পঞ্চদা বুদ্ধির্ভবতি, অতঃ প্রাধান্যমিন্দ্রিয়ার্থ-  
সম্বন্ধস্তেতি ।

অনুবাদ । সেই ইন্দ্রিয়গুলির দ্বারা এবং অর্থগুলির দ্বারা অর্থাৎ গ্রাণ প্রভৃতি  
বহিরিন্দ্রিয় এবং গন্ধ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ার্থগুলির দ্বারা জ্ঞানবিশেষগুলি (প্রত্যক্ষ-  
বিশেষগুলি) ব্যপদিস্ত অর্থাৎ বিশেষ বিশেষ নাম প্রাপ্ত হয় । (প্রশ্ন) কি  
প্রকারে ? (উত্তর) গ্রাণেন্দ্রিয়ের দ্বারা গ্রাণ করিতেছে, চক্ষুর দ্বারা দর্শন  
করিতেছে, রসনার দ্বারা আস্বাদ গ্রহণ করিতেছে । গ্রাণজ্ঞান (গ্রাণজ্ঞ জ্ঞান),  
চক্ষুজ্ঞান (চাক্ষুজ্ঞ জ্ঞান), রসনাজ্ঞান (রাসনজ্ঞান) এবং গন্ধজ্ঞান, রূপজ্ঞান,  
রসজ্ঞান [ অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন প্রত্যক্ষগুলির যে পূর্বোক্তরূপ ভিন্ন ভিন্ন নামকরণ  
হইতেছে, তাহা গ্রাণাদি ইন্দ্রিয় ও গন্ধাদি ইন্দ্রিয়ার্থকে গ্রহণ করিয়াই হইতেছে,  
সুতরাং প্রত্যক্ষের কারণের মধ্যে ইন্দ্রিয়ার্থ-সম্বন্ধই যে প্রধান, ইহা স্বীকার্য্য ] ।

এবং ইন্দ্রিয় ও বিষয়ের বিশেষবশতঃ অর্থাৎ বহিরিন্দ্রিয় পাঁচটি ও তাহার  
গন্ধাদি পাঁচটি বিষয়ের পঞ্চদ সংখ্যারূপ বিশেষ থাকতেই পাঁচ প্রকার বুদ্ধি-  
(প্রত্যক্ষ) হয় । অতএব ইন্দ্রিয়ার্থ-সম্বন্ধের প্রাধান্য ।

টিপ্পনী । প্রত্যক্ষের কারণের মধ্যে ইন্দ্রিয়ার্থ-সম্বন্ধই যে প্রধান, এ বিষয়ে মহর্ষি এই হৃয়ের  
দ্বারা আর একটি হেতু বলিয়াছেন । সে হেতুটি এই যে, ইন্দ্রিয় ও গন্ধাদি ইন্দ্রিয়ার্থের দ্বারা  
ভিন্ন ভিন্ন প্রত্যক্ষগুলির বিশেষ বিশেষ নামকরণ হইয়া থাকে । ভাষ্যকার ইহা বুঝাইতে বলিয়াছেন  
যে, গ্রাণজ্ঞ প্রত্যক্ষ হলে “গ্রাণেন্দ্রিয়ের দ্বারা গ্রাণ করিতেছে” এইরূপ কথাই বলা হয়, আবার  
সমাস করিয়া “গ্রাণবিজ্ঞান” এইরূপ নাম বলা হয় । এইরূপ চাক্ষুবাদি প্রত্যক্ষ হলে “চক্ষুর দ্বারা  
দেখিতেছে” এবং “চক্ষুর্বিজ্ঞান” ইত্যাদি প্রকার কথাই বলা হয় । সুতরাং দেখা যাইতেছে যে,  
গ্রাণজ্ঞ প্রভৃতি জ্ঞানবিশেষের গ্রাণাদি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ব্যপদেশ বা নামকরণ হয় । এবং “গন্ধ-  
জ্ঞান,” “রূপজ্ঞান,” “রসজ্ঞান” ইত্যাদি নামগুলি ইন্দ্রিয়ার্থ-গন্ধাদির দ্বারাই দেখা যায় । ইহাতে  
বুঝা যায় যে, প্রত্যক্ষের কারণের মধ্যে ইন্দ্রিয়ার্থ-সম্বন্ধই প্রধান । কারণ, প্রধান ও অপ্রধানের  
মধ্যে প্রধানের দ্বারা ব্যপদেশ (নামকরণ) হইয়া থাকে । অসাধারণ কারণই প্রধান কারণ, এ জ্ঞাত  
অসাধারণ কারণের দ্বারা ব্যপদেশ দেখা যায় । উদ্যোতকর এই কথা বলিয়া, ইহার দৃষ্টান্ত  
বলিয়াছেন—“শাল্যচূর” । ঐ অঙ্কুরের প্রতি ক্ষিতি, জল প্রভৃতি বহু কারণ থাকিলেও শালি-বীজই  
অসাধারণ কারণ, এই জ্ঞাত “ক্ষিত্যচূর,” “জলচূর” প্রভৃতি কোন নাম না বলিয়া “শাল্যচূর”  
এই নামই বলা হয় । ফল কথা, ইন্দ্রিয় ও অর্থের দ্বারা যখন প্রত্যক্ষবিশেষগুলির ব্যপদেশ দেখা  
যায়, তখন ইন্দ্রিয় ও অর্থ প্রধান, সুতরাং ইন্দ্রিয়ের সহিত অর্থের সম্বন্ধই আয়মনসম্বন্ধ



প্রকৃতি কারণ হইতে প্রধান, ইহা বুঝা যাইতেছে। আত্মা বা মনের দ্বারা চাক্ষু্যাদি কোন বস্তু প্রত্যক্ষের কোন ব্যপদেশ দেখা যায় না, সুতরাং পূর্বোক্ত যুক্তিতে আত্মমনঃসম্বন্ধের প্রাধান্য বুঝা যায় না।

ভাব্যাকার শেষে আরও একটি যুক্তি বলিয়াছেন যে, বহিঃস্মিত্তির দ্বারা পাঁচ প্রকার প্রত্যক্ষ জন্মে; ইহার কারণ, ঐ দ্রাবাদি বহিঃস্মিত্তির পঞ্চত্ব-সংখ্যা ও তাহাদিগের দ্বন্দ্ব প্রকৃতি বিবরের পঞ্চত্ব-সংখ্যা। ইন্দ্রিয় ও বিবরের ঐ পঞ্চত্ব-সংখ্যাত্মক বিশেষবশতঃ তৎকাল প্রত্যক্ষকে পঞ্চ প্রকার বলিয়া ব্যপদেশ করা হয়; সুতরাং ইহাতেও ইন্দ্রিয় ও অর্থের প্রাপ্ত বুদ্ধি ইন্দ্রিয়ার্থ-সম্বন্ধের প্রাপ্ত বুদ্ধি বাহ। ভাব্যাকারের এই শেষোক্ত যুক্তি বা হেতুও তাহার মতে দহমি-হুত্রে (অপদেশ শব্দের দ্বারা) স্থগিত হইয়াছে ৷২৮৷

ভাষ্য। যদ্ব্যক্তিমিত্তিয়ার্থসম্বন্ধগ্রহণং কার্যং নাজ্ঞমনসোঃ সম্বন্ধ-  
স্তেতি, কস্মাৎ ? হুগুব্যাসক্তমনসামিত্তিয়ার্থয়োঃ সম্বন্ধস্ত জ্ঞাননিমিত্ত-  
ত্বাদিতি সৌহৃদম্।

সূত্র। ব্যাহতত্বাদহেতুঃ ॥২৯॥১০॥

অনুবাদ। (পূর্বপক্ষ) ইন্দ্রিয়ার্থ-সম্বন্ধের গ্রহণ কর্তব্য, আত্মা ও মনের সম্বন্ধের গ্রহণ কর্তব্য নহে। কেন ? যেহেতু হুগুমনা ও ব্যাসক্তমনা ব্যক্তিদিগের ইন্দ্রিয় ও অর্থের সম্বন্ধের জ্ঞাননিমিত্ততা অর্থাৎ প্রত্যক্ষবিশেষে কারণব আছে, এই যে বলা হইয়াছে, সেই ইহা (সূত্রানুবাদ) ব্যাহতত্ব প্রযুক্ত অর্থাৎ পূর্বোক্ত ব্যাঘাতবশতঃ অহেতু (হেতু হয় না)।

ভাষ্য। যদি তাবৎ কচিদাজ্ঞমনসোঃ সম্বন্ধস্ত জ্ঞানকারণত্বং মেঘাতে, তদা “যুগপজ্জ্ঞানানুৎপত্তির্মনসো লিঙ্গ”মিতি ব্যাহন্তেত, নেদানীং মনসঃ সম্বন্ধমিত্তিয়ার্থসম্বন্ধোহপেক্ষতে, মনঃসংযোগানপেক্ষা-  
য়াক্ষ যুগপজ্জ্ঞানোৎপত্তিপ্রসঙ্গঃ। অথ মাতৃদ্ব্যবাত ইতি সর্বজ্ঞানানা-  
নাজ্ঞমনসোঃ সম্বন্ধঃ কারণমিষ্যতে, তদবস্বনেবেদং ভবতি, জ্ঞানকারণ-  
ত্বাদাজ্ঞমনসোঃ সম্বন্ধস্ত গ্রহণং কার্যমিতি।

অনুবাদ। যদি কোন স্থলেই আত্মা ও মনের সম্বন্ধের প্রত্যক্ষ কারণর ইচ্ছা না হয় অর্থাৎ স্বীকার না করা যায়, তাহা হইলে “যুগপৎ জ্ঞানের অনুৎপত্তি মনের লিঙ্গ” ইহা অর্থাৎ এই পূর্বোক্ত সূত্র ব্যাহত হয়। (কারণ) এখন অর্থাৎ ইহা

হইলে ( আত্মমনঃসম্বন্ধকে কুজাপি প্রত্যক্ষের কারণ না বলিলে ) ইন্দ্রিয়ার্গ-সম্বন্ধ মনঃসম্বন্ধকে অপেক্ষা করে না, মনঃসংযোগকে অপেক্ষা না করিলে যুগপৎ প্রত্যক্ষের উৎপত্তির আপত্তি হয় [ অর্থাৎ মনঃসম্বন্ধ-নিরপেক্ষ ইন্দ্রিয়ার্গ-সম্বন্ধকে প্রত্যক্ষের কারণ বলিলে একই সময়ে চাকুবাতি নানা প্রত্যক্ষের উৎপত্তি হইতে পারে, তাহা হইলে পূর্বোক্ত যুগপৎ জ্ঞানের অনুৎপত্তি সিদ্ধান্ত ব্যাহত হইয়া যায় ]।

যদি ( পূর্বোক্ত কথা ) ব্যাখ্যাত না হয়, এ জন্ত আত্মমনঃসম্বন্ধ মনঃ জ্ঞানের কারণরূপে ইষ্ট ( স্বীকৃত ) হয়, ( তাহা হইলে ) জ্ঞানকারণবশতঃ ( প্রত্যক্ষ-লক্ষণে ) আত্মা ও মনের সম্বন্ধের গ্রহণ কর্তব্য, ইহা তদবস্থই থাকে, অর্থাৎ পূর্বোক্ত এই পূর্বপক্ষ পূর্বপক্ষাবস্থ হইয়াই থাকে—উহার সমাধান হয় না।

টীকণী। পূর্বোক্ত ( ২৩১২৭২৮ ) তিন হস্তের দ্বারা বাহা বলা হইয়াছে, তদ্বারা ইন্দ্রিয়ার্গ-সম্বন্ধই প্রত্যক্ষের কারণ, আত্মমনঃসংযোগ বা ইন্দ্রিয়মনঃসংযোগ প্রত্যক্ষের কারণই নহে, এইরূপ ভুল বুঝিয়া পূর্বপক্ষী বৈরুপ পূর্বপক্ষের অবতারণা করিতে পারেন<sup>১</sup>, মহর্ষি এখানে এই হস্তের দ্বারা তাহারও উল্লেখ ও সমাধান করিয়া, তাহার পূর্বোক্ত প্রকৃত সমাধানকে আরও বিশদ ও সূক্ষ্ম করিয়া গিয়াছেন। ভাষ্যকার প্রথমে ত্রাত পূর্বপক্ষীর ঐ তন প্রকাশ করিয়া, পরে তদনুক পূর্বপক্ষ-হস্তের অবতারণা করিয়াছেন। ভাষ্যকারের “সোহুঃ” এই বাক্যের সহিত হস্তের “অহেতুঃ” এই বাক্যের যোজনা বুঝিতে হইবে। ভাষ্যে “কন্মঃ” এই কথা দ্বারা পূর্বপক্ষবাদীর নিজেরই প্রশ্ন প্রকাশপূর্বক পরে তাহারই নিজ বক্তব্য হেতুর উল্লেখ করিয়া “সোহুঃ” এই কথার দ্বারা ঐ হেতুকেই গ্রহণ করা হইয়াছে। পূর্বপক্ষবাদীর কথা এই যে, সুপ্তমনা ও ব্যাসক্তমনা ব্যক্তিবিশেষ জ্ঞানবিশেষ ইন্দ্রিয়ার্গ-সম্বন্ধ-নিমিত্তক, এ জন্ত প্রত্যক্ষ-লক্ষণে ইন্দ্রিয়ার্গ-সম্বন্ধের গ্রহণই কর্তব্য, আত্মমনঃসংযোগের গ্রহণ কর্তব্য নহে; এই বাহা পূর্বে বলা হইয়াছে, তাহা হেতু হইবে না। কারণ, উহাতে ব্যাখ্যাত-দোষ হইতেছে। কারণ, ইন্দ্রিয়ার্গ-সম্বন্ধকেই প্রত্যক্ষের কারণ বলিলে, আত্মমনঃসংযোগ ও ইন্দ্রিয়মনঃসংযোগ প্রত্যক্ষের কারণ না হওয়ায় একই সময়ে নানা প্রত্যক্ষের উৎপত্তি অনিবার্য। তাহা হইলে পূর্বে যে বলা হইয়াছে, “যুগপৎ জ্ঞানের অনুৎপত্তি মনের নিমিত্ত”, এই কথা ব্যাখ্যাত হয়। যুগপৎ নানা প্রত্যক্ষের অনুৎপত্তি পূর্বস্বীকৃত সিদ্ধান্ত। এখন তাহার ব্যাখ্যাতক বা বিরোধী হেতু বলিলে তাহা হেতু হইতে পারে না; তাহা হেতুভাঙ্গ, সূত্রাৎ তদ্বারা সাধ্যসিদ্ধি হইতে পারে না। ভাষ্যকার পূর্বপক্ষ-বাদীর তদনুক পূর্বপক্ষ বুঝাইতে বলিয়াছেন যে, আত্মমনঃসম্বন্ধ প্রত্যক্ষের কারণই নহে, ইহা

১। অনেক প্রাচ্যেন্দ্রিয়ার্গ-সম্বন্ধ এবং কারণ জ্ঞানক, ন আত্মমনঃসম্বন্ধ ইন্দ্রিয়মনঃসম্বন্ধ বা জ্ঞান-কারণমনোনিমিত্তি মনোনিমিত্তি।—ভাষ্যকারীক।



যদি বলা হইল, তাহা হইলে এখন মনঃসংযোগের অপেক্ষা নাই, ইহা বলা হইল; তাহা হইলে একই সময়ে চাক্ষুসাদি নানা প্রত্যক্ষের উৎপত্তির আপত্তি হয়। অর্থাৎ তাহা হইলে “যুগপৎ জ্ঞানের অহুৎপত্তি মনের লিঙ্গ” এই পুৰ্ণোক্ত হুত্র ব্যাহত হয়। ভাষ্যকার যে আশ্রমঃসংযোগ বলিয়াছেন, উহার দ্বারা ইন্দ্রিয়মনঃসংযোগও বুঝিতে হইবে। আত্মা মনের সহিত সংযুক্ত হয়, মন ইন্দ্রিয়ের সহিত সংযুক্ত হয়, এইরূপ কথায় ভাষ্যকার প্রত্যক্ষ-লক্ষণ-হুত্র-ভাষ্যে বলিয়াছেন। সুতরাং এখানে “আশ্রমঃসংযোগ” শব্দের দ্বারা ইন্দ্রিয়মনঃসংযোগকেও ভাষ্যকার গ্রহণ করিয়াছেন, বুঝা যায়। কেবল আশ্রম সহিত মনঃসংযোগকে প্রত্যক্ষে কারণ না বলিলে যুগপৎ নানা প্রত্যক্ষের উৎপত্তির আপত্তি হইতে পারে না। কারণ, ইন্দ্রিয়মনঃসংযোগকে প্রত্যক্ষের কারণ বলিতেই ঐ আপত্তির নিরাস হইয়াছে। ইন্দ্রিয়মনঃসংযোগকে প্রত্যক্ষে কারণ বলিয়া আশ্রমঃসংযোগকে কারণ না বলিলে ঐ আপত্তি হইতে পারে না। সুতরাং ভাষ্যকার যে আশ্রমঃসংযোগের উল্লেখ এখানে করিয়াছেন, উহা ইন্দ্রিয়সংযুক্ত মনের সহিত আশ্রম বিলক্ষণ সংযোগ। পরন্তু পূৰ্ণপক্ষবাদী আশ্রমঃসংযোগ ও ইন্দ্রিয়মনঃসংযোগ প্রত্যক্ষে কারণই নহে, ইন্দ্রিয়গর্ভসমিকর্ষই প্রত্যক্ষে কারণ, এইরূপ ভ্রমবশতঃ পুৰ্ণোক্তরূপ পূৰ্ণপক্ষের অবতারণা করিয়াছেন। পুৰ্ণোক্ত তিন হুত্রের দ্বারা সিদ্ধান্তী তাহাই বলিয়াছেন, এইরূপ ভ্রমই এই পূৰ্ণপক্ষের মূল। ভাষ্যকার ঐ ভ্রম প্রকাশ করিয়া ঐ পূৰ্ণপক্ষের ব্যাখ্যা করিতে যে আশ্রমঃসংযোগ শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন, তদ্বারা ইন্দ্রিয়মনঃসংযোগও তিনি গ্রহণ করিয়াছেন, সন্দেহ নাই। তাৎপর্য্য-টীকাকার পূৰ্ণপক্ষবাদীর ভ্রম প্রকাশ করিয়া, পূৰ্ণপক্ষ-হুত্রের উদ্ভাষন করিতে আশ্রমঃসংযোগ ও ইন্দ্রিয়মনঃসংযোগ, এই উভয়ের বিশেষ করিয়াই উল্লেখ করিয়াছেন। ইন্দ্রিয়মনঃসংযোগও প্রত্যক্ষে কারণ, নচেৎ যুগপৎ নানা প্রত্যক্ষের আপত্তি হয়, এই সিদ্ধান্ত ভাষ্যকারও অত্র বিশেষ করিয়া বলিয়াছেন। তৃতীয়পাঠ্যে মনঃপরীক্ষা-প্রকরণে হুত্রকার ও ভাষ্যকার বিচারপূর্বক সিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়াছেন। যথাস্থানে ইহার বিশদ আলোচনা দ্রষ্টব্য।

পূৰ্ণপক্ষী পক্ষান্তরে তাহার শেষ কথা বলিয়াছেন যে, যদি পুৰ্ণোক্ত দ্বাণাত ভয়ে আশ্রমঃসংযোগাদিকেও প্রত্যক্ষের কারণ বলিতে হয়, তাহা হইলে প্রত্যক্ষ-লক্ষণে তাহাদিগেরও উল্লেখ কর্তব্য, নচেৎ অসম্পূর্ণ কখন প্রযুক্ত প্রত্যক্ষ-লক্ষণের অল্পপত্তি, এই পূৰ্ণপক্ষের সমাধান হইল না, উহা নিরাকর হইয়াই থাকিল। মূলকথা, আশ্রমঃসংযোগাদিকে প্রত্যক্ষে কারণ না বলিলে পুৰ্ণোক্ত দ্বাণাত কারণ বলিলে প্রত্যক্ষ-লক্ষণে তাহাদিগের অনুলোকে পূৰ্ণপক্ষ-প্রতি, ইহাই উক্ত পক্ষে পূৰ্ণপক্ষবাদীর বক্তব্য।

উদ্যোতকর এই হুত্রের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন যে, পূৰ্ণপক্ষী “ব্যাহতব্ধাৎ” এই কথার দ্বারা পুৰ্ণোক্ত তিন হুত্রকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। পূৰ্ণপক্ষীর কথা এই যে, পুৰ্ণোক্ত তিন হুত্রের দ্বারা যখন আশ্রমঃসংযোগের প্রত্যক্ষ কারণত্ব নিষিদ্ধ হইয়াছে, তখন “জ্ঞানলিঙ্গত্বাৎ” ইত্যাদি ও “তদযোগপদ্যলিঙ্গত্বাৎ” ইত্যাদি হুত্রের ব্যাহত হইয়াছে। কারণ, ঐ দুই হুত্রের দ্বারা আবার আশ্রমঃসংযোগকে প্রত্যক্ষের কারণ বলা হইয়াছে। সুতরাং পূৰ্ণপক্ষের বিরোধ হওয়ায় ঐ হুত্রের

বাহ্যত হইয়াছে এবং যুগপৎ জ্ঞানের অনুৎপত্তি দেখা যায় অর্থাৎ উহা অদ্বৈত-সিদ্ধি। প্রত্যকে মনোমৈত্রিকর্ষের অপেক্ষা না থাকিলে যুগপৎ নানা প্রত্যক জন্মিতে পারে। তাহা হইলে দৃষ্টব্যবস্তু দোষ হয়। ২৯।

## সূত্র। নার্থবিশেষ-প্রাবল্যাৎ ॥৩০॥১১॥

অনুবাদ। (উক্তর) না, অর্থাৎ পূর্বোক্ত ব্যাঘাত নাই। অর্থবিশেষের প্রাবল্য প্রযুক্ত (সুপ্তমনা ও ব্যাসক্তমনা ব্যক্তিদিগের জ্ঞানবিশেষ জন্মে, এ জাত প্রত্যক কারণের মধ্যে ইন্দ্রিয়ার্থ-সম্বন্ধের প্রাধান্যই বলা হইয়াছে, আত্মমনঃসংযোগাদির প্রত্যক-কারণ নিষেধ করা হয় নাই)।

ভাষ্য। নাস্তি ব্যাঘাতঃ, ন হ্যাত্মমনঃসম্বন্ধস্ত জ্ঞানকারণত্বং ব্যভি-  
চরতি, ইন্দ্রিয়ার্থসম্বন্ধস্ত প্রাধান্যদুপাদৌগতে, অর্থবিশেষ-প্রাবল্যাক্তি  
সুপ্তবাসক্তমনসাং জ্ঞানোৎপত্তিরেকদা ভবতি। অর্থবিশেষঃ কশ্চি-  
দেবেন্দ্রিয়ার্থঃ, তস্য প্রাবল্যং তীত্রতাপটুতে। তচ্চার্থবিশেষপ্রাবল্য-  
মিন্দ্রিয়ার্থসম্বন্ধবিষয়ং, নাহ্মমনসোঃ সম্বন্ধবিষয়ং, তস্মাদিন্দ্রিয়ার্থ-  
সম্বন্ধঃ প্রধানমিতি।

অসতি সংকল্পে প্রণিধানোচ্যমিতি সুপ্তবাসক্তমনসাং যদিইন্দ্রিয়ার্থ-  
সম্বন্ধবাহুৎপাদ্যতে জ্ঞানং তত্র মনঃসংযোগোহপি কারণমিতি মনসি ক্রিয়া-  
কারণং বাচ্যমিতি। যদৈব জ্ঞাতুঃ খল্লয়মিচ্ছাজনিতঃ প্রবত্তো মনসঃ  
প্রেরক আত্মগুণ এবমাত্মনি গুণাস্তরং সর্বস্ত সাধকং প্রবৃত্তিদোষজনিত-  
মস্তি, যেন প্রেরিতং মন ইন্দ্রিয়েণ সম্বধ্যতে। তেন হ্যপ্রের্যমাণে মনসি  
সংযোগাভাবাজ্ঞানানুৎপত্তৌ সর্বার্থতাহস্ত্য নিবর্ততে, এযিতবাক্যস্ত  
গুণাস্তরস্ত দ্রব্যগুণকর্ম্মকারকত্বং, অন্যথা হি চতুর্বিধানামণুনাং ভূত-  
দৃক্ষাণাং মনসাধ ততোহস্ত্য ক্রিয়াহেতোরসম্ভাবাৎ শরীরেন্দ্রিয়বিষয়াণা-  
মনুৎপত্তিপ্রসঙ্গঃ।

অনুবাদ। ব্যাঘাত নাই, যেহেতু আত্মমনঃসম্বন্ধের প্রত্যক-কারণ ব্যভিচারী হইতেছে না (অর্থাৎ পূর্বের আত্মমনঃসম্বন্ধের প্রত্যক-কারণ নিষেধ করা হয় নাই), ইন্দ্রিয়ার্থ-সম্বন্ধের প্রাধান্য গ্রহণ করা হইয়াছে। যেহেতু অর্থ-



বিশেষের প্রাবল্যবশতঃ কোন সময়ে সুপ্তমনা ও ব্যাসক্তমনা ব্যক্তিদিগের প্রত্যক্ষ-বিশেষের উৎপত্তি হয়। অর্থবিশেষ কি না কোন একটি ইন্দ্রিয়ার্ধ, তাহার প্রাবল্য কি না তীব্রতা ও পটুতা। সেই অর্থবিশেষের প্রাবল্য ইন্দ্রিয়ার্ধ-সম্বন্ধবিষয়ক, আত্মা ও মনের সম্বন্ধবিষয়ক নহে (অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ার্ধ-সম্বন্ধের সহিতই পূর্বোক্ত অর্থবিশেষ প্রাবল্যের বিশেষ সম্বন্ধ, আত্মমনঃসম্বন্ধের সহিত উহার কোনই বিশেষ সম্বন্ধ নাই), সেই জন্ত ইন্দ্রিয়ার্ধ-সম্বন্ধ প্রধান।

(প্রশ্ন) সংকল্প না থাকিলে এবং প্রাধান্য না থাকিলে সুপ্তমনা ও ব্যাসক্তমনা ব্যক্তিদিগের ইন্দ্রিয়ার্ধ-সম্বন্ধবশতঃ যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহাতে মনঃসংযোগও কারণ, এ জ্ঞান মনে ক্রিয়ার কারণ বলিতে হইবে। (উত্তর) জ্ঞাতার অর্থাৎ আত্মার ইচ্ছাজনিত মনের প্রেরক এই প্রযত্ন যে প্রকারই আত্মার গুণ, এই প্রকার আত্মাতে সর্বসামান্য প্রবৃত্তি-দোষ-জনিত অর্থাৎ কৰ্ম ও বাগদেবাদি-জনিত গুণাস্তর আছে, যৎকর্তৃক প্রেরিত হইয়া মন ইন্দ্রিয়ের সহিত সম্বন্ধ হয়। যেহেতু সেই গুণাস্তর কর্তৃক মন প্রের্যমাণ অর্থাৎ সংযোগানুকূল ক্রিয়াযুক্ত না হইলে সংযোগাবশতঃ জ্ঞানের অনুৎপত্তি হওয়ায় এই গুণাস্তরের সর্বদীর্ঘতা অর্থাৎ সমস্ত জ্ঞান দ্রব্য গুণ ও কৰ্মের কারণতা নিবৃত্ত হয় (থাকে না)। এই গুণাস্তরের অর্থাৎ অদৃষ্ট নামক আত্মগুণ-বিশেষের দ্রব্য গুণ ও কৰ্মের কারণত্ব ইচ্ছা করিতেও হইবে অর্থাৎ তাহা স্বীকার করিতেও হইবে। যেহেতু অথবা (তাহা স্বীকার না করিলে) চতুর্বিধ সূক্ষ্মভূত পরমাণুগুলির এবং মনের তন্নিহ্ন অর্থাৎ পূর্বোক্ত অদৃষ্টরূপ গুণাস্তর ভিন্ন ক্রিয়ার হেতুর সম্ভব না থাকায় শরীর ইন্দ্রিয়ও বিষয়ের অনুৎপত্তি প্রসঙ্গ হয়, অর্থাৎ তাদৃশ অদৃষ্ট ব্যতীত পরমাণুর ক্রিয়া হইতে না পারায় পরমাণুদ্বয়ের সংযোগ-জন্ত ঘ্যণুকাপি ক্রমে সৃষ্টি হইতে পারে না।

টিপ্পনী। মহর্ষি এই হৃদের দ্বারা পূর্বোক্ত ব্রাহ্মের পূর্ণপক্ষ নিরত করিয়াছেন। এই হৃদের দলিতার্থ এই যে, পূর্বে ইন্দ্রিয়ার্ধ-সম্বন্ধের প্রাধান্যই বলা হইয়াছে। আত্মমনঃসংযোগ বা ইন্দ্রিয়মনঃসংযোগ প্রত্যক্ষ কারণই নহে, ইহা বলা হয় নাই, হুতরাং ব্যাঘাত-দোষ হয় নাই। পূর্বে ইন্দ্রিয়ার্ধ-সম্বন্ধের প্রাধান্য কিরূপে বলা হইয়াছে, ইহা দুবাইবার জন্ত মহর্ষি বলিয়াছেন,—“অর্থবিশেষ-প্রাবল্যং।” ভাষ্যকার মহর্ষির ঐ কথাই ব্যাখ্যার বলিয়াছেন যে, অর্থবিশেষের প্রাবল্যবশতঃই সমস্তবিশেষে সুপ্তমনা ও ব্যাসক্তমনা ব্যক্তিদিগের প্রত্যক্ষবিশেষ জন্মে। যেমন কোন তীর ফানি বা স্পর্শ অর্থবিশেষ, তাহার তীব্রতা ও পটুতাই প্রাবল্য। ঐ তীব্রতা ও পটুতাবশতঃই ঐ ফানি বা স্পর্শ ইন্দ্রিয়ের সহিত সম্বন্ধ হইয়া সুপ্তমনা ও ব্যাসক্তমনা ব্যক্তিরও প্রত্যক্ষ হয়।

ঐ স্থলে আত্মমনঃসংযোগও কারণরূপে থাকে, কিন্তু পূর্কোক্ত তীব্রতা ও পটুতার সহিত তাহার কোন বিশেষ সম্বন্ধ নাই। ঐ তীব্রতা ও পটুতা না থাকিলেও তখন আত্মমনঃসংযোগ হইতে পারিত। কিন্তু ঐ ধনি বা স্পর্শের সহিত ইন্দ্রিয়ের সন্নিবর্তন হইতে পারিত না। অর্থবিশেষের পূর্কোক্ত তীব্রতা ও পটুতাবশতঃই তাহার সহিত তৎকালে ইন্দ্রিয়ের সন্নিবর্তন হওয়ার সুপ্তমনা বা ব্যাকুলমনা ব্যক্তির অর্থবিশেষের প্রত্যক্ষ জন্মিয়া থাকে। সুতরাং ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিবর্তনই প্রধান, ইহা বুঝা যায়। ফল কথা, পূর্কোক্ত “সুপ্তবাসকুলমনাং” ইত্যাদি শব্দের দ্বারা ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিবর্তনের প্রাধান্ত বিষয়েই যুক্তি স্থচনা করা হইয়াছে, উহার দ্বারা প্রত্যক্ষে আত্মমনঃসংযোগ প্রকৃতির কারণত্ব নাই, ইহা বলা হয় নাই; সুতরাং পূর্কোক্ত বিরোধরূপ ব্যাঘাত-দোষ নাই।

প্রশ্ন হইতে পারে যে, যেখানে পূর্কসংকল্প ও তৎকালীন প্রশিধান না থাকিলেও সুপ্তমনা ও ব্যাকুলমনা ব্যক্তির ইন্দ্রিয়ের সহিত কোন বিষয়বিশেষের সন্নিবর্তনবশতঃ প্রত্যক্ষ জন্মে, সেখানেও যদি আত্মমনঃসংযোগও কারণরূপে আবশ্যক হয়, তাহা হইলে সেখানে আত্মার সহিত ও ইন্দ্রিয়ের সহিত মনের সেই বিলক্ষণ সংযোগ কিরূপে হইবে? আত্মার ক্রিয়া নাই, মনের ক্রিয়া জন্মই আত্মার সহিত মনের সংযোগ হইবে। কিন্তু মনের ক্রিয়ার কারণ সেখানে কি, তাহা বলিতে হইবে। যেখানে আত্মা ইচ্ছাপূর্কক প্রবৃত্তির দ্বারা মনকে প্রেরণ করেন, সেখানে আত্মার ঐ প্রবৃত্তিই মনের ক্রিয়া জন্মাইয়া তাহাকে আত্মার সহিত সংযুক্ত করে। কিন্তু পূর্কোক্ত স্থলে সুপ্ত বা ব্যাকুলমনা ব্যক্তি ত প্রবৃত্তির দ্বারা মনকে প্রেরণ করেন না, সেখানে আত্মমনঃসংযোগের জন্ম মনে যে ক্রিয়া আবশ্যক, তাহা জন্মাইবে কে? ভাব্যকার এই প্রশ্ন স্থচনা করিয়া তদ্ব্যবহারে বলিয়াছেন যে, আত্মা যেখানে ইচ্ছা করিয়া প্রবৃত্তির দ্বারা মনকে প্রেরণ করেন, সেখানে তাহার ঐ প্রবৃত্তি যেমন মনঃপ্রেরক অর্থাৎ মনে ক্রিয়ার জনক আত্মগুণ, এইরূপ আর একটি আত্মগুণ আছে, বাহা সর্ক-কার্য্যের কারণ এবং বাহা কর্ম্ম ও রাগ-বৈরাডি বোধ-জানিত। ঐ গুণান্তরটিই পূর্কোক্ত স্থলে মনে ক্রিয়া জন্মাইয়া আত্মার সহিত এবং ইন্দ্রিয়ের সহিত মনকে সংযুক্ত করে। ভাব্যকার এখানে অদৃষ্টরূপ আত্মগুণকেই তৎকালে মনে ক্রিয়ার কারণ গুণান্তর বলিয়াছেন। আপত্তি হইতে পারে যে, ঐ অদৃষ্টরূপ গুণান্তর জীবের স্রষ্টাদি ভোগেরই কারণ বলিয়া জানা যায়, উহা মনের ক্রিয়ারও জনক, ইহার প্রমাণ নাই। এই জন্ত ভাব্যকার শেষে আবার বলিয়াছেন যে, ঐ অদৃষ্টরূপ আত্মগুণ যদি মনে ক্রিয়া না জন্মায়, তাহা হইলে মনের সহিত আত্মা প্রকৃতির সংযোগ হইতে না পারায় তখন জ্ঞান জন্মিতে পারে না; সুতরাং ঐ অদৃষ্ট যে সর্ককার্য্যের কারণ, তাহা বলা যায় না, উহার সর্ককার্য্যজনকত্ব থাকে না। তাৎপর্য্যটীকাকার এই কথার তাৎপর্য্য বর্ণন করিয়াছেন যে, ভোগই অদৃষ্টের প্রধান প্রয়োজন, তজ্জন্ত জন্ম ও আয়ু তাহার প্রয়োজন বা ফল। নিজের সুখ-দুঃখের অদৃষ্টতাই ভোগ, তাহার আয়তন শরীর। মন অসংযুক্ত হইয়া ভোগ এবং ভোগের বিষয় সুখ-দুঃখ এবং তাহার কারণ জ্ঞান জন্মাইতে পারে না। এ জন্ত মনঃসংযোগের কারণ যে মনের ক্রিয়া, তাহার প্রতি অদৃষ্টকেই কারণ বলিতে হইবে। অতথা ঐ অদৃষ্টের সমস্ত জন্ত দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্মের প্রতি কারণতা থাকে না। পূর্কোক্ত মনের ক্রিয়ার প্রতি অদৃষ্ট কারণ না হইলে,



তাহার সর্বকারণতা থাকিবে কিরূপে ? যদি বল, অদৃষ্টের ঐ সর্বকারণতা বা সর্বকারণতা না থাকিল, তাহাতে ক্ষতি কি ? এই জন্ত শেষে আবার বলিয়াছেন যে, অদৃষ্টরূপে গুণাত্মকে সর্বকারণ বলিতেই হইবে ; নচেৎ হুস্ম ভূত যে চতুর্বিধ পরমাণু, তাহাদিগের এবং মনের ক্রিয়ার ঐ অদৃষ্ট ত্রিগুণ কোন হেতু সম্ভব না হওয়ায়, শরীর, ইন্দ্রিয় ও বিষয় অর্থাৎ ভোগের আদ্যতন, ভোগের কারণ ও ভোগ্য বস্তু জন্মিতে পারে না, এক কথায় সৃষ্টিই হইতে পারে না । কারণ, সৃষ্টির পূর্বে যে পরমাণুদ্বয়ের ক্রিয়া আবশ্যিক, তাহার কারণ তখন কি হইবে ? যে জীবের ভোগের জন্ত সৃষ্টি, সেই জীবের অদৃষ্টই তখন ঐ ক্রিয়ার জনক বলিতে হইবে । জীবের ভোগ-নির্দায়ক ঐ ক্রিয়াতে আর কাহাকেও কারণ বলা যাইবে না । সুতরাং সৃষ্টির মূলে জীবের অদৃষ্টরূপে গুণাত্মক, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে । তাহা হইলে অদৃষ্ট যে সর্বকারণের কারণ, ইহাও স্বীকার করিতে হইল । জীবের সমস্ত ভোগাই অদৃষ্টাধীন, সুতরাং সাক্ষ্য ও পরম্পরায় সকল কাহাই অদৃষ্ট-জন্ত । যে ভাবেই হউক, অদৃষ্টের সর্বকারণত্ব স্বীকার করিতেই হইবে । মূল কথাটা এই যে, হুস্ম ও ব্যাসজন্মনা সৃষ্টির যে সহস্রা বিষয়বিশেষের সাময়িক প্রত্যক্ষ জন্মে, সেখানেও তাহার আত্মা ও ইন্দ্রিয়ের সহিত মনের সংযোগ জন্মে । সেখানে তাহার অদৃষ্টবিশেষই মনে তখনই ক্রিয়া জন্মাইয়া, মনকে আত্মা ও ইন্দ্রিয়বিশেষের সহিত সংযুক্ত করে ; সুতরাং তখন আত্মমনঃসংযোগ ও ইন্দ্রিয়মনঃসংযোগরূপ কারণের অভাব হয় না । ভাস্যে পরমাণুকেই 'ভূতহুস্ম বলা হইয়াছে' । এখন প্রকৃত কথা স্মরণ করিতে হইবে যে, প্রত্যক্ষে ইন্দ্রিয়ার্থ-সমিকর্ষই অসাধারণ কারণ, এ জন্ত প্রত্যক্ষ-লক্ষণে তাহারই উল্লেখ করা হইয়াছে । আত্মমনঃসংযোগ ও ইন্দ্রিয়মনঃসংযোগ প্রত্যক্ষে কারণ হইলেও, তাহা প্রত্যক্ষ-লক্ষণে বলা হয় নাই । ইন্দ্রিয়মনঃসংযোগ অসাধারণ কারণ হইলেও, ইন্দ্রিয়ার্থ-সমিকর্ষই প্রধান ; এই জন্ত সেই প্রধান কারণই উল্লেখ করা হইয়াছে । প্রত্যক্ষের কারণমাত্রই প্রত্যক্ষ-লক্ষণে বক্তব্য নহে । আত্মমনঃসংযোগাদি কারণের দ্বারা প্রত্যক্ষের নির্দেশ লক্ষণ বলাও যায় না । সুতরাং ইন্দ্রিয়ার্থ-সমিকর্ষরূপ অসাধারণ কারণের দ্বারা প্রত্যক্ষের লক্ষণ বলা হইয়াছে । সুতরাং অসম্পূর্ণ বচন হয় নাই, তৎপ্রসূক্ত প্রত্যক্ষ-লক্ষণের অরূপপত্তিও নাই ॥৩০॥

**সূত্র ।** প্রত্যক্ষমনুমানমেকদেশগ্রহণাদুপলব্ধেঃ ॥৩১॥৯২॥

অনুবাদ । (পূর্বপক্ষ) প্রত্যক্ষ অনুমান, অর্থাৎ প্রত্যক্ষ নামে কোন প্রমাণাস্তর নাই, বাহ্যকে প্রত্যক্ষ প্রমিতি বলা হয়, তাহা বস্তুতঃ অনুমিতি । কারণ, একদেশ গ্রহণহেতুক অর্থাৎ বৃক্ষাদির কোন অংশবিশেষের জ্ঞান-জন্ম (বৃক্ষাদির) উপলব্ধি হয় ।

ভাস্য । যদিদমিন্দ্রিয়ার্থসমিকর্ষাৎপদ্যতে জ্ঞানং বৃক্ষ ইত্যেতৎ

কিল প্রত্যক্ষং, তৎ খল্বনুমানমেব, কস্মাৎ ? একদেশগ্রহণাদবুদ্ধিশ্রোপ-  
লক্ষেঃ। অবর্বাগ্ভাগময়ং গৃহীত্বা বুদ্ধিমূলভতে, ন চৈকদেশো বুদ্ধিঃ  
তত্র যথা ধূমং গৃহীত্বা বহ্নিমনুমিনোতি তাদৃগেব ভবতি।

কিং পুনর্গৃহমাণাদেকদেশাদর্শান্তরমনুমেয়ং মন্যসে ? অবয়বসমূহ-  
পক্ষে অবয়বান্তরাণি, দ্রব্যোৎপত্তিপক্ষে তানি চাবয়বী চেতি। অবয়বসমূহ-  
পক্ষে তাবদেকদেশগ্রহণাদবুদ্ধিবুদ্ধিরভাবঃ, নাগৃহমাণাদেকদেশান্তরং  
বুদ্ধো গৃহমাণৈকদেশবদिति। অণৈকদেশগ্রহণাদেকদেশান্তরানুमानে  
সমুদায়প্রতিসম্ভাবনাং তত্র বুদ্ধিবুদ্ধিঃ ? ন তর্হি বুদ্ধিবুদ্ধিরনুমানমেবং সতি  
ভবিতুমর্হতীতি। দ্রব্যান্তরোৎপত্তিপক্ষে নাবয়বানুমেয়োহষ্টৈকদেশ-  
সম্বন্ধত্যাগ্রহণাদগ্রহণে চাবিশেষবাদনুমেয়ত্বাভাবঃ। তস্মাদবুদ্ধিবুদ্ধিরনুমানং  
ন ভবতি।

অনুবাদ। এই যে ইঞ্জিরার্থসন্নিবর্তন-হেতুক “বুদ্ধ” এই প্রকার জ্ঞান উৎপন্ন  
হয়, ইহা প্রত্যক্ষ অর্থাৎ ঐ প্রকার জ্ঞানকে প্রত্যক্ষ বলা হয়, কিন্তু তাহা অনুমানই।  
(প্রশ্ন) কেন ? অর্থাৎ “বুদ্ধ” এই প্রকার পূর্বোক্ত জ্ঞান অনুমানই কেন ?  
(উত্তর) যেহেতু একদেশের জ্ঞান-জ্ঞাত বুদ্ধের উপলক্ষি হয়। এই ব্যক্তি অর্থাৎ  
বুদ্ধের উপলক্ষিকারী ব্যক্তি অবর্বাগ্ভাগ অর্থাৎ বুদ্ধের সম্মুখবর্তী অংশ গ্রহণ  
করিয়া বুদ্ধকে উপলক্ষি করে। একদেশ (বুদ্ধের সেই একাংশ) বুদ্ধ নহে।  
সেই স্থলে যেমন ধূমকে গ্রহণ করিয়া বহ্নিকে অনুমান করে, সেইরূপই হয়  
[অর্থাৎ বহ্নি হইতে ভিন্ন পদার্থ ধূমের জ্ঞান-জ্ঞাত বহ্নির জ্ঞান যেমন সর্বমতেই  
অনুমিতি, তজ্জপ বুদ্ধ হইতে ভিন্ন পদার্থ বুদ্ধের একদেশের জ্ঞান-জ্ঞাত যে বুদ্ধের  
জ্ঞান হয়, তাহাও পূর্বোক্ত বহ্নি-জ্ঞানের স্থায় হওয়ার অনুমিতি, ঐ বুদ্ধজ্ঞান  
প্রত্যক্ষ নহে, প্রত্যক্ষ বলিয়া কোন পৃথক জ্ঞান নাই]।

[ভাষ্যকার এই পূর্বপক্ষ নিরাস করিবার জন্ত প্রশ্নপূর্বক দুই মতে দুইটি পক্ষ  
গ্রহণ করিতেছেন।]

গৃহমাণ একদেশ হইতে ভিন্ন কোন পদার্থকে অনুমেয় মনে করিতেছ ?  
(অর্থাৎ পূর্বপক্ষবাদীর মতে পূর্বোক্ত স্থলে বুদ্ধের প্রত্যক্ষ অংশ ভিন্ন কোন  
পদার্থ অনুমেয় ?) অবয়বসমূহ পক্ষে অর্থাৎ পরমাণুরূপ অবয়বসমূহই বুদ্ধ,



উহা ভিন্ন বৃক্ষ বলিয়া কোন অবয়বী ত্ৰব্যের উৎপত্তি হয় না, এই মতে অবয়বাস্তর-  
গুলি অৰ্থাৎ প্ৰত্যক্ষ অবয়বগুলি ( অনুমেয় বলিতে হইবে )। ত্ৰব্যোৎপত্তিপক্ষে  
অৰ্থাৎ পরমাণুসমূহই বৃক্ষ নহে, পরমাণুর দ্বাৰা ঘাণুকাদিক্ৰমে বৃক্ষ নামক অবয়বী  
ত্ৰব্যাস্তরেরই উৎপত্তি হয়, এই মতে সেই ( পূৰ্বোক্ত ) অবয়বাস্তরগুলি, এবং  
অবয়বীও ( অনুমেয় বলিতে হইবে )।

[ এখন এই উভয় পক্ষেই দোষ প্ৰদৰ্শন করিয়া পূৰ্বপক্ষ নিৰাস করিতেছেন। ]

অবয়বসমূহ পক্ষে একদেশের গ্ৰহণ জ্ঞাত বৃক্ষ-বুন্দি হয় না। ( কারণ )  
গৃহমাণ একদেশের ত্ৰায় অগৃহমাণ একদেশান্তর বৃক্ষ নহে [ অৰ্থাৎ অবয়বসমষ্টিই  
বৃক্ষ, এই মতে ঐ সমষ্টির একাংশ বৃক্ষ নহে, সম্মুখবৰ্তী যে একাংশের প্ৰথম গ্ৰহণ  
হয়, তাহা যেমন বৃক্ষ নহে, তদ্রূপ অনুমেয় অপর একাংশও বৃক্ষ নহে ; সুতরাং  
একদেশের জ্ঞান-জ্ঞাত যে অপর একদেশের জ্ঞান, তাহা বৃক্ষের জ্ঞান বলা যায় না।  
তাহা হইলে বৃক্ষের একদেশের গ্ৰহণ-জ্ঞাত বৃক্ষের উপলব্ধি হয়, উহা বৃক্ষের অনুমিতি,  
ইহাও বলা গেল না। ]

( পূৰ্বপক্ষ ) একদেশের গ্ৰহণ-হেতুক একদেশান্তরের অনুমান হইলে,  
সমুদায়ের প্ৰতিসন্ধানবশতঃ তাহাতে বৃক্ষ-বুন্দি হয় ? অৰ্থাৎ বৃক্ষের সম্মুখবৰ্তী  
অংশ দেখিয়া অপর অংশের অনুমান করে, তাহার পরে ঐ দুই অংশের প্ৰতি-  
সন্ধান জ্ঞান-জ্ঞাত “ইহা বৃক্ষ” এইরূপ জ্ঞান করে। ( উত্তর ) না। তাহা হইলে  
( অৰ্থাৎ যদি এক অংশের দৰ্শন-জ্ঞাত অপর অংশের অনুমান করিয়া, শেষে ঐ  
উভয় অংশের প্ৰতিসন্ধান করিয়াই তাহাতে বৃক্ষ-বুন্দি করে, এইরূপ হইলে )  
বৃক্ষবুন্দি অনুমান হইতে পারে না।

ত্ৰব্যাস্তরোৎপত্তি পক্ষে অৰ্থাৎ পরমাণুসমষ্টিবিশেষই বৃক্ষ নহে, বৃক্ষ নামে অবয়বী  
ত্ৰব্যাস্তরই উৎপন্ন হয়, এই মতে অবয়বী অনুমেয় হয় না। কারণ, ( পূৰ্বপক্ষীর  
মতে ) একদেশের সহিত সম্বন্ধযুক্ত এই অবয়বীর গ্ৰহণ হয় না, গ্ৰহণ হইলেও  
কিষেব না থাকায় ( অবয়বীর ) অনুমেয়ত্ব থাকে না ( অৰ্থাৎ তাহা হইলে  
একদেশের প্ৰত্যক্ষকে অবয়বীর প্ৰত্যক্ষই স্বীকার করিতে হয় ) ; অতএব বৃক্ষ-বুন্দি  
অনুমান হয় না।

টীকণী। প্ৰত্যক্ষ-পরীক্ষার প্ৰথমে পূৰ্বোক্ত প্ৰত্যক্ষ-লক্ষণের পরীক্ষা করিয়া, এখন প্ৰত্যক্ষ  
নামে কোন প্ৰমাণাস্তর নাই, যে জ্ঞানকে প্ৰত্যক্ষ বলা হয়, তাহা অনুমান, এই পূৰ্বপক্ষের অবতারণা।

করিয়া মহর্ষি তাঁহার উকিষ্ট ও লক্ষিত প্রত্যক্ষ-প্রমাণের প্রামাণ্য পরীক্ষা করিতেছেন। বুকের সহিত চক্ষুরিস্ত্রিরের সংযোগ হইলে “বৃক্ষ” এই প্রকার যে জ্ঞান জন্মে, তাহাকে বুকের চাক্ষুণ্য প্রত্যক্ষ বলা হয়। পূর্নপক্ষবাদীর কথা এই যে, ঐ বৃক্ষ-বুদ্ধি বস্তুতঃ অহুমান; কারণ, বুকের সর্বাংশ কেহ দেখে না, সমুখবর্তী অংশ দেখিরাই বৃক্ষ বলিয়া বুঝে। সমুখবর্তী অংশ বুকের একদেশ, উহা বৃক্ষ নহে; সুতরাং উহার জ্ঞানকে বৃক্ষজ্ঞান বলা যায় না; উহার জ্ঞানজন্য বুকের জ্ঞান ধূনের জ্ঞানজন্য বহির্জ্ঞানের জ্ঞান হওয়ার উহাকে অহুমিতিই বলিতে হইবে। ঐহলে “বৃক্ষ” এই প্রকার জ্ঞান বাহ্য প্রত্যক্ষ নামে ব্যবহৃত বা কথিত হয়, তাহা প্রত্যক্ষ নহে। ঐরূপ প্রত্যক্ষ অলৌকিক। ভাষ্যকার পূর্নপক্ষ ব্যাখ্যা করিতে দ্রাব্যজন্য প্রত্যক্ষের উল্লেখ করিয়া “কিল” শব্দের দ্বারা উহার অলৌকিক প্রকাশ করিয়াছেন। “কিল” শব্দ অলৌকিক অর্থেও প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

মহর্ষি পরবর্তী সিদ্ধান্ত-সূত্রের দ্বারা এই পূর্নপক্ষের নিরাস করিলেও, ভাষ্যকার প্রকারান্তরে এখানে এই পূর্নপক্ষ নিরাস করিবার জন্য প্রশ্ন করিয়াছেন যে, একদেশ গ্রহণ-জন্য কোন পদার্থ-সূত্রের অনুমান হয়? অর্থাৎ পূর্নপক্ষী যে বৃক্ষজ্ঞানকে অহুমিতি বলেন, তাহাতে সেখানে তাঁহার মতে অনুমের কি? বোধ সম্প্রদায়ের মতে কতকগুলি পরমাণুসমষ্টই বৃক্ষ। পরমাণুসমষ্ট ভিন্ন বৃক্ষ বলিয়া কোন অতিরিক্ত পদার্থ নাই। তাঁহার অবরবসমষ্ট হইতে ভিন্ন অবরবী মানে নাই। পূর্নপক্ষবাদী এই মতাবলম্বী হইলে বুকের একদেশ গ্রহণ-জন্য অর্থাৎ সমুখবর্তী কতকগুলি অবরব দেখিয়া পরভাগ অর্থাৎ অপর দেশবর্তী অবরবগুলিই অনুমের বলিবেন। তাহা হইলে বৃক্ষ অনুমের হইল না; কারণ, বুকের সমুখবর্তী দৃশ্যমানে অংশের জ্ঞান পূর্নপক্ষীর মতে অনুমের অপর অংশও বৃক্ষ নহে। তাঁহার মতে কতকগুলি অবরব-সমষ্টই বৃক্ষ, সেই সমষ্টের অন্তর্গত অপর কোন সমষ্ট বা অংশবিশেষ বৃক্ষ নহে, সুতরাং প্রত্যক্ষ বলিয়া ব্যবহৃত বৃক্ষ-জ্ঞানকে তিনি অহুমিতি বলিতে পারেন না। তাঁহার মতে বস্তুতঃ বুকের অহুমিতি হয় না, বুকের অদৃশ্য অংশেরই অহুমিতি হয়। বুকের সেই অংশবিশেষকে বৃক্ষ বলিলে দৃশ্যমানে অংশকেও বৃক্ষ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। তাহা হইলে পূর্নপক্ষবাদীকে বৃক্ষ দেখিরা বুকের অনুমান হয়, এই কথা বলিয়া উপহাসাস্পদ হইতে হইবে। কল কথা, বুকের কোন অংশবিশেষকে পূর্নপক্ষবাদী যখন কিছুতেই বৃক্ষ বলিতে পারিবেন না, তখন ঐ অংশবিশেষের অনুমানকে বুকের অনুমান বলিতে পারিবেন না।

পরবর্তী কালে কোন সম্প্রদায় মহর্ষি সোতনের এই পূর্নপক্ষকে সিদ্ধান্তরূপে আশ্রয় করিয়া প্রকারান্তরে ইহার সমর্থন করিতেন যে, বুকের সমুখবর্তী ভাগ দেখিরা প্রথমে পরভাগেরই অনুমান করে, বুকের অনুমান করে না; পরভাগের অনুমান করিয়া পূর্নভাগ ও পরভাগের অর্থাৎ সর্বাংশের প্রতিদক্ষানপূর্নক শেষে ‘বৃক্ষ’ এইরূপ জ্ঞান করে; ঐ জ্ঞানও অহুমান; সুতরাং প্রত্যক্ষ বলিয়া ব্যবহৃত “বৃক্ষ” ইত্যাদি প্রকার জ্ঞান অহুমানে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার, প্রত্যক্ষ নামে কোন অতিরিক্ত প্রশংসা নাই। ভাষ্যকার শেষে এই পূর্নপক্ষেরও অবসারণা করিয়া, এখানে তাহার নিরাস করিয়া গিয়াছেন। উদ্যোতকরও অপর সম্প্রদায়ের মত বলিয়াই শেষে এই মতের (এই পূর্নপক্ষের)



উল্লেখপূর্বক ইহার নিরাস করিয়াছেন। তাৎপর্যটোকার কিস্ত প্রথমেই পূর্বোক্ত প্রকারেই পূর্ণপক্ষ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, অবয়ব-সমষ্টি হইতে পৃথক্ “অবয়বী” বলিয়া কোন পদার্থ নাই। অবয়বগুলিই পারমাণবিক বস্তু। তন্মধ্যে কতকগুলি অবয়ব দেখিয়া তৎসম্বন্ধে অপর অবয়বগুলির অনুমান করিয়া, শেষে সর্বাধিকারের প্রতিসন্ধান জন্ত “বৃক্ষ” ইত্যাদি প্রকারে যে জ্ঞান করে, তাহা অনুমানই। সুতরাং প্রমাণ-বিভাগস্থলে প্রত্যক্ষকে যে অতিরিক্ত প্রমাণ বলা হইয়াছে, তাহা উপপন্ন হয় না। ভাষ্যকার এই প্রকারে সমর্থিত পূর্ণপক্ষের নিরাস করিতে সম্বন্ধে বলিয়া গিয়াছেন যে, ঐরূপ বলিলেও বৃক্ষবুদ্ধি অর্থাৎ “বৃক্ষ” এই প্রকার পরজ্ঞাত জ্ঞানটি অনুমিতি হইতে পারে না অর্থাৎ বৃক্ষজ্ঞানকে অনুমান বলিয়া যে পূর্ণপক্ষ দ্বিভাঙ্গরূপে আশ্রয় করা হইয়াছে, তাহা নিরসিত হইয়াছে। কারণ, পূর্ণপক্ষবাদী কোনরূপেই বৃক্ষজ্ঞানকে অনুমান বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে পারিবেন না।

উদ্যোক্তকর এই পূর্ণপক্ষ নিরাস করিতে বহু বিচার করিয়াছেন। তিনি প্রথমে বলিয়াছেন যে, বৃক্ষের কোন অংশবিশেষ যখন বৃক্ষ নহে, তখন একাংশ দেখিয়া অপর অংশের অনুমানকে বৃক্ষের অনুমান বলা হইবে না। যদি বস্তু, বৃক্ষের অংশগুলির প্রতিসন্ধান জন্ত শেষে “বৃক্ষ” এইরূপ জ্ঞান অন্নিতে পারে, কিন্তু তাহা হইলেও ঐ বৃক্ষজ্ঞানকে অনুমান বলা হইবে না। কারণ, যদি “বৃক্ষোহয়মকীর্ণভাগবতঃ” এইরূপে অর্থাৎ, “এইটি বৃক্ষ, যেহেতু ইহাতে সমুদায় ভাগ আছে” এইরূপে যদি অনুমান করিতে হয় তাহা হইলে ঐ অনুমানের আশ্রয় বৃক্ষ কি, তাহা বুঝিতে হইবে। কারণ, বাহ্যতে সমুদায় ভাগরূপ স্বর্গ বুঝিয়া অনুমান করিতে হইবে, সেই স্বর্গের জ্ঞান পূর্বেই আবশ্যক, নচেৎ কিছুতেই তাহাতে অনুমান হইতে পারে না। পূর্ণপক্ষবাদীর মতে যখন কতকগুলি পরমাণু-সমষ্টি ভিন্ন বৃক্ষ বলিয়া কোন বস্তু নাই, তখন তাহা হইতে বৃক্ষরূপ স্বর্গের জ্ঞান হইতেই পারিবে না—উহা অলীক। পরমাণু-সমষ্টিরূপে বৃক্ষের জ্ঞান স্বীকার করিয়া লইলেও পূর্বোক্ত প্রতিসন্ধান-জন্ত বৃক্ষ-জ্ঞানকে অনুমান বলা যায় না। কারণ, অনুমানে ঐরূপ প্রতিসন্ধান আবশ্যক নাই। ঐরূপ প্রতিসন্ধানপূর্বক কোথায়ও অনুমান হয় না—হইতে পারে না। প্রতিসন্ধান জ্ঞান পর্যন্ত জ্ঞানিলে ঐ অবস্থায় অনুমানের কোন আবশ্যকতাও থাকে না। আর প্রতিসন্ধান স্বীকার করিলেও বৃক্ষের সর্বাংশে প্রতিসন্ধান হয় না, বৃক্ষেও প্রতিসন্ধান হয় না। কারণ, অনুমানকারী বৃক্ষের একদেশ দেখিয়া সমুদায়কে বুঝে না, বৃক্ষকেও বুঝে না, কিন্তু সমুদায়কেই বুঝে, ইহাই বলিতে হইবে। কেন না, পূর্ণপক্ষবাদীরা সমুদায়ী ভিন্ন অর্থাৎ অবয়ব ভিন্ন সমুদায় (অবয়বী) স্বীকার করেন না। সুতরাং সমুদায়ের প্রতিসন্ধান তাৎক্ষণিকের মতে অসম্ভব। সমুদায়ের সত্তা না থাকিতেও তাহার অনুমান অসম্ভব। এবং প্রথমে বৃক্ষের সমুদায়ী ভাগ দেখিয়া অপর ভাগের অনুমানও হইতে পারে না। কারণ, পূর্ণভাগের সহিত পরভাগের চ্যাব্বিনিশ্চয় সম্ভব হয় না। অনুমানকারী ঐ পূর্ণভাগ ও পরভাগ দেখে নাই, কেবল পূর্ণভাগই দেখিয়াছে, সুতরাং পূর্ণপক্ষীর মতে পরভাগের দর্শন না হওয়ায় ঐ ভাগদ্বয়ের ব্যাপ্যব্যাপক-ভাবনিশ্চয় বোধরূপেই সম্ভব হয় না। এবং সমুদায়ী ভাগ ও পরভাগে স্বর্গ-স্বর্গি ভাব না থাকায় “অকীর্ণভাগঃ

পরভাগবান" ইত্যাদি প্রকারেও অস্বীকৃতি হইতে পারে না। বৃক্ষের পরভাগ তাহার পূর্বভাগের  
বর্ধন নহে, পূর্বভাগও পরভাগের বর্ধন নহে।

উদ্যোক্তর এইরূপ বহু কথা বলিয়া, শেষে পূর্বপক্ষীর অভিমত প্রতিসন্ধান জানাজ্ঞ বৃক্ষবৃদ্ধি  
খণ্ডন করিতে বিশেষ কথা বলিয়াছেন যে, পূর্বপক্ষী বখন অবয়বসমষ্ট ভিন্ন বৃক্ষ বলিয়া কোন  
পদার্থ স্বীকার করেন না, তখন তাহার প্রতিসন্ধান হইতে পারে না। অবয়বদ্বয়ের প্রতিসন্ধান  
জ্ঞাতও বৃক্ষ-বৃদ্ধি হইতে পারে না। যেখানে এক পদার্থের জ্ঞান হইয়া অপর পদার্থের জ্ঞান  
জন্মে, সেখানে পরে সেই ব্যক্তিরই পূর্বজ্ঞানের বিষয়কে অবলম্বন করতঃ অপর পদার্থবিষয়ে যে  
সমুদায়জন একটি জ্ঞান, তাহাই এখানে প্রতিসন্ধান-জ্ঞান<sup>১</sup>। যেমন "আমি রূপ উপলব্ধি করিয়াছি,  
সমস্ত উপলব্ধি করিয়াছি" এইরূপ বলিলে রূপ রসের প্রতিসন্ধান হইয়াছে, ইহা বলা যায়।  
পূর্বপক্ষবাদীর মতে পূর্বে বৃক্ষের সমুদায়ভাগ ভাগের দর্শন হয়, পরে তৎসমস্ত পরভাগের অস্বীকার  
হয়। তাহা হইলে উহার পরে "পূর্বভাগপরভাগী" অর্থাৎ "সমুদায়ভাগ ও পরভাগ" এইরূপই  
প্রতিসন্ধান-জ্ঞান হইতে পারে, যেখানে "বৃক্ষ" এইরূপ জ্ঞান কিরূপে হইবে? তাহা কিছুতেই  
হইতে পারে না। সমুদায়ভাগ ও বৃক্ষ নহে, পরভাগও বৃক্ষ নহে, ইহা পূর্বপক্ষবাদীর স্বীকৃত  
সিদ্ধান্ত। সুতরাং পূর্বোক্ত প্রকার ঐ পূর্বভাগ ও পরভাগ-বিষয়ক প্রতিসন্ধান-জ্ঞানকেও তিনি  
বৃক্ষজ্ঞান বলিতে পারিবেন না। ঐ ভাগদ্বয়ের প্রতিসন্ধান ঐ ভাগদ্বয়কেই লোকে বৃক্ষ বলিয়া  
ভ্রম করে, ইহাই শেষে পূর্বপক্ষবাদীর বলিতে হইবে। কিন্তু তাহা হইলে ঐ বৃক্ষজ্ঞানকে  
অস্বীকার বলা যাইবে না। কারণ, প্রমাণ বথার্থ জ্ঞানেরই সাধন হয়। অস্বীকার-প্রমাণের দ্বারা  
বৃক্ষজ্ঞান জন্মে, এই পক্ষ বক্ষা করিতে হইলে ঐ বৃক্ষ জ্ঞানকে ভ্রম বলা যাইবে না। আর যদি  
সর্বত্রই বৃক্ষজ্ঞান পূর্বোক্তরূপে ভ্রমই হইতেছে, সর্বত্র অস্বীকারভাসের দ্বারা অথবা অল্প কোন  
প্রমাণভাসের দ্বারা বৃক্ষজ্ঞান জন্মে, ইহাই অসত্য বলিতে চাও, তাহাও বলিতে পারিবে না।  
কারণ, বথার্থ বৃক্ষ-জ্ঞান একটা না থাকিলে বৃক্ষবিষয়ক ভ্রম জ্ঞান বলা যায় না। প্রমাণের দ্বারা  
বৃক্ষবিষয়ক বথার্থ জ্ঞান জন্মিলে তদ্বারা বৃক্ষ কি, ইহা বুঝা যায় এবং কোন পদার্থ বৃক্ষ  
নহে, ইহাও বুঝিয়া বৃক্ষ ভিন্ন পদার্থে বৃক্ষ-বৃদ্ধিকে ভ্রম বলিয়া বুঝিয়া লওয়া যায়। পূর্বপক্ষ-  
বাদীর মতে বৃক্ষ বলিয়া কোন বাস্তব পদার্থ না থাকিলে তদ্বিষয়ে বথার্থ জ্ঞান অসম্ভব, সুতরাং  
তদ্বিষয়ে ভ্রম জ্ঞানও সর্বথা অসম্ভব।

অবয়বসমষ্ট হইতে পৃথক বৃক্ষ নামে অবয়বী ব্যবস্থার উৎপত্তি হয়, এই মতেও ঐ বৃক্ষরূপ  
অবয়বী অস্বীকার হয় না। ভাষ্যকার ইহার হেতু বলিয়াছেন যে, একদেশরূপ অবয়বের সহিত

১। কতকদূরতে প্রতিসন্ধানপ্রভাৱ। বৃক্ষবৃদ্ধিরূপে তৎসমস্ত বৃক্ষজ্ঞানসিদ্ধবিশ্বাসপন্থা ন প্রতিসন্ধান।  
প্রতিসন্ধান হি নাম পূর্বপ্রত্যাহারপ্রভাৱঃ প্রভাৱঃ পিতামহে ভবতি। যথা রূপক মনোপলব্ধ্যভ্রমভেদেতি। ভ্রম-  
পক্ষে পুনরঙ্গীকৃত্যং গুণীকৃত্য পরভাগসমুদায় অঙ্গীকৃত্যপরভাগী ইচ্ছোভাবান্ প্রতিসন্ধানপ্রভাৱো দৃষ্টঃ। বৃক্ষবৃদ্ধি  
কৃতঃ? ন তদ্বিষয়কৃত্যং বৃক্ষা ন পরভাগ ইতি। অঙ্গীকৃত্যপরভাগপ্রত্যাহারবৃক্ষভ্রমোপী বৃক্ষবৃদ্ধিঃ না অঙ্গী-  
কৃত্যেতি প্রভাৱো নাপ্রমাণভ্রমভেদেতি। প্রমাণভ্রম বাক্যভ্রমভেদেতি ইত্যাদি।—ভাষ্যকারিক।



সম্বন্ধযুক্ত অবয়বীর জ্ঞান নাই। ভাব্যকারের তাৎপর্য্য এই যে, পূর্বপক্ষীর মতে বস্তু অনুমানের পূর্বে বৃক্ষরূপ অবয়বীর কোনরূপ জ্ঞান নাই, কেবল অবয়ববিশেষেরই জ্ঞান আছে, তখন ঐ বৃক্ষ বিষয়ে অনুমান অসম্ভব। যে পদার্থ একেবারে অপ্রসিদ্ধ বা অনুমানকারীর অজ্ঞাত, তদ্বিষয়ক অনুমান কোনরূপেই হইতে পারে না। পূর্বপক্ষী যদি বলেন যে, অবয়ব-জ্ঞান হইলেই অবয়বী বৃক্ষের জ্ঞান হইয়া যায়, তাহা হইলে ঐ অবয়ব-জ্ঞান হইতে অবয়বী বৃক্ষের জ্ঞানে কোন বিশেষ না থাকায়, অবয়বের দ্বারা অবয়বী বৃক্ষকেও প্রত্যক্ষ বলিতে হইবে। তাহা হইলে অবয়বীকে আর অনুমানের বলা গেল না—অবয়বীর অহমেয়ত থাকিল না। সুতরাং এ মতেও বৃক্ষজ্ঞানকে অনুমান বলা যায় না। উল্লেখ্যতর এখানে বলিয়াছেন যে, বৃক্ষের সম্বন্ধবর্তী ভাগ যেমন ইন্দ্রিয়-সম্বন্ধ হইয়া প্রত্যক্ষ হয়, তত্রূপ ঐ সমস্ত বৃক্ষও ইন্দ্রিয়-সম্বন্ধ হইয়া প্রত্যক্ষ হয়। ইন্দ্রিয়-সম্বন্ধ হইয়াও যদি বৃক্ষ প্রত্যক্ষ না হইয়া অনুমেয় হয়, তাহা হইলে সম্বন্ধবর্তী ভাগও অনুমানের বল না কেন? তাহা বলিলে পূর্বপক্ষবাদীর নিজের কথাই ব্যাহত হইয়া যায়। কারণ, সম্বন্ধবর্তী ভাগ দেখিয়া বৃক্ষের অনুমান হয়, এই কথাই তিনি বলিয়াছেন। যদি ঐ কথা ত্যাগ করিয়া সর্বদাশেই অনুমান বলেন, তাহাও বলিতে পারিবেন না। কারণ, অনুমানের পূর্বে ধর্ম্মীর জ্ঞান না থাকিলে অনুমান হইতে পারে না। বৃক্ষের অনুমানের পূর্বে কোন ধর্ম্মী বা আশ্রয়ের প্রত্যক্ষ না হইলে কিরূপে অনুমান হইবে? অতরূপ কোন অনুমানও এখানে সম্ভব হয় না। মহর্ষির সিদ্ধান্ত-সূত্র-ভাষ্য-ব্যাখ্যাতে সকল কথা পরিষ্কৃত হইবে ॥৩১॥

ভাষ্য। একদেশগ্রহণমাত্রিত্য প্রত্যক্ষস্থানুমানস্বরূপপাদ্যতে, তচ্চ—

সূত্র। ন, প্রত্যক্ষেন যাবত্তাবদপ্যুপলভ্যং ॥৩২॥১৩॥

অনুবাদ। একদেশের জ্ঞানকে আশ্রয় করিয়া প্রত্যক্ষের অনুমানের উপপাদন করা হইতেছে—তাহা কিন্তু হয় না, ( অর্থাৎ প্রত্যক্ষ অনুমানই, প্রত্যক্ষ নামে পৃথক কোন প্রমাণ নাই, ইহা উপপাদন করা যায় না ) কারণ, প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারা যে কোন অংশেরও উপলব্ধি হইতেছে [ অর্থাৎ বৃক্ষের সম্বন্ধবর্তী ভাগের প্রত্যক্ষই হয়, ইহা বস্তু পূর্বপক্ষবাদীরও স্বীকৃত, তখন প্রত্যক্ষ নামে পৃথক কোন প্রমাণই নাই, এই পূর্বপক্ষ সর্বথা অযুক্ত, ব্যাহত ]।

ভাষ্য। ন প্রত্যক্ষমনুমানং, কস্মাৎ? প্রত্যক্ষেনৈবোপলভ্যং। যৎ তদেকদেশগ্রহণমাত্রীয়তে, প্রত্যক্ষণাসাবুপলভ্যং, ন চোপলভ্যো নির্বিঘ্নয়োহন্তি, যাবচ্চার্জজাতং তস্মৈ বিঘ্নস্তাবদভ্যানুজ্ঞায়মানং প্রত্যক্ষ-ব্যবস্থাপকং ভবতি। কিং পুনস্ততোহন্তদর্ঘজাতং? অবয়বী সমুদায়ো বা। ন চৈকদেশগ্রহণমনুমানং ভাবয়িতুং শক্যং হেতুভাবাদিতি।

অনুবাদ। প্রত্যক্ষ অনুমান নহে অর্থাৎ প্রত্যক্ষ নামে পৃথক কোন প্রমাণই নাই, উহা বস্তুতঃ অনুমান, ইহা বলা যায় না। (প্রশ্ন) কেন? (উত্তর) যেহেতু প্রত্যক্ষের দ্বারাই উপলব্ধি হয়। (বিশদার্থ) সেই যে একদেশ গ্রহণকে অর্থাৎ বৃক্ষের সম্মুখবর্তী ভাগের উপলব্ধিকে আশ্রয় করা হইতেছে, প্রত্যক্ষের দ্বারা এই উপলব্ধি হয়। বিষয়হীন উপলব্ধি নাই অর্থাৎ উপলব্ধি হইলেই অবশ্য তাহার বিষয় আছে, স্বীকার করিতে হইবে। যাবৎ পদার্থসমূহ অর্থাৎ বৃক্ষাদির বস্তুটুকু অংশ সেই (পূর্বোক্ত) উপলব্ধির বিষয় হয়, তাবৎ পদার্থসমূহ স্বীকৃত্যমান হইয়া (ঐ প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বিষয়রূপে অবশ্য স্বীকৃত হইয়া) প্রত্যক্ষের ব্যবস্থাপক হইতেছে। অর্থাৎ প্রত্যক্ষের বিষয়রূপে স্বীকৃত অংশই প্রত্যক্ষের সাধক হইতেছে। (প্রশ্ন) তাহা হইতে অর্থাৎ পূর্বোক্ত প্রত্যক্ষ বিষয়-পদার্থ হইতে ভিন্ন পদার্থ (সেখানে) কি? (উত্তর) অবয়বী অথবা সমুদায় অর্থাৎ অবয়ব-সমষ্টি হইতে ভিন্ন দ্রব্যাস্তর অথবা বৌদ্ধ সম্মত অবয়ব-সমষ্টি। একদেশের জ্ঞানকেও অশুমিত্তি রূপ করিতে পারা যায় না<sup>১</sup>। কারণ, হেতু নাই [ অর্থাৎ বৃক্ষের একদেশের জ্ঞানও অনুমান-প্রমাণের দ্বারা হয়, তাহাতেও প্রত্যক্ষ প্রমাণের আবশ্যক নাই, ইহা বলা যায় না। কারণ, তাহাতে অনবস্থা-দোষের প্রসঙ্গবশতঃ অনুমানের হেতু পাওয়া যায় না। ]

টীকানী। মহর্ষি এই সিদ্ধান্ত-হস্তের দ্বারা পূর্বোক্ত পূর্ণপক্ষের নিরাস করিয়াছেন যে, একদেশ গ্রহণ যখন প্রত্যক্ষ বলিয়া পূর্ণপক্ষবাদীরও স্বীকৃত, তখন প্রত্যক্ষ নামে ব্যবহৃত জ্ঞান-মাত্রই অশুমিত্তি, উহা বস্তুতঃ প্রত্যক্ষ নহে, প্রত্যক্ষ বলিয়া পৃথক কোন জ্ঞান বা প্রমাণই নাই, এই সিদ্ধান্ত ব্যাহত। প্রত্যক্ষ বলিয়া যদি পৃথক কোন জ্ঞান বা প্রমাণ না থাকে, তাহা হইলে বৃক্ষের একদেশ দেখিয়া বৃক্ষের অনুমান হয়, এ কথা বলা বার কিরূপে? অনুমানকারী যে বৃক্ষের একদেশ গ্রহণ করেন, তাহা ত প্রত্যক্ষই করেন? এবং সেই প্রত্যক্ষ-জ্ঞান জন্তই পূর্ণপক্ষবাদীর মতে বৃক্ষের অনুমান হয়। সুতরাং পূর্ণপক্ষবাদীর নিজের উক্ত হেতুর দ্বারাই তাহার নিজের উক্ত “প্রত্যক্ষ নামে ব্যবহৃত জ্ঞানমাত্রই অনুমান” এই প্রতিজ্ঞা ব্যাহিত হইয়া গিয়াছে। অবশ্য যদিও সিদ্ধান্তে বৃক্ষরূপ অবয়বীরও প্রত্যক্ষ স্বীকৃত ও সমর্থিত হইয়াছে, কিন্তু সূত্রকার মহর্ষি এই হস্তের দ্বারা পূর্ণপক্ষবাদীর বখানুসারেই প্রথমে বলিয়াছেন যে, “যাবৎ তাবৎ” অর্থাৎ যে-কোন অংশেরও প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারা উপলব্ধি যখন পূর্ণপক্ষবাদীরও স্বীকৃত, তখন পূর্বোক্ত পূর্ণপক্ষ বলা যায় না। ভাষ্যকার পূর্বোক্ত পূর্ণপক্ষের অনুবাদ করিয়া “তচ্চ” এই



কথার সহিত যোগে এই সিদ্ধান্ত-সূত্রের অবতারণা করিয়াছেন। ঐ “তচ্চ” এই কথার সহিত সূত্রোক্ত “ন” এই কথার যোজনাবুঝিতে হইবে।

ভাষ্যকার মহর্ষির কথা বুঝাইতে শেষে বলিয়াছেন যে, একদেশের যে উপলব্ধি হয়, তাহা প্রত্যক্ষ, ঐ উপলব্ধির অবশ্য বিষয় আছে। কারণ, বিষয় না থাকিলে উপলব্ধি হইতে পারে না। বুদ্ধ বা তাহার অবয়বসমষ্টি ঐ উপলব্ধির বিষয় বলিয়া স্বীকার না করিলেও বুদ্ধের বস্তুত্ব অংশ ঐ উপলব্ধির বিষয় বলিয়া অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে, ততটুকু অংশই ঐ প্রত্যক্ষ উপলব্ধির বিষয়রূপে স্বীকৃত হওয়ায়, তাহাই প্রত্যক্ষের ব্যবস্থাপক হইবে অর্থাৎ তাহাই প্রত্যক্ষ নামে যে পৃথক্ জ্ঞান ও প্রমাণ আছে, ইহার সাধক হইবে। সুতরাং পূর্বপক্ষবাদীরও প্রত্যক্ষ নামে যে পৃথক্ জ্ঞান ও প্রমাণ অবশ্য স্বীকার্য। পূর্বোক্ত উপলব্ধির বিষয় অংশ হইতে ভিন্ন পদার্থ সেখানে কি আছে, যাহাকে পূর্বপক্ষবাদী অহ্মের বলিবেন? ভাষ্যকার তাহা দেখাইবার জন্ত ঐ প্রশ্ন করিয়া তত্বতরে বলিয়াছেন যে, অবয়বী, অথবা সমুদায়। অর্থাৎ তাহার অবয়ব-সমষ্টি হইতে পৃথক্ অবয়বী স্বীকার করেন, তাহাদিগের মতে ঐ অবয়বীকেই অহ্মের বলা হইবে। বৌদ্ধ সম্প্রদায় অবয়ব-সমুদায় অর্থাৎ পরমাণুসমষ্টি ভিন্ন পৃথক্ অবয়বী স্বীকার করেন নাই; সুতরাং সে মতে ঐ পরমাণুসমষ্টিকেই অহ্মের বলা হইবে। ভাষ্যকার পূর্ব-সূত্র-ভাষ্যে পূর্বপক্ষবাদীর অহ্মের বিচার করিয়া, যে সকল অল্পগতি প্রদর্শন করিয়া আসিয়াছেন, তাহা এখানে চিস্তনীয় নহে। এখানে তাহার বক্তব্য এই যে, পূর্বপক্ষবাদী বুদ্ধের একদেশ গ্রহণ অথবা বুদ্ধরূপ অবয়বীকেই অহ্মের বলুন, আর অবয়বী না মানিয়া অবয়বসমষ্টিকেই অহ্মের বলুন, সে বিচার এখানে কর্তব্য মনে করি না। প্রত্যক্ষ বিষয় অংশবিশেষ হইতে পৃথক্ অবয়বী অথবা পরমাণুসমষ্টি তাহাই থাকুক এবং অহ্মের হউক, বুদ্ধাদির অংশবিশেষকে যখন প্রত্যক্ষ বলিয়াই স্বীকার করা হইতেছে, তখন প্রত্যক্ষ নামে কোন প্রমাণই নাই, প্রত্যক্ষ নামে ব্যবহৃত জ্ঞানস্বরূপ অগ্রমিতি, এই প্রতিজ্ঞা পূর্বপক্ষবাদীর নিজের উক্ত হেতুর দ্বারাই ব্যক্তি হইয়া গিয়াছে।

পূর্বপক্ষবাদী তাহার প্রতিজ্ঞা ব্যাঘাত-ভয়ে যদি শেষে বলেন যে, বুদ্ধের একদেশ গ্রহণও অহ্মমান; অহ্মমানের দ্বারা বুদ্ধের একদেশ গ্রহণ করিয়া, তদ্বারা বুদ্ধের অহ্মমান করে, কুত্বাপি প্রত্যক্ষ বলিয়া পৃথক্ কোন জ্ঞান স্বীকার করি না। ভাষ্যকার শেষে এই কথারও নিরাস করিতে বলিয়াছেন যে, একদেশজ্ঞানকে অহ্মমানাত্মক করা যায় না। কারণ, হেতু নাই। ভাষ্যকারের গুঢ় ভাবপার্থ্য এই যে, অহ্মমানের দ্বারা একদেশের গ্রহণ করিতে হইলে, যে হেতু আবশ্যক হইবে, তাহারও অবশ্য অহ্মমানের দ্বারা জ্ঞান করিতে হইবে। কারণ, পূর্বপক্ষবাদী প্রত্যক্ষ নামে কোন পৃথক্ প্রমাণই মানেন না। এইরূপ ঐ হেতুর অহ্মমানে যে হেতু আবশ্যক হইবে, তাহারও জ্ঞান অহ্মমানের দ্বারা করিতে হইবে। তাহা হইলে পূর্বোক্তরূপে অহ্মমানের দ্বারা হেতু নিশ্চয় করিয়া, তাহার দ্বারা একদেশের জ্ঞান করিতে অনবদ্যোদয় হইয়া পড়িবে। অহ্মমানমাত্রই যখন হেতু জ্ঞান আবশ্যক, নাচল অহ্মমানই হইতে পারে না, তখন ঐ হেতু জ্ঞানের জন্ত অহ্মমানকেই আশ্রয়

করিতে গেলে কোন দিনই হেতুর জ্ঞান হইতে পারিবে না। সুতরাং একদেশের অনুমানরূপ জ্ঞান হওয়া অসম্ভব। তাই ভাষ্যকার বলিয়াছেন,—“হেতুতাবাৎ”।<sup>১</sup> অনবহা-দোষের প্রসঙ্গবশতঃ হেতু জ্ঞান হইতে না পারায়, বৃক্ষাদির একদেশেরও অনুমিতিরূপ জ্ঞান করা অসম্ভব, ইহাই ঐ শেষ ভাষ্যের তাৎপর্য্যার্থ।

ভাষ্য। অন্তথাপি চ প্রত্যক্ষস্ত নানুমানত্বপ্রসঙ্গস্তৎপূর্ব্বকত্বাৎ। প্রত্যক্ষপূর্ব্বকমনুমানং, সম্বন্ধাবয়িধূমৌ প্রত্যক্ষতো দৃষ্টবতো ধূম-প্রত্যক্ষ-দর্শনাদগ্ৰাবনুমানং ভবতি। তত্র যচ্চ সম্বন্ধয়োর্লিপ্লিলিঙ্গিনোঃ প্রত্যক্ষং যচ্চ লিঙ্গমাত্রপ্রত্যক্ষগ্রহণং নৈতদন্তরেণানুমানস্ত প্রযুক্তিরস্তি। ন হেতদনুমানমিস্ত্রিয়ার্থসম্বন্ধকর্ষজত্বাৎ। ন চানুমেয়স্তেন্দ্রিয়েণ সম্বন্ধার্থ-দনুমানং ভবতি। সোহয়ং প্রত্যক্ষানুমানয়োর্লক্ষণভেদো মহান-প্রমিতব্য ইতি।

অনুবাদ। অন্য প্রকারেও প্রত্যক্ষের অনুমানত্ব প্রসঙ্গ হয় না। কারণ, (অনুমানে) তৎপূর্ব্বকত্ব (প্রত্যক্ষপূর্ব্বকত্ব) আছে। বিশদার্থ এই যে, অনুমান প্রত্যক্ষপূর্ব্বক, সম্বন্ধ অর্থাৎ ব্যাপ্যব্যাপক ভাবসম্বন্ধযুক্ত অগ্নি ও ধূমকে প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারা যে দেখিয়াছে, সেই ব্যক্তির ধূমের প্রত্যক্ষ দর্শন জন্ম অগ্নি বিষয়ে অনুমান হয়। তদ্বাদ্যে সম্বন্ধ লিঙ্গ ও লিঙ্গীর (হেতু ও সাধ্য ধর্ম্মের) ঙ্গে প্রত্যক্ষ এবং লিঙ্গমাত্রের যে প্রত্যক্ষজ্ঞান, ইহা অর্থাৎ এই দুইটি প্রত্যক্ষ ব্যতীত অনুমানের প্রযুক্তি (উৎপত্তি) হয় না। কিন্তু ইহা অর্থাৎ ঐ প্রত্যক্ষ জ্ঞান অনুমান নহে, যেহেতু (উহাতে) ইস্ত্রিয়ার্থ-সম্বন্ধকর্ষজত্ব আছে। অনুমেয়ের ইন্দ্রিয়ের সহিত সম্বন্ধকর্ষবশতঃ অনুমান হয় না। সেই এই প্রত্যক্ষ ও অনুমানের মহান লক্ষণ-ভেদ আশ্রয় করিবে।

টীকা। প্রত্যক্ষ অনুমান হইতে পারে না, এ বিষয়ে শেবে ভাষ্যকার নিজে অন্য প্রকার একটি যুক্তি বলিয়াছেন যে, অনুমান প্রত্যক্ষপূর্ব্বক, প্রত্যক্ষ ঐরূপ নহে। প্রত্যক্ষ, ইন্দ্রিয়ার সহিত বিষয়ের সম্বন্ধকর্ষজ, অনুমান ঐরূপ নহে। ইন্দ্রিয়ার সহিত অনুমেয় বিষয়ের সম্বন্ধকর্ষজ অনুমান হয় না। সুতরাং প্রত্যক্ষকে কোনরূপেই অনুমান বলা যায় না। অনুমানমাত্রই কিরূপে কিরূপ প্রত্যক্ষপূর্ব্বক, তাহা প্রথমাব্যয়ে অনুমান-স্বত্রের (৫ স্বত্রের) ব্যাখ্যাতে বলা হইয়াছে। প্রত্যক্ষ ও অনুমানের লক্ষণগত যে মহাভেদ, তাহাও সেখানে প্রকটিত হইয়াছে। ভাষ্যকার এখানে ঐ লক্ষণ-ভেদ প্রকাশ করিয়া, শেষে উহাকে আশ্রয় করিয়া প্রত্যক্ষ ও অনুমানের



ভেদ বুঝিতে হইবে, ইহাও বলিয়া গিয়াছেন। ভাষ্যকার অহুমান-সূত্র-ভাষ্যে বিষয়ভেদবশতঃ প্রত্যক্ষ ও অহুমানের ভেদ বর্ণন করিয়াছেন। প্রত্যক্ষ কেবল বর্তমানবিষয়ক। অহুমান—তত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমানবিষয়ক। সুতরাং প্রত্যক্ষকে অহুমান বলা যায় না। উদ্যোতকর আরও যুক্তি বলিয়াছেন যে, অহুমান “পূর্ববৎ”, “শেষবৎ” ও “সামান্যতোদৃষ্ট” এই প্রকারত্রয়বিশিষ্ট। প্রত্যক্ষের ঐরূপ প্রকার-ভেদ নাই; সুতরাং প্রত্যক্ষকে অহুমান বলা যায় না। এবং অহুমান-মাত্রেরই হেতু ও সাব্যসনের ব্যাপ্যব্যাপক ভাব সম্বন্ধ-জ্ঞানের অপেক্ষা আছে, প্রত্যক্ষে তাহা নাই। সুতরাং প্রত্যক্ষকে অহুমান বলা যায় না। বৃত্তিকার প্রতীতি নব্যগণ মহর্ষির এই সিদ্ধান্ত-সূত্রে উপলক্ষণ বলিয়া বলিয়াছেন যে, প্রত্যক্ষমাত্রের নিবেদন করা যায় না অর্থাৎ প্রত্যক্ষ নামে ব্যবহৃত জ্ঞান দর্শনই অহুমিতি, প্রত্যক্ষ জ্ঞান বস্তুতঃ পৃথক্ কিছু নাই, এই কথা বলাই যায় না। কারণ, শব্দ, গন্ধ প্রভৃতি পদার্থের যে প্রত্যক্ষ-জ্ঞান, তাহা অহুমানের দ্বারা হইয়, ইহা কোনরূপেই বলা যাইবে না। শব্দ, গন্ধ প্রভৃতি পদার্থের বুদ্ধাদি জ্ঞেয়র দ্বারা একদেশ নাই; বুদ্ধাদির দ্বারা একাংশ গ্রহণ দ্বারা তাহাদিগের উপলব্ধি হয়, এ কথা বলা অথবা অসম্ভব কোন হেতুর জ্ঞান-জ্ঞাত তাহাদিগের ঐরূপ ইন্দ্রিয়-সমিকর্ষ-জ্ঞাত জ্ঞান জন্মে, ইহা বলা অসম্ভব।

মূল কথা, প্রত্যক্ষ না থাকিলে কোন জ্ঞানই হইতে পারে না। কেবল অহুমান কেন, সর্ববিধ জ্ঞান জ্ঞানের মুণ্ডেই যে-কোনরূপে প্রত্যক্ষ আছেই। প্রত্যক্ষ ব্যতীত যখন অহুমান অসম্ভব, তখন প্রত্যক্ষের বাস্তব পৃথক্ দ্বারা অপলাপ করিয়া উহাকে অহুমান বলা অসম্ভব। মহর্ষি এই সিদ্ধান্ত-সূত্রের দ্বারা এই চরম যুক্তিও স্থানা করিয়া গিয়াছেন।

**ভাষ্য। ন চৈকদেশোপলব্ধিরবয়বিসদৃশ্যবাবৎ। \* ন চৈক-  
দেশোপলব্ধিমাত্রঃ, কিং তর্হি? একদেশোপলব্ধিস্তৎসহচরিতাবয়ব্যুপ-**

\* এই বাণীটি বৃত্তিকার প্রতীতি নব্যগণ এই প্রকরণের শেষ সূত্ররূপেই গ্রহণ করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বস্তুতঃ এটি ভাষ্যসূত্র হইলেই ইহার পরবর্তী সূত্রের সহিত উহার উপোদ্যোত-সঙ্গতি থাকে। বৃত্তিকার প্রতীতি পরবর্তী সূত্রে সেই সঙ্গতিই দেখাইয়াছেন। পরবর্তী সূত্রের ভাষ্যান্তরে ভাষ্যকারের কথার দ্বারাও “অবয়ববিসদৃশ্যবাবৎ” এই বাণীটি সূত্রকারের কথা বলিয়াই সরলভাবে বুঝা যায়। ভারতবালোকে ব্যাপ্তি মিশ্রিত “অব্যবয়ববিসদৃশ্যবাবতি সূত্রেণ” এইরূপ কথা লিখিয়াছেন। উহার দ্বারা তাহার মতে “ন চৈকদেশোপলব্ধিঃ” এই অংশ ভাষ্য, “অব্যবয়ব-সদৃশ্যবাবৎ” এই অংশই সূত্র, ইহা বুঝা যাইতে পারে। কেহ কেহ ঐরূপই বলিয়াছেন। কোন পুস্তকে “অব্যবয়ব-সদৃশ্যবাবৎ” এইমাত্র সূত্রশাস্তিও দেখা যায়। এ পক্ষে পরবর্তী সূত্রের সহিত উপোদ্যোত-সঙ্গতিও উপপন্ন হয়। পরবর্তী সূত্রের ভাষ্যান্তরে “পদ্বত্মবয়ববিলম্ব্যাবলিভ্যন্তরমহেতুঃ” এই শাস্তিও সহজে সম্ভব হয়। কিন্তু জাহ-সূচী-নিবন্ধে ব্যাপ্তি মিশ্র ইহাকে সূত্ররূপে গ্রহণ না করার এবং তাৎপর্യാটীকাতেও পূর্বেক্ত সন্দেহ ভাষ্যকর্মেই কথিত হওয়ার এই গ্রন্থে উহা ভাষ্যকর্মেই পৃথক্ হইয়াছে। জাহ-সূচী-নিবন্ধে পরবর্তী অবয়ব-প্রকরণকে “প্রাসঙ্গিক” বলা হইয়াছে। ইহাতে বুঝা যায়, এমনও সম্ভবিতাই পরবর্তী প্রকরণের আরম্ভ, ইহা ব্যাপ্তি মিশ্রের মত। ব্যাপ্তি মিশ্র তাৎপর্യാটীকার উদ্যোতকরের উদ্ধৃত সন্দেহের উত্তরে করিয়া লিখিয়াছেন, “ন চৈকদেশোপলব্ধিরিতি। তৎকর্তব্যং ভাষ্যসূত্রো বাস্তবিকভাবে বাস্তব ন তর্হি,” উদ্যোতকর “ন চৈকদেশোপলব্ধিঃ” ইত্যাদি ভাষ্যেরই অনুভব-পুঙ্খক ব্যাখ্যা করিয়াছেন, ইহা ব্যাপ্তি মিশ্রের কথার বুঝা যায়।

লক্ষিষ্ট, কস্মাৎ ? অবয়বিসদৃশাৎ । অস্তি হ্রস্মেকদেশব্যতিরিক্তো-  
 হ্রস্ববী, তস্মাবয়বস্থানস্তোপলক্ষিকারণপ্রাপ্তৈকদেশোপলক্ষাবনুপলক্ষি-  
 রনুপপত্তি ।

অনুবাদ । একদেশের উপলক্ষিও অর্থাৎ কেবল একদেশের উপলক্ষি হয় না ; কারণ, অবয়বীর অস্তিত্ব আছে । বিশদার্থ এই যে, একদেশের উপলক্ষি-  
 মাত্রও হয় না । (প্রশ্ন) তবে কি ? (উত্তর) একদেশের উপলক্ষি এবং তাহার সহিত  
 সম্বন্ধ অবয়বীর উপলক্ষি হয় । (প্রশ্ন) কেন ? (উত্তর) যেহেতু অবয়বীর অস্তিত্ব  
 আছে । বিশদার্থ এই যে, যেহেতু একদেশ হইতে ব্যতিরিক্ত অর্থাৎ অবয়বসমূহ  
 হইতে ভিন্ন অবয়বী আছে, “অবয়বস্থান” অর্থাৎ অবয়বগুলি বাহার স্থান (আধার),  
 “উপলক্ষি-কারণপ্রাপ্ত” অর্থাৎ উপলক্ষির কারণগুলি যাহাতে আছে, এমন সেই  
 (পূর্বোক্ত) অবয়বীর একদেশের উপলক্ষি হইলে, অনুপলক্ষি অর্থাৎ ঐ অবয়বীর  
 অপ্রত্যক্ষ উপপন্ন হয় না ।

টীকানী । পূর্বপক্ষবাদী যদি বলেন যে, আমি প্রত্যক্ষমাত্রের অপলাপ করি না । পূর্বোক্ত  
 যুক্তিতে আমি প্রত্যক্ষের প্রামাণ্য স্বীকার করিলাম, কিন্তু বৃক্ষাদির প্রত্যক্ষ স্বীকার করি না ।  
 বৃক্ষের একদেশের সহিতই চক্ষুসংযোগ হয়, সমস্ত বৃক্ষে চক্ষুঃসংযোগ হয় না ; সুতরাং ঐ এক-  
 দেশেরই প্রত্যক্ষ হইতে পারে এবং তাহাই হইয়া থাকে । তাহার পরে একদেশরূপ অবয়বের  
 সহিত সমবায়-সম্বন্ধযুক্ত বৃক্ষরূপ অবয়বীর (‘অয়ং বৃক্ষঃ এতদবয়ববসনবৈতস্মাৎ’ এইরূপে) অনুমান  
 হয় । অথবা অবয়বসমষ্টি ভিন্ন অবয়বী বলিয়া, কোন প্রত্যক্ষের না থাকায়, একদেশরূপ অবয়ব-  
 বিশেষেরই প্রত্যক্ষ হয়—সর্বাংশের প্রত্যক্ষ অসম্ভব । সুতরাং অবয়বসমষ্টিরূপ যে বৃক্ষাদি, তাহার  
 জ্ঞান অনুমান, উহা প্রত্যক্ষ নহে । ভাষ্যকার এই সকল কথা নিরাস করিবার জন্ত শেষে  
 আবার বলিয়াছেন যে, কেবল একদেশের উপলক্ষিও হয় না, একদেশের উপলক্ষির সহিত  
 একদেশী সেই অবয়বীরও উপলক্ষি (প্রত্যক্ষ) হয় । অবয়বসমষ্টি ভিন্ন অবয়বী আছে । ঐ  
 অবয়বী তাহার একদেশ বা অংশরূপ অবয়বগুলিতে সমবায়-সম্বন্ধে সম্বন্ধ থাকে । সুতরাং  
 কোন অবয়বে ইন্দ্রিয়-সম্বন্ধ ঘটিলে অবয়বীতেও তাহা ঘটবেই । প্রত্যক্ষের কারণ ইন্দ্রিয়-  
 সম্বন্ধ, মহাব উদ্ভূত রূপ প্রকৃতি থাকিলে অবয়বের ভায় বৃক্ষাদি অবয়বীরও প্রত্যক্ষ হইয়া  
 যাইবে । যে কারণগুলি থাকায় বৃক্ষাদির অবয়বের প্রত্যক্ষ হইবে, সেই কারণগুলি তখন বৃক্ষাদি  
 অবয়বীতেও থাকায়, তাহারও প্রত্যক্ষ হইবে । পূর্বোক্ত প্রকারে অবয়বের উপলক্ষি বা প্রত্যক্ষ  
 হলে অবয়বীর প্রত্যক্ষ না হওয়া দেখানে কোনরূপেই উপপন্ন হয় না । পূর্বপক্ষবাদীদিগের  
 যুক্তি এই যে, বৃক্ষাদির কোন এক অবয়বেই চক্ষুঃসংযোগ হয়, সর্বাংগে তাহা হয় না,



হইতে পারে না, সুতরাং ইঞ্জির-সমিকৃষ্ট সেই একদেশেরই প্রত্যক্ষ হইতে পারে। সমস্ত অবয়বের সহিত সমস্ত অবয়বীর প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। এতজন্তরে সিদ্ধান্তবাদীদিগের কথা এই যে, অবয়বীর প্রত্যক্ষে সমস্ত অবয়বে ইঞ্জির-সমিকৃষ্টের অপেক্ষা নাই। যে-কোন অবয়বের সহিত চক্ষুরাদির সংযোগ হইলেই অবয়বীর প্রত্যক্ষ হইতে পারে এবং বস্তুতঃ তাহা হইয়া থাকে। সেখানে অবয়বের সহিত চক্ষুরাদির সংযোগ হইলে, সেই অবয়বের সহিত নিত্য-সদ্ব্যবহৃত অবয়বীর সহিতও চক্ষুরাদির সংযোগ জন্মে, সেই অবয়বীর সহিত চক্ষুরাদির সম্বন্ধই অবয়বীর প্রত্যক্ষ কারণ হয়। সুতরাং অবয়বরূপ ভিন্ন পদার্থে ইঞ্জির-সমিকৃষ্ট অবয়বীর প্রত্যক্ষের কারণ হইতে পারে না—পূর্বপক্ষবাদীদিগের এই আপত্তিও নিরাকৃত হইয়াছে। পূর্বপক্ষবাদীরা যদি বলেন যে, সমস্ত অবয়বে চক্ষুঃসংযোগ ব্যতীত অবয়বের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হইতে পারে না, তাহা হইলে তাহাদিগের মতে একদেশরূপ অবয়বেরও প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। কারণ, যে অবয়বের প্রত্যক্ষ তাহার স্বীকার করেন, তাহারও সর্বাংশে চক্ষুঃসংযোগ হয় না, কোন অংশেই চক্ষুঃসংযোগ হয়, তদ্বারা অনেকটা অংশের প্রত্যক্ষ হইয়া যায়, ইহা তাহাদিগেরও অবস্থা স্বীকার্য। এইরূপ কোন ব্যক্তির কোন অবয়বের স্পর্শ করিলে, সেই ব্যক্তিকেই স্পর্শ করা হয়, ইহা অবস্থা স্বীকার্য। অতথা সেই ব্যক্তিকে স্পর্শ করা অর্থাৎ ঋগিজিরের দ্বারা তাহাকে অথবা কাহাকেও প্রত্যক্ষ করা অসম্ভব হয়। সুতরাং অবয়বের দ্বারা অবয়বাস্তরগুলি ব্যবহৃত থাকায় একদা সমস্ত অবয়বের সহিত ঋগিজিরের সম্বন্ধ অসম্ভব বলিয়া, কোন কালেই কোন অবয়বীর স্পর্শন প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। অতএব স্বীকার করিতে হইবে যে, কোন ব্যক্তি বা কোন জন্মের কোন অবয়বের সহিত ঋগিজিরের সংযোগ হইলে ঐ অবয়বীর সহিতও তখন ঋগিজিরের সংযোগ হয়, তজ্জন্ম ঐ অবয়বীরও স্বাচ প্রত্যক্ষ জন্মে। মূল কথা, অবয়বসমষ্টি ভিন্ন অবয়বী আছে, অবয়বের প্রত্যক্ষ হইলে তাহারও প্রত্যক্ষ জন্মে এবং পূর্বোক্ত প্রকারে তাহা জন্মিতে পারে, সুতরাং তাহার অসুমান স্বীকার নিস্রয়োজন এবং উহার প্রত্যক্ষের অপরাধ করিয়া অসুমান স্বীকারের কোন যুক্তি নাই।

ভাব্য। অকুৎস্রগ্রহণাদিতি চেৎ<sup>১</sup> ন, কারণতোহন্ত্যশ্চৈকদেশস্তা-  
ভাব্যঃ। \* ন চাবয়বাঃ কুৎস্রা গৃহ্যন্তে, অবয়বৈরেবাবয়বাস্তরব্যবধানাৎ  
নাবয়বী কুৎস্রো গৃহ্যত ইতি। নায়ং গৃহ্যমাণেষবয়বেষু পরিসমাপ্ত ইতি  
সেয়েমেকদেশোপলব্ধিরনিবৃত্তেবেতি।

১। অকুৎস্রভাব্য অকুৎস্রগ্রহণাদিতি চেৎ। উত্তরভাব্যঃ ন কারণত ইতি, দেশবিশেষঃ ন চাবয়বা ইতি। এক-  
দেশগ্রহণনিবৃত্তার্থঃ ইতি স্বয়ংবয়বগ্রহণমাবীহতে, ন চৈতাব্যতা কুৎস্রগ্রহণমভব্যে। যত একদেশগ্রহণনিবৃত্তিঃ স্তাৎ।  
ন অবয়বগ্রহণে কুৎস্রগ্রহণাবয়বী সূচীতা ভবন্তি। নাপাবয়বী, তত্কার্যগ্ৰহণস্ত গ্রহণংপি সম্যগপরাধং তত্কার্যগ্রহণাদিতি  
বেদ্যভাব্যঃ।—ভাষ্যপরিচয়ঃ।

\* কৃৎস্নমিতি<sup>১</sup> বৈ খলশেষতায় সত্যং ভবতি, অকৃৎস্নমিতি শেষে সতি, তচ্চৈতদবয়বেণ বহুত্বস্তি অব্যবধানে গ্রহণাদব্যবধানে চাগ্রহণাদিতি । অঙ্গ তু ভবান্ পূৰ্ণো ব্যাচক্ষীঃ গৃহমাণস্তাবয়বিনঃ। কিমগ্রহীতং মন্যতে, যেনৈকদেশোপলব্ধিঃ স্যাদিতি । ন হ্যস্ত কারণেত্যোহস্তে একদেশো ভবন্তীতি তত্রাবয়ববিস্তৃতং নোপপদ্যত ইতি । ইদং তস্মৈ বৃত্তং, যেমামিন্দ্রিয়-সম্বন্ধকর্বাদগ্রহণমবয়বানাং তৈঃ সহ গৃহ্যতে, যেমামবয়বানাং ব্যবধানাদ-গ্রহণং তৈঃ সহ ন গৃহ্যতে । ন চৈতৎ কৃতোহস্তি ভেদ ইতি ।

\* সমুদায়শেষতা বা<sup>২</sup> সমুদায়ো বৃক্ষঃ স্যাৎ তৎপ্রাপ্তিকর্বা, উভয়থা গ্রহণাভাবঃ । মূলস্বকক্ষাখাপলাশাদীনামশেষতা বা সমুদায়ো বৃক্ষ ইতি স্যাৎ প্রাপ্তিকর্বা সমুদায়িনামিতি উভয়থা সমুদায়ভূতস্য বৃক্ষস্য গ্রহণং নোপপদ্যত ইতি । অবয়বৈস্তাবদবয়বান্তরস্য ব্যবধানাদশেষগ্রহণং নোপপদ্যতে, প্রাপ্তিগ্রহণমপি নোপপদ্যতে, প্রাপ্তিমতামগ্রহণং । সেয়মেকদেশ-গ্রহণসহচরিতা বৃক্ষবুদ্ধির্জ্যেষ্ঠান্তরোৎপত্তৌ বদ্যতে ন সমুদায়মাত্রে ইতি ।

অনুবাদ । ( পূর্বপক্ষ ) অসমস্ত গ্রহণ বশতঃ ইহা যদি বল, অর্থাৎ অবয়ব বা অবয়বী সমস্ত গৃহীত হয় না, উহাদিগের অংশবিশেষই গৃহীত হয়, এ' জন্য অবয়বীর উপলব্ধি হয়, এ কথা বলা যায় না, ইহা যদি বল ? ( উত্তর ) না, অর্থাৎ তাহা বলিতে পার না, যেহেতু কারণ হইতে ভিন্ন একদেশ ( অবয়ব ) নাই অর্থাৎ অবয়বী স্রব্যের একদেশ বা অবয়বগুলি তাহার কারণ ভিন্ন আর কিছুই নহে । ( পূর্বপক্ষ-ভাষ্যের বিশদার্থ এই যে ) \* অবয়বগুলি সমস্ত গৃহীত ( প্রত্যক্ষ ) হয় না ; কারণ, অবয়বগুলির দ্বারাই অবয়বান্তরের ব্যবধান থাকে, অর্থাৎ দৃশ্যমান অবয়বসমূহের দ্বারাই যখন অন্যান্য অবয়বগুলি ব্যবহৃত বা আবৃত থাকে, তখন সমস্ত অবয়বের প্রত্যক্ষ অসম্ভব । ( এবং ) অবয়বীও সমস্ত গৃহীত হয় না ; ( কারণ ) এই অবয়বী গৃহ্যমাণ অবয়বগুলিতে পরিসমাপ্ত নহে [ অর্থাৎ সিকান্তবাদীর মস্তক অবয়বী যখন দৃশ্যমান অবয়বগুলিতেই পরিসমাপ্ত হইয়া থাকে না, ব্যবহৃত

১। উত্তরভাষ্যবিবরণপত্র ভাষ্যে কৃৎস্নমিতি বৈ খলিভ্যাদি। তদেকগ্রন্থতয়া অঙ্গ তু ভবান্ ইত্যাদি সর্বো-  
ন্যেপলক্ষ্যঃ ভাষ্যে ব্যবহৃতঃ :—ভাষ্যপটীকা।

২। স্বঃ পুনর্ভুক্ততঃ অবয়বসমূহায় এবাবয়বীতি তা গ্রহণে ভাষ্যকারঃ সমুদায়শেষতেন্ভ্যাদি ভগবঃ।—



অবয়বগুলিতেও থাকে, তখন সমস্ত অবয়বী প্রত্যক্ষ হইতে পারে না, একদেশেরই প্রত্যক্ষ হয় ] ; ( তাহা হইলে ) সেই এই অর্থাৎ পূর্বপক্ষবাদীর সমস্ত পূর্বোক্ত একদেশের উপলক্ষি ( একদেশমাত্রেরই প্রত্যক্ষ ) অনিবৃত্তই থাকিল অর্থাৎ ঐ পূর্বপক্ষের নিবৃত্তি বা নিরাস হইল না ।

উক্ত-ভাষ্যের বিশদার্থ এই যে, যেহেতু “কৃত্ত্ব” অর্থাৎ “সমস্ত” এই কথাটি অশেষতা থাকিলে হয়, অর্থাৎ অনেক বস্তুর অশেষতা বুঝাইতেই “কৃত্ত্ব”, “সমস্ত” ইত্যাদি শব্দের প্রয়োগ হয় । “অকৃত্ত্ব” এই কথাটি শেষ থাকিলে হয় অর্থাৎ অনেক বস্তুর শেষ বুঝাইতেই “অকৃত্ত্ব”, “অসমস্ত” ইত্যাদি শব্দের প্রয়োগ হয় । সেই ইহা অর্থাৎ পূর্বপক্ষবাদীর উক্ত অকৃত্ত্ব গ্রহণ ( অসমস্ত প্রত্যক্ষ ) বহু অবয়বে আছে ; কারণ, অব্যবধান থাকিলে ( তাহাদিগের ) গ্রহণ হয়, ব্যবধান থাকিলে গ্রহণ হয় না [ অর্থাৎ যে বস্তু অনেক, তাহারই অশেষতা বুঝাইতে “কৃত্ত্ব” শব্দ এবং তাহারই শেষ বুঝাইতে “অকৃত্ত্ব” শব্দ প্রযুক্ত হয় এবং তাহারই কৃত্ত্ব গ্রহণ ও অকৃত্ত্ব-গ্রহণ সম্ভব হয় । অবয়বগুলি অনেক বা বহু পদার্থ, তাহার অকৃত্ত্ব গ্রহণ হইয়া থাকে । ব্যবহিত অবয়বগুলির প্রত্যক্ষ হয় না, অব্যবহিত অবয়বগুলির প্রত্যক্ষ হয় । সুতরাং অবয়বগুলির মধ্যে ব্যবহিত অবয়বগুলি অগৃহীত থাকে, ইহা স্বীকার্য্য ] । কিন্তু, আপনি জিজ্ঞাসিত হইয়া বলুন, গৃহ্যমাণ অবয়বীর সম্বন্ধে কাহাকে অগৃহীত মনে করিতেছেন ? যে ক্ষণ একদেশের উপলক্ষি হইবে ? ( অর্থাৎ অবয়বীর সম্বন্ধে কিসের অনুপলক্ষিবশতঃ অবয়বীর অনুপলক্ষি স্বীকার করিয়া, একদেশেরই উপলক্ষি স্বীকার করিতেছেন ? একদেশরূপ অবয়ব-বিশেষের অনুপলক্ষিতে অবয়বীর অনুপলক্ষি বলা যায় না ) যেহেতু এই অবয়বীর কারণ হইতে ভিন্ন একদেশ নাই ( অর্থাৎ উহার কারণগুলিকেই একদেশ বলা হয় ) এ ক্ষণ সেই একদেশে অবয়বীর স্বভাব উপপন্ন হয় না<sup>১</sup> । সেই অবয়বীর স্বভাব এই, ইন্দ্রিয়-সম্বন্ধবশতঃ যে অবয়বগুলির গ্রহণ ( প্রত্যক্ষ ) হয়, সেই অবয়বগুলির সহিত ( অবয়বী ) গৃহীত হয়, ব্যবধানবশতঃ যে অবয়বগুলির গ্রহণ হয় না, তাহাদিগের সহিত-গৃহীত হয় না । “এতৎকৃত্ত্ব” অর্থাৎ অবয়বগুলির গ্রহণ ও

১। ঘটনিক ভাষ্য-পুস্তকে “অবয়ববৃত্তঃ স্যোপপন্নতে” এইরূপ পাঠ আছে । সেই অবয়বীতে অথবা তাহা হইলে— অবয়বের স্বভাব উপপন্ন হয় না, এইরূপ অর্থ ঐ পাঠ-পক্ষে বুঝা যায় । কিন্তু ভাষ্যকার ঐ কথা বলিয়াই অবয়বীর স্বভাব বর্ণন করার বুঝা যায় যে, একদেশ হইতে অবয়বী পৃথক পদার্থ, একদেশরূপ অবয়বে অবয়বীর স্বভাব নাই । সুতরাং “অবয়ববৃত্তঃ” এইরূপ পাঠই প্রকৃত বলিয়া মনে হইয়ায়, যুগে ঐরূপ-পাঠই গৃহীত হইয়াছে ।



অগ্রহণ-প্রযুক্ত (অবয়বীর) ভেদ হয় না [ অর্থাৎ অবয়বী হইতে অবয়বগুলি পৃথক্ পদার্থ এবং উহা অনেক বা বহু, উহাদিগের মধ্যে কাহারও গ্রহণ ও কাহারও অগ্রহণ হইতে পারে, তৎপ্রযুক্ত গৃহীত ও অগৃহীত অবয়বগুলির পরস্পর ভেদ নির্ণয় হইলেও অবয়বীর ভেদ নির্ণয় হয় না, সর্বাবয়ব-সম্বন্ধ অবয়বী এক; তাহা কুৎসৃতও নহে, একদেশও নহে। তাহার উপলব্ধি হইলে আর তাহার অনুপলব্ধি কলা যায় না ]। (বৌদ্ধ-সম্প্রদায় অবয়ব-সমষ্টিকেই অবয়বী বলিয়া মানিতেন, তাহাদিগের মত বণ্ডনের জ্ঞাত ভাষ্যকার বলিতেছেন)। \* সমুদায়ীগুলির অশেষতারূপ সমুদায় অর্থাৎ অবয়বগুলির অশেষ ব্যাপ্তিরূপ সমষ্টি বৃক্ষ হইবে? অথবা তাহাদিগের (অবয়ব-ব্যাপ্তিরূপ সমুদায়ীগুলির) প্রাপ্তি অর্থাৎ পরস্পর বিলক্ষণ সংযোগ বৃক্ষ হইবে? উভয় প্রকারে অর্থাৎ উভয় পক্ষেই গ্রহণ (বৃক্ষ-জ্ঞান) হয় না। বিশদার্থ এই যে, মূল, কন্ধ, শাখা-পত্রাদির অশেষতারূপ সমুদায় (সমষ্টি) বৃক্ষ, ইহা হইবে? অথবা সমুদায়ীগুলির প্রাপ্তি অর্থাৎ শাখা-পত্রাদি অবয়বগুলির পরস্পর বিলক্ষণ সংযোগ বৃক্ষ, ইহা হইবে? উভয় প্রকারে অর্থাৎ ঐ পক্ষ-দ্বয়েই সমুদায়ভূত (অবয়ব-সমষ্টিরূপ) বৃক্ষের জ্ঞান উপপন্ন হয় না। (কারণ) অবয়বগুলির দ্বারা অর্থাৎ দৃশ্যমান অবয়বগুলির দ্বারা অল্প অবয়বের ব্যবধানপ্রযুক্ত অশেষ গ্রহণ উপপন্ন হয় না। প্রাপ্তির গ্রহণও অর্থাৎ অবয়ব-সমূহের পরস্পর বিলক্ষণ সংযোগের জ্ঞানও উপপন্ন হয় না। কারণ, প্রাপ্তিমান অর্থাৎ ঐ সংযোগের আধার সমস্ত অবয়বের জ্ঞান হয় না। একদেশ জ্ঞানের সহচরিত অর্থাৎ বৃক্ষের একাংশ প্রত্যক্ষের সমান-কর্তৃক ও সমানকালীন সেই এই বৃক্ষ-বুদ্ধি দ্রব্যান্তরের উৎপত্তি হইলে (অবয়বসমষ্টিকে বৃক্ষ নহে—বৃক্ষ নামে দ্রব্যান্তরই উৎপন্ন হয়, এই সিদ্ধান্ত স্বীকার করিলে) সম্ভব হয়, সমুদায়নাহ্নে অর্থাৎ অবয়ব-সমষ্টিমা ত্রে (বৃক্ষ-বুদ্ধি) সম্ভব হয় না।

টিপ্পনী। ভাষ্যকার পূর্বে বলিয়াছেন যে, অবয়বসমূহ ভিন্ন অবয়বী আছে। অবয়বের উপলব্ধিহলে সেই অবয়বীরও উপলব্ধি হয়। কিন্তু বাহ্যরা ইহা স্বীকার করেন নাই, বাহ্যরা অবয়বীর পৃথক্ অস্তিত্বই মানেন নাই, তাহাদিগের পূর্কপক্ষ নিরাস করিতে ভাষ্যকার এখানে তাহারও উল্লেখ করিয়াছেন। পরবর্তী অবয়ব-পরীক্ষা-প্রকরণে স্বত্রকার মহর্ষি নিজেও পূর্কপক্ষ নিরাস করিয়া অবয়বীর সাধন করিয়াছেন। এবং চতুর্থ অধ্যায়ের দ্বিতীয় আদিকে মহর্ষি দ্বিত্বভঙ্গ্যে এই বিচার করিয়া, সকল পূর্কপক্ষের নিরাস করিয়াছেন। যথাহানেই সে সকল কথা বিশদরূপে পাওয়া যাইবে। মহর্ষির চতুর্থোধ্যায়োক্ত পূর্কপক্ষ ও উহাদের আভাস দিবার



কল্পই ভাষ্যকার এখানে পূর্ণগণক বলিয়াছেন যে, তখন অবয়ব বা অবয়বীর অসমস্ত জ্ঞানই হয়—সমস্ত জ্ঞান হইতেই পারে না, তখন অবয়বী বলিয়া পৃথক্ একটি দ্রব্য সিদ্ধ হইতে পারে না। একদেশরূপ অবয়বেরই গ্রহণ হয়, হুতরাং অবয়বীর গ্রহণ সিদ্ধ করা যায় না। পূর্ণগণকবাদীর গুঢ় তাৎপর্য্য এই যে, একদেশমাত্রের গ্রহণ হয় না, ইহা প্রতিপন্ন করিতেই সিদ্ধান্তী অবয়বীর গ্রহণকে সিদ্ধান্ত করিতেছেন। কিন্তু তাহাতে ত অবয়বীর সমস্ত-গ্রহণ সিদ্ধান্তরূপে সম্ভব হইবে না; বাহ্যতে একদেশমাত্রেরই গ্রহণ হয়, এই সিদ্ধান্ত নিরস্ত হইয়া বাইবে। অবয়বীর জ্ঞান হইলেও দেখানে সমস্ত অবয়ব গৃহীত হয় না; অবয়বীও সমস্ত গৃহীত হয় না। পূর্ণভাগের প্রত্যেক হইলেও মধ্যভাগ ও পরভাগের প্রত্যেক হয় না। হুতরাং বাহ্যকে অবয়বীর গ্রহণ বলা হইতেছে, তাহা বস্ততঃ একদেশেরই গ্রহণ—একদেশের গ্রহণ ভিন্ন অবয়বীর কোন পৃথক্ গ্রহণ এবং তজ্জাত অবয়বীর পৃথক্ অস্তিত্ব-নিদ্ধি কোনরূপেই হইতে পারে না। উদ্যোক্তকর এই পূর্ণগণকের ব্যাখ্যা করিতে বলিয়াছেন যে, অবয়বীর উপলব্ধি হইতে পারে না; কারণ, অবয়ব হইতে পৃথক্ অবয়বী তাহার অবয়বে কোন প্রকারেই থাকিতে পারে না। সিদ্ধান্তীর মতে প্রত্যেক অবয়বেই অবয়বী দ্রব্য সমবায়-সম্বন্ধে থাকে। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, ঐ অবয়বী কি একটি অবয়বে সর্বাংশ লইয়াই থাকে? অথবা একদেশ লইয়া থাকে? একটি অবয়বে সর্বাংশ লইয়াই যদি অবয়বী থাকে, তবে আর অস্ত অবয়বগুলির প্রয়োজন কি? যদি কোন একটি অবয়বেই অবয়বী সর্বাংশ লইয়া থাকিতে পারে, তবে অস্ত অবয়বগুলি অবয়বীর কোন উপকারক না হওয়ার নিরর্থক। পরন্তু তাহা হইলে ঐ অবয়বী দ্রব্য একমাত্র দ্রব্যে সমবেত হইয়া উৎপন্ন হওয়ার, উহার আধারের অনেক দ্রব্যবত্তা না থাকায়, উহার চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। এবং তাহা হইলে ঐ অবয়বীর বিনাশ হইতে পারে না। কারণ, একটিমাত্র দ্রব্যই উহার কারণ দ্রব্য। একমাত্র দ্রব্যের বিভাগ অসম্ভব; হুতরাং কারণ দ্রব্যের বিভাগ হইতে না পারায় কার্যদ্রব্য অবয়বীর বিনাশ অসম্ভব। এবং একটিমাত্র অবয়বের দ্বারা অবয়বীর উৎপত্তি হইলে তাহার নহৎ পরিমাণ জন্মিতে পারে না। হুতরাং অবয়বী একটি অবয়বে সর্বাংশ লইয়া থাকে না—থাকিতে পারে না, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য। এইরূপ অবয়বী একাংশ লইয়াও একটি অবয়বে থাকে না। অর্থাৎ যেমন মালার গ্রহণ-হুত্ৰটি এক একটি অংশ লইয়া এক একটি অবয়বে থাকে, তরুণ অবয়বী তাহার এক একটি অংশ লইয়া এক একটি অবয়বে থাকে, ইহাও বলা যায় না। কারণ, যেগুলিকে অবয়বীর একদেশ বলা হয়, সেগুলি তাহার কারণ। অবয়বীর কারণ অবয়বগুলি ভিন্ন আর তাহার কোন একদেশ নাই। তাহা হইলে একাংশের উপলব্ধিহীন যে অবয়বীর উপলব্ধি হয় বলা হইতেছে, তাহা ঐ অংশবিশেষে অবয়বীর অংশ-বিশেষেরই উপলব্ধি বলিতে হইবে। তাহা হইলে বস্ততঃ একদেশেরই উপলব্ধি হয়, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। একদেশের উপলব্ধির নিয়ুত্তি বা নিরাস হইবে না। যদি অবয়বী দৃষ্টমান অবয়বগুলিতে পরিমাপ বা পর্য্যাপ্ত হইয়া থাকিত, অর্থাৎ যে অবয়বগুলির দর্শন হয়, সেই সমস্ত অবয়বগুলিতেই যদি অবয়বী পরিমাপ হইয়া থাকিত, অদৃষ্টমান বাবহিত অবয়বগুলিতে না

ধাক্কিত, তাহা হইলে কেবল একদেশমাত্রের উপলক্ষি না হইয়া, সম্পূর্ণ অবয়বীরও তাহাতে উপলক্ষি হইতে পারিত। কিন্তু অবয়বীকে ত দৃষ্টমান অবয়বগুলিতেই পরিসমাণ্ড বলা যাইবে না। তাহা হইলে অল্প অবয়বগুলি নিরর্থক হইয়া পড়ে, ইহা পূর্বেই বলিয়াছি। অশেষ অবয়বের উপলক্ষিও হইতে পারে না। কারণ, পূর্নভাগের দ্বারা মধ্যভাগ ও পরভাগ ব্যবহৃত থাকে। ফলকথা, অবয়বী প্রত্যেক অবয়বে অথবা কোন এক অবয়বে সর্বাংশ নহীয়া অর্থাৎ পরিসমাণ্ড হইয়া অবস্থান করে, অথবা একাংশ নহীয়া অবস্থান করে, ইহার কোন পক্ষই বর্ণন বলা যাইবে না, এই দুইটি পক্ষ ভিন্ন অল্প কোন প্রকার পক্ষও নাই, তখন অবয়বীর অবয়বে অবস্থান অসম্ভব; সুতরাং অবয়বের উপলক্ষি হলে অবয়বই অবয়বীরও উপলক্ষি হয়, এই সিদ্ধান্ত অযুক্ত। ভাষ্যকার “কৃত্ত্বমিতি বৈ বনু” ইত্যাদি ভাষ্য-সন্দর্ভের দ্বারা তাহার পূর্বোক্ত উত্তর-ভাষ্যের বিবরণ করিয়াছেন। ভাষ্যে “বৈ” শব্দটি পূর্বোক্ত পূর্বপক্ষের অযুক্ততা বোধের জন্য প্রযুক্ত হইয়াছে। “বনু” শব্দটি হেতুর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। অর্থাৎ পূর্বোক্ত পূর্বপক্ষ অযুক্ত, যেহেতু “কৃত্ত্বম” এই শব্দটি অনেক বস্তুর অশেষবোধক এবং “অকৃত্ত্বম” এই শব্দটি অনেক বস্তুর শেষ অর্থাৎ অংশবিশেষের বোধক। অবয়বগুলি অনেক বলিয়া তাহাতে কৃত্ত্বম ও অকৃত্ত্বম শব্দের প্রয়োগ করা যাইতে পারে। ব্যবহৃত অবয়বের গ্রহণ হয় না, অব্যবহিত অবয়বেরই গ্রহণ হয়, সুতরাং অবয়বের অকৃত্ত্বম গ্রহণ হয়, ইহা বলা যায়। কিন্তু অবয়বী এক, উহা অনেক পদার্থ নহে, সুতরাং উহাতে “কৃত্ত্বম” শব্দের এবং “একদেশ” শব্দের প্রয়োগই করা যায় না। সুতরাং উহাতে পূর্বোক্ত প্রকারে গ্রহণই হইতে পারে না। মহর্ষি চতুর্থ অধ্যায়ের দ্বিতীয় আধিক্যে একাদশ সূত্রের দ্বারা এই কথা বলিয়াই পূর্বোক্ত পূর্বপক্ষের নিরাস করিয়াছেন। উদ্যোতকর মহর্ষির সেই কথা অবলম্বন করিয়াই এখানে ভাষ্যকারের উত্তর-ভাষ্যের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। উদ্যোতকর বলিয়াছেন যে, একমাত্র বস্তুতে “কৃত্ত্বম” শব্দ ও “একদেশ” শব্দের প্রয়োগই অসম্ভব, সুতরাং পূর্বোক্ত গ্রহণই হইতে পারে না। “কৃত্ত্বম” শব্দ অনেক বস্তুর অশেষ বুঝায়। “একদেশ” শব্দও অনেক বস্তুর মধ্যেই কোন একটিকে বুঝায়। অবয়বী একমাত্র পদার্থ, সুতরাং উহা কৃত্ত্বমও নহে, একদেশও নহে; উহাতে “কৃত্ত্বম” শব্দের ও “একদেশ” শব্দের প্রয়োগই হয় না। অবয়বী আশ্রিত, অবয়ব-গুলি তাহার আশ্রয়; উহারা অশ্রয়াশ্রয়িতাবে থাকে। এক বস্তুর অনেক বস্তুতে আশ্রয়াশ্রিত ভাবরূপ সম্বন্ধ থাকিতে পারে। ফল কথা, অবয়বী স্বরূপেই অনন্বয়নমূহে থাকে, কৃত্ত্বমরূপে অথবা একদেশরূপে থাকে না। কারণ, অবয়বী একমাত্র বস্তু বলিয়া তাহা কৃত্ত্বমও নহে, একদেশও নহে। চতুর্থ অধ্যায়ে ইহা বিশদরূপে ব্যক্ত হইবে। অবয়বী বহন এক, তখন অবয়বীর উপলক্ষি হইলে তাহার কিছুই অস্থাপনক থাকে না। সুতরাং অবয়বীর উপলক্ষিকে একদেশের উপলক্ষি বলা যায় না। ভাষ্যকার এই কথা বুঝাইতে তাহার হেতু বলিয়াছেন যে, অবয়বীর কারণ ভিন্ন

১। চতুর্থ অধ্যায়ের দ্বিতীয় আধিক্যের প্রারম্ভে—“বিধাজ্ঞানং বৈ বনু মোহঃ” এই ভাষ্যের দ্বাৰা ভাষ্যকার বিধিযাছেন—“বৈ শব্দঃ বনু পূর্বপক্ষাকমারায় বনু শব্দো হেতুর্থে। অযুক্তঃ পূর্বপক্ষো বহুবিধাজ্ঞানঃ মোহ ইতি।”—এখানেও ইতিপূর্ব অর্থ সম্বন্ধ ও আশ্রয়ক।



আর কোন একদেশ নাই। তাহার উপাদান-কারণ অবয়বগুলিই তাহার একদেশ, অর্থাৎ অবয়বী নিজে একদেশ নহে, তাহার উপাদান-কারণ হইতে ভিন্ন আর কোন একদেশও নাই। সেই একদেশগুলিকেই অবয়বী বলে। তাহাতে অবয়বীর স্বভাব নাই। অবয়বীর স্বভাব এই যে, তাহা গৃহীত অবয়বগুলির সহিত গৃহীত হয়, অগৃহীত বা ব্যবহৃত অবয়বগুলির সহিত গৃহীত হয় না। কোন একদেশরূপ অবয়বের এইরূপ স্বভাব নাই। সুতরাং একদেশরূপ অবয়ব-গুলিকে অবয়বী বলা যায় না। সুতরাং কোন একদেশের অল্পপল্লি থাকিলেও অবয়বীর অল্পপল্লি বলা যায় না। যে একদেশগুলি অবয়বী হইতে বস্তুতঃ পৃথক্ পদার্থ, তাহাদিগের অল্পপল্লিতে অবয়বীর অল্পপল্লি হইবে কেন? একদেশদমূহে সমবেত অবয়বী একটি পৃথক্ জব্য, তাহার উপলব্ধি তাহারই উপলব্ধি। ঐ উপলব্ধি কোন একদেশের উপলব্ধির সহিত জড়িলেও, উহা একদেশের উপলব্ধি নহে। একদেশগুলির মধ্যেই কাহার গ্রহণ ও কাহার অগ্রহণ হয়; কারণ, সেগুলি ভিন্ন ভিন্ন অনেক পদার্থ। সেই একদেশের গ্রহণ ও অগ্রহণ প্রযুক্ত তাহাদিগের পরস্পর ভেদ সিদ্ধি হইলেও, তৎপ্রযুক্ত অবয়বীর ভেদ-সিদ্ধি হইতে পারে না। কারণ, অবয়বীর গ্রহণই হয়—অগ্রহণ হয় না। যাহা একমাত্র বস্তু, তাহার উপলব্ধি হইলে আর তাহার অল্পপল্লি বলা যায় না। অবশ্য সেখানে অবয়বীর কোন একদেশের অল্পপল্লি থাকে। কিন্তু তাহাতে অবয়বীর ভেদ বা অনেককি সিদ্ধি হইতে পারে না। একমাত্র বস্তুর উপলব্ধি হলেও অল্প বস্তুর অল্পপল্লি নইয়া ঐরূপ গ্রহণ ও অগ্রহণ দেখা যায়। যেমন কোন বীর খেলা ও উকীল মারণ করিয়া উপস্থিত হইলে, যদি কেহ খেলার সহিত তাহাকে দেখে, উকীলের সহিত না দেখে, অর্থাৎ তাহাকে উকীলযুক্ত না দেখিয়া খেলাবুত্বেই দেখে, তাহা হইলে সেখানে উকীলরূপ ত্রব্যাস্তর নইয়া ঐ বীরের গ্রহণ ও অগ্রহণ বলা যায়। কিন্তু তাহাতে কি ঐ বীর ব্যক্তির ভেদ সিদ্ধি হয়? ঐ বীর ব্যক্তি কি সেখানে একই ব্যক্তি নহে? এইরূপ অবয়বীর কোন অবয়বের অগ্রহণ হইলেও তাহাতে অবয়বীর ভেদ-সিদ্ধি হয় না। গৃহমাণ অবয়ববিশেষের সহিত গৃহীত হওয়াই অবয়বীর স্বভাব। সর্কীবয়বেই অবয়বী পরিসমাপ্ত হইয়া থাকে। সর্কীবয়বের গ্রহণ সম্ভব না হওয়ায় গৃহমাণ অবয়বেই অবয়বীর গ্রহণ হয়, তাহাতে কোন দোষের আশঙ্কি হয় না। বৌদ্ধ-নন্দাদির বলিতেন যে, বিলক্ষণ সংযোগবিশিষ্ট অবয়ব সমুদায় অর্থাৎ অবয়বসমষ্টিকেই অবয়বী বলে। অবয়ব-সমষ্টি ভিন্ন অবয়বী বলিয়া পৃথক্ কোন জব্য নাই। পরবর্তী অবয়ব-পরীক্ষা-প্রকরণে এই মতের বিশদ সমালোচনা ও খণ্ডন হইয়াছে। ভাস্কর্য্যকার এই প্রকরণের শেষে সংক্ষেপে ঐ মতের অল্পপল্লি প্রদর্শন করিতে বলিয়াছেন যে, সমুদায়ের অশেষভাৱূপ সমুদায়কে বৃক্ষ বলিলে, বৃক্ষ-বৃদ্ধি হইতে পারে না। সমুদায়ীগুলির আশ্রি অর্থাৎ বিলক্ষণ সংযোগকে বৃক্ষ বলিলেও বৃক্ষ-বৃদ্ধি হইতে পারে না। ভাস্কর্য্যকার শেষে তাহার ঐই কথাটির বিবরণ করিয়া বলিয়াছেন যে, মূল, ডাল, শাখা, পত্র প্রভৃতি যে সমুদায়ী, তাহার অশেষতা অর্থাৎ সমষ্টিরূপ যে সমুদায়, সেই সমুদায়ভূত বৃক্ষের উপলব্ধি হইতে পারে না। কারণ, কতকগুলি অবয়বের দ্বারা তন্ত্রিত অবয়বের ব্যাপান থাকায়, অশেষ অবয়বের গ্রহণ হইতে পারে না। অশেষ অবয়ব বা

অবয়ব-সমষ্টিই বৃক্ষ হইলে তাহার প্রত্যক্ষ হওয়া অসম্ভব। এবং ঐ অবয়বগুলির পরস্পর প্রাপ্তি অর্থাৎ বিলক্ষণ সংযোগেরও উপলব্ধি হইতে পারে না। কারণ, অবয়ব-সমষ্টিই ঐ সংযোগের আধার; তাহাদিগের উপলব্ধি ব্যতীত ঐ সংযোগের উপলব্ধি অসম্ভব। এই পদার্থ এই পদার্থের সহিত সংযুক্ত, এইরূপেই সংযোগের উপলব্ধি হইয়া থাকে। সুতরাং সংযোগের আশ্রয়গুলিকে প্রত্যক্ষ করিতে না পারিলে, সংযোগের প্রত্যক্ষও সেখানে সম্ভব হইবে না। তাহা হইলে অবয়বগুলির সংযোগকে বৃক্ষ বলিলে, সে পক্ষেও বৃক্ষ-বৃদ্ধি হওয়া অসম্ভব। বৃক্ষের একদেশ গ্রহণ হইলে তখন বৃক্ষ-বৃদ্ধি কিন্তু সকলেরই হইতেছে। কোন সম্প্রদায়ই ঐ বৃদ্ধির অঙ্গলাপ করিতে পারেন না। অবয়ব-সমষ্টি হইতে পৃথক বৃক্ষ নামে একটি দ্রব্যাস্তর উৎপন্ন হয়, এই মত স্বীকার করিলেই ঐ বৃদ্ধি উপপর হইতে পারে। অবয়বসমূহই বৃক্ষ, এই মতে উহা উপপর হইতে পারে না। বৌদ্ধ-সম্প্রদায় পরমাণুবিশেষের সমষ্টিকেই অবয়বী বলিতেন। সে সকল কথা ভাষ্যকার পরে বলিয়াছেন। ভাষ্যে “সমুদায়শেষতা বা সমুদায়ঃ” ইহাই প্রকৃত পাঠ। “সমুদায়ী” বলিতে ব্যষ্টি, “সমুদায়” বলিতে সমূহ বা সমষ্টি। যাহার সমুদায় বা সমষ্টি আছে, এই অর্থে ব্যষ্টিকে “সমুদায়ী” বলা যায়। ঐ সমুদায়ীর অশেষতাকে সমুদায় বলিলে বৃক্ষা যায়, অশেষ সমুদায়ী অর্থাৎ সমস্ত ব্যষ্টিগুলিই সমুদায়। এক একটি ব্যষ্টিকে “সমুদায়” বলা যায় না—সমষ্টিই সমুদায় ॥৩২॥

প্রত্যক্ষ-পরীক্ষা-প্রকরণ সমাপ্ত ॥ ৩ ॥

— ০ —

## সূত্র। সাধ্যত্বাদবয়বিনি সন্দেহঃ ॥৩৩॥৯৪॥

অনুবাদ। সাধ্যবশতঃ (অর্থাৎ অবয়বী সর্ববিধতে সিদ্ধ নহে, এ জন্য উহাতে বিপ্রতিপত্তিপ্রযুক্ত) অবয়বী বিষয়ে সন্দেহ।

ভাষ্য। যদুক্তমবয়বিসদৃশাদিত্যয়মহেতুঃ, সাধ্যত্বাৎ, সাধ্যং তাবদেতৎ, কারণেভ্যো দ্রব্যাস্তরমুৎপদ্যত ইতি। অনুপপাদিতমেতৎ। এবং সতি বিপ্রতিপত্তিমাাত্রং ভবতি, বিপ্রতিপত্তেচ্চাবয়বিনি সংশয় ইতি।

অনুবাদ। “অবয়বিসদৃশত্বাৎ” এই যে কথা বলা হইয়াছে অর্থাৎ ঐ কথার দ্বারা যে হেতু বলা হইয়াছে, ইহা অহেতু অর্থাৎ উহা হেতু হয় না—উহা হেতুভাস। যেহেতু (অবয়বীতে) সাধ্যত্ব আছে। বিশদার্থ এই যে, কারণসমূহ হইতে দ্রব্যাস্তর উৎপন্ন হয়—ইহা সাধ্য, ইহা অনুপপাদিত। [অর্থাৎ কারণদ্রব্য অবয়বগুলি হইতে অবয়বী বলিয়া একটি পৃথক দ্রব্য উৎপন্ন হয়, ইহা সাধন করিতে, হইবে; উহা প্রতিবাদীর যুক্তি খণ্ডন করিয়া উপপাদন করা হয় নাই। সুতরাং



পূর্বোক্ত হেতু সাধ্য বলিয়া হেতু হইতে পারে না ]। এইরূপ হইলে অর্থাৎ অবয়বী প্রতিবাদীদিগের মতে অসিদ্ধ হইলে বিপ্রতিপত্তি মাত্র হয়। বিপ্রতিপত্তি প্রযুক্তই অবয়ববিষয়ে সংশয় হয়।

টিপ্পনী। পূর্বে বলা হইয়াছে যে, একদেশনারের উপলব্ধি হয় না, যে হেতু অবয়বীর অস্তিত্ব আছে। একদেশরূপ অবয়ব হইতে তির অবয়বী আছে বলিয়া তাহারও উপলব্ধি হয়। কিন্তু ঐ অবয়ববিষয়ে যদি বিপ্রতিপত্তিপ্রযুক্ত সংশয় হয়, তাহা হইলে অবয়বীর সম্ভাব (অস্তিত্ব) সন্দিগ্ধ হওয়ার, উহা হেতু হইতে পারে না। পূর্বোক্ত ঐ হেতু সন্দিগ্ধাসিদ্ধ। মহর্ষি এই শূন্নের দ্বারা তাহাই হুচনা করিয়াছেন। অবয়ব হইতে পৃথক অবয়বীর সাধনই মহর্ষির এই প্রকরণের প্রয়োজন। অবয়ব হইতে পৃথক অবয়বীর অস্তিত্ব সিদ্ধ হইলে পূর্বোক্ত “অবয়বিসম্ভাব্য”রূপ হেতু নির্দোষ হইতে পারে। তাহা হইলে উহা হেত্বাত্মক হয় না—প্রকৃত হেতুই হয়। “অবয়বিসম্ভাব্য” এই বাক্য মহর্ষির কণ্ঠোক্ত হইলে, ঐ হেতু সাধনের জন্য উপোদ্বাস্ত-সংগতিতেই মহর্ষির এই প্রকরণারম্ভ বলা যায়। বৃত্তিকার প্রভৃতি নব্যগণ তাহাই বলিয়াছেন। এই শূন্নে “বহুস্তং” ইত্যাদি ভাষা পাঠ করিলেও তাহাই মনে আসে। “অবয়বিসম্ভাব্য” এই কথা মহর্ষি পূর্বে নিজেই বলিয়াছেন, ইহাই ভাষ্যকারের ঐ কথায় সহজে বুঝা যায়। কিন্তু ভাষ্য-শ্রুতী-নিবন্ধ, জায়বান্তিক ও তাৎপর্য্যটীকার কথা অনুসারে যখন পূর্বোক্ত প্রকার ব্যাখ্যা করা যাইবে না, তখন ঐ মতে বুঝিতে ও ব্যাখ্যা করিতে হইবে যে, ভাষ্যকারের নিজেরই পূর্বোক্ত “অবয়বিসম্ভাব্য” এই কথা মহর্ষির কণ্ঠোক্ত না হইলেও উহা মহর্ষির বুদ্ধিই ছিল। মহর্ষি ঐ বুদ্ধিই হেতুকে গ্রহণ করিয়াই উহার সিদ্ধতা সমর্থনোদ্দেশ্যে এই প্রকরণারম্ভ করিয়াছেন। অর্থাৎ প্রসঙ্গ-সংগতিতেই মহর্ষির এই প্রকরণারম্ভ। ভাষ্য-শ্রুতী-নিবন্ধেও এই প্রকরণকে প্রাসঙ্গিক বলা হইয়াছে। তাহা হইলে এই শূন্নে “বহুস্তং” ইত্যাদি ভাষ্যের অর্থ বুঝিতে হইবে যে, আমি (ভাষ্যকার) যে “অবয়বিসম্ভাব্য” এই কথা বলিয়াছি (যাহা মহর্ষি না বলিলেও তাহার বুদ্ধিই ছিল) অর্থাৎ আমার পূর্বোক্ত ঐ বাক্য-প্রতিপাদ্য যে হেতু, তাহা হেতু হয় না—উহা হেত্বাত্মক, উহা হেতু না হইলে, উহার দ্বারা পূর্বে যে সাধ্যসাধন করিয়াছি, তাহা হয় না। মহর্ষি, শূন্নের দ্বারা পূর্বোক্ত প্রকারে সাধ্যসাধন প্রদর্শন না করিলেও পূর্বোক্ত প্রকার অনুমান-প্রমাণ তাহারও বুদ্ধিত, স্মরণে ঐ অনুমান-প্রমাণের হেতু সাধন করা তাহারও কর্তব্য, তাই অবয়বীর সাধন করিয়া তাহাও করিয়াছেন। ভাষ্যকারের পূর্বোক্ত “ন চৈকদেশোপলব্ধিরবয়বিসম্ভাব্য” এই বাক্যের দ্বারা একদেশ অর্থাৎ অবয়ব-বিষয়ক উপলব্ধি কেবল অবয়ব-বিষয়ক নহে, যেহেতু ঐ উপলব্ধিতে বিধিগিতা-সম্বন্ধে অবয়বীর সম্ভাব আছে, এইরূপ অনুমান-প্রণালীই হুচিৎ হইয়াছে। অবয়ব-বিষয়ক উপলব্ধিতে বিধিগিতা-সম্বন্ধে অবয়বীকে হেতু করিলে, ঐ অবয়ব-বিষয়ে সন্দেহ সমর্থন করিয়া, উহাকে সন্দিগ্ধাসিদ্ধ বলা যায়, মহর্ষির এই শূন্নে তাহাই মূল বক্তব্য। অর্থাৎ অবয়বী বলিয়া পৃথক সব্য যখন বিবাদের বিষয়, উহাকে বিপ্রতিপত্তি আছে, তখন উহা সন্দিগ্ধ, স্মরণে উহা হেতু

হইতে পারে না, মহর্ষি এই স্বত্রের দ্বারা এই পূৰ্বপক্ষের অবতারণা করিয়া পরবর্তী সিদ্ধান্ত-স্বত্রের দ্বারা এই পূৰ্বপক্ষের নিরাস করিয়াছেন।

মহর্ষির এই বর্ণাশ্রিত স্বত্রের দ্বারা বুঝা যায়, “সাধ্যত্বপ্রযুক্ত অবয়ব-বিষয়ে সন্দেহ”। কিন্তু সাধ্যত্ব সাক্ষাৎসম্বন্ধে সংশয়ের প্রয়োজক হয় না। তাহা হইলে পূৰ্ব্বতাদি স্থানে বহি প্রভৃতি সাধ্য হইলে, সেখানেও বহি প্রভৃতি পদার্থ বিষয়ে সংশয় হইত। যদি সাধ্য বলিয়া বুঝিলেই সেই পদার্থ আছে কি না, এইরূপ সংশয় জন্মে, তাহা হইলে বহি প্রভৃতি পদার্থ বিষয়েও ঐরূপ সংশয় জন্মে না কেন? বহি প্রভৃতি পদার্থ পূৰ্ব্বতাদি স্থানে সাধ্য বা সন্দিগ্ধ হইলেও অন্ততঃসিদ্ধ পদার্থ। স্থানবিশেষে উহাদিগের সাধ্যতা জ্ঞান থাকিলেও নামান্তর; ঐ সকল পদার্থ-বিষয়ে সংশয় জন্মে না। এইরূপ সাধ্যত্বপ্রযুক্ত অবয়ব-বিষয়েও সংশয় জন্মিতে পারে না। ভাষ্যকার এই অল্পপন্থি চিন্তা করিয়াই স্বত্রার্ণ বর্ণন করিয়াছেন যে, পূৰ্বে যে অবয়বিসম্বন্ধকে হেতু বলিয়াছি, তাহা অহেতু; যেহেতু তাহা সাধ্য। অবয়বরূপ কাৰণগুলি হইতে “অবয়ব”রূপ ভব্যাস্তর উৎপন্ন হয়, ইহা সাধ্য। সাধ্য কি, ইহা বুঝাইতে শেবে তাহার স্পষ্ট ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, ইহা অল্পপন্থিত। অর্থাৎ অবয়বী বলিয়া যে ভব্যাস্তর উৎপন্ন হয়, ইহা অনেকে স্বীকার করেন না। যাহারা উহা মানেন না, তাহাদিগের মত খণ্ডন করিয়া উহা উপপাদন করিতে হইবে। তাহা যখন করা হয় নাই, তখন উহা হেতু হইতে পারে না। সিদ্ধ পদার্থই হেতু হইতে পারে; বাহ্য সিদ্ধ নহে, সাধ্য—তাহা হেতু হইতে পারে না (১অ০, ২আ০, ৮ স্বত্র দ্রষ্টব্য)। এই ভাবে স্বত্রার্ণ ব্যাখ্যা করিলে মহর্ষির “সাধ্যত্বপ্রযুক্ত অবয়ব-বিষয়ে সন্দেহ”, এই কথা কিরূপে সংগত হয়? তাই ভাষ্যকার শেবে উহার সংগতি করিতে বলিয়াছেন,—“এবং সতি” ইত্যাদি। ভাষ্যকারের ঐ কথার তাৎপৰ্য্য এই যে, এইরূপ হইলে অর্থাৎ অবয়ব হইতে পৃথক অবয়বী অল্প সম্প্রদায়ের অসিদ্ধ হইলে, অবয়ব-বিষয়ে বিপ্রতিপত্তিমাত্র হয়। বিপ্রতিপত্তিপ্রযুক্ত তদ্বিষয়ে সন্দেহ হয়। ভাষ্যকারের গূঢ় তাৎপৰ্য্য এই যে, অবয়ব-বিষয়ে সন্দেহে বিপ্রতিপত্তিই সাক্ষাৎ প্রয়োজক। স্বত্রোক্ত সাধ্যত্ব পরস্পরায় প্রয়োজক। অবয়বী সাধ্য হইলে অর্থাৎ সর্গসিদ্ধ না হইয়া সম্প্রদায়বিশেষের দ্বারা অসিদ্ধ হইলে “অবয়বী আছে” এবং “অবয়বী নাই,” এইরূপ বিবাদার্ণ-প্রতিপাদক বাক্যদ্বয়রূপ বিপ্রতিপত্তি পাওয়া বাইবে, তৎপ্রযুক্ত অবয়ব-বিষয়ে সংশয় জন্মিবে। তাহার ফলে পূৰ্ব্বোক্ত অবয়বিরূপ হেতু সন্দিগ্ধাসিদ্ধ হইয়া বাইবে, ইহাই মহর্ষির চরমে বিবক্ষিত। বিপ্রতিপত্তিপ্রযুক্ত সংশয়ের কথা প্রথম অধ্যায়ে সংশয়-স্বত্রে এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ে সংশয়-পরীক্ষা-প্রকরণে দ্রষ্টব্য।

বৃত্তিকার বিখ্যাত প্রভৃতি এখানে “দ্রব্যত্বং অণুত্বাখ্যাপ্যং ন বা” অথবা “স্পর্শবত্বং অণুত্বাখ্যাপ্যং ন বা” ইত্যাদি প্রকার বিপ্রতিপত্তি-বাক্য প্রদর্শন করিয়াছেন। যাহারা ভব্যাস্তরকেই পরমাণু ভিন্ন অতিরিক্ত পদার্থ বলেন না, তাহাদিগের মতে দ্রব্যত্ব অণুত্বের ব্যাপ্য। দ্রব্যমাত্রই কোন মতেই পরমাণুরূপ নহে। নিজের স্পর্শহীন আকাশাদি পরমাণুরূপ হইতেই পারে না, ইহা মনে করিয়া বৃত্তিকার কল্মাঙ্করে “স্পর্শবত্বং অণুত্বাখ্যাপ্যং ন বা” এইরূপ বিপ্রতিপত্তি-বাক্য প্রদর্শন করিয়াছেন।



স্পর্শবান্‌ দ্বিত্তি, জল, তেজঃ, বায়ু, এই চারিটি দ্রব্যেরই পরমাণু আছে। ঐ পরমাণুরূপ উপাদান-কারণের দ্বারা কণুকাদিক্রমে দ্বিত্তি, জল, তেজঃ ও বায়ু নামক অবয়বী দ্রব্যান্তরের সৃষ্টি হইয়াছে, ইহা জ্ঞান ও বৈশেষিকের সিদ্ধান্ত। বৌদ্ধ সম্প্রদায়বিশেষ ঐ পরমাণুসমষ্টি ভিন্ন পৃথক্ অবয়বী নানেন নাই, সুতরাং তাহাদিগের মতে স্পর্শবান্‌ বস্তুদ্বয়ই অণু, সুতরাং তাহার স্পর্শ-বস্তুকে অণুত্বের ব্যাপ্য বলিতে পারেন। যে পদার্থে স্পর্শবস্তু আছে, সেই সমস্ত পদার্থেই অণুত্ব থাকিলে স্পর্শবস্তু অণুত্বের ব্যাপ্য হয়। যে পদার্থের সমস্ত আধারেই যে পদার্থ থাকে, সেই প্রথমোক্ত পদার্থকে শেযোক্ত পদার্থের ব্যাপ্য বলে। যেমন বিশিষ্ট ধূম বহির ব্যাপ্য। নৈয়ায়িক প্রভৃতির মতে পরমাণু হইতে পৃথক্ অবয়বী আছে, দেগুলি পরমাণুসমষ্টি নহে, সুতরাং তাহাতে স্পর্শবস্তু থাকিলেও অণুত্ব নাই, এ জন্ত তাহাদিগের মতে স্পর্শবস্তু অণুত্বের ব্যাপ্য নহে। তাহা হইলে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের বাক্য হইল “স্পর্শবস্তু অণুত্বের ব্যাপ্য।” নৈয়ায়িকের বাক্য হইল “স্পর্শবস্তু অণুত্বের ব্যাপ্য নহে।” ভাষ্যকারের মতে বিরুদ্ধার্থ-প্রতিপাদক বাক্যদ্বয়ই বিপ্রতিপত্তি। সুতরাং তাহার মতে এখানে পূর্বোক্ত বাক্যদ্বয়কে বিপ্রতিপত্তিক্রমে গ্রহণ করা যাইতে পারে।

বৃত্তিকার পূর্বোক্ত বৌদ্ধমতের যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন যে, বুদ্ধাদি পদার্থে বহন সঙ্কল্প, অকল্প, রক্তত্ব অরক্তত্ব, আবৃত্ত অন্নাবৃত্ত ইত্যাদি বহু বিরুদ্ধ পদার্থ দেখা যায়, তখন বুদ্ধাদি একমাত্র পদার্থ নহে। বুদ্ধের শাবা-প্রদেশে কল্প দেখা যায়। মূল-দেশে কল্প থাকে না। এইরূপ বুদ্ধ কোন প্রদেশে রক্ত, কোন প্রদেশে অরক্ত, কোন প্রদেশে আবৃত্ত, কোন প্রদেশে অন্নাবৃত্ত দেখা যায়। বুদ্ধ একমাত্র পদার্থ হইলে তাহাতে কোনরূপেই সঙ্কল্প অকল্প প্রভৃতি পূর্বোক্ত বিরুদ্ধ দ্বন্দ্ব থাকিতে পারে না। বিরুদ্ধ দ্বন্দ্বের অধ্যাসবশতঃ বস্তুর ভেদ সিদ্ধ হয়, ইহা সর্বসম্মত। গোহ ও অগ্নয় বিরুদ্ধ দ্বন্দ্ব, উহা একাধারে থাকিতে পারে না; এ জন্ত গো এবং অগ্নি ভিন্ন পদার্থ বলিয়াই সিদ্ধ হইয়াছে। সুতরাং বুদ্ধও নানা পদার্থ, বিলক্ষণ-সংযোগ-বিশিষ্ট কতকগুলি অবয়বই বুদ্ধ, ইহা অবশ্য স্বীকার্য। অর্থাৎ কতকগুলি পরমাণুবিশেষের সমষ্টিই বুদ্ধ। তাহা হইলে বুদ্ধ এক পদার্থ না হওয়ার উহাতে সঙ্কল্প অকল্প প্রভৃতি পূর্বোক্ত বিরুদ্ধ দ্বন্দ্বের অধ্যাস থাকিল না। বিলক্ষণ-সংযুক্ত যে সকল পরমাণুকে বুদ্ধ বলা হয়, তন্মধ্যে কতকগুলি পরমাণুতে কল্প এবং তদন্তরিত কতকগুলি পরমাণুতে কল্পের অভাব থাকায় এক বস্তুতে বিরুদ্ধ দ্বন্দ্বের আগতির কারণ থাকিল না। ফলকথা, পূর্বোক্ত প্রকার যুক্তিতেই বুদ্ধাদি পদার্থ যে নানা, উহা অবয়বী নামে পৃথক্ কোন দ্রব্য নহে, উহা পরমাণুরূপ অবয়বসমষ্টি, ইহা সিদ্ধ হয়। ইহাই বৃত্তিকার বৌদ্ধপক্ষের যুক্তি বর্ণন করিতে বলিয়াছেন এবং উচ্ছ্যাতকর এখানে যে কতকগুলি দ্বন্দ্বের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের পূর্বপক্ষ-হইয়া বলিয়াই বৃত্তিকার বলিয়াছেন। কিন্তু উচ্ছ্যাতকরের উক্ত ঐ সমস্ত হইয়া যে পূর্বোক্ত বৌদ্ধ মতেরই সমর্থক, ইহা বুঝা যায় না এবং ঐগুলি বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের কোন গ্রন্থের হইয়া, তাহাও জানিতে পারা যায় না। বৃত্তিকার যে উচ্ছ্যাতকরের ব্যক্তিকের ঐ অংশও পর্যালোচনা করিয়াছিলেন, ইহা তাহার ঐ কথার দ্বারা যায়।

বৃত্তিকার ব্যক্তিকের সন্নিবেশ দেখিতে পান নাই, এই অনুমান সদনুমান বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। কিন্তু বৃত্তিকার এখানে উদ্যোতকের উদ্ধৃত স্বত্বগুলিকে কিরূপে বৌদ্ধদিগের পূর্বপক্ষ-স্থল বলিয়া বুঝিয়াছিলেন, তাহা চিস্তনীয়। উদ্যোতকের ভাষাব্যক্তিকে এখানে পূর্বপক্ষবাদীদিগের সমস্ত স্বর্থের বহু বৃত্তির উল্লেখ করিয়া, বহু বিচারপূর্বক দেওলির খণ্ডন করিয়াছেন। ভাষাকারের পরবর্তী বিচারে পূর্বপক্ষবাদীদিগের অনেক কথা পাওয়া যাইবে এবং এ বিষয়ে সকল কথা পরিষ্কৃত হইবে ॥৩৩॥

### সূত্র। সৰ্ব্বগ্রহণমবয়ব্যাসিদ্ধেঃ ॥৩৪॥৯৫॥

অনুবাদ। অবয়বীর অসিদ্ধি হইলে তৎপ্রযুক্ত সকল পদার্থের অগ্রহণ হয়। অর্থাৎ পরমাণুসমষ্টি হইতে পৃথক্ অবয়বী না থাকিলে কোন পদার্থেরই জ্ঞান হইতে পারে না।

ভাষ্য। যদ্যবয়বী নাস্তি, সৰ্ব্বস্থ গ্রহণং নোপপদ্যতে। কিং তৎ সৰ্ব্বং? দ্রব্য-গুণ-কর্ম-সামান্য-বিশেষ-সমবায়ঃ। কথং কৃৎস্না? পরমাণু-সমবস্থানং তাবদ্দর্শনবিষয়ো ন ভবত্যতীন্দ্রিয়ত্বাদপূনাং; দ্রব্যান্তরকা-বয়বিভূতং দর্শনবিষয়ো নাস্তি। দর্শনবিষয়স্বাশ্চেমে দ্রব্যাদয়ো গৃহ্যন্তে, তেন' নিরর্থিতানাং ন গৃহ্যেয়ং, গৃহ্যন্তে তু কুন্তোহয়ং স্ত্যাম, একো, মহান, সংযুক্তঃ, স্পন্দতে, অস্তি, মুখ্যঃশ্চেতি, সন্তি চেমে গুণাদয়ো ধর্ম্মা ইতি— তেন সৰ্ব্বস্থ গ্রহণাৎ পশ্চ্যামোহস্তি দ্রব্যান্তরভূতোহবয়বীতি।

অনুবাদ। যদি অবয়বী না থাকে, (তাহা হইলে) সকল পদার্থের জ্ঞান উপপন্ন হয় না। (প্রশ্ন) সেই সর্ব অর্থাৎ সকল পদার্থ কি? (উত্তর) দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য, বিশেষ, সমবায় [অর্থাৎ কণাদোক্ত দ্রব্যাদি ষট্ পদার্থই সূত্রে "সর্ব" শব্দের দ্বারা মহাবি গোতমের বুদ্ধিহ, ঐ ষট্ পদার্থের জ্ঞান না হইলে সকল পদার্থেরই অজ্ঞান হয়] (প্রশ্ন) কেমন করিয়া? অর্থাৎ অবয়বী না থাকিলে কোন পদার্থেরই জ্ঞান হয় না, হইতে পারে না—ইহা বুঝি কিরূপে? (উত্তর) পরমাণুগুলির

১। কোন পুস্তকে "তে নিরর্থিতানাং ন গৃহ্যেয়ং" এইরূপ পাঠ আছে। "তে" অর্থাৎ পূর্বোক্ত দ্রব্যাদি পদার্থ বিচারের হওয়ার পূর্ব হইতে পারে না, ইহাই ঐ পাঠ পক্ষে বুঝা যায়। ইহাতে অর্থ-সংগতিও ভাল হয়। কিন্তু আর সমস্ত পুস্তকেই "তেন" এইরূপ তৃতীয়াংশ পাঠ আছে। "তেন" অর্থাৎ পূর্বোক্ত হেতুগুণতঃ ইহাই ঐ পাঠপক্ষে অর্থ বুদ্ধিতে হইবে।



অতীন্দ্রিয়ত্ববশতঃ পরমাণুসমবস্থান অর্থাৎ পরস্পর বিলক্ষণ সংযোগবিশিষ্ট হইয়া অবস্থিত পরমাণুসমষ্টি দর্শনের বিষয় হয় না। (পূর্বপক্ষীর মতে) দর্শনের বিষয় অর্থাৎ চক্ষুরিন্দ্রিয়-গ্রাহ্য অবয়বীভূত দ্রব্যাস্তরও নাই [ অর্থাৎ পরমাণুগুলি অতীন্দ্রিয় বলিয়া তাহাদিগের প্রত্যক্ষ অসম্ভব। পরমাণু ভিন্ন অবয়বী বলিয়া ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য কোন দ্রব্যাস্তরও পূর্বপক্ষবাদী মানেন না। হুতরাং তাঁহার মতানুসারে কোন দ্রব্যের দর্শন হইতে পারে না। ] এবং এই দ্রব্যাদি পদার্থ দর্শনবিষয়স্থ হইয়া অর্থাৎ দৃশ্য পদার্থে অবস্থিত হইয়া গৃহীত (প্রত্যক্ষ) হয়। সেই হেতু অর্থাৎ পূর্বপক্ষবাদী পরমাণুসমষ্টি ভিন্ন কোন দ্রব্যাস্তর মানেন না ; পরমাণুগুলিও অতীন্দ্রিয় পদার্থ বলিয়া দৃশ্য নহে, এই পূর্বোক্ত কারণে (পূর্বোক্ত দ্রব্যাদি পদার্থ) নিরখিষ্টান হওয়ার অর্থাৎ কোন দৃশ্য পদার্থ তাহাদিগের অখিষ্টান বা আশ্রয় হইতে না পারায় গৃহীত (প্রত্যক্ষ) হইতে পারে না। কিন্তু এই কুণ্ড শ্যামবর্ণ, এক, মহান, সংযোগবিশিষ্ট, স্পন্দন করিতেছে অর্থাৎ ক্রিয়াবান, আছে, অর্থাৎ অস্তিত্ব বা সম্ভাবিশিষ্ট এবং যুগ্ম, এই প্রকারে (পূর্বোক্ত দ্রব্যাদি পদার্থ) গৃহীত (প্রত্যক্ষ) হইতেছে। এবং এই গুণ প্রভৃতি ধর্মগুলি (গুণ, কর্ম, সামান্য, বিশেষ, সমবায়) আছে। অতএব সকল পদার্থের জ্ঞান হয় বলিয়া দ্রব্যাস্তরভূত অর্থাৎ অবয়বসমষ্টি হইতে পৃথক্ ভাবে উৎপন্ন অবয়বী আছে, ইহা আমরা দেখিতেছি (প্রমাণের দ্বারা বুঝিতেছি)।

টগুনী। মহর্ষি পূর্বসূত্রের দ্বারা অবয়বী বিষয়ে যে সংশয়ের উল্লেখ করিয়াছেন, এই সিদ্ধান্ত-সূত্রের দ্বারা সেই সংশয়ের নিরাস করিয়াছেন। তাই উদ্যোতকর প্রথমে এই সূত্রকে সংশয় নিরাকরণার্থে সূত্র বলিয়াই উল্লেখ করিয়াছেন। মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা বলিয়াছেন যে, অবয়বী না থাকিলে সর্বপদার্থেরই জ্ঞান হইতে পারে না। সর্বপদার্থ কি? এতদন্তরে ভাষ্যকার কণাদোক্ত দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য, বিশেষ ও সমবায়—এই ষট্ পদার্থকেই মহর্ষি-সূত্রোক্ত সর্বপদার্থ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ভাষ্যকারের ব্যাখ্যার দ্বারা মনে হয়, কণাদ-সূত্রের পরেই জ্ঞানসূত্র রচিত হইয়াছে। ইহাই তাঁহার গুরুপরম্পরাগত সংস্কার ও সিদ্ধান্ত ছিল। ভাষ্যকার অত্রও জ্ঞানসূত্র ব্যাখ্যার কণাদ-সূত্রোক্ত সিদ্ধান্তকে আশ্রয় করিয়াছেন। প্রথমভাগ্যে প্রদত্ত সূত্র-ব্যাখ্যার কণাদোক্ত দ্রব্যাদি ষট্ পদার্থের উল্লেখ করিয়া, সেগুলিও গোতমের সম্মত প্রদত্ত পদার্থ, ইহা বলিয়াছেন। কণাদোক্ত ষট্ পদার্থে সকল ভাব পদার্থই অন্তর্ভুক্ত আছে। কণাদ, সমস্ত ভাব পদার্থকেই দ্রব্যাদি ষট্ প্রকারে বিভক্ত করিয়া বলিয়াছেন। হুতরাং সর্বপদার্থ বলিলে কণাদোক্ত ষট্ পদার্থ, এইরূপ ব্যাখ্যা করা যায়। ভাব পদার্থ ছাড়িয়া অন্তর পদার্থের জ্ঞান হইতে পারে না। হুতরাং ভাব পদার্থের জ্ঞান অসম্ভব হইলে অন্তর পদার্থেরও জ্ঞান হওয়া অসম্ভব।



তাহা হইলে সমস্ত ভাব পদার্থের জ্ঞান হয় না, এ কথা বলিলে অভাব পদার্থেরও জ্ঞান হয় না, এ কথা পাওয়া যায়। তাই ভাষ্যকার মহর্ষি-স্বত্রোক্ত “সর্ব” পদার্থের ব্যাখ্যায় অভাব পদার্থের পৃথক্ করিয়া উল্লেখ করেন নাই।

অবয়বী না থাকিলে সকল পদার্থের জ্ঞান কেন হইতে পারে না? ভাষ্যকার ইহা বুঝাইতে বলিয়াছেন যে, পরমাণুগুলি অতীন্দ্রিয় পদার্থ; সুতরাং উহাদিগের ব্যতিরিক্ত আর সমষ্টিও অতীন্দ্রিয় হইবে। তাহা হইলে উহা দর্শনের বিষয় হইতে পারিবে না। পরমাণুসমষ্টি হইতে পৃথক্ অবয়বী বলিয়া দ্রব্যাত্তর থাকিলে তাহা দর্শনের বিষয় হইতে পারে। কিন্তু পূর্বপক্ষবাদীরা ত পরমাণুসমষ্টি ভিন্ন অবয়বী বলিয়া কোন পৃথক্ দ্রব্য মানেন না। সুতরাং উহাদিগের মতে কোন পদার্থেরই দর্শন হইতে পারে না, তাহাদিগের মতে দর্শনযোগ্য পদার্থই নাই। পূর্বপক্ষবাদী যদি বলেন যে, গুণ-কর্ম প্রভৃতি যে সকল পদার্থ তোমাদিগের সম্মত, সেগুলির ত দর্শন হইতে পারে, তাহার তোমাদিগের মতে অবয়বী না হইলেও যেমন দর্শনের বিষয় হইতেছে, আমাদিগের মতেও তদ্রূপ উহারা দর্শনের বিষয় হয়, অবয়বী না থাকিলে কোন পদার্থেরই দর্শন হয় না, ইহা কিরূপে বলা যায়? এই জন্ত ভাষ্যকার শেষে আবার বলিয়াছেন যে, এই সকল দ্রব্যাদি পদার্থ দৃশ্য পদার্থে অবস্থিত থাকিয়াই দর্শনের বিষয় হয়। অর্থাৎ যে পদার্থ অতীন্দ্রিয় বা অদৃশ্য, তাহাতে দ্রব্য, গুণ, কর্ম প্রভৃতি কোন পদার্থেরই দর্শন হইতে পারে না, একটি পরমাণুগত রূপের কি দর্শন হইয়া থাকে? পূর্বপক্ষবাদীরা যখন পরমাণুসমষ্টিতেই দ্রব্য, গুণ, কর্মাদির আশ্রয় বলেন, তখন ঐ দ্রব্য, গুণ, কর্মাদি কোন পদার্থেরই দর্শন হইতে পারে না। নিরবিচ্ছিন্ন অর্থাৎ বাহ্যাদিগের দর্শন বিষয় পদার্থ অবিচ্ছিন্ন বা আশ্রয় নহে, এমন দ্রব্যাদি দর্শনের বিষয় হইতে পারে না। পূর্বোক্তরূপ দ্রব্য, গুণ, কর্মাদি পদার্থ দর্শনের বিষয়ই হয় না, এ কথাও বলা যাইবে না; তাই শেষে বলিয়াছেন যে, ‘এই কুস্ত শ্রামবর্ণ’ ইত্যাদি প্রকারে কুস্তরূপ দ্রব্য এবং তাহার শ্রামবর্ণরূপ গুণ একত্ব, মহত্ব ও সংযোগরূপ গুণ, স্পন্দন (ক্রিয়া) অস্তিত্ব অর্থাৎ সত্তারূপ সামান্য এবং মুক্তিকাদি অবয়বরূপ বিশেষ এবং পূর্বোক্ত গুণ-কর্মাদির সমবার-সম্বন্ধ, এগুলি দর্শনের বিষয় হইতেছে। যাহা দেখা যাইতেছে, তাহা দেখা যায় না—তাহা অদৃশ্য, এমন কথা বলিলে সত্যের অপলাপ করা হয়। গুণ-কর্মাদি পদার্থগুলি নাই—উহাদিগের অস্তিত্বই স্বীকার করি না, সুতরাং উহাদিগের দর্শন হইতে পারে না, এই আপত্তি অলীক, ইহাও পূর্বপক্ষবাদীরা বলিতে পারিবেন না। তাই ভাষ্যকার আবার শেষে বলিয়াছেন যে, গুণ-কর্মাদি ধর্মগুলি আছে। ভাষ্যকারের গুঢ় তাৎপর্য্য এই যে, গুণ-কর্মাদি পদার্থগুলি যখন প্রত্যক্ষসিদ্ধ, তখন তোমাদিগের মতে ঐগুলির প্রত্যক্ষ অসম্ভব হইয়া পড়ে বলিয়াই উহাদিগের অস্তিত্বের অপলাপ করিতে পার না। তাহা হইলে জগতে কোন বস্তুই প্রত্যক্ষ হয় না, বস্তুমাত্রই অতীন্দ্রিয়, এই কথাই প্রথমে বলা কেন? তাহা বলিলেই ত তোমাদিগের সকল গোল মিটিয়া যায়? যদি সত্যের অপলাপ-ভয়ে তাহা বলিতে না পার, তাহা হইলে প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ গুণ-কর্মাদিও নাই, এ কথাও বলিতে পারিবে না। তাহা হইলে ঐ গুণ-কর্মাদির প্রত্যক্ষের উপপত্তির জন্ত উহাদিগের আশ্রয় দর্শনবিষয় অবয়বীও



মানিতে হইবে। উহার অতীন্দ্রিয় পরমাণুতে অবস্থিত থাকিয়া কখনই দর্শনের বিষয় হইতে পারে না। অতএব প্রত্যক্ষবোধ্য পদার্থবাদেরই প্রত্যক্ষের অল্পরোধে বুঝা যায়, পরমাণুগণমণ্ডিত স্রব্যান্তর অবরবী আছে। উহা পরমাণু নহে, উহা মহৎ, উহা দর্শনের বিষয়, এ জন্ত উহার এবং উহাতে অবস্থিত জব্যাদি পদার্থের দর্শন হইয়া থাকে।

আহার্য অবরবী মানেন না, তাহার্য গুণ-কর্মাদিও পৃথক্ মানেন না। সুতরাং তাহাদিগের মতে সর্বগ্রাহ্যরূপ দোষ ক্রিয়ণে হইবে? এই কথা মনে করিয়াই শেদে এখানে উদ্যোতকর বলিয়াছেন যে, অবরবী স্বীকার না করিলে বিরোধ হয়, ইহা প্রদর্শন করাই এই স্বত্রের মূল উদ্দেশ্য। তাৎপর্য্যটাকাঁকার উদ্যোতকরের ঐ কথার ঐরূপ প্রয়োজন ব্যাখ্যা করিয়া, উহার তাৎপর্য্য বর্ণন করিয়াছেন যে, গুণ-কর্মাদি পদার্থের জ্ঞান হয়, ইহা কেহই অপলাপ করিতে পারেন না। উহাদিগের প্রত্যক্ষ জ্ঞান হইয়া থাকে। গুণ-কর্মাদির সহিত অবরবীরও বস্তু প্রত্যক্ষ হয়, তখন তাহার অপলাপ করা কোনরূপেই সম্ভব নহে। অর্থাৎ তাহা হইলে প্রত্যক্ষ-বিরোধ হইয়া পড়ে। এই প্রত্যক্ষ বিরোধ প্রদর্শনই মহর্ষির এই স্বত্রের মূল উদ্দেশ্য। ভাষ্যকারও শেষে গুণ-কর্মাদি পদার্থ আছে অর্থাৎ উহার্য প্রত্যক্ষ-নিষ্ঠ বলিয়া উহাদিগকে মানিতেই হইবে, এই কথা বলিয়া বিকল্প-পক্ষে চরমে প্রত্যক্ষ-বিরোধ গোদেরই সূচনা করিয়াছেন।

পরমাণু-বস্তুটরূপ বৃক্ষাদির প্রত্যক্ষ হইতে না পারিলেও সমস্ত পদার্থের অপ্ৰত্যক্ষ হইবে কেন? আশ্রয়ের অপ্ৰত্যক্ষতাবশতঃ আশ্রিত গুণ-কর্মাদির প্রত্যক্ষ হইতে না পারিলেও অহুমানাদির দ্বারা তাহাদিগের জ্ঞান হইতে পারে। শেষ কথা, যদি কোন পদার্থেরই প্রত্যক্ষ না হইতে পারে, তাহাতেও কোন ক্ষতি নাই। অহুমানাদি প্রমাণের দ্বারাই বস্তু বস্তুর জ্ঞান হইবে। প্রত্যক্ষ বলিয়া কোন পৃথক্ জ্ঞানই মানিব না। পূর্বপক্ষবাদীরা যদি পূর্বপ্রকরণোক্ত এই পূর্বপক্ষই আবার অবলম্বন করেন, তাহা হইলে এই স্বত্রের দ্বারা মহর্ষি তাহারও এক প্রকার উত্তর সূচনা করিয়া গিয়াছেন। উদ্যোতকর কল্পান্তরে মহর্ষি-স্বত্রের সেই পাক্ষিক অর্থের ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, অবরবী না থাকিলে “সর্বগ্রাহ্য” অর্থাৎ সর্বপ্রমাণের দ্বারাই বস্তুর অগ্রহণ হয়। কারণ, বর্তমান ও মহৎ পদার্থ বিধেই বহিঃপ্রিয়-জন্ত লৌকিক প্রত্যক্ষ জন্মে। যটাদি অবরবী না থাকিলে তাদৃশ প্রত্যক্ষের বিষয় কোন পদার্থই থাকে না। তাদৃশ প্রত্যক্ষ জ্ঞান না থাকিলে অহুমানাদি জ্ঞানও থাকে না। কারণ, অহুমানাদি জ্ঞান প্রত্যক্ষমূলক। প্রত্যক্ষ প্রমাণ না থাকিলে অহুমানাদি প্রমাণও সম্ভব হয় না। সুতরাং অহুমানাদি প্রমাণের দ্বারা বস্তুর গ্রহণও অসম্ভব হয়। তাহা হইলে কলে সর্বপ্রমাণের দ্বারা বস্তুর অগ্রহণ হইয়া পড়ে। এ জন্ত পরমাণু-পুঞ্জ হইতে অতিরিক্ত অবরবী আছে, ইহা মানিতেই হইবে। ঐ অবরবী জ্বয়ের মহত্ব থাকায় তাহার প্রত্যক্ষ হইতে পারে, প্রত্যক্ষের উপপত্তি হওয়ার তন্মূলক অহুমানাদিও হইতে পারে। ফল কথা, প্রত্যক্ষের অপলাপ করিলে কোন পদার্থের কোন প্রকার জ্ঞানই হইতে পারে না, সর্বপ্রমাণের দ্বারাই জ্ঞান হইতে পারে না; সুতরাং প্রত্যক্ষের বক্ষার জন্ত অবরবী মানিতে হইবে। তাহা হইলে আর সর্বপ্রমাণের দ্বারা সর্ববস্তুর অগ্রহণরূপ দোষ হইবে না। অবরবী না



মানিলে পুরোঁকরূপে স্বত্রোক্ত "সর্বাগ্রহণ" দোষ অনিবার্য। মূল কথা, স্বরণ করিতে হইবে যে, মহর্ষি পূর্বস্বত্রে অবয়ববিবরণে যে সংশয় বলিয়াছেন, এই স্বত্রের দ্বারা তাহার নিরাসক প্রমাণ সূচনা করিয়াছেন। এই স্বত্রের দ্বারা "এই দৃশ্যমান বুদ্ধাদি পদার্থ পরমাণুপুঞ্জ নহে, ইহার পদমাণু-পুঞ্জ হইতে ভিন্ন স্রব্যাক্তর, যেহেতু ইহার লৌকিক প্রত্যক্ষের বিষয়, তাহা পরমাণু হইতে ভিন্ন পদার্থ নহে, তাহা এইরূপ প্রত্যক্ষের বিষয় নহে" ইত্যাদি প্রকারে ব্যক্তিরেকী অসুস্থমান সূচনা করিয়া, ঐ অসুস্থমান-প্রমাণের দ্বারা পরমাণুপুঞ্জ হইতে অতিরিক্ত অবয়বী স্রব্যের নিশ্চয় সম্পাদন করা হইয়াছে। সুতরাং আর অবয়ববিবরণে সংশয় থাকিতে পারে না। অবয়ব হইতে পৃথক অবয়বী আছে, ইহা প্রমাণের দ্বারা নিশ্চিত হইলে আর কোন কারণেই তাহিষয়ে সংশয় জন্মিতে পারে না। ৩৪।

### সূত্র । ধারণাকর্ষণোপপত্তেশ্চ ॥ ৩৫ ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ । ধারণ ও আকর্ষণের উপপত্তিবশতঃ ( অবয়বী অবয়ব হইতে পৃথক পদার্থ ) [ অর্থাৎ দৃশ্যমান বুদ্ধাদি পদার্থ যদি কতকগুলি পরমাণুসমূহ হইত, তাহা হইলে উহাদিগের ধারণ ও আকর্ষণ হইতে পারিত না, ধারণ ও আকর্ষণ হওয়াতেও বুঝা যায়, উহার পদমাণু হইতে পৃথক পদার্থ ] ।

ভাষ্য । অবয়বার্থান্তরভূত ইতি । সংগ্রহকারিতে বৈ ধারণাকর্ষণে, সংগ্রহো নাম সংযোগসহচরিতং গুণান্তরং স্নেহদ্রবত্বকরিতং, অপাং সংযোগাদামে কুন্তেহগ্নিসংযোগাৎ পকে । যদি স্বয়মবিকারিতে অভবিষ্যতাং পাংশুরাশিপ্রভৃতিদ্ব্যপ্যজ্ঞাস্তেতাং । দ্রব্যান্তরানুৎপত্তৌ চ তুণোপলকাস্তাদিযু জ্ঞতুসংগৃহীতেষপি নাতবিষ্যতাং ।

অথাবয়বিনং প্রত্যক্ষাণকো নাতুৎ প্রত্যক্ষলোপ ইত্যনুসঙ্গয়ং দর্শনবিষয়ং প্রতিজানানঃ কিমনুষোক্তব্য ইতি । "একমিদং দ্রব্য-" নিত্যেকবুদ্ধের্বিষয়ং পর্য্যনুষোজ্যঃ, কিমেকবুদ্ধিরতিমার্থবিবরা ? আহো নানার্থবিষয়েতি । অভিমার্থবিষয়েতি চেৎ, অর্থান্তরানুজ্ঞানাদবয়বিসিদ্ধিঃ । নানার্থবিষয়েতি চেৎ ভিন্নেষেকদর্শনানুপপত্তিঃ । অনেকস্মিন্নেক ইতি ব্যাহতা বুদ্ধির্ন দৃশ্যত ইতি ।

অনুবাদ । অবয়বী অর্থান্তরভূত, অর্থাৎ ( স্বত্রোক্ত ) ধারণ ও আকর্ষণের উপপত্তিবশতঃ অবয়ব হইতে ( পরমাণুপুঞ্জ হইতে ) অবয়বী পৃথক পদার্থ ।

[ ভাষ্যকার মতান্তর অবলম্বন করিয়া এই যুক্তির খণ্ডন করিতেছেন ]

ধারণ ও আকর্ষণ সংগ্রহ-জনিতই, অর্থাৎ উহা অবয়ব-জনিত নহে । স্নেহ ও



দ্রব্য-জনিত সংযোগ-সহচরিত গুণাস্তর সংগ্রহ, অর্থাৎ ঐরূপ গুণাস্তরের নাম সংগ্রহ। (যেমন) জলের সংযোগবশতঃ অপক অগ্নি-সংযোগবশতঃ পক কুস্তে।

যদি (পূর্বোক্ত ধারণ ও আকর্ষণ) অবয়বি-জনিতই হইত, (তাহা হইলে) ধূলিরাশি প্রভৃতিতেও জানা যাইত। দ্রব্যাস্তরের অনুৎপত্তি হইলেও জড়-সংগৃহীত (লাক্ষ্যের দ্বারা সংশ্লিষ্ট) তৃণ, প্রস্তর ও কাষ্ঠ প্রভৃতিতেও (পূর্বোক্ত ধারণ ও আকর্ষণ) হইত না [অর্থাৎ চূর্ণ মুস্তিকায় জল-সংযোগ করিয়া, উহা প্রথমতঃ পিষ্টাকার করা হয়, তাহার পরে উহার দ্বারা কাচা ঘট প্রস্তুত করিয়া, সেই ঘট অগ্নি-সংযোগ দ্বারা পক করিলে, সেই ঘটে সংগ্রহ নামক গুণাস্তর জন্মে বলিয়াই তাহার ধারণ ও আকর্ষণ হয়, এইরূপ সর্বত্রই ধারণ ও আকর্ষণ সংগ্রহ-জনিত। উহা যদি অবয়বি-জনিত হইত, তাহা হইলে ধূলিরাশি প্রভৃতিরও ধারণ ও আকর্ষণ হইত; কারণ, তাহার অবয়বী এবং তৃণ-প্রস্তরাদি বিভিন্ন দ্রব্য লাক্ষ্যের দ্বারা সংশ্লিষ্ট হইলে, সেখানে দ্রব্যবয়ের ঐরূপ সংযোগে দ্রব্যাস্তর জন্মে না, অর্থাৎ পৃথক অবয়বী জন্মে না, ইহা সর্ব্বসম্মত; কিন্তু সেই সংশ্লিষ্ট দ্রব্যবয় পৃথক অবয়বী না হইলেও তাহারও ধারণ ও আকর্ষণ হইয়া থাকে। উহা অবয়বি-জনিত হইলে সেখানে উহা হইতে পারিত না। সুতরাং ধারণ ও আকর্ষণ যে অবয়বি-জনিত নহে, উহা সংগ্রহ-জনিত, ইহা স্বীকার্য্য। সুতরাং উহা অবয়বীর সাধক হইতে পারে না]।

(প্রশ্ন) প্রত্যক্ষ লোপ না হয়, এ জন্ম পরমাণুপুঞ্জকেই প্রত্যক্ষ বিষয়রূপে প্রতিজ্ঞাকারী অবয়বি-প্রত্যাখ্যানকারীকে কি অনুযোগ করিবে? [অর্থাৎ যদি সূত্রকারোক্ত যুক্তির দ্বারা অবয়বীর সিদ্ধি না হয়, তাহা হইলে যে বৌদ্ধ সম্প্রদায় পরমাণুপুঞ্জকেই প্রত্যক্ষ বিষয় বলেন, উহা হইতে ভিন্ন অবয়বী মানেন না, তাহাদিগকে কি প্রশ্ন করিবে? কোন প্রশ্নের দ্বারা তাহার মত খণ্ডন করিবে?]।

(উত্তর) “এই দ্রব্য এক” এই প্রকার একবুদ্ধির বিষয় প্রশ্ন করিব। (সে কিরূপ প্রশ্ন, তাহা বলিতেছেন) একবুদ্ধি কি অর্থাৎ “ইহা এক” এইরূপ যে বোধ, তাহা কি অভিমার্ক-বিষয়ক, অথবা নানার্থ-বিষয়ক? অভিমার্ক-বিষয়ক—ইহা যদি বল, (তাহা হইলে) পদার্থাস্তরের অর্থাৎ পরমাণুপুঞ্জ হইতে পৃথক পদার্থের স্বীকার-বশতঃ অবয়বীর সিদ্ধি হয়। নানার্থ-বিষয়ক—ইহা যদি বল, (তাহা হইলে) ভিন্ন পদার্থসমূহ বিষয়ে একবুদ্ধির উপপত্তি হয় না। অনেক পদার্থে “এক” এই প্রকার ব্যাহত বুদ্ধি দেখা যায় না [অর্থাৎ ঘটাদি পদার্থকে “ইহা এক” এইরূপেও প্রত্যক্ষ

করা হয়, সুতরাং ঘটাদি পদার্থ বহু পরমাণুর সমষ্টিরূপ বহু পদার্থ নহে, তাহা হইলে উহাতে যথার্থ একবুদ্ধি কিছুতেই জন্মিতে পারিত না। বিভিন্ন বহু পদার্থে “ইহা এক” এইরূপ বুদ্ধি ব্যাহত; কোন সম্প্রদায়ই তাহা স্বীকার করিতে পারেন না। ঐ একবুদ্ধিকে এক পদার্থবিষয়ক যথার্থ বোধ বলিয়া স্বীকার করিতে হইলে পরমাণুপুঞ্জ হইতে ভিন্ন অবয়বী স্বীকার্য্য]।

টিকনো। মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা অবয়ব-সাধনে আর একটি যুক্তি বলিয়াছেন। সে যুক্তি এই যে, পরমাণুপুঞ্জ হইতে পৃথক্ অবয়বী না থাকিলে ধারণ ও আকর্ষণ হইতে পারে না। কোন কাঠখণ্ড বা ঘটাদি পদার্থের একদেশের ধারণ ও আকর্ষণ করিলে, তাহার সমুদায়েরই ধারণ ও আকর্ষণ হইয়া থাকে। ঐ কাঠখণ্ড বা ঘটাদি পদার্থ যদি পরমাণুপুঞ্জ হইত, তাহা হইলে উহাদিগের একদেশের ধারণ ও আকর্ষণে সমুদায়ের ধারণ ও আকর্ষণ কিছুতেই হইত না, উহাদিগের একদেশ ধরিয়া উত্তোলন করিলে সমুদায় উত্তোলিত হইত না,—সে অংশ বা যে পরমাণুগুলি ধৃত বা আকৃষ্ট হইত, সেই অংশেরই ধারণ ও আকর্ষণ হইত। অতএব স্বীকার করিতে হইবে যে, ঐ কাঠখণ্ড ও ঘটাদি পদার্থ কতকগুলি পরমাণুপুঞ্জ নহে; উহারা পরমাণুপুঞ্জের দ্বারা গঠিত পৃথক্ অবয়বী দ্রব্য। মহর্ষি ধারণ ও আকর্ষণের উপপরিচয় হেতুর দ্বারা অবয়বী অর্থান্তরভূত অর্থাৎ পরমাণুপুঞ্জরূপ অবয়ব হইতে পদার্থান্তর, এই সাধ্য সাধন করিয়াছেন। তাই ভাষ্যকার প্রথমে “অবয়বী অর্থান্তরভূতঃ” এই বাক্যের পূরণ করিয়াই মহর্ষির সাধ্য নির্দেশ করতঃ সূত্রার্থ ব্যাখ্যা সমাপ্ত করিয়াছেন। উদ্যোতকর বলিয়াছেন যে, “অবয়বী অর্থান্তরভূত” ইহা মহর্ষি-সূত্রস্থ “চ” শব্দের অর্থ। অর্থাৎ মহর্ষি সূত্রশেষে চকারের দ্বারা ই তাঁহার বুদ্ধিস্থ ঐ সাধ্য প্রকাশ করিয়াছেন।

ভাষ্যকার এখানে মহর্ষি-সূত্রোক্ত (পূর্বোক্ত) যুক্তির প্রতিবাদ করিয়াছেন। তিনি ঐ যুক্তির খণ্ডন করিতে বলিয়াছেন যে, ধারণ ও আকর্ষণ অবয়ববিজ্ঞানিত নহে—উহা “সংগ্রহ”-জনিত। অবয়বীই যদি পূর্বোক্ত প্রকার ধারণ ও আকর্ষণের কারণ হইত, তাহা হইলে গুলিরাশি প্রভৃতি অবয়বীও পূর্বোক্ত প্রকার ধারণ ও আকর্ষণ হইত। গুলিরাশিও যখন সিদ্ধান্তে কাঠখণ্ড ও ঘটাদি পদার্থের জায় অবয়বী, তখন তাহার একদেশের ধারণ ও আকর্ষণে সর্বাসংশের ধারণ ও আকর্ষণ হইত। তাহা যখন হয় না, তখন অবয়বী পূর্বোক্ত প্রকার ধারণ ও আকর্ষণের কারণ, ইহা বলা যায় না। এবং অবয়বী না হইলে যদি তাহার ধারণ ও আকর্ষণ না হয়, তাহা হইলে বিজাতীয় জুইটি দ্রব্য যেখানে লাফার দ্বারা বিলক্ষণরূপে সংশ্লিষ্ট হইয়া আছে, সেখানে তাহার একটির ধারণ ও আকর্ষণে উভয়েরই ধারণ ও আকর্ষণ কেন হয়? সেখানে ত ঐ উভয় দ্রব্যের ঐরূপ সংযোগে একটি পৃথক্ অবয়বী দ্রব্য জন্মে না। কারণ, বিজাতীয় দ্রব্যদ্বয় সংযুক্ত হইলেও তাহা কোন দ্রব্যান্তরের আৱম্বক হয় না। এক খণ্ড কাঠ ও এক খণ্ড প্রস্তর লাফার দ্বারা সংশ্লিষ্ট করিলে, ঐ উভয় দ্রব্যের দ্বারা কোন একটি পৃথক্ অবয়বী দ্রব্য জন্মিতে পারে না, ইহা সর্বসম্মত।



ফল কথা, অবয়বী হইলেই ধারণ ও আকর্ষণ হয় ( অবয়ব ), অবয়বী না হইলে ধারণ ও আকর্ষণ হয় না ( ব্যতিরেক ), এইরূপ "অবয়ব" ও "ব্যতিরেক"র দ্বারাই ধারণ ও আকর্ষণের প্রতি অবয়বীর কারণই সিদ্ধ হয় এবং তাহা হইলে ঐ ধারণ ও আকর্ষণরূপ কার্যের দ্বারা অবয়বিক্রম কারণের অহুমান হইতে পারে, কিন্তু পূর্কোক্তরূপ "অবয়ব" ও "ব্যতিরেক" যখন নাই, তখন ধারণ ও আকর্ষণের প্রতি অবয়বী কারণ হইতে পারে না। ভাষ্যকার ধূলিরাশি প্রকৃতি অবয়বীতে অবয়ব ব্যক্তির এবং লাক্ষ্য-সংশ্লিষ্ট বিজাতীয় ত্ব-কাষ্ঠাদিতে ব্যতিরেক ব্যক্তির প্রদর্শন করিয়া ধারণ ও আকর্ষণের প্রতি অবয়বী কারণ নহে, ইহাই প্রতিপন্ন করিয়াছেন। তাহাতে ধারণ ও আকর্ষণ অবয়বীর সাধক হইতে পারে না, এই মূল বক্তব্যটি প্রতিপন্ন হইয়া গিয়াছে।

তবে পূর্কোক্তপ্রকার ধারণ ও আকর্ষণের কারণ কি? এতদ্বত্তরে প্রথমেই ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, ধারণ ও আকর্ষণ "সংগ্রহ"-জনিত, অর্থাৎ "সংগ্রহ"ই উহার কারণ, অবয়বী উহার কারণ নহে। সংগ্রহ কি? তাই বলিয়াছেন যে, যেহ ও ত্রবন্ধ নামক গুণের দ্বারা জনিত সংযোগ-সহচরিত একটি গুণাস্তরের নাম "সংগ্রহ"। ঐ সংগ্রহের একটি আধার প্রদর্শনের দ্বারা উহার পূর্কোক্ত স্বরূপ বুঝাইতে শেষে বলিয়াছেন যে, জল-সংযোগবশতঃ অণু ও অগ্নি-সংযোগবশতঃ পকুস্তে উহা আছে। অবশ্য ঐরূপ বহু দ্রব্যাদিকার্যেই উহা আছে। ভাষ্যকারের ঐ কথা একটি দৃষ্টান্ত প্রদর্শন মাত্র। ভাষ্যকারের ঐ কথার দ্বারা বুঝা যায় যে, অণু কুস্তে যে সংগ্রহ জন্মে, জলসংযোগ ও তাহার প্রযোজক। অণু কুস্তে অগ্নি প্রভৃতি কোন তেজঃপদার্থের সংযোগ না হওয়া পর্যন্ত জলসংযোগ প্রযুক্তই তাহাতে "সংগ্রহ" জন্মে; তাই তাহার ধারণ ও আকর্ষণ হয়। ঐ কুস্তে বিশিষ্ট জলসংযোগ না করিলে, উহার পকতার পূর্কো উহা যখন ভাঙ্গিয়া পড়ে, উহার পূর্কোক্ত প্রকার ধারণ ও আকর্ষণ হয় না, তখন বিশিষ্ট জলসংযোগ উহাতে "সংগ্রহ" নামক গুণাস্তরের উৎপত্তির প্রযোজক, ইহা বুঝা যায়। বিশিষ্ট জলসংযোগের অভাবে ধূলিরাশিতে ঐরূপ "সংগ্রহ" জন্মে না, তাই তাহার পূর্কোক্ত প্রকার ধারণ ও আকর্ষণ হয় না। সুতরাং সংগ্রহই ধারণ ও আকর্ষণের কারণ, ইহা বুঝা যায়। পকুস্তে অগ্নি বা সূর্যের সংযোগ পূর্কোক্ত "সংগ্রহ" নামক গুণাস্তরের প্রযোজক হয়। সুতরাং তাহারও ঐ সংগ্রহ-জনিত ধারণ ও আকর্ষণ হইয়া থাকে। পকুস্তে তেজঃসংযোগ সংগ্রহের প্রযোজক হইলেও, ঐ সংগ্রহও ঐ কুস্তের অন্তর্গত জলগত যেহ ও ত্রবন্ধজনিত। কারণ, সংগ্রহ নামক গুণ সর্বত্রই যেহ ও ত্রবন্ধ-জনিত হইয়া থাকে। পকুস্তাদিতে কোন বিলক্ষণ সংগ্রহের উৎপত্তি হয়, তাহাতে তেজঃ-সংযোগই সহকারী কারণ হইয়া থাকে। কারণ, তেজঃসংযোগ ব্যতীত ঐরূপ বিলক্ষণ সংগ্রহ জন্মে না।

ভাষ্যকার "সংগ্রহ"কে সংযোগ-সহচরিত গুণাস্তর বলিয়াছেন। ইহাতে বুঝা যায়, "সংগ্রহ" সংযোগ হইতে পৃথক্ একটি গুণবিশেষ, উহা সংযোগ-প্রযুক্ত হওয়ায় সংযোগাশ্রয়েই জন্মে, তাই উহাকে "সংযোগ-সহচরিত" বলিয়াছেন; সংযোগের সহিত একাধারে থাকিলে তাহাকে "সংযোগ-সহচরিত" বলা যায়। কুস্তাদিতে জলসংযোগ থাকায়, ঐ জলসংযোগের সহিত তাহাতে



সংগ্রহও আছে। বৈশেষিক-সম্মত রূপাদি চতুর্বিংশতি গুণের মধ্যে কিন্তু “সংগ্রহ” নামক অতিরিক্ত গুণের উল্লেখ নাই। গুণপদার্থের ব্যাখ্যাকার আচার্য্যগণ “সংগ্রহ”কে সংযোগবিশেষই বলিয়াছেন<sup>১</sup>। তরল পদার্থের নেকুপ সংযোগের দ্বারা চূর্ণ, শকু, প্রভৃতি দ্রব্যের পিণ্ডীভাব-প্রাপ্তি হয়, তাহা সংযোগবিশেষই সংগ্রহ। ভাষ্যকার কোন প্রাচীন মতবিশেষ অবলম্বন করিয়াই “সংগ্রহ”কে গুণান্তর বলিয়াছেন; তাহার এখানে স্বত্রোক্ত যুক্তিখণ্ডন ও মতান্তর আশ্রয় করিয়াই সংগতি হয়, এ কথাও পরে ব্যক্ত হইবে। ভাষ্যকার সংগ্রহকে মেহ ও দ্রবত্ব-জনিত বলিয়াছেন। মেহ জলমাত্রের গুণ, জলে দ্রবত্বও আছে, এই উভয়ই সংগ্রহের কারণ। প্রশস্তপাদ “পদার্থধর্ম-সংগ্রহে” কেবল মেহকেই সংগ্রহের কারণ বলিয়াছেন<sup>২</sup>। প্রশস্তপাদের আশ্রিত বিশ্বনাথ ভাষ্যপরিচ্ছেদে দ্রবত্বকে সংগ্রহের কারণ বলিয়া<sup>৩</sup> মুক্তাবলীতে মেহকেও উহার কারণ বলিয়াছেন। “সংগ্রহ” নামক সংযোগবিশেষের প্রতি মেহ ও দ্রবত্ব, এই উভয়ই যে কারণ বলিতে হইবে, ইহা বৈশেষিক স্বত্রের উপর্য্যাপ্ত শব্দক মিশ্র<sup>৪</sup> বিশদ করিয়া বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, কাচ বা কাকিন গলাইয়া, সেই দ্রবত্বের দ্বারা কাহারও সংগ্রহ জন্মে না, সুতরাং সংগ্রহে মেহও কারণ। কাচ ও কাকিনে মেহ নাই। শুষ্ক দ্রবের অন্তর্গত জলে মেহ থাকিলেও, তাহার দ্বারা কাহারও সংগ্রহ হয় না, সুতরাং দ্রবত্বও সংগ্রহে কারণ। শুষ্ক দ্রুতে দ্রবত্ব নাই, সুতরাং তাহার দ্বারা সংগ্রহ হয় না। প্রশস্তপাদ ও ভাষ্যকল্লীকার শ্রীধর ইহা না বলিলেও পূর্ববর্তী বাৎস্তারন, সংগ্রহকে “মেহদ্রবত্ব-কারিত” বলায় উহা নব্য মত বলিয়াই গ্রহণ করা যায় না।

ভাষ্যকার মহর্ষি-স্বত্রোক্ত যুক্তি খণ্ডন করিতে পূর্বোক্তরূপ যাহা বলিয়াছেন, উন্মোচকর তাহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। উন্মোচকর বলিয়াছেন যে, যখন কেহ কোন অবয়বীর গ্রহণ করে, তখন ঐ একদেশ গ্রহণজ্ঞ অবয়বীকেও গ্রহণ করে। সেই গ্রহণজ্ঞ অবয়বীর যে দেশান্তর-প্রাপ্তির নিরাকরণ, তাহাকে বলে ধারণ এবং একদেশ গ্রহণজ্ঞ অবয়বীর যে দেশান্তর-প্রাপ্ত, তাহাকে বলে আকর্ষণ। এই ধারণ ও আকর্ষণ যখন অবয়বীতেই দেখা যায়, নিরবয়ব আকাশাদি এবং জ্ঞানাদি পদার্থে দেখা যায় না এবং পরমাণুরূপ অবয়বমাত্রেরও দেখা যায় না, তখন উহা অবয়বীরই ধর্ম; সুতরাং উহা অবয়বীর সাধক হয়। ভাষ্যকার যে ব্যক্তির নির্দেশন করিয়াছেন, তাহা মহর্ষির তাৎপর্য্যাবধারণ করিলে বলা যায় না। কারণ, সমস্ত অবয়বীতেই ধারণ ও আকর্ষণ হয়, ইহা মহর্ষির তাৎপর্য্য নহে। অবয়বী ভিন্ন অন্য কোন পদার্থে ধারণ ও আকর্ষণ

১। সংগ্রহঃ পরস্পরমযুক্তানাং শকু, সৌনাং পিণ্ডীভাবপ্রাপ্তিহেতুঃ সংযোগবিশেষঃ।—ভাষ্যকল্লী।

২। মেহোৎপাদ্য বিশেষগুণঃ, সংগ্রহমুৎপাদিহেতুঃ।—প্রশস্তপাদভাষ্য।

৩। ভাষ্যক লম্বনে হেতুনির্মিতঃ সংগ্রহে তু তৎ।—ভাষ্যপরিচ্ছেদ, ১৩৬। সংগ্রহে শকু, কাকিনসংযোগ-বিশেষ, তদ্রবত্ব, মেহসহিতমিতি বোদ্ধব্যং। তেন দ্রবত্বধর্মীনাং ন সংগ্রহঃ।—সিদ্ধান্তমুক্তাবলী।

৪। সংগ্রহো হি মেহদ্রবত্বকারিতঃ সংযোগবিশেষঃ, ন হি ন দ্রবত্বমাত্রাবলীঃ কাচকাকিনদ্রবত্বেন সংগ্রহাশ্রয়পদের, —নাপি মেহমাত্রকারিতঃ, স্যাদনির্বৃত্তান্তিঃ। সংগ্রহাশ্রয়পদের, তদ্রবত্বধর্ম-কারিতোভাষ্য মেহদ্রবত্বকারিতঃ, স ও জলেদাপি শকু-সিকতাভৌ দ্রবত্বমাত্রঃ মেহঃ জলে জটরতি।—উপকার, বৈশেষিকতর্কণ, ২ অঃ, ১ আঃ, ২ সূত্র।



হয় না, সুতরাং উহা অবয়বীর সাধক হয়, ইহাই মহর্ষির তাৎপর্য; সুতরাং ব্যভিচার নাই। যদি নিরবয়ব আকাশাদি ও জ্ঞানাদি পদার্থে এবং পরমাণুরূপ অবয়বে ধারণ ও আকর্ষণ হইত, তাহা হইলে অবশ্য মহর্ষির অবলম্বিত নিয়মের ব্যভিচার হইত। লাক্ষ্য-সংশ্লিষ্ট ত্ব-কাঠাদিতে যে ধারণ ও আকর্ষণ হয়, তাহা অবয়বীতেই হয়। কারণ, ঐ ত্ব-কাঠাদি সেখানে প্রত্যেকে অবয়বীই, সুতরাং সেখানে কোন ব্যভিচার নাই। পরন্তু ধারণ ও আকর্ষণ সংগ্রহ-জনিত, অবয়ব-জনিত নহে—এই সিদ্ধান্তে বিশেষ হেতু কিছু নাই। যদি অবয়বী ভিন্ন অস্ত্র ধারণ ও আকর্ষণ হইত, তাহা হইলে ঐরূপ সিদ্ধান্তে উহা বিশেষ হেতু হইত। যদি বল, অবয়বীই যদি ধারণ ও আকর্ষণের কারণ হয়, তাহা হইলে ধূলিরাশি প্রভৃতিতে কেন উহা হয় না? একজ্ঞানের বক্তব্য এই যে, ধূলিরাশি প্রভৃতিতে ভাষ্যকারোক্ত “সংগ্রহ” কেন জন্মে না, ইহাও বলিতে হইবে। উহাতে সংগ্রহ না হওয়ার বাহা হেতু বলিবে, তাহাই উহাতে ধারণ ও আকর্ষণ না হওয়ার হেতু বলিব। অর্থাৎ অবয়বী হইলেও অস্ত্র কারণের অভাবে সর্বত্র ধারণ ও আকর্ষণ হয় না; তাহাতে ধারণ ও আকর্ষণে অবয়বী কারণ নহে, ইহা প্রতিপন্ন হয় না। অবয়বী ভিন্ন পদার্থে যদি ধারণ ও আকর্ষণ হইত, তাহা হইলে উহা ধারণ ও আকর্ষণের কারণ নহে, ইহা বলা যাইত। কলকথা, মহর্ষি ধারণ ও আকর্ষণকে আশ্রয় করিয়া ব্যতিরেকী অহুমান সূচনা করিয়াই এখানে অবয়বীর সাধন করিয়াছেন।

তাৎপর্যটীকাকার এইরূপে উদ্যোতকরের পূর্বোক্ত সমাধানের ব্যাখ্যা করিয়া, শেষে বলিয়াছেন যে, “অতএব ভাষ্যকারের স্বত্ববুৎ পরমতে বুদ্ধিতে হইবে।” তাৎপর্যটীকাকারের ঐ কথা তাৎপর্য এই যে, ভাষ্যকার মহর্ষির তাৎপর্য বুদ্ধিতে ভ্রম করিয়া, ঐরূপ স্বত্রোক্ত বুদ্ধি খণ্ডন করিতে পারেন না, তাহা অসম্ভব। অস্ত্র কোন প্রতিপক্ষ বাহা বলিয়া মহর্ষি-স্বত্রের খণ্ডন করিয়াছিল, ভাষ্যকার এখানে তাহারই উল্লেখ করিয়া, পরে অস্ত্রপ্রকারে মহর্ষি-সিদ্ধান্তের সমর্থন করিয়াছেন। অর্থাৎ পূর্বোক্ত প্রকার খণ্ডন স্বীকার করিয়াই তিনি অস্ত্র বুদ্ধি আশ্রয় করিয়াছেন। বস্তুতঃ ভাষ্যকার যে “সংগ্রহ”কে গুণান্তর বলিয়াছেন, তাহাতেও তিনি নতান্তর আশ্রয় করিয়াই পূর্বোক্ত ঐ কথাগুলি বলিয়াছেন, ইহা নম্নে আসে। কারণ, জ্ঞান ও বৈশেষিকের মতে চতুর্দিশেতি গুণ হইতে অতিরিক্ত “সংগ্রহ” নামক গুণপদার্থবিষয়ে কোন প্রমাণ নাই। উহাকে গুণান্তর না বলিলেও প্রকৃত স্থলে ভাষ্যকারের কোন ক্ষতি ছিল না, উহা সংযোগবিশেষ হইলেও ভাষ্যকারের বক্তব্য সমর্থিত হইতে পারিত। তথাপি গুণান্তর বলাতে তিনি ঐ স্থলে কোন বিরুদ্ধ সম্প্রদায়ের নতকেই আশ্রয় করিয়াছেন, ইহা নম্নে করা যাইতে পারে।

ভাষ্যকার পরে অস্ত্র-ব্যতিরেকী হেতুর প্ররোধ উপলব্ধি করিবেন বলিয়া প্রশংসাপূর্ণক তত্ত্বেরে

১। যোহন বুদ্ধমহো গোষ্ঠাদিরবয়বী পরমাণুসমূহভাবে নিবাস্যাসিতঃ নাস্যবয়বী, ধারণাকর্ষণাণুপপত্তি-প্রসঙ্গঃ। যো যোহনবয়বী তত্র তত্র ধারণাকর্ষণে ন ভবত্য, যথা বিজ্ঞানান্যে, ন চাহং গোষ্ঠাদিস্তথা, তদ্ব্যগ্রানবয়-নীতি।—তাৎপর্যটীকা।

২। তদ্ব্যভাষ্যকারস্ত স্বত্ববুৎ পরমতেন তত্ত্বং।—তাৎপর্যটীকা।

বলিয়াছেন যে, “এই ত্রব্য এক” এইরূপ যে একবুদ্ধি হয়, তাহার বিষয় কি, ইহাই পূৰ্বপক্ষবাদীর নিকটে জিজ্ঞাস্য। পূৰ্বপক্ষবাদীর মতে ঘটাদি ত্রব্য পরমাণুপঞ্জায়ক, সুতরাং উহা নানা; উহাকে এক বলিয়া বুঝিলে ভুল বুঝা হয়। সকল লোকেই পরমাণুপঞ্জায়ক নানা পদার্থকে এক বলিয়া ভুল বুঝিতেছে, ইহা বলা যায় না। নানা পদার্থবিষয়ে একবুদ্ধি ব্যাহত, উহা কোন দিনই বর্থাণবুদ্ধি হইতে পারে না। যদি ঐ একবুদ্ধি একমাত্র বিষয়েই হয়, তাহা হইলেই উহা বর্থাণ হইতে পারে। তাহা হইলে পরমাণুপঞ্জা হইতে অতিরিক্ত অবধৌ বলিয়া একটি ত্রব্য মানিতেই হয়। ঐ বর্থাণ একবুদ্ধির বিষয়রূপে যখন তাহা মানিতেই হইবে, তখন পূৰ্বপক্ষবাদীর সম্মত পরিভাষা করিতেই হইবে। ভাষাকারের এখানে মূল বক্তব্য এই যে, একবুদ্ধি ও অনেকবুদ্ধি ভিন্নবিভিন্নক; যেহেতু তাহাতে বিশেষ আছে অথবা তাহা যথাক্রমে অননুষ্ঠিত ও অনুষ্ঠিত-বিষয়ক, ইত্যাদিরূপে অধ্বং-ব্যতিরেকী হেতুর প্রয়োগ করিয়া পূৰ্বপক্ষবাদীর মত যখন করিতে হইবে ॥৩৫॥

সূত্র। সেনাবনবদ্ব্যগ্রহণমিতি চেন্নাতীন্দ্রিয়ত্বাদনূনাম্।

॥৩৬॥১৭॥

অনুবাদ। (পূৰ্বপক্ষ) সেনা ও বনের দ্ব্যয় প্রত্যক্ষ হয়, ইহা যদি বল অর্থাৎ যদি বল যে, হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতির সমষ্টিরূপ সেনা এবং বৃক্ষের সমষ্টিবিশেষরূপ বন বস্তুতঃ নানা পদার্থ হইলেও, ঐ সেনা ও বনকে যেমন “এক” বলিয়া প্রত্যক্ষ হয় এবং ঐ হস্তী প্রভৃতি পদার্থের দূর হইতে প্রত্যেকের প্রত্যক্ষ না হইলেও, তাহাদিগের সমষ্টিরূপ সেনা ও বনের যেমন দূর হইতে প্রত্যক্ষ হয়, তদ্রূপ পরমাণুগুলির প্রত্যেকের প্রত্যক্ষ না হইলেও, উহাদিগের সমষ্টিরূপ ঘটাদি পদার্থের প্রত্যক্ষ হইতে পারে এবং ঘটাদি পদার্থ বস্তুতঃ নানা পদার্থ হইলেও, সেনা ও বনের দ্ব্যয় উহার এক বলিয়া প্রত্যক্ষ হইতে পারে, আমাদিগের মতে তাহাই বইয়া থাকে। (উত্তর) না, অর্থাৎ ঐরূপ প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। কারণ, পরমাণুগুলি অতীন্দ্রিয় অর্থাৎ হস্তী, অশ্ব প্রভৃতি সেনাঙ্গ এবং বনাক্ষ বৃক্ষ অতীন্দ্রিয় নহে, এ জন্ত সেনা ও

১। একাধিকবুদ্ধী ভিন্নবিভিন্ন বিষয়বস্তুতে জ্ঞানবিভিন্নবুদ্ধিরং। অথবা একাধিকবুদ্ধী ভিন্নবিভিন্ন সমুচ্চিতা-নুষ্ঠিতবিষয়বস্তু ইতিমতি যথা ইত্যেকেকোভি যথা।—ভাষ্যকারিক। পটোৎসাহিত্যোক্তবিধা বুদ্ধিভেদবুদ্ধি, তত্ত্ব ইতি নানাবিধা বুদ্ধিরনেকবুদ্ধি। অননুষ্ঠিতবিষয়বস্তুকে বুদ্ধি, অনুষ্ঠিতবিষয়বস্তুকে বুদ্ধিমতি।—ভাষ্যকারিক।

২। হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতি, এই চারিটি বৃক্ষের উপাধানকে “সেনাঙ্গ” বলে। এই চতুর্দশ সেনাই পুরোক্ত “সেনা” শব্দের অর্থ। ভাষ্যকারও পুরোক্ত হস্তী প্রভৃতি অশ্বচতুর্দশ বুঝাইতেই ভাবো “সেনাঙ্গ” শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। বৃক্ষের সমষ্টিবিশেষকে “বন” বলে। প্রত্যেকটি বৃক্ষ ঐ বনের অঙ্গ। ভাষ্যকার “বনাক্ষ” বলিয়া ঐ অর্থই প্রকাশ করিয়াছেন। “হস্তাশ্বরথপাদাক্ষ সেনাঙ্গং ভাস্করত্বং”। “কাজিনী বাহিনী সেনা পুতনাংহীকিনী চহুঃ”।—অমরকোষ, কত্রিহবর্ণ।



বনের পূর্বোক্তরূপ প্রত্যক্ষ হইতে পারে ; পরমাণুগুলি প্রত্যেকে অত্যন্ত বসিয়া, তাহাদিগের সমষ্টিরও কোনরূপে প্রত্যক্ষ হইতে পারে না ।

ভাষ্য । যথা সেনাদ্বেষু বনাদ্বেষু চ দূরাদগৃহমাণপৃথক্বেদ্বৈকমিদ-  
মিত্যুপপদ্যতে বুদ্ধিঃ, এবমণুব সন্ধিতেষু গৃহমাণপৃথক্বেদ্বৈকমিদমিত্যুপ-  
পদ্যতে বুদ্ধিরিতি । যথা গৃহমাণপৃথক্ভাবনাং সেনাবনাদ্ভাবনামারাৎ  
কারণান্তরতঃ পৃথক্ভাবনাগ্রহণঃ, যথা গৃহমাণজাতীনাং পলাশ ইতি বা খদির  
ইতি বা নারাজ্জাতিগ্রহণঃ ভবতি । যথা গৃহমাণপ্রস্পন্দানাং নারাৎ স্পন্দ-  
গ্রহণঃ । গৃহমাণে চার্ঘজাতে পৃথক্ভাবনাগ্রহণাদেকমিতি ভাস্তপ্রত্যয়ো  
ভবতি, ন ত্বণুনামগৃহমাণপৃথক্ভাবনাং কারণতঃ পৃথক্ভাবনাগ্রহণাদ্ভাস্ত এক-  
প্রত্যয়োহতীন্দ্রিয়দ্বাদণুনামিতি ।

অনুবাদ । ( পূর্বপক্ষ ) যেমন<sup>১</sup> দূরবশতঃ অগৃহমাণপৃথক্ অর্থাৎ  
দূরনিবন্ধন যাহাদিগের পৃথক্ প্রত্যক্ষ হয় না, এমন সেনাদ্বেষ ও বনাদ্বেষসমূহে “ইহা  
এক” এই প্রকার বুদ্ধি উপপন্ন হয়, এইরূপ অগৃহমাণপৃথক্ অর্থাৎ যাহাদিগের  
পৃথক্ প্রত্যক্ষ হয় না, এমন পুঞ্জীভূত পরমাণুসমূহে “ইহা এক” এই প্রকার  
বুদ্ধি উপপন্ন হয় ।

( উত্তর ) যেমন গৃহমাণপৃথক্ অর্থাৎ যাহাদিগের পৃথক্ প্রত্যক্ষ হয়,  
নিকটে গেলেই দেখা যায়, এমন সেনাদ্বেষ ও বনাদ্বেষ দূররূপ নিমিত্তান্তরবশতঃ  
পৃথক্ প্রত্যক্ষ হয় না, ( এবং ) যেমন গৃহমাণজাতি অর্থাৎ নিকটে গেলে  
যাহাদিগের জাতি প্রত্যক্ষ হয়, এমন পদার্থগুলির ( পলাশ খদিরাদি পদার্থের )  
দূরবশতঃ “পলাশ” এই প্রকারে অথবা “খদির” এই প্রকারে ( পলাশ  
খদিরাদি ) জাতির প্রত্যক্ষ হয় না ( এবং ) যেমন গৃহমাণক্রিয় অর্থাৎ নিকটে গেলে  
যাহাদিগের ক্রিয়া প্রত্যক্ষ হয়, এমন পদার্থগুলির ( বৃক্ষাদির ) দূরবশতঃ ক্রিয়া

১। ভাষ্যে “দূর” শব্দ ও “যাহাৎ” শব্দ দুইই অর্থে প্রযুক্ত। প্রাচীনমণ ইজল প্রয়োগ করিতেন।  
“মতিদূরং সানীয়াৎ” ইত্যাদি সাংখ্যকারিকা দ্রষ্টব্য। দূরত্বকে যে “কারণান্তর” বলা হইয়াছে, ঐ কারণ শব্দের  
অর্থ প্রয়োজনক। প্রাচীনমণ প্রয়োজনক অর্থেও “কারণ” শব্দের প্রয়োগ করিতেন। ভাষ্যকার বাস্তবায়নও তাহা  
অনেক স্থলে করিয়াছেন। প্রথমবার, ১২৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। যে সকল পদার্থের পৃথক্বেদ গ্রহণ হয়, এমন পদার্থেরই  
দূরবশতঃ পৃথক্বেদ অসম্ভব হয় অর্থাৎ ঐক্য পদার্থেরই পৃথক্বেদ অসম্ভব অজনিমিত্তক হয়। ভাষ্যকার  
ইহারই দৃষ্টান্তরূপে গরু জাতি ও ক্রিয়ার অসম্ভবকে কথা বলিয়াছেন। জাতি ও ক্রিয়ার দ্বারা পৃথক্বেদ পদ-  
পদার্থের যে গৃহমাণপদার্থে অসম্ভব, তাহার স্তূপাদিপ্রযুক্ত ইহাই ভাষ্যকারের বিবক্ষিত।

প্রত্যক্ষ হয় না। এইরূপ গৃহ্যমাণ পদার্থসমূহেই অর্থাৎ বাহাদিগের প্রত্যক্ষ হয়, এমন পদার্থসমূহেই পৃথক্‌ত্বের প্রত্যক্ষ না হওয়ায় “এক” এই প্রকার ভ্রান্ত প্রত্যক্ষ (সাদৃশ্য প্রযুক্ত ভ্রম প্রত্যক্ষ) হয়। কিন্তু অগৃহ্যমাণ-পৃথক্‌ত্ব অর্থাৎ বাহাদিগের পৃথক্‌ত্বের প্রত্যক্ষ হয় না—হইতেই পারে না, এমন পরমাণুসমূহের কারণবশতঃ (দূরত্বাদি কোন প্রযোজকবশতঃ) পৃথক্‌ত্বের প্রত্যক্ষ না হওয়ায় ভ্রান্ত এক প্রত্যক্ষ অর্থাৎ পরমাণুসমূহেও সাদৃশ্যমূলক “ইহা এক” এই প্রকার ভ্রম প্রত্যক্ষ হয় না (হইতে পারে না)। যেহেতু পরমাণুসমূহ অতীন্দ্রিয়।

টীকণী। মহাবি তাহার প্রথমোক্ত দিকান্তস্থলে (৩৪ স্থলে) বলিয়াছেন যে, অবয়বী না থাকিলে অর্থাৎ দৃশ্যমান ঘটাদি পদার্থ পরমাণুপুঞ্জরূপ হইলে তাহাদিগের, এমন কি, কোন পদার্থেই প্রত্যক্ষ হইতে পারে না, পরমাণুপুঞ্জস্থ ঔণ-কণাদির প্রত্যক্ষও অসম্ভব। প্রত্যক্ষ অসম্ভব হইলে অল্পমানাদিও অসম্ভব। কারণ, অল্পমানাদি জ্ঞান প্রত্যক্ষমূলক। ইহাতে পূর্বপক্ষবাদীরা বলিতে পারেন এবং কোন এক সময়ে বলিয়াও গিয়াছেন যে, তোমাদিগের মতে সেনা ও বন যেমন বহু পদার্থের সমষ্টরূপ, আমাদিগের মতে ঘটাদি পদার্থগুলিও তজ্জপ বহু পরমাণুর সমষ্টরূপ। সেনাদ্ধ হস্তী প্রভৃতি এবং বনাদ্ধ বৃক্ষের দূর হইতে প্রত্যক্ষের প্রত্যক্ষ না হইলেও, তোমরা যেমন সেনা ও বনকে দূর হইতে প্রত্যক্ষ কর এবং ঐ সেনা ও বন বস্তুতঃ বহু পদার্থ হইলেও তাহাকে “এক” বলিয়াই প্রত্যক্ষ কর, তজ্জপ পরমাণুগুলির প্রত্যক্ষের প্রত্যক্ষ না হইলেও, উহাদিগের সমষ্টের প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে এবং উহা বস্তুতঃ নানা পদার্থ হইলেও সেনা ও বনের জায় উহা এক বলিয়াই প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। মহাবি শেষে এই স্থলের দ্বারা এই পূর্বপক্ষেরও সূচনা করিয়া, ইহারও উত্তর সূচনা করিয়াছেন। মহাবি এই স্থলেই বলিয়াছেন যে, পরমাণু, সেনা ও বনের জায় প্রত্যক্ষ হইতে পারে না; কারণ, পরমাণুগুলি অতীন্দ্রিয়। মহাবির মনের কথা এই যে, পরমাণুগুলি বহু প্রত্যক্ষে অতীন্দ্রিয়, তখন তাহাদিগের সমষ্টও অতীন্দ্রিয় হইবে। কারণ, ঐ সমষ্টই পরমাণু হইতে পৃথক্‌ পদার্থ নহে। পৃথক্‌ বলিয়া স্বীকার করিলে অবয়বী নানাই হইবে। স্বমতস্বার্থ তাহা না করিলে পরমাণুপুঞ্জরূপ ঘটাদি পদার্থ কোনরূপেই প্রত্যক্ষ হইতে পারিবে না। প্রত্যক্ষই যদি না হইতে পারিল, তাহা হইলে আর “ইহা এক এবা” ইত্যাদি প্রকার একবুদ্ধির সম্ভাবনাই নাই। সুতরাং উহার উপপত্তির কথা অলীক এবং সে উপপত্তিও হইতে পারে না। কারণ, নানা পদার্থের কোন কারণে প্রত্যক্ষের পৃথক্‌ত্ব প্রত্যক্ষ না হইলে তাহাতে “ইহা এক” এই প্রকার বুদ্ধি জন্মে। যেমন সেনাদ্ধ ও বনাদ্ধের প্রত্যক্ষের পৃথক্‌ত্ব দূর হইতে দেখা যায় না; এ জন্ত সেনা ও বনকে “এক” বলিয়া দেখে। কিন্তু পরমাণুগুলি প্রত্যক্ষ-যোগ্য পদার্থই নহে; সুতরাং তাহাদিগের পৃথক্‌ত্বও প্রত্যক্ষের অযোগ্য। সেনাদ্ধ ও বনাদ্ধের জায় দূরত্বাদি অজ্ঞ কোন কারণবশতঃই যে তাহাদিগের পৃথক্‌ত্বের প্রত্যক্ষ হয় না, তাহা নহে; সুতরাং সেনা ও বনের জায় পরমাণুসমষ্টিকে এক বলিয়া বুঝা অসম্ভব। জাযাকার পূর্বস্থলের শেষ ভাষ্যে



বলিয়াছেন যে, তাহারা প্রত্যক্ষ লোপ না করিয়া, পরমাণুপুঞ্জকেই প্রত্যক্ষের দ্বারা বলিয়া স্বীকার করেন, তাহারা ঘটাদি পদার্থে “ইহা এক জন্ম” এইরূপ একবুদ্ধির উপপত্তি কল্পিতে পারেন না। কারণ, পরমাণুপুঞ্জরূপ নানা পদার্থে একবুদ্ধি ব্যাহত। নানা পদার্থকে “এক” বলিয়া বুঝিলে তাহা ভ্রম হয়। মার্কজুনীন ঐ যথার্থ বুদ্ধির অপলাপ করা বাইতে পারে না। এতদ্বারা পূৰ্বপক্ষবাদীরা বলিতেন যে, বহু পদার্থেও কোনও সময়ে সকলেরই গৌণ একবুদ্ধি হইয়া থাকে। যেমন সেনা ও বন বস্তুতঃ বহু পদার্থ হইলেও, দূরত্বরূপ কারণান্তরবশতঃ সেনা হস্তী প্রভৃতির এবং বনাঞ্চ বৃক্ষগুলির পৃথক্‌ত্বের প্রত্যক্ষ না হওয়ার, দূর হইতে সেনা ও বনকে সকলেই এক বলিয়া দেখে। এইরূপ পুঞ্জীভূত পরমাণুগুলির পরস্পর বিলক্ষণ সংযোগবশতঃ প্রত্যক্ষের পৃথক্‌ত্বের প্রত্যক্ষ হইতে না পারায়, উহাদিগকে এক বলিয়াই দেখা যায়। ইহাকে বলে “ভাক্ত” একবুদ্ধি। বহু পদার্থে পূৰ্ব্বোক্তরূপ কারণে একবুদ্ধিই ভাক্ত একবুদ্ধি। একমাত্র পদার্থে একবুদ্ধিই মুখ্য একবুদ্ধি। ভাষ্যকার তাহার পূৰ্ব্বোক্ত ভাষ্যের সংগতি অত্যাশ্ৰিত্যে নহিঁর এই পূৰ্বপক্ষকে পূৰ্ব্বোক্ত প্রকারেই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বস্তুতঃ নহিঁর এই শেষ সূত্রের দ্বারা পূৰ্বপক্ষবাদীদিগের সমস্ত সমাধানেরই আশঙ্কা করিয়া, পরমাণুগুলির অতীন্দ্রিয়ত্ব হেতু দ্বারা সমস্ত সমাধানেরই নিরাস করিয়াছেন। তাই ভাষ্যকাটীকাকার কোন বিশেষ আশঙ্কায় উল্লেখ না করিয়া, সামান্যতঃ বলিয়াছেন, “আশঙ্কাত ইতরস্বত্রম্।”

বুদ্ধিকার বিব্রাণ বলিয়াছেন যে, পূৰ্বসূত্রোক্ত বুদ্ধি সমীচীন নহে। কারণ, যেমন নৌকার আকর্ষণের দ্বারা নৌকাহ ব্যক্তিদিগের আকর্ষণ হয় এবং ভাণ্ড ধারণের দ্বারা ভাণ্ডের দধির ধারণ হয়, তদ্রূপ বিলক্ষণ-সংযোগবশতঃই পরমাণুপুঞ্জরূপ ঘটাদির পূৰ্ব্বোক্তরূপ ধারণ ও আকর্ষণ হইতে পারে, তাহাতে পরমাণুপুঞ্জ ভিন্ন অবরবী স্বীকারের কোনই প্রয়োজন নাই। নহিঁর ইহা চিন্তা করিয়া তাহার প্রথম সিদ্ধান্তসূত্রোক্ত বুদ্ধিকেই তিনি সমীচীন মনে করিয়া, তাহাতে পূৰ্বপক্ষবাদীদিগের সমাধানের আশঙ্কাপূৰ্ব্বক এই শেষ সূত্রের দ্বারা তাহার খণ্ডন করিয়াছেন। বুদ্ধিকার এই কথা বলিয়া এই সূত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, যেমন অতিদূরস্থ একটি দ্রব্য ও একটি বৃক্ষাদির প্রত্যক্ষ না হইলেও, সেনাবাদির প্রত্যক্ষ হয়, তদ্রূপ এক পরমাণুর প্রত্যক্ষ না হইলেও পরমাণুসমূহরূপ ঘটাদি পদার্থের প্রত্যক্ষ হইতে পারে, এ কথা বলা যায় না। কারণ, পরমাণুগুলি অতীন্দ্রিয়, তাহাদিগের মহত্ব নাই, প্রত্যক্ষে মহত্ব (মহৎ পরিমাণ) কারণ। সেনাবাদির মহত্ব থাকার তাহার প্রত্যক্ষ হইতে পারে। কলকথা, বুদ্ধিকার প্রকৃতি নব্যপণ দ্বারা তৎ হজ্জাহ্বানে সেনাবাদির দ্বায় পরমাণুপুঞ্জরূপ ঘটাদি পদার্থেরই প্রত্যক্ষকে পূৰ্বপক্ষরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ভাষ্যকারের দ্বায় সেনা ও বনের একবুদ্ধিকে দৃষ্টান্ত দিয়া পরমাণুপুঞ্জরূপ ঘটাদি পদার্থের একত্ব প্রত্যক্ষকে পূৰ্বপক্ষরূপে ব্যাখ্যা করেন নাই। নহিঁর কিন্তু প্রথমোক্ত সিদ্ধান্তসূত্রে ‘দক্ষাগ্রহণ’ বলিয়া ঘটাদি পদার্থের একত্বরূপ সূত্রেরও অগ্রহণ বলিয়াছেন। ইহা বুদ্ধিকারও সেখানে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সুতরাং এই সূত্রে সেনা-বনাদির দ্বায় গ্রহণ হয়, এই কথা যে নহিঁর বলিয়াছেন, তাহাতে সেনাবনাদিতে একত্ব গ্রহণের দ্বায় পরমাণুপুঞ্জরূপ ঘটাদিতে একত্বের গ্রহণ হয়, ইহাও



মহাবীর যুক্তি বলিয়া যুক্তিকারেরও গ্রহণ করা উচিত মনে হয়। ভাষ্যকার তাহার পূর্বভাষ্যানুসারে পুরোক্ত একই গ্রন্থকেই এখানে প্রধানরূপে আশ্রয় করিয়া, পূর্বপক্ষ ও উত্তরপক্ষের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সুত্রে "সেনাবনাদিপ্রত্যক্ষবৎ" অথবা "সেনাবনাদিবৎ" এইরূপ পাঠই যুক্তিকার-সম্মত বলিয়া বুঝা যায়। কিন্তু "সেনাবনবৎ" এইরূপ পাঠই প্রাচীনদিগের সম্মত।

যুক্তিকারের কথার বলবৎ এই যে, নৌকা ও নৌকাই ব্যক্তির এবং ভাও ও ভাওই দ্বিবি আধার আধের ভাব থাকায়, আধার নৌকা ও ভাওর ধারণ ও আকর্ষণে আধের মহাবাদি ও দ্বিবি ধারণ ও আকর্ষণ হইতে পারে। কিন্তু পরমাণুগুলি পরস্পর বিলক্ষণ-সংযোগবিশিষ্ট হইলেও তাহা-বিশেষ এইরূপ আধার আধের ভাব নাই। এক পরমাণু অপর পরমাণুর অথবা বহু পরমাণুও অপর বহু পরমাণুর আধার হয় না। সুতরাং পরমাণুগুলির পুরোক্তরূপ ধারণ ও আকর্ষণ হইতে পারে না। তবে যদি বিজাতীয় সংযোগরূপেই উদ্ভাসিগের এইরূপ ধারণ ও আকর্ষণ হইতে পারে, ইহা স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে পুরোক্ত ঐ যুক্তি ত্যাগ করিয়া, মহাবী শেষ সূত্রের দ্বারা অল্প যুক্তি সমর্থন করিয়াছেন, ইহা বলা যায়। তাহাতে পারে। অবশ্যই সত্যতঃ যে পুরোক্তরূপ ধারণ ও আকর্ষণ হইতে পারে না, ধারণ ও আকর্ষণ যে অবশ্যবীরই ধর্ম, সুতরাং উহা অবশ্যবীর সাধক, এ বিষয়ে উদ্যোতকরের কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। যুক্তিকার সে সকল কথা কেন চিন্তা করেন নাই, ইহা চিন্তনীয়।

দূর হইতে কার্ত্ত, লোষ্ট্র, তৃণ ও পাতাখাদি পদার্থগুলি প্রত্যেক পৃথকভাবে প্রত্যক্ষ হয় না, কিন্তু ঐ সকল পদার্থের পুঞ্জ প্রত্যক্ষ হয়। ঐ সকল পদার্থ পরস্পর সংযুক্ত হইয়াও কোন অবশ্যী জব্যাক্তর জন্মায় না; কারণ, উহারা একজাতীয় পদার্থ নহে। তাহা হইলেও যেমন উদ্ভাসিগের প্রত্যক্ষ হয়, তদ্রূপ পরমাণুগুলি প্রত্যেকে দৃশ্য না হইলেও তাহাদিগের সমূহ বা পুঞ্জ পৃথক অবশ্যী জন্ম না জন্মাইবাও দৃশ্য হইতে পারে। এইরূপ পূর্বপক্ষ চিন্তা করিয়া তত্বতঃ উদ্যোতকর বলিয়া-ছেন যে, পূর্ণমান পদার্থের অগ্রহণই অননিমিত্তক হয়। উদ্যোতকরের ভাবার্থ্য এই যে, পরমাণু-গুলির প্রত্যেকের প্রত্যক্ষ কেন হয় না, এতদ্বত্তে উহারা অতীন্দ্রিয়, উহারা পরমহস্য বলিয়া স্বরূপতঃ গ্রহণের যোগ্যই নহে, ইহাই বলিতে হইবে। পূর্বপক্ষবাদীও ইহাই বলিয়া থাকেন। তাহা হইলে ঐ অতীন্দ্রিয় পরমাণুগুলি মিলিত হইলেও, পরস্পর সংশ্লিষ্ট হইয়া পুঞ্জীভূত হইলেও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হইতে পারে না। চক্ষুরিন্দ্রিয়ের অবিরত বাহনমূহ মিলিত হইলে কি চাক্ষু হইয়া থাকে? যদি বল, বায়ুর রূপ না থাকাতাই তাহা চাক্ষু হইতে পারে না। তাহা হইলে পরমাণুর মহাব না থাকায় তাহাও প্রত্যক্ষ হইতে পারে না; চাক্ষু প্রত্যক্ষে রূপের রূপ মহাবও প্রত্যক্ষমাত্রের কারণ। সুতরাং পরমাণুগুলিকে অতীন্দ্রিয় বলিয়া, আবার তাহাদিগকেই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বলিলে মহাবিরোধ হইবে। যদি বল, মিলিত বহু পরমাণুতে এমন কোন বিশেষ জন্মে, বাহার ফলে তাহা-বিশেষ প্রত্যক্ষ হয়, এতদ্বত্তে উদ্যোতকর বলিয়াছেন যে, তাহা হইলে ঐ বিশেষই অবশ্যবীর। অবশ্যবীর পরমাণুসমূহে আর বিশেষ কি জন্মিবে? যদি বল, বিলক্ষণ-সংযোগই বিশেষ, তাহাও বলিতে পার না। কারণ, পরমাণুগুলি যখন অতীন্দ্রিয়, তখন তাহাদিগের সংযোগও অতীন্দ্রিয় হইবে;



অত্যাগ প্রত্যক্ষ হইতে পারে না ;—তাহার প্রত্যক্ষ ব্যতীত সংযুক্ত পরমাণুগুণের প্রত্যক্ষ  
কিরূপে হইবে ? ( পরে এ কথা পরিস্ফুট হইবে ) । পরন্তু অনেক পদার্থে একবুদ্ধি মিথ্যাজ্ঞান ।  
বিশেষের অল্পপদ্ধতি থাকিয়া সামান্য দর্শন ঐ মিথ্যাজ্ঞানের নিমিত্ত । পরমাণুগুলি অতীন্দ্রিয় বলিয়া  
তাহাদিগের সামান্য দর্শন অসম্ভব ; অত্যাগ বিশেষের অদর্শনই বা দেখানে কিরূপে বলা হইবে ?  
তাহা হইলে পরমাণুগুণমূহে পুরোঁক নৈমিত্তিক মিথ্যাজ্ঞান হইতে পারে না । উদ্ভোতকর এই কথা  
বলিয়া শেষে বলিয়াছেন যে, এই কথার দ্বারা “ভাক্ত” ও “ঔপমিক” প্রত্যয় হইতে পারে না, ইহা  
বলা হইল । কারণ, যে পদার্থ তথাক্রমে নহে, তাহার তথাক্রমে পদার্থের সহিত সাদৃশ্যই “ভক্তি” ।  
ঐ সাদৃশ্য উত্তর পদার্থেই থাকে, উত্তর পদার্থই উক্তকে ভজনা করে, এ ভক্ত<sup>১</sup> উক্তকে প্রাচীনগণ  
“ভক্তি” নামে উল্লেখ করিয়াছেন । ঐ ভক্তি-প্রযুক্ত যে ভেদজ্ঞানবিশেষ, তাহাকে বলিয়াছেন—  
ভাক্ত জ্ঞান । যেমন কোন বাহ্যিককে গোর জায় মন্দবুদ্ধি বুঝিয়া বলা হয়—“গৌর্য্যবাহকঃ”  
অর্থঃ “এই বাহ্যিক গো” ; এই প্রকার জ্ঞান ঐ স্থলে ভাক্ত জ্ঞান, উহা সাদৃশ্য প্রযুক্ত । পরমাণু-  
গুলি অতীন্দ্রিয় বলিয়া তাহাতে ঐরূপ কোন ধর্ম বুঝা যায় না । অত্যাগ তাহাতে ঐরূপ ভাক্ত  
প্রত্যয়ও হইতে পারে না । ঐরূপ দেখানে পুরোঁকভূত উক্তকে ভেদজ্ঞান থাকিয়া সদৃশ বলিয়া  
বুঝা হয়, তাহার নাম ঔপমিক জ্ঞান বা উপমান-প্রত্যয় । ইহাকে প্রাচীনগণ “গৌণ” প্রত্যয়  
বলিয়াই বহু স্থলে উল্লেখ করিয়াছেন । “এই নানবক সিংহ” এইরূপ জ্ঞানই ঐ গৌণ প্রত্যয়ের  
উদাহরণ । ভাক্ত জ্ঞানস্থলে পদার্থবিশেষের ভেদজ্ঞান থাকে না, গৌণ প্রত্যয়স্থলে ভেদজ্ঞান থাকে ।  
তাৎপর্য্যটীকাকার ঐ জ্ঞানবিশেষের এইরূপ ভেদ বর্ণন করিয়া—“সিংহো নানবকঃ” এই স্থলে “সিংহ”  
শব্দের উত্তর আচার অর্থে কিপ প্রত্যয় করিয়া, পরে “সিংহ” এই নামধাতুর উত্তর কর্তৃবাচ্যে “অচ্”  
প্রত্যয়বোধে সিংহ শব্দের দ্বারা সিংহসদৃশ, এইরূপ অর্থ বুঝা যায়, অত্যাগ ঐ স্থলে “নানবক  
সিংহসদৃশ” এইরূপই স্বার্থ জ্ঞান হওয়ায়, ঐ জ্ঞান “ভাক্ত” নহে, উহা “ঔপমিক জ্ঞান” এইরূপ  
নির্দেশ করিয়াছেন । তিনি “ভাক্তী”-প্রারম্ভেও<sup>২</sup> গৌণ প্রত্যয়ের ঐরূপই স্বরূপ বর্ণন করিয়া  
“সিংহো নানবকঃ” এইরূপ স্থলেই তাহার উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন । মূলকথা, সাদৃশ্য-জ্ঞান-  
মূলক এই গৌণ প্রত্যয়ও পরমাণুগুণমূহে হইতে পারে না । কারণ, পরমাণুগুলি অতীন্দ্রিয়, তাহাতে  
আত্যাগ সাদৃশ্য প্রত্যক্ষ সম্ভব নহে ।

তাম্য । ইদমেব পরীক্ষ্যতে—কিমেকপ্রত্যয়োগ্যুসঙ্গমবিষয় আহো-  
ব্রিজেতি, অধুনঙ্গয় এব সেনাবনাদানি,—ন চ পরীক্ষ্যমাণমুদাহরণমিতি

১। ভক্তিনামাতথাক্রমে তথা ভাবিতিঃ সামাজ্যে, উত্তমেন ভজ্যতে ইতি ভক্তিঃ, যথা বাহ্যিকত্ব মনোমত্ত-  
গজেন্দ্রিয়াদি বাহ্যিকো দৌহিত্যি । তথাক্রমে ভক্তভাবিতিঃ সামাজ্যঃ তত্তোপমানমত্যাগো ভুক্তঃ যথা সিংহো  
নানবক ইতি, সিংহ ইব সিংহঃ ।—স্মারত্যাগিক ।

২। অপি চ পরশমঃ পরত লক্ষ্যমাণগুণবোধেন বর্ত্তক ইতি পর প্রযোক্তৃমতিপত্তোঃ সম্ভবতিপতিঃ স যৌগঃ,  
ন চ ভেদপ্রত্যয়পুংসঃ । নানবকঃ সিংহঃ সিংহসদৃশঃ সিংহঃ সিংহঃ ।—ভাক্তী ।

যুক্ত সাধ্যাদিতি । দৃষ্টমিতি চেৎ তদ্বিষয়স্ত পরীক্ষোপপত্তেঃ । বদপি  
নন্তেত দৃষ্টমিদং সেনাবনাস্তানাং পৃথক্বত্তাগ্রহণাদভেদেনৈকমিতিগ্রহণং,  
ন চ দৃষ্টং শক্যং প্রত্যাখ্যাতুমিতি, তচ্চ তন্মৈবং, তদ্বিষয়স্ত পরীক্ষোপপত্তেঃ,  
—দর্শনবিষয় এবাং পরীক্ষাতে—বোহন্নৈকমিতি প্রত্যয়ো দৃষ্টতে স  
পরীক্ষাতে কিং দ্রব্যান্তরবিষয়ো বা অথাণুসকরবিষয় ইত্যত্র দর্শনমন্ততরস্ত  
সাধকং ন ভবতি ।

অনুবাদ । একবুদ্ধি কি অর্থাৎ ঘটাদি পদার্থে “ইহা এক” এই প্রকার বুদ্ধি  
কি পরমাণুপুঞ্জবিষয়ক, অথবা নাহে, অর্থাৎ ঐ একবুদ্ধি কোন অতিরিক্ত একদ্রব্য-  
বিষয়ক ? ইহাই পরীক্ষা করা হইতেছে । ( পূর্বপক্ষবাদীর মতে ) সেনাঙ্গ ও  
বনাস্তগুলি পরমাণুপুঞ্জই, কিন্তু পরীক্ষ্যমাণ ( বস্তু ) উদাহরণ, ইহা যুক্ত নহে, যেহেতু  
( তাহাতে ) সাধ্যক আছে [ অর্থাৎ যাহা পরীক্ষিত নহে, কিন্তু পরীক্ষ্যমাণ, তাহা  
সাধ্য, তাহা নিক্ত না হওয়ায় দৃষ্টান্ত হইতে পারে না । সেনাঙ্গ ও বনাস্তও পূর্বপক্ষ-  
বাদীর মতে পরমাণুপুঞ্জ, উহা প্রত্যক্ষের বিষয় বলিয়া নিক্ত না হওয়ায় দৃষ্টান্ত  
হইতে পারে না ] ।

( পূর্বপক্ষ ) দৃষ্ট, ইহা যদি বল ? ( উত্তর ) না । যেহেতু তদ্বিষয়পদার্থের  
( প্রত্যক্ষবিষয় ঐ জ্ঞানের ) পরীক্ষার দ্বারা উপপত্তি হয় । বিশদার্থ এই যে, যাহাও  
মনে করিবে ( যে ) সেনাঙ্গ ও বনাস্তসমূহের পৃথক্বত্তের অপ্রত্যক্ষবশতঃ অভিন্নরূপে  
“এক” এই প্রকার জ্ঞান দেখা যায়,—দৃষ্টকে প্রত্যাখ্যান করিতে পারা যায় না ।  
( উত্তর ) তথাপি তাহা এই প্রকার নহে, অর্থাৎ ঐরূপ একবুদ্ধি দৃষ্ট হইলেও উহা  
প্রকৃতস্থলে দৃষ্টান্ত হয় না । যেহেতু তদ্বিষয়ের ( পূর্বোক্তরূপ প্রত্যক্ষবিষয় ঐ  
জ্ঞানের ) পরীক্ষার দ্বারা উপপত্তি হয় । বিশদার্থ এই যে, প্রত্যক্ষবিষয় ইহাকেই  
পরীক্ষা করা হইতেছে,—এই যে “এক” এই প্রকার জ্ঞান দৃষ্ট হইতেছে, তাহাই  
পরীক্ষা করা হইতেছে । কি দ্রব্যান্তরবিষয়ক, অথবা পরমাণুপুঞ্জবিষয়ক ? অর্থাৎ  
“ইহা এক” এই প্রকার যে প্রত্যয় বা জ্ঞান দেখা যায়, তাহা কি পরমাণুপুঞ্জ ভিন্ন

১। ভাবো “তচ্চ” ইহার ব্যাখ্যা তদপি । “তদপি” এই অর্থে “তদপি” এইরূপ শব্দটির আরোপ দেখা যায় ।  
“তদপি অস্মিন্মহাভিঃ”—নৈমদ্বীপভট্ট, ৩য় সর্গ । আংগণীকাক্য “তচ্চ তন্মৈবং” এইরূপ ভাবাপন্ন উক্ত  
করার এখানে অন্তরূপ পাঠ প্রকৃত বলিয়া সুস্বীকৃত হয় নাই । ভাবো “বদপি” এই কথাটির দ্বারা বদপি এইরূপ  
অর্থেরও ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে ।



এক ভ্রাব্যবস্থায় হয় অথবা পরমাণুপুঞ্জরূপ বহু ভ্রাব্যবস্থায় হয় ? এই বিষয়ে (এই পরীক্ষ্যমাণ অসিদ্ধ বিষয়ে) দর্শন অর্থাৎ পূর্বোক্তরূপ একবুদ্ধির প্রত্যক্ষ একতরের সাধক হয় না।

তিনি। ভাব্যকার পূর্ণপক্ষবাদীকে নিরস্ত করিতে আর একটি বিশেষ কথা বলিয়াছেন যে, পূর্ণপক্ষবাদী সেনাপ ও বনাদকে দৃষ্টান্তরূপে আশ্রয় করিতে পারেন না। সেনাপ ও বনাদ মান্য পদার্থ হইলেও দূর হইতে তাহাদিগের পৃথক্বেষ প্রত্যক্ষ না হওয়ায় যেমন সেনাপ্তরূপে ও বনাদ-রূপে উহাতে একবুদ্ধি জন্মে, এইরূপ কথাও তিনি বলিতে পারেন না। কারণ, ঐ সেনাপ ও বনাদে যে একবুদ্ধি হয়, তাহা কি পরমাণুপুঞ্জই হয় অথবা অতিরিক্ত অবয়বী ত্রয়ো হয়, ইহাই পরীক্ষা করা (নিচর দ্বারা নির্ণয় করা) হইতেছে। ঐ সেনাপ ও বনাদ যদি পরমাণুপুঞ্জই হয়, তাহা হইলে উহা অতীন্দ্রি হইয়া পড়ে—উহাতে একবুদ্ধি অসম্ভব হয়। পূর্ণপক্ষবাদীর মতে তখন তাহার আশ্রিত সেনাপ ও বনাদ প্রকৃতি সমস্তই পরমাণুপুঞ্জ, তখন তিনি কাহাকেও দৃষ্টান্ত-রূপে গ্রহণ করিতে পারেন না, তাহার নিজ মতে এখানে অসিদ্ধান্ত সমর্থনের অমূল্য দৃষ্টান্তই নাই। ঐ একবুদ্ধিও দৃষ্টান্ত হইতে পারে না। কারণ, ঐ একবুদ্ধি পরমাণুপুঞ্জবিষয়ক, অথবা অতিরিক্ত ভ্রাব্যবস্থায়ক, ইহা পরীক্ষা করা হইতেছে। বাহা পরীক্ষ্যমাণ, অর্থাৎ বাহা সিদ্ধ নহে—সাধ্য, তাহা দৃষ্টান্ত হয় না। উভয়বাদিসিদ্ধ পদার্থই দৃষ্টান্ত হইয়া থাকে।

পূর্ণপক্ষবাদী যদি বলেন যে, সেনাপ ও বনাদের পৃথক্বেষ প্রত্যক্ষ না হওয়ায়, তাহাতে যে অতিমহতশে একবুদ্ধি জন্মে, তাহা দৃষ্ট অর্থাৎ মানস প্রত্যক্ষসিদ্ধ। দৃষ্ট ঐ একবুদ্ধির অপলাপ করা যাইবে না; হুতবাং উভয়বাদিসিদ্ধ ঐ একবুদ্ধিকে দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করিয়া, পরমাণুপুঞ্জরূপ ঘটাদি পদার্থেও ঐরূপ একবুদ্ধি জন্মে, ইহা বলিতে পারি। ভাব্যকার শেষে এই সনাদানের উল্লেখ করিয়া তত্বতরে বলিয়াছেন যে, তবাশি উহা দৃষ্টান্ত হইতে পারে না। কারণ, যে একবুদ্ধির দর্শন অর্থাৎ প্রত্যক্ষ হয় বলিতেছে, ঐ দর্শনের বিষয় একবুদ্ধিকেই, উহা কি পরমাণুপুঞ্জই হয় অথবা অতিরিক্ত অবয়বী ত্রয়ো হয়, এইরূপে পরীক্ষা করা হইতেছে। পূর্ণোক্তরূপ একবুদ্ধির দর্শন বিজ্ঞা-মাণ কোন পক্ষেই সাধক হয় না। অর্থাৎ তোনার বতাহুবারে পরমাণুপুঞ্জও ঐ একবুদ্ধির দর্শন হইতে পারে। অল্প মতে অতিরিক্ত অবয়বী ত্রয়োও ঐ একবুদ্ধির দর্শন হইতে পারে। যদি সেনাপ ও বনাদরূপ পরমাণুপুঞ্জই ঐরূপ একবুদ্ধির দর্শন হয় বল, তাহা হইলে ঐ একবুদ্ধি দৃষ্টান্ত হইতে পারিবে না। কারণ, আমরা পরমাণুপুঞ্জ অতীন্দ্রি বলিয়া তাহাতে একবুদ্ধি অসম্ভবই বলি, উহা আমরা মানি না; হুতবাং পূর্ণপক্ষকার মতে পরমাণুপুঞ্জরূপ ঘটাদি পদার্থে একবুদ্ধি সমর্থন করিতে সেনাপ ও বনাদে একবুদ্ধি কিছুতেই দৃষ্টান্ত হইতে পারে না। পূর্ণোক্ত একবুদ্ধিকে পরীক্ষা করিয়া যদি স্বপক্ষসাধনের অমূল্যরূপে প্রতিপন্ন করা যায়, তবেই উহা দৃষ্টান্ত হইতে পারে। পূর্ণপক্ষবাদীর নিজ পরীক্ষায় যখন ঐ একবুদ্ধি সেনাপ ও বনাদ প্রকৃতি স্বভেদে পরমাণুপুঞ্জবিষয়ক বলিয়াই প্রতিপন্ন আছে, তখন তাহার নিজমতেই বা উহা দৃষ্টান্ত হইবে কিভাবে ?



ভাষ্যকারীকাকার এখানে ভাষ্য ভাষ্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, যদি দৃষ্টকে প্রত্যাখ্যান করা না যায়, তাহা হইলে অব্যবহীকেও প্রত্যাখ্যান করা যায় না; কারণ, তাহাও দৃষ্ট। যদি বল, পরীক্ষার দ্বারা অব্যবহীর প্রত্যাখ্যান করিয়াছি, পরমাণুগুণ ভিন্ন অব্যবহী নাই—ইহা নির্ণয় করিয়াছি, তাহা হইলে সেই যুক্তিতে সেনাপ ও বনাদিও প্রত্যাখ্যান করিতে হইবে। তাহা হইলে উহা দৃষ্টান্ত হইতে পারিবে না। আর কোন দৃষ্টান্ত পাওয়া যাইবে না।

ভাষ্যকার কিন্তু পূর্বপক্ষবাহীর কথিত যে সেনাপ ও বনাদি একবুদ্ধির দর্শন, এই দর্শনের বিষয় এই একবুদ্ধিকেই দৃষ্ট ও পরীক্ষাযোগ বলিয়াছেন।

ভাষ্য। নানাভাবে চাণূনাং পৃথক্‌হস্তাগ্রহণাদভেদে নৈকমিতিগ্রহণ-মতস্মিন্‌স্তদিত্তি প্রত্যয়ো যথা স্বাগৌ পুরুষ ইতি। ততঃ কিম্? অতস্মিন্‌-স্তদিত্তি প্রত্যয়স্ত প্রধানাপেক্ষিত্বাৎ প্রধানসিদ্ধিঃ। স্বাগৌ পুরুষ ইতি প্রত্যয়স্ত কিং প্রধানম্? যোহসৌ পুরুষে পুরুষপ্রত্যয়ঃ, তস্মিন্‌ সতি পুরুষ-সামান্যগ্রহণাৎ স্বাগৌ পুরুষোহয়মিতি। এবং নানাভূতেশ্চৈকমিতি সামান্যগ্রহণাৎ প্রধানেন সতি ভবিতুমিতি, প্রধানঞ্চ সর্ব্বস্তাগ্রহণাদিত্তি নোপপদ্যতে, তস্মাদভিন্ন এবায়নভেদপ্রত্যয় একমিতি।

অনুবাদ। এবং পরমাণুসমূহের নানাব্য ভাষ্যকার পৃথক্‌হস্তের অপ্রত্যক্ষবশতঃ অভিন্নরূপে “এক” এই প্রকার জ্ঞান, যাহা তাহা নহে, তাহাতে “তাহা” এই প্রকার জ্ঞান, যেমন স্বাগুতে “পুরুষ” এই প্রকার জ্ঞান। (প্রশ্ন) তাহাতে কি? অর্থাৎ পরমাণুসমূহে একবুদ্ধি—স্বাগুতে পুরুষ-বুদ্ধির গায় ভ্রমই বটে, তাহাতে বাধা কি? (উত্তর) বাধা তাহা নহে, তাহাতে “তাহা” এই প্রকার জ্ঞানের প্রধান সাপেক্ষতা-বশতঃ প্রধান সিদ্ধি হয় [ অর্থাৎ প্রমাজ্ঞানরূপ প্রধান জ্ঞান না থাকিলে ভ্রমজ্ঞান-রূপ অপ্রধান জ্ঞান হয় না, পরমাণুসমূহে একবুদ্ধিরূপ ভ্রম জ্ঞান স্বীকার করিলে প্রধান একবুদ্ধিও স্বীকার করিতে হইবে ]। (পূর্বোক্ত ভাষ্যের বিশদার্থ বর্ণনের জন্য ভাষ্যকার প্রশ্ন করিতেছেন) স্বাগুতে “পুরুষ” এই প্রকার জ্ঞানের সম্বন্ধে প্রধান (জ্ঞান) কি? (উত্তর) এই যে পুরুষে পুরুষ-বুদ্ধি, অর্থাৎ পুরুষকে পুরুষ বলিয়া যে বদার্থ জ্ঞান, তাহাই ঐ স্থলে প্রধান জ্ঞান। সেই প্রধান জ্ঞান থাকিতে পুরুষের সাদৃশ্য জ্ঞানপ্রযুক্ত স্বাগুতে “ইহা পুরুষ” এই প্রকার অপ্রধান জ্ঞান (ভ্রমজ্ঞান) জন্মে। এইরূপ প্রধান জ্ঞান থাকিলে সাদৃশ্য-জ্ঞান-প্রযুক্ত নানাভূত পদার্থে অর্থাৎ পরমাণুসমূহরূপ নানা পদার্থে “এক” এই প্রকার অপ্রধান



বা ভ্রমজ্ঞান হইতে পারে। প্রধান কিন্তু অর্থাৎ যথার্থ একবুদ্ধি কিন্তু বেহেতু সকল পদার্থের জ্ঞান হয় না, এ জ্ঞান উপপন্ন হয় না [ অর্থাৎ একবুদ্ধির বিষয় ঘটাদি পরমার্থকে পরমাণুপুঞ্জ বলিলে যখন তাহার এবং তাহাতে এককের প্রত্যক্ষ অসম্ভব, তখন প্রধান একবুদ্ধি অসম্ভব, সুতরাং ভ্রম একবুদ্ধিও অসম্ভব ] অতএব “এক” এই প্রকারে এই অভেদ-জ্ঞান অভিন্ন পদার্থেই হয়। অর্থাৎ একপদার্থেই ঐ এক বুদ্ধি জন্মে, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য ; ঐ বুদ্ধি ভ্রম নহে—উহা যথার্থ বুদ্ধি।

উদাহরণ। ভাষ্যকার পূর্ণপক্ষবাদীকে নিরস্ত করিতে এখন তাহার মতের একটি দৃষ্ট অঙ্গপ-  
পতির উল্লেখ করিগাছেন যে, ঘটাদি পদার্থ পরমাণুপুঞ্জরূপ হইলে উহা নানা অর্থাৎ অনেক  
পদার্থ, ইহা পূর্ণপক্ষবাদীর স্বীকার্য্য। অনেক পদার্থকে এক বলিয়া বোধ হইলে, ঐ বুদ্ধি ভ্রম,  
ইহাও অসম্ভব স্বীকার্য্য। বাহ্য এক নহে, তাহাতে একবুদ্ধি যথার্থ হইতেই পারে না ; উহা  
হাণ্ডিতে পুরুষ-বুদ্ধির জ্ঞান ভ্রমই হইবে। কিন্তু ঐরূপ ভ্রমবুদ্ধি স্বীকার করিলে প্রমারূপ প্রধান  
বুদ্ধিও স্বীকার করিতে হইবে। প্রমারূপ প্রধান বুদ্ধি যদি একটা নাই থাকে, উহা কোন দিনই  
না হয়, তাহা হইলে ভ্রমবুদ্ধি হওয়া অসম্ভব। যেমন হাণ্ডিতে পুরুষ-বুদ্ধির সম্বন্ধে পুরুষে পুরুষ-  
বুদ্ধিই প্রধান বুদ্ধি। পুরুষকে পুরুষ বলিয়া বুঝিলে ঐ বুদ্ধি প্রমা বা যথার্থ হয়। তাহার ফলে  
হাণ্ডিতে পুরুষের সাদৃশ্য জ্ঞান হইতে পারে। তজ্জন্ম হাণ্ডিতে পুরুষ-বুদ্ধিরূপ ভ্রম হইতে পারে।  
পুরুষে যাহার কখনও পুরুষবুদ্ধি জন্মে নাই অর্থাৎ যে ব্যক্তি পুরুষ কি, তাহা যথার্থরূপে কখনও  
জ্ঞান নাই, তাহার হাণ্ডিতে পুরুষের সাদৃশ্য-বোধ কখনই সম্ভব হয় না, সুতরাং হাণ্ডিতে পুরুষ-  
বুদ্ধিরূপ ভ্রমও তাহার জন্মিতে পারে না। অতএব ভ্রমরূপ অপ্রধান বুদ্ধি প্রমারূপ প্রধান  
বুদ্ধিকে অপেক্ষা করে অর্থাৎ কোন দিন প্রমাজ্ঞান না জন্মিলে ভ্রমজ্ঞান জন্মিতে পারে না, ইহা  
অবশ্য স্বীকার্য্য। প্রকৃত স্থলে পরমাণুসমূহরূপ অনেক পদার্থে একবুদ্ধি ভ্রম। এক পদার্থের  
সাদৃশ্য-জ্ঞানবশতই উহা জন্মিতে পারে। কিন্তু এক পদার্থকে এক বলিয়া যে প্রমারূপ প্রধান  
বুদ্ধি, তাহা কখনও না হইলে ঐ ভ্রমজ্ঞানক সাদৃশ্য জ্ঞান সম্ভব হয় না। পূর্ণপক্ষবাদীর মতে যখন  
পরমাণুপুঞ্জের অতীন্দ্রিয়বশতঃ সকল পদার্থেই প্রত্যক্ষ অসম্ভব, তখন পুরোক্তপ্রকার  
প্রমারূপ প্রধান বুদ্ধিও অসম্ভব হওয়ার পুরোক্তরূপ ভ্রমজ্ঞান হইতে পারে না। অতএব ঘটাদি  
পদার্থে এক বলিয়া যে অভেদ প্রত্যয় হয়, উহা অভিন্ন অর্থাৎ একমাত্র পদার্থেই হয়, পরমাণুসমূহ-  
রূপ অনেক পদার্থেই হয় না, ইহা প্রতিপন্ন হয়।

ভাষ্য। ইন্দ্রিয়ান্তরবিষয়েষ্বেভেদপ্রত্যয়ঃ প্রধানমিতি চেৎ ন,—  
বিশেষহেতুভাবাদ্দূর্তীস্তোগ্যবস্থা। শ্রোত্রাদিবিষয়েষু শব্দাদিষভিন্নৈবেক-  
প্রত্যয়ঃ প্রধানমনেকস্মিন্নেকপ্রত্যয়শ্চেতি। এবঞ্চ সতি দূর্তীস্তোপাদানং  
ন ব্যবতিষ্ঠাতে বিশেষহেতুভাবাৎ। অণুবু সন্ধিতেষ্বেকপ্রত্যয়ঃ কিমত-

স্মিত্তিদিতি প্রত্যয়ঃ ? স্বাণৌ পুরুষপ্রত্যয়বৎ, অধাৰ্হস্ম তথাভাবাৎ  
তস্মিত্তিদিতি প্রত্যয়ো যথাশব্দশ্চেকহাদেকঃ শব্দ ইতি । বিশেষ-  
হেতুপরিগ্রহমন্তরেণ দৃষ্টান্তৌ সংশয়মাপাদয়ত ইতি । কুন্তবৎ সঙ্কর-  
মাত্রং গন্ধাদয়োঃ পীত্যানুদাহরণং গন্ধাদয় ইতি । এবং পরিমাণ-সংযোগ-  
স্পন্দ-জাতি-বিশেষপ্রত্যয়ানপ্যনুবোক্তব্যাস্তেযু চৈবং প্রসঙ্গ ইতি ।

অনুবাদ । ইঞ্জিয়াস্তরের বিষয়সমূহে ( শব্দাদিতে ) অভেদজ্ঞান প্রধান, ইহা  
যদি বল ? ( উত্তর ) না, কারণ, বিশেষ হেতু না থাকায় দৃষ্টান্তের ব্যবস্থা হয় না ।  
বিশদার্থ এই যে, ( পূর্বপক্ষ ) অবগাদি ইঞ্জিয়ার বিষয় শব্দাদি অভিন্ন পদার্থনমূহে  
একবুদ্ধি অনেক পদার্থে একবুদ্ধির সম্বন্ধে প্রধান, অর্থাৎ শব্দ প্রভৃতি একমাত্র  
পদার্থে যে একবুদ্ধি হয়, তাহাই প্রমারূপ প্রধান একবুদ্ধি আছে । ( উত্তর ) এইরূপ  
হইলেও দৃষ্টান্তের গ্রহণ ব্যবস্থিত হয় না । কারণ, বিশেষ হেতু নাই । ( দৃষ্টান্তের  
ব্যবস্থা কিরূপে হয়, তাহা বুঝাইতেছেন ) সঙ্কিত অর্থাৎ পুঞ্জীভূত পরমাণুসমূহে  
একবুদ্ধি কি—যাহা তাহা নহে অর্থাৎ এক নহে, তাহাতে “তাহা” অর্থাৎ “এক” এই  
প্রকার বুদ্ধি ? যেমন স্বাণুতে পুরুষ-বুদ্ধি ? অথবা পদার্থের তথাভাববশতঃ অর্থাৎ  
ঐ একবুদ্ধির বিষয় ঘটাদি পদার্থের একত্ববশতঃ তাহাতে “তাহা” অর্থাৎ এক  
পদার্থেই “এক” এই প্রকার বুদ্ধি ? যেমন শব্দের একত্ববশতঃ “শব্দ এক” এই  
প্রকার বুদ্ধি । বিশেষ হেতুর পরিগ্রহ ব্যতীত দৃষ্টান্তের অর্থাৎ পূর্বোক্ত দুইটি  
বুদ্ধিরূপ দৃষ্টান্ত সংশয় সম্পাদন করে ।

পরন্তু কুন্তের স্থায় গন্ধ প্রভৃতিও সঙ্করমাত্র অর্থাৎ গন্ধ, শব্দ প্রভৃতিও পূর্ব-  
পক্ষীয় মতে সঙ্কিত বা সমষ্টিরূপ পদার্থ, এ জন্ত গন্ধ প্রভৃতি দৃষ্টান্ত হয় না । এইরূপ  
পরিমাণ, সংযোগ, ক্রিয়া, জাতি ও বিশেষ পদার্থবিষয়ক জ্ঞানগুলিও পূর্বপক্ষবাদীকে  
জিজ্ঞাস্ত, সেই জ্ঞানগুলিতেও এইরূপ প্রসঙ্গ হয় ।

টিপ্পনী । ভাষ্যকার পূর্বে বলিয়াছেন যে, এক পদার্থে একবুদ্ধিরূপ প্রধান বুদ্ধি না থাকিলে  
এক পদার্থের সাবৃদ্ধ-জ্ঞান-জন্ত অনেক পদার্থে একবুদ্ধিরূপ ভ্রম-বুদ্ধি হইতে পারে না ; পূর্বপক্ষীয়  
নিদ্বন্দ্বের দ্বন্দ্ব প্রধান একবুদ্ধি নাই, তখন অনেক পদার্থে ( পরমাণুগুণরূপ ঘটাদি পদার্থে )  
একবুদ্ধি হওয়া অসম্ভব । এতদ্বারা পূর্বপক্ষবাদী বলিতে পারেন যে, চকুরিজিয়ার বিষয় ঘটাদি  
পদার্থ নানা হইলেও অর্থাৎ যে ঘটাদি পদার্থকে এক বলিয়া বুঝা হয়, তাহা আনাদিগের ন্যে  
পরমাণুগুণরূপ অনেক পদার্থ হইলেও অবগাদি ইঞ্জিয়ার বিষয় যে শব্দাদি, তাহার প্রত্যেকে



একমাত্র পদার্থ। শব্দরূপে শব্দ অনেক পদার্থ হইলেও এক একটি শব্দ অনেক পদার্থ নহে। যে শব্দকে এক বলিয়াই শ্রবণ করা যায়, তাহা বস্তুতঃই এক, সুতরাং তাহাতে একবুদ্ধি বসার্ম একবুদ্ধি, উহাই ঘটাদিরূপ অনেক পদার্থে একবুদ্ধির সম্বন্ধে প্রধান একবুদ্ধি আছে। ঐরূপ স্পর্শ ও গন্ধ প্রভৃতি এক পদার্থে যে একবুদ্ধি হয়, তাহাও প্রধান একবুদ্ধি আছে। এই প্রধান একবুদ্ধি থাকায় শব্দাদি কোন এক পদার্থের সাদৃশ্য-জ্ঞানবশতঃ ঘটাদি অনেক পদার্থে একবুদ্ধিরূপ ভ্রম হইতে পারে; আমরা বলি, তাহাই হইয়া থাকে। ভাষ্যকার পূর্বপক্ষবাদীর এই প্রতিবাদের উত্তর করিয়া, তত্ত্বতরে এখানে বলিয়াছেন যে, এইরূপ হইলেও বিশেষ হেতু না থাকায় দৃষ্টান্তের ব্যবস্থা হয় না। ভাষ্যকার পরে ইহা বুঝাইয়াছেন। ভাষ্যকারের সে কথার তাৎপৰ্য্য এই যে, পরমাণুগম্ভ উভয়বাদিনিষ্ঠ পদার্থ। আমরা ঘটাদি পদার্থকে পরমাণুগম্ভ হইতে অতিরিক্ত অবস্থা বলিয়া স্বীকার করিলেও পরমাণুগম্ভ আনাদিগেরও স্বীকৃত। পূর্বপক্ষবাদী এই পরমাণু-গম্ভরূপ অনেক পদার্থে স্বাপ্নতে পুরুষবুদ্ধির জ্ঞান ভ্রম একবুদ্ধি হয়, ইহা বলিতেছেন। শব্দাদি এক পদার্থে বসার্ম একবুদ্ধি হয়, ইহা বলিতেছেন। এখন যদি অনিচ্ছাস্ত সমর্থনের জন্য শব্দাদিতে প্রধান একবুদ্ধি স্বীকার করিতে হইল, তাহা হইলে ঘটাদিতে একবুদ্ধি যে ঐরূপ বসার্ম একবুদ্ধি নহে, এ বিষয়ে বিশেষ হেতু বলিতে হইবে। স্বাপ্নতে পুরুষ-বুদ্ধির জ্ঞান এই বুদ্ধিকে যেমন ভ্রম বলা হইতেছে, শব্দাদিতে একবুদ্ধির জ্ঞান এই বুদ্ধিকে বসার্ম ও বলা যাইতে পারে। ঘটাদি পদার্থ যে পরমাণু-পুস্তরূপ অনেক, উহা পরমাণুপুস্ত হইতে অতিরিক্ত এক ভ্রম নহে, ইহাও এখনও সিদ্ধ হয় নাই, তাহা সিদ্ধ হইলে আর এত কথার কোন প্রয়োজনই ছিল না। সুতরাং পরমাণুগম্ভে স্বাপ্নতে পুরুষ-বুদ্ধির জ্ঞান ভ্রম একবুদ্ধি হয় অথবা শব্দ একবুদ্ধির জ্ঞান বস্তুতঃ এক পদার্থেই এই বসার্ম একবুদ্ধি হয়, ইহা সন্দিহ। কোন বিশেষ হেতু অর্থাৎ একতর পক্ষ-নির্ধারক হেতুর দ্বারা একতর পক্ষের নির্ণয় হইলেই এই সন্দেহ নিবৃত্ত হইতে পারে। বিশেষ হেতু পরিগ্রহ না করিয়া কেবল দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিলে, তাহার দ্বারা কোন পক্ষনিষ্ঠ হয় না, পরন্তু উভয় পক্ষেই দৃষ্টান্ত থাকায়, এই দৃষ্টান্তের পুরোক্তপ্রকার সংশয়েরই সম্পাদক হয়। ঘটাদি পদার্থে একবুদ্ধিতে স্বাপ্নতে পুরুষ-বুদ্ধিকেই দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করিবে, শব্দে একবুদ্ধিকে দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করিবে না—এইরূপ ব্যবস্থা অর্পাৎ নিয়ম নাই। কারণ, পুরোক্ত সংশয়ের একতর কোটি-নিষ্ঠারক কোন বিশেষ হেতু নাই।

ভাষ্যকার শেষে পূর্বপক্ষবাদী বৌদ্ধ বৈভাবিক সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্ত চিন্তা করিয়া বলিয়াছেন যে, ঘটাদি পদার্থের জ্ঞান গন্ধ, শব্দ প্রভৃতিও যখন ভোমাদিগের ন্যে সক্ষিত<sup>১</sup>, উহারা কেহই একমাত্র পদার্থ নহে, সকলেই সমষ্টিরূপ, তখন উহারাও দৃষ্টান্ত হইতে পারে না। শব্দাদি পদার্থে একবুদ্ধিও ভোমাদিগের ন্যে প্রধান বা বসার্ম বুদ্ধি হইতে পারে না। এবং শেষে বলিয়াছেন যে, ঘটাদি পদার্থে যে পরিমাণ সংযোগ ও জিন্মা প্রভৃতির জ্ঞান হয়, তাহাও পূর্বপক্ষবাদীকে প্র

১। বৈভাবিকঃ বসু বাখ্যীপুরা কৃতজ্যোতিষনুহাং ঘটাদি পদার্থানিচ্ছতি ভক্তত্বেনাং ন্যে পদার্থয়োহপি সক্ষিতা একতর্য্য।—তাৎপৰ্য্যসিদ্ধা।



করিতে হইবে। সেই সব জানেও এইরূপ প্রত্যয় অর্থাৎ পূর্বোক্ত একবুদ্ধির জায় অনুপপত্তি হয়। উল্লেখ্যকর এ কথাটির তাৎপর্য্য বর্ণন করিয়াছেন যে, পরমাণুপুঞ্জ হইতে অতিরিক্ত অবরোধী না মানিলে যেমন একবুদ্ধি অসম্ভব, তদ্রূপ “মহান” এইরূপে পরিমাণ-বুদ্ধি, “সংযুক্ত” এইরূপে সংযোগ-বুদ্ধি, “গমন করিতেছে” এইরূপে ক্রিয়া-বুদ্ধি, এইরূপ জাতি প্রকৃতির বুদ্ধিও হইতে পারে না। কারণ, পরমাণুসমূহ অতীন্দ্রিয়, তাহাতে একত্বের জায় পূর্বোক্ত পরিমাণাদিরও প্রত্যক্ষ অসম্ভব। ভাষ্যে “অল্পবোক্তব্যঃ” এইরূপই পাঠ। প্রসঙ্গি ধাতু বিকর্ষক বলিয়া “পূর্বপকবাদী” এইরূপ প্রথমাস্ত গৌণ কর্মবোধক পদের অধ্যাহার করিতে হইবে।

ভাষ্য। একবুদ্ধিস্ত্রিংশস্তদিতি প্রত্যয় ইতি বিশেষহেতুর্গ্ৰহদিতি প্রত্যয়েন সামান্যিকরণ্যাৎ। একমিদং মহস্তুতি একবিষয়ো সমানাদিকরণো ভবতঃ, তেন বিজ্ঞায়তে যন্মহৎ তদেকমিতি।

অণুসমূহেহতিশয়গ্রহণং মহৎপ্রত্যয় ইতি চেৎ? সৌহ্যনমহৎবণুবৃ মহৎপ্রত্যয়েহতিশয়গ্রহদিতি প্রত্যয়ো ভবতীতি। কিঞ্চাতঃ? অতশ্মিঃ-স্তদিতি প্রত্যয়স্ত প্রধানাপেক্ষিত্বাৎ প্রধানসিদ্ধিরিতি ভবিতব্যং মহত্যেব মহৎপ্রত্যয়েনেতি।

অনুবাদ। একবুদ্ধি তাহাতে তাহা অর্থাৎ এক পদার্থে এক, এই প্রকার জ্ঞান অর্থাৎ উহা অনেক পদার্থে ভ্রম একত্ব-জ্ঞান নহে, উহা এক পদার্থেই যথার্থ একত্ব-জ্ঞান, (ইহাতে) বিশেষ হেতু আছে। কারণ, “মহৎ” এই প্রকার জ্ঞানের সহিত (ঐ একত্ব-বুদ্ধির) সমানাত্ম্যই আছে। বিশদার্থ এই যে, “ইহা এক এবং মহৎ” এই প্রকার জ্ঞানদ্বয় সমানাত্ম্য হয়; তজ্জন্ম বুঝা যায়, যাহা মহৎ, তাহা এক [অর্থাৎ যে ঘটাদি পদার্থে একত্ববুদ্ধি হয়, তাহাতেই মহত্ব-বুদ্ধি হয়, সুতরাং মহৎ পদার্থেই যে একত্ব-বুদ্ধি হয়, ইহা স্বীকার্য্য। তাহা হইলে ঘটাদি পদার্থে যে একত্ব-বুদ্ধি, তাহা এক পদার্থেই যথার্থ একত্ব-বুদ্ধি, ইহাও স্বীকার্য্য। কারণ, ঘটাদি পদার্থ এক না হইয়া অনেক পরমাণুপুঞ্জ হইলে, তাহাতে মহত্ব-বুদ্ধি হইতে পারে না। পরমানু অতি সূক্ষ্ম—উহা মহৎ নহে, ইহা সর্ব্বসম্মত; সুতরাং তাহাতে যথার্থ মহত্ব-বুদ্ধি অসম্ভব]।

(পূর্বপক্ষ) পরমাণুসমূহে অতিশয় জ্ঞানই মহৎ প্রত্যয়, ইহা যদি বল? অর্থাৎ কোন পরমাণুপুঞ্জকে প্রত্যক্ষ করিয়া, তদ্বত্তির পরমাণুপুঞ্জে যে অতিশয় বা আধিক্যের প্রত্যক্ষ, তাহাই মহত্বের প্রত্যক্ষ, ইহা যদি বল? (উত্তর) অমহৎ পরমাণুসমূহে



অৰ্থাৎ মহাবিশ্ব পৰমাণুপুঞ্জ সেই এই ( পূৰ্বেকৃত ) মহৎ প্রত্যয় ( মহাবিশ্ব প্রত্যয় ) তদন্তিম পদাৰ্থে তাহা অৰ্থাৎ মহাবিশ্ব পদাৰ্থে “মহৎ” এই প্রকার জ্ঞান হয়, অৰ্থাৎ তাহা হইলে উহা ভ্রমজ্ঞান হয়। ( প্রশ্ন ) ইহা হইলে কি ? অৰ্থাৎ ঐ জ্ঞান ভ্রম হইলে কতি কি ? ( উত্তর ) তদন্তিম পদাৰ্থে “তাহা” এই প্রকার জ্ঞানের অৰ্থাৎ ভ্রমজ্ঞানের প্রধান সাপেক্ষতা থাকায় প্রধান মিত্তি হয়, এ জ্ঞান মহৎ পদাৰ্থেই মহৎ প্রত্যয় হইবে।

টিপ্পনী। ভাষ্যকার পূৰ্বে বলিয়াছেন যে, পৰমাণুসমূহেই ভ্রম একত্ব-বুদ্ধি হয়, এ বিষয়ে বিশেষ হেতু নাই। পূৰ্ণপক্ষবাদী তাহা বলিতে পারেন নাই। বিশেষ হেতু না থাকায়, পৰমাণু-সমূহ ভিন্ন এক অবয়বীতেই বৰ্ণ্য একত্ব-বুদ্ধি হয়, ইহাও বলিতে পারি। কিন্তু ভাষ্যকার নিজেও ঐ বিষয়ে ঠাৱার স্বপক্ষসাধক কোন বিশেষ হেতু বলেন নাই; কেবল পূৰ্ণপক্ষবাদীর মতের অল্পপক্ষিত্ব প্রদৰ্শন করিয়াছেন। তাই ভাষ্যকার এখন তাহার স্বপক্ষসাধক বিশেষ হেতু প্রদৰ্শন করিতেছেন। ভাষ্যকারের কথা এই যে, আনাদিগের মতে ঘটাদি পদাৰ্থে যে একত্ব-বুদ্ধি হয়, তাহা বস্তুতঃ এক পদাৰ্থেই একত্ব-বুদ্ধি; সুতরাং তাহা বৰ্ণ্য বুদ্ধি। এ বিষয়ে বিশেষ হেতু এই যে, ঘটাদি পদাৰ্থকে যেন “এক” বলিয়া বুঝে, তদ্রূপ “মহৎ” বলিয়াও বুঝে। “ইহা এক” এবং “ইহা মহৎ,” এই প্রকার দুইটি জ্ঞান একাত্ম্যেই হয়। একই বিষয়ে, একই আশয়ে বখন ঐরূপ দুইটি জ্ঞান হয়, তখন বুঝা যায়—বাহা মহৎ, তাহা এক অৰ্থাৎ মহৎ পদাৰ্থেই ঐরূপ একত্ব-বুদ্ধি জন্মে। তাহা হইলে বাহা মহৎ নহে—ইহা সৰ্বসম্মত, সেই পৰমাণুসমূহে ঐ একত্ব-বুদ্ধি হয় না, মহাবিশ্ব কোন একমাত্র পদাৰ্থেই ঐ একত্ব-বুদ্ধি হয়, ইহা পূৰ্বেকৃত বিশেষ হেতুর দ্বারা বুঝা যায়। তাহা হইলেই ঐ একত্ব-বুদ্ধি বৰ্ণ্যবুদ্ধি বলিয়াই প্রতিপন্ন হইল।

পূৰ্ণপক্ষবাদী ইহার প্রতিবাদ করিতে পারেন যে, আমরা পৰমাণুসমূহ হইতে ভিন্ন অবয়বী নানি না। আনাদিগের মতে মহৎ প্রত্যয় বলিতে অতিশয় জ্ঞান। কোন পৰমাণুপুঞ্জ দেখিয়া অল্প পৰমাণুপুঞ্জ যে অতিশয়বিশেষের প্রত্যয়, তাহা মহৎ প্রত্যয়। মহত্ব যে আপেক্ষিক, ইহা ত সকলেরই সম্মত। কিন্তু ঘট হইতে বৃহৎ ঘটে যে অতিশয় বিশেষ দেখে, তাহারই নাম মহৎ-প্রত্যয়। ভাষ্যকার ঐ প্রতিবাদের উত্তৰ করিয়া, তদন্তরে বাহা বলিয়াছেন, তাহার তাৎপৰ্য্য এই যে, তাহা হইলেও পৰমাণুতে ঐরূপ মহৎ-প্রত্যয় হইতে পারে না। বাহা অতি স্থূল, বাহাতে মহত্বই নাই, তাহাকে মহৎ বলিয়া বুঝিলেই ঐ বোধ ভ্রম হইবে। মহত্ব অৰ্থাৎ মহৎ পরিমাণ ভিন্ন মহৎ প্রত্যয়ের বিধ “অতিশয়” বলিয়া কোন পদাৰ্থ হইতে পারে না। পৰমাণুসমূহে ঐ ভিন্নরূপ মহৎ প্রত্যয়ই হয়, ইহা স্বীকার করিতে গেলেও প্রধান অৰ্থাৎ বৰ্ণ্য মহৎ প্রত্যয় অবশ্য স্বীকার্য। কারণ, প্রধান জ্ঞান ব্যতীত ভ্রম জ্ঞান জন্মিতে পারে না, ইহা পূৰ্বেই বলিয়াছি। অল্প কোন পদাৰ্থে বখন ঐ প্রধান মহৎ প্রত্যয়ের সম্ভাবনা নাই, তখন ঘটাদি মহৎ পদাৰ্থেই ঐ মহৎ প্রত্যয় হইবে অৰ্থাৎ তাহাই স্বীকার করিতে হইবে। ঘটাদি পদাৰ্থে ভিন্নরূপ মহৎ প্রত্যয় উপপন্ন করা যাইবে না।



ভাষ্য । অণুঃ শব্দো মহানিতি চ ব্যবসায়্যঃ প্রধানসিদ্ধিরিতি চেৎ ন, মন্দতীভ্রতাগ্রহণমিয়ন্তানবধারণাৎ যথাদ্রব্যো । অণুঃ শব্দোহল্লো মন্দ ইত্যেতস্ত গ্রহণং, মহান্ শব্দঃ পটুতীভ্র ইত্যেতস্ত গ্রহণং, কস্মাৎ ? ইয়ন্তানবধারণাৎ । নৃহয়ং মহান্ শব্দ ইতি ব্যবস্থামিয়ানয়মিত্যবধারণয়তি যথা বদরামলকবিদ্বাদীনি ।

অমুবাদ । ( পূর্বপক্ষ ) শব্দ অণু অর্থাৎ সূক্ষ্ম এবং মহান্ অর্থাৎ বৃহৎ, এই প্রকার ব্যবসায় ( বিশিষ্ট বুদ্ধি ) হয় বলিয়া প্রধান সিদ্ধি হয়, ইহা যদি বল ? ( উত্তর ) না, ( শব্দে ) মন্দতা ও তীভ্রতার জ্ঞান হয়, যেহেতু ইয়ন্তার অবধারণ হয় না, যেমন দ্রব্যো, অর্থাৎ দ্রব্যো যেমন ইয়ন্তার অবধারণ হয়, শব্দে তাহা হয় না । বিশদার্থ এই যে, শব্দ অণু কি না অল্প, মন্দ, ইহার জ্ঞান হয়, শব্দ মহান্ কি না পটু, তীভ্র, ইহার জ্ঞান হয় অর্থাৎ মন্দ শব্দকেই শ্রোতা “অণু” বলিয়া বুঝে এবং তীভ্র শব্দকেই “মহৎ” বলিয়া বুঝে, বস্তুরতঃ অণুত্ব ও মহত্ত্বরূপ পরিমাণ শব্দে নাই । ( প্রশ্ন ) কেন ? অর্থাৎ শব্দে মহত্ত্ব নাই, ইহা কিরূপে বুঝা যায় ? ( উত্তর ) যেহেতু ( শব্দে ) ইয়ন্তার অবধারণ হয় না । বিশদার্থ এই যে, যেহেতু এই ব্যক্তি ( যে ব্যক্তি শব্দকে “মহৎ” বলিয়া বুঝে ) শব্দ মহান্, এই প্রকার বিশিষ্ট বোধ বা অবধারণ করতঃ বদর, আমলক ও বিব প্রভৃতির স্থায় ইহা অর্থাৎ ঐ শব্দ এই পরিমাণ, এইরূপ অবধারণ করে না ।

টিপ্পনী । ভাষ্যকার পূর্বে বলিয়াছেন যে, ঘটাদি পদার্থকে বে এক ও মহান্ বলিয়া বোধ হয়, তাহার দ্বারা বুঝা যায়, ঘটাদি পদার্থ এক ও মহৎপরিমাণবিশিষ্ট । উহার পরিমাণপুঞ্জ হইলে, তাহাতে ঐ মহৎ প্রত্যয়কে জন বলিতে হয় । তাহাও বলা যায় না ; কারণ, ভ্রম প্রত্যয় প্রধান ( বস্তুার্থ ) প্রত্যয়-সাপেক্ষ । ঘটাদি পদার্থকে মহৎ বলিয়া স্বীকার না করিলে বস্তুার্থ মহৎ প্রত্যয়রূপ প্রধান জ্ঞান থাকে না । কারণ, আর কোন পদার্থেই ঐ বস্তুার্থ মহৎ প্রত্যয়ের সম্ভাবনা নাই । সুতরাং ঘটাদি পদার্থকেই মহৎ বলিয়া স্বীকার করিয়া, তাহাতেই পূর্বোক্ত প্রকার বস্তুার্থ মহৎ প্রত্যয় হয়, ইহাই স্বীকার করিতে হইবে । পূর্বপক্ষবাদী ইহাতে বলিতে পারেন যে, কেন ? শব্দে যে মহৎ প্রত্যয় হয়, তাহাই প্রধান মহৎপ্রত্যয় আছে । শব্দ অণু, শব্দ মহান্, এইরূপে শব্দে বে অণুত্ব ও মহত্ত্বের ব্যবসায় ( নিশ্চয় ) হইয়া থাকে, তাহা ত বস্তুার্থ জ্ঞানই বটে । ঘটাদি পদার্থকে মহৎ বলিয়া স্বীকার না করিলে প্রধান মহৎ প্রত্যয় থাকিবে না কেন ? ভাষ্যকার এই প্রতিবাদের উত্তর করিয়া, তাহার প্রতিবাদ করিয়াছেন যে, শব্দে অণুত্ব ও মহত্ত্বরূপ পরিমাণ বস্তুরতঃ নাই । “শব্দ অণু” এইরূপে শব্দে অল্পতা বা মন্দতার বোধ হয় এবং



শব্দ মহান্, এইরূপে শব্দে পটুত্ব বা তীব্রত্বের বোধ হয়। ঐ মন্যতা ও তীব্রতা শব্দগত জ্ঞাতিবিশেষ অথবা স্বরবিশেষ ? উচ্চাতকরের মতে ঐ মন্যতা ও তীব্রতাই বাক্যরূপে শব্দে অণুত্ব ও মহত্ব-বোধে নিমিত্ত। অর্থাৎ শব্দে মন্যতা ও তীব্রতার বোধ হইলে, অণু ও মহত্ব-বোধের সাদৃশ্য-বোধপ্রযুক্ত তাহাতে “অণু” ও “মহত্ব” এইরূপ জ্ঞান জন্মে। উচ্চাতকর বলিয়াছেন, অণুত্ব-বোধের সাদৃশ্যবশতঃ সাদৃশ্য-জ্ঞানবিষয়ই মন্যতা। মহত্ব-বোধের সাদৃশ্যবশতঃ সাদৃশ্য-জ্ঞানবিষয়ই তীব্রতা বা পটুতা। মূলকথা, শব্দে অণুত্ব ও মহত্ব কিছুই নাই। শব্দে মহত্বপ্রত্যয় প্রধান বা বর্ধার জ্ঞান হইতে পারে না। ইহার বিশেষ যুক্তি এই যে, মহত্ব পরিমাণরূপ গুণপদার্থ। শব্দও গুণপদার্থ। গুণপদার্থে গুণপদার্থ থাকে না, ইহা সমর্থিত নিন্দাস্ত। অতরাং শব্দে মহত্ব থাকিতে পারে না। শব্দে মহত্বপ্রত্যয় ভাক্ত এবং এই যুক্তিতে ভাব্যকারের মতে শব্দে একত্ব-বুদ্ধিও ভাক্ত। কারণ, একত্বও সংখ্যারূপ গুণ-পদার্থ, উহাও শব্দে থাকে না। অতরাং শব্দে একত্ববুদ্ধি ও মহত্ববুদ্ধি কখনই প্রধান বুদ্ধি হইতে পারে না। প্রধান বুদ্ধি ব্যতীতও আবার ভাক্ত বুদ্ধি হইতে পারে না; এ জন্য ঘটাদি দ্রব্যেই ঐ একত্ব-বুদ্ধি ও মহত্ব-বুদ্ধিকে প্রধান বুদ্ধি বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। যদি বল, মহত্বপ্রত্যয়ের বিষয় হইলেই তাহাতে মহত্ব স্বীকার করি; ঘটাদির জায় বহন শব্দও মহত্বপ্রত্যয় হয়, তখন শব্দও মহত্ব আছে। এতদ্বারা উচ্চাতকর বলিয়াছেন যে, মহত্ব বলিয়া বোধ হইলেই তাহাতে মহত্ব থাকে, এইরূপ নিয়ম বলা যায় না। কারণ, “মহত্ব পরিমাণ” এইরূপে পরিমাণকেও মহত্ব বলিয়া বুঝে। তাই বলিয়া পরিমাণেও মহত্বরূপ পরিমাণ আছে, ইহা বলা যায় না। তাহা বলিলে সেই পরিমাণেও পরিমাণ আছে, আবার সেই পরিমাণেও পরিমাণ আছে, এইরূপে অনবস্থা-বোধ হইয়া পড়ে। অতরাং শব্দে মহত্বপ্রত্যয় হয় বলিয়াই তাহাতে মহত্ব আছে, ইহা বলা যায় না। শব্দে ঐ মহত্বপ্রত্যয় ভাক্তই বলিতে হইবে। ঘটাদি দ্রব্য-পদার্থেই ঐ মহত্বপ্রত্যয় মুখ্য বা প্রধান বলিতে হইবে। মুখ্য প্রত্যয় একটা একেবারে না থাকিলে ভাক্ত প্রত্যয় হইতে পারে না, ইহা পূর্বে বলা হইয়াছে।

শব্দকে মহত্ব বলিয়া বুঝিলে, সেখানে শব্দগত তীব্রতারই বোধ হয়, বস্তুর মহত্ব পরিমাণের বোধ হয় না। ভাব্যকারের এই সিদ্ধান্ত সমর্থন করিতে তিনি হেতু বলিয়াছেন যে, শব্দকে মহত্ব বলিয়া নিশ্চয় করিয়া, কেহ তাহাতে ইয়ত্তার পরিচ্ছেদ করে না। যেমন বদন, আমলক ও বিব প্রভৃতি ফল দেখিয়া, তাহাতে ইহা এই পরিমাণ, এইরূপে ভ্রষ্টা ইয়ত্তার পরিচ্ছেদ করিয়া থাকে। ভাব্যকারের ঐ দৃষ্টান্তকে “ব্যক্তিরেক দৃষ্টান্ত” বলে। ভাব্যকারের তাৎপর্য্য এই যে, বদন, আমলকী, বিব প্রভৃতি ফল দেখিলে, বোকা ব্যক্তি বদন হইতে আমলকী বড়, আমলকী হইতে বিব বড়, এইরূপ বুঝে। অতরাং ঐ বদন প্রভৃতি দেখিয়া “ইহা এই পরিমাণ” এইরূপে উহাদিগের ইয়ত্তা নির্ধারণ করে। বদন প্রভৃতি সবগুলিই মহত্ব হইলেও, উহাদিগের মহত্বের তারতম্য আছে; ঐ তারতম্য বুঝিতে গেলেই উহাদিগের প্রত্যেকের ইয়ত্তা নির্ধারণ আবশ্যক। বদন প্রভৃতিতে তাহা হইয়া থাকে, কিন্তু শব্দে তাহা হয় না। শব্দকে মহত্ব বলিয়া বুঝিলেও “এই শব্দ এই পরিমাণ” এইরূপে কেহ তাহার ইয়ত্তা নির্ধারণ করে না, করিতেও



পারে না ; সুতরাং বুঝা যায়, শব্দে বস্তুতা বস্তু প্রভৃতির জ্ঞান মহত্ব থাকে না ; সুতরাং উহাতে বস্তুার্থ বা প্রধান মহত্বপ্রত্যয় হয় না । আপত্তি হইতে পারে যে, পরিমাণ থাকিলেও তাহার ইয়তার অবধারণ হয় না, যেমন আকাশাদি বিশ্বব্যাপী পদার্থে পরমমহত্ব পরিমাণ আছে, কিন্তু কেহ তাহার ইয়তা পরিচ্ছেদ করে না, করিতে পারে না । সুতরাং ইয়তার অবধারণ না হইলেই যে সেখানে পরিমাপই নাই, ইহা কিরূপে বলা যায় ? এতদ্বত্তরে তাৎপর্যটীকাকার বলিয়াছেন যে, আকাশাদি পদার্থ অতীন্দ্রিয় বলিয়া তাহাদিগের পরিমাণও অতীন্দ্রিয় । প্রত্যক্ষযোগ্য পরিমাণদ্বয়েরই ইয়তা-পরিচ্ছেদ হয়, এই নিয়মের ব্যতিক্রম নাই । শব্দে মহত্ব পরিমাণ থাকিলে “শব্দ মহান্” এইরূপে তাহার প্রত্যক্ষ হইবেই । পূর্বপক্ষবাদীও তাহাই বলিতেছেন । সুতরাং বস্তু প্রভৃতিতে যেমন ইয়তা-পরিচ্ছেদ হয়, তদ্রূপ শব্দগত ঐ মহত্ব পরিমাণের ইয়তা-পরিচ্ছেদ হউক ? তাহা বখন হয় না, তখন বুঝা যায়, শব্দে বস্তুতা মহত্ব পরিমাণ নাই । ফলকথা, প্রত্যক্ষের বিষয় পরিমাণদ্বয়েরই ইয়তার পরিচ্ছেদ হয়, এই নিয়মদ্বারা এই ভাষ্যকার ঐরূপ কথা বলিয়াছেন ।

ভাষ্য । সংযুক্তে ইমে ইতি চ দ্বিত্বসমানাশ্রয়প্রাপ্তিগ্রহণং । সৌ সমুদায়বাস্তবঃ সংযোগস্থিতি চেৎ ? কোহয়ং সমুদায়ঃ ? প্রাপ্তিরনেকস্থানেকা বা প্রাপ্তিরেকস্ত সমুদায় ইতি চেৎ ? প্রাপ্তেরগ্রহণং প্রাপ্ত্যশ্রিতায়াঃ । সংযুক্তে ইমে বস্তুনী ইতি নাত্র বে প্রাপ্তী সংযুক্তে গৃহ্যেতে ।

অনেকসমূহঃ সমুদায় ইতি চেৎ ? ন, দ্বিত্বেন সমানাধিকরণস্ত গ্রহণাৎ । দ্বাবিমৌ সংযুক্তাবধাবিতি গ্রহণে সতি নানেকসমূহাশ্রয়ঃ সংযোগো গৃহ্যেতে, ন চ দ্বয়োরণৌগ্রহণমন্তি, তস্মান্নহতী দ্বিত্বাশ্রয়ভূতে দ্রব্যে সংযোগস্ত স্থানমিতি ।

অনুবাদ । “এই দুই বস্তু সংযুক্ত” এইরূপে দ্বিত্বের সমানাশ্রয় (বস্তুবয়স্ব) সংযোগের জ্ঞানও হয় । অর্থাৎ “এই বস্তুবয় সংযুক্ত” এইরূপে বখন বস্তুবয়গত সংযোগের প্রত্যক্ষ হয়, তখন বুঝা যায়, ঐ সংযোগের আধার পরমাণুপুঞ্জরূপ বহু দ্রব্য নহে, উহার আধার দুইটি অবয়বী দ্রব্য । (পূর্বপক্ষবাদীর উত্তর) দুইটি সমুদায় সংযোগের আধার, ইহা যদি বলি ? (ভাষ্যকারের প্রশ্ন) এই সমুদায় কি ? অর্থাৎ দুইটি সমুদায়ে যে সংযোগ থাকে বলিলে, ঐ সমুদায় কাহাকে বলি ? (পূর্বপক্ষবাদীর উত্তর) অনেক বস্তুর প্রাপ্তি (সংযোগ) অথবা এক বস্তুর অনেক প্রাপ্তি (সংযোগ) “সমুদায়”, ইহা যদি বলি ? (ভাষ্যকারের উত্তর) প্রাপ্ত্যশ্রিত প্রাপ্তির অর্থাৎ সংযোগাশ্রিত সংযোগের জ্ঞান হয় না । বিশদার্থ এই যে, “এই



দুই বস্তু সংযুক্ত" এইরূপে এই স্থলে সংযুক্ত দুইটি সংযোগ গৃহীত হয় না। অর্থাৎ "এই দুইটি বস্তু সংযুক্ত" এইরূপে দুইটি ভাবকেই সংযুক্ত বলিয়া বুঝে, দুইটি সংযোগকে সংযুক্ত বলিয়া কেহ বুঝে না। (পূর্বপক্ষবাদীর উত্তর) অনেক বস্তুর সমূহ "সমুদায়", ইহা যদি বলি ? (ভাব্যকারের উত্তর) না অর্থাৎ তাহাও বলিতে পার না। যেহেতু বিশ্বের সহিত সমানাদিকরণ সংযোগের জ্ঞান হয়। বিশদার্থ এই যে, "এই দুইটি পদার্থ সংযুক্ত" এইরূপ জ্ঞান হইলে অনেক বস্তুর সমুহাশ্রিত সংযোগ গৃহীত হয় না ; দুইটি পরমাণুরও জ্ঞান হয় না ; অতএব মহৎ ও দ্বিতীয়াশ্রয় অর্থাৎ মহৎ পরিমাণবিশিষ্ট দুইটি ভাব সংযোগের আধার।

টিপ্পনী। ভাব্যকার পূর্বপক্ষবাদীর বক্তৃতা শুনিয়া ক্রোধিত হইয়া একটি বুদ্ধি বলিয়াছেন যে, কোন দুইটি ভাব পরস্পর সংযুক্ত হইলে "এই বস্তুদ্বয় সংযুক্ত" এইরূপে দ্বিতীয়াশ্রয় এই দুই ভাবগত যে প্রাপ্তি অর্থাৎ সংযোগ, তাহার জ্ঞান হয়। ভাব্যকারের গূঢ় তাৎপৰ্য্য এই যে, ঐরূপ বিশ্বের সহিত একাশ্রয়ে সংযোগের প্রত্যক্ষ হওয়ায় বুঝা যায়, ঐ সংযোগের আধার ভাব দুইটি। তাহা হইলে ঐ ভাবদ্বয়ের কোনটিই পরমাণুপুঞ্জরূপ অনেক পদার্থ নহে, ইহা প্রতিপন্ন হয়। কারণ, তাহা হইলে দুইটি ভাব হইতে পারে না। যেখানে দুইটি ঘট সংযুক্ত হইয়াছে, ইহা আমরা বলি ও বুঝি, সেখানে যদি বস্তুতঃ ঐ ঘট পরমাণুপুঞ্জরূপ অনেক পদার্থই হয়, তাহা হইলে আর দুইটি ঘট সংযুক্ত, ইহা বুঝা যায় না। কিন্তু তাহা বর্ণন বৃত্তিতেছি এবং সকলেই বৃত্তিতেছে, তখন ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য যে, ঐ স্থলে দুইটি ঘট দুইটি অবয়বী, উহার কোনটিই পরমাণুপুঞ্জরূপ অনেক পদার্থ নহে। পূর্বপক্ষবাদী বলেন যে, যেখানে "এই দুই ভাব সংযুক্ত" এইরূপ বোধ হয়, সেখানে ঐ ভাবদ্বয় দুইটি সমুদায়। উহার প্রত্যেকটি বস্তুতঃ পরমাণুপুঞ্জরূপ অনেক পদার্থ হইলেও সেই বহু পরমাণুর একটি সমষ্টিরূপ সমুদায়কেই এক ভাব বলা হয়, এইরূপ দুইটি সমুদায় সংযুক্ত হইলে "এই দুই ভাব সংযুক্ত" এইরূপ বোধ হইয়া থাকে। কলকথা, পুৰ্ণোক্ত প্রকার দুইটি "সমুদায়"ই ঐ স্থলে জ্ঞানমান সেই সংযোগের আধার। প্রত্যেকটি পরমাণু ধরিয়া বহু পদার্থে বিভক্ত থাকিতে না পারিলেও পুৰ্ণোক্ত দুইটি সমষ্টিরূপ দুইটি সমুদারে বিভক্ত থাকিতে পারে। দ্বিতীয়াশ্রয় ঐ সমুদায়গত সংযোগেরই পুৰ্ণোক্তরূপে প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। ভাব্যকার এই সমুদায়ের বস্তুত্বের জ্ঞান এখানে গ্রহণ করিয়াছেন যে, সমুদায় কাহাকে বলিবে ? অনেক পরমাণুর পরস্পর সংযোগই কি সমুদায় ? অথবা একসমষ্টিগত যে অনেক সংযোগ, তাহাই সমুদায় ? ভাব্যকারের গূঢ় তাৎপৰ্য্য এই যে, অসংযুক্ত পরমাণুসমূহকে সমুদায় বলিতে পার না। কারণ, তাদৃশ পরমাণুসমূহকে এক বলিয়া গ্রহণ করা কোন মতেই সম্ভব নহে। সংযুক্ত পরমাণুপুঞ্জকে সমষ্টিরূপে এক বলিয়া গ্রহণ করিতে পার। কারণ, ঐরূপ পরমাণুপুঞ্জই ঘটাদি নামে এক পদার্থরূপে জোনাদিগের মতে গৃহীত হয়। সুতরাং অনেক পরমাণুর সংযোগই জোনাদিগের মতে সমুদায় ব্যবহারের প্রয়োজক। অথবা পুৰ্ণোক্ত সংযুক্ত পরমাণুপুঞ্জরূপ একসমষ্টিগত



সংযোগই তাহাতে সমুদায় ব্যবহারের প্রয়োজক । তাহা হইলে বখন ঐ সংযোগ না হওয়া পর্য্যন্ত তোমরা "সমুদায়" বল না—বলিতে পার না, তখন কি ঐ সংযোগকেই "সমুদায়" পদার্থ বলিবে ? যদি তাহাই বল, তাহা হইলে দুইটি সমুদায়গত সংযোগের প্রত্যক্ষ হয়, এই কথা বলিলে, দুইটি সংযোগগত সংযোগের প্রত্যক্ষ হয়, এই কথাই বলা হয়, অর্থাৎ "এই দুইটি বস্তু সংযুক্ত," এইরূপ জ্ঞান না হইয়া "দুইটি সংযোগ সংযুক্ত" এইরূপই জ্ঞান হইবে । কিন্তু এইরূপ জ্ঞান কাহারই হয় না, এই দুইটি বস্তু বা দ্রব্য সংযুক্ত, এইরূপ জ্ঞানই সকলের হইয়া থাকে । গদ্যে গদ্যে সাক্ষরজনীন প্রত্যক্ষের অপলাপ করিয়া কোন সিদ্ধান্ত স্থাপন করা যায় না । ফল কথা, এ পক্ষে বখন সংযোগবিশেষই সমুদায় বলিয়া স্বীকৃত হইতেছে এবং দুইটি সমুদায়ই সংযোগের আশ্রয় বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে, তখন পূর্বোক্ত হলে "দুইটি সংযোগ সংযুক্ত" এই প্রকারই প্রত্যক্ষ হইবে; তাহা কিন্তু কোনমতেই হয় না । সুতরাং এ পক্ষ গ্রাহ্য নহে অর্থাৎ সংযোগবিশেষকে সমুদায় বলা যায় না । ভাষ্যে "প্রাপ্তি" বলিতে এখানে সংযোগ বুঝিতে হইবে । অপ্রাপ্ত অনেক বস্তুর প্রাপ্তিকে সংযোগ বলে ।

যদি বল, পূর্বোক্ত সংযোগবিশেষকে সমুদায় বলিব কেন ? আমরা তাহা বলি না, অনেক বস্তুর যে সমূহ, তাহাকেই সমুদায় বলি । এক একটি পরমাণুর নাম সমুদায়ী, তাহারিগের সমূহ বা সমষ্টির নাম সমুদায় । যেখানে "দুইটি বস্তু সংযুক্ত" এইরূপ বোধ হয়, সেখানে দুইটি সমষ্টি-রূপ সমুদায় সংযুক্ত, এইরূপই বুঝা যায় । ভাষ্যকার এই পক্ষেরও উল্লেখ করিয়া, ইহা খণ্ডন করিতে বলিয়াছেন যে, না—তাহাও বলিতে পার না । কারণ, পূর্বোক্ত হলে যে সংযোগের জ্ঞান হয়, তাহা যিহের আশ্রয়গতরূপেই জ্ঞান হয় অর্থাৎ দ্বিধাবিশিষ্ট বস্তুতে সংযোগ হইয়াছে, এইরূপই বোধ হয় । "এই দুইটি পদার্থ সংযুক্ত" এইরূপ জ্ঞান হইলে, ঐ সংযোগ অনেক বস্তুর সমূহগত, এইরূপ বুঝা যায় না, কোন দ্রব্যদ্বয়গত, এইরূপই বুঝা যায় । দুইটি পরমাণু দুইটি দ্রব্য হইলেও অতীন্দ্রিয় বলিয়া ঐ পরমাণুদ্বয়ের প্রত্যক্ষ অসম্ভব, সুতরাং তাহাতে সংযোগের প্রত্যক্ষও অসম্ভব । পূর্বোক্তরূপে দ্রব্যবরে বখন সংযোগের প্রত্যক্ষ হইতেছে, তখন মহৎ পরিমাণবিশিষ্ট দুইটি দ্রব্যই ঐ সংযোগের আধার, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য । তাহা হইলে পূর্বোক্তরূপ প্রত্যক্ষের বিবরণ, সংযোগের আধার দুইটি দ্রব্যের কোনটিই পরমাণুপুঞ্জরূপ বহু পদার্থ ও অণুপদার্থ নহে, উহার প্রত্যেকটিই পরমাণুপুঞ্জ ভিন্ন এক অবরবী ও মহৎ পদার্থ, উহারিগের দুইটিতে বহুত নাই, বিচ্ছিন্ন আছে, ইহা নিত্ব হইল । পূর্বপক্ষবাদীরা যে অনেক পরমাণুর সমূহকে "সমুদায়" বলিতেন, তাহাতে ভাষ্যকারের পক্ষে ইহাও বুঝিতে হইবে যে, ঐ সমূহও ঐ পরমাণুগুলি ভিন্ন আর কোন অতিরিক্ত পদার্থ নহে; তাহা হইলে ত অতিরিক্ত অবরবী মানাই হয় । এখন যদি ঐ সমূহ বা সমষ্টিও বস্তুতঃ নানা পদার্থ হইল, তাহা হইলে উহাতেও দ্বিধা থাকিতে পারে না; উহাতে সংযোগের প্রত্যক্ষ হইলে দ্বিধাবিশিষ্ট বস্তুতে সংযোগের প্রত্যক্ষ হয় না । সুতরাং দ্বিধাবিশিষ্ট বস্তুতে যে সংযোগের প্রত্যক্ষ হয় অর্থাৎ "এই দুইটি বস্তু সংযুক্ত" এইরূপ যে জ্ঞান হয়, তাহা পূর্বপক্ষবাদীর দ্বিতীয় কল্পেও উপপন্ন হয় না ।



ভাষ্য । প্রত্যাসত্তিঃ প্রতীঘাতাবসানী সংযোগো নার্থাস্তরমিতি চেৎ ? নার্থাস্তরহেতুর্ভাৎ সংযোগস্ত । শব্দরূপাদিশ্পন্দানীং হেতুঃ সংযোগো, ন চ দ্রব্যায়োগ্যগুণাস্তরোপজননমন্তরেণ শব্দে রূপাদিবু স্পন্দে চ কারণত্বং গৃহ্যতে, তস্মাদ্গুণাস্তরম্ । প্রত্যয়বিষয়চার্থাস্তরং তৎপ্রতিষেধো বা ? কুণ্ডলী গুরুকুণ্ডলশ্ছাত্র ইতি । সংযোগবুদ্ধেচ যদ্যর্থাস্তরং ন বিষয়ঃ অর্থাস্তর-প্রতিষেধস্তর্হি বিষয়ঃ । তত্র প্রতিবিধ্যমানবচনং সংযুক্তে দ্রব্যে ইতি, যদর্থাস্তরমশ্চাত্র দৃষ্টমিহ প্রতিবিধ্যতে তদ্বক্তব্যমিতি । দ্বয়োর্মহতো-রাশ্রিতত্ত্ব গ্রহণাশ্রয়শ্চ ইতি ।

অনুবাদ । (পূর্বপক্ষ) প্রতীঘাত পর্যাস্ত প্রত্যাসত্তি সংযোগ, অর্থাৎ তাহার অবসানে দ্রব্যের প্রতীঘাত হয়, এতাদৃশ প্রত্যাসত্তি অর্থাৎ নিকটবর্তিতারূপ সংযোগ পদার্থাস্তর নহে, ইহা যদি বল, (উত্তর) না, অর্থাৎ সংযোগ পদার্থাস্তর নহে, ইহা বলিতে পার না, যেহেতু সংযোগের পদার্থাস্তরে কারণত্ব আছে । বিশদার্থ এই যে, শব্দ রূপাদি এবং ক্রিয়ার কারণ সংযোগ, যেহেতু দ্রব্যস্বরের গুণাস্তরোৎপত্তি ব্যতীত শব্দে, রূপাদিতে এবং ক্রিয়াতে কারণত্ব গৃহীত হয় না, অতএব (সংযোগ) গুণাস্তর । এবং পদার্থাস্তর অথবা তাহার অভাব জ্ঞানের বিষয় হয় (যেমন) গুরু কুণ্ডলবিশিষ্ট, ছাত্র কুণ্ডলশূন্য [ অর্থাৎ যেমন “গুরু কুণ্ডলবিশিষ্ট” এইরূপ জ্ঞানে গুরুতে কুণ্ডলরূপ পদার্থাস্তর বিষয় হয় এবং “ছাত্র কুণ্ডল-শূন্য” এইরূপ জ্ঞানে ছাত্রে ঐ কুণ্ডলের অভাব বিষয় হয়, এইরূপ বিশিষ্ট জ্ঞানমাত্রেই কোন পদার্থাস্তর অথবা তাহার অভাব বিষয় হইয়া থাকে ] কিন্তু যদি পদার্থাস্তর সংযোগ-জ্ঞানের বিষয় না হয়, তাহা হইলে পদার্থাস্তরের অভাব বিষয় হইবে । তাহা হইলে “দ্রব্যস্বয় সংযুক্ত” এইরূপ জ্ঞানে প্রতিবিধ্যমান বলিতে হইবে । বিশদার্থ এই যে, অন্ততঃ দৃষ্ট যে পদার্থাস্তর এই স্থলে প্রতিবিদ্ধ হয় অর্থাৎ পূর্বোক্ত জ্ঞানে যে পদার্থাস্তরের অভাব বিষয় হয়, তাহা বলিতে হইবে । দুইটি মহৎ পদার্থে আশ্রিত পদার্থের জ্ঞান হওয়ায় (ঐ গৃহমাণ পদার্থ) পরমাণুপুঞ্জাশ্রিত নহে অর্থাৎ “দ্রব্যস্বয় সংযুক্ত” এইরূপে দুইটি মহৎ পদার্থগত সংযোগরূপ পদার্থের জ্ঞান হইতেছে ; সুতরাং ঐ সংযোগ মহৎশূন্য বহু পরমাণুগত নহে, ইহা স্বীকার্য্য ।

টিপ্পনী । পূর্বোক্ত পূর্বপক্ষবাদীদিগের মধ্যে কেহ কেহ বলিতেন যে, সংযোগ নামে কোন পদার্থাস্তর বা গুণাস্তর নাই । দ্রব্য প্রত্যাসত্তি অর্থাৎ নিকটবর্তী হইলে শব্দে দ্রব্যাস্তরের দৃষ্ট



তাহার প্রতীকিত হয়, তখন তদুপ প্রত্যাসক্তিকে অথবা ঐ প্রতীকিতকে লোকে সংযোগ বলিয়া ব্যবহার করে। বস্তুতঃ সংযোগ নামে কোন গুণান্তর নাই, উহা অলীক। তাহা হইলে ভাষ্যকার পূর্বাভাষে যে দোষ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহার আর সম্ভাবনা নাই। ভাষ্যকার এখানে এই মতেরও উল্লেখপূর্বক বলিয়াছেন যে, সংযোগ—পদার্থান্তর বা গুণান্তর, ইহা অবশ্য স্বীকার্য। কারণ, তাহা পদার্থান্তরের কারণ, তাহা অবশ্য পদার্থান্তর হইবে, তাহা অলীক হইতে পারে না। সংযোগ শব্দ, রূপাদি ও ক্রিয়ার কারণ। অব্যবহরে সংযোগরূপ গুণান্তর উৎপন্ন না হইলে, শব্দ ও রূপাদি কখনই জন্মিতে পারে না। ইহা স্বীকার না করিলে সংযোগোৎপত্তির পূর্বকও সেই অব্যবহার থাকায় তখনও কেন শব্দাদি জন্মে না? সুতরাং সংযোগ নামে গুণান্তর অবশ্য স্বীকার্য। উদ্যোতকর পূর্বোক্ত ৩৩ সূত্রবাহিককে পূর্বোক্ত মতের উল্লেখপূর্বক ইহার খণ্ডন করিতে প্রথমে বলিয়াছেন যে, পূর্বপক্ষবাদী যদি সংযোগ নামে পদার্থান্তরই স্বীকার না করেন, তাহা হইলে তিনি প্রতীকিত ও প্রত্যাসক্তি কাহাকে বলিবেন? পূর্বপক্ষবাদীর কথিত প্রতীকিত ও প্রত্যাসক্তি সংযোগরূপ পদার্থান্তর ব্যতীত কিছুতেই বুঝা যায় না। যিনি সংযোগ পদার্থই মানেন না, তিনি প্রতীকিত ও প্রত্যাসক্তি শব্দের অর্থ কি, তাহা বলিবেন; কিন্তু তাহা বলা অসম্ভব। প্রতীকিতেই সংযোগ ব্যবহার হয় বলিলে বস্তুতঃ সংযোগ পদার্থ স্বীকার করাই হয়। কারণ, ঐ প্রতীকিত বস্তুতঃ সংযোগবিশেষ। উদ্যোতকর এইরূপ ভাষ্যপর্য্যে প্রথমে পূর্বোক্ত মতের খণ্ডন করিয়া, বিচার্য্যমাণ বিষয়ে বহু আলোচনা করিয়াছেন। সুদীপন ত্রায়বাহিক তাহা দেখিবেন।

ভাষ্যকার শেষে পূর্বোক্ত পূর্বপক্ষ নিরাস করিতে আর একটি বুক্তি বলিয়াছেন যে, বিশিষ্ট বুদ্ধিতে বিশেষণরূপে কোন পদার্থান্তর অথবা পদার্থান্তরের অভাবই বিষয় হইয়া থাকে। যেমন "গুরু কুণ্ডলবিশিষ্ট" এইরূপ বিশিষ্ট বুদ্ধিতে গুরু হইতে ভিন্ন কুণ্ডলরূপ পদার্থ বিশেষণরূপে বিষয় হয়। "ছাত্র কুণ্ডলশূন্য" এইরূপ বিশিষ্ট বুদ্ধিতে ঐ কুণ্ডলের অভাব বিশেষণরূপে বিষয় হয়। বিশিষ্ট বুদ্ধিদ্বয়েই এইরূপ বিষয়নিয়ম দেখা যায়। "এই ছুইটি দ্রব্য সংযোগবিশিষ্ট", এইরূপ বিশিষ্ট বুদ্ধি হইয়া থাকে, উহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। ঐ বিশিষ্ট বুদ্ধিতে বিশেষণভাবে কোন পদার্থ বিষয় হয়, ইহা অবশ্য বলিতে হইবে। আমরা বলি, সংযোগ নামক পদার্থান্তরই উহাতে বিশেষণভাবে বিষয় হয়। যদি সংযোগকে পদার্থান্তর বলিয়া স্বীকার না কর, তাহা হইলে তাহা ঐ বুদ্ধির বিষয় হওয়া অসম্ভব। তাহা হইলে কোন পদার্থান্তরের অভাবকেই উহার বিষয় বলিতে হইবে। কারণ, বিশিষ্ট বুদ্ধিতে কোন পদার্থান্তর অথবা পদার্থান্তরের অভাব বিষয় হয়, এইরূপই নিয়ম। ঐ বিশিষ্ট বুদ্ধিতে সংযোগরূপ পদার্থান্তর বিষয় না হইলে অত্যা দৃষ্ট যে পদার্থান্তর ঐ হলে প্রতিবিধানান অর্থাৎ যে পদার্থ অত্যা দৃষ্ট হইয়াছিল, পূর্বোক্ত প্রতীকিতে তাহার অভাব

১। প্রত্যাসক্তিতে প্রতীকিতাবদানাদ্বাঃ সংযোগব্যবহারঃ, তাবৎস্থানানি প্রত্যাসক্তিঃ স্বাভাব্য প্রতিবিধানি ভবন্তি, শুচিন্ প্রতীকিতে সংযোগব্যবহারো নার্য্যন্তর ইতি। অনকুণ্ডলপদার্থান্তরসংযোগেন প্রত্যাসক্তিপ্রতীকিতো বক্তব্যো। তত্র সংযোগসংযোগাদীরাণ্যং প্রত্যাসক্তিভূত পূর্বপক্ষসংযোগঃ প্রতীকিতঃ। যঃ পুনঃ সংযোগঃ ন প্রতি-  
পদ্যতে তেন প্রত্যাসক্তঃ প্রতীকিতস্য চার্ণো বক্তব্য ইতি।—ভাষ্যবাহিক।



বিশেষণভাবে বিবর হইতেছে, এমন পদার্থ কি ? তাহা বলিতে হইবে । তাহা বখন বলিবার উপায় নাই, অর্থাৎ “এই দ্রব্যের সংযুক্ত” এইরূপ বিশিষ্ট বুদ্ধিতে বখন কোন দৃষ্ট পদার্থের অভাব বিবর হয়, ইহা বলা যায় না, তখন সংযোগনামক পদার্থান্তরই উহাতে বিবর হয়, ইহাই বলিতে হইবে । সুতরাং ঐ বিশিষ্ট বুদ্ধিরূপ প্রত্যক্ষের দ্বারাই সংযোগরূপ পদার্থান্তর সিদ্ধ হয় । ঐ সংযোগরূপ প্রত্যক্ষবিষয় পদার্থ, দুইটি মহৎ পদার্থে আশ্রিত থাকিয়াই প্রত্যক্ষ হয়—উহা পরমাণুগত হইলে উহার প্রত্যক্ষ হইতে পারে না । সুতরাং উহা পরমাণুদ্বারাশ্রিত বা পরমাণুপুঞ্জরূপ সমুদায়দ্বারাশ্রিত নহে । ভাষ্যকার শেষে এই কথা বলিয়া পূর্বোক্তরূপ সংযোগবিষয়ক প্রত্যক্ষের দ্বারা অতিরিক্ত সংযোগ পদার্থের দ্বারা অতিরিক্ত অবয়বী পদার্থও সিদ্ধ হয়, ইহাই স্থচিত করিয়া গিয়াছেন ।

ভাষ্য । জাতিবিশেষস্ত প্রত্যয়ানুবৃত্তিলিঙ্গস্থাপ্রত্যাখ্যানং, প্রত্যাখ্যানে বা প্রত্যয়ব্যবস্থানুপপত্তিঃ । ব্যধিকরণস্থানভিব্যক্তেরধিকরণবচনং । অণু-সমবস্থানং বিবর ইতি চেৎ ? প্রাপ্তাপ্রাপ্তসামর্থ্যবচনং । কিমপ্রাপ্তেহণু-সমবস্থানে তদাশ্রয়ো জাতিবিশেষো গৃহ্যতে ? অথ প্রাপ্তে ইতি । অপ্রাপ্তে গ্রহণমিতি চেৎ ? ব্যবহিতস্তাণুসমবস্থানস্তাপ্যুপলক্ষ্যপ্রসঙ্গঃ, ব্যব-হিতেহণুসমবস্থানে তদাশ্রয়ো জাতিবিশেষো গৃহ্যতে । প্রাপ্তে গ্রহণ-মিতি চেৎ ? মধ্যপরভাগয়োঃপ্রাপ্তাবনভিব্যক্তিঃ । যাবৎ প্রাপ্তং ভবতি তাবত্যভিব্যক্তিরিতি চেৎ ? তাবতোহধিকরণত্বমণুসমবস্থানস্তা । যাবতি প্রাপ্তে জাতিবিশেষো গৃহ্যতে তাবদস্তাধিকরণমিতি প্রাপ্তং ভবতি । তত্রৈক-সমুদায়ে প্রতীয়মানের্থভেদঃ । এবঞ্চ সতি যোহয়মণুসমুদায়ো বুদ্ধ ইতি প্রতীয়তে তত্র বুদ্ধবহুত্বং প্রতীয়তে ? যত্র যত্র হণুসমুদায়স্ত ভাগে বুদ্ধত্বং গৃহ্যতে স স বুদ্ধ ইতি ।

তস্মাৎ সমুদিতাণুস্থানস্যার্থান্তরস্য জাতিবিশেষাভিব্যক্তিবিরতাদবয়-ব্যর্থান্তরভূত ইতি ॥৩৬॥

অনুবাদ । “প্রত্যয়ানুবৃত্তিলিঙ্গ” অর্থাৎ গো, অশ্ব, ঘট, বুদ্ধ, ইত্যাদি প্রকার অনুবৃত্ত জ্ঞান বাহার লিঙ্গ ( সাধক ), এমন জাতিবিশেষের অপলাপ করা যায় না অর্থাৎ “জাতি” বলিয়া কোন পদার্থ নাই, ইহা বলা যায় না । পক্ষান্তরে অপলাপ করিলে জ্ঞানের ব্যবস্থার উপপত্তি হয় না [ অর্থাৎ গো, অশ্ব প্রভৃতি পদার্থমাত্রেরই যে সর্বত্র “গো”, “অশ্ব”, এইরূপ একই প্রকার জ্ঞান জন্মে, তাহাতে গোত্ব ও অশ্বত্ব প্রভৃতি জাতিই নিমিত্ত, এই জাতিবিশেষ ব্যতীত সকল গো, সকল অশ্ব প্রভৃতিতে ঐরূপ



জ্ঞান হইতে পারে না। সুতরাং গোধ ও অশ্ব প্রভৃতি জাতিবিশেষ অবশ্য স্বীকার্য্য]। ব্যতিকরণের (অধিকরণশূন্য ঐ জাতিবিশেষের) জ্ঞান হয় না অর্থাৎ অধিকরণ ব্যতিরেকে জাতির জ্ঞান হইতে পারে না, এ জ্ঞান (ঐ জ্ঞানমান জাতিবিশেষের) অধিকরণ (আশ্রয়) বলিতে হইবে।

(পূর্বপক্ষ) পরমানুসমবস্থান অর্থাৎ পরস্পর বিলক্ষণ সংযোগবিশিষ্ট হইয়া অবস্থিত পরমানুসমূহ “বিষয়” অর্থাৎ ঐ জাতিবিশেষের দেশ বা অধিকরণ, ইহা যদি বল ? (উত্তর) প্রাপ্ত অথবা অপ্রাপ্তের সামর্থ্য বলিতে হইবে অর্থাৎ প্রাপ্ত (চক্ষুঃসম্বন্ধিত) পূর্বোক্তরূপ পরমানুপুঞ্জের জাতিবিশেষ গ্রহণ করাইতে সামর্থ্য আছে, অথবা অপ্রাপ্ত অর্থাৎ চক্ষুঃসংযোগশূন্য পূর্বোক্ত পরমানুপুঞ্জের জাতিবিশেষ গ্রহণ করাইতে সামর্থ্য আছে, ইহা বলিতে হইবে। বিশদার্থ এই যে, কি অপ্রাপ্ত (চক্ষুঃসংযোগশূন্য) পরমানুপুঞ্জে তদাশ্রিত জাতিবিশেষ গৃহীত হয়, অথবা প্রাপ্ত (চক্ষুঃসংযুক্ত) পরমানুপুঞ্জে তদাশ্রিত জাতিবিশেষ গৃহীত হয় ?

(পূর্বপক্ষ) অপ্রাপ্তে অর্থাৎ চক্ষুঃসংযোগশূন্য পূর্বোক্তরূপ পরমানুপুঞ্জে (জাতিবিশেষের) জ্ঞান হয়, ইহা যদি বল ? (উত্তর) ব্যবহিত পরমানুপুঞ্জেরও উপলব্ধির আপত্তি হয় (এবং) ব্যবহিত অর্থাৎ বাহার সহিত চক্ষুঃসংযোগ হয় নাই, এমন পরমানুপুঞ্জে তদাশ্রিত জাতিবিশেষ গৃহীত (প্রত্যক্ষ) হইত ?

(পূর্বপক্ষ) প্রাপ্তে অর্থাৎ চক্ষুঃসংযুক্ত পূর্বোক্তরূপ পরমানুপুঞ্জে (জাতিবিশেষের) জ্ঞান হয়, ইহা যদি বল ? (উত্তর) মধ্যভাগ ও পরভাগে অর্থাৎ বৃক্ষাদির সম্মুখবর্তী ভাগ ভিন্ন আর যে দুই ভাগের সহিত চক্ষুঃসংযোগ হয় না, সেই দুই ভাগের অপ্রাপ্তি হওয়ায় অর্থাৎ তাহাতে চক্ষুঃসংযোগ না হওয়ায় (জাতিবিশেষের) অভিব্যক্তি (প্রত্যক্ষ) হয় না।

(পূর্বপক্ষ) ব্যবমাত্র প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ যে পর্য্যন্ত পরমানুপুঞ্জ চক্ষুর সহিত সংযুক্ত হয়, তাবমাত্র (জাতিবিশেষের) অভিব্যক্তি (প্রত্যক্ষ) হয়, ইহা যদি বল ? (উত্তর) তাবমাত্র পরমানুপুঞ্জের অধিকরণ হয়। বিশদার্থ এই যে, প্রাপ্ত অর্থাৎ চক্ষুঃসংযুক্ত ব্যবমাত্র (যে পর্য্যন্ত পরমানুপুঞ্জ) জাতিবিশেষ গৃহীত (প্রত্যক্ষ) হয়, তাবমাত্র এই জাতিবিশেষের অধিকরণ, ইহা প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ পূর্বপক্ষবাদীর কথার দ্বারা পাওয়া যায়। তাহা হইলে এক সমুদায় অর্থাৎ বৃক্ষ প্রভৃতি কোন এক পরমানুপুঞ্জ প্রতীয়মান হইলে পদার্থের ভেদ হয়। বিশদার্থ এই যে, এইরূপ হইলে অর্থাৎ চক্ষুঃসংযুক্ত পরমানুপুঞ্জেই বৃক্ষরূপ জাতিবিশেষের প্রত্যক্ষ হওয়ায় তাদৃশ



পরমাণুপুঞ্জই ঐ বৃক্ষের জাতির অধিকরণ বলিয়া স্বীকৃত হইলে, এই যে পরমাণুপুঞ্জ “বৃক্ষ” এইরূপে প্রতীত (প্রত্যক্ষ) হইতেছে, তাহাতে বৃক্ষবহুর প্রতীত হউক ? যেহেতু পরমাণুপুঞ্জের যে যে ভাগে বৃক্ষের গৃহীত (প্রত্যক্ষ) হয়, সেই সেই ভাগ বৃক্ষ ।

অতএব সমুদিতপরমাণুসমূহস্থান অর্থাৎ পরস্পর বিলক্ষণ সংযোগবিশিষ্ট পরমাণুপুঞ্জ বাহার স্থান (আলী), এমন পদার্থাস্তরের জাতিবিশেষের প্রত্যক্ষবিষয়ক-বশতঃ অর্থাৎ পরমাণুপুঞ্জের কোন পৃথক পদার্থই জাতিবিশেষপ্রত্যক্ষের বিদ্য (বিশেষ্য) হয় বলিয়া অব্যবহী পদার্থাস্তর ।

টিপ্পনী । ভাষ্যকার পূর্বোক্ত পূর্বপক্ষ নিরস্ত করিতে সর্বশেষে আর একটি কথা বলিয়াছেন যে, পরমাণুপুঞ্জ হইতে পৃথক অব্যবহী পদার্থ না থাকিলে জাতিবিশেষের প্রত্যক্ষ হইতে পারে না । বৃক্ষে যে বৃক্ষরূপ জাতিবিশেষের প্রত্যক্ষ হয়, তাহা বৃক্ষ বলিয়া কোন একটি মহৎ দ্রব্য না থাকিলে অর্থাৎ উহা পরমাণুপুঞ্জাত্মক হইলে কিছুতেই হইতে পারে না । পূর্বপক্ষবাদীরা ভাষ্যকারের দ্বারা “জাতি” পদার্থ মানিতেন না ; সুতরাং জাতি পদার্থ যে অবশ্য আছে, উহা অবশ্য স্বীকার্য, ইহা না বলিলে ভাষ্যকার তাহার ঐ যুক্তি বলিতে পারেন না, বলিলেও তাহা গ্রাহ্য হয় না, এ অস্ত ভাষ্যকার প্রথমে জাতি পদার্থের সাধক উত্তরপূর্বক জাতি পদার্থের অপলাপ করা যার না, এই কথা বলিয়া, পরে তাহার মূল বক্তব্যের অবতারণা করিয়াছেন । পরে তাহাতে পূর্বপক্ষ-বাদীর সকল বক্তব্যের অবতারণা করতঃ তাহার প্রতিবাদ করিয়া, নিজ বক্তব্যের সমর্থন করিয়াছেন ।

ভাষ্যকার প্রথমে বলিয়াছেন যে, জাতিবিশেষ “প্রত্যয়ানুভূতিগিষ্ণ”—তাহার অপলাপ করিলে প্রত্যয়ের ব্যবহার উপপত্তি হয় না । ভাষ্যকার ঐ কথার দ্বারা জাতিপদার্থের সাধক যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন যে, গো, অশ্ব, বৃক্ষ প্রভৃতি পদার্থ দেখিলে সর্বত্রই “ইহা গো”, “ইহা অশ্ব”, “ইহা বৃক্ষ” ইত্যাদিরূপে একাকার প্রত্যয় (জ্ঞান) হয়, ইহা সকলেরই স্বীকার্য । উহারই নাম প্রত্যয়ের অনুভূতি । গোমাত্রেরই গোষ নামে একটি জাতিবিশেষ আছে বলিয়াই গোমাত্রেরই ঐরূপ প্রত্যয়ানুভূতি হয় অর্থাৎ পূর্বোক্তরূপ অনুভূত প্রত্যয় হয় । গোমাত্রেরই “ইহার গো” এইরূপ জ্ঞানকে “অনুভূত প্রত্যয়” বলা হইয়াছে । গো ভিন্ন “ইহার গো নহে” এইরূপ জ্ঞানকে “ব্যবৃত্ত-প্রত্যয়” বলা হইয়াছে । অশ্ব, বৃক্ষ প্রভৃতি পদার্থ হলেও ঐরূপ অনুভূত ও ব্যবৃত্ত প্রত্যয় যুক্তিতে হইবে ।

পূর্বোক্তরূপ প্রত্যয়ানুভূতি বা অনুভূত প্রত্যয় যখন সকলেরই হইতেছে, তখন উহার অবশ্য নিমিত্ত আছে । নির্নিমিত্ত প্রত্যয় কখনই হইতে পারে না । গোষ, অশ্ব, বৃক্ষ প্রভৃতি জাতি-বিশেষই উহার নিমিত্ত বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে । একই গোষ সমস্ত গো পদার্থে আছে বলিয়াই সমস্ত গোপদার্থে ঐরূপ অনুভূত প্রত্যয় হয় । নতুন অস্ত কোন নিমিত্তবশতঃ ঐরূপ



প্রত্যয় হইতে পারে না। সুতরাং পূর্বোক্তরূপ প্রত্যয়ানুবৃত্তি জাতিবিশেষের লিঙ্গ অর্থাৎ অস্থ-  
মাপক হেতু। উহার দ্বারা গোষ্ঠাদি জাতিবিশেষ অস্থমান সিদ্ধ হয়। তাৎপর্য্যটীকাকার এখানে  
বলিয়াছেন যে, প্রত্যয়ানুবৃত্তি যদিও প্রত্যক্ষ, তথাপি বিপ্রতিপন্নকে লক্ষ্য করিয়া তাহাকেই লিঙ্গ  
বলা হইয়াছে। অর্থাৎ যদিও ভাষ্যকার প্রভৃতি স্মার্য্যচাৰ্য্যগণের মতে পূর্বোক্তপ্রকার অনুবৃত্ত  
প্রত্যয়রূপ প্রত্যক্ষের দ্বারাই গোষ্ঠাদি জাতিবিশেষ সিদ্ধ হয়, তাহা হইলেও পূর্বপক্ষবাদীরা তাহাতে  
বিপ্রতিপন্ন, তাহার ঐরূপ জাতি মানেন না, এই জন্য ঐ প্রত্যয়ানুবৃত্তিকেই অস্থমানের লিঙ্গরূপে  
উল্লেখ করা হইয়াছে। গুটু তাৎপর্য্য এই যে, বিপ্রতিপন্ন পক্ষের প্রতিপাদক পরার্থস্থমানরূপ স্মার  
দ্বারাও (যাহাকে প্রথমাব্যয়ে ভাষ্যকার “পরম স্মার” বলিয়াছেন) জাতিবিশেষ সিদ্ধ করা যাইবে,  
এই অভিপ্রারেই ভাষ্যকার প্রভৃতি প্রত্যয়ানুবৃত্তিকে “লিঙ্গ” বলিয়াছেন।

তাৎপর্য্যটীকাকার এখানে বহু বিচারপূর্বক জাতিবিশেষী বৌদ্ধসম্প্রদায়ের সমর্থিত জাতিবাদক  
নিরাস করিয়া ভাষ্যকার ও ব্যক্তিকারের কথিত পূর্বোক্ত জাতিবাদকের সমর্থন করিয়াছেন।  
মূলকথা, জাতিপদার্থ না থাকিলে পূর্বোক্তরূপ অনুবৃত্ত জ্ঞান হইতে পারে না। ভিন্ন ভিন্ন  
গোষ্ঠাজেই যে সর্বত্র “গো” এইরূপ একাকার জ্ঞান হয়, ঐরূপ জ্ঞাননিয়ম উপপন্ন হয় না।  
সুতরাং জাতিপদার্থের অপলাপ করা যায় না, উহা অবশ্য স্বীকার্য্য, ইহাই এখানে ভাষ্যকার  
সর্বাগ্রে বলিয়াছেন।

তাহার পরে যদি জাতি ও তাহার প্রত্যক্ষ অবশ্য স্বীকার্য্য হয়, তাহা হইলে ঐ জাতি কোন  
আশ্রয়ে থাকিয়া প্রত্যক্ষ হয়, তাহা পূর্বপক্ষবাদীর অবশ্য বক্তব্য। জাতির প্রত্যক্ষ হইলে, কোন  
আশ্রয় ব্যতীত তাহার প্রত্যক্ষ হইতে পারে না, ইহাও অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। সুতরাং  
ঐ স্বীকৃত প্রত্যক্ষবিষয় জাতির আধার কে, ইহা অবশ্য বলিতে হইবে। পূর্বপক্ষবাদী অবশ্যই  
বলিবেন যে, যদি জাতিপদার্থ মানিতেই হয়, তাহা হইলে পরমাণুপুঞ্জই তাহার অধিকরণ বা আশ্রয়  
বলিব। আমরা যখন পরমাণু ভিন্ন অবয়বী মানি না, তখন আমাদের মতে বৃক্ষের প্রভৃতি  
জাতি পরমাণুপুঞ্জরূপ বৃক্ষমিতেই থাকে, ইহাই বলিব। ভাষ্যকার “অণুমবস্থানং বিষয় ইতি  
চেৎ” এই সন্দর্ভের দ্বারা পূর্বপক্ষবাদীর ঐ কথার উল্লেখ করিয়াছেন। “অণুমবস্থান” বলিতে  
এখানে পরস্পর বিলক্ষণসংযোগবিশিষ্ট হইয়া অবস্থিত পরমাণুসমূহ বুঝিতে হইবে। “বিষয়”  
শব্দের দ্বারা দেশ বা অধিকরণ বুঝিতে হইবে। উদ্যোতকরের কথার দ্বারাও এইরূপ অর্থ  
বুঝা যায়। দেশাত্মক শব্দের মধ্যে “বিষয়” শব্দও কোবে কথিত আছে<sup>১</sup>। প্রাচীনগণ অধি-  
করণস্থানমাত্র অর্গেও “বিষয়” শব্দের প্রয়োগ করিতেন।

ভাষ্যকার পূর্বপক্ষবাদীর পূর্বোক্ত উত্তরের নিরাস করিতে বলিয়াছেন যে, যদি পরমাণুপুঞ্জকেই  
জাতির আধার বলিয়া জাতির ব্যক্তক বল, তাহা হইলে জিজ্ঞাস্য এই যে, ঐ পরমাণুপুঞ্জ কি

১। অণুমবস্থানমধিকরণমিতি চেৎ? অথ মন্তস্যে পরমাণব এব কেন্দিচ মবস্থানেনানবতিষ্ঠমানাত্মা জাতি  
বাস্তবমিতি স্মৃতিঃ নাবয়বী সিদ্ধান্তোতি।—ভাষ্যবাস্তবিক।

২। নীলজ্ঞানগণো দেশবিষয়ো জুগপদন্তঃ।—অমরকোষ, ভূমিবর্গ।



প্রাপ্ত অর্থাৎ চক্ষুঃসংযুক্ত হইয়াই জ্ঞাতির ব্যঞ্জক হয়? অথবা অপ্রাপ্ত অর্থাৎ চক্ষুঃসংযুক্ত না হইয়াও জ্ঞাতির ব্যঞ্জক হয়? যদি বল, চক্ষুঃসংযুক্ত না হইয়াও উহা জ্ঞাতির ব্যঞ্জক হয়, অর্থাৎ পরমাণুগুণে চক্ষুঃসংযোগ না হইলেও তাহাতে জ্ঞাতির প্রত্যক্ষ হয়, তাহা হইলে ব্যবহিত পরমাণু-গুণেরও কেন উপলব্ধি হয় না? যেমন বৃক্ষ তোনাদিগের মতে পরমাণুগুণ, তাহার সন্মুখবর্তী ভাগে চক্ষুঃসংযোগ হয়, ব্যবহিত ভাগে চক্ষুঃসংযোগ হয় না; ব্যবহিত ভাগ চক্ষুর দ্বারা অপ্রাপ্ত, ঐ অপ্রাপ্ত ভাগের প্রত্যক্ষ কেন হয় না এবং উহাতে বৃক্ষের জ্ঞাতির প্রত্যক্ষ কেন হয় না? যদি বল, চক্ষুঃসংযুক্ত পরমাণুগুণেই জ্ঞাতির প্রত্যক্ষ হয়, ইহাই আমরা বলি। এই পক্ষে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, তাহা বলিলে বৃক্ষের সকল ভাগে বৃক্ষজ্ঞাতির প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। কারণ, প্রথমে বৃক্ষের সন্মুখবর্তী ভাগেই চক্ষুঃসংযোগ হয়। মধ্যভাগ ও পরভাগে (পৃষ্ঠভাগে) চক্ষুঃসংযোগ হয় না; তাহা হইলে ঐ মধ্যভাগ ও পরভাগে বৃক্ষের প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। যদি বল, বাবদ্যে অর্থাৎ বৃক্ষাদির যতটুকু অংশ চক্ষুঃসংযুক্ত হয়, তাবদ্যেই বৃক্ষের প্রত্যক্ষ হয়, অল্প অংশে হয় না, ইহাতে দোষ কি? ভাষ্যকার এতদ্বারা বলিয়াছেন যে, তাহা হইলে বাবদ্যে জ্ঞাতিবিশেষের প্রত্যক্ষ হইবে, তাবদ্যেই ঐ জ্ঞাতিবিশেষের আধার, ইহাই স্বীকার করা হয়। তাহা স্বীকার করিলে "এক" বলিয়া যে বৃক্ষাদিকে প্রত্যক্ষ করা হইতেছে, তাহাও নানা পদার্থ হইয়া পড়ে। কারণ, যে যে ভাগে বৃক্ষের প্রত্যক্ষ হয়, সেই সেই ভাগ বৃক্ষ বলিতে হইবে, তাহা হইলে বৃক্ষের বহু-বোধ হইয়া পড়ে। বৃক্ষের এক-বোধ বাহা উভয় পক্ষেরই সম্মত, তাহা হইতে পারে না।

ভাষ্যকারের গুঢ় তাৎপর্য এই যে, যদি সর্বাধিক একটী বৃক্ষরূপ অবয়বী থাকে, তাহা হইলে উহার যে কোন ভাগে চক্ষুঃসংযোগ হইলে অবয়বী ঐ বৃক্ষেও চক্ষুঃসংযোগ হয়। তাহার কলে ঐ বৃক্ষেই বৃক্ষজ্ঞাতির প্রত্যক্ষ হয়। তাহাতে ঐ বৃক্ষের বহু-বোধের কোন সম্ভাবনাই নাই। কিন্তু যদি পরমাণুগুণেই বৃক্ষ হয়, তাহা হইলে উহার সন্মুখবর্তী ভাগে চক্ষুঃসংযোগ হইলে, ঐ ভাগেই বৃক্ষের প্রত্যক্ষ হইবে এবং তখন ঐ ভাগই একটী বৃক্ষ বলিয়া প্রত্যক্ষবিষয় হইবে। এইরূপ ক্রমে অন্তর্য্য ভাগে চক্ষুঃসংযোগ হইলে, তখন সেই সেই ভাগে বৃক্ষের প্রত্যক্ষ হওয়ায় সেই সেই ভাগকে বৃক্ষ বলিয়া বুঝিলে, ঐ বৃক্ষ পদার্থের ভেদই হইয়া পড়ে অর্থাৎ যে বৃক্ষ এক বলিয়াই প্রত্যক্ষবিষয় হয়, তাহা তখন অনেক বলিয়া প্রত্যক্ষবিষয় হইয়া পড়ে। বৃক্ষের অনেক প্রত্যক্ষ হইলে এক-প্রত্যক্ষ কিছুতেই হইতে পারে না। ভাষ্যকার পুনর্কৃত বিভাবের উপসংহারে বলিয়াছেন যে, অতএব সমুদিত পরমাণুসমূহ দ্বারা স্থান, এমন পদার্থান্তরই যখন জ্ঞাতিবিশেষ প্রত্যক্ষের বিষয় অর্থাৎ বিশেষ্য হয়, তখন অবয়বী ঐরূপ পদার্থান্তর। অর্থাৎ বৃক্ষাদি, পরমাণুগুণ নকে, উহার অতিবিক্ত অবয়বী। পরমাণুবিশেষ হইতে ব্যাণ্ডিকাদিক্রমে বৃক্ষাদি অবয়বী প্রবোধ উৎপত্তি হয়। পরমাণু দ্বাণ্ডকেরই সাক্ষ্য আধার ও কারণ হইলেও বৃক্ষাদি অবয়বীর সম্বন্ধে পরস্পর পরমাণুগুণিকে স্থান বা আধার বলা যায়। ভাষ্যকার তাহাই বলিয়াছেন। ভাষ্যে "সমুদিতাণুস্থানত" এইরূপ পাঠই প্রকৃত বুদ্ধি দায়। উদ্যোক্তবাদের ব্যাখ্যায়



ছাড়াও ঐ পাঠই ধরা যায়, ভাষা “জাতিবিশেষাতিব্যক্তিবিষয়ক” এইরূপ পাঠই সকল পুস্তকে দেখা যায়। উদ্যোতকর লিখিয়াছেন, “জাতিবিশেষাতিব্যক্তিহেতুবাং।” উদ্যোতকরের ঐ পাঠকে ভাষাকারের পাঠ বলিয়াও বিশ্বাস করিবার কোন বাধা নাই। প্রচলিত ভাষা-পাঠে অবয়বী বৃক্ষাদি, বৃক্ষাদি জাতিবিশেষ প্রত্যেকের বিষয় অর্থাৎ দুখা বিশেষরূপে বিষয়, ইহাই অর্থ বুঝিতে হইবে।

ভাষাকার এখানেই এই প্রকরণের বিচার শেষ করিয়া, বৃক্ষাদি ভ্রব্যগুলি যে পরমাণুপুঞ্জ নহে, উহার পৃথক অবয়বী, এই সিদ্ধান্ত প্রতিপন্ন করিয়াছেন। উদ্যোতকর ভ্রাব্যবৃত্তিকে এই বিচারের শেষে পূৰ্ণপক্ষবাদীকে নিরস্ত করিতে আর একটি কথা বলিয়াছেন যে, তাহার অবয়বী মানেন না, তাহার “পরমাণু” বলেন কিরূপে? বাহা পরম অণু অর্থাৎ পরম সূক্ষ্ম, তাহাই “পরমাণু” শব্দের অর্থ। কিন্তু যদি মহৎ পদার্থ কেহই না থাকে, তাহা হইলে অণুতে পরমত্ব বিশেষণ সার্থক হয়। অর্থাৎ যদি সবই এক প্রকার অণু হয়, তবে আর পরম অণু বলিবার প্রয়োজন কি? আনাদিগের মতে দুইটি পরমাণুর সংযোগে যে দ্ব্যণুক নামে পৃথক অবয়বী উৎপন্ন হয়, তাহাও অণু, তাহার অপেক্ষায় একটি পরমাণু আরও সূক্ষ্ম, এ জন্য তাহাকে পরমাণু বলা হয়। কেবল অণু বলিলে পূৰ্ণোক্ত দ্ব্যণুকও বুঝা যায়, সুতরাং পরমত্ব বিশেষণ সার্থক হয়। কিন্তু তাহার অবয়বী মানেন না, দ্ব্যণুক নামক পদার্থকে তাহার পরমাণুত্ব ভিন্ন আর কিছু বলেন না; সুতরাং তাহাদিগের মতে অণুতে পরমত্ব বিশেষণ সার্থক হয় না। বাহা হইতে আর সূক্ষ্ম নাই, তাহাই পরমাণু, ইহা বুঝিতে নহৎ পদার্থ স্বীকার আবশ্যক; নচেৎ “পরমাণু” শব্দের অর্থ বুঝিবার কোন উপায় নাই। উদ্যোতকর এইরূপে বিচার করিয়া সাংখ্যসম্মত “পরমাণু” শব্দার্থের উল্লেখপূর্বক তাহারও খণ্ডন করিয়াছেন। শেষে তত্ত্ব প্রভৃতি অবয়ব যে বস্ত্র প্রভৃতি অবয়বী হইতে ভিন্ন পদার্থ, এই বিষয়ে অহুমান প্রদর্শন করিয়া সাংখ্যসিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করিয়াছেন। তিনি এই প্রকরণের প্রারম্ভেও সাংখ্যসম্মত অবয়ব ও অবয়বীর অভেদ শব্দের যুক্তিবৃহের উল্লেখপূর্বক তাহারও নিরাস করিয়াছেন। তাহার মতে সাংখ্যমত নিরাসও যেন এই প্রকরণের উদ্দেশ্য বুঝা যায়। সাংখ্যমতে কিন্তু বৃক্ষাদি সমস্তই পরমাণুপুঞ্জ, উহার পৃথক অবয়বী নহে, এই সিদ্ধান্ত স্বীকৃত হয় নাই। সাংখ্যসূত্রে বিচার দ্বারা ঐ মতের খণ্ডনই দেখা যায়। ভ্রাব্যহজকার মহর্ষিও “নাতীন্দ্রিয়বাদপুনাং” এই কথার দ্বারা বৃক্ষাদি ভ্রব্য পরমাণুপুঞ্জ, উহার অবয়বী নহে, এই মতেরই খণ্ডন করিয়াছেন। পরবর্তী কালে বৌদ্ধ সম্প্রদায় এই মতের বিশেষরূপে সমর্থন করিলেও ইহা তাহাদিগেরই আবিস্কৃত মত বলিয়া বুঝিবার পক্ষে কোন প্রমাণ নাই। সূত্রির কাল হইতেই ঐ সমস্ত বিরুদ্ধ মতের উদ্ভাবন ও খণ্ডন মগুন চলিতেছে। ভ্রাব্যহজকার মহর্ষি গোতম ঐরূপ পূৰ্ণপক্ষের উদ্ভাবন করিয়াও তাহার খণ্ডন করিতে পারেন। তিনি যে তাহাই করেন নাই,

১। তন্মাত্র সমুচ্চিতপুমানাধীকৃত জাতিবিশেষাতিব্যক্তিহেতুবাংব্রব্যার্থাধীকৃত ইতি। সমুচ্চিতা অর্থঃ স্থানং বস্ত্র সোহং সমুচ্চিতপুমানঃ, সমুচ্চিতপুমানস্তাংবার্থাধীকৃত তস্য জাতিবিশেষব্যক্তিহেতুবাং নান্যনামিতি সিদ্ধান্তাবস্থার্থাধীকৃতঃ।—ভ্রাব্যবৃত্তিক।



এ বিষয়েও প্রমাণাভাব। তিনি চতুর্থাদ্বারেও পুনরায় অবয়ববিচার করিয়া বিশেষরূপে সমর্থন করিয়াছেন। সেখানেই এ বিষয়ে অন্তান্ত বক্তব্য প্রকাশিত হইবে।

ভাষ্যকার বাস্তবতায় এখানে পূর্বোক্ত পূর্বপক্ষের নিরাস করিতে যেরূপ বিতৃত বিচার করিয়াছেন, পূর্বপক্ষবাদীর পক্ষ সমর্থনপূর্বক তাহার নিরাসে যেরূপ প্রবৃত্ত করিয়াছেন, তাহাতে বুঝা যায়, তিনি বৌদ্ধযুগে বৌদ্ধ সম্প্রদায়কেই পূর্বপক্ষবাদিরূপে গ্রহণ করিয়া নিতান্ত আবশ্যক-বোধে বিতৃত বিচারপূর্বক ঐ মতের খণ্ডন করিয়াছেন। বুদ্ধদেবের শিষ্যচতুষ্টয়ের মধ্যে বৈভাষিক ও সৌত্রান্তিকই বাহু পদার্থ স্বীকার করিতেন। তন্মধ্যে সৌত্রান্তিক বাহু পদার্থকে অহুম্যেয় বলিতেন। বৈভাষিক বাহু পদার্থের প্রত্যক্ষ স্বীকার করিতেন। ভাষ্যকার, হুজুমাগারে প্রত্যক্ষের অল্পপ-পত্রিকেই বিশেষরূপে সমর্থন করিয়া পূর্বপক্ষের নিরাস করায়, তিনি প্রাচীন বৈভাষিক সম্প্রদায়কেই যে এখানে প্রতিবাদিরূপে গ্রহণ করিয়াছেন, ইহা বুঝা যায়। তাৎপর্যটীকাকারও এই বিচারের ব্যাখ্যায় এক স্থলে বৈভাষিক সম্প্রদায়ের সনাধানের স্পষ্ট উল্লেখ করিয়া ভাষ্যকারোক্ত উক্তরের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। যথাহানে তাহা বলা হইয়াছে। ৩৬।

অবয়বপরীক্ষা-প্রকরণ সমাপ্ত।

—c—

ভাষ্য। পরীক্ষিতং প্রত্যক্ষং, অনুমানমিদানীং পরীক্ষ্যতে।

অনুবাদ। প্রত্যক্ষ পরীক্ষিত হইয়াছে, এখন (অবসরতঃ) অনুমান পরীক্ষা করিতেছেন।

সূত্র। রোদোপঘাতসাদৃশ্যেভ্যো ব্যভিচার-  
দনুমানমপ্রমাণম্ ॥ ৩৭ ॥ ৯৮ ॥

অনুবাদ। (পূর্বপক্ষ) রোধ, উপঘাত এবং সাদৃশ্যপ্রযুক্ত ব্যভিচারবশতঃ অনুমান অপ্রমাণ।

ভাষ্য। “অপ্রমাণ”নিত্যেকদাপ্যর্থস্ত ন প্রতিপাদকমিতি। রোদোপঘাতাদপি নদী পূর্ণা গৃহতে, তদাচোপরিষ্ঠাদৃক্ষো দেব ইতি মিথ্যানুমানং। নীড়োপঘাতাদপি পিপীলিকাগুসঞ্চারো ভবতি। তদা চ ভবিষ্যতি বৃষ্টিরিতি মিথ্যানুমানমিতি। পুরুষোহপি ময়ূরবাশিতমনুকরোতি তদাপি শব্দ-সাদৃশ্যান্মিথ্যানুমানং ভবতি।

অনুবাদ। “অপ্রমাণ” এই শব্দের দ্বারা কোন কালেও পদার্থের নিশ্চায়ক হয় না (ইহা বুঝা যায়) অর্থাৎ সূত্রোক্ত “অনুমান অপ্রমাণ” এই কথার অর্থ এই

যে, অনুমান কোন কালেই পরার্থের যথার্থ নিশ্চয় জন্মায় না। (সূত্রোক্ত রোধাদি প্রযুক্ত ব্যভিচাররূপ হেতু বুঝাইতেছেন) রোধবশতঃও অর্থাৎ নদীর একদেশ রোধ প্রযুক্তও নদীকে পূর্ণ বুঝা যায়, তৎকালেও “উপরিভাগে দেব (পর্য্যন্তদেব) বর্ষণ করিয়াছেন” এইরূপ ভ্রম অনুমান হয়। নীড়ের উপবাতবশতঃও অর্থাৎ পিপীলিকার গৃহের উপদ্রব প্রযুক্তও পিপীলিকার অণ্ডসঞ্চার হয়, তৎকালেও “বৃষ্টি হইবে” এইরূপ ভ্রম অনুমান হয়। মনুষ্যও ময়ূরের রব অনুকরণ করে, তৎকালেও শকসাদৃশ্যবশতঃ ভ্রম অনুমান হয়। [তাৎপর্য্য এই যে, নদীর পূর্ণতা, পিপীলিকার অণ্ডসঞ্চার এবং ময়ূরের রব জ্ঞান জন্ম যখন ভ্রম অনুমিতি হয়, তখন নদীর পূর্ণতা প্রভৃতি হেতুত্রয় কথিত অনুমানে ব্যভিচারী, উহা প্রকৃত হেতু হইতে পারে না। সুতরাং ব্যভিচারিহেতুক বলিয়া অনুমান অপ্রমাণ।]

বিবৃতি। মহর্ষি গোতম প্রথমাদ্যায়ে অনুমান-প্রমাণকে “পূর্ব্ববৎ”, “শেষবৎ” ও “সামান্ততোদৃষ্ট” এই তিন নামে তিন প্রকার বলিয়াছেন। নদীর পূর্ণতাহেতুক অতীত বৃষ্টির অনুমান এবং পিপীলিকার অণ্ডসঞ্চার হেতুক ভাবিবৃষ্টির অনুমান এবং ময়ূরের রব হেতুক বর্তমান বৃষ্টির অনুমান অথবা বর্তমান ময়ূরের অনুমান, এই ত্রিবিধ অনুমানই পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ অনুমানের প্রসিদ্ধ উদাহরণরূপে প্রদর্শিত হইয়া থাকে। মহর্ষি গোতমের এই পূর্ব্বপক্ষ-সূত্রের কথার দ্বারাও পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ উদাহরণ তাহার অর্জিত বুঝা যায়। মহর্ষি অনুমান পরীক্ষার জন্য এই সূত্রে পূর্ব্বপক্ষ বলিয়াছেন যে, “অনুমান অপ্রমাণ,” অর্থাৎ বাহাকে অনুমান বলা হইয়াছে, তাহা কোন কালেই পরার্থ-নিশ্চয় জন্মায় না। কারণ,—

১। নদীর পূর্ণতা অতীত বৃষ্টির অনুমানে হেতু হইতে পারে না। নদীর একদেশ রোধ দ্বারা জন বদ্ধ করিলেও তখন নদীর পূর্ণতা বা জলাধিক্য দেখা যায়। সেখানে ঐ জলাধিক্য বৃষ্টিজন্ম নহে, কিন্তু ভ্রান্ত ব্যক্তি সেখানেও ঐ জলাধিক্য দেখিয়া অতীত বৃষ্টির ভ্রম অনুমান করে। সুতরাং নদীর পূর্ণতা অতীত বৃষ্টির অনুমানে ব্যভিচারী হওয়ায়, উহা প্রকৃত হেতু হই না। ব্যভিচারিহেতুক বলিয়া ঐ অনুমান অপ্রমাণ।

২। এবং পিপীলিকার গর্ত্তে জল সঞ্চালনাদির দ্বারা তাহার উপবাত করিলে, ঐ গর্ত্তস্থ পিপীলিকাগুলি ভীত হইয়া, নিজ নিজ অণ্ড মুখে করিয়া, ঐ গর্ত্ত হইতে অন্তর গমন করে, ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ। কিন্তু সেখানে পরে বৃষ্টি না হওয়ায় পিপীলিকার অণ্ডসঞ্চার ভাবি বৃষ্টির অনুমানে হেতু হয় না। কারণ, উহা ভাবিবৃষ্টির ব্যভিচারী। পিপীলিকার অণ্ডসঞ্চার হইলেই যে সেখানে পরে বৃষ্টি হইবে, এরূপ নিয়ম নাই। সুতরাং ব্যভিচারিহেতুক বলিয়া উদাহৃত ঐ অনুমানও অপ্রমাণ।

৩। এবং ময়ূরের রব শুনিয়া পরিতত্ত্বাহামব্যবসী ব্যক্তি যে বর্ত্তমান বৃষ্টির অথবা বর্ত্তমান



ময়ের অহুমান করে, ইহা তৃতীয় প্রকার অহুমানের উদাহরণরূপে প্রদর্শিত হয়। কিন্তু উহাও প্রমাণ হয় না। কারণ, কোন মনুষ্য যদি অহুকরণ শিকার দ্বারা ময়ের রবের দ্বারা রব করে, তাহা হইলে ঐ রব শুনিয়াও পূর্ণতঃ হান্যবাদী ব্যক্তি বর্তমান বুঝি বা ময়ের ভ্রম অহুমান করে। সুতরাং ময়ের রব ঐ অহুমানে হেতু হয় না—উহা ব্যভিচারী। সুতরাং ব্যভিচারিহেতুক বলিয়া উদাহৃত ঐ অহুমানও অপ্রমাণ। কলকথা, নদীর একদেশের "রোধ" এবং পিপীলিকা-গৃহের "উপঘাত" এবং ময়ূররবের "মাদৃশ" গ্রহণ করিয়া পূর্বোক্ত প্রকারে (১) নদীর পূর্ণতা, (২) পিপীলিকার অণুসঙ্গার ও (৩) ময়ূররব, এই হেতুত্রয়ের ব্যভিচার নিশ্চয় হওয়ার পূর্বোক্ত ত্রিবিধ অহুমানের কোন অহুমানই কোন কালেই বর্থাৎ বস্তুর নিশ্চয়ক হয় না। পূর্বোক্ত ত্রিবিধ অহুমানের ত্রিবিধ উদাহরণই বর্থাৎ কথিত হেতুতে ব্যভিচার নিশ্চয় হইতেছে, তখন অত্রাণ্ড উদাহরণেও ঐরূপে ব্যভিচার নিশ্চয় করা যাইবে। কোন স্থলে ব্যভিচার নিশ্চয় না হইলেও ব্যভিচার-সংশয় অবশ্যই হইবে। কারণ, প্রদর্শিত বহু অহুমানে ব্যভিচার নিশ্চয় হওয়ার তাহার সমানধর্মজ্ঞান জন্ত অহুমানমাত্রে ব্যভিচার সংশয়ের বাধক কিছু নাই। তাহা হইলে কোন স্থলেই অহুমান বর্থাৎ বস্তুর নিশ্চয়ক হইতে পারে না,—ইহাই পূর্বপক্ষরূপে বলা হইয়াছে যে, "অহুমান অপ্রমাণ"।

তিননী। মহাবি গোতম প্রমাণবিশেষের পরীক্ষা করিতে প্রত্যক্ষ প্রমাণের পরীক্ষা করিয়া, এখন অহুমান-প্রমাণের পরীক্ষা করিতেছেন। কারণ, প্রত্যক্ষ-প্রমাণের পরেই (প্রথমাব্যয়ে) অহুমান-প্রমাণ উদ্ভিষ্ট ও লক্ষিত হইয়াছে। সর্বাঙ্গে প্রত্যক্ষ-প্রমাণের উদ্দেশ ও লক্ষণ করার সর্বাঙ্গে প্রত্যক্ষ-প্রমাণেরই পরীক্ষা করিতে হইয়াছে। কারণ, উদ্দেশের ক্রমাহুমায়েই পদার্থের লক্ষণও পরীক্ষা কর্তব্য। সর্বাঙ্গে উদ্ভিষ্ট ও লক্ষিত প্রত্যক্ষ-প্রমাণ বিবরেই শিষ্যদিগের সর্বাঙ্গে জিজ্ঞাসা-বিশেষ উপস্থিত হওয়ার পরীক্ষা দ্বারা সর্বাঙ্গে তাহারই নিবৃত্তি করিতে হইয়াছে। ঐ জিজ্ঞাসা অহুমান-পরীক্ষার বিরোধী হওয়ার, প্রথমে অহুমান পরীক্ষা করিতে পারেন নাই। এখন প্রত্যক্ষ পরীক্ষার দ্বারা ঐ বিরোধি জিজ্ঞাসার নিবৃত্তি হওয়ার অবসরপ্রাপ্ত অহুমানের পরীক্ষা করিতেছেন। তাই ভাষ্যকার মহর্ষির অহুমান-পরীক্ষার অবতারণা করিতে বলিয়াছেন যে, "প্রত্যক্ষ পরীক্ষিত হইয়াছে, ইদানীং অহুমান পরীক্ষা করিতেছেন"। উদ্যোতকর ভাষ্যকারোক্ত "ইদানীং" এই কথার ব্যাখ্যা করিয়াই বলিয়াছেন যে, "অখেন্দানীমবদরপ্রাপ্তমহুমানং পরীক্ষ্যতে"। প্রত্যক্ষ পরীক্ষার পরে অহুমান অবদরপ্রাপ্ত অর্থাৎ মহর্ষির প্রত্যক্ষ পরীক্ষার পরে অহুমান পরীক্ষা সংগত, উহাতে অবদর নামে সংগতি আছে, সুতরাং ঐ সংগতিতেই মহর্ষি এখন অহুমান পরীক্ষা করিতেছেন। বিরোধি জিজ্ঞাসার নিবৃত্তি হইলে বক্তব্যতাই "অবদর"-সংগতি; প্রত্যক্ষপরীক্ষার পূর্বে অহুমান পরীক্ষা করিলে এই সংগতি থাকিত না। অত্র কোন সংগতিও সম্ভব না হওয়ার উহা অসংগত

১। বলা চাবসংগত সংগতিঃ তথা বক্তব্যাকরে।—অহুমিত্তিবিতি। অহুমানং,—বিরোধিজিজ্ঞাসানিবৃত্তি-বাবসরঃ,—অপি তু তদ্বিত্তো সত্যং বক্তব্যম্বেৎ, তথাচ কিমিদানীং বক্তব্যমিতি জিজ্ঞাসামবদরপ্রাপ্তমহুমানং নামেৎ।—অহুমিত্তিবিতি, পাণ্যদত্তো।



হইত, সংগতিহীন কথা বলা নিষিদ্ধ। প্রাচীনগণ সংগতির-বিচারপূর্বক কোথায় কোন কথা সংগত ও অসংগত, তাহা বিশদরূপে বুঝিয়া গিয়াছেন। দার্শনিক ঋষিগুণ্ডগিও সৰ্বত্র কোন না কোন সংগতিতে কথিত হইয়াছে। বিচারের দ্বারা সৰ্বত্রই তাহা বুঝিতে হইবে। প্রাচীন ব্যাখ্যা-কারগণ অনেক স্থলেই তাহা দেখাইয়া গিয়াছেন। কলকথা, ভাব্যকার এখানে প্রত্যক্ষ পরীকার পরে মহর্ষির অমুমান পরীকার “অবসর”-সংগতি দেখাইয়াছেন। উদ্যোতকর “অবসরপ্রাপ্ত্য” এই কথা দ্বারা তাহার স্পষ্ট ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

এর হইতে পারে যে, মহর্ষি প্রত্যক্ষপরীকার পরে অবয়বিপরীকা করিয়া অমুমান পরীকা করিয়াছেন। সুতরাং প্রত্যক্ষ পরীকার অব্যবহিত পরে অমুমান পরীকা না হওয়ায় প্রত্যক্ষ ও অমুমানে সংগতি থাকে কিরূপে? ভাব্যকারও অবয়বি-পরীকার পরে অমুমান-পরীকার অবতারণা করিতে সংগতি প্রদর্শনের জন্য “পরীক্ষিতং প্রত্যক্ষং” এই কথা বলেন কিরূপে? প্রত্যক্ষপরীকা ত অবয়বি-পরীকার পূর্বেই হইয়া গিয়াছে। এতদ্বত্তে বক্তব্য এই যে, প্রত্যক্ষপরীকা-প্রকল্পের পরে অবয়বিপরীকা-প্রকল্পে যে অবয়বি-পরীকা হইয়াছে, তাহাও প্রকারান্তরে প্রত্যক্ষ-পরীকার মধ্যে গণ্য। কারণ, অবয়বী না মানিলে প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। প্রত্যক্ষের যখন প্রামাণ্য আছে, ঘটাদি, পদার্থের প্রত্যক্ষলোপ যখন কোন মতেই করা যাইবে না, তখন ঘটাদি পদার্থ পরমাণুপুঞ্জ নহে, উহার পরমাণুপুঞ্জ হইতে পৃথক অবয়বী, উহার অবয়বী বলিয়াই উহাদিগের প্রত্যক্ষ হইতে পারে, পরমাণুপুঞ্জের প্রত্যক্ষ অসম্ভব; কারণ, পরমাণুগুলি অতীক্ষিত, এইরূপ যুক্তি অবলম্বনে মহর্ষি যে অবয়বি-পরীকা করিয়াছেন, তাহাতে পরম্পরায় প্রত্যক্ষও পরীক্ষিত হইয়াছে। সুতরাং অবয়বি-পরীকার পরে ভাব্যকার “পরীক্ষিতং প্রত্যক্ষং” এই কথা বলিয়া সংগতি প্রদর্শন করিতে পারেন। এই কথাগুলি মনে করিয়াই উদ্যোতকর ভাব্যকারের ঐ কথারই তাৎপর্য বর্ণনোদ্দেশে প্রথমে বলিয়াছেন, “পরম্পরায় পরীক্ষিতং প্রত্যক্ষং”। অবয়বি-পরীকাও পরম্পরায় প্রত্যক্ষ পরীকা। উহার দ্বারাও প্রত্যক্ষের প্রামাণ্য সমর্থিত হইয়াছে। প্রত্যক্ষ অমুমান, এই পূর্বোক্ত পূর্বপক্ষ নিবৃত্ত হইয়াছে। সুতরাং ঐ অবয়বি-পরীকারূপ চরমপ্রত্যক্ষপরীকার অব্যবহিত পরেই অমুমান-পরীকা হওয়ায়, পূর্বোক্ত সংগতি থাকার কোন বাধা নাই। মহর্ষি প্রথম-সংগতিতে অবয়বি-পরীকা করিলেও যদি প্রকারান্তরে প্রত্যক্ষ-পরীকার জন্মই অবয়বি-পরীকা করা হইয়া থাকে, তাহা হইলে উহা সাক্ষ্য অবয়বি-পরীকা হইলেও পরম্পরায় প্রত্যক্ষ-পরীকা হইবে। সুতরাং ভাব্যকার “পরীক্ষিতং প্রত্যক্ষং” এই কথা বলিয়া এখানে পূর্বোক্তরূপ সংগতি প্রদর্শন করিতে পারেন।

সূত্রে “অমুমানমপ্রমাণং” এই অংশের দ্বারা পূর্বপক্ষ বলা হইয়াছে, “অমুমান অপ্রমাণ”

১। যুক্তিকার বিশ্বনাথও লিখিয়াছেন,—অন্যদেয় ক্রমপ্রাপ্তমমুমানং পরীক্ষিতং পূর্বপক্ষকতি।

২। আনন্দবাণিজীবনপ্রয়োজকবিজ্ঞানজ্ঞানবিবর্তো দ্বর্থঃ সংখতিঃ।—অমুমানচিত্তাঙ্গানি-বীজিত, অথবা বৃত্ত। বস্তুনিষ্ঠপদার্থবহিতোক্তনিবৃত্তপদার্থোক্তিক। বা জিজ্ঞাসা ওঅনবজ্ঞানবিবর্তোক্তো যো দ্বর্থঃ স তদ্বিরপিত-সংগতিবিরোধঃ।—প্রমাণবী ব্যাখ্যা।



অর্থাৎ কোন কাণেই বস্তুর নিশ্চায়ক নহে। ভাষ্যকার প্রথমেরই স্বত্বোক্ত “অগ্রমাণ” শব্দের ঐরূপ অর্থের ব্যাখ্যা করিয়া পূর্ণপক্ষ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাহোক্ত “প্রতিপাদক” শব্দের ব্যাখ্যায় তাৎপর্যটীকাকার লিখিয়াছেন,—“প্রতিপাদকং নিশ্চায়কং”।

আপত্তি হইতে পারে যে, পূর্ণপক্ষবাদী যখন অহুমানগ্রমাণ স্বীকারই করেন না, তখন তিনি “অহুমান অগ্রমাণ” এই কথা বলিতেই পারেন না। অহুমান অলৌক হইলে তাহাতে অপ্রামাণ্যরূপ সাধ্যসাধন অনন্তব্য। আকাশকুহন গন্ধবিশিষ্ট, এইরূপ কথা কি বলা যায়? ঐরূপ প্রতিজ্ঞা যেমন হয় না, তদ্রূপ “অহুমান অগ্রমাণ” এইরূপ প্রতিজ্ঞাও হয় না।

এতদ্বত্তরে পূর্ণপক্ষবাদীদিগের কথা এই যে, অহুমান কি না অহুমানস্বরূপে তোনাদিগের অভিমত ধূমাদি হেতু জ্ঞান অগ্রমাণ, ইহাই ঐ প্রতিজ্ঞাবাক্যের অর্থ। অর্থাৎ আমরা অহুমান না মানিলেও তেনারা যে ধূমাদি জ্ঞানকে অহুমান বলিয়া স্বীকার কর, আমরাও ঐ ধূমাদি জ্ঞানকে অবশ্যই স্বীকার করি, আমরা তাহাকেই অগ্রমাণ বলি। অর্থাৎ “অহুমান অগ্রমাণ” এই বাক্যে “অহুমান” শব্দের দ্বারা তোনাদিগের অহুমানস্বরূপে অভিমত ধূমাদি জ্ঞান বুঝিবে, তাহা হইলে আর আশ্রয়ামিচ্ছা সোদের আশঙ্কা থাকিবে না। যদি বল যে, “অহুমান” শব্দের দ্বারা ধূমাদি জ্ঞান বুঝিলে উহার মূখ্যার্থ রক্ষা হয় না। লক্ষণা স্বীকার ব্যতীত “অহুমান” শব্দের ঐরূপ অর্থ বুঝা যায় না, এই জন্য পূর্ণপক্ষবাদী নাস্তিকনাস্ত্রদায় বলিতেন যে, আমরা যখন “অনংখ্যাত্তি”-বাদী, তখন আমরাইগের সত্তে অহুমান পরার্থ “অনং” ( অলৌক ) হইলেও তাহা “খ্যাত্তি”র অর্থাৎ জ্ঞানের বিষয় হওয়ায়, ঐ অনং পরার্থও আমরাইগের সত্তে অহুমান পরার্থ। অর্থাৎ অহুমিত্তির করণ অনং পরার্থ হইলেও উহা আমরা স্বীকার করি, তাহাকে অহুমান পরার্থ বলি, কিন্তু তাহা অগ্রমাণ, ইহা আমরাইগের নত। তাই তাহাতে আমরা অপ্রামাণ্যের সাধন করিতে পারি।

“অহুমান অগ্রমাণ” এই প্রতিজ্ঞার্থ সাধনে অর্থাৎ অহুমানে অপ্রামাণ্য সাধন করিতে মহর্ষি পূর্ণপক্ষবাদীর হেতুবাক্য বলিয়াছেন, “ব্যতিক্রান্ত”। ব্যতিক্রমের বিষয়নাথ উহার ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন, “ব্যতিক্রান্তিহেতুকত্বাৎ” অর্থাৎ ব্যতিক্রান্তিহেতুকত্বই অহুমানে অপ্রামাণ্যের সাধন। যে অহুমানের হেতু সাধ্য ধর্মের ব্যতিক্রান্তি, তাহাকে বলে ব্যতিক্রান্তিহেতুক অহুমান। ব্যতিক্রান্তিহেতুক অহুমান

১। অধ্যায়ানাং ন প্রমাণং ইত্যাহি।—তদ্বচিষ্ঠামপি, প্রথম পঙ। “অহুমানঃ” অহুমানঃস্বভাবিতঃ ধূমাদিজ্ঞানং, অনংখ্যাত্তিপুনীতনুমানসেব বা।—নীতিতি। অহুমানমিতি,—অভিসমস্তমিত্তত পট্টিকাদি। “ধূমাদিজ্ঞানঃ” ধূমাদিজ্ঞানস্বাভিজ্ঞঃ, “অহুমানঃ” অহুমানপরার্থঃ। তদ্বচি ধূমাদিজ্ঞানঃস্বভাবৈব লক্ষণততি সাধুপপত্তিরিতি ভাষ্যঃ। অহুমানপরার্থঃ ধূমাদিজ্ঞানস্বাভিনা যোযো লক্ষণতত্তেভ্যস্তিভ্যোঃ মূখ্যার্থপরতামপি সংসংগতি অনতিতি,—“খ্যাত্তিঃ” জ্ঞানঃ “উপনীতঃ” নিবর্তীকৃতঃ, অহুমানসেব বা অহুমিত্তিকরণস্বাভিজ্ঞসেব বা, অহুমানপরার্থঃ ইত্যমুখ্যভ্যে। তদ্বত্তে অলৌক এব পরানং শক্তিঃ তু পারমাণিকঃ, সনসংসংগতভ্যোঃ তত্র প্রবৃত্তিনিবর্তীকৃতাপ্রবৃত্তাকারানসংখ্যং, অহুমান-কারত গোচ্যসেবতথ্যাপ্রবৃত্তাকারসেব অতাবরণতরা অলৌকত্বাৎ অনতোষামুমিত্তিকরণস্বাভিজ্ঞত তদ্বত্তে অহুমান-পরার্থততি যোযাৎ। এবক চার্বকিকরণমিত্তজনকুপসংসংগতি অনংখ্যাত্তিবীকরণং তেনাঃ সত্তে অহুমিত্তি-করণস্বাভিজ্ঞেঃ সামান্যসাধনে নাসংখ্যাজ্ঞানসংগো যোয ইতি ভাষ্যঃ।—প্রাদ্যবদী।



অগ্রদান, ইহা সর্বসম্মত। সুতরাং যদি অহুমাননাই ব্যক্তিরিহেতুক বলিয়া প্রতিপন্ন করা যায়, তাহা হইলে অহুমাননাই অগ্রদান, ইহা সকলেরই স্বীকার্য।

অহুমাননাই ব্যক্তিরিহেতুক হইবে কেন? পূর্বপক্ষবাদীর বুদ্ধিহ ব্যক্তিরের প্রবোজক কি? এতদ্ব্যতীত মহর্ষি বলিয়াছেন, “রোহোপধাতনানুশ্রোতাঃ”। মহর্ষি ঐ কথা দ্বারা তাহার কণিত ত্রিবিধ অহুমানের হেতুস্বরে পূর্বপক্ষবাদীর বুদ্ধিহ ব্যক্তিরের প্রবোজক হুচনা করিয়াছেন।

মহর্ষি প্রথমদ্বায়ে অহুমাননহুত্রে (৫ হুত্রে) অহুমানকে পূর্ববৎ, শেষবৎ ও সামান্যতোদৃষ্টে, এই নামদ্বয়ে ত্রিবিধ বলিয়াছেন। কিন্তু উহাদিগের লক্ষণ কিছু বলেন নাই। ভাষ্যকার প্রথম করে কারণহেতুক অহুমানকে “পূর্ববৎ” এবং কার্যহেতুক অহুমানকে “শেষবৎ” বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। “সামান্যতোদৃষ্টে” অহুমানের এক প্রকার উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াই তাহার অত্রবিধ স্বরূপ হুচনা করিয়াছেন। উদ্যোতকর তৃতীয় করে ভাষ্যকারের প্রথম করা গ্রহণ করিলেও ভাষ্যকারোক্ত “সামান্যতোদৃষ্টে” অহুমানের উদাহরণ গ্রহণ করেন নাই। তিনি তৃতীয় করে কার্যকারণ-ভিন্ন-হেতুক অহুমানকেই “সামান্যতোদৃষ্টে” বলিয়াছেন। বলাকার দ্বারা জলের অহুমানকে তাহার উদাহরণ বলিয়াছেন। পরে ভাষ্যকারোক্ত সূর্যের গতির অহুমানরূপ উদাহরণের উল্লেখ করিয়া তাহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। বুদ্ধিকার বিনাশ প্রথম করে “পূর্ববৎ” বলিতে কারণহেতুক, “শেষবৎ” বলিতে কার্যহেতুক, “সামান্যতোদৃষ্টে” বলিতে কার্যও নহে, কারণও নহে, এমন পদার্থ-হেতুক অহুমান, এইরূপই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। পরে পূর্ববৎ বলিতে “অধরী”, শেষবৎ বলিতে “ব্যতিরেকী”, “সামান্যতোদৃষ্টে” বলিতে “অদ্যব্যতিরেকী” এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই ব্যাখ্যা প্রথম করে প্রাচীন স্মার্তাচার্য উদ্যোতকরই প্রদর্শন করিয়াছেন; উহা নব্যদিগের উদ্ভাবিত নূতন ব্যাখ্যা নহে। তবে লক্ষণ ও উদাহরণ বিবরে মন্তভেদ হইয়াছে। চিন্তামণিকার গবেষণ “কেবলাধরী” প্রভৃতি নামে অহুমানকে ত্রিবিধ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তৎপূর্ববর্তী উদয়নও অহুমানের ঐ প্রকারত্রয়ের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। গবেষণ প্রভৃতি নব্যদিগের ব্যাখ্যাত ত্রিবিধ অহুমানের চিন্তা করিয়া, অনেকে উহাই মহর্ষিসম্বোক্ত “পূর্ববৎ” প্রভৃতি ত্রিবিধ অহুমানের নব্য নৈয়ায়িকদিগের সম্মত ব্যাখ্যা বলেন। কিন্তু গবেষণ যে মহর্ষি-সম্বোক্ত ত্রিবিধ অহুমানেরই ব্যাখ্যা করিয়াছেন, স্বতন্ত্রভাবে অহুমানের প্রকারত্রয়ের ব্যাখ্যা করেন নাই, ইহা নিঃসংশয়ে বুঝা যায় না। পরন্তু নব্য নৈয়ায়িকচূড়ামণি গদাধর ভট্টাচার্য্য মহর্ষি গোতমের অহুমান-সম্বন্ধ উদ্ধৃত করিয়া “পূর্ববৎ” বলিতে কারণলিঙ্গক, “শেষবৎ” বলিতে কার্যালিঙ্গক, “সামান্যতোদৃষ্টে” বলিতে কার্যকারণ-ভিন্নলিঙ্গক অহুমান, এইরূপই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তবে আর নব্যদিগের মতে এইরূপ ব্যাখ্যা নাই, ইহা কি করিয়া বলা যায়? নব্যগণ মহর্ষি-সম্বোক্ত “পূর্ববৎ” প্রভৃতি অহুমানকে “অধরী” প্রভৃতি নামেই মন্তরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, ইহাই বা কি করিয়া বলা যায়?

কার্যহেতুক কারণাহুমান “শেষবৎ” অহুমান, এই পক্ষে নদীর পূর্ণতাহেতুক বৃষ্টির অহুমান

১। পূর্ববক্তিত্যজঃ কারণলিঙ্গকং কার্যালিঙ্গকং তন্তলিঙ্গককেত্বার্থঃ।—(অহুমানিত-পাদাধরী সংগতি-বিভাগের শেষ ভাগ ইহা)।



অর্থাৎ এই স্থলে বৃষ্টির অনুমিতির করণ "শেববৎ" অনুমান-প্রমাণ, এইরূপ উদাহরণ প্রদর্শিত হইয়া থাকে। নদীর পূর্ণতা বৃষ্টির কার্য্য, বৃষ্টি তাহার কারণ। মহর্ষি এই স্থলে "রোধ" শব্দের দ্বারা এই অনুমানের হেতু নদীর পূর্ণতাতে পূর্বপক্ষবাদের বুদ্ধি স্ব ব্যক্তির সূচনা করিয়াছেন। এই "রোধ" শব্দের দ্বারা নদীর একদেশ রোধই মহর্ষির বিবক্ষিত। নদীর একদেশ রোধবশতঃ নদীর পূর্ণতা হয়। সেখানে বৃষ্টিরূপ সাধ্য না থাকিলেও নদীর পূর্ণতারূপ হেতু থাকায়, এই হেতু বৃষ্টিরূপ সাধের ব্যক্তির, ইহাই মহর্ষির বিবক্ষিত। সুতরাং নদীর পূর্ণতারূপ কার্য্যহেতুক বৃষ্টিরূপ কারণের অনুমান মহর্ষি-কথিত ত্রিবিধ অনুমানের এক প্রকার উদাহরণরূপে মহর্ষির অভিপ্রেত, ইহাও এই স্থলে "রোধ" শব্দের দ্বারা বুঝা যাইতে পারে। এইরূপ ময়ূরের রবহেতুক ময়ূরের অনুমানও কার্য্যহেতুক কারণের অনুমান বলিয়া "শেববৎ" অনুমানের উদাহরণরূপে প্রদর্শিত হইয়া থাকে। মহর্ষি এই স্থলে "সাদৃশ্য" শব্দের দ্বারা এই অনুমানের হেতু ময়ূরের রবেও পূর্বপক্ষবাদের বুদ্ধি স্ব ব্যক্তির সূচনা করিয়াছেন। মহাব্যকর্ত্তক ময়ূরবসদৃশ রব শ্রবণেও ময়ূরব ভনে তজ্জাত ময়ূরের ভন অনুমিত হয়। সুতরাং ময়ূরের রব ব্যক্তির। এইরূপ পিপীলিকার অণুসন্ধারকে বৃষ্টির কারণরূপে বুঝিয়া, সেই হেতুর দ্বারা যে বৃষ্টির অনুমিত হয়, এই অনুমিতির করণ "পূর্ববৎ" অনুমান। পিপীলিকাওসন্ধারকে বৃষ্টির কারণরূপে না বুঝিয়া, এই হেতুক বৃষ্টির অনুমান "সামান্যতোদৃষ্ট" এইরূপ উদাহরণ প্রদর্শিত হইয়া থাকে। মহর্ষি এই স্থলোক্ত "উপবাত" শব্দের দ্বারা পিপীলিকাওসন্ধারহেতুক বৃষ্টির অনুমান তাহার পূর্বকথিত ত্রিবিধ অনুমানের কোন প্রকারের উদাহরণরূপে তাহার অভিপ্রেত, ইহাও বুঝা যায়। এই স্থলে "উপবাত" শব্দের দ্বারা মহর্ষি এই অনুমানের হেতুতে পূর্বপক্ষবাদের বুদ্ধি স্ব ব্যক্তির সূচনা করিয়াছেন। "উপবাত" বলিতে এখানে পিপীলিকা-গৃহের উপবাত বা উগ্ৰবাই মহর্ষির বিবক্ষিত। ভাষ্যকার প্রভৃতি একরূপই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। পিপীলিকাগৃহের উপবাতবশতঃ পিপীলিকার অণুসন্ধার হয়। কিন্তু সেখানে বৃষ্টি না হওয়ার, এই হেতু বৃষ্টিরূপ সাধের ব্যক্তির, ইহাই মহর্ষির বিবক্ষিত।

তাৎপর্য্যটীকাকার বার্তিকের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন যে, নদীর পূর্ণতা ও ময়ূররব, এই দুইটি "শেববৎ" অনুমানের উদাহরণ। এবং পিপীলিকার অণুসন্ধার অতিরিক্তি বৃষ্টির কার্য্য হইতে পারে না; উহা বৃষ্টির কারণও হইতে পারে না। কারণ, বৃষ্টিকার্য্যে উহার কোন সামর্থ্য উপলব্ধ হয় না; উহা না হইলেও বৃষ্টি হইয়া থাকে। কিন্তু এই স্থলে বৃষ্টির মূল কারণ পৃথিবীর ক্ষোভ; উহারই পূর্বকার্য্য পিপীলিকাওসন্ধার। পিপীলিকাগণ পাখির উন্মাদ দ্বারা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া নিম্ন নিম্ন অণুগুলি ভূমি হইতে উপরিভাগে নাইয়া যায়। অতএব এই পিপীলিকাওসন্ধারের দ্বারা বৃষ্টির কারণ পৃথিবীর ক্ষোভ অনুমান করিয়া, যদি সেই কারণেও দ্বারা বৃষ্টিরূপ কার্য্যের অনুমান হয়, তাহা হইলে এখানে এই অনুমান-প্রমাণ "পূর্ববৎ" অনুমানের উদাহরণ। আর যদি পূর্বোক্ত কার্য্যকাণ্ডে ভাব না বুঝিয়াই পিপীলিকাওসন্ধারের দ্বারা বৃষ্টির অনুমান হয়, তাহা হইলে কার্য্যকারণভাব না থাকায়, এই "অনুমান-প্রমাণ" "সামান্যতোদৃষ্ট" অনুমানের উদাহরণ জানিবে।



তাৎপর্যটীকাকারে কথগুলির দ্বারাও “পূর্ববৎ” প্রভৃতি মহর্ষি-স্বত্রোক্ত ত্রিবিধ অনুমানের কারণহেতুক, কার্যাহেতুক এবং কার্যাকারণভিন্ন পদার্থহেতুক, এইরূপ পূর্বোক্ত ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। কার্যও নহে, কারণও নহে, এমন পদার্থহেতুক অনুমানকে “সামান্ততোদৃষ্ট” অনুমান বলিলে সে পক্ষে “সামান্ত” শব্দের দ্বারা বুঝিতে হইবে, “সামান্তহেতু” অর্থাৎ কার্যও নহে, কারণও নহে, এমন ব্যাপ্তিবিশিষ্ট হেতু। সমস্ত হেতুতেই সামান্ততঃ ব্যাপ্তি থাকে, তাই “সামান্ত” শব্দের দ্বারা ই ব্যাপ্তিবিশিষ্ট হেতুকে গ্রহণ করা হইয়াছে। তাদৃশ হেতুপ্রযুক্ত দৃষ্ট অর্থাৎ জ্ঞানরূপ অনুমানই “সামান্ততোদৃষ্ট”। পূর্ববৎ এবং শেষবৎ অনুমানও ব্যাপ্তিবিশিষ্ট হেতুপ্রযুক্ত, এ অল্প উদ্যোতকর এই পক্ষে ঐ হেতুকে বলিয়াছেন, কার্য ও কারণভিন্ন। ভাষ্যকার প্রথম করে স্বর্ঘ্যের দেশান্তর দর্শনের দ্বারা তাহার গতির অনুমানকে সামান্ততোদৃষ্ট অনুমানের উদাহরণ বলিয়াছেন। উদ্যোতকর তাহা উপেক্ষা করিয়া অন্তরূপ উদাহরণ বলিয়াছেন। তাৎপর্যটীকাকার তাহার একটি হেতু বলিয়াছেন যে, ঐ স্থলেও স্বর্ঘ্যের দেশান্তরপ্রাপ্তিরূপ কার্যের দ্বারা তাহার কারণ স্বর্ঘ্যের গতির অনুমান হওয়ায়, ভাষ্যকারের ঐ উদাহরণ তাহার পূর্বোক্ত শেষবৎ অনুমানেরই উদাহরণ হইয়া পড়ে। ভাষ্যকার কিন্তু স্বর্ঘ্যের দেশান্তর দর্শনকেই স্বর্ঘ্যের গতির অনুমাপক বলিয়াছেন। বাহ্য এক স্থান হইতে স্থানান্তরে দৃষ্ট হয়, তাহা গতিমান, এইরূপ ব্যাপ্তি-নিশ্চয়বশতঃ স্বর্ঘ্যের দেশান্তর দর্শন তাহার গতির অনুমাপক হইতে পারে। ঐ দেশান্তরদর্শন স্বর্ঘ্যের গতির কার্য না বলিলে, ঐ অনুমান ভাষ্যকারের পূর্বোক্ত “শেষবৎ” অনুমান হয় না। স্বর্ঘ্যের দেশান্তরপ্রাপ্তি তাহার গতিক্রমের কার্য বটে, স্বর্ঘ্যের ক্রিয়া-জ্ঞাত তাহার দেশান্তরসংযোগ জন্মে। কিন্তু ভাষ্যকার ঐ দেশান্তরপ্রাপ্তিকে স্বর্ঘ্যের গতির অনুমাপক বলেন নাই, দেশান্তরদর্শনকেই স্বর্ঘ্যের গতির অনুমাপক বলিয়াছেন। দেশান্তর-প্রাপ্তি এবং দেশান্তরদর্শন এক পদার্থ নহে। ঐ দেশান্তরদর্শন গতিপ্রয়োজ্য হইলেও উহাকে গতিজন্য বলিয়া ভাষ্যকার স্বীকার করেন নাই। ভাষ্যকারের “ত্রয়া-পূর্বক” এই কথা দ্বারা সেখানে গতিপ্রয়োজ্য, এইরূপ অর্থ বুঝা যাইতে পারে। গতিজন্য দেশান্তরপ্রাপ্তি হয়, তজ্জন্য দেশান্তরদর্শন হয়, এইরূপ বলিলে দেশান্তর দর্শনের প্রতি স্বর্ঘ্যের গতি কারণ নহে, উহা কারণের কারণ হওয়ায় অন্তর্থাৎসিদ্ধ, ইহা বলা যাইতে পারে। তাহা হইলে ভাষ্যকারোক্ত ঐ অনুমান কারণ ও কার্যভিন্ন পদার্থহেতুক, এই অর্থেও “সামান্ততোদৃষ্ট” অনুমানের উদাহরণ হইতে পারে কি না, ইহা স্বাধীন চিন্তা করিয়া দেখিবেন। ভাষ্যকারোক্ত ঐ উদাহরণ খণ্ডন করিতে শেষে উদ্যোতকর পূর্বপক্ষ অবলম্বন করিয়াছেন যে, স্বর্ঘ্যের দেশান্তরপ্রাপ্তি দর্শনের দ্বারাও গতানুমান হইতে পারে না। কারণ, স্বর্ঘ্যের দেশান্তরসংযোগ অতীতির বলিয়া তাহার দর্শনই হইতে পারে না। অন্য ব্যক্তির দেশান্তরপ্রাপ্তি দর্শনের দ্বারা স্বর্ঘ্যের গতির অনুমান হয়, ইহাও বলা যায় না। কারণ, তাহা হইলে

১। অবিনাভাবিক স্বভাবপ্রতিবন্ধক, সর্বদ্যোতক হেতুনা সামান্ততঃ, অত্র বর্ধব্যপ্তিগোচরভবিত্বকর। হেতুবেশ সামান্তবৃত্তঃ। সামান্তেনাবিনাভাবিনা হেতুনা লজ্জিতঃ দৃষ্টঃ বর্ধিত্রয়মহুমান সামান্ততোদৃষ্টমহুমান। তৃতীয়াধিকারিণি।—তাৎপর্যটীকা, অনুবানপত্র, ১ অঃ।



ঐক্ৰপে অস্ত বস্তৰ দেশান্তৰপ্ৰাপ্তি দৰ্শনের দ্বাৰা সকল পদার্থেরই গতি অসম্ভৱন কেন হইবে না ? অতএব দেশান্তৰপ্ৰাপ্তিৰ অসম্ভৱন কৰিয়া, তাহাৰ দ্বাৰা সূৰ্য্যোৰ গতিৰ অসম্ভৱন হয়, ইহাই বলিতে হইবে, ইহাতে কোন দোষ হয় না, ইহাই উদ্যোতকরের এখানে সিদ্ধান্ত<sup>১</sup>। ভাষ্যকাৰ কিন্তু দেশান্তৰদৰ্শনকেই গতিপূৰ্ণক বহিয়া গতিৰ অসম্ভৱাপক বলিয়াছেন। দেশান্তৰপ্ৰাপ্তি দৰ্শন বলেন নাই। উদ্যোতকরের কথা এই যে, সৰ্ব্বত্র সূৰ্য্যমণ্ডলই কেবল দৃষ্ট হয়, আকাশ বা দিক্দেশরূপ দেশান্তরের দৰ্শন হইয়া সূৰ্য্যোৰ দৰ্শন হয় না, তাহা হইতে পারে না। কারণ, ঐ আকাশাদি অতীন্দ্রিয়, উহাদিগের দৰ্শন হইতে পারে না। সুতরাং সূৰ্য্যোৰ দেশান্তরে দৰ্শন অসম্ভৱ। ইহাতে বলব্য এই যে, প্ৰাক্তকালে সূৰ্য্যদৰ্শনের পৰে মধ্যাহ্নাদি কালে যে সূৰ্য্য-দৰ্শন হয়, তাহা কি পূৰ্ণদৰ্শন হইতে বিশিষ্ট নহে ? মধ্যাহ্নকালীন সূৰ্য্যদৰ্শনে যে বৈশিষ্ট্য আছে, তাহাৰ কি কোন প্ৰয়োজক নাই ? উহা কি পূৰ্ণদৰ্শন হইতে অস্ত স্থানে সূৰ্য্যদৰ্শন বলিয়া অসম্ভৱনিক হয় না ? তাহা হইলে ঐ অসম্ভৱনিক বৈশিষ্ট্যবিশিষ্ট সূৰ্য্যদৰ্শনই দেশান্তরে সূৰ্য্য-দৰ্শন। তাদৃশ বিশিষ্টদৰ্শনবিষয়ই ভাষ্যকাৰ সূৰ্য্যোৰ গতিৰ অসম্ভৱাপক হেতুৰূপে গ্ৰহণ কৰিয়াছেন, ইহা বুঝিবাষ্ট বাধা কি ? উদ্যোতকৰ বেৰূপ বিশিষ্ট হেতুৰ দ্বাৰা সূৰ্য্যো দেশান্তৰপ্ৰাপ্তিৰ অসম্ভৱন কৰিয়াছেন। ভাষ্যকাৰ দেশান্তৰদৰ্শন বলিয়া ঐ হেতুকেই সূৰ্য্যোৰ গতিৰ অসম্ভৱপকৰূপে গ্ৰহণ কৰিয়াছেন, ইহা বুঝিবাষ্ট বাধা কি ? যাহা সূৰ্য্যোৰ গতিজ্ঞাত দেশান্তৰপ্ৰাপ্তিৰ অসম্ভৱাপক হইতে পারে, তাহা সূৰ্য্যোৰ গতিৰ অসম্ভৱাপক কেন হইতে পারে না ? সূৰ্য্যগণ ভাষ্যকাৰের পক্ষের কথাগুলি ভাবিবেন।

বৃত্তিকার বিঘনাথ এই সূত্ৰের ব্যাখ্যায় শেষে কল্পান্তরে বলিয়াছেন যে, অথবা অসম্ভৱন-সম্বন্ধ-সূত্ৰে “পূৰ্ণবৎ” বলিতে পূৰ্ণকালীন সাধ্যাসম্ভৱাপক, “শেষবৎ” বলিতে উত্তৰকালীন সাধ্যাসম্ভৱাপক, “সামান্যভোদৃষ্ট” বলিতে বিন্যাস সাধ্যায়ত্ত অসম্ভৱাপক। নদীর পূৰ্ণতাজ্ঞান পূৰ্ণকালীন বৃষ্টির অসম্ভৱাপক। পিপীলিকাগুলকায়জ্ঞান উত্তৰকালীন বৃষ্টির অসম্ভৱাপক। নদীর বজ্ঞান বিন্যাস বৃষ্টির অসম্ভৱাপক। পূৰ্ণপক্ষবানী পূৰ্ণোক্ত ত্ৰিবিধ অসম্ভৱানের হেতুতেই ব্যক্তিতার প্ৰদৰ্শন কৰিয়া অসম্ভৱানের ত্ৰৈকালিক সাধ্যাসম্ভৱাপকত্ব সম্ভৱ হয় না, ইহা বুকাইয়া অসম্ভৱন অশ্ৰমাণ বলিয়াছেন। ইহাই বৃত্তিকারের ঐ কল্পের তাৎপৰ্য্য। ভাষ্যকাৰও কিন্তু সূত্ৰোক্ত “অশ্ৰমান” শব্দের ব্যাখ্যায় প্ৰথমেই বলিয়াছেন যে, একদাও অৰ্গাৎ কোন কালেও পদাৰ্থনিশ্চয়ক নহে। পরে সূত্ৰোক্ত ব্যক্তিতার বুকাইতে নদীর পূৰ্ণতাকে অতীত বৃষ্টির অসম্ভৱাপকৰূপে এবং পিপীলিকাগুলকায়কে ভাবি বৃষ্টির অসম্ভৱাপকৰূপে গ্ৰহণ কৰিয়াছেন। সুতরাং ভাষ্যকাৰেরও ঐক্ৰপ তাৎপৰ্য্য বুঝা

১। দেশান্তৰপ্ৰাপ্তিমহুমাৰ তদা পতম্ভৱানমিত্যদোষঃ। দেশান্তৰপ্ৰাপ্তিমানমিত্যঃ, ত্ৰাবাবে সতি কংগুচ্ছি-প্ৰত্যয়বিধয়ঃ চ প্ৰাচ্যস্থাপনভাবে চ তদভিমুখদেশসম্বন্ধাদিসম্বন্ধপ্ৰসিদ্ধিহাৰিত্য পরিবৃতাৎ ৩৭প্ৰত্যয়বিধয়ঃ। মধ্যাহ্নকালতঃ সৰ্গমন্তি, স চ দেশান্তৰপ্ৰাপ্তিমান, এবকাহিত্যঃ, তদাৎদেশান্তৰপ্ৰাপ্তিমানমিতি। অন্য দেশান্তৰ-প্ৰাপ্তিহুমাৰ গতিমহুমাৰ ইতি। দেশান্তৰপ্ৰাপ্তিহুমাৰ বাহুমাৰ দেশান্তৰপ্ৰাপ্তিমানমিত্যঃ, অলচস্থগো-বাধানিগুণপত্তৌ দৃষ্টত পুনৰ্দৰ্শনবিষয়তঃ সেবকত্বং !—ভাষ্যগাষ্ট্ৰিক।



বাইতে পারে। ভাষাকার বৃত্তিকারের ভাব মহাবির লক্ষণ-স্বত্রোক্ত “পূর্ববৎ” প্রকৃতি ত্রিবিধ অহুমানের পূর্বোক্ত প্রকার ব্যাখ্যাতর না করিয়াও কেবল অহুমানের ত্রৈকালিক সাধ্যাহুমাণকত সম্ভব হয় না, এই কথা বলিয়াও মহাবির পূর্বপক্ষ-স্বত্রের ঐক্যপই তাৎপর্য বর্ণন করিতে পারেন। তাহাতেও অহুমানের অপ্রামাণ্যরূপ পূর্বপক্ষ সমর্থিত হইতে পারে। কারণ, ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান কোন কালেই সাধ্যাহুমাণক হয় না, ইহা সমর্থন করিলে অপ্রামাণ্যেরই সমর্থন হয়, এবং উহা সমর্থন করিতে ঐক্য ত্রিকালীন সাধ্যাহুমানের হেতুতেই ব্যক্তির প্রদর্শন করিতে হয়। ভাষাকার তাহাই করিয়াছেন। উদ্যোতকর নদীর পূর্ণতাহেতুক বৃষ্টির অহুমানে কাগবিশেষ বিবক্ষিত নহে, যে কোন কালই গ্রাহ্য, ইহাই বলিয়াছেন। তাৎপর্যটীকাকার উদ্যোতকরের ব্যক্তিকের ব্যাখ্যায় “পূর্ববৎ” প্রকৃতি মহাবিরস্বত্রোক্ত ত্রিবিধ অহুমানের উদাহরণেই হেতুতে ব্যক্তির প্রদর্শন তাহার অভিপ্রেত বলিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন এবং ঐ “পূর্ববৎ” বলিতে কারণ-হেতুক, “শেষবৎ” বলিতে কার্য্যহেতুক, “সামান্যতোদৃষ্ট” বলিতে কার্য্যকারণভিন্নহেতুক অহুমান, এইরূপই ব্যক্ত করিয়াছেন। কারণ, তিনি ভাষাকারোক্ত নদীর পূর্ণতাহেতুক এবং ময়ূরবহেতুক এবং পিপীলিকাওসঞ্চারণহেতুক অহুমানত্রয়কে পূর্বোক্তরূপেই বুকাইয়াছেন।

ভাষাকার মহাবিরস্বত্রোক্ত “ব্যক্তির” বুকাইতে উদাহরণত্রে যে ভ্রম অহুমিত্তির কথা বলিয়াছেন, তাহাতে ভাষাকারের গুঢ় তাৎপর্য্য এই যে, যখন নদীর পূর্ণতা প্রকৃতি হেতুত্রয়ের দ্বারা বৃষ্টির অহুমান করিলে ঐ অহুমান ভ্রম হয়, তখন ঐ হেতুত্রয় বৃষ্টিরূপ সাধারণ ব্যক্তির, ইহা সকলেরই স্বীকার্য্য। নচেৎ ঐ সকল স্থলে অহুমিত্তি ভ্রম হইবে কেন? যেখানে হেতুতে সাধ্যার্থের ব্যাপ্তি নাই অর্থাৎ হেতুপদার্থ সাধ্যার্থের ব্যক্তির, সেখানে হেতুতে সাধ্যার্থের ব্যাপ্তি-ভ্রমেই ভ্রম অহুমিত্তি হইয়া থাকে। যেমন বহিতে ধূমের ব্যাপ্তি নাই, বহি ধূমের ব্যক্তির। ঐ বহিতে ধূমের ব্যাপ্তি আছে, এইরূপ ভ্রম হইলে, সেখানে বহি দেখিয়া ধূমের যে অহুমিত্তি হয়, তাহা ভ্রম, ইহা সকলেই স্বীকার করেন। সুতরাং বহিহেতুক ধূমের অহুমিত্তির করণ, অহুমান-প্রমাণের লক্ষ্যই নহে। ধূমসাধনে বহিহেতুও (ধূমবান্ বহে:) সঙ্কেত লক্ষণের লক্ষ্যই নহে, ইহা সকলেই স্বীকার করেন। এইরূপ নদীর পূর্ণতা প্রকৃতিহেতুক বৃষ্টির অহুমিত্তি যখন ভ্রম হয়, তখন ঐ অহুমানে প্রবৃত্ত হেতু ব্যক্তির, সুতরাং ঐ অহুমিত্তির করণ অপ্রমাণ, উহা অহুমান-প্রমাণের লক্ষণের লক্ষ্যই নহে। এই ভাবে যদি অহুমান-প্রমাণের লক্ষণের লক্ষ্যই কেহ না থাকে, তাহা হইলে তাহার লক্ষণ বাহা বলা হইয়াছে, তাহা অলীক। লক্ষ্য না থাকিলে লক্ষণ থাকিতে পারে না। এই ভাবেই পূর্বপক্ষবাদীর তাৎপর্য্য বুঝিতে হইবে। তাৎপর্য্যটীকাকার প্রথমেই পূর্বপক্ষবাদীর তাৎপর্য্য বর্ণন করিয়াছেন যে, লক্ষণের লক্ষ্যপরতাবশতঃ অর্থাৎ লক্ষ্যকে উদ্দেশ্য করিয়াই লক্ষণ বলা হয়, এই ভ্রম লক্ষণবৃত্ত লক্ষ্যের ব্যক্তির হইলে তাহার অপ্রমাণত্ববশতঃ

১। ন চ তত্র লক্ষণস্যেব.....তরাপি ব্যাপ্তিভ্রমেই বা অহুমিত্তির ভ্রমবিসিদ্ধিঃ। অতথা ধূমবান্ বহেতিত্যাদেবপি লক্ষ্যবৃত্ত স্বত্ববাৎ।—ব্যাপ্তিপক্ষবাদীরা।



লক্ষণই দৃষ্ট হইবে। শেষকথা, অনুমান বলিয়া অভিমত সকল স্থলেই ব্যক্তির নিষ্কর না হইলেও ব্যক্তির সংশয় অবশ্যই হইবে। তাহা হইলে কোন স্থলেই অনুমানের দ্বারা সাধ্যানিশ্চয়ের সম্ভাবনা নাই। সাধ্যানিশ্চয়ের জনক না হইলে তাহা প্রমাণ হইতে পারে না। বাহ্য সম্ভাবনা বা সংশয়-বিশেষের জনক, তাহাকে প্রমাণ বলা যায় না। সিদ্ধান্তবাদীদের নিজ মতানুসারেই যখন অনুমানের অপ্রমাণা গণিত হইতেছে, তখন অনুমানকে তাহার প্রমাণ বলিতে পারেন না, ইহাই পূর্বপক্ষবাদের মূল বক্তব্য। পরবর্তী সূত্রে সকল কথা পরিস্ফুট হইবে। ৩৭]

### সূত্র । নৈকদেশ-ত্রাস-সাদৃশ্যেভ্যোহর্থান্তর- ভাবাৎ ॥৩৮॥১৯॥

অনুবাদ। (উত্তর) না, অর্থাৎ অনুমান অপ্রমাণ নহে। যেহেতু একদেশ, ত্রাস ও সাদৃশ্য হইতে অর্থান্তরভাব (ভেদ) আছে। [অর্থাৎ পূর্বপক্ষবাদের গৃহীত একদেশ বোধজ্ঞান নদীরকি, ত্রাসজ্ঞান পিপীলিকাওসঞ্চার ও মনুষ্য কর্তৃক ময়ূর-রবসদৃশ রব হইতে পূর্বোক্ত অনুমানে হেতুরূপে গৃহীত নদীরকি প্রভৃতি ভিন্ন পদার্থ, তাহা ব্যক্তির নহে, সূত্রের অনুমান ব্যক্তির হেতুক না হওয়ায় অপ্রমাণ নহে]।

ভাষ্য। নারমনুমানব্যক্তিরঃ, অননুমানে তু বহুরমনুমানাভিমানঃ। কথং? নাবিশিক্টো লিঙ্গং ভবিতুমহতি। পূর্বোদকবিশিক্টং খলু বর্ষো-দকং ক্ষীণতরঙ্গং স্রোতসো বহুতরকেন-কলপর্ণকাস্তাদিবহনক্ষোপলভমানঃ পূর্ণত্বেন নদ্যা উপরি বৃক্টো দেব ইত্যনুমিনোতি নোদকবুদ্ধিমাশ্রেণ। পিপীলিকাপ্রায়স্তাওসঞ্চারে ভবিষ্যতি বৃষ্টিরিত্যানুমীয়তে ন কাসাধিদতি। নেদং ময়ূরবাশিতং তৎসদৃশোহয়ং শব্দ ইতি, বিশেষ্যপরিজ্ঞানান্নিখ্যানু-মানমিতি। যন্ত সদৃশাদ্বিশিক্টাচ্ছব্দাদ্বিশিক্টং ময়ূরবাশিতং গৃহ্মাতি তন্ত বিশিক্টোহর্থো গৃহ্মাণো লিঙ্গং যথা সর্পাদীনামিতি। সোহয়মনু-মাতুরপরাধো নানুমানন্ত, যোহর্থবিশেষেণানুমেয়মর্থমবিশিক্টার্থদর্শনেন বুভুৎসত ইতি।

অনুবাদ। ইহা অনুমানে ব্যক্তির নহে, কিন্তু ইহা অননুমানে অর্থাৎ বাহ্য অনুমান নহে, তাহাতে অনুমান ভ্রম। (প্রশ্ন) কেন? (উত্তর) অবিশিক্ট পদার্থ

১। লক্ষণের বর্ণনায় লক্ষণবৃত্ত লক্ষণ ব্যক্তির প্রমাণের লক্ষণের দৃষ্ট্যঃ ভবতীভাবঃ।—



হেতু হইতে পারে না, অর্থাৎ পূর্বোক্ত অনুমানে অবিশিষ্ট নদীবৃদ্ধি প্রভৃতি হেতু হইতে পারে না। যেহেতু পূর্বজল হইতে বিশিষ্ট বৃষ্টিজল, শ্রোতের প্রধরতা এবং বহুতর ফেন, কল, পত্র ও কাষ্ঠাদির বহনকে উপলব্ধি করতঃ নদীর পূর্বতা-হেতুক “উপরিভাগে পর্জন্যদেব বর্ষণ করিয়াছেন” ইহা অনুমান করে, জলবৃদ্ধিমাত্রের দ্বারা অনুমান করে না, অর্থাৎ সামান্যতঃ নদীর যে কোনরূপ জলবৃদ্ধি দেখিলে ঐরূপ অনুমান হয় না।

(এবং) পিপীলিকাপ্রবাহের অর্থাৎ শ্রেণীবদ্ধ বহু পিপীলিকার অণুসংকার হইলে “বৃষ্টি হইবে” ইহা অনুমিত হয়, কতকগুলির অর্থাৎ কতিপয় পিপীলিকার অণুসংকার হইলে “বৃষ্টি হইবে” ইহা অনুমিত হয় না।

(এবং) ইহা ময়ূরব নহে, ইহা তাহার সদৃশ শব্দ। [ অর্থাৎ পূর্বপক্ষবাদী যে মনুষ্য কর্তৃক অনুকৃত ময়ূরশব্দকে গ্রহণ করিয়া ব্যক্তিতার বলিয়াছেন, তাহা প্রকৃত ময়ূরব নহে, তাহা ময়ূরবের সদৃশ শব্দ, ময়ূরবে ঐ শব্দ হইতে বিশেষ আছে ] বিশেষের অপরিজ্ঞানবশতঃ ভ্রম অনুমান হয়। যে (ব্যক্তি) কিন্তু সদৃশ বিশিষ্ট শব্দ হইতে বিশিষ্ট ময়ূরশব্দ গ্রহণ করে, তাহার সম্বন্ধে বিশিষ্ট পদার্থ অর্থাৎ প্রকৃত ময়ূরশব্দ গৃহমাণ হইয়া (ময়ূরানুমান) হেতু হয়, যেমন সর্প প্রভৃতির [ অর্থাৎ সর্প প্রভৃতি প্রকৃত ময়ূরশব্দ গ্রহণ করিতে পারায় ঐ ময়ূরশব্দ তাহাদিগের ময়ূরানুমানে হেতু হয় ]।

সেই ইহা অনুমানকর্তার অপরাধ, অনুমানের (অপরাধ) নহে, যে (অনুমান-কর্তা) অর্থবিশেষের দ্বারা অর্থাৎ কোন বিশিষ্ট পদার্থরূপ হেতু দ্বারা অনুমেয় পদার্থকে অবিশিষ্ট পদার্থ দর্শনের দ্বারা বৃত্তিতে ইচ্ছা করে [ অর্থাৎ বিশিষ্ট নদীবৃদ্ধি প্রভৃতি পদার্থের দ্বারা বাহ্য অনুমেয়, তাহাকে অবিশিষ্ট নদীবৃদ্ধি প্রভৃতির দ্বারা অনুমান করিতে যাইয়া ব্যক্তিতার দেখিলে, তাহা ঐ অনুমানকর্তারই অপরাধ, উহা অনুমানের অপরাধ নহে;—কারণ, উহা অনুমানই নহে, অনুমানকারী বাহ্য অনুমানই নহে, তাহাকে অনুমান বলিয়া ভ্রম করিয়া ব্যক্তিতার প্রদর্শন করায় উহা তাহারই অপরাধ ]।

টিপসনী। মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা পূর্বোক্ত পূর্ণপক্ষের নিরাস করিয়াছেন। পূর্ণপক্ষ হইতে “অনুমানমপ্রমাণং” এই কথাটির অর্থবৃত্তি করিয়া, এই সূত্রস্থ “ন” এই কথার সহিত তাহাব যোগে বাধ্য হইবে যে, “অনুমান অপ্রমাণ নহে”। তাহা হইলে পূর্ণপক্ষবাদীর দাব্য অনুমানের অপ্রমাণের অভিধেই মহর্ষির এখানে দাব্য, ইহা বুঝা যায়। পূর্ণপক্ষবাদীর পক্ষে হেতু, ব্যক্তিতার-



হেতুক। মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা ঐ হেতু অসিদ্ধতা সূচনা করিয়া তাহার সমাখ্যাত্বমানে অব্যভিচারিহেতুকরূপ হেতুও সূচনা করিয়াছেন। অর্থাৎ অহমান ব্যভিচারিহেতুক নহে, সুতরাং অপ্রমাণ নহে। অহমান অব্যভিচারিহেতুক, সুতরাং প্রমাণ। অহমান ব্যভিচারিহেতুক নহে কেন? পূর্বসূত্রে যে ব্যভিচার প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা কেন হয় না? ইহা বুঝাইতে অর্থাৎ পূর্বপক্ষবাদীর কথিত ব্যভিচারিহেতুকরূপ হেতু যে অহমানে নাই, উহা যে অসিদ্ধ, সুতরাং স্বক্ৰান্ত—ইহা বুঝাইতে মহর্ষি এই সূত্রে বলিয়াছেন যে, একদেশ, জ্ঞান ও নানুস্ত হইতে ভেদ আছে। মহর্ষি এই একদেশ শব্দের দ্বারা একদেশরোধজন্য নদীর বৃত্তিকে এবং জ্ঞান শব্দের দ্বারা জ্ঞানজন্য পিপীলিকার অণুসংস্কারকে এবং নানুস্ত শব্দের দ্বারা মনুরূপের সন্মুখ রককে লক্ষ্য করিয়াছেন। ঐগুলি প্রদর্শিত অহমানে হেতু নহে। প্রদর্শিত অহমানে যে বিশিষ্ট নদীবৃত্তি প্রকৃতি হেতু, তাহা পূর্বপক্ষবাদীর পবিগৃহীত পুঙ্খানুপুঙ্খ একদেশরোধজন্য নদীবৃত্তি প্রকৃতি হইতে অর্থাত্তর অর্থাৎ তিন্ন পদার্থ। সুতরাং সেগুলি ব্যভিচারী হইলে, প্রকৃত হেতু ব্যভিচারী হয় না। সুতরাং মহর্ষির অভিমত বিশিষ্ট নদীবৃত্তি প্রকৃতি-হেতুক অহমানজ্ঞেয় ব্যভিচারি-হেতুক নাই, উহা অসিদ্ধ। মহর্ষির অভিমত অহমানে যেগুলি প্রকৃত হেতুরূপেই গৃহীত হয়, তাহারাই সেই হলে প্রকৃত সাধ্যের ব্যভিচারী নহে, সুতরাং অহমানে অব্যভিচারিহেতুকই আছে, সুতরাং অহমানের প্রামাণ্যই সিদ্ধ হয়,—অপ্রামাণ্য বাবিত হইয়া যায়, এই পর্য্যন্তই এই সূত্রে মহর্ষির মূল তাৎপর্য্য। কোন নব্য টীকাকার এখানে “নৈকদেশরোধ” এইরূপ সূত্রপার্থ উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু উচ্চোক্তকর প্রকৃতি প্রাচীনগণের উক্ত সূত্রপার্থে “রোধ” শব্দ নাই। “একদেশরোধ” বলিলেও মহর্ষির সম্পূর্ণ বক্তব্য বলা হয় না, সুতরাং মহর্ষি “একদেশ” শব্দের দ্বারাই তাহার বক্তব্য সূচনা করিয়াছেন, বুঝিতে হইবে। —এবং পরে “জ্ঞান” ও “নানুস্ত” শব্দের দ্বারাই তাহার বক্তব্য সূচনা করিয়াছেন, বুঝিতে হইবে। প্রাচীন সূত্রগ্রন্থে সংক্ষিপ্ত ভাষার ঐক্য সূচনা দেখা যায়।

ভাষ্যকার, স্বত্রকার মহর্ষির তাৎপর্য্য বর্ণন করিতে বলিয়াছেন যে, পূর্বপক্ষবাদী যাহা অহমান নহে, তাহাকে অহমান বলিয়া ভ্রম করিয়া ব্যভিচার প্রদর্শন করিয়াছেন। তাহার প্রদর্শিত ব্যভিচার অহমানে ব্যভিচার নহে, সুতরাং তাহার দ্বারা অহমানের অপ্রামাণ্য সিদ্ধ হয় না। পূর্বপক্ষবাদীর প্রদর্শিত ব্যভিচার অহমানে ব্যভিচার নহে কেন, ইহা বুঝাইতে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, অবিশিষ্ট নদীবৃত্তিমান এবং পিপীলিকার অণুসংস্কারমাত্র বৃষ্টির অহমানে হেতু নহে, তাহা হেতু হইতে পারে না। বৃষ্টি হইলে নদীতে যে জল দেখা যায়, অর্থাৎ বাহ্যকে বর্ষোদক বা বৃষ্টির জল বলে, তাহা নদীর পূর্বস্থ জল হইতে বিশিষ্ট এবং তখন নদীর প্রোভের প্রধরতা হয় এবং নদীবেষ দ্বারা চালিত হইয়া ভাসমান বহুতর ফেন, কল, পত্র ও কাষ্ঠাদি দেখা যায়। নদীর এইরূপ বিশিষ্ট জল প্রকৃতি দেখিলেই তদ্বারা “বৃষ্টি হইয়াছে” এইরূপ অহমান হয়। সুতরাং নদীর পূর্ণতা দেখিয়া যে বৃষ্টির অহমান হয়, ইহা বলা হইয়া থাকে, তাহাতে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশিষ্ট জল প্রকৃতিই নদীর পূর্ণতা বলিয়া বুঝিতে হইবে। উহাই বৃষ্টির অহমানে



হেতু, নদীবুদ্ধিমান্ত তাহাতে হেতু নহে। সুতরাং একদেশরোধ-জ্ঞান নদীর পূর্ণতা বুঝির অহুমান হেতুই নহে; তাহাতে প্রদর্শিত ব্যক্তির অহুমান ব্যক্তির নহে। একদেশরোধ-জ্ঞান নদী-বুদ্ধি দেখিয়া বুঝির অহুমান করিলে তাহা ভ্রম হয়, তাহাতে প্রকৃত্যহুমানের ভ্রম হয় না। শিষ্টানি-দোষে চক্ষুর দ্বারাও ভ্রম প্রত্যক্ষ হয়, তাই বলিয়া কি প্রত্যক্ষমাত্রই ভ্রম? প্রত্যক্ষের করণ চক্ষু; কি সর্বত্রই অপ্রমাণ? তাহা কেহই বলিতে পারিবেন না। এইরূপ পিপীলিকা-গৃহের উপদ্রাব করিলে তদ্রূপ পিপীলিকাগুলি ভীত হইয়া নিজ নিজ অণ্ডগুলি উপরিভাগে লইয়া যায়। সেই পিপীলিকাগুণ্ডকার জ্ঞানজ্ঞান অর্থাৎ ভ্রমজ্ঞান, তাহা দেখিয়া বুঝির অহুমান করিলে, সে অহুমান ভ্রম হইবে; কিন্তু সেই অহুমিতির করণ অহুমান প্রমাণ নহে। জ্ঞানজ্ঞান পিপীলিকাগুণ্ডকার বুঝির অহুমানে হেতুই নহে। পৃথিবীর ঘোড়জ্ঞান বহু পিপীলিকা অভ্যন্ত সমুদ্র হইয়া শ্রেণীবদ্ধভাবে নিজ নিজ অণ্ডগুলি যে উপরিভাগে লইয়া যায়, সেই পিপীলিকাগুণ্ডকারই বুঝির অহুমানে হেতু। তাহাতে ব্যক্তির নাই; সুতরাং অহুমান-প্রমাণে ব্যক্তির নাই। ভাষ্যকার “পিপীলিকাগুণ্ডকার” এই কথাবার্তা পূর্বোক্তরূপ বিশিষ্ট পিপীলিকাগুণ্ডকারই ভাবিবুঝির অহুমানে হেতু, ইহা প্রকাশ করিয়াছেন। তাৎপর্যটীকাকার ঐ কথা উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন, “প্রারম্ভঃ প্রবন্ধঃ”। প্রবন্ধ বলিতে এখানে প্রবাহ। পিপীলিকার প্রবাহ বলিতে শ্রেণীবদ্ধ বহু পিপীলিকাই ভাষ্যকারের বিবক্ষিত। তাই পরে “ন কাশাকিং” এই কথা দ্বারা ঐ ভাবই প্রকাশ করিয়াছেন। এইরূপ মনুষ্য কর্তৃক মনুষ্যবদনুদ্রব, বস্তুতঃ মনুষ্যবই নহে; প্রকৃত মনুষ্যবদে যে বিশেষ আছে, তাহা না বুঝিয়া ঐ মনুষ্যবদনুদ্রব মনুষ্যবদকে প্রকৃত মনুষ্যবদ বলিয়া ভ্রম করিয়া এখানে মনুষ্য আছে, এইরূপ ভ্রম অহুমান করে। ঐ নদ্রব বিশিষ্ট শব্দ হইতে প্রকৃত মনুষ্যবদ বিশিষ্ট, তাহা বুঝিলে ঐ বিশিষ্ট মনুষ্যবদকেই মনুষ্যবদ অহুমান হয়। যে তাহা বুঝিতে না পারে, মনুষ্যবদের নদ্রব মনুষ্যবদ শব্দকে যে মনুষ্যবদ বলিয়া ভ্রম করে, তাহার বর্থা অহুমান হইতে পারে না। কিন্তু সর্পাসি উহা বুঝিতে পারে, তাহার মনুষ্যবদের স্বল্প বৈশিষ্ট্য অহুমান করিতে পারে, সুতরাং তাহারা প্রকৃত মনুষ্যবদ বুঝিয়া “এখানে মনুষ্য আছে” এইরূপ বর্থা অহুমানই করে। সুতরাং মনুষ্যবদ পূর্বোক্ত্যহুমানে ব্যক্তির নহে। শেষকথা, যে বিশিষ্ট পদার্থগুলির দ্বারা পূর্বোক্ত স্থানে অহুমান হয়, যে বিশিষ্ট পদার্থগুলি পূর্বোক্ত্যহুমানে হেতুরূপে গৃহীত ও কথিত, সেগুলিতে ব্যক্তির নাই, সেগুলি অব্যক্তির। কেহ যদি সেই বিশিষ্ট হেতুগুলি না বুঝিয়া অবিশিষ্ট পদার্থ-জ্ঞানের দ্বারা অহুমান করিতে ইচ্ছুক হয় এবং অহুমান করিয়া শেষে ঐ হেতুতে ব্যক্তির বুঝে, তাহাতে প্রকৃত হেতুর ব্যক্তির সিদ্ধ হয় না। অহুমানকারী নিজের অজ্ঞতাবশতঃ ভ্রম করিলে, উহা তাহারই অপরাধ, উহা প্রকৃত অহুমান-প্রমাণের অপরাধ নহে। অহুমানকারীর ভ্রমপ্রাপ্ত অহুমানের অপ্রমাণ হইতে পারে না।

উদ্যোতকর পূর্বস্থানের ব্যক্তিকে পূর্বস্থানোক্ত পূর্বপক্ষের নিরাস করিতে বলিয়াছেন যে, “অহুমান অপ্রমাণ” এইরূপ কথাই বলা যায় না। কারণ, অহুমান বাহ্যকে বলে, তাহা অপ্রমাণ



হইতে পারে না; অপ্রমাণ হইলে তাহাকে অহুমান বলা যায় না। সুতরাং পূর্বপক্ষবাদের প্রতিজ্ঞাবাক্যে দুইটি পদ ব্যাহত এবং ঐ প্রতিজ্ঞা ও হেতুরও বিরোধ হয়। কারণ, অহুমান না মানিলে ঐ প্রতিজ্ঞার সাধন হয় না। পূর্বপক্ষবাদী হেতুর দ্বারা তাহার সাধ্য সাধন করিবেন। তিনি তাহার সাধ্য সাধনে ব্যতিচারিহেতুকতই হেতুরূপে গ্রহণ করিয়া বস্তুতঃ অহুমান-প্রবণের দ্বারা ই যথাসাধন করিতেছেন। সুতরাং তাহার ঐ হেতু তাহার “অহুমান অপ্রমাণ” এই প্রতিজ্ঞাকে ব্যাহত করিতেছে এবং ঐ প্রতিজ্ঞা ঐ হেতুকে ব্যাহত করিতেছে। অর্থাৎ অহুমান অপ্রমাণ বলিলে, অহুমানের সাধন ঐ হেতু বলা যায় না। ঐ হেতুবাক্য বলিলেও অহুমানের প্রামাণ্য স্বীকৃত হওয়ার অহুমান অপ্রমাণ, এই প্রতিজ্ঞাবাক্য বলা যায় না। পরন্তু “অহুমান অপ্রমাণ” এই কথা বলিয়া পূর্বপক্ষবাদী কি অহুমানমাত্রেরই অপ্রামাণ্য সাধন করিবেন? অথবা অহুমানবিশেষে অপ্রামাণ্য সাধন করিবেন? অহুমানমাত্রে অপ্রামাণ্য সাধন করিতে গেলে, তাহাতে পূর্বপক্ষবাদের কথিত হেতু না থাকায়, তাহার সাধ্য সিদ্ধি হইতে পারে না। কারণ, অহুমানমাত্রই ব্যতিচারিহেতুক নহে, পূর্বপক্ষবাদী তাহা প্রতিপন্ন করিতে পারিবেন না। তাহার প্রদর্শিত ব্যতিচার স্বীকার করিলেও পূর্বোক্ত অহুমানমাত্রেরই ব্যতিচারিহেতুকস্বরূপ হেতু থাকে, উহা অহুমানমাত্রে থাকে না। সুতরাং ঐ হেতু অহুমানমাত্রের অপ্রামাণ্যের সাধক হইতে পারে না। অন্ততঃ পূর্বপক্ষবাদী অহুমানের অপ্রামাণ্য সাধনের জন্য ব্যতিচারিহেতুকস্বরূপ যে হেতু গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাকে তিনি অব্যতিচারী বলিতে বাগ, তাহার সাধ্যসাধক হেতুও ব্যতিচারী হইলে তাহারও সাধ্যসাধন হইবে না। সুতরাং তাহার প্রদর্শিত অহুমানে ব্যতিচারিহেতুকস্বরূপ হেতু না থাকায় অহুমানমাত্রের তাহার গৃহীত হেতু নাই; তাহা হইলে ঐ হেতু দ্বারা তিনি অহুমানমাত্রের অপ্রামাণ্য সাধন করিতে পারেন না। উহা অহুমানমাত্রের অসিদ্ধ বলিয়া ঐরূপ অহুমানে হেতুই হয় না। যদি বল, বাহা ব্যতিচারী, তাহা অপ্রমাণ, ইহাই আমার প্রতিজ্ঞা, তাহা হইলে তোমার কথিত হেতুপদার্থ প্রতিজ্ঞার একদেশে বিশেষণ হওয়ার পৃথক্ হেতু বলিতে হইবে। পরন্তু ঐরূপ প্রতিজ্ঞা বলিলে সিদ্ধ-সাধন-দোষ হয়। বাহা ব্যতিচারী, তাহা অপ্রমাণ, ইহা শু সর্বসিদ্ধ; তুমি তাহা সাধন কর কেন? বাহা সিদ্ধ, তাহা নিষ্কারণে সাধ্য হয় না।

উদ্যোতকর এই কথাগুলি বলিয়া শেষে বলিয়াছেন যে, যে সকল উদাহরণকে তুমি ব্যতিচারী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছ, বস্তুতঃ সেগুলিও ব্যতিচারী নহে। অর্থাৎ পূর্বপক্ষবাদের গৃহীত হেতু, তাহার গৃহীত পূর্বোক্ত অহুমানমাত্রেরও নাই, উহা অসিদ্ধ, ইহা বহুবি পরস্পরে বলিয়াছেন। উদ্যোতকরের গৃহ তৎপর্য্য এই যে, পূর্বে আমি যে কথাগুলি বলিলাম, তাহা চিত্তাশীল বুদ্ধিমান ব্যক্তিমাত্রই বুঝিতে পারেন। অহুমানের প্রামাণ্য একেবারে না মানিলে পূর্বপক্ষবাদীও তাহার সাধ্য সাধন করিতে পারেন না। কারণ, তিনিও তাহার সাধ্যসাধন করিতে অহুমানকেই আশ্রয় করিয়াছেন। তাহার ঐ অহুমানের প্রামাণ্য না মানিলে তিনি কিরূপে তাহার দ্বারা সাধ্য সাধন করিবেন? প্রমাণ ব্যতীত বস্তুসিদ্ধি হইতে পারে না। তাহা হইলে পূর্বপক্ষবাদী পূর্বোক্ত জীবিত অহুমান হলে ব্যতিচার প্রদর্শন করিতে গিয়াছেন কেন? ব্যতিচারবশতঃ অহুমান অপ্রমাণ,



এইরূপ কথা বলার প্রয়োজন কি? “অহুমান অপ্রমাণ” এইমাত্র বলিয়াই নিজ মত প্রকাশ করিলে হয়, আমরাও “অহুমানে প্রমাণ” এই কথা বলিয়া নিজ মত প্রকাশ করিতে পারি, বিচারের কোনই প্রয়োজন থাকে না। সুতরাং ইহা উভয় পক্ষেরই স্বীকার্য যে, উভয়ের সাধ্যসাধনে উভয়কেই প্রমাণ দেখাইতে হইবে। পূর্বপক্ষবানীও এই জন্তই তাঁহার সাধ্য অহুমানের অপ্রামাণ্যের সাধন করিতে হেতু প্রয়োগ করিয়া অহুমান প্রমাণ দেখাইয়াছেন। তাহা হইলে তাঁহার ঐ অহুমানের প্রামাণ্য তাঁহার অবশ্য স্বীকার্য। পরের মতাহুনায়ে নিজের মত সিদ্ধ করা যায় না। নিজের মত সাধন করিতে যে মত অবশ্য স্বীকার্য, অবশ্য অবলম্বনীয়, তাহাও নিজ মত বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। যিনি ঈশ্বর মানেন না, তিনি যদি স্বমত সাধন করিতে ঈশ্বর মানিতে বাধ্য হন, তখন তাঁহাকে ঈশ্বরও নিজ মতরূপে মানিয়া গইতেই হইবে। আমি হাঁহা মানি না, তাহা আমার সাধ্য-সাধনের স্হায় বা উপায় হইতে পারে না। সুতরাং “অহুমান অপ্রমাণ” বলিয়া হাঁহার পূর্বপক্ষ গ্রহণ করিবেন, তাঁহাদিগের ঐ পূর্বপক্ষ তাঁহারা নিজেই নিরস্ত করিয়া বসিয়া আছেন। তাঁহা নিরাস করিতে আর বেশী কথা বলা নিশ্চয়োজন। তবে তাঁহারা যে অহুমান না চিনিয়া হাঁহা অহুমান নহে, তাহাকে অহুমান বলিয়া ভুল বুঝিয়া ব্যভিচার প্রদর্শন করিয়াছেন, তাঁহাদিগের ঐ ভ্রম দেখাইয়া, তাঁহাদিগের আশ্রিত অহুমানটি অপ্রমাণ, কারণ, তাঁহাদিগের গৃহীত হেতু তাঁহাদিগের গৃহীত অহুমানদ্বয়ে অসিদ্ধ, সুতরাং উহার দ্বারা তাঁহাদিগের সাধ্য সাধন অসম্ভব, এইমাত্রই মহর্ষি একটামাত্র সিদ্ধান্ত-সূত্রের দ্বারা বলিয়া গিয়াছেন। আর বেশী কিছু বলা আবশ্যক মনে করেন নাই।

পূর্বপ্রদর্শিত অহুমানধূলে উদ্যোতকর নদীর পূর্ণতাবিশেষকে উপরিভাগে বুটবিশিষ্ট দেশ-সম্বন্ধিদের অহুমানে হেতু বলিয়াছেন,<sup>১</sup> বুটবিশিষ্ট দেশের অথবা বুটের অহুমানে হেতু বলেন নাই। হেতু ও সাধ্যার্থের একাধিকরণতা রক্ষা করিবার জন্তই উদ্যোতকর ঐরূপ বলিয়াছেন এবং অল্পত বহু পিপীলিকার বহু স্থানে বহু অণুর উচ্ছস্কারবিশেষকেই উদ্যোতকর ভাবি-বুটের ব্যাপ্তিবিশিষ্ট অহুমাণক হেতু বলিয়াছেন। তিনি উহার দ্বারা পৃথিবীর ক্ষোভাহুমানের কথা বলেন নাই। এবং ময়ূরের রবকে ময়ূরের অস্তিত্বের অহুমাণক হেতু বলিয়া শেষে ইহাও বলিয়াছেন যে, এই অহুমানে ময়ূর অহুমের নহে, শব্দবিশেষকেই ময়ূরগুণবিশিষ্ট বলিয়া অহুমান করে। বৃত্তিকার বিশ্বনাথ প্রভৃতি মত্যাগণ, ময়ূরের রবকে বর্তমান বুটের অহুমাণক বলিয়াই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু প্রাচীন উদ্যোতকর তাহা বলেন নাই। ভাষ্যকারও ঐ ভাবের কোন কথা বলেন নাই। পরন্তু তিনি ময়ূরের বিশিষ্ট শব্দ ঠিক বুঝিতে পারিয়া সর্পাদির দ্বাংগ অহুমান হয়, এইরূপ কথা বলার, ঐ অহুমান তাঁহার মতে বুটের অহুমান নহে, ইহা মনে আসে।

১। কথা পুনরুক্তরী পুরো নকায় বর্তমান উপরি বুটবিশেষমহুমাণরতি বাবিকরণতঃ নৈবোপরি বুটবিশেষমহুমান নদীপুং, কিং তর্হি? নহা। এবোপরি বুটবিশেষসম্বন্ধিমনুসীভতে নদীর্থণে। উপরি বুটবিশেষ-সম্বন্ধিনী নদী প্রোক্তনীদ্বয়ে সতি পর্বকলকাটারিবহনরবে সতি পূর্বাং পূর্ববুটবিশেষ ইতি। ভবিষ্যতি ভূতগতি কালভাবিবন্ধিতবাং।—স্মার্তবর্তিক, ১অঃ, ৫৫২।



ময়ূরের রব বর্তমান বৃষ্টির অহুমান্যক হয় কি না, তাহাও বিবেচ্য। বৃষ্টিশূন্য কালেও ময়ূর ডাকিয়া থাকে। বৃষ্টিকালীন ময়ূরের বিজাতীয় শব্দকে হেতুরূপে গ্রহণ করিতে যাওয়া অপেক্ষায় প্রকৃত ময়ূরবকেই হেতুরূপে গ্রহণ করিয়া তদ্বারা ময়ূরাহুমানের ব্যাখ্যা করাই সুসংগত এবং ঐক্যপ অভিপ্রায়ই গ্রহণকারের অসম্ভব; উন্মোচকর তাহাই করিয়াছেন।

নাস্তিকশিরোমণি চার্লস প্রত্যক্ষ ভিন্ন আর কোন প্রমাণ স্বীকার করেন নাই। চার্লসের প্রথম কথা এই যে, যাহা দেখি না, তাহার অস্তিত্ব স্বীকার করি না। অহুপলব্ধিবশতঃ তাহার অভাবই সিদ্ধ হয়। অহুমানানি কোন প্রমাণ বশতঃ নাই। সম্ভাবনামাত্রের দ্বারাই লোকব্যবহার চলিতেছে। বিশিষ্ট ধূম দেখিলে বহির সম্ভাবনা করিয়াই বহির আনয়নে লোক প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। দেখানে বহি পাইলে, ঐ সম্ভাবনাকেই প্রমাণ বলিয়া ভ্রম করিয়া থাকে। এই ভাবেই লোকযাত্রা নির্বাহ হয়। বশতঃ অহুমান বলিয়া কোন প্রমাণ নাই। মহানৈমগ্নিক উদরনাচার্য্য ভারকুম্ভমাজলি এষে এতদন্তরে বলিয়াছেন,—

দৃষ্টাদৃষ্টোর্ব্য সন্দেহো ভাবাত্মবিনিশ্চয়াৎ।

অদৃষ্টবাসিত্তে হেতো প্রত্যক্ষমপি দুর্লভং। ৩। ৬।

উদরনের কথা এই যে, বিশিষ্ট ধূম দেখিয়া বহির সম্ভাবনা করিয়াই যে লোকের বহির আনয়নাদি কার্য্যে প্রবৃত্তি হয়, এবং তাহার দ্বারাই লোকব্যবহার নির্বাহ হইতেছে, ইহা বলিতে পার না। কারণ, সম্ভাবনা মনেহবিশেষ। ঐ সন্দেহ তোমার মতে হইতে পারে না। কারণ, বহির দর্শন হইলে তখন ভাবনিশ্চয় ঐ সংশয়ের বিরোধী হওয়ার ঐ সংশয় জন্মিতে পারে না। এবং বহির অদর্শন হইলেও তোমার মতে তখন তাহার অভাব নিশ্চয় হওয়ার ঐ সংশয় জন্মিতে পারে না। যে ভাব ও অভাব লইয়া সংশয় হইবে, তাহার একতর নিশ্চয় ঐ সংশয়ের বিরোধী, ইহা সর্বদায়ত। সুতরাং তোমার মতে বহির প্রত্যক্ষ না হইলে যখন বহির অভাব নিশ্চয়ই হয়, তখন তৎকালে বিশিষ্ট ধূম দেখিলেও তদ্বিবয়ে আর সংশয়বিশেষরূপ সম্ভাবনা হইতেই পারে না। এবং তোমার সিদ্ধান্তে তুমি গৃহ হইতে স্থানান্তরে গেলে তোমার জীপুহাদির অভাব নিশ্চয় হওয়ার, আর গৃহে আনা উচিত হয় না। পরন্তু তাহাদিগের বিরহজ্ঞ শোকাচ্ছন্ন হইয়া রোদন করিতে হয়। তুমি কি তাহা করিয়া থাক? তুমি কি স্থানান্তরে গেলে অপ্রত্যক্ষবশতঃ জীপুহাদির অভাব নিশ্চয় করিয়া শোকাচ্ছন্ন হইয়া রোদন করিয়া থাক? যদি বল, স্থানান্তরে গেলে তখন জীপুহাদি প্রত্যক্ষ না হইলেও তাহাদিগের স্মরণ হওয়ার ঐ সব কিছু করি না। তাহাও বলিতে পার না। কারণ, তুমি প্রত্যক্ষ ভিন্ন আর কাহাকেও প্রমাণ বল না। প্রত্যক্ষ না হইলেই তুমি বস্তুর অভাব নিশ্চয় কর। সুতরাং তুমি স্থানান্তরে গেলে যখন জীপুহাদি প্রত্যক্ষ কর না, তখন তৎকালে তোমার মতানুসারে তুমি তাহাদিগের অভাব নিশ্চয় করিতে বাধ্য। তবে তুমি যে তখন তাহাদিগকে স্মরণ কর, তাহা তোমার ঐ অভাব নিশ্চয়ের অহুকুল; কারণ, যে বস্তুর অভাব জ্ঞান হয়, তাহার স্মরণ তৎকালে আবশ্যক হইয়া থাকে। উহা অভাব প্রত্যক্ষের কারণই হইয়া থাকে, প্রতিবন্ধক হয় না। যদি বল, অভাব



প্রত্যকে ঐ অভাবের অধিকরণস্থানের প্রত্যক্ষও আবশ্যক হয়। গৃহ হইতে স্থানান্তরে গেলে ঐ গৃহরূপ অধিকরণস্থানও বন্ধন দেখি না, তখন তাহাতে দ্রীপুত্রাদির অভাব প্রত্যক্ষ হয় না, হইতে পারে না। ইহাও তুমি বলিতে পার না। কারণ, তাহা হইলে তুমি স্বর্গলোকে দেবতাদি নাই, ইহা কি করিয়া বল? তুমি ত স্বর্গলোক দেখ না, দেখিতে পাও না; তবে তাহাতে অপ্রত্যক্ষবশতঃ দেবতাদির অভাব নিশ্চয় কিরূপে কর? সুতরাং তোমার মতে অভাবের প্রত্যক্ষে অধিকরণস্থানের প্রত্যক্ষ কাণে নহে, অধিকরণস্থানের যে কোনরূপ জ্ঞানই কারণ, ইহাই তোমার সিদ্ধান্ত বলিতে হইবে। তাহা বলিলে স্থানান্তরে গেলে তোমার গৃহরূপ অধিকরণস্থানের স্বরূপ জ্ঞান থাকায়, তাহাতে তোমার মতে তোমার দ্রীপুত্রাদির অভাব প্রত্যক্ষ অনিবার্য। যদি বল, গৃহে গেলে দ্রীপুত্রাদির অস্তিত্ব দেখি বলিগাই স্থানান্তর হইতে গৃহে বাইরা থাকি, তাহা হইলে স্থানান্তরে থাকা কালেও তাহারা গৃহে ছিল, ইহা তোমার অবশ্য স্বীকার্য। যদি বল, তখন তাহারা গৃহে ছিল নাই বলিব, বন্ধন গৃহে বাইরা তাহাদিগকে দেখি, তৎপূর্বকণেই তাহারা আবার গৃহে উৎপন্ন হয়; এ কথাও নিত্যক অসংগত ও উপহাসজনক। কারণ, তখন তাহাদিগের জনক কে? ইহা তোমাকে বলিতে হইবে। তখন তোমার পুত্র-কন্তার জনক কে, ইহা কি তুমি বলিতে পার? তুমি বন্ধন বাহা দেখ না, তাহা নাই বল, তখন তোমার ঐ পুত্র-কন্তাদির জনক কেহ নাই, ইহাই তোমাকে স্বীকার করিতে হইবে। সুতরাং তখন উহারা আবার জন্মে, এই কথা সর্বথা অসংগত।

আর এক কথা, তুমি যে প্রত্যক্ষ ভিন্ন আর কোন প্রমাণ মান না, সে প্রত্যক্ষ প্রমাণগুলি কি তুমি প্রত্যক্ষ করিয়া থাক? তোমার চক্ষু প্রত্যক্ষ প্রমাণ, তুমি কি তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া থাক? তাহা তোমার প্রত্যক্ষের অযোগ্য। সুতরাং তোমার নিজ মতানুসারেই তোমার চক্ষু নাই, সুতরাং তুমি তাহাকে প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিতে পার না। তোমার নিজ মতেই তোমার সিদ্ধান্ত টিকে না। নাস্তিকশিরোমণি চার্লস নহজে নিরস্ত হইবার পাত্র নহেন। তিনি অহমানপ্রামাণ্য খণ্ডন করিতে বহু কথা বলিয়াছেন। তাঁহার প্রথম কথা এই যে, যদি অল্পপণ্ডিতদের দ্বারা বস্তুর অভাব নিশ্চয় না হয়, তাহা হইলে অহমানের প্রামাণ্যও কোনরূপে নিশ্চয় করা গাইতে পারে না। কারণ, যে হেতুর দ্বারা কোন সাধের অহমান হইবে, সেই হেতুতে ঐ সাধের ব্যাপ্তিনিশ্চয় আবশ্যক। ব্যক্তির অজ্ঞান ও সহচারের জ্ঞানই ব্যাপ্তিনিশ্চয়ের কারণ, ইহা অহমান-প্রামাণ্যবাদী জায়াচার্যগণ বলিয়াছেন। অর্থাৎ যদি এই হেতু এই সাধ্যযুক্ত স্থানে থাকে, এইরূপে সেই হেতুতে সেই সাধের ব্যক্তিজ্ঞান না হয় এবং এই হেতু এই সাধ্যযুক্ত স্থানে থাকে, এইরূপে কোন পদার্থে ঐ হেতুর ঐ সাধের সহিত সহচার (সহাবস্থান) জ্ঞান হয়, তাহা হইলেই সেই হেতুতে সেই সাধের ব্যাপ্তিনিশ্চয় হয়। কিন্তু হেতুতে ব্যক্তির অজ্ঞান কোনরূপেই সম্ভব নহে। কারণ, ব্যক্তির সংস্কারক জ্ঞান সর্বত্রই জগিবে। সুমহত্ব বহি সাধের ব্যক্তির কি না? অর্থাৎ বহুস্থানেও যুগ থাকে কি না? এইরূপ ব্যক্তির বংশনিবৃত্তির উপায় নাই। সুতরাং ব্যাপ্তিনিশ্চয়ের



সম্ভাবনা না থাকায় অনুমান প্রমাণ হইতে পারে না। চার্লসের বিশেষ বক্তব্য এই যে, জ্ঞানচাৰ্য্যগণ অনৌপাধিক সম্বন্ধকে ব্যাপ্তি বলিয়াছেন। সম্বন্ধ বিবিধ,—স্বাভাবিক এবং ঔপাধিক। যেমন জ্বাপুষ্ণের সহিত তাহার রক্তিমার সম্বন্ধ স্বাভাবিক এবং শুভ্র ফটিকমণিতে জ্বাপুষ্ণের রক্তিমার আরোপিত হইলে, ঐ রক্তিমার সহিত ফটিকমণির যে অব্যক্তব সম্বন্ধ, তাহা ঐ জ্বাপুষ্ণরূপ উপাধিমূলক বলিয়া ঔপাধিক। পূৰ্ণোক্ত স্বাভাবিক সম্বন্ধ অর্থাৎ নিয়ত সম্বন্ধই অনৌপাধিক সম্বন্ধ। ধূমে বহির ঐ অনৌপাধিক সম্বন্ধ আছে, উহাই ধূমে বহির ব্যাপ্তি। সাধ্যধর্মের ব্যক্তিকার্য্য পদার্থে অর্থাৎ যে পদার্থ সাধ্যশূন্য স্থানে থাকে, তাহাতে সাধ্যের পূৰ্ণোক্তরূপ অনৌপাধিক সম্বন্ধ থাকিতে পারে না, এ জন্ত তাহাতে সাধ্যের ব্যাপ্তি থাকে না। যেমন ধূমশূন্য স্থানেও বহি থাকে; বহিতে ধূমের যে সম্বন্ধ, তাহা স্বাভাবিক নহে, তাহা ঔপাধিক। কারণ, যেখানে আর্দ্র ইন্ধনের সহিত বহির সংযোগবিশেষ আছে, সেইখানেই ঐ বহি হইতে ধূমের উৎপত্তি হয়। সুতরাং বহির সহিত ধূমের ঐ সম্বন্ধ আর্দ্র ইন্ধনরূপ উপাধিমূলক বলিয়া, উহা ঔপাধিক সম্বন্ধ। তাহা হইলে বুঝা গেল যে, অনুমানের হেতুতে যদি উপাধি না থাকে, তাহা হইলেই ঐ হেতুতে সাধ্যের ব্যাপ্তি থাকে। সাধ্যের ব্যক্তিকার্য্য হেতুনাশেই উপাধি থাকায়, তাহাতে পূৰ্ণোক্ত অনৌপাধিক সম্বন্ধরূপ ব্যাপ্তি নাই। কিন্তু সেই হেতুতে যে উপাধি নাই, ইহা কিরূপে নিশ্চয় করা যাইবে? চার্লসের কথা বুঝিতে হইলে এখন এই “উপাধি” কাহাকে বলে, তাহা বুঝিতে হইবে। “উপ” শব্দের অর্থ এখানে সমীপবর্তী; সমীপস্থ অল্প পদার্থে বাহা নিজ ধর্মের আধান অর্থাৎ আরোপ জন্মায়, তাহা উপাধি; ইহাই “উপাধি” শব্দের মৌলিক অর্থ<sup>১</sup>। জ্বাপুষ্ণ তাহার নিকটস্থ ফটিক-মণিতে নিজধর্ম রক্তিমার আরোপ জন্মায়, এ জন্ত তাহাকে ঐ স্থলে উপাধি বলা হয়। অনুমানের হেতুতে ব্যক্তিকার্য্যের অনুমানপক পূৰ্ণোক্ত উপাধিকেও বাহারা পূৰ্ণোক্ত মৌলিক অর্থানুসারে উপাধি বলিয়াছেন, তাঁহাদিগের মতে যে পদার্থ সাধ্যধর্মের সমনিয়ত হইয়া হেতুপদার্থের অব্যাপক হয় অর্থাৎ যে পদার্থ সাধ্যধর্মের সমস্ত আধারেই থাকে এবং সাধ্যধর্মশূন্য কোন স্থানেও থাকে না এবং হেতুপদার্থের সমস্ত আধারে থাকে না, এমন পদার্থ উপাধি হয়। যেমন বহিহেতুক ধূমের অনুমানস্থলে ( ধূমবান্ বহুঃ ) আর্দ্র ইন্ধনসম্বৃত্ত বহি উপাধি। উহা ধূমরূপ সাধ্যের সমনিয়ত অর্থাৎ ব্যাপক ও কাপক এবং উহা বহিরূপ হেতুর অব্যাপক। কারণ, বহিযুক্ত স্থাননাশেই আর্দ্র ইন্ধনসম্বৃত্ত বহিবিশেষ থাকে না। পূৰ্ণোক্ত স্থলে আর্দ্র ইন্ধনসম্বৃত্ত বহিতে ধূমের যে ব্যাপ্তি আছে, তাহাই বহিধর্মরূপে বহিসানান্তে আরোপিত হয়। অর্থাৎ বহিধর্মরূপে বহিসানান্ত বাহা, যেখানেও জ্ঞানের বিষয় হইয়া নিকটবর্তী, তাহাতে ধূমের ব্যাপ্তি না থাকিলেও আর্দ্র ইন্ধনসম্বৃত্ত বহিতে ধূমের যে ব্যাপ্তি আছে, তাহারই বহিধর্মরূপে বহিসানান্তে ভ্রম হয়, সেই ভ্রমাত্মক ব্যাপ্তি-নিশ্চয়বশতঃ বহিধর্মরূপে বহিহেতুর দ্বারা ধূমের ভ্রম অনুমিতি হয়। তাহা হইলে ঐ স্থলে আর্দ্র

১। উপ সমীপবর্তিনী আধখ্যতি বীজ ধর্মমিত্তাপাধিঃ—বীতিতি। সমীপবর্তিনী খতিরে আধখ্যতি সংক্রান্ততি আরোপমতীতি বাবৎ।—জ্ঞানবীতি, উপাধিধার।



ইকনসমূহ বহি বহিসান্যে নিজস্ব ধুমব্যাপ্তির আরোপ জন্মাইয়া, জ্বাপুস্পের স্থায় উপাধিশব্দবাচ্য হইতে পারে। কিন্তু অর্জ ইকন উপাধিশব্দবাচ্য হইতে পারে না। কারণ, যে যে স্থানে অর্জ ইকন থাকে, সেই সমস্ত স্থানেই ধূম না থাকায়, অর্জ ইকন ধূমের ব্যাপ্য নহে। তাহাতে ধূমের ব্যাপ্তি না থাকায়, তাহা বহিসান্যরূপ হেতুতে আরোপিত হওয়া অসম্ভব। সুতরাং উপাধি শব্দের পূর্বোক্ত যৌগিক অর্থানুসারে বহিহেতুক ধূমের অসম্মান হলে অর্জ ইকন উপাধি হইবে না। যাহা ধূম সাধ্যের সমব্যাপ্ত, সেই অর্জ ইকনসমূহ বহি প্রকৃতি পদার্থই উপাধি হইবে। সাধ্যের সমব্যাপ্ত পদার্থই পূর্বোক্ত যুক্তিতে উপাধি হয়, ইহা মহানৈয়মিক উদয়নাচার্যের মত বলিয়া অনেক গ্রন্থে পাওয়া যায়। উদয়ন স্মারকসুসমাজলি গ্রন্থে উপাধি শব্দের পূর্বোক্ত যৌগিক অর্থের স্মৃতি করিয়া, এই ভুলই ইহাকে উপাধি বলে, ইহা বলিয়াছেন এবং অত্যাচার্য্য কারিকার দ্বারাও তাহার ঐ মত পাওয়া যায়। তাত্ত্বিকরক্ষাকার বরদরাজ তাহার উল্লেখ করিয়া সমস্ত সমর্থন করিয়াছেন। আত্মতত্ত্ববিবেক গ্রন্থে উদয়ন, উপাধিকে সাধ্যপ্রয়োজক হেতুস্বর বলিয়াছেন। উপাধি পদার্থটি সাধ্যের ব্যাপ্য না হইলে সাধ্যের প্রয়োজক বা সাধক হইতে পারে না। পরন্তু তত্ত্বচিন্তামণিকার গবেশ, ব্যাপ্তিবাদের শেষে (অতএবতত্ত্বের গ্রন্থে) উদয়নাচার্য্যের এই মত তাহার যুক্তি অনুসারে সমর্থন করিয়াছেন। সেখানে টীকাকার রঘুনাথ ও নথুরানাথ উহা আচার্য্যমত বলিয়াই স্পষ্ট প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। রঘুনাথ প্রকৃতি ঐ মতের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন যে, এই “উপাধি” শব্দটি যোগরূঢ়, ইহার যৌগিক অর্থমাত্র গ্রহণ করিয়া উপাধি নিরূপণ করা যায় না। কারণ, তাহা হইলে ঐরূপ অনেক পদার্থই উপাধি হইতে পারে। সুতরাং রূঢ়ার্থও গ্রহণ করিতে হইবে। সাধ্যের ব্যাপক হইয়া হেতুর অব্যাপক, ইগাই সেই রূঢ়ার্থ। ঐ রূঢ়ার্থও যোগার্থ, এই উভয় অর্থ গ্রহণ করিয়াই উপাধি বুঝিতে হইবে। তাহা হইলে সাধ্যের সমব্যাপ্ত পদার্থই উপাধি হয়। কারণ, তাহা সাধ্যের ব্যাপক হইয়া হেতুর অব্যাপক পদার্থও বটে এবং তাহাতে সাধ্যের ব্যাপ্তি থাকায় হেতুতে তাহার আরোপজনকও বটে। ইহাদিগের কথাই বুঝা যায়, উদয়ন যে সাধ্যের ব্যাপক হইয়া হেতুর অব্যাপক পদার্থ উপাধি, এই কথা বলিয়াছেন, উহা তাহার উপাধি শব্দের রূঢ়ার্থ-কথন। ঐ কথার দ্বারা তিনি উপাধির নিষ্কট লক্ষণ বলেন নাই। সুতরাং তাহার মতে সাধ্যের বিসমব্যাপ্ত পদার্থও উপাধি হয়, ইহা তাহার ঐ কথার দ্বারা বুঝিতে হইবে না। সাধ্যের সমব্যাপ্ত পদার্থই উদয়নের মতে উপাধি হয়। এই মতানুসারে তাত্ত্বিকরক্ষাকারও তাহাই স্পষ্ট বলিয়াছেন। পূর্বোক্ত মতবাদীদিগের আর একটি যুক্তি এই যে, যদি সাধ্যবর্ণের ব্যাপ্য না হইলেও তাহাকে উপাধি বলা যায়, তাহা হইলে অসম্মাননামাত্রই পক্ষের ভেদ উপাধি হইতে পারে। যে ধর্ম্মান্তে সাধ্যবিন্ধি উদ্দেশ্য হয়, সেই ধর্ম্মকে “পক্ষ” বলিয়াছেন। যেমন পক্ষান্তে বহির অসম্মান হলে পক্ষান্তে “পক্ষ”। পক্ষান্তে বহির অসম্মানের পূর্বে পক্ষান্তে বহি অসিদ্ধ, সুতরাং পক্ষান্তকে বহিযুক্ত স্থান বলিয়া তখন গ্রহণ করা বাইবে না। তাহা হইলে পক্ষান্তের



ভেদ বহিরূপ সাধ্যের ব্যাপক বলা যায়। কারণ, পাকশালা প্রভৃতি বহিঃস্থ স্থানমাঝেই পক্ষতের ভেদ আছে এবং ঐ অস্থানের পূর্বেই ধূমরূপ হেতু পক্ষতে দ্বিধা থাকায় পক্ষতকে ধূমযুক্ত স্থান বলিয়া গ্রহণ করা যাইবে। ধূমযুক্ত পক্ষতে পক্ষতের ভেদ না থাকায়, পক্ষতের ভেদ ধূম হেতুর অব্যাপক হইয়াছে। তাহা হইলে পক্ষতে ধূমহেতুক বহির অস্থানে পক্ষতের ভেদ উপাধি হইতে পারে। কারণ, সাধ্যের ব্যাপক হইয়া হেতুর অব্যাপক পরার্থকে উপাধি বলিলে, উক্ত স্থলে পক্ষতের ভেদ বহিঃস্থ সাধ্যের ব্যাপক এবং ধূম হেতুর অব্যাপক হওয়ার উপাধিলক্ষণাক্রান্ত হইয়াছে। এইরূপ অস্থানমাঝেই পক্ষের ভেদ উপাধি হইতে পারায় সর্বান্বয়ানের সকল হেতুই নোপাধি হইয়া পড়ে। তাহা হইলে অস্থানগ্রন্থমাঝেরই উল্লেখ হইয়া যায়। কিন্তু যদি বলা যায় যে, উপাধি পদার্থটি যেমন সাধ্য ধর্মের ব্যাপক হইবে, তদ্রূপ সাধ্য ধর্মের ব্যাপ্যও হইবে, নচেৎ তাহা উপাধি হইবে না, তাহা হইলে এই দোষ হয় না। কারণ, পূর্বোক্ত স্থলে পক্ষতের ভেদ বহিঃস্থ সাধ্যের ব্যাপক হইলেও ব্যাপ্য হয় নাই। যেখানে যেখানে পক্ষতের ভেদ আছে অর্থাৎ পক্ষতভিন্ন জল প্রভৃতি সমস্ত স্থানেই বহিঃ থাকিলে পক্ষতের ভেদ বহির ব্যাপ্য হইতে পারে; কিন্তু তাহা ত নাই। সুতরাং পক্ষতের ভেদ ঐ স্থলে পূর্বোক্ত উপাধিলক্ষণাক্রান্ত হয় না। এইরূপ কোন অস্থানেই পক্ষের ভেদ সাধ্যধর্মের ব্যাপ্য না হওয়ার উপাধিলক্ষণাক্রান্ত হইবে না, সুতরাং অস্থানমাঝের উল্লেখের আশঙ্কা নাই। ফল কথা, সাধ্য ধর্মের ব্যাপ্যও হইবে, ব্যাপকও হইবে এবং হেতু পরার্থের অব্যাপক হইবে, এমন পরার্থই উপাধি। সুতরাং ধূমহেতুক বহির অস্থানে (ধূমান্ বহেঃ) আর্দ্র ইন্দ্রন উপাধি হইবে না। আর্দ্র ইন্দ্রনসমুত্ত বহিঃ পরার্থই উপাধি হইবে। পরবর্তী তত্ত্ব-চিন্তামণিকার গবেষণ, শেষে “উপাধিবাদে” এই মতের প্রতিবাদ করিয়া খণ্ডন করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, যে পরার্থের ব্যক্তিরূপ হেতুর দ্বারা বাদীর কথিত হেতুতে তাহার সাধ্যের ব্যক্তির অস্থান করা যায়, তাহাই উপাধি হয়। উপাধি পদার্থটি বাদীর অভিমত হেতুতে তাহার সাধ্যের ব্যক্তিরূপ দোষের অন্বাপক হইয়া, ঐ হেতুকে চুষ্ট বলিয়া প্রতিপন্ন করে। এই জন্যই তাহাকে হেতুর দ্ব্যক বলে এবং তাহাই তাহার দ্ব্যকতা-বীজ। ঐ দ্ব্যকতা-বীজ থাকিলেই তাহা উপাধি হইতে পারে। সাধ্যের ব্যাপক হইয়া হেতুর অব্যাপক পরার্থে পূর্বোক্তরূপ দ্ব্যকতা-বীজ আছে বলিয়াই তাহাকে অস্থানদ্ব্যক উপাধি বলা হইয়া থাকে, নচেৎ ঐরূপ লক্ষণাক্রান্ত একটা পরার্থ থাকিলেই সেখানে হেতু ব্যক্তির হইবে, যথার্থ অস্থান হইবে না, এইরূপ কথা কখনই বলা যাইত না। যদি পূর্বোক্তপ্রকার দ্ব্যকতা-বীজকেই অবলম্বন করিয়া উপাধির লক্ষণের লক্ষ্য স্থির করিতে হয়, তাহা হইলে পূর্বোক্ত বহিঃস্থ হেতুক ধূমের অস্থানস্থলে (ধূমান্ বহেঃ) আর্দ্র ইন্দ্রনকেও উপাধি বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। কারণ, আর্দ্র ইন্দ্রন যেখানে নাই, এমন স্থানেও বহিঃ থাকে বলিয়া, ঐ স্থলে বাদীর অভিমত বহিঃ হেতু আর্দ্র ইন্দ্রনের ব্যক্তির হইবে এবং ঐ আর্দ্র ইন্দ্রন ধূমযুক্ত স্থানমাঝেই থাকে বলিয়া তাহা ধূমের ব্যাপক পরার্থ। ধূম ঐ স্থলে বাদীর সাধ্যরূপে অভিমত। এখন যদি



বহি পদার্থকে ঐ ধূমের ব্যাপক আর্দ্র ইন্ধনের ব্যভিচারী বলিয়া বুঝা যায়, তাহা হইলে তাহাকে ঐ ধূম সাধের ব্যভিচারী বলিয়া বুঝা যায়। বাহা ধূমের ব্যাপক পদার্থের ব্যভিচারী, তাহা অবশ্যই ধূমের ব্যভিচারী হইবে। ধূমবৃত্ত হানমাত্রেই যে আর্দ্র ইন্ধন থাকে, সেই আর্দ্র ইন্ধনশূন্য স্থানে বহি থাকিলে, তাহা ধূমশূন্য স্থানেও থাকিবে। কারণ, ঐ আর্দ্র ইন্ধনশূন্য স্থানই ধূমশূন্য স্থানরূপে গ্রহণ করা যাইবে। তাহা হইলে ঐ স্থলে আর্দ্র ইন্ধন পদার্থও তাহার ব্যভিচারিণরূপ হেতুর দ্বারা বহিতে ধূমের ব্যভিচারের অনুমাপক হওয়ার, উহাতে পূর্বোক্ত প্রকার দৃষকতাবীজ থাকায়, উহাকে উপাধি বলিতে হইবে। সুতরাং উপাধির লক্ষণে সাধ্যসমব্যাপ্ত, এইরূপ কথা বলা যায় না; তাহা বলিলে পূর্বোক্ত স্থলে আর্দ্র ইন্ধন উপাধি হইতে পারে না। পূর্বোক্ত যুক্তিতে যখন তাহাকেও উপাধি বলা উচিত এবং বলিতেই হইবে, তখন ইচ্ছামত লক্ষণ করিয়া তাহাকে লক্ষ্য হইতে বিতাড়িত করা যায় না। গল্পে উপাধির লক্ষণ বলিয়াছেন যে, বাহা পর্যাবসিত সাধের ব্যাপক হইয়া হেতুর অব্যাপক হয়, তাহাই উপাধি। পর্যাবসিত সাধ্য কিরূপ, তাহা বলিয়া গল্পে সমস্ত লক্ষ্যই উপাধি-লক্ষণ-সম্বন্ধ সমর্থন করিয়াছেন<sup>১</sup>। সন্দেহ স্থলে পক্ষের ভেদ কেন উপাধি হয় না? এতদ্বত্তরে গল্পে বলিয়াছেন যে, সেখানে পক্ষভেদে সাধ্যব্যাপকত্ব নিশ্চয় না থাকায় ঐ পক্ষভেদ নিশ্চিত উপাধি হইতেই পারে না। উহা সন্দেহ উপাধিও হইতে পারে না। কারণ, সন্দেহোপাধি হেতুতে সাধ্য ব্যভিচারের সংশয়-প্রবোজক হয় বলিয়া, তাহা উপাধি হইয়া থাকে। সন্দেহ স্থলে পক্ষভেদে স্বাব্যবাহিকত্বশতঃ হেতুতে সাধ্য সংশয়ের প্রবোজকই হয় না, সুতরাং উহা উপাধি হইতে পারে না। যেখানে পক্ষে সাধ্য নাই, ইহা নিশ্চিত, সেখানে পক্ষের ভেদ নিশ্চিত উপাধিই হইবে। কিন্তু সন্দেহস্থলে পক্ষের ভেদকে উপাধিরূপে গ্রহণ করিলে সর্বাঙ্গমানই পক্ষের ভেদকে উপাধিরূপে গ্রহণ করা যায়। উপাধির সাহায্যে হেতুকে ছুটি বলিয়া অনুমান করিতে গেলে, তখন সেই অনুমানেও পক্ষের ভেদকে উপাধি বলা যাইবে। সুতরাং উহা স্বাব্যবাহিক।

কল কথা, উপাধির সাহায্যে প্রতিবাদী বেক্রপ অনুমানের দ্বারা সন্দেহকে দুই বলিয়া বুঝাইতে যাইবেন, সেই অনুমানেও যখন পূর্বোক্ত প্রকারে পক্ষের ভেদ উপাধি গ্রহণ করিয়া তাহার হেতুকে দুই বলা যাইবে, তখন পক্ষের ভেদকে উপাধিরূপে গ্রহণ করিয়া, প্রতিবাদী তাহাতে দৃষকতা দেখাইতে পারিবেন না। সুতরাং সন্দেহ স্থলে পক্ষের ভেদ উপাধি হয় না। উহা হেতুতে ব্যভিচার সংশয়ের প্রবোজক না হওয়ার সন্দেহোপাধিও হইতে পারে না। এইরূপ যুক্তিতে সন্দেহ স্থলে সাধ্য ধর্মটিও উপাধি হয় না। পরন্তু নির্দোষ হেতু স্থলে সাধ্য ধর্মটি হেতুর অব্যাপক, ইহা নিশ্চিত না হওয়ার তাহাকে উপাধি বলিলে সন্দেহ উপাধিই বলিতে হইবে। কিন্তু

১। বহ্যভিচারিণের সাধনস্ত সাধ্যভিচারিণঃ স উপাধিঃ। লক্ষণস্ত পর্যাবসিতসাধ্যব্যাপকত্বং সতি সাধন-  
ব্যাপকত্বং। বহ্যভিচারিণেন সাধ্যং প্রসিদ্ধং তদবজ্জিহ্বঃ পর্যাবসিতং সাধ্যং স চ কতিং সাধনেন কচিৎপ্রযোজ্যং কচিৎ  
মহানসহায়। তথাহি সমব্যাপ্তস্ত বিধব্যাপ্তস্ত বা সাধ্যব্যাপকস্ত ব্যভিচারেণ সাধনস্ত সাধ্যভিচারঃ স চ এত-  
ব্যাপকভিচারিণঃ সাধ্যব্যাপকভিচারিণঃ।—তদ্ব্যভিচারিণি।



সেখানে যদি প্রকৃত হেতুতে সাধ্য ব্যক্তির সন্দেহই হয়, তাহা হইলে সাধ্যবশত উপাধির উদ্ভাবন সেখানে ব্যর্থ। সাধ্যের ব্যক্তির অসন্দেহ হইলে, সেখানে সাধ্যবশত সন্দেহোপাধিও হইতে পারে না। রঘুনাথ শিরোমণি শেষে ইহাই তত্ত্ব বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। আর এক কথা, অব্যবহিত স্থলে পক্ষের ভেদ উপাধি হইবে না, কিন্তু বাধিত স্থলে অর্থাৎ সেখানে পক্ষে সাধ্য নাই, ইহা নিশ্চিত, সেই স্থলে পক্ষের ভেদ উপাধি হইবে। যেমন কার্য্যের হেতুর দ্বারা বহিতে অসম্ভবতার অসম্ভবতা করিতে গেলে, বহির ভেদ উপাধি হইবে। গঙ্গেশ ও রঘুনাথ এ বিষয়ে অন্তরূপ যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। পক্ষভেদের উপাধির কারণের জন্য উপাধিকে “সাধ্যসমব্যাগ” বলিলে বাধিত স্থলে পক্ষের ভেদ উপাধি হইতে পারে না। সুতরাং সাধ্যসমব্যাগ পদার্থই যে উপাধি হইবে, তাহা নহে; সাধ্যের বিষমব্যাগ আর্জ ইকন প্রভৃতিও উপাধি হইবে। তাহাতে উপাধির দৃশকতা-বীজ থাকিবে, তাহাকে উপাধিরূপে গ্রহণ করিতেই হইবে। তাহার সংগ্রহের জন্য উপাধির লক্ষণও সেইরূপ বলিতে হইবে। গঙ্গেশ শেষে কলান্তরে উপাধির লক্ষণ বলিয়াছেন যে, তাহা হেতুব্যক্তিকারী হইয়া সাধ্যের ব্যক্তিকারের অনুমানক হয়, তাহাই উপাধি। গঙ্গেশের মতে সর্বত্র হেতুতে সাধ্যব্যক্তিকারের অনুমানক হইয়াই উপাধি দৃশক হয়। সুতরাং ঐরূপ পদার্থ হইলেই তাহা সাধ্যের সমব্যাগই হউক, আর বিষমব্যাগই হউক, উপাধি হইবে। সাধ্যের সমব্যাগ না হইলে তাহা অব্যবহিতের দ্বারা উপাধিশব্দবাচ্য হয় না, ইত্যাদি কথাই উল্লেখ করিয়া গঙ্গেশ বলিয়াছেন যে, লোকে সর্বত্র সমাপবর্তী পদার্থে নিজ ধর্ম্মের আরোপজনক পদার্থেই যে উপাধি শব্দের প্রয়োগ হয়, তাহা নহে; অন্তবিধ পদার্থেও উপাধি শব্দের প্রয়োগ হইয়া থাকে। শরৎ শাস্ত্রে নৈতিক ব্যবহারের জন্য উপাধির ব্যুৎপাদন করা হয় নাই; অনুমান দৃশকের জন্যই তাহা করা হইয়াছে। সাধ্যের ব্যাপক হইয়া হেতুর অব্যাপক পদার্থেই শাস্ত্রে উপাধি শব্দের প্রয়োগ হয়। মূল কথা, আর্জ ইকনও বহন বহিতে ধর্ম্মের ব্যক্তিকারের অনুমানক হইয়া পূর্বোক্তরূপে অনুমানের দৃশক হয়, তখন তাহাকেও পূর্বোক্ত স্থলে উপাধি বলিতে হইবে। তাহা না বলিবার বহন কোন যুক্তি নাই, পরন্তু বলিবারই অকাটা যুক্তি রহিয়াছে, তখন সাধ্যের সমব্যাগ পদার্থই উপাধি হইবে, বিষমব্যাগ পদার্থ উপাধি হইবে না, এই সিদ্ধান্ত কোনরূপে গ্রাহ হইতে পারে না। স্থলবিশেষে উপাধি শব্দের একটা যৌগিক অর্থ দেখিয়া সর্বত্রই যে উপাধি শব্দের সেইরূপ অর্থই প্রয়োগ হইবে, এইরূপ সিদ্ধান্ত নির্ণয় করা যায় না, ঐ সিদ্ধান্তের অনুবোধেই আর্জ ইকন প্রভৃতি পদার্থে উপাধির পূর্বোক্ত দৃশকতাবীজ সত্ত্বেও সেগুলিকে অনুপাধি বলা যায় না, ইহাই গঙ্গেশের সিদ্ধান্ত।

গঙ্গেশের পুত্র বর্ধমান, উদয়নের তাত্পর্য্য ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন যে, যে পদার্থের নিজ ধর্ম্ম

১। জ্ঞানোপাধি সাধনাব্যাপককে সতি সাধ্যাব্যাপকঃ। তদ্ব্যবহৃত্যহি ব্যাপ্তিকর্তৃবাহুসমভ্যন্তরং ন্যটকে সাধনাব্যাপকঃ চক্ৰাণীকৃত্যপাধিরন্যাত্যন্তে ইতি।—জায়হরমালি (তৃতীয় পুস্তক)। বঙ্গভাষায় জ্ঞান ভাসতে স এতাদেশাব্যাপকবাচ্যে। বহা জ্ঞানবাহুসমভ্যন্তরং। তথা বঙ্গভাষায় সাধনাব্যাপকঃ স তদ্ব্যবহৃত্যহি সাধনাব্যাপকঃ।—বর্ধমানকৃত প্রকাশিকা।



অন্ত পদার্থে আরোপিত হয়, তাহাই উপাধিপদবাচ্য; যেমন ক্ষটিকমণিতে জ্বাপুপ। তাহা হইলে যে পদার্থে নামের ব্যাপ্তি আছে, সেই পদার্থই নিজস্ব ব্যাপ্তিকে হেতুরূপে অতিমত পদার্থে আরোপিত করে বলিয়া, সেই পদার্থই সেই হেতুতে উপাধিপদবাচ্য হইতে পারে। সুতরাং নামের সম্ব্যাপ্ত পদার্থেই অর্থাৎ যে পদার্থ সাধ্য ধর্মের ব্যাপক হইয়া ব্যাপ্যও হয়, তাহাতেই উপাধিশব্দ মুখ্য। নামের বিষয়বাস্ত্ব পদার্থ পূর্বোক্ত ব্যুৎপত্তি অনুসারে উপাধিশব্দবাচ্য না হইলেও তাহাও উপাধির জায় সাধ্যব্যাপক ও হেতুর অব্যাপক হওয়ায় হেতুতে সাধ্যব্যাপ্তির অহুমানক হইয়া অহুমান দৃষ্ট করে; এ জন্ত তাহা উপাধিসদৃশ বলিয়া তাহাকেও উপাধি বলা হয় অর্থাৎ ঐরূপ পদার্থে উপাধি শব্দ গৌণ। বর্তমান এইরূপে উদয়নের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিয়া পূর্বোক্ত উভয় মতের বৈরূপ সামঞ্জস্য বিধান করিয়াছেন, তাহাতে উদয়নও নামের বিষয়বাস্ত্ব পদার্থকে উপাধি বলিতেন, ইহা বুঝা যায়। মনে হয়, উদয়ন সেই জন্তই মুখ্য ও গৌণ দ্বিবিধ উপাধিতে লক্ষণসমবয়ের চিন্তা করিয়া, উপাধির লক্ষণ বলিতে সাধ্য ব্যাপক, এইরূপ কথাই বলিয়াছেন। তর্কিকব্রহ্মাকারের জায় তিনি লক্ষণে “সাধ্য সম্ব্যাপ্ত” এইরূপ কথা বলেন নাই। বস্তুতঃ প্রাচীনগণ নামের বিষয়বাস্ত্ব পদার্থকেও পূর্বোক্ত যুক্তিতে উপাধি বলিতেন। উদয়নের পূর্ববর্তী তাৎপর্যটাকাবার বাচস্পতি মিশ্রও বহিঃহেতুক ধূনের অহুমানহলে আর্দ্র ইন্দ্রকে উপাধি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং বর্তমানের জায় উপাধি শব্দের মুখ্য-গৌণ ভেদ বুঝিলে ও মানিলে উভয় মতেরই সামঞ্জস্য হয়।

মনে হয়, গবেশ উপাধিবাদে “উপাধি” শব্দের উদয়নোক্ত যৌগিক অর্গের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিলেও তিনিও যৌগিক অর্থ গ্রহণ করিয়া পূর্বোক্ত হলে আর্দ্র ইন্দ্রসদৃশ বহিকেই মুখ্য উপাধি বলিতেন। তাই তিনি উপাধিবিভাগে নিশ্চিত উপাধির উদাহরণ বলিতে আর্দ্র ইন্দ্র না বলিয়া, আর্দ্র ইন্দ্রসদৃশ বহিকেই নিশ্চিত উপাধি বলিয়াছেন। আর্দ্র ইন্দ্র এবং আর্দ্র ইন্দ্রসদৃশ বহি, এই উভয়ই যদি উহার প্রকৃতমতে তুল্য অর্থাৎ মুখ্য উপাধি হইত, তাহা হইলে তিনি সেখানে আর্দ্র ইন্দ্রকেই উদাহরণরূপে উল্লেখ করিতেন, মনে হয়। পরন্তু অহুমানদূষক আর্দ্র ইন্দ্র প্রভৃতি পদার্থে প্রাচীনগণ যে উপাধি শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহার মূল কি হওয়া উচিত, তাহাও চিন্তা করা কর্তব্য। উদয়ন যাহা বলিয়াছেন, তাহাই উহার মূল হওয়া সম্ভব ও যুক্তিযুক্ত। সুতরাং গবেশের পুত্র, উদয়নের বৈরূপ তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাই উদয়ন ও গবেশের প্রকৃত মত হইলে সর্বসামঞ্জস্য হয়। আরও মনে হয়, গবেশ তত্ত্ব-চিন্তামণির বিশেষব্যাপ্তি গ্রন্থে উদয়নাচার্য্যোক্ত “অনোপাধিক”রূপ ব্যাপ্তিলক্ষণের যে পরিহার করিয়াছেন, সেখানে তিনি আর্দ্র ইন্দ্রকেও উপাধি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং উদয়নের মতে আর্দ্র ইন্দ্র মুখ্য উপাধি না হইলেও উপাধি, ইহা গবেশের নির্দ্ধারিত সিদ্ধান্ত হইতে পারে। নচেৎ উদয়নের লক্ষণ-ব্যাখ্যায় গবেশ, আর্দ্র ইন্দ্রকে উপাধি বলিয়া উল্লেখ করিবেন কিরূপে? টাকাবার মধুরানাত্ত সেখানেও “আচার্য্যলক্ষণং পরিব্রজ্যতি” এই কথা বলিয়া, ঐ লক্ষণের ব্যাখ্যা করিতে আর্দ্র ইন্দ্রকে উপাধিরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। অবশ্য বলা যাইতে পারে যে, গবেশ



সেখানে নিজ সিদ্ধান্তানুসারেই আচার্য্যলক্ষণের ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়াছেন এবং সেখানে চরম লক্ষণে আর্ত ইন্দ্রনসমূহ বহির্কেই তিনি উপাধিরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। গঙ্গেশের ব্যাখ্যাত এই চরমব্যাখ্যি-লক্ষণানুসারেই উদয়ন সাধ্যব্যাপ্য পদার্থকেই স্বগত ব্যাপ্তিধর্মের হেতুতে আরোপজনক বলিয়া উপাধি বলিতেন, ইহা ( “অতএবচতুর্থে”র দীক্ষিতিতে ) রত্ননাথ শিরোমণিও বলিয়াছেন। কিন্তু সাধ্যের বিষমব্যাপ্য পদার্থও যে উপাধি হইবে, এ বিষয়ে গঙ্গেশের যুক্তি এবং গঙ্গেশতনয় বর্দ্ধমানের নামজ্ঞত-বিধান এবং উপাধিবিভাগে গঙ্গেশের প্রদর্শিত উদাহরণ, এগুলিও নৈয়্যিক সুধীগণের চিন্তা করা উচিত। যাহাতে বিক্ষত মতের নামজ্ঞত হয়, তাৎপর্য্য করনা করিয়া তাহা করাই কি উচিত নহে ?

কোন কোন আচার্য্যের মতে উপাধি পদার্থ নিজের অভাবরূপ হেতুর দ্বারা পক্ষে সাধ্যাতাবের অহুমানক হইয়াই অহুমানের দ্ব্যক হয়। অর্থাৎ উপাধি পদার্থ হেতুতে “সংপ্রতিপক” নামক দোষের উদ্ভাবক, উহাই তাহার দ্ব্যকতা। যেমন বহির্কেতুক ধূমের অহুমানস্থলে ( ধূমবান্ বহেঃ ) আর্ত ইন্দ্রনরূপ উপাধি ধূম সাধ্যের ব্যাপক পদার্থ, সুতরাং উহার অভাব থাকিলে সেখানে উহার ব্যাপ্য ধূমের অভাব থাকিবেই। কারণ, ব্যাপক পদার্থের অভাব থাকিলে, সেখানে তাহার ব্যাপ্য পদার্থের অভাব অবশ্যই থাকে। তাহা হইলে ব্যাপক পদার্থের অভাবকে হেতুরূপে গ্রহণ করিয়া, তাহার ব্যাপ্য পদার্থের অভাবকে অহুমান করা যায়। আর্ত ইন্দ্রনের অভাবকে হেতুরূপে গ্রহণ করিয়া, ধূমের অভাব অহুমানের দ্বারা বুঝিলে আর সেখানে ধূমের অহুমান হইতে পারে না। এইরূপে উপাধি পদার্থ হেতুতে সংপ্রতিপকরূপ দোষের উদ্ভাবক হইয়া অহুমান দূষিত করে। এই মতাবলম্বীরা বলিয়াছেন যে, উপাধির সামান্য লক্ষণে হেতুর অব্যাপক এই কথা বলা নিশ্চয়োক্ত, উহা বলাও যায় না। কারণ, পূর্বোক্ত প্রকারে দ্ব্যকতাবশতঃ কোন স্থলে হেতুপদার্থের ব্যাপক পদার্থও উপাধি হয়। যেমন করকাত্তে কঠিন-সংযোগকে হেতুরূপে গ্রহণ করিয়া, কেহ পৃথিবীস্থের অহুমান করিতে গেলে ( করকাত্ত পৃথিবী কঠিন-সংযোগাৎ ) অহুক্ষাশীতস্পর্শ উপাধি হয়। করকাত্ত জলপদার্থ, উহা ক্ষিত নহে ; সুতরাং উহাতে কঠিন-সংযোগরূপ হেতু পদার্থ নাই, অহুক্ষাশীতস্পর্শও নাই, জলপদার্থে তাহা থাকে না। অহুমানের পূর্বে উহা জলপদার্থ, ইহা নিশ্চয় না থাকিলেও অহুক্ষা-শীতস্পর্শ যে উহাতে নাই ( শীতস্পর্শই আছে ), ইহা নিশ্চিত আছে। কঠিন-সংযোগ যেখানে সেখানে থাকে, সেখানে অর্থাৎ পৃথিবীদ্বয়েই অহুক্ষাশীতস্পর্শ থাকায়, উহা কঠিন-সংযোগরূপ হেতু-পদার্থের ব্যাপক পদার্থ। কিন্তু তাহা হইলেও উহা পৃথিবীস্থরূপ সাধ্যধর্মের ব্যাপক পদার্থ বলিয়া, ঐ ব্যাপক পদার্থ অহুক্ষাশীতস্পর্শের অভাব করকাত্তে নিশ্চিত হওয়ার, উহা করকাত্তে পৃথিবীস্থরূপ ব্যাপ্য পদার্থের অভাবের অহুমানক হয়। তাহা করকাত্তে পৃথিবীস্থের অহুমানকে বাধা দিবার প্রয়োজক হয়। অর্থাৎ পূর্বোক্ত স্থলে আর্ত ইন্দ্রনের জায় এই স্থলে অহুক্ষাশীতস্পর্শও বধন নিজের অভাবের দ্বারা করকাত্তে পৃথিবীস্থরূপ সাধ্যের অভাবের অহুমানক হইয়া সংপ্রতিপক নামক দোষের অহুমানক হয়, তখন ঐ স্থলে অহুক্ষাশীতস্পর্শ কঠিন-সংযোগরূপ হেতুর ব্যাপক পদার্থ হইয়াও উপাধি হইবে। এই মতে যেখানে পক্ষে হেতুপদার্থ নাই, সেই স্থলেই হেতুর ব্যাপক হইয়াও



সাধের ব্যাপক পদার্থ উপাধি হয়। সর্বত্র উপাধিহলে যখন হেতুভাস্বরূপ দোষান্তর থাকিবেই, তখন উপাধির সহিত দোষান্তরের সাধ্য্য সকলেরই স্বীকৃত। তদ্বিত্ত্বানবিকার গঙ্গেশ পুরোক্ত-রূপে এই মতের উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু উপাধির দৃশ্যতা-বীজ নিম্নপক্ষে “সংপ্রতিপক্ষ”রূপ দোষের অনুমাপক হইয়াই উপাধি দৃশ্য হয়, এই মত গ্রহণ করেন নাই, তিনি ঐ মতের প্রতিবাদই করিয়াছেন। গঙ্গেশের পুত্র বর্দ্ধমান জাহকুমারজিপ্রকাশে বহু মতের উল্লেখ ও প্রতিবাদ করিয়া, শেষে এই মতের উল্লেখ করিয়াছেন,—এই মতের প্রতিবাদ করেন নাই। বর্দ্ধমান সর্বশেষে গঙ্গেশের মতেরও উল্লেখ করিয়া তাহারও প্রতিবাদ করেন নাই। বর্দ্ধমানের পুরোক্ত মতে অব্যবহিত হলে পক্ষের ভেদ উপাধি হইতে পারে না। কারণ, পর্ততে বহির অনুমানে পর্ততের ভেদ উপাধি বলিলে, ঐ পর্তত ভেদের অভাব পর্ততই পর্ততে বহির অভাবের অনুমাপক হইতে পারে না। পর্ততই হেতুর দ্বারা পর্ততে বহির অভাবের অনুমানে ঐ পর্ততভেদই আবার উপাধিরূপে প্রযুক্ত হইতে পারে। সুতরাং সেই পর্ততভেদের অভাব পর্ততই হেতুর দ্বারা আবার পর্ততে বহির অভাবরূপ সাধের অভাব যে বহি, তাহারই অনুমাপক হইয়া উহা প্রব্যাব্যাক্ত হইয়া পড়ে। সুতরাং বাহার অভাবের দ্বারা পক্ষে সাধ্যাতাবের অনুমান হয়, তাহা উপাধি, এইরূপ সিদ্ধান্তে অব্যবহিত হলে পক্ষের ভেদ উপাধি হওয়া অসম্ভব। যেখানে পক্ষে সাধ্য নাই, ইহা নিশ্চিত, সেই ব্যবহিত হলে পক্ষের ভেদ উপাধি হইতে পারে। কারণ, সেখানে ঐ উপাধির অভাবের দ্বারা পক্ষে যে সাধ্যাতাব বুঝান হইবে, তাহা পক্ষে প্রমাণনিহিত। সেখানে প্রমাণনিহিত সাধ্যাতাবকেই প্রতিবাদী ঐ উপাধির উল্লেখ করিয়া সমর্থন করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ গঙ্গেশ ব্যক্তিরের অনুমাপকরূপেই উপাধিকে দৃশ্য বলিলেও স্থলবিশেষে সংপ্রতিপক্ষের এবং স্থলবিশেষে বাধের অনুমাপকরূপেও উপাধি দৃশ্য হইয়া থাকে। গঙ্গেশের ন্যূনতা পরিহারের জন্য টীকাকার রঘুনাথ শেষে তাহাও বলিয়াছেন।

পুরোক্ত উপাধি ত্রিবিধ:—সন্দিগ্ধ এবং নিশ্চিত। যে উপাধি সাধের ব্যাপক এবং হেতুর অব্যাপক, ইহা নিশ্চিত, তাহা “নিশ্চিত” উপাধি। যেমন পুরোক্ত বহিহেতুক ধূমের অনুমান হলে ( ধূমবান্ বহু: ) আর্দ্র ইন্দ্রনস্কৃত বহি প্রতীতি। যে উপাধিতে সাধের ব্যাপকত্ব অথবা হেতুর অব্যাপকত্ব অথবা ঐ উভয়ই সন্দিগ্ধ, তাহা “সন্দিগ্ধ” উপাধি। গঙ্গেশ প্রতীতি ইহার উদাহরণ বলিয়াছেন যে, মিত্রাতনয়ত্বকে হেতুরূপে গ্রহণ করিয়া, মিত্রার ভাবী পুত্র জ্ঞানত্বের অনুমান করিতে গেলে সেখানে “শাকপাকজন্তুত্ব” সন্দিগ্ধ উপাধি হইবে। কথাটা এই যে, মিত্রা নামে কোন স্ত্রীর সবগুলি পুত্রই কৃষ্ণবর্ণ হইয়াছে, ইহা দেখিয়া যদি কেহ গতিবী মিত্রার ভাবী পুত্রকে অথবা বিশেষজ্ঞাত মিত্রার নব পুত্রের সংবাদ পাইয়া, সেই পুত্রকে পক্ষরূপে গ্রহণ করতঃ অনুমান করেন যে, “সেই পুত্র কৃষ্ণবর্ণ” ( স গ্রামো মিত্রাতনয়ত্বাৎ ) অর্থাৎ মিত্রার পুত্র হইলেই সে কৃষ্ণবর্ণ হইবে, এইরূপ সংকারবুলক ব্যাপ্তি স্বরণ করিয়া মিত্রাতনয়ত্বকেই হেতুরূপে গ্রহণ করতঃ মিত্রার সেই পুত্র যদি জ্ঞানত্বের অনুমান করেন, তাহা হইলে সেখানে প্রতিবাদকারী বলিতে পারেন যে, মিত্রার সমস্ত পুত্রই কৃষ্ণবর্ণ হইবে, ইহা নিশ্চয় করা যায় না। কারণ, শাক



ভক্ষণ করিলে ঐ শাকের পরিপাকজন্তু সম্বন্ধেই প্রশ্নবর্ণ হয়, ইহা চিকিৎসাশাস্ত্রের দ্বারা জানা যায়। মিয়ার পূর্জাত সন্তানগুলি যে শাক ভক্ষণের ফলেই শ্রামবর্ণ হয় নাই, ইহা নিশ্চয় করা যায় না। যদি শাক ভক্ষণের ফলেই মিয়ার পূর্জাত সন্তানগুলি শ্রামবর্ণ হইয়া থাকে, তাহা হইলে মিয়ার পুত্রমাত্রই শ্রামবর্ণ হইবে, এইরূপ নিশ্চয় করা যায় না। শাক ভক্ষণ না করিলে মিয়ার গৌরবর্ণ পুত্রও হইতে পারে। সুতরাং মিহাতনয়ন শ্রামবর্ণের অনুমানে হেতু হইতে পারে না। উহাতে শাকপাকজন্তু সন্দেহ উপাধি। পূর্বোক্ত ফলে মিহাতনয়ন হেতুরূপে গৃহীত হইয়াছে; শ্রামবর্ণ সাধ্যরূপে গৃহীত হইয়াছে। মিয়ার শ্রামবর্ণ পুত্রগণ মিয়ার ভক্ষিত শাকের পরিপাকজন্তু কি না, ইহা সন্দেহ। সুতরাং শাকপরিপাকজন্তু ঐ ফলে পর্যাবসিত সাধের ব্যাপক কি না, ইহা সন্দেহ। যদিও উহা সামান্যতঃ শ্রামবর্ণ সাধের ব্যাপক নহে, ইহা নিশ্চিত। কারণ কাক, কোকিলা প্রভৃতিতেও শ্রামবর্ণ আছে, তাহাতে শাকপরিপাকজন্তু নাই, ইহা নিশ্চিত। তথাপি ঐ ফলে মিহাতনয়নরূপ হেতু তাহা পর্যাবসিত সাধ। তাহা কেবল মিয়ার পুত্রগণেই আছে, সেই সমস্ত পুত্রেই শাকপরিপাকজন্তু আছে কি না, ইহা সন্দেহ বলিয়া উহাতে পর্যাবসিত সাধের ব্যাপক সন্দেহ। গঙ্গেশ পর্যাবসিত সাধ সেক্ষণ বলিয়াছেন, তাহাতেও এখানে হেতুরিণি সাধকে পর্যাবসিত সাধ্যরূপে গ্রহণ করিয়া সন্দেহ উপাধির লক্ষণ বুঝা যায়। এবং এখানে শাকপরিপাকজন্তু মিহাতনয়নরূপ হেতুর অব্যাপক কি না, ইহাও সন্দেহ। মিয়ার পুত্রগুলি সবই যদি মিয়ার ভক্ষিত শাকের পরিপাকবশতই শ্রামবর্ণ হইয়া অমিয়া থাকে, তাহা হইলে ঐ শাকপরিপাকজন্তু মিহাতনয়নের ব্যাপক পদার্থই হয়। কিন্তু তাহা যখন সন্দেহ, তখন ঐ শাকপরিপাকজন্তু মিহাতনয়নরূপ হেতুর অব্যাপক, কি ব্যাপক, এইরূপ সংশয়বশতঃ পূর্বোক্ত অনুমানে শাকপরিপাকজন্তু সন্দেহ উপাধি।

পূর্বোক্ত নিশ্চিত উপাধি হেতুতে সাধের ব্যক্তিত্বনিশ্চয় জন্মায়, এই জন্ত তাহাকে বলে নিশ্চিত উপাধি এবং সন্দেহ উপাধি হেতুতে সাধের ব্যক্তিত্ব সংশয় জন্মায়, এই জন্ত তাহাকে বলে সন্দেহ উপাধি। সন্দেহ উপাধি হেতুতে সাধ ব্যক্তিত্ব সংশয়ের প্রয়োজক কারণে হইবে,

১। ভবভিহীনতার প্রসঙ্গ এইরূপ কথা দিরাছেন। কিন্তু সীমাকারণ ইহার কোন প্রমাণ প্রকাশ করেন নাই। ব্রহ্মতত্ত্ববিদ্যার শাস্ত্রীয় দ্বায়েন বিত্তীয় অধারে কেহর তুল্য প্রভৃতি বর্ণের কারণ বর্ণিত আছে। "তত্র জ্যোতিঃস্বাঃ পর্যবসায়ঃ প্রত্যয়ঃ" ইত্যাদি সন্দেহ প্রস্তাব। সেখানে পরে বলায়ছে বলা হইয়াছে যে, "বাক্যবর্ণ-বাহ্যবর্ণসকল বর্ণিত, তবুও বর্ণপ্রদা জবর্তনকে ভাষ্যে"। বর্ণিত প্রত্যয় বর্ণবিশিষ্ট আহার সেবা করেন, সেইরূপ বর্ণবিশিষ্ট সন্তান প্রদান করেন। তাহা হইলে বর্ণিত শ্রামবর্ণ শাক ভক্ষণ করিলে তজ্জাত সন্তান শ্রামবর্ণ হইতে পারে। পরন্তু চিকিৎসাশাস্ত্র পারিজাতিক "শাক" শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। কল-পুষ্পারিতে শাক চতুর্বিধ। "শাক চতুর্বিধঃ কং পুষ্পাঃ ছবকন্দকটোঃ সহ" (অমল্যাসনিবটু)। সুতরাং কলবিশেষও শাক শব্দের দ্বারা বর্ণিত হইয়াছে। তাহা হইলে প্রসঙ্গ বেৎকান শাকবিশেষকে শাক শব্দের দ্বারা গ্রহণ করিয়াও ঐ কথা বলিতে পারেন। প্রসঙ্গ "শাকাদিহায়গণিতজ্ঞঃ" এই কথা বলিয়া, স্থানি পদের দ্বারা শাক ভিন্ন বস্তুবিশেষের আধারকেও গ্রহণ করিয়াছেন।

এতদ্বারা (উপাধিবিভাগের দাবিত্তিতে) রত্ননাথ শিরোমণি প্রবনে একটি মতের উল্লেখ করিয়াছেন যে, ব্যাপ্য পদার্থের সংশয় ব্যাপক পদার্থের সংশয়ের কারণ হয়। যেমন বুন বহির ব্যাপ্য পদার্থ, বহি তাহার ব্যাপক পদার্থ। যেখানে বহি বা তাহার অভাবের নিশ্চয়রূপ বিশেষ দর্শন নাই, সেই স্থলে পদার্থাদি স্থানে ধূমের সংশয় হইলে তজ্জন্ত বহির সংশয় জন্মে। বহিও ধূম না থাকিলেও সেখানে বহি থাকিতে পারে, কিন্তু যখন বহি দেখা যায় না, বহির অনুমাপক ধূমও সেখানে সন্দিদ্ধ, তখন এখানে বহি আছে কি না, এইরূপ সংশয় অনুভবদিক। সংশয়ের সাধারণ কারণ থাকিলে পূর্বোক্ত প্রকার ব্যাপ্য পদার্থের সংশয়রূপ বিশেষ কারণজন্ত তাহার ব্যাপক পদার্থের সংশয় জন্মে। এই মতবাদীরা বলিয়াছেন যে, সংশয়সূত্রে (১ অঃ, ২৩ সূত্রে) এই প্রকার বিশেষ সংশয় কথিত না হইলেও ঐ সূত্র প্রদর্শন আছে। উহার দ্বারা এই প্রকার সংশয়ও বুঝিতে হইবে। অথবা সেই সূত্রের “চ” শব্দের অনুক্ত সমুচ্চয় অর্থ। ব্যাপ্য সংশয় জন্ত ব্যাপকের সংশয় বাহ্য এই সূত্রে অনুক্ত, তাহা ঐ “চ” শব্দের দ্বারা মহাবি স্থানা করিয়া গিয়াছেন। বৃত্তিকার বিখ্যাত রত্ননাথের কথিত এই মতানুসারে সংশয়সূত্রের বৃত্তির শেষে এই মতটিও বলিয়া গিয়াছেন। রত্ননাথ পূর্বোক্ত মত সমর্থন করিয়া, শেষে ঐরূপ সংশয়বিশেষের কারণ বিচারে ন্যায়মত এবং তাৎপর্যটীকাকার বাচস্পতি সমুদায়ের মত প্রকাশ করিয়াছেন।

ব্যাপ্য সংশয় ব্যাপক সংশয়ের কারণ হইলে যেখানে উপাধি পদার্থটি সাধ্যব্যাপক, ইহা নিশ্চিত, কিন্তু উহা হেতুর অব্যাপক কি না, ইহা সন্দিদ্ধ, সেই স্থলে উপাধি পদার্থে হেতুর অব্যাপকসংশয় হইলে হেতুপদার্থে সাধ্যব্যাপক ঐ উপাধি পদার্থের ব্যক্তির সংশয় জন্মিবে। কারণ, উপাধি পদার্থ হেতুর অব্যাপক হইলে হেতুপদার্থ উপাধি পদার্থের ব্যক্তির হইবেই। সুতরাং উপাধি পদার্থ হেতুর অব্যাপক কি না, এইরূপ সংশয় স্থলে হেতুপদার্থ উপাধি পদার্থের ব্যক্তির কি না, এইরূপ সংশয় হইবে। উপাধি পদার্থটি সর্বত্রই সাধ্যের ব্যাপক পদার্থ। সাধ্যব্যাপক ঐ উপাধি পদার্থের ব্যক্তির সংশয় হইলে তজ্জন্ত হেতুতে সাধ্যের ব্যক্তির সংশয় জন্মিবে। কারণ, সাধ্যের ব্যাপক পদার্থের ব্যক্তির যে যে পদার্থে থাকে, সেই সেই পদার্থে সাধ্যের ব্যক্তির অবস্থাই থাকে, সুতরাং সাধ্যের ব্যাপক পদার্থের ব্যক্তির সাধ্যের ব্যক্তির ব্যাপ্য পদার্থ। ঐ ব্যাপ্য পদার্থের সংশয় জন্ত ব্যাপক পদার্থের পূর্বোক্ত প্রকার সংশয় জন্মিবে। এইরূপ যেখানে উপাধি পদার্থ হেতুর অব্যাপক, ইহা নিশ্চিত, কিন্তু সাধ্যের ব্যাপক কি না, ইহা সন্দিদ্ধ, সেখানে অর্থাৎ ঐ প্রকার সন্দিদ্ধ উপাধি স্থলে সাধ্য পদার্থে হেতুর অব্যাপক সেই উপাধির ব্যাপ্য সংশয়ও জন্মে। কারণ, উপাধি পদার্থ সাধ্যের ব্যাপক হইলে সাধ্য তাহার ব্যাপ্য হয়। সুতরাং উপাধি পদার্থ সাধ্যের ব্যাপক কি না, এইরূপ সংশয় স্থলে সাধ্য ঐ উপাধি পদার্থের ব্যাপ্য কি না, এইপ্রকার সংশয়ও জন্মে। তাহার ফলে সাধ্য পদার্থে হেতুর অব্যাপক সংশয় জন্মিবে। যে যে পদার্থ হেতুর অব্যাপক পদার্থের ব্যাপ্য, তাহার সমস্তই হেতুর অব্যাপক পদার্থ হইয়া থাকে। সুতরাং পূর্বোক্ত স্থলে সাধ্য পদার্থে হেতুর অব্যাপক সংশয়ও ব্যাপ্য পদার্থের সংশয়জন্ত ব্যাপক পদার্থের সংশয়।



এইরূপ সংশয় স্থলে হেতুতে সাধ্যের ব্যাপ্যতা সংশয়ও অবশ্য জন্মিবে। সন্দিগ্ধ উপাধির পূর্বোক্ত উদাহরণস্থলে মিত্রাতনয়রূপ হেতুতে পূর্বোক্ত প্রকারে চরমে শ্রমদ্বরূপ সাধ্যের ব্যতিচার সংশয় জন্মিয়া থাকে।

এই সকল কথা ভালরূপে বুঝিতে হইলে ব্যাপক, ব্যাপ্য, ব্যতিচারী ইত্যাদি অনেক পদার্থে বিশেষরূপে ব্যুৎপন্ন হওয়া আবশ্যক। এইদ্বারা অহুমান-লক্ষণস্বত্ব ও অবয়বপ্রকরণ এবং হেত্বাত্তানপ্রকরণে যে সকল কথা বলা হইয়াছে, তাহা বিশেষরূপে অরণ ব্যক্তি হইবে। অহুমান এবং তাহার প্রামাণ্য বুঝিতে হইলে পূর্বোক্ত উপাধি পদার্থ এবং তাহার দৃশকতা বিশেষরূপে বুঝা আবশ্যক। নব্য নৈয়ায়িক গবেষণ প্রকৃতি এ বিষয়ে বহু মত ও বহু বিচার প্রদর্শন করিয়াছেন। সমস্ত মত ও বিচারের প্রকাশ এখানে অসম্ভব। পূর্বোক্ত উপাধি পদার্থ না বুঝিলে হেতুপদার্থ সাধ্য ধর্মের ব্যাপ্য কি না, ইহা নিশ্চয় করা যায় না। উপাধি পদার্থের জ্ঞান হইলে হেতুতে সাধ্য-ধর্মের ব্যতিচার জ্ঞান হয়। সুতরাং দেখানে হেতুতে সাধ্যের ব্যাপ্তিনিশ্চয় না হওয়ার অসম্ভবিতা হইতে পারে না। এই জন্য ভ্রাতৃত্বাচার্য্যগণ উপাধি পদার্থের সবিশেষ নিরূপণ করিয়া দিয়াছেন। উহা গবেষণ প্রকৃতি নব্য নৈয়ায়িকগণের অভিনব বুঝা বাগ্জাল নহে। উদয়নাচার্য্যও এই উপাধির নিরূপণ করিয়া গিয়াছেন। শ্রীমান্ বাচস্পতি মিশ্র ভাষ্যপর্য্যটীকার জ্ঞান সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদীতেও ব্যাপ্য কাহাকে বলে, ইহা বলিতে পূর্বোক্ত সন্দিগ্ধ ও নিশ্চিত, এই দ্বিবিধ উপাধির উল্লেখ করিয়াছেন।

এখন চার্মাকের কথা বুঝিতে হইবে। চার্মাক প্রতিবাদ করিয়াছেন যে, যে হেতুতে উপাধি আছে, তাহা সাধ্যের ব্যতিচারী; যে হেতুতে উপাধি নাই, তাহাই সাধ্যের অব্যতিচারী বা ব্যাপ্য। তদ্বশ হেতুই সাধ্যের সাধক হয়, ইহাই বখন অহুমান প্রামাণ্যবাদীদিগের সিদ্ধান্ত, তখন উপাধি নাই, ইহা নিশ্চিত না হইলে সাধ্যসাধক হেতু নিশ্চয় অসম্ভব, ইহা তাহাদিগেরও স্বীকার্য্য। কিন্তু এই উপাধির অভাব নিশ্চয় কোনরূপেই হইতে পারে না। কোথার উপাধি আছে বা নাই, ইহা কিরূপে তাহার নিশ্চয় করিবেন? উপাধি বখন দেখিতে পাইতেছি না, তখন তাহা নাই, এ কথা তাহার বলিতে পারিবেন না। কারণ, তাহার আনাদিগের দ্বারা অহুপলক্ষিত্যকেই অভাবের গ্রাহক বলেন না। তাহাদিগের মতে বখন প্রত্যক্ষের অযোগ্য পদার্থও অনেক আছে, তখন ঐরূপ অতীন্দ্রিয় উপাধিও সর্বত্র থাকিতে পারে। অহুপলক্ষিত্যকেই অভাবের গ্রাহক অর্থাৎ প্রত্যক্ষ না হইলেই তাহার অভাব বুঝা যায়, আনাদিগের এই মত গণন করিলে, তাহাদিগেরও অহুমান-দ্বারা উপাধি নাই, ইহা নিশ্চয় করা অসম্ভব। সুতরাং হেতুতে ব্যাপ্তিনিশ্চয় অসম্ভব হওয়ার কোন স্থলেই অহুমান হইতে পারে না। অহুমানের দ্বারা উপাধির অভাব নিশ্চয় করিতে গেলেও ঐ অহুমানের হেতুতেও উপাধির অভাব নিশ্চয় আবশ্যক হওয়ার সর্বত্র তাহা অসম্ভব বলিয়া তাহাও করা বাইবে না। কল কথা, যেমন উপাধির নিশ্চয় নাই, তত্ৰপ তাহার অভাব নিশ্চয়ও নাই। কারণ, অতীন্দ্রিয় উপাধি পদার্থও থাকিতে পারে। তদ্বশ পদার্থের অভাব নিশ্চয় প্রত্যক্ষের দ্বারা

হয় না ; পূর্কোক্ত বৃত্তিতে অহুমানের দ্বারাও হয় না । অজ্ঞ প্রমাণও অহুমানোপেক বলিয়া তাহার দ্বারাও হইতে পারে না । এইরূপ হইলে উপাধি বিষয়ে সংশয়ই জন্মে । ধূম হেতুর দ্বারা বহির অহুমান স্থলে এই ধূম হেতু গোপাধি কি না, এইরূপ সংশয় অবশ্যই হইবে, তাহার নিবৃত্তি হওয়ার উপায় নাই । কারণ, ঐ সংশয়ের নিবর্তক উপাধিনিশ্চয় যেমন ঐ স্থলে নাই, তদ্রূপ উহার নিবর্তক উপাধির অভাব নিশ্চয়ও ঐ স্থলে নাই ; পূর্কোক্ত বৃত্তিতে তাহা হইতেই পারে না । সুতরাং সর্বত্র উপাধির সংশয়বশতঃ ব্যক্তির সংশয়ই হইবে । তাহা হইলে ব্যাধিনিশ্চয় হইতেই পারিবে না । সুতরাং অহুমানের প্রমাণ্য স্থাপন একেবারেই অসম্ভব । স্থলভাবে চিন্তা করিলেও বুঝা যায় যে, হেতুতে ব্যক্তির সংশয় অনিবার্য্য । কারণ, ধূম থাকিলেই যে সেখানে বহি থাকিবেই, ধূমে বহির ঐরূপ নিরন্তর দৃষ্ট আছে, ইহা নিশ্চয় করা যায় না । অনন্ত দেশ ও অনন্ত কালে ঐ নিয়মের ভঙ্গ যে কোন দেশে কোন কালেই নাই, কালক্রমে কোন দেশে ধূম আছে, কিন্তু বহি নাই, ইহা যে দেখা যাইবে না, তাহা কে বলিতে পারে ? সর্বকালে ও সর্বদেশে যখন কেহই উহা দেখে নাই, উহা গৃহীয়া দেখাও একেবারে অসম্ভব, তখন ধূমে বহির ব্যক্তির শকা অনিবার্য্য । ঐ ব্যক্তির শকাবশতঃ ধূমে বহির ব্যাধিনিশ্চয় অসম্ভব হওয়ার অহুমান দ্বারা গৃহীত অসম্ভব । সুতরাং অহুমানের প্রমাণ্য স্থাপন অসম্ভব । প্রতিজ্ঞার অবতারণা, মহানৈরাসিক উদয়নাচার্য্য চার্লসের এই প্রতিবাদের উত্তরে বলিয়াছেন,—

“শকা চেনমুদাহৃত্যেব ন চেজ্জকা ততস্তরাং ।

ব্যাখ্যাভাববিরাশকা তর্কঃ শকাবধিশ্রুতঃ ।”—জয়কুমারজালি । ৩ । ৭ ।

অর্থাৎ যদি শকা থাকে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই অহুমান আছে । অর্থাৎ তাহা হইলে অহুমান-প্রমাণ অবশ্য স্বীকার্য্য । আর যদি শকা অর্থাৎ পূর্কোক্ত প্রকার সংশয় না থাকে, তাহা হইলেও সুতরাং অহুমান আছে । অর্থাৎ তাহা হইলেও অহুমানের প্রমাণ্য-তত্ত্বের চার্লসোক্ত হেতুই থাকিবে না । উদয়নের উত্তরে এই যে, চার্লস যে ভাবী দেশ ও কালকে আশ্রয় করিয়া সর্বত্র অহুমানের হেতুতে সাধারণ ব্যক্তির সংশয় বলিয়াছেন, সেই ভাবী দেশ ও কাল ত তাহার অপ্রত্যক্ষ সিদ্ধ নহে ? তবে তিনি তাহা আশ্রয় করিয়া সংশয় করিবেন কিরূপে ? তাহার নিজ মতে যখন প্রত্যক্ষ ভিন্ন কোন প্রমাণই নাই, তখন ভাবী দেশ ও কাল তাহার অপ্রত্যক্ষ বলিয়া তাহার মতে উহা অস্বীকার, সুতরাং উহা আশ্রয় করিয়া সর্বত্র হেতুতে ব্যক্তির সংশয়ের কথা তিনি বলিতেই পারেন না । তাহা বলিতে গেলে ঐ ভাবী দেশ ও কাল তাহাকে অবশ্য মানিতে হইবে ; তাহার জ্ঞান অহুমানপ্রমাণও মানিতে হইবে । অহুমানপ্রমাণের দ্বারা ভাবী দেশ কাল নির্ণয়-পূর্বক তাহাকে আশ্রয় করিয়া পূর্কোক্তপ্রকার শকা বা সংশয় করিতে হইবে । তাহা হইলে যে শকার দ্বারা চার্লস অহুমানের প্রমাণ্য খণ্ডন করিবেন, সেই শকা অহুমানপ্রমাণ ব্যতীত অসম্ভব । সুতরাং শকা করিতে হইলে চার্লসেরও অহুমানপ্রমাণ অবশ্য স্বীকার্য্য । শকা না হইলেও অহুমান স্বীকারের কোন বাধকই নাই । ফল কথা, চার্লস অহুমানের প্রমাণ্য খণ্ডন করিতে পূর্কোক্ত উপাধির শকা করিয়া হেতুতে সাধারণ ব্যক্তির সংশয় করিতে গেলে অথবা



যে কোনরূপে এই সংশয় করিতে গেলে ভাবী দেশ-কাল প্রকৃতি এমন অনেক পদার্থ তাহাকে অবশ্য মানিতে হইবে, বাহা অমুমান-প্রমাণ ব্যতীত তিনি সিদ্ধ করিতে পারিবেন না। সুতরাং চার্লসকেও যে শঙ্কা অমুমান-প্রমাণ ব্যতীত জন্মিতেই পারে না, তাহা অমুমান-প্রমাণের ব্যাঘাতক-রূপে চার্লসকে বলিতেই পারেন না।

দ্বিতীয় বলিতে পারেন যে, চার্লসকে ভাবী দেশ-কাল প্রকৃতিতে সম্ভাবনা কল্পনা, সেই সম্ভাবিত দেশকালাদির আশ্রয়পূর্বক হেতুতে সাধার ব্যক্তির সংশয়ের কথা বলিতে পারেন। তাহাতে চার্লসকে ভাবী দেশকালাদির নিশ্চয়ত্বক জ্ঞান আবশ্যক নাই, চার্লসকে মতে তাহা সম্ভবও নহে। অল্প সম্ভাব্যের অনুমিতিকে চার্লসকে সম্ভাবনারূপ জ্ঞানই বলিয়া থাকেন। যম দেখিয়া বহির সম্ভাবনা করিয়াই লোকে বহির আনয়নাদি কার্যে প্রবৃত্ত হয়, ইহাই চার্লসকে সিদ্ধান্ত। এইরূপ ভাবী দেশকালাদির সম্ভাবনার সাহায্যেই চার্লসকে পুরোক্ত প্রকার সংশয় জন্মে, ইহা বলিতে পারেন। বস্তুতঃ চার্লসকে তাহাই বলিয়াছেন।

এতদ্বারা বুঝিতে হইবে যে, সম্ভাবনাও সংশয়বিশেষ। ভাবী দেশকালাদির সম্ভাবনারূপ সংশয় করিতে হইলে তাহার কারণ আবশ্যক। সংশয়ের বিবরণ-পদার্থ কি, তাহা পূর্বে দেখানে জানা আবশ্যক। যম দেখিলে চার্লসকে বহি বিদ্যে যে সম্ভাবনা করেন, তাহাতে পূর্বে তাহার বহিবিবরণ প্রত্যক্ষ ছিল, ইহা তাহারও স্বীকার্য। তিনি কোন দিন কোন স্থানে বহি না দেখিলে হানাস্তরে যম দেখিয়া তাহার সম্ভাবনা করিতে পারিতেন না। তাহা হইলে ইহা চার্লসকেও অবশ্য স্বীকার্য যে, সম্ভাব্যমান বিবরণের নিশ্চয়ত্বক জ্ঞান পূর্বে কোন স্থানেই না জন্মিলে তদ্বিষয়ে একটা সংসার জন্মিতে পারে না। সংসার না জন্মিলে তদ্বিষয়ে অরণ হওয়া অসম্ভব। সংশয়ের পূর্বে সন্ধিস্থান পদার্থ অর্থাৎ বাহ্যকে সংশয়ের কোটি বলে, তাহার অরণ আবশ্যক। কারণ, তাহা সংশয়নাশের কারণ। যম দেখিয়াও যদি যে কোন কারণে চার্লসকে বহি পদার্থের অরণ না হয়, তাহা হইলে দেখানে কি চার্লসকে বহি বিদ্যে কোন প্রকার সংশয় হইয়া থাকে? তাহা কাহারই হয় না। সুতরাং সংশয়ের পূর্বে সন্ধিস্থান পদার্থের অরণ আবশ্যক, ইহা সকলেরই স্বীকার্য। তাহা হইলে সংশয়নাশের সন্ধিস্থান পদার্থের অরণের দ্বারা তদ্বিষয়ে পূর্বে যে কোন প্রকার নিশ্চয়ত্বক অনুভূতি আবশ্যক। কারণ, অরণমাত্রই সংসার-রক্ত। নিশ্চয় ব্যতীত ঐ সংসার জন্মিতে পারে না। ফল কথা, সম্ভাবনা করিতে হইলে অল্পতম পূর্বে সেই সম্ভাব্যমান পদার্থ বিবরণে নিশ্চয়ত্বক জ্ঞান আবশ্যক। চার্লসকে ভাবী দেশকালাদিবিবরণ যে সম্ভাবনা করিবেন, তাহাতে ঐ দেশকালাদিবিবরণ নিশ্চয়ত্বক জ্ঞান বাহা আবশ্যক, বাহা পূর্বে জন্মিয়া তদ্বিষয়ে সংসার জন্মাইবে, পরে তাহার দ্বারা সংশয়ের পূর্বে তদ্বিষয়ে সংশয়জনক অরণ জন্মাইবে, সেই নিশ্চয়ত্বক জ্ঞান তাহার মতে অসম্ভব। চার্লসকে প্রত্যক্ষ ভিন্ন প্রমাণ নানেন না। ভাবী দেশকালাদির প্রত্যক্ষ অসম্ভব। সুতরাং ঐ দেশকালাদির নিশ্চয়ত্বক জ্ঞান তাহার মতে হইতেই পারে না, সুতরাং তাহার মতে ভাবী দেশকালাদিবিবরণ সম্ভাবনা জ্ঞানও জন্মিতে পারে না।

পূর্বোক্ত কথায় চার্লস্‌ক যদি বলেন যে, ভাবী দেশকালাদিবিষয়ক নিশ্চয়ত্বক জ্ঞানের জ্ঞাত অহুমানাদি প্রমাণ স্বীকারের কোনই আবশ্যকতা নাই। কারণ, ভ্রব্যস্বরূপ সামান্য ধর্মের কোন ভ্রব্যে নৈতিক প্রত্যক্ষজ্ঞ (সামান্যলক্ষণ প্রত্যাপ্তি জ্ঞাত) সকল ভ্রব্যেরই অলৌকিক প্রত্যক্ষ হয়, ইহা অহুমানপ্রমাণবাদীদের স্বীকার্য। তাহা হইলে ভ্রব্যস্বরূপে ভাবী দেশকালাদিও পূর্বোক্ত অলৌকিক প্রত্যক্ষের বিষয় হওয়ার, সে সকল পদার্থ নিশ্চিতই আছে। সামান্য ধর্মের জ্ঞানজ্ঞাত অলৌকিক প্রত্যক্ষ স্বীকার না করিলে, অহুমানপ্রমাণবাদীরা ধুমস্বরূপে ধুমমাত্রে বহির ব্যাপ্তিনিশ্চয় করিতে পারেন না। কারণ, পাকশালা প্রভৃতি স্থানে পূর্বে যে ধুম প্রত্যক্ষ হয়, তাহাতে বহির ব্যাপ্তিনিশ্চয় হইতে পারিলেও, সে ধুম পর্য্যভূতিতে থাকে না। পর্য্যভূতিতে যে ধুম দেখিয়া বহির অহুমান হয় তাহা পূর্বে পাকশালা প্রভৃতি স্থানে ধূমে বহির ব্যাপ্তিনিশ্চয়-কালে) প্রত্যক্ষ নহে। সুতরাং সেই ধূমে তখন বহির ব্যাপ্তিনিশ্চয় অসম্ভব। যদি বলা যায় যে, কোন এক স্থানে কোন ধুম দেখিয়াই তখন ধুমস্বরূপ সামান্য ধর্মের জ্ঞানজ্ঞাত ধুমমাত্রের এক-প্রকার অলৌকিক প্রত্যক্ষ জন্মে, তাহা হইলে তখন তালু প্রত্যক্ষের বিষয় ধুমমাত্রে বহির ব্যাপ্তিনিশ্চয় হইতে পারে। তাহাচিহ্নামণিকার গবেষণ প্রভৃতি এই সিদ্ধান্তের সমর্থন করিয়াছেন। মূল কথা, পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তানুসারে ভ্রব্যস্বরূপ সামান্য ধর্মের জ্ঞানজ্ঞাত বখন ভ্রব্যমাত্রেরই অলৌকিক প্রত্যক্ষ হয়, তখন ভাবী দেশকালাদি ভ্রব্যেরও ঐ অলৌকিক প্রত্যক্ষ হইবে। তাহা হইলে আর উহা অজ্ঞাত বা অনিশ্চিত বলা যায় না।

এতদ্ব্যতীত বক্তব্য এই যে, যে পদার্থ প্রমাণসিদ্ধ আছে, তাহারই ঐক্য অলৌকিক প্রত্যক্ষ হইতে পারে। চার্লস্‌কের মতে ভাবী দেশ-কালাদি পদার্থ কোন প্রমাণ-সিদ্ধ? চার্লস্‌ক অহুমানাদি প্রমাণ নানেন না, সুতরাং কেবল প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারা ইহাকে বস্তুসিদ্ধি করিতে হইবে। ভাবী দেশ-কালাদির নৈতিক প্রত্যক্ষ অসম্ভব। চার্লস্‌ক যদি বলেন যে, ভ্রব্যস্বরূপ সামান্য ধর্মের জ্ঞানজ্ঞাত পূর্বোক্ত প্রকার অলৌকিক প্রত্যক্ষ আমি মানি, উহার দ্বারা ভাবী দেশ-কালাদি ভ্রব্য পদার্থ আমার মতেও সিদ্ধ হয়, তাহা হইলে নৈসর্গিক-সম্মত ঐক্যরূপ ভ্রব্য পদার্থই বা কেন চার্লস্‌কের মতে পূর্বোক্ত প্রকার অলৌকিক প্রত্যক্ষের দ্বারা সিদ্ধ হইবেন না? যদি বলা যায়, ঐক্যের অলৌকিক, উহা একটা পদার্থই নহে, সুতরাং উহা পূর্বোক্ত প্রকার অলৌকিক প্রত্যক্ষের বিষয়ই হইতে পারে না। তাহা হইলে ভাবী দেশ-কালাদি কেন অলৌকিক নহে? উহার অন্তিধে চার্লস্‌কের প্রমাণ কি, তাহা তাহাকে বলিতে হইবে। চার্লস্‌ক অহুমানাদির দ্বারা যেমন ঐক্যের অভাব নিশ্চয় করিয়াছেন, তদ্রূপ ভাবী দেশ-কালাদিরও ত অহুমানাদির দ্বারা অভাব নিশ্চয় করিতে হয়। ফলতঃ, যে সকল পদার্থ প্রমাণসিদ্ধ আছে, সেই সকল পদার্থেরই অলৌকিক প্রত্যক্ষ হইতে পারে, ইহাই বলিতে হইবে। নাচেং চার্লস্‌কের অস্বীকৃত অনেক পদার্থ পূর্বোক্ত-রূপ অলৌকিক প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ; সুতরাং চার্লস্‌কেরও অবশ্য স্বীকার্য, ইহা বলিলে চার্লস্‌ক কি উত্তর দিবেন? চার্লস্‌কের মতে ভাবী দেশ-কালাদি বখন প্রমাণসিদ্ধ হইতেই পারে না, তখন ঐ সকল পদার্থের পূর্বোক্তপ্রকার অলৌকিক প্রত্যক্ষ হয়, এ কথা চার্লস্‌ক বলিতে পারেন না। ভাবী দেশ-



কালাদি পদার্থকে প্রমাণসিদ্ধ করিতে গেলে অনুমানাদি প্রমাণকেই আশ্রয় করিতে হইবে। যে কারণে ঈশ্বর প্রভৃতি স্বতীন্দ্রিয় পদার্থ চার্লস্‌কেবর মতে অব্যবহৃতপে বা প্রদেয়রূপে সামান্যবর্ণজ্ঞানজন্য আলৌকিক প্রত্যক্ষের বিষয় হইতে পারে না, সেই কারণেই জীবী দেশ-কালাদি পদার্থ পূর্বোক্তরূপ আলৌকিক প্রত্যক্ষের বিষয় হইতে পারে না। সুতরাং সেই সকল পদার্থে চার্লস্‌কেবর মতে নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান সম্ভব না। ইচ্ছার তদ্বিষয়ে সম্ভাবনারূপ সংশয়ও অসম্ভব। চার্লস্‌কেবর মতে যে সংশয় হইতেই পারে না, বহির উপলব্ধিহলে বহি নিশ্চয় থাকার বহিসংশয় জন্মিতে পারে না, বহির অহুপলব্ধিহলেও বহির অভাব নিশ্চয় থাকার বহিসংশয় জন্মিতে পারে না; সুতরাং খন সেখিয়া বহির সম্ভাবনারূপ সংশয় করিয়াই প্রবৃত্ত হয়, এই সিদ্ধান্ত কোনরূপেই সম্ভব নহে, এ কথা উদঘোষ্যার্থ পূর্বোক্ত বস্তু কারিকার বলিয়াছেন। উহাই উদঘোষের মূল বুদ্ধি জানিতে হইবে। প্রকাশটীকাকার বর্তমান এখানে চার্লস্‌কেবর পক্ষে সামান্য ধর্মের জ্ঞানজন্য দেশ-কালাদির আলৌকিক প্রত্যক্ষের কথা সমর্থন করিয়া তত্বতরে বলিয়াছেন যে, চার্লস্‌কেবর যখন “এই হেতু শব্দক নহে, যেহেতু ইহা ব্যক্তিরশব্দাশ্রয়” এইরূপে অনুমানের দ্বারাই স্বপক সাধন করিতেছেন, তখন তাহার ঐ অনুমানের হেতুও তাহার নঃসূত্রের ব্যক্তিরশব্দাশ্রয় হইবে, অর্থাৎ ইহা হইলে তাহার দ্বারা তিনি স্বপক সাধন করিতে পারিবেন না। যে হেতুতে ব্যক্তির শব্দা হয় না, এমন হেতু স্বীকার করিলে অনুমানের প্রামাণ্যই স্বীকার করা হইবে। পরন্তু ব্যক্তির শব্দা করিলে ব্যক্তির ও অব্যক্তির, এই দুইটি পদার্থ স্বীকার্য। “এই হেতু এই নামের ব্যক্তির কি না” এইরূপ সংশয়ে সেই নামের ব্যক্তির ও অব্যক্তির, এই দুইটি পদার্থ সেই হেতু পদার্থে বিশেষণ হয়। ঐ দুইটি পদার্থই ঐ সংশয়ের কোটি। সেই নামের অব্যক্তির বলিয়া যদি একটা পদার্থই না থাকে, অর্থাৎ উহা যদি অলীক হয়, তাহা হইলে উহা পূর্বোক্তরূপ সংশয়ের কোটি হইতে পারে না। বাহ্য অলীক, বাহ্য কোন সম্ভাবনাই নাই, তাহা কি কোনরূপ জ্ঞানের বিষয় হইতে পারে? চার্লস্‌কেবর তাহা স্বীকার করিলেও কোন স্থলে সেই অব্যক্তিরের নিশ্চয় ব্যতীতও অজ্ঞাত তাহার সংশয় হইতে পারে, ইহা কিছুতেই বলিতে পারিবেন না। কলকথা, চার্লস্‌কেবর মতে যখন কোন পদার্থেই সাধ্য পদার্থের অব্যক্তির নিশ্চয় সম্ভব নহে, তখন সাধ্য পদার্থের ব্যক্তির-সংশয়ও তাহার মতে অসম্ভব। কারণ, যে পদার্থ বিষয়ে সংশয়, সেই পদার্থের অস্তিত্ব ঐ সংশয়ের পূর্বে আবশ্যক। তাহাতে ঐ অব্যক্তির বিষয়ে সংশয় আবশ্যক। তাহাতে ঐ অব্যক্তির বিষয়ক নিশ্চয় আবশ্যক। সুতরাং অব্যক্তিরের নিশ্চয় অসম্ভব হইলে তাহার সংশয়ও অসম্ভব। তাহা হইলে ব্যক্তিরের সংশয়ও অসম্ভব। কারণ, বাহ্য ব্যক্তির-সংশয়, তাহা অব্যক্তির-সংশয়কেই হইবে। অব্যক্তিরের সংশয় হইতে না পারিলে ব্যক্তির-সংশয় কোন-রূপেই হইতে পারে না।

চার্লস্‌কেবর দ্বিতীয় কথা এই যে, যদি আমার কথিত উপাধিশব্দ বা ব্যক্তিরশব্দের উপপত্তির দ্বারা অনুমানের প্রামাণ্য স্বীকার করিতেই হয়, তবে বাধ্য হইয়া তাহা করিব। কিন্তু হেতুতে যে নামের ব্যক্তিরশব্দা হইয়া থাকে, বাহ্য অনুমান-প্রামাণ্যবাদীরাও স্বীকার করিতে বাধ্য, স্বীকার



না করিলে সত্যের অপলাপ করা হয়, সেই ব্যক্তির শঙ্কা নিবৃত্তির উপায় কি? আপাততঃ ধূমে বহির ব্যক্তির দেখা না গেলেও কোন কালেই কোন দেশেই যে উহা দেখা যাইবে না, তাহা কে বলিতে পারে? সহস্র সহস্র স্থানে পদার্থবিশেষের সহচার দেখিয়াও ত আবার কোন স্থানে তাহাদিগের ব্যক্তির দেখা যাইতেছে। সুতরাং হেতুতে সাধের ব্যক্তির শঙ্কা অনিবার্য। উপাধির শঙ্কা হইলে হেতুতে সাধের ব্যক্তির শঙ্কা হয়, ইহা অহুমানপ্রামাণ্যবাদীরাও বলিয়াছেন। উপাধির শঙ্কাও সর্বত্রই হইতে পারে। সুতরাং ব্যক্তির শঙ্কাও সর্বত্রই হইতে পারে। ঐ শঙ্কার উপ-  
পত্তির অত্র যেমন অহুমানের প্রামাণ্য স্বীকার করিতে হয়, হেতুতে সাধের অব্যক্তির প্রকৃতি পদার্থ এবং কোন স্থানে তাহার নিশ্চয়ত্বক জ্ঞান স্বীকার করিতে হয়, তজ্জন্য ঐ ব্যক্তির শঙ্কা হয় বলিয়া আবার অহুমানের প্রামাণ্যও উপপন্ন হয় না; এ সমস্তার মীমাংসা কি? একজুরের উদয়ন বলিয়াছেন,—“তর্ক: শঙ্কাবিশিষ্ট:”। উদয়নের কথা এই যে, সর্বত্র হেতুতে সাধের ব্যক্তির শঙ্কা হয় না। যেখানে ব্যক্তির শঙ্কা হয়, সেখানে তর্ক ঐ শঙ্কার অবশিষ্ট অর্থাৎ নিবর্তক। ব্যক্তির শঙ্কানিবর্তক তর্কের দ্বারা ব্যক্তির শঙ্কা নিবৃত্তি হইলে ব্যাপ্তিনিশ্চয় হয়, সুতরাং সেখানে অহুমান হইতে পারে। যেমন ধূমে বহির ব্যক্তির সংশয় হইলে অর্থাৎ বহিঃশূন্য স্থানেও ধূম আছে কি না, এইরূপ সংশয় হইলে “ধূম যদি বহির ব্যক্তির হয়, তাহা হইলে বহিঃশূন্য না হউক” ইত্যাদি প্রকার তর্কের দ্বারা ঐ সংশয়ের নিবৃত্তি হইয়া যায়। বহিঃ থাকিলেই ধূম হয়, বহির অভাবে অস্ত্রান্ত সমস্ত কারণ সাবও ধূম হয় না, এইরূপ অময় ও ব্যক্তিরেক দেখিয়া ধূমের প্রতি বহিঃ কারণ অর্থাৎ ধূম বহিঃশূন্য, ইহা নিঃসংশয়ে বুঝা গিয়াছে। ধূম বহির ব্যক্তির হয় হইলে অর্থাৎ বহিঃশূন্য স্থানেও ধূম থাকিলে ধূম বহিঃশূন্য হইতে পারে না। কারণশূন্য স্থানে কার্য জঘিতে পারে না। যদি বহিঃ নাই, কিন্তু সেখানে ধূম অনিবার্য, ইহা বলা যায়, তাহা হইলে ধূম বহিঃশূন্য নহে, ইহা বলিতে হয়; কিন্তু তাহা বলা যাইবে না। বহিঃ ব্যতীত ধূমের উৎপত্তি কেহ দেখে নাই, ঐ বিষয়ে অত্র কোন প্রশ্নও পাওয়া যায় নাই। যে অময়ব্যক্তিরেক জ্ঞানজন্য কার্যকারণভাব নির্ণয় হয়, তাহা ধূম ও বহিতেও আছে। বহিঃ সহ ধূমের সত্তা (অময়), বহির অময়ে ধূমের অসত্তা (ব্যক্তিরেক), ইহা বহন প্রত্যক্ষ-  
নিত, তখন প্রত্যক্ষের দ্বারা ধূমে বহিঃশূন্য নিশ্চয় হইয়াছে। তাহা হইলে ধূমে বহিঃশূন্যের অভাবের আপত্তি করিলে, যে আপত্তি ইষ্টোপত্তি হইতে পারিবে না। প্রত্যক্ষের দ্বারা ধূমে বহির ব্যাপ্তিনিশ্চয় করিতে যদি ধূম বহির ব্যক্তির কি না, এইরূপ সংশয় উপস্থিত হয়, তাহা হইলে “ধূম যদি বহির ব্যক্তির হয়, তাহা হইলে বহিঃশূন্য না হউক” অর্থাৎ ধূমে বহিঃশূন্যের অভাব থাকুক, এইরূপ তর্ক বা আপত্তি ঐ সংশয় নিবৃত্ত করিয়া থাকে। কারণ, ধূম বহির ব্যক্তির হইলে অর্থাৎ বহিঃশূন্য স্থানেও থাকিলে তাহা বহিঃশূন্য হয় না, বহিঃ ধূমের কারণ হয় না। সুতরাং ধূমে বহিঃশূন্যের অভাব স্বীকার করিতে হয়। ফলকথা, পূর্বোক্তপ্রকার আপত্তিরূপ তর্ক পূর্বোক্ত প্রকার সংশয়ের প্রতিবন্ধক, ইহা ফলবলে করণা করিতে হইবে। জ্ঞানকার ও উদ্যোক্তকর বেঙ্গল জ্ঞানবিশেষকে “তর্ক” বলিয়াছেন, তাহাও তাহাদিগের মতে সংশয়-



বিশেষের প্রতিবন্ধক, ইহা কলকলে করণা করিতে হইবে। ( ১ অঃ, ৪০ সূত্র প্রৱ্য ) ।  
কল কথা, কোন স্থলে উপাধি সন্দেহবশতঃ কোন স্থলে অত্র কারণজ্ঞ হেতুতে যে সাধ্যের ব্যতির  
সংশয় জন্ম, তাহা তর্কের দ্বারা নিবৃত্ত হয় এবং অনেক স্থলে ঐ ব্যতিরশব্দা জন্মেই না,  
ইহার অসংপত্তি সেখানে স্বতঃসিদ্ধ অর্থাৎ ঐ সংশয়ের অত্রস্ত কারণের অভাবপ্রযুক্ত। সুতরাং  
ব্যতির-সংশয়প্রযুক্ত অনুমানের প্রামাণ্য লোপ হইতে পারে না ।

চাক্ষুরের তৃতীয় কথা এই যে, যে তর্কের দ্বারা ব্যতিরশব্দা নিবৃত্তি হয়, সেই  
“তর্ক”ও ব্যাধিদুলক অর্থাৎ সেই তর্কজন্য জ্ঞানও ব্যাধিনিশ্চয়জ্ঞ। সেখানেও ব্যতির  
সংশয়প্রযুক্ত ব্যাধিনিশ্চয় হইতে না পারিলে, তত্রস্ত তর্কও হইতে পারিবে না । আবার সেখানে  
ঐ ব্যতিরসংশয় নিবৃত্তির অত্র কোন তর্ককে আশ্রয় করিতে গেলে তাহার মূলীভূত ব্যাধিনিশ্চয়  
আবশ্যক হইবে । সেই স্থলেও ব্যতিরসংশয়বশতঃ ব্যাধিনিশ্চয় অসম্ভব হওয়ায়, সেই ব্যতির-  
সংশয় নিবৃত্তির জন্য অত্র তর্ককে আশ্রয় করিতে হইবে । এইরূপে ব্যতিরসংশয় নিবৃত্তির জন্য  
প্রত্যেক স্থলেই তর্ককে আশ্রয় করিতে হইলে অবশ্যম্ভাব্য অনিবার্য এবং তাহা হইলে কোন  
দিনই তর্ক প্রতিষ্ঠিত হইতে না পারায় ব্যতিরসংশয় নিবৃত্তির আশা নাই । সুতরাং অনুমানের  
প্রামাণ্যনিশ্চয় সম্ভব নহে । বেনন পুণোক্ত স্থলে “ধূম যদি বহির ব্যতির্যারী হয়, তবে বহিঃস্থ  
না হউক” এইরূপ তর্ক বা আপত্তিতে বহিঃস্থত্বের অভাব আপাত, বহিঃ-ব্যতির্যারী আপাদক ।  
ধূমে বহিঃব্যতির্যারী আপাদকের আরোপ করিয়া, তাহাতে বহিঃস্থত্বাভাবের আরোপ করা  
হয় । আপত্তি স্থলে যদি ঐ আপত্তিকে ইঙ্গাপত্তি বলিবার উপায় না থাকে, তাহা হইলে আপাত  
পদার্থটির অভাবকে হেতুরূপে গ্রহণ করিয়া, তদ্বারা আপাদক পদার্থের অভাবের অনুমান করা  
হয় । পুণোক্ত স্থলে ধূমে বহিঃস্থত্ব হেতুর দ্বারা বহিঃব্যতির্যারীত্বের অভাবের অনুমানই সেই  
চরম কর্তব্য অনুমান । অর্থাৎ “ধূম” বহির ব্যতির্যারী নহে, যেহেতু ধূম বহিঃস্থত্ব ; বহা বহির  
ব্যতির্যারী পদার্থ, তাহা বহিঃস্থ পদার্থ হইতে পারে না ; ধূম এখন বহিঃস্থ পদার্থ, তখন  
তাহা বহির ব্যতির্যারী হইতে পারে না, এইরূপে যে অনুমান হইবে, তাহাতে বহিঃস্থত্ব হেতুতে  
বহির ব্যতির্যারীত্বাভাবের ব্যাধিনিশ্চয় আবশ্যক । ঐ ব্যাধিনিশ্চয় ব্যতীত ধূম যদি “বহির  
ব্যতির্যারী হয়, তবে বহিঃস্থ না হউক, এইরূপ তর্ক জন্মিতে পারে না । বহিঃস্থ হইলেই  
সে পদার্থ বহির ব্যতির্যারী হয় না, ইহা সিদ্ধ না থাকিলে ঐরূপ আপত্তি কেহ করিতে পারেন  
না । সুতরাং ব্যতির্যারীত্বনিবর্তক তর্কও যখন ব্যাধিদুলক, তখন ব্যতিরসংশয়বশতঃ সেই  
ব্যাধিনিশ্চয়ও অসম্ভব হইলে, তন্মূলক ঐ “তর্ক”ও অসম্ভব হইবে । এইরূপ ধূম বহিঃস্থ, ইহার  
নিশ্চয় না হইলেও তন্মূলক ঐ তর্ক অসম্ভব । কিন্তু ধূম ও বহির কাব্যাকালভাবের ব্যতির  
শব্দা করিলে, তাহাও যদি তর্কবিশেষের দ্বারা নিবৃত্ত করিতে হয়, তাহা হইলে ঐ তর্কের মূলীভূত  
ব্যাধিনিশ্চয় আবশ্যক হইবে । সেখানেও ব্যতির্যারীপ্রযুক্ত ব্যাধিনিশ্চয় অসম্ভব হইলে  
তন্মূলক ঐ তর্কও অসম্ভব হইবে । কলকথা, নরক ব্যতির্যারী উপস্থিত হইয়া ব্যাধি-  
নিশ্চয়ের প্রতিবন্ধক হইলে কুতাপি ব্যাধিনিশ্চয় হইতে না পারায় তন্মূলক তর্কও কুতাপি



অস্বিতে পারে না ; পরন্তু সর্বত্র ব্যক্তিরসংশয় নিবৃত্তির জন্য ভিন্ন ভিন্ন প্রকার অসংখ্য তর্ককে আশ্রয় করিলে “অনবস্থা” বোধ হইয়া পড়ে । সুতরাং “তর্ককে আশ্রয় করিয়া অনুমানের আশ্রয় সিদ্ধির সম্ভাবনাও নাই । এতদ্ব্যতীত উদয়নাচার্য্য বলিয়াছেন,—“ব্যবাত্তাববিশাশকা” । উদয়নাচার্য্যের কথা এই যে, সর্বত্র ঐক্য শব্দ হইতেই পারে না । ব্যবাত্তপ্রযুক্ত শব্দ অসংখ্য বস্তু থাকে । শব্দাকারী তাহাই আশঙ্কা করিতে পারেন, বাহা আশঙ্কা করিলে নিজের প্রভুতির ব্যবাত্ত উপস্থিত না হয় । ধূম বহির ব্যক্তির হইলে বহিঃকৃত হইতে পারে না । যদি বহিঃকৃত জানেও ধূম জানে, তাহা হইলে বহিঃ ধূমের কারণ হয় না । বহিঃ ধূমের কারণ না হইলে, ধূমার্থী ব্যক্তি ধূমের জন্য বহিঃবিষয়ে কেন প্রবৃত্ত হয় ? যদি বহিঃ ব্যতীতও ধূম অস্বিতে পারে, এইরূপ সংশয় থাকে, তবে ধূমের উপস্থিতিতে বহিঃকে নিবৃত্ত আবেশক মনে করিয়া পূর্বোক্তরূপ সংশয়বাহী ব্যক্তিও কেন বহিঃবিষয়ে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন ? সুতরাং ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য যে, পূর্বোক্তরূপ সংশয় না থাকতেই ধূমার্থী ব্যক্তি বহিঃবিষয়ে প্রবৃত্ত হইতেছে । বহিঃ সবে ধূমের সত্তা (অনু), বহির অসবে ধূমের অসত্তা (ব্যতিরেক), এইরূপ অস্বয় ও ব্যতিরেক দেখিয়াই ধূম বহিঃকৃত, ইহা নিশ্চয় করিয়া, ধূমার্থী ব্যক্তি ধূমের জন্য বহিঃবিষয়ে প্রবৃত্ত হয় । ধূমার্থী ব্যক্তি ধূমের জন্য বহিঃ গ্রহণ করে, কিন্তু বহিঃ ধূমের কারণ নহে, এইরূপ শঙ্কাও করে, ইহা কখনও সম্ভব নহে । সুতরাং তাহা আশঙ্কা করিলে শব্দাকারীর প্রভুতিরই ব্যবাত্ত হয়, তাহা কেহই শঙ্কা করিতে পারে না ও করে না, ইহা অসুভবসিদ্ধ সত্য । পূর্বোক্তরূপে প্রভুতির ব্যবাত্তই শব্দার অবশিষ্ট । তাহা হইলে শব্দা নিরবশিষ্ট না হওয়ার অনবস্থাবোধের সম্ভাবনা নাই । পরন্তু শব্দাকারী চার্য্যক যদি কার্য্যকারণ-ভাবেরও শঙ্কা করেন অর্থাৎ যদি বলেন যে, বহিঃ ধূমের কারণ, ইহা নিশ্চিত হইলে ধূম বহির ব্যক্তির নহে, ইহা নিশ্চিত হয় বটে, কিন্তু বহিঃ যে ধূমের কারণ, ইহা নিশ্চয় করা যায় না । কোন স্থানে বহিঃ ব্যতীতও ধূম জানে কি না, ইহা কে বলিতে পারে ? এতদ্ব্যতীত উদয়ন বলিয়াছেন যে, ঐরূপ অস্বয়ব্যতিরেক-নিবৃত্ত কার্য্যকারণভাবের শঙ্কা করিলে, কুত্ৰাপি শঙ্কাই অস্বিতে পারে না । কারণ, চার্য্যক যে শঙ্কা করেন, তাহাও বিনা কারণে হইতে পারে না । শঙ্কার কোন কারণ না থাকিলে শঙ্কা হইবে কিরূপে ? কারণ ব্যতীতও যদি কার্য্যোৎপত্তি হয়, তাহা হইলে সকল কার্য্যই সর্বত্র সর্বত্র হয় না কেন ? সুতরাং শঙ্কারূপ কার্য্যের অবশ্য কারণ আছে, ইহা চার্য্যকেন্দ্রও স্বীকার্য্য । কিন্তু তিনি সেই কারণকে তাহার কারণ বলিয়া কিরূপে নিশ্চয় করিবেন ? তাহার স্বীকৃত শঙ্কার কারণও শঙ্কার কারণ না হইতে পারে । তাহাতও তিনি সংশয় করেন না কেন ? তিনি যদি অস্বয় ও ব্যতিরেক নিশ্চয়পূর্বক তাহার শঙ্কার কারণ নিশ্চয় করেন, তাহা হইলে ধূম-বহিঃ প্রাকৃতি পদার্থেরও ঐরূপে কার্য্যকারণভাব নিশ্চয় কেন করা যাইবে না ? ফলতঃ, অস্বয়-ব্যতিরেক-নিবৃত্ত কার্য্যকারণভাবের শঙ্কা করা যায় না, তাহা কেহ করেও না । সুতরাং ধূমের প্রতি বহিঃ কারণ, বহিঃ ব্যতীত কিছুতেই ধূম জানে না, ইহা নিশ্চিতই আছে । তাহা হইলে ধূম বহির ব্যক্তির নহে, ইহাও নিশ্চিত । কাহারও সংশয় হইলে পূর্বোক্তরূপ তর্কের দ্বারা তাহা নিবৃত্ত হয় । এই তর্কের মূলীভূত ব্যাপ্তিতে নিরবশি



সংশয় হইতে পারে না। চার্লসেরও তাহা হয় না। উদয়ন প্রকৃতি প্রাচীনগণের মূল তাৎপর্য্য এই যে, ইষ্টসাধনতা নিশ্চয় জন্মও অনেক প্রকৃতি হইয়া থাকে। সে সকল বিজ্ঞাতীয় প্রকৃতির প্রতি ইষ্টসাধনতার নিশ্চয়ই কারণ। অদ্বয়-ও ব্যতিরেক প্রযুক্ত তাহা নির্ধারণ করা যায়। ইষ্টসাধনতার বৈকল্যরূপ জ্ঞানব্রত তাহাতে কারণ নহে। হুনাথী ব্যক্তির ধর্মই ইষ্ট; বহির্কে তাহার সাধন বা কারণ বলিয়া নিশ্চয় করিয়াই ধর্মের জন্ম তাহার বহির্ বিষয়ে প্রকৃতি হইয়া থাকে। নচেৎ ঐ বিশিষ্ট প্রকৃতি তাহার কিছুতেই হইত না। হুনাথী ব্যক্তি যখন ধর্মের প্রতি বহির্ কারণ, ইহা নিশ্চয় করিয়াই ধর্মের জন্ম বহির্ গ্রহণ করিতেছেন, চার্লসও তাহাই করিতেছেন, তখন তদ্বারা বুঝা যায় ধর্মের প্রতি বহির্ কারণ কি না, এইরূপ সংশয় তাহার নাই। তত্ত্বচিন্তামণিকার গবেষণ বলিয়াছেন যে, হুনাথী কার্যের জন্ম বহির্ প্রকৃতি পদার্থকে "নিয়মতঃ" অর্থাৎ হুনাথী ইষ্ট পদার্থের কারণ বলিয়া নিশ্চয় করিয়া, সেই নিশ্চয়প্রযুক্ত অবস্থার বিষয় করে; আবার বহির্ প্রকৃতি পদার্থ হুনাথীর কারণ কি না, এইরূপ শঙ্কাও করে, ইহা কখনই সম্ভব হয় না অর্থাৎ উহা পরস্পর বিরুদ্ধ। গবেষণের তাৎপর্য্য বর্ণনার মৈথিল মিশ্র আচার্য্যগণ বলিয়াছেন যে, চার্লসের প্রতি ব্যাপ্তিগ্রহের উপায় প্রদর্শন করিতে গেলে, তখন শঙ্কানিবর্তক তর্ক প্রদর্শন করিলে, চার্লস যদি তাহাতেও শঙ্কার উদ্ভাবন করেন, তাহা হইলে তাহাকে এইরূপ ব্যাখ্যাত দেখাইতে হইবে যে, তুমি ঐরূপ শঙ্কা কর না অর্থাৎ তুমি নিখ্যা কথা বলিতেছ। বস্তুতঃ তোমারও ঐরূপ শঙ্কা বা সংশয় নাই। ঐরূপ সংশয় থাকিলে হুনাথী সেই সেই কার্যের জন্ম বহির্ প্রকৃতি সেই সেই কারণে তোমারই প্রকৃতি ব্যাহত হইয়া যায়। অর্থাৎ তোমার হুনাথী কার্যের প্রতি বহির্ প্রকৃতিকে কারণ বলিয়া নিশ্চয় না থাকিলে তোমারও তন্মূলক ঐ বিশিষ্ট প্রকৃতি হইত না। রবুনাথ শিরোনথির দীক্ষিতিতে মৈথিল মিশ্রদিগের এইরূপ তাৎপর্য্য বর্ণন পাওয়া যায়। রবুনাথ ঐ বর্ণনের প্রকর্ষ ব্যাশনও করিয়াছেন। টীকাকার অগদীশ সেখানে বলিয়াছেন যে, ইষ্টসাধনতা-নিশ্চয়কে প্রকৃতির কারণ স্বীকার করিয়াই ঐরূপ তাৎপর্য্য বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু চার্লস যখন ইষ্টসাধনতার সংশয়কেও প্রকৃতির কারণ বলেন, তখন তাহার ধর্মের জন্ম বহির্বিষয়ে যে প্রকৃতি, তাহার ব্যাখ্যাত নাই। বহির্ ধর্মের কারণ কি না, এইরূপ সংশয়বশতঃ তাহার মতে ঐ প্রকৃতি হইতে পারে। এই কারণেই রবুনাথ, মিশ্র-বর্ণিত তাৎপর্য্য গ্রহণ করেন নাই, ইহা অগদীশের কথার স্পষ্ট পাওয়া যায়। মনে হয়, মৈথিল মিশ্র-বর্ণিত তাৎপর্য্যই উদয়ন "ব্যাখ্যাতাবধিরাশঙ্কা" এই কথা বলিয়াছেন। মিশ্র টীকাকারও উদয়নের ঐরূপ তাৎপর্য্য বুঝিয়াই তদনুসারে গবেষণের তাৎপর্য্য বর্ণন করিয়াছেন। উদয়ন তাহার ঐ কথার বিবরণ করিতে বলিয়াছেন যে, "তাহাই আশঙ্কা করা যায়, বাহা আশঙ্কা করিলে অজিতাব্যাবাত প্রকৃতি দোষ উপস্থিত হয় না, ইহা লোকমর্ম্মারা"। অর্থাৎ ইহা সর্বলোক-সম্মত সিদ্ধান্ত, উহা কেহ না মানিয়া পারেন না। "বাহা আশঙ্কা করিলে অজিতাব্যাবাত না হয়" এ কথা গবেষণও বলিয়াছেন। টীকাকার

নব্য নৈয়ায়িক মণ্ডুরানাথ, গঙ্গেশের এই কথার ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, বাহ্য আশঙ্কা করিলে অর্থাৎ বাহ্য প্রবৃত্তির পূর্বে সন্দেহের বিদ্য হইলে স্বক্ৰিয়ের অর্থাৎ নিজের প্রবৃত্তির ব্যাঘাত না হয়। মণ্ডুরানাথ এই স্থলে “ক্রিয়া” শব্দের প্রবৃত্তি অর্থ গ্রহণ করিয়া স্বক্ৰিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন— প্রপ্রবৃত্তি। উদয়নও প্রপ্রবৃত্তি অর্থেই স্বক্ৰিয়া বলিয়াছেন, বৃত্তিতে হইবে। এই প্রপ্রবৃত্তির কারণ ইষ্টদানতত্ত্বজ্ঞান। ইষ্টদানতত্ত্বজ্ঞান নিশ্চয়ান্বক জ্ঞানজন্তই যে সকল প্রবৃত্তি হয়, তাহার পূর্বে ইষ্টদানতত্ত্বজ্ঞান নিশ্চয়ই আছে, সংশয় নাই, ইহা স্বীকার্য। তাহা হইলে বহিঃকর্মের কারণ, এইরূপ নিশ্চয় জন্ত যুগ্মার্থী ব্যক্তির বহিঃকর্ম বিবরে যে প্রবৃত্তি, তাহা এই নিশ্চয়পূর্বক হওয়ায়, সেখানে বহিঃকর্মের কারণ কি না, এইরূপ সংশয় নাই, ইহা স্বীকার্য। সেখানে এইরূপ সংশয় থাকিলে নিশ্চয়-মূলক এই প্রবৃত্তির ব্যাঘাত হইত, অর্থাৎ তাহা জন্মিতেই পারিত না। ফল কথা, সংশয়মূলক প্রবৃত্তিও বহু স্থলে বহু বিবরে হইয়া থাকে, ইহা উদয়নেরও স্বীকার্য। কিন্তু যে বিশেষ প্রবৃত্তি-গুলি ইষ্টদানতত্ত্বনিশ্চয়জন্ত, তাহাতে পূর্বোক্তরূপ সংশয় থাকিলে এই প্রবৃত্তি জন্মিতেই পারে না, ইহাই উদয়নের মূল তাৎপর্য বুঝা যাইতে পারে। চার্লস পূর্বোক্তরূপ শব্দ করিলে তাঁহার নিশ্চয়মূলক প্রবৃত্তির উল্লেখ করিয়া, তাহার ব্যাঘাতই তাঁহাকে দেখাইতে হইবে। মিত্র নৈয়ায়িকের এই কথা চিন্তা করিয়া, উদয়নেরও এইরূপ তাৎপর্য মনে করা যাইতে পারে। বহিঃকর্মের কারণ, ইহা নিশ্চয়ই করা যায় না, ধন বহিঃকর্ম কার্যকারণভাবেও সন্দেহ, এই কথা বলিলে চার্লসের শব্দরূপ কার্যও জন্মিতে পারে না। তাহার শব্দার কারণও অনিশ্চিত হইলে কোন্ কারণজন্ত এই শব্দ হয়, ইহা তিনি বলিতে পারিবেন না। ধনা কারণে শব্দ হইতে পারে না। উদয়ন শেষে বলিয়াছেন যে, শব্দার কারণ অনিশ্চিত হইলে সকল বস্তু অসত্য হইয়া পড়ে। উদয়নের এই শেষ কথার দ্বারাও তাঁহার পূর্বোক্তরূপ তাৎপর্যই মনে আসে। তর্ক আছে গঙ্গেশ বাহ্য বলিয়াছেন, তাহারও মিশ্র-বর্ণিত পূর্বোক্তরূপ তাৎপর্যই সন্দেহভাবে বুঝা যায়। টীকাকার যদুনাথ ও মণ্ডুরানাথ কষ্ট করিয়া গঙ্গেশ-বাক্যের যেরূপ অর্থের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, একই শব্দের ভিন্ন ভিন্ন স্থলে যথাক্রমার্থ পরিভাষণ করিয়া যেরূপ বিভিন্নার্থের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাই গঙ্গেশের বিবক্ষিতার্থ বলিয়া মনে আসে না। নৈয়ায়িক সুদীপণ গঙ্গেশের তর্কগ্রন্থের মাপুরী ব্যাখ্যা গ্রহণ করিয়া উহার সমালোচনা করিবেন।

অনির্মাণ্যবাদী, প্রতিভার পূর্ণ অবতার শ্রীহর্ষ “বগুনখণ্ডবাদ্য” গ্রন্থে উদয়নের পূর্বোক্ত কথার বহু বাদপ্রতিবাদ করিয়া কোন প্রকারেই শব্দার উচ্ছেদ হইতে পারে না, ইহা দেখাইতে উপসংহারে বলিয়াছেন,—

“তদ্বাদ্যবৃত্তিরপ্যস্বিন্নপে ন বনু হুস্তা।

স্বদ্যথৈবাত্মথাকারমক্ষরাপি কিংস্তাপি।

ব্যাবাহিকো যদি শব্দাহতি ন চেচ্ছকা ততস্তথাং।

ব্যাবাহিকবিশিষ্টাশঙ্কা তর্কঃ শব্দাবধিঃ কৃতঃ।”

প্রথম স্লোকে বলা হইয়াছে যে, এই বিবরে আমরাও তোমার গাথাতেই (উদয়নের কবিতাতেই)



ক'একটিমাত্র অক্ষর অর্থাৎ শব্দ অন্তর্গত করিয়া, নহলে পাঠ করিতে পারি। শব্দর মিশ্রের ব্যাখ্যামুসারে ক'একটিমাত্র অক্ষর যে তোমার পাখা, তাহাকে অন্তর্গত করিয়া পাঠ করিতে পারি। অর্থাৎ তোমার কারিকারই একটু পাঠভেদ করিয়া, তদ্ব্যবহিত তোমার কথার প্রতিবাদ করিতে পারি, ইহাই প্রশ্নন শ্রোকে বলা হইয়াছে। দ্বিতীয় শ্রোকে সেই অন্তর্গতপাঠ করিয়া উদয়নের কথার প্রতিবাদ করা হইয়াছে। উদয়ন বলিয়াছেন,—“শব্দা চেদন্যমাত্মকোব”। শ্রীহর্ষ বলিয়াছেন,—“ব্যাখ্যাতো যদি শব্দাহতি”। উদয়ন বলিয়াছেন,—“তর্কঃ শব্দাবহির্ভূতঃ”। শ্রীহর্ষ বলিয়াছেন,—“তর্কঃ শব্দাবহিঃ কুতঃ”। ইহাই অন্তর্গতপাঠ। দ্বিতীয় শ্রোকের ব্যাখ্যা এই যে, “ব্যাখ্যাতো যদি” অর্থাৎ যদি ব্যাখ্যাত থাকে, তবে “শব্দাহতি” অর্থাৎ তাহা হইলে শব্দা অবশ্যই থাকিবে। শব্দা ব্যতীত তোমার কথিত ব্যাখ্যাত থাকিতেই পারে না। “ন চেৎ” অর্থাৎ যদি ব্যাখ্যাত না থাকে, যদি তোমার কথিত শব্দার প্রতিবন্ধক ব্যাখ্যাত নাই বল, তাহা হইলে সূত্রস্বয় শব্দা আছে, শব্দার প্রতিবন্ধক না থাকিলে অবশ্যই শব্দা থাকিবে। তাহা হইলে শব্দা ব্যাখ্যাতাবহি অর্থাৎ ব্যাখ্যাত শব্দার প্রতিবন্ধক, ইহা কিরূপে হয়? এবং তাহা না হইলে তর্ক শব্দাবহি অর্থাৎ শব্দার প্রতিবন্ধক, ইহা কিরূপে হয়? অর্থাৎ ব্যাখ্যাত থাকিলে এখন শব্দা অবশ্যই থাকিবে, শব্দা ছাড়া ব্যাখ্যাত থাকিতেই পারে না, তখন ব্যাখ্যাত শব্দার নিবর্তক হইতে পারে না। তাহা না হইলে পূর্বোক্ত প্রকার শব্দাবশতঃ পূর্বোক্তপ্রকার তর্কই জন্মিতে পারে না। সূত্রস্বয় তর্কও শব্দার নিবর্তক হইতে পারে না, তাহা অনস্বয়। শ্রীহর্ষের যুক্ত অভিসন্ধি এই যে, শব্দা হইলে অপ্রতীতির ব্যাখ্যাত হয়, সূত্রস্বয় শব্দা হয় না, এই কথা বলিলে অপ্রতীতির ব্যাখ্যাতকেই শব্দার প্রতিবন্ধক বলা হয়। উদয়ন “ব্যাখ্যাতাবহিরাশব্দা” এই কথা বলায় তাহাই বলিয়াছেন। ব্যাখ্যাত শব্দার অবহি কি না নীচা অর্থাৎ প্রতিবন্ধক, ইহাই ঐক্যের দ্বারা বুঝা যায়; এখন ঐ ব্যাখ্যাত পরার্থ কি, তাহা দেখিতে হইবে। ধন বলিভক্ত কি না, ইত্যাদি প্রকার সংশয় থাকিলে, ধর্মার্থ ব্যক্তি ধনের জন্ম নির্নিচ্চারণে যে ব্যক্তি বিকরে প্রসূত হয়, তাহা হইতে পারে না। ঐরূপ সংশয় থাকিলে ঐরূপ নিশ্চয় প্রসূতি হয় না। পূর্বোক্তপ্রকার শব্দা বা সংশয়ের সহিত পূর্বোক্তপ্রকার প্রসূতির এই যে বিরোধ, তাহাই ঐ “ব্যাখ্যাত” শব্দের দ্বারা প্রকটিত হইয়াছে। বিরোধ স্থলে দুইটি পদার্থ অবশ্যক। এক পদার্থ আশ্রয় করিয়া বিরোধ থাকিতে পারে না। পদার্থবিশেষের পরস্পর বিরোধ থাকিলে, ঐ দুইটি পদার্থই সেই বিরোধের আশ্রয়। উহার একটি না থাকিলেও ঐ বিরোধ থাকিতে পারে না। পূর্বোক্তপ্রকার শব্দা এবং প্রসূতির যে বিরোধ (বহ্যকে উদয়ন ব্যাখ্যাত বলিয়াছেন), তাহা যেখানে আছে, সেখানে ঐ বিরোধের প্রতিযোগী বা আশ্রয় যে শব্দা, তাহা অবশ্যই থাকিবে। ঐ বিরোধের প্রতিযোগী বা আশ্রয় শব্দা ছাড়া, ঐ বিরোধ কিছুতেই থাকিতেই পারে না। বাহার সহিত বিরোধ, সেই বিরোধের আশ্রয় না থাকিলে, বিরোধ কি থাকিতে পারে? তাহা কোন মতেই পারে না। তাহা হইলে ইহা অবশ্য স্বীকার্য যে, উদয়নোক্ত ব্যাখ্যাত অর্থাৎ শব্দাও প্রতীতিবিশেষের বিরোধ থাকিলে সেখানে শব্দা অবশ্যই থাকিবে। তাই বলিয়াছেন, “ব্যাখ্যাতো যদি”, তাহা হইলে “শব্দাহতি”। ব্যাখ্যাত থাকিলে



যখন শব্দ অবশ্যই থাকিবে, নাচে পূৰ্বোক্ত বিরোধরূপ ব্যাখ্যাত পদার্থ থাকিতেই পারে না, তখন আর ঐ ব্যাখ্যাতকে শব্দের প্রতিবন্ধক বলা যায় না। সুতরাং পূৰ্বোক্ত প্রকার শব্দের কোন কোনই কোনরূপেই উচ্ছেদ হইতে না পারায়, তর্কের মূলীভূত ব্যাখ্যানিস্তবও অসম্ভব; সুতরাং তর্ক অসম্ভব; সুতরাং তর্ক শব্দের প্রতিবন্ধক হইবে কিরূপে? উহা অসম্ভব। তাই শেষে বলিয়াছেন,—“তর্ক: শব্দাবধি: কৃত:”।

শ্রীহর্ষ উদয়নের “ব্যাখ্যাত” শব্দের দ্বারা কি বুঝিয়াছিলেন এবং তিনি উদয়নের সমাধান কিরূপ বুঝিয়াছিলেন, তাহা স্থবীর্ণ লক্ষ্য করিবেন। নব্য নৈয়ায়িক মণ্ডানাথও শ্রীহর্ষের কথায় পূৰ্বোক্তরূপ ব্যাখ্যা করিয়া পূৰ্বোক্তরূপই ভ্রাতৃগণ্য বর্ণন করিয়াছেন। কিন্তু তিনি গঙ্গেশের প্রযুক্ত “ব্যাখ্যাত” শব্দের অন্ততঃ ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

তত্ত্বচিন্তামণিকার গঙ্গেশ “তর্ক” প্রভৃ শ্রীহর্ষের পূৰ্বোক্ত দ্বিতীয় মোকটি উদ্ধৃত করিয়া, তাহার ঐ কথায় খণ্ডন করিয়াছেন। গঙ্গেশ প্রথমে বলিয়াছেন যে, শব্দশ্রিত ব্যাখ্যাত, শব্দের প্রতিবন্ধক নহে অর্থাৎ তাহা বলা হয় নাই; প্রজিয়াই শব্দের প্রতিবন্ধক। গঙ্গেশের গুঢ় ভ্রাতৃগণ্য এই যে, যদি শব্দ ও প্রযুক্তির বিরোধরূপ ব্যাখ্যাতকে শব্দের প্রতিবন্ধক বলা হইত, তাহা হইলে ব্যাখ্যাত থাকিলে শব্দ থাকিবেই, এইরূপ কথা বলা যাইত; কিন্তু তাহা কেহ বলে নাই। উদয়নেরও তাহা বিবক্ষিত নহে। উদয়নের কথা এই যে, তাহাই আশঙ্কা করা যায়, বাহা আশঙ্কা করিলে প্রযুক্তির ব্যাখ্যাতাদি নোব না হয়, ইহা সর্বলোকসিদ্ধ। উদয়ন পরে এই কথা বলিয়া, তাহার পূৰ্বোক্ত “ব্যাখ্যাতাবিরোধকা” এই কথারই বিবরণ বা ভ্রাতৃগণ্য বর্ণন করিয়াছেন। তাহা হইলে বুঝা যায় যে, যেখানে শব্দ হইলে শব্দাকারীর প্রযুক্তিই ব্যাখ্যাত হয়, সেখানে বন্ধন: শব্দ হয় না। সেখানে শব্দের অত্র কারণের অন্তবেই হটক, অথবা কোন প্রতিবন্ধক উপস্থিত হওয়াতেই হটক, শব্দই জন্মে না, ইহাই উদয়নের ভ্রাতৃগণ্য। উদয়ন যে ঐ ব্যাখ্যাতকেই শব্দের প্রতিবন্ধক বলিয়াছেন, তাহা নহে। শ্রীহর্ষ উদয়নের কথা না বুঝিয়াই ঐরূপ অনুবাদ প্রতিবাদ করিয়াছেন। গঙ্গেশ পরে দ্বিতীয় কথা বলিয়াছেন যে, ব্যাখ্যাত শব্দের প্রতিবন্ধক, ইহা বলিলেও কোন ক্ষতি নাই, তাহাতেও শ্রীহর্ষোক্ত দোষ হয় না। বিশেষ দর্শন বেদন শব্দের নিবর্তক হয়, তরূপ ব্যাখ্যাতও শব্দের নিবর্তক হইতে পারে, নাচে বিশেষ দর্শনজন্তও কোন বলে শব্দের নিবর্তিত হইতে পারে না। গঙ্গেশের এই শেষ কথার গুঢ় ভ্রাতৃগণ্য এই যে, পূৰ্বোক্ত প্রকার শব্দ ও প্রযুক্তির বিরোধরূপ যে ব্যাখ্যাত, তাহা শব্দশ্রিত, সুতরাং শব্দ না থাকিলে তাহা থাকিতে পারে না, তাহা হইলে ঐ ব্যাখ্যাত যেখানে থাকিবে, সেখানে ঐ শব্দও অবশ্যই থাকিবে; সুতরাং ব্যাখ্যাত শব্দের নিবর্তক হইতে পারে না। বাহা থাকিলে বাহা থাকিবেই, তাহা তাহার নিবর্তক হইতে পারে না, ইহাই শ্রীহর্ষের মূল কথা। কিন্তু তাহা হইলে বিশেষ দর্শন শব্দের নিবর্তক হয় কিরূপে? ইহা কি স্থাপু অথবা গুঢ়ম? এইরূপ সংশয় হইলে যদি সেখানে স্থাপু বা গুঢ়মরূপ বিশেষ দর্শনিস্তব হয়, তাহা হইলে আর সেখানে ঐরূপ সংশয় জন্মে না। ঐ স্থলে ঐ বিশেষ দর্শন বিরোধি দর্শন, এই জন্মই উহা ঐ সংশয়ের নিবর্তক হয়। পূৰ্বোক্ত



সংশয়ের সহিত উহার বিরোধ আছে বলিয়াই উহা ঐ সংশয়ের বিরোধি দর্শন। পূর্বোক্ত সংশয় ও বিশেষ দর্শন-এ নিশ্চয়ের যে বিরোধ, তাহা না থাকিলে ঐ বিশেষ দর্শন বিরোধি দর্শন হয় না, সুতরাং উহা ঐ সংশয়ের নিবর্তকও হইতে পারে না। কিন্তু পূর্বোক্ত সংশয় ও নিশ্চয়ের যে বিরোধ, তাহা থাকিলেও (ঐহর্বের কথাহুসারে) ঐ সংশয় দেখানে থাকা আবশ্যক। কারণ, যে বিরোধ শঙ্কাস্থিত, তাহা থাকিলে শঙ্কা বা সংশয় দেখানে থাকিবেই, ইহা ঐহর্বই বলিয়াছেন। শঙ্কা ছাড়িয়া বশন শঙ্কাস্থিত বিরোধ কিছুতেই থাকিতে পারে না, তখন শঙ্কার বিরোধবিশিষ্ট দর্শন যে বিশেষ দর্শন, তাহা থাকিলে শঙ্কা দেখানে অবশ্যই থাকিবে। তাহা থাকিলে আর ঐ বিশেষ দর্শন শঙ্কার নিবর্তক হইতে পারে না। যে বিশেষ দর্শন থাকিলে শঙ্কা দেখানে থাকিবেই, সেই বিশেষ দর্শন ঐ শঙ্কার নিবর্তক কিরূপে হইবে? তাহা কিছুতেই হইতে পারে না। ঐহর্বের নিজের কথাহুসারেই তাহা হইতে পারে না। তাহা হইলে বলিতে হয়, বিশেষ দর্শন কোন হলেই শঙ্কার নিবর্তক হয় না। স্বাপু বা পুরুষ বলিয়া নিশ্চয় হইলেও ইহা কি স্বাপু অথবা পুরুষ, এইরূপ সংশয় নিবৃত্ত হয় না। কিন্তু তাহা কি বলা যায়? সত্যের অপলাপ করিয়া, অসত্যের অপলাপ করিয়া ঐহর্বও কি তাহা বলিতে পারেন? ঐহর্ব বলি বলেন যে, শঙ্কা ও নিশ্চয়ের বিরোধের প্রতিদোষী বা আশ্রয় যে শঙ্কা, তাহা যে ঐ বিরোধি নিশ্চয়ত্বলোই থাকিবে, এমন কথা নহে; যে কোন কালে, যে কোন স্থানে ঐ শঙ্কাপদার্থ থাকা আবশ্যক। যে কোন কালে, যে কোন স্থানে শঙ্কা না থাকিলে শঙ্কাস্থিত বিরোধ থাকে না। সুতরাং পূর্বে বশন শঙ্কা ছিল, তখন পরজাত নিশ্চয় শঙ্কার বিরোধী হইতে পারে। তাহা হইলে প্রকৃত হলেও ঐরূপ হইতে পারিবে। ব্যাঘাতকে বিশেষ দর্শনের জায় শঙ্কার নিবর্তক করনা করিলেও যে সময়ে ব্যাঘাত, সেই সময়েই বা সেই ভানেই শঙ্কা থাকা আবশ্যক নাই; যে কোন হলে ঐরূপ শঙ্কা বশন আছেই বা ছিল, তখন শঙ্কা ও প্রবৃত্তির বিরোধরূপ যে ব্যাঘাত, তাহা জাবি শঙ্কার নিবর্তক হইতে পারে। ঐ ব্যাঘাতের আশ্রয় যে শঙ্কা, তাহা যে দেখানেই থাকিতে হইবে, এমন কোন যুক্তি নাই, তাহা বলাও যায় না। সুতরাং উল্লিখিত যদি “ব্যাঘাতবিরোধীশঙ্কা” এই কথার দ্বারা পূর্বোক্ত শঙ্কাস্থিত বিরোধরূপ ব্যাঘাতকে শঙ্কার নিবর্তকই বলিয়া থাকেন, তাহাতেই বা দোষ কি? গবেশ আবার এই দ্বিতীয় কথাটি কেন বলিয়াছেন, তাহা সুবোধ আরও ভিত্তা করিবেন। টীকাকার মধুনাথ পূর্বোক্ত প্রকারেই গবেশের তাৎপর্য বর্ণন করিয়াছেন। তর্কিকশিরোমণি দীপ্তিতিকার মধুনাথ এখানে গুণনকার ঐহর্বের কথা বা গবেশের কথার কোন কথাই বলেন নাই। ঐহর্বের কৃত গুণনখণ্ডখণ্ডের টীকা দেখিতে পাইলে তাহার ব্যাখ্যা ও পক্ষবিশেষের সমর্থন দেখা যাইতে পারে। গবেশের কথাহুসারে ঐহর্ব যে উদয়নোক্ত ব্যাঘাতকেই শঙ্কার প্রতিবন্ধক বলিয়া বুঝিয়া, তাহার গুণন করিয়াছেন, ইহা বুঝা যায়; টীকাকার মধুনাথও সেইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু “গুণনখণ্ডখণ্ডো” দেখা যায়, ঐহর্ব ব্যাঘাতরূপ বিশেষের দর্শনকেই শঙ্কার প্রতিবন্ধক বলিয়া বুঝিয়া, তাহার গুণন করিয়াছেন। বস্তুতঃ অজ্ঞানবান ব্যাঘাতকে শঙ্কার প্রতিবন্ধক



বলাও যায় না। ব্যাঘাত বলিতে বিরোধ, বিরোধ পরার্থ বুঝিতে আবার ব্যাপ্তিজ্ঞান আবশ্যক। সুতরাং ব্যাঘাতজ্ঞান ব্যাপ্তিজ্ঞানসাপেক্ষ হওয়ায় আবার অনবস্থা-দোষ উপস্থিত হয়, এজন্য ব্যাঘাতজ্ঞানও শব্দের প্রতিবন্ধক নহে, ইহাও গম্ভীর বলিয়াছেন। শ্রীহর্ষ এই ভাবে ব্যাঘাত জ্ঞানের শব্দপ্রতিবন্ধকতা খণ্ডন করেন নাই। তিনি যে ভাবে খণ্ডন করিয়াছেন, সেই ভাবানুসারেই গম্ভীর দ্বিতীয় করে বলিয়াছেন যে, ব্যাঘাত অথবা ব্যাঘাতজ্ঞানকেও যদি শব্দের প্রতিবন্ধক বলা যায়, তাহাতেও শ্রীহর্ষোক্ত দোষ নাই। তাহাতে শ্রীহর্ষোক্ত দোষ হইলে বিশেষ দর্শনও কুত্ৰাপি শব্দের প্রতিবন্ধক হইতে পারে না। শ্রীহর্ষের মূল কথা এই যে, ব্যাঘাত যখন শব্দান্ত্রিত, তখন ব্যাঘাত দর্শন স্থলে প্রথমে ব্যাঘাতবর্ণী ব্যক্তির শব্দা জন্মিয়াছিল, ইহা অবশ্য স্বীকার্য। ঐ শব্দকে অবলম্বন করিয়া অবস্থিত ব্যাঘাতরূপ বিশেষের দর্শন হইলে আর শব্দান্ত্র জন্মে না, সুতরাং ব্যাপ্তি-নিশ্চয়ের বাধা নাই, এই সিদ্ধান্তও বিচারগত নহে। কারণ, যে কাল পর্যন্ত ব্যাঘাত আছে, সে কাল পর্যন্ত তাহার আশ্রয় শব্দা থাকিবেই। ঐ শব্দের নিবৃত্তি হইলে তদান্ত্রিত ব্যাঘাতরূপ বিশেষও থাকিবে না। সুতরাং তখন শব্দান্ত্রের উৎপত্তি কে নিবারণ করিবে? যদি বল, তখন ব্যাঘাত-রূপ বিশেষ না থাকিলেও তাহার জ্ঞান বা প্রজ্ঞাত সংস্কার থাকে, তাহাই শব্দের প্রতিবন্ধক হইবে। এতদ্বারা শ্রীহর্ষ বলিয়াছেন যে, ঐ ব্যাঘাতরূপ বিশেষের দর্শন অথবা প্রজ্ঞাত সংস্কার কাশান্ত্রে শব্দের প্রতিবন্ধক হইতে পারে না। তাহা হইলে অনেক সংশয়ই জন্মিতে পারে না। বিশেষ নিশ্চয় হইলেও কাশান্ত্রে আবার অনেক স্থলে সংশয় জন্মিয়া থাকে। বস্তুতঃ সর্বত্র শব্দা জন্মে না, ইহাই প্রকৃত কথা। শব্দা জন্মিলে তাহা অনেক দূরত্বই বুঝা যায়। যিনি সর্বত্র শব্দাবাদী, তাহার মনস্ক সমর্থন করিতে হইলেও এই অসম্ভববুদ্ধি সত্য স্বীকার্য। ঐখনিয়ায় ভাব্যরূপে তাহা দেখাইরাছি। ব্যাঘাত থাকিলেই তৎকাল পর্যন্ত শব্দা থাকিবেই, ইহার কোন কারণ নাই। যে কোন কালে যে কোন স্থানে শব্দা থাকা আবশ্যক, এইমাত্রই শ্রীহর্ষ বলিতে পারেন, এ কথাও গম্ভীরের তাত্পর্য-বর্ণনার মধুরানাতের ব্যাখ্যানানুসারে পূর্ণে বলিয়াছি।

শ্রীহর্ষের আর একটি বিশেষ কথা এই যে, কার্যকারণভাবের শব্দা আমি করিতেছি না, বহি হইতে যে সকল ধর্মের উৎপত্তি দেখা যায়, সেই সকল ধর্মবিশেষের প্রতি বহি কারণ, ইহাই মাত্র নিশ্চয় করা যায়। ধূমারে বহি কারণ, ইহা নিশ্চয় করা যায় না, ইহাই আমার বক্তব্য। যেমন বিজাতীয় কারণ হইতে বিজাতীয় বহি জন্মে, ইহা নৈমিত্তিকগণ স্বীকার করেন, তদ্রূপ বিজাতীয় কারণ হইতে বিজাতীয় ধূমও জন্মিতে পারে। অর্থাৎ এমন ধূমও থাকিতে পারে, বাহ্য বহি যাতীত অন্ত কারণ হইতেই জন্মে, সুতরাং ধূমাত্রই বহিজন্ম কি না, এইরূপ সংশয় অনিবার্য। এইরূপ সংশয় থাকিলে ধূম যদি বহির ব্যক্তিত্বীয় হয়, তাহা হইলে বহিজন্ম না হউক, এই প্রকার তর্ক হইতে পারে না। ঐরূপ তর্কে ধূমারে ধূমরূপে বহিজন্ম নিশ্চয় আবশ্যক, তাহা যখন অসম্ভব, তখন পূর্ণোক্ত প্রকার তর্ক সম্ভব হওয়ায় ধূমে বহি ব্যক্তিত্বের শব্দা নিবৃত্তি হওয়া অসম্ভব; অসম্ভববিশেষী চার্লসেরও ইহা একটি বিশেষ কথা। তর্কদীপ্তি গ্রন্থে মধ্য নৈমিত্তিক প্রবৃত্তি শিরোনামেই এই কথার অবতারণা করিয়াছেন। তিনি সেখানে বলিয়াছেন যে, বহু বহু ধূম বহি-



জন্ম, ইহা যে সময়ে প্রত্যক্ষের দ্বারা নিশ্চয় করে, তখন ঐ নিশ্চয় ধূমরূপে ধূমাত্মের প্রতিই বহিঃকরণে বহিঃকারণত্বকে বিষয় করে। অর্থাৎ ঐরূপ সামান্য কার্যাকারণ ভাব নিশ্চয়ই তখন জন্মিয়া থাকে। ঐরূপ সামান্য কার্যাকারণ-ভাব করনাত্তেই লাঘব জ্ঞান থাকার সেখানে ঐ নিশ্চয়ের কেহ বাধক হইতে পারে না। ঐরূপ সামান্য কার্যাকারণ ভাব না মানিলে যে করন-গোঁড়ব হয়, সেই করন-গোঁড়বের পক্ষে বধন কিছুমাত্র প্রমাণ নাই, তখন যে পক্ষে লাঘব জ্ঞান আছে, তাহাই লোকে নিশ্চয় করিয়া থাকে এবং সেইরূপই অমর ও ব্যতিরেক (যাহা বৃথিয়া কারণ নিশ্চয় হয়) প্রামাণিক বলিয়া নিষ্ক। ফলকথা, ধূমরূপে ধূমমাত্রে বহিঃকরণে বহিঃকারণ, এইরূপ নিশ্চয় হইয়াই থাকে; অমূলক শব্দা করিয়া করন-গোঁড়ব কেহ আশ্রয় করে না। নচেৎ ভাবী ধূমের অঙ্গ ধূমের কারণজ ব্যক্তির বহিকে নির্লিঙারে গ্রহণ করিতেন না। বহিঃসত্ত্ব ধূমের সত্ত্ব (অমর), বহির অমর ধূমের অমর (ব্যতিরেক), ইহা দেখিয়াই ধূমমাত্রে বহিঃকারণ, ইহা নিশ্চয় করে। তাই ধূমের প্রয়োজন বোধ হইলেই তৎক্ষণত সকলে বহিকে গ্রহণ করে। বস্তুতঃ অহমান-প্রামাণ্যবাদীরা বহির অহমানে যে ধূম পদার্থকে হেতুরূপে গ্রহণ করিয়াছেন, সেই ধূম পদার্থ কি, তাহা বুঝিলে ধূমমাত্রই বহিঃকরণ কি না, এইরূপ সংশয় হইতেই পারে না। আর ইন্ডনসংযুক্ত বহিঃ হইতে যে মেন ও অন্নজনক পদার্থবিশেষ জন্মে, তাহাই ঐ ধূম পদার্থ; তাহা বহিঃ ব্যতীত জন্মিতেই পারে না; সূচিকাল হইতেই বহিঃ তাহার কারণ বলিয়া নিশ্চিত আছে। সূতরাং সূচিকাল হইতেই তাহার দ্বারা বহির অহমান হইতেছে। যিনি ধূমপদার্থের ঐ স্বরূপ জানেন না, ধূমমাত্রই বহিঃকরণ, বহিঃ ব্যতীত ধূম জন্মিতেই পারে না, ইহা বাহার জানা নাই, তাহার ঐ অহমান হইতে পারে না। বহিঃ ব্যতীত কখনও কোন স্থানে ঐ ধূম জন্মিলে অবশ্যই প্রামাণিকপণ তাহা গ্রহণের দ্বারা জানিতে পারিতেন। বস্তুতঃ তাহা জন্মে নাই, জন্মিতেও পারে না। বাহা আর ইন্ডনসংযুক্ত বহিঃ হইতেই জন্মিবে, অঙ্গ কারণ হইতে তাহা কিরূপে জন্মিবে? আর ইন্ডনসংযুক্ত বহিঃ হইতে জাত অন্নজনক পদার্থবিশেষ বলিয়া বাহার পরিত্যক্ত হইতেছে, তাহা সমস্তই বহিঃকরণ কি না, এইরূপ সংশয় কিরূপে হইবে? পূর্বোক্ত ধূমপদার্থে ঐরূপ সংশয় হইতেই পারে না, কোন দিনই কাহারও হয় নাই। এই জন্ম ধূম বাহার কেতু অথবা কেতন অথবা ধ্বজ অর্থাৎ ধূম বাহার চিহ্ন বা লিঙ্গ অর্থাৎ অহমানপক, এই অর্থে “ধূমকেতু”, “ধূমকেতন”, “ধূমধ্বজ” এই তিনটি শব্দ সূচিকাল হইতে বহিঃ অর্থেও প্রযুক্ত হইয়া আসিতেছে। অতিথানে ঐ তিনটি শব্দ পূর্বোক্ত ব্যুৎপত্তি অনুসারে বহির বোধক বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। ইহা কি ধূমমাত্রই বহিঃকরণ, সূতরাং বহির অহমানপক, এই সূত্রটান সংস্কারের সমর্থন করিতেছে না? “ধূমেন গচ্ছতে গম্যতেহসৌ” এইরূপ ব্যুৎপত্তি অনুসারে গচ্ছতেও বহিকে “ধূমগচ্ছি” বলা হইয়াছে। বহিঃ “ধূমগচ্ছি” অর্থাৎ ধূমগমা ধূম বহির গমক অর্থাৎ অহমানপক, তাই বহিকে ধূমগমা বলা হয়। গচ্ছতেও যদি ঐ কথা পাওয়া যায়, তবে তাহা ঐ বিবরে অন্যি সংস্কারই সমর্থন করে। গচ্ছতে আছে—“মারিধর্শনদীপ্তমগচ্ছিঃ” [১]১৩২।১৫।

চাক্ষুর বা তদ্রূপবলম্বী যদি কেহ বলেন যে, কোন কালে কোন দেশে বহিঃ ব্যতীতও ঐ



ধুম জ্বলিতে পারে। বর্তমান কালে কোন দেশবিশেষে বহিঃ হইতেই ধুম জ্বলি দেখিয়া সর্ব-  
দেশের সর্বকালের জ্ঞাত ধুম-বহির ঐরূপ সামান্য কার্য্যকারণ-জাব করা যায় না। এক দিন  
এমন কারণও আবিষ্কৃত হইতে পারে, তাহা বহিরে অপেক্ষা না করিয়াই ধুম জ্বলাইবে।  
এতদ্বারা বক্তব্য এই যে, যদি কোন দিন ঐরূপ হয়, তখন তাহাকে যে ধুমই বলিতে হইবে,  
ইহার প্রমাণ কি? ধূমের জ্ঞাত দৃষ্টমান ব্যাপ্ত যেমন ধুম নহে, তাহা বহির লিঙ্গও নহে, তদ্রূপ  
কালান্তরে সম্ভাব্যমান সেই ধুমসদৃশ পদার্থও ধুম শব্দের বাজ্য নহে। স্বচিরকাল হইতে প্রাচীনগণ  
বহিঃজ্ঞাত যে পদার্থবিশেষকে ধুম বলিয়া গিয়াছেন এবং তাহাকেই বহির লিঙ্গ বা অহুমানপক বলিয়া  
গিয়াছেন, তাহা বহিঃ ব্যতীত কোন দিনই জ্বলিবে না। পূর্বেও ধুমপদার্থকে অসম্ভবরূপে  
দেখিলেই তদ্বারা বহির বার্থ অহুমান হয়, ইহা প্রশস্তপাদ বলিয়াছেন। ভ্রাতৃকন্দলীকার  
সেখানে বলিয়াছেন যে, ইহা ধুমই—বাস্তবিক নহে, এইরূপ জ্ঞানই অসম্ভব ধুমদর্শন।  
দেশবিশেষ ও কালবিশেষ অবলম্বন করিয়া যে পদার্থ অপরের অবিনাশ বা ব্যাপ্তিবিশিষ্ট হয়,  
তাহাও ঐ পদার্থের লিঙ্গ বা অহুমানপক হয়, ইহাও প্রশস্তপাদ বলিয়াছেন। কপালস্থে ইহা না  
থাকিলেও তিনি কপালস্থকে প্রদর্শনমান বলিয়া অর্থাৎ কপাল স্থি করেক প্রকার প্রধান লিঙ্গ  
বলিয়াই অস্ত্রবিধ লিপ্সের স্মৃতি করিয়া গিয়াছেন, ইহাই বলিয়া তাহার কথিত দেশকালবিশেষাশ্রিত  
লিঙ্গের উদাহরণ দেখাইয়া গিয়াছেন। তবে পূর্বেও ধুম পদার্থ সর্বদেশে সর্বকালেই বহির  
অহুমানপক, ইহা অহুমানবাদী সকলেই সিদ্ধান্ত। ভ্রাতৃকন্দলীকার সেই ভাবেই প্রশস্তপাদ-  
ভাবের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বহির অহুমানপকরূপে যে ধুম পদার্থ গৃহীত হয়, তাহা কোন  
দেশে কোন কালেই বহিঃ ব্যতীত জ্বলিতে পারে না। বহিঃ ব্যতীত জাত পদার্থ ঐ ধুম শব্দের  
বাচ্যই নহে, এই সিদ্ধান্তই প্রাচীন কাল হইতে সর্বসিদ্ধ আছে। তদ্বান্ শ্রীকৃষ্ণও গীতার  
সর্বসিদ্ধ দৃষ্টান্ত দেখাইতে বলিয়াছেন,—“ধূমনাত্মিতো বহিঃস্থথা।”

শেব কথা, যদি কোন কালে বহিঃ ব্যতীতও ধুম জ্বলি এবং তাহাও ধুমবিশিষ্ট বলিয়া পদ্বীকিত  
ও গৃহীত হয়, তাহাতেও বর্তমান কালে ধুমহেতুক বহির অহুমানের ভ্রম সিদ্ধি হয় না। অর্থাৎ  
যদি দেশবিশেষ ও কালবিশেষ আশ্রয় করিয়াই ধুমকে বহির ব্যাপ্ত বা অহুমানপক বলিয়া স্বীকার  
করি, তাহা হইলে যে দেশে বর্তমান কাল পর্য্যন্ত বহিঃ ব্যতীত ধুম জ্বলিতেছে না, সেই দেশে তত কাল  
পর্য্যন্ত ধুম দেখিয়া যে বহির অহুমান হইবে, তাহা বার্থই হইবে। ঐ অহুমানের অগ্রাণাশ  
নাশন করিবার কোন হেতু নাই। কোন কালে কোন দেশে ধূমে বহির ব্যাপ্তিভক্ত হইলেও যে  
দেশে বর্তমান দিন পর্য্যন্ত ঐ ব্যাপ্তিভক্ত আছে, সে দেশে তত দিন পর্য্যন্ত ঐ ব্যাপ্তি অগ্রহস্ত  
ধুমহেতুক বহির বার্থ অহুমান হইতেই পারে। দেশবিশেষ ও কালবিশেষাশ্রিত ব্যাপ্তি স্বীকার  
করিলে সেই স্থলে দেশবিশেষ ও কালবিশেষই অহুমান হইয়া থাকে। যে সময়ে দেশে  
পুস্তকত্রয়ই হস্তকার্য লিখিত হইত, তখন কোন পুস্তকের নাম তুলিলেই তাহা কাহারও  
হস্তলিখিত, এইরূপ অহুমানই সকলের হইত। এখন সে নিয়মের ভঙ্গ হইয়াছে, এখন কেহ  
কোন পুস্তকের নাম তুলিলে, তাহা কাহারও হস্তলিখিত, এইরূপ বার্থ অহুমান করিতে পারেন



না। পুস্তকমাত্রই হস্তলিখিত হইবে, এইরূপ নিয়ম না থাকায় এখন আর ঐরূপ অহুমানের প্রামাণ্য নাই। তাই বলিয়া কি পূর্বকালে যে পুস্তকমাত্রকেই হস্তলিখিত বলিয়া অনেক ব্যক্তির অহুমান হইয়াছে, তাহা তাহাদিগের ভ্রম বলা যাইবে? তাহা কখনই হইবে না। এইরূপ বর্তমান রাজবিধি অনুসারে এ দেশে বর্তমান কালে আমাদেরিগের যে সকল নিয়ম বা ব্যাপ্তির নিশ্চয় আছে, তৎসমস্ত এ দেশে বর্তমান কালে আমরা যে সকল অহুমান করিতেছি, কালাস্তরে আবার বর্তমান রাজবিধির পরিবর্তন হইতে পারে সম্ভাবনা করিয়া, অথবা অনেক স্থলে প্রমাণের দ্বারা তাহা নিশ্চয় করিয়াও আমরা বর্তমান কালের ঐ সকল অহুমানকে কি ভ্রম বলিতে পারি? তাহা কি কেহ বলিতেছেন? ফল কথা, যদি দেশবিশেষ বা কালবিশেষ ধরিয়াও ধূমে বহির ব্যাপ্তি স্বীকার করিতে হয়, তাহাতেও ধুমহেতুক বহির অহুমানের সর্বদশে সর্বকালে অপ্রামাণ্য হয় না। অন্ততঃ যেকোন দেশে যেকোন কালেও চাক্ষু্যকরও ধুমহেতুক বহির অহুমানের প্রামাণ্য স্বীকার করিতে হয়। চাক্ষু্যক কি তাহার নিজ গৃহেও ধূম দেখিয়া বহির অহুমান করেন না? চাক্ষু্যক যত দিন পর্য্যন্ত তাহার নিজ গৃহে বহি হইতেই ধূমের উৎপত্তি দেখিতেছেন, বহি ব্যতীত ধূমের উৎপত্তি দেখিতেছেন না, তত দিন পর্য্যন্ত ধূম দেখিলেই নিজ গৃহে বহির অহুমান করিতেছেন। দেই অহুমানরূপ নিশ্চয়াদ্বক জানের কালে তাহার নিশ্চয়মূলক কত ইচ্ছা ও প্রবৃত্তি হইতেছে, ইহা কি তিনি সত্যবাদী হইলে স্বীকার করিতে পারেন? চাক্ষু্যক বলেন যে, আমি নিজ গৃহেও ধূম দেখিয়া বহির সম্ভাবনা করিয়াই ততমূলক কার্য্য করিয়া থাকি। চাক্ষু্যকের এই সম্ভাবনারূপ সংশয় যে তাহার মতে ঐ স্থলে হইতে পারে না, ইহা উদয়নের ভারকুহুমাজলির তৃতীয় স্তবকের বর্গ কারিকার দ্বারা দেখাইয়াছি এবং কুত্রাপি নিশ্চয় না থাকিলে যে সংশয় হইতে পারে না, ইহাও পূর্বে দেখাইয়াছি। বস্তুতঃ চাক্ষু্যক যে অপ্রত্যক্ষ স্থলে সর্বত্র সম্ভাবনা করিয়াই কার্য্য প্রবৃত্ত হন, ইহা সত্য নহে। চাক্ষু্যক তাহার জীপুত্রের মৃত্যু হইলে তাহাদিগকে যে শ্রমানে লইয়া নান, তাহা কি তাহার জীপুত্রের মৃত্যুর সম্ভাবনা করিয়া অথবা নিশ্চয় করিয়া? সম্ভাবনা সংশয়-বিশেষ। চাক্ষু্যকের যদি তাহার জীপুত্রের মৃত্যু বিষয়ে অণুমাত্রও সংশয় থাকে, তাহা হইলে কি তিনি তাহাদিগকে শ্রমানে লইয়া যাইতে পারেন? তিনি জীপুত্রের মৃত্যু নিশ্চয় হইলেই তাহাদিগকে শ্রমানে লইয়া যাইয়া থাকেন, ইহাই সত্য। তাহার ঐ নিশ্চয় অহুমান-প্রমাণজন্য। কারণ, মৃত্যু পদার্থ তাহার প্রত্যক্ষনিদ্র নহে। মৃত্যুর অব্যক্তিকারী লক্ষণ দেখিয়াই তিনিও মৃত্যুর অহুমান করিয়া থাকেন। অবশ্য অনেক স্থলে সম্ভাবনার কালেও প্রবৃত্তি হয় বটে এবং সর্বত্র বস্তুার্থ অহুমান হয় না বটে, অনেক স্থলে তুল্যকোটিক সংশয়ও হয় বটে; কিন্তু অনেক স্থলে বস্তুার্থ অহুমানও হইয়া থাকে। কোন ব্যক্তি শ্রমানে হইতেও কিরিয়া আসিয়া দীর্ঘকাল বাতিয়া ছিল, ইহা সত্য; কিন্তু তাই বলিয়া সকল ব্যক্তিরই আত্মীয়বর্গ তাহাদিগের মৃত্যু ভ্রম করিয়া তাহাদিগকে শ্রমানে লইয়া যায় না, জীবনবিশিষ্ট শরীর দ্রব করে না।

প্রশ্ন হইতে পারে যে, বহিঃস্থ স্থানেও যখন ধূম দেখা যায়, তখন ধূমরূপে ধূম যে বহির ব্যক্তিকারী, ইহা ত প্রত্যক্ষনিদ্র। ধূম তাহার উৎপত্তিস্থান হইতে বিচ্যুত হইয়া আকাশাদি স্থানে



উল্লেখ হইলে অথবা আর কোন স্থানে বহু থাকিলে, সেখানে বহি না থাকায় ধ্রু বহির ব্যাপ্য হইতেই পারে না। তবে আর ধ্রু বহির ব্যাপ্যিসিদ্ধির জন্য নৈয়ায়িকের এত কথা, এত বিবাদ কেন? এতদ্বারা বক্তব্য এই যে, সামান্ততঃ সংযোগ সন্ধে ধ্রুস্বরূপে ধ্রুসামান্ত যে বহির ব্যক্তিত্ব, ইহা নৈয়ায়িকগণের স্বীকৃত। উদ্যোক্তকর ঐ ব্যক্তিত্বের উল্লেখ করিয়াও ধ্রুস্বরূপ বহির অসম্ভব হইতে পারে না বলিয়া স্বনত সমর্থন করিয়াছেন। তাহার নিজ মত প্রথমাধ্যায়ে অসম্ভব ব্যাখ্যায় বলা হইয়াছে। কিন্তু সংযোগ সন্ধে বিশিষ্ট ধ্রু বহির ব্যক্তিত্ব নহে। রঘুনাথ শিরোমণি বহু স্থলে তত্ত্বচিন্তামণির ব্যাখ্যায় গবেষণের মতানুসারে ধ্রুস্বরূপে ধ্রুসামান্তকে বহির অসম্ভব হেতুরূপে ব্যাখ্যা করিলেও তিনি যে বিশিষ্ট ধ্রুস্বরূপেই ধ্রুের হেতুতাবাদী, ইহা তাহার কথার দ্বারা যায়।<sup>১</sup> জাংগদীকাকার বাচস্পতি মিশ্র ধ্রুবিশেষই যে বহির অসম্ভব সন্ধে, ধ্রুস্বরূপে ধ্রুসামান্ত বহির ব্যক্তিত্ব, এ কথা স্পষ্ট বলিয়াছেন<sup>২</sup>। এই মতানুসারেই প্রথমাধ্যায়ে বহু স্থলে বহির অসম্ভব বিশিষ্ট ধ্রুই হেতু বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি।

নব্য নৈয়ায়িক জগদীশ তর্কালঙ্কার এক স্থানে বলিয়াছেন যে,<sup>৩</sup> সামান্ততঃ সংযোগসন্ধে ধ্রুস্বরূপ বহির ব্যক্তিত্ব; এ জন্য পর্ত্তবাদি নিরূপিত সংযোগ সন্ধে ধ্রু বহির অসম্ভব হেতু। পর্ত্তবাদি নিরূপিত সংযোগ সন্ধে ধ্রু পর্ত্তবাদি স্থানেই থাকে। সেখানে বহিও থাকে; সুতরাং ঐ বিশিষ্ট সংযোগ সন্ধে ধ্রুস্বরূপে ধ্রুস্বরূপ বহির ব্যক্তিত্ব হয় না, ইহাই তাহার কথা। অনেক প্রাচীন এবং গবেষণ প্রভৃতি অনেক নব্য আচার্য্য ধ্রুস্বরূপে অবিশিষ্ট ধ্রুকেই বহির অসম্ভব হেতুরূপে উল্লেখ করিয়াছেন। জগদীশের কথানুসারে বুঝা যায়, ইহারা পর্ত্তবাদি নিরূপিত সংযোগ সন্ধেই ধ্রুস্বরূপে ধ্রুসামান্তকে বহির অসম্ভব হেতু বলিয়াছেন, তাহাই তাহাদিগের অভিপ্রেত। নচেৎ সামান্ততঃ সংযোগ সন্ধে ধ্রুসামান্ত যে বহির ব্যক্তিত্ব, অর্থাৎ বহিশূন্য স্থানেও যে শুদ্ধ সংযোগ সন্ধে ধ্রুস্বরূপে ধ্রু থাকে, এ কথার উত্তরে তাহাদিগের আর কি বক্তব্য আছে? কিন্তু নব্য নৈয়ায়িকগণ অনেক স্থলেই শুদ্ধ সংযোগ সন্ধে ধ্রুস্বরূপে ধ্রুের হেতুতা গ্রহণ করিয়াছেন, ইহাও দেখা যায়। সে সব স্থলেও পরিশেষে বিশিষ্ট সংযোগ সন্ধেই ধ্রুের হেতুতা তাহাদিগেরও বক্তব্য, ইহা বুঝিতে হয়। কিন্তু রঘুনাথ শিরোমণি ধ্রুস্বরূপ সংযোগ সন্ধকে বিশিষ্টরূপে আশ্রয় না করিয়া, সামান্ততঃ সংযোগ সন্ধে বিশিষ্ট ধ্রুকেই বহির অসম্ভব হেতুরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। রঘুনাথের যুক্তি ইহাই মনে হয় যে, ধ্রুস্বরূপে ধ্রুসামান্তই

১। অর্থ পর্ত্তবাদের পক্ষে বহিরের সাধারণ বিশিষ্টধ্রুস্বরূপ হেতুর ইত্যাদি।—হেতুতাবাদসামান্তনিরূপিত-  
বাহিত্ব।

২। বলাপি কাণ্ডমাত্র ব্যক্তিত্বের কার্যাবশ্যক, তথাপি বাবুসং ন ব্যক্তিত্বের ওই নিগূঢ় অভিপ্রেত।  
তবিত্বং, অত্যাধা ধ্রুসামান্ত বহিঃস্থতা। ব্যক্তিত্বত্বাতি ন ধ্রুবিশেষেণ। ধ্রুসং তবিত্বং।—জাংগদীক।

১ম অঃ, ২ম পৃঃ।

৩। সংযোগসন্ধে ধ্রুস্বরূপে প্রত্যক্ষভাবে বাহ্যিকব্যক্তিত্বের পর্ত্তবাদিনিরূপিতসংযোগসন্ধে তত্ত্ব হেতুতাব।—  
বাহিকবাপ্ত্যব্যক্তিত্বত্বাৎ—জাংগদীক।



বহিৰ অহুমানক নহে; যে ধূম তাহাৰ মূলদেশ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া স্থানান্তৰে দ্বাৰ নাই, বাহ্য নিজের উপপত্তিস্থানের সহিত সংযুক্তই আছে, সেই বিশিষ্ট ধূম দেখিছাই বহিৰ অহুমান হয়। এবং প্রথমে তাদৃশ বিশিষ্ট ধূমেই পাকশালাদি স্থানে বহিৰ ব্যাপ্তি প্রত্যক্ষ হয়। সুতরাং তাদৃশ বিশিষ্ট ধূমই বহিৰ অহুমানে হেতু। সম্বন্ধবিশেষে ধূমসামান্যে বহিৰ অহুমানে হেতুতা ব্ৰহ্মা করা গেলেও এবং সম্বন্ধবিশেষে ধূমসামান্যহেতুক বহিৰ অহুমানান্তর থাকিলেও সামান্যতঃ সংযোগ সম্বন্ধে ধূম দেখিয়া যে বহিৰ অহুমান হয়, সংযোগগত কোন বৈশিষ্ট্যজ্ঞান না থাকিয়াও সাধারণের ধূমহেতুক যে বহিৰ অহুমান হয়, তাহাতে অবিশিষ্ট সংযোগ সম্বন্ধে বিশিষ্ট ধূমই হেতু হইয়া থাকে, ইহা অন্তর্ভবিত।

ধূমরূপে ধূমসামান্যকে বহিৰ অহুমানে হেতু বলিবার পক্ষে যুক্তি এই যে, ধূমহেতুক বহিৰ অহুমান কার্যাহেতুক কারণের অহুমান। ধূমরূপে ধূমসামান্যের প্রতি বহিৰরূপে বহিসামান্য কারণ, এইরূপে কার্যকারণ ভাবস্বহমূলক ব্যাপ্তিনিষ্ঠবশতাই ধূমহেতুক বহিৰ অহুমান হয়। সুতরাং ধূমরূপে ধূমসামান্যরূপ কার্যই বহিৰরূপে বহিসামান্যরূপ কারণের অহুমানে হেতু হইবে। এই সিদ্ধান্তে বলিয়া এই যে, ধূমরূপে ধূমসামান্য যে সম্বন্ধে বহিৰ কার্য বলিয়া বুঝা যাইবে, সেই সম্বন্ধে (কার্যভাবজ্ঞানক সম্বন্ধে) ধূমরূপে ধূমসামান্য বহিৰ অহুমানে হেতু বলা যাইবে না। পূৰ্বোক্ত পৰ্জ্বতাদি নিরূপিত সংযোগ সম্বন্ধে ধূমসামান্যকে বহিৰ কার্য বলা যাইবে না, ইহা নৈময়িক স্রবীণ বুঝিতে পারেন। তর্কদীপ্তির টীকার জগদীশ তর্কালঙ্কারও ধূম ও বহিৰ কার্যকারণ ভাবের সম্বন্ধ বিষয়ে কেবল মতান্তর প্রকাশ করিয়া শেষে বলিয়াছেন যে, 'ধূম ও বহিৰ কার্য-কারণ-ভাব-জ্ঞান যে প্রকারেই হউক অর্থাৎ যিনি যে সম্বন্ধেই ঐ কার্য-কারণ ভাবের করণা করেন, তাদৃশ কার্যকারণভাবজ্ঞান সংযোগ সম্বন্ধে বহি ও ধূমের ব্যাপ্তিজ্ঞানে উপযোগী হয় না, ইহা কিন্তু অবধান করিবে। যদি ধূম বহিৰ সামান্য কার্যকারণভাব অহুসরণ করিয়া ধূমরূপে ধূমসামান্যকেই বহিৰ অহুমানে হেতু বলিতে হয়, তাহা হইলে যে সম্বন্ধে ধূমের কার্যতা স্বীকার করিতে হইবে, তাহাকেই বা কি করিয়া ত্যাগ করা যায়? যদি তাহাকে বাধ্য হইয়া ত্যাগ করিয়া সংযোগ বা পৰ্জ্বতাদি নিরূপিত সংযোগ সম্বন্ধকে ঐ ধূমহেতুর সম্বন্ধ বলিয়া গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে ধূমরূপে ধূমসামান্যরূপ কার্যকে ত্যাগ করিয়া, বিশিষ্ট ধূমরূপে কার্যবিশেষকেই বা বহিৰ অহুমানে হেতু বলা যাইবে না কেন? ধূমসামান্য বহিঃকৃত, ইহা বুঝিলে বিশিষ্ট ধূমকেও বহিঃকৃত বলিয়া বুঝা হয়। সুতরাং ঐরূপ জ্ঞান পরস্পরায় বিশিষ্ট ধূমও বহিৰ ব্যাপ্তিনিষ্ঠের উপযোগী হইতে পারে। স্রবীণ উত্তর নন্তেরই সমালোচনা করিয়া এবং জগদীশের কথাগুলি ভাবিয়া তথ্য নির্ণয় করিবেন।

চাৰ্কাকের আর একটি কথা এই যে, অনৌপাধিকত্বই যখন ব্যাপ্তি পদার্থ বলা হইয়াছে, তখন ঐ ব্যাপ্তিজ্ঞান কোনরূপেই হইতে পারে না। কারণ, অনৌপাধিকত্ব বুঝিতে উপাদির জ্ঞান

১। ইহা বলাও হয়, অহু বলা ও হয়। বহিঃকৃতঃ কার্যকারণভাবজ্ঞান; ন চানৌ সাংযোগেন বহিঃকৃতঃ ব্যাপ্তি-প্রদীপ্তিঃ। ইতি।



আবশ্যক। উপাধির লক্ষণ বাহা বলা হইয়াছে, তাহা বুঝিতে আবার ব্যাপ্তিজ্ঞান আবশ্যক। সুতরাং ব্যাপ্তিজ্ঞান ব্যাপ্তিজ্ঞানদ্ব্যপেক্ষ হওয়ার অস্তিত্বশ্রব-সৌখ অনিবার্য; সুতরাং কোনরূপেই ব্যাপ্তিজ্ঞান হওয়া সম্ভব নহে। তাহা হইলে অতমানের প্রাণাত্ম্য সিদ্ধি হইতেই পারে না। এক্ষত্রে বলা যায় এই যে, তত্ত্বজ্ঞানমণ্ডিকার গবেষণ উদয়নাচার্য্যসম্মত অনৌপাধিকত্বরূপ ব্যাপ্তি-লক্ষণের ( বিশেষব্যাপ্তি গ্রন্থে ) যেসকল ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাতে অস্তিত্বশ্রব-সৌখের সম্ভাবনা নাই। উপাধির জ্ঞান ব্যাপ্তিজ্ঞানদ্ব্যপেক্ষ নহে, ইহাও গবেষণ দেখাইয়াছেন। পরন্তু ব্যাপ্তি পদার্থ নানা প্রকারে নির্ধারিত হইয়াছে। অত্মমিথির জনক ব্যাপ্তিজ্ঞান যদি আবার সেই ব্যাপ্তির জ্ঞানকেই অপেক্ষা করে, তাহা হইলেই অস্তিত্বশ্রব-সৌখ হইতে পারে। যদি উপাধি পদার্থ বুঝিতে ব্যাপ্তিজ্ঞান আবশ্যক হয়, তাহা হইলে তাহা অত্মবিধ ব্যাপ্তির জ্ঞানই বলা হইতে পারিবে। পরন্তু অনৌপাধিকত্বই যে ব্যাপ্তি পদার্থ, অত্মরূপ ব্যাপ্তির লক্ষণ বলাই যায় না, ইহা চার্ক্যক বলিতে পারেন না। ভাষ্যচর্চাশ্রব বহু বিচারপূর্বক নানা প্রকারে ব্যাপ্তির যে নিরূপিত লক্ষণ বলিয়াছেন, তাহাতে চার্ক্যকোক্ত কোন দোষের সম্ভাবনা নাই। তাৎপর্য্যটীকাকার বাচস্পতি মিশ্রের মতে অনৌপাধিকত্ব সম্বন্ধ অর্থব্যবহারে সত্যকই ব্যাপ্তি। তিনি বলিয়াছেন যে, ধূমে বহির সত্যক অনৌপাধিক বা প্রাণাত্মিক। কারণ, ঐ স্থলে কোন উপাধির উপলব্ধি হয় না। কোন স্থানেই ধূমে বহির ব্যক্তির দর্শন না হওয়ার অত্মপনভ্যমান উপাধির ও করনা করা যায় না। উপলব্ধির অগোচ্য কোন উপাধি পদার্থ সেখানে থাকিতে পারে, এই শঙ্কা সর্বত্র জন্মে বলিলে সর্বত্রই নানাবিধ অমূলক শঙ্কা কেন জন্মে না, তাহা বলিতে হইবে। অন্নভোজনাদির পরেও যখন অনেকের মৃত্যু দেখা গিয়াছে, তখন সর্বত্র প্রত্যহ অন্নভোজনাদিতেও অনর্গলকর শঙ্কা কেন জন্মে না? অন্নভোজনাদিতে ঐরূপ শঙ্কা হয় বলিলে তাহা হইতে লোকের নিবৃত্তিই হইয়া পড়ে। তাহা হইলে লোকসমাজের উচ্ছেদ হইয়া পড়ে। সুতরাং সর্বত্র অমূলক শঙ্কা জন্মে না, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য। বাচস্পতি মিশ্র এই সকল কথা বলিয়া শেষে আরও একটি কথা বলিয়াছেন যে, সংশয়নাশেরই বিশেষ ধর্ম্মের অরূপ আবশ্যক। সংশয়ের এক একটি কোটিই বিশেষ ধর্ম্ম। তাহার কোন একটির উপলব্ধি হইলে সংশয় জন্মিতে পারে না। কিন্তু পূর্বে কোন বিন তাহার উপলব্ধি থাকা আবশ্যক, নচেৎ তাহার অরূপ হইতে পারে না, অজ্ঞাত পদার্থের অরূপ জন্মে না। বিশেষ ধর্ম্মের অরূপ ব্যতীত যে কোন প্রকার সংশয়ই জন্মিতে পারে না, এ কথা পূর্বে বলা হইয়াছে। তাহা হইলে সর্বত্র উপাধির শঙ্কা কখনই সম্ভব হয় না। সুতরাং তদ্ব্যবহারে সংশয়ও অসম্ভব। বাচস্পতি মিশ্রের কথার গূঢ় তাৎপর্য্য এই যে, “এই যে উপাধিবৃত্ত কি না?” এইরূপ সংশয়ে উপাধি এবং তাহার অভাব, এই দুইটি পদার্থ কোটি। তাহার এক ভরের নিশ্চয় হইলে আর ঐরূপ সংশয় জন্মে না। সুতরাং তাহার প্রত্যেকটি ঐ স্থলে বিশেষ ধর্ম্ম। এখন ঐ উপাধিরূপ একতর কোটি বা বিশেষ ধর্ম্ম যদি কুত্র পি নিশ্চিত না হইয়া থাকে, তবে ঐ বিষয়ে সংশয় জন্মিতে না পারায় তাহার অরূপ হওয়া অসম্ভব। সুতরাং সেখানে উপাধির সংশয় হওয়া অসম্ভব। উপাধির সংশয় কল্পিতে গেলে যখন তাহার অরূপ আবশ্যক,



তখন সেখানে উপাধি পদার্থের কুরাপি নিশ্চয় না হওয়ার স্বরণ হওয়া অসম্ভব, সেখানে উপাধির সংশয় কোনরূপেই হইতে পারে না। ব্যক্তিরই হেতুতে যে উপাধি নিশ্চিত আছে, সন্দেহভুক্ত তাহার সংশয় কোন স্থলে হইতে পারিলেও ঐ সংশয় সেই হেতুতে ব্যক্তির-সংশয় সম্পাদন করিতে পারে না। যে স্থলে যাহা উপাধিলক্ষণাক্রান্তই হয় না, সেখানে তাহার সংশয় উপাধির সংশয় নহে। যদি সেই স্থলে কোন পদার্থ উপাধিলক্ষণাক্রান্ত হয় এবং অজ্ঞ তাহার নিশ্চয় হয়, তাহা হইলে সেই স্থলেও ঐ উপাধির নিশ্চয় হওয়ার ব্যক্তির নিশ্চয়ই জন্মিবে। সুতরাং সেখানে উপাধির নিশ্চয় হওয়ার তাহার সংশয় বা তদ্বৎক ব্যক্তির সংশয় অসম্ভব।

তৎপর্যটোকার বাচস্পতি মিশ্র পরে নাংখ্যক্তকৌমুদীতে অহুমান-ব্যাখ্যারম্ভে বলিয়াছেন যে, "অহুমান প্রমাণ নহে" এই কথা বলিলে চার্লস অপরের কিরূপে তাহার মত বুঝাইবেন? অজ্ঞ, সন্দিগ্ধ এবং ভ্রান্ত, এই ত্রিবিধ ব্যক্তিকে লোকে তত্ত্ব বুঝাইয়া থাকে। কিন্তু যে অজ্ঞ নহে বা সন্দিগ্ধ নহে, তাহাকে অজ্ঞ বা সন্দিগ্ধ বলিয়া অথবা ভ্রান্ত ব্যক্তিকে ভ্রান্ত বলিয়া তাহাকে বুঝাইতে গেলে, লোকনমনাজে উন্নতের ত্রায় উপেক্ষিত হইতে হয়। সুতরাং অপরের বাক্য-বিশেষ শুনিয়া, তাহার অতি প্রায়বিশেষ অহুমান করিয়া, তদ্বারা তাহার অজ্ঞতা সংশয় অথবা ভ্রমের অহুমানপূর্বক অর্থাৎ অহুমান দ্বারা অপরের অজ্ঞতাদির নিশ্চয় করিয়াই তাহাকে বুঝাইতে হয়। বস্তুতঃ বিজ্ঞগণও তাহাই করিয়া থাকেন। অহুমান বাতীত অপর ব্যক্তিগত অজ্ঞতা সংশয় বা ভ্রম লৌকিক প্রত্যক্ষের দ্বারা বুঝা অসম্ভব। এইরূপ অপরের ক্রোধ ও রেহাদিও অপরের লৌকিক প্রত্যক্ষের বিবয় হইতে পারে না, সেগুলিরও অহুমান দ্বারা নিশ্চয় হইয়া থাকে। চার্লসও পূর্বোক্ত প্রকারে তাহার প্রতিবাদী বা অপরের অজ্ঞতা প্রভৃতির অহুমান দ্বারা নিশ্চয় করিয়াই তাহাকে সম্মত বুঝাইবেন। নচেৎ তিনি অপরের অজ্ঞতাদি নিশ্চয় করিবেন কিরূপে? লৌকিক প্রত্যক্ষের দ্বারা অপর ব্যক্তিগত অজ্ঞতাদি বুঝা যায় না। চার্লস প্রত্যক্ষ ভিন্ন আর কোন প্রমাণও মানেন না। তাহা হইলে অপর ব্যক্তির অজ্ঞতাদি নিশ্চয়ের জন্ত বাধ্য হইয়া চার্লসেরও অহুমান-প্রামাণ্য অবশ্য স্বীকার্য।

বাচস্পতি মিশ্রের কথায় চার্লস বলিবেন যে, আমি অপরের বাক্য শ্রবণাদি করিয়া, তাহার অজ্ঞতাদির সম্ভাবনা করিয়াই তাহাকে বুঝাইয়া থাকি। অপরের বুঝাইতে তাহার অজ্ঞতাদির নিশ্চয় আমার আবশ্যক কি? সুতরাং ঐ নিশ্চয়ের জন্ত অহুমানের প্রামাণ্য স্বীকার করিতে আমি বাধ্য নহি। এতদ্বারা বক্তব্য এই যে, চার্লস যদি অপরের অজ্ঞ বা ভ্রান্ত বলিয়া সম্ভাবনা করিয়া অর্থাৎ অপরের অজ্ঞতা বা ভ্রান্তির বিষয়ে সংশয় রাখিয়াও তাহাকে অজ্ঞ বা ভ্রান্ত বলিয়া তাহার অনিশ্চিত অজ্ঞতা বা ভ্রম দূর করিতে উদ্যত হন, তাহা হইলে তিনি সত্যনামে নিশ্চিত ও উপেক্ষিত হইয়া পড়েন। যাহাকে অজ্ঞ বা ভ্রান্ত বলিয়া নিশ্চয় জন্মে নাই, তাহাকে অজ্ঞ বা ভ্রান্ত বলা কোন বুদ্ধিমানের কর্তব্য নহে। আর যদি চার্লস অপরের অজ্ঞতা বা ভ্রম নিশ্চয় করিতে পারেন না, ইহা নিজেই স্বীকার করেন, তাহা হইলে সেই অপর ব্যক্তি অজ্ঞ বা ভ্রান্ত নাও হইতে পারেন। তাহার মতও সত্য হইতে পারে, ইহাও এক পক্ষে চার্লসের মানিয়া লইতে হয়।



তাহা হইলে তিনি যে নিজের মতটিকেই অস্বাস্ত্র সত্য বলিয়া অপরকে বলিয়া থাকেন, তাহাও বলিতে পারেন না। তাহা বলিতে গেলেই অপর ব্যক্তিকে ভ্রান্ত বলিয়া নিশ্চয়ই করিতে হয়। বস্তুতঃ চার্লসও তাহাই করিয়া থাকেন। তিনি অপরের অজ্ঞতা বা ভ্রম বিষয়ে নিশ্চয়াদিক জানপূর্বকই তাহাকে নিজমত বুঝাইয়া থাকেন। তাহার ঐ নিশ্চয় অনুমান ব্যতীত হইতে পারে না। তবে অনেক স্থলে তিনিও অনুমানভাসের দ্বারা ভ্রম অনুমিতি করিয়া থাকেন। অপরের অজ্ঞতাদি বিষয়ে ভ্রম নিশ্চয়ও তাহার জন্মিয়া থাকে। তাহার ফলেও তিনি অপরকে ভ্রান্ত বলিয়া নিজ মত বুঝাইয়া থাকেন। কিন্তু তিনি অপরের অজ্ঞতাদি বিষয়ে সংশয় রাখিয়া যদি অপরকে অজ্ঞ বা ভ্রান্ত বলেন, তাহা হইলে তাহাকে সভ্যসমাজ কিছুতেই ক্ষমা করিতে পারেন না। বস্তুতঃ চার্লসও সর্বত্র অপরের বাক্য শ্রবণাদি করিয়া তাহার অজ্ঞতাদির নিশ্চয়ই করিয়া থাকেন। যদি কেহ বলে যে, “আমি নিত্য”, তাহা হইলে কি চার্লসও তাহার নিজ মতানুসারে তাহাকে ভ্রান্ত বলিয়া নিশ্চয়ই করেন না? যদি কেহ বলে যে, “আমি ইহা বুঝিতে পারি না” অথবা “আমি বুঝি যে, এই দেহই চিরস্থায়ী নিত্য পদার্থ”, তাহা হইলে কি চার্লসও তাহাকে অজ্ঞ বা ভ্রান্ত বলিয়া নিশ্চয়ই করেন না? চার্লসের ঐ নিশ্চয় অনুমানপ্রমাণহীন। প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারা তিনি ঐ নিশ্চয় করিতে পারেন না। সুতরাং ইচ্ছা না থাকিলেও বাধ্য হইয়া চার্লসের অনুমান-প্রমাণ স্বীকার্য।

তদুচিত্তামণিকার গদ্যেও বাচস্পতি মিশ্রের কথিত যুক্তির উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, যদিও বা ভ্রান্ত ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিয়াই চার্লসও অনুমান অপ্রমাণ, এই কথা বলিয়া থাকেন। যাহার ঐ বিষয়ে কোন সংশয় বা ভ্রম তিনি বুঝেন না, অর্থাৎ যে ব্যক্তি ঐ বিষয়ে চার্লসের সহিত একমত, তাহাকে ঐ কথা বলা চার্লসের নিশ্চয়োজ্ঞান। গদ্যে শেষে আরও বলিয়াছেন যে, অনুমানের প্রামাণ্য না থাকিলে প্রত্যক্ষেরও প্রামাণ্য থাকে না। কারণ, প্রত্যক্ষের যে প্রামাণ্য আছে, তাহাও অনুমানের দ্বারাই নিশ্চয় করিতে হইবে। চার্লসও কি তাহার সমস্ত প্রত্যক্ষ প্রামাণ্যকে প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন? তাহা কখনই সম্ভব নহে। যুক্তি দ্বারাই তাহা বুঝিতে হয়। চার্লসও তাহাই বুঝিয়া প্রত্যক্ষের প্রামাণ্য নিশ্চয় করিয়া থাকেন। তাহা হইলে অনুমানের প্রামাণ্য তাহারও স্বীকার্য। এবং অনুমান অপ্রমাণ, ইহা প্রতিপন্ন করিতেও বস্তুতঃ চার্লসও যুক্তিকেই আশ্রয় করিয়াছেন, তখন অনুমানের অপ্রামাণ্যসাধনে অনুমানই অবলম্বিত হওয়ায় “অনুমান অপ্রমাণ” এ কথা চার্লসও বলিতেই পারেন না। উদ্যোতকর এই কথাটাই প্রধানরূপে উল্লেখ করিয়াছেন। প্রথমে তাহার কথা বলিয়াছি। বৌদ্ধসম্প্রদায় চার্লসের আপত্তি নিরাস করিতে বলিয়াছেন যে, ব্যাপ্তি-নিশ্চয়ের উপায় আছে। কোন স্থলে কার্যকারণতাব-প্রযুক্ত ব্যাপ্তি থাকে এবং কোন স্থলে তাৎপর্য বা অভেদ সম্বন্ধপ্রযুক্ত ব্যাপ্তি থাকে। সুতরাং কোন স্থলে কার্যকারণ ভাবের জ্ঞানের দ্বারা, কোন স্থলে অভেদ সম্বন্ধ জ্ঞানের দ্বারা ব্যাপ্তিনিশ্চয় হয়। তাহারাই এই কথাই বলিয়াছেন,—

“কার্যকারণতাবাবা স্বভাবাবা নিরামকাং।

অবিনাশাবিনিরমোহদর্শনান্ন ন দর্শনাং ॥”\*

\* তাৎপর্যসীতার বাচস্পতি মিশ্র এই বৌদ্ধধর্মিক উদ্ধৃত করিয়া বৌদ্ধমতে কার্যকারণতাব ও স্বভাব,



কার্যাকারণতাব অথবা স্বভাব, এই দুইটিই অবিনা তাব অর্থাৎ ব্যাপ্তির নিয়ামক, তৎপ্রযুক্তই ব্যাপ্তির নিয়ম, অর্শনপ্রযুক্ত নহে এবং দর্শনপ্রযুক্ত নহে। অর্থাৎ সাধ্যশূন্য স্থানে হেতুর অর্শন এবং সাধ্যশূন্য স্থানে হেতুর দর্শন, এই উভয় কারণই যে হেতুতে সাধ্যের ব্যাপ্তি নিশ্চয় হয়, ইহা নহে। তাহা বলিলে সাধ্যশূন্য স্থানদ্বয়ে হেতু আছে কি না, ইহা দেখা বা বুঝা অসম্ভব বলিয়া কোন দিনও কোন পদার্থে ব্যাপ্তিনিশ্চয় সম্ভব হয় না, সুতরাং চার্বাকেরই জয় হয়। কিন্তু যে দুইটি পদার্থের কার্যাকারণতাব আছে, তদ্ব্যবহায়ে কার্য পদার্থটি যেখানে থাকিলে, তাহার কারণ পদার্থটি সেখানে থাকিবেই। কারণশূন্য স্থানে কার্য থাকিতে পারে না, ইহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। তাহা হইলে ঐ কার্যাকারণতাব জ্ঞানের দ্বারাই সেখানে কার্য পদার্থে কারণের ব্যাপ্তিনিশ্চয় করা যায়। যেমন বহি ব্যতীত ধূম জন্মিতে পারে না, বহি থাকিলেই ধূম হয়, বহি না থাকিলে ধূম হয় না, এইরূপ অদ্বয় ও ব্যতিরেকবশতঃ ধূম ও বহির কার্যাকারণতাব নিশ্চয় হওয়ায় তৎপ্রযুক্ত ধূমে বহির ব্যাপ্তিনিশ্চয় হয়।

এইরূপ কোন কোন স্থলে স্বভাবই ব্যাপ্তির নিয়ামক। "স্বভাব" বলিতে এখানে ভাস্কর্য বা অস্ত্রের সম্বন্ধ। উহার জ্ঞানপ্রযুক্ত কোন স্থলে ব্যাপ্তির নিশ্চয় হয়। যেমন শিংশপা বৃক্ষ-বিশেষ। শিংশপা ও বৃক্ষে অস্ত্রের সম্বন্ধ থাকার শিংশপা ও বৃক্ষেরও অস্ত্রের সম্বন্ধ আছে। কারণ, শিংশপাও শিংশপা হইতে ভিন্ন পদার্থ নহে; বৃক্ষও বৃক্ষ হইতে কোন ভিন্ন পদার্থ নহে। ধর্ম ও ধর্মী বস্তুতঃ অভিন্ন পদার্থ। সুতরাং শিংশপা ও বৃক্ষ অভিন্ন পদার্থ হইলে শিংশপা ও বৃক্ষেরও অভিন্ন পদার্থ হইবে। এই অভিন্নবশতঃই শিংশপাও বৃক্ষের ব্যাপ্তি আছে। ঐ অভিন্নজ্ঞানপ্রযুক্ত শিংশপাও বৃক্ষের ব্যাপ্তি নিশ্চয় হইলে ঐ শিংশপাও হেতুর দ্বারা শিংশপাতে বৃক্ষের অন্বেষণ হয়। কলকথা, পূর্বোক্ত কার্যাকারণতাব অথবা পূর্বোক্ত স্বভাব বা ভাস্কর্য নিবন্ধনই ব্যাপ্তিনিশ্চয় হয়। আর কোন উপায়ে ব্যাপ্তিনিশ্চয় হয় না, হইতে পারে না। পূর্বোক্ত কার্যাকারণতাব অথবা স্বভাব ব্যাপ্তির নিয়ামক ও গ্রাহক হইলে ব্যাপ্তিনিশ্চয়ের কোনই বাধা হইতে পারে না। কারণ, ঐ উভয় স্থলে কোনভাবেই ব্যতিরেক সংশয় হইতে পারে না। ধূম ও বহির কার্যাকারণতাব বুদ্ধিলে বহিরূপ কারণশূন্য স্থানে ধূমরূপ কার্য জন্মিবে, এইরূপ আশঙ্কা কখনই হইতে পারে না। কারণ ব্যতীত কার্য জন্মিতে পারে না। ধূম কার্যে বহি

এই উক্ত্যকেই ব্যাপ্তির নিয়ামক বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু অনুপলব্ধির দ্বারাও অনুমান হয়, ইহাও কোন বোধকর বাক্য নয়। দ্বিবিধ্যার বোধ নৈরাসিক ধর্মকীর্ণি উহার "ভাস্কর্য" গ্রন্থে "স্বভাব," "কার্য" ও "অনুপলব্ধি," এই তিন প্রকার অনুমানের হেতু বলিয়াছেন। (১) স্বভাবের উদাহরণ—এইটি বৃক্ষ, যেহেতু ইহা শিংশপা। (২) কার্যের উদাহরণ—ইহা বহিমান, যেহেতু ইহাতে ধূম আছে। (৩) অনুপলব্ধির উদাহরণ—এখানে ধূম নাই, যেহেতু ভাস্কর্য উপলব্ধ হইতেছে না। এই অনুপলব্ধি প্রকাশের প্রকার কথিত হইয়াছে। বাক্য—(১) স্বভাবানুপলব্ধি, (২) কার্যানুপলব্ধি, (৩) ব্যাপ্ত্যানুপলব্ধি, (৪) স্বভাববিশ্লেষণানুপলব্ধি, (৫) বিশুদ্ধকার্যোপলব্ধি, (৬) বিশুদ্ধ-ব্যাপ্ত্যানুপলব্ধি, (৭) কার্যবিশ্লেষণানুপলব্ধি, (৮) ব্যাপ্তিবিশ্লেষণানুপলব্ধি, (৯) কার্যানুপলব্ধি, (১০) কারণবিশ্লেষণানুপলব্ধি, (১১) কারণবিশুদ্ধ কার্যোপলব্ধি। ইহাবিশেষের উদাহরণ মূল গ্রন্থে স্তম্ভে।



অজ্ঞতম কারণ, ইহা স্বীকার করিবার উপায় নাই। এইরূপ শিংশপা হইলেও তাহা বৃক্ষ ভিন্ন আর কিছু হইবে, এইরূপ আশঙ্কাও কখনই হইতে পারে না। কারণ, বৃক্ষবিশেষই শিংশপা। বৃক্ষ নহে, কিন্তু শিংশপা, ইহা কিছুতেই হইতে পারে না। শিংশপা যদি বৃক্ষ না হয়, তবে তাহা নিজের স্বভাব বা আত্মাকেই ত্যাগ করে, অর্থাৎ তাহা হইলে উহা শিংশপাই হয় না। সুতরাং স্বভাব বা আত্মা নিবন্ধন ব্যাপ্তিনিষ্ঠর হলেও ব্যক্তির সংশয়ের কোন অবকাশই নাই। তাহা হইলে পূর্বোক্ত কার্যাকারণ ভাব (তত্ত্বপন্থি) অথবা স্বভাব (তাদাত্ম্য) নিবন্ধন ব্যাপ্তিনিষ্ঠরত্বই অস্বীকার হইতে পারে এবং কথ্য: এই দুইটিই ব্যাপ্তির স্বরূপ। সুতরাং সর্বত্র ব্যক্তির সংশয় হওয়ার কুপ্রাপি ব্যাপ্তিনিষ্ঠর হইতে পারে না বলিয়া অনুমান অপ্রমাণ, চার্লসকের এই কথা অযুক্ত।

বৌদ্ধ সম্প্রদায় পূর্বোক্ত প্রকারে জ্ঞানার্চাচরণের পক্ষ সমর্থন করিলেও তাঁহাদিগের সিদ্ধান্ত দুই বসিয়া জ্ঞানার্চাচরণ ঐ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন নাই। শ্রীমদ্ব্যচক্ষুশ্রুতি মিত্র, উদয়নাচার্য, শ্রীধরনাচার্য, জয়ন্ত ভট্ট, বদদরাজ প্রভৃতি আচার্যগণ ভূরি প্রতিবাদপূর্বক ঐ সিদ্ধান্তের খণ্ডন করিয়াছেন। সে প্রতিবাদের সংক্ষিপ্ত সার কথা এই যে, বৌদ্ধ সম্প্রদায় ব্যাপ্তিমূলক “তর্ক”কে আশ্রয় না করিলে কার্যাকারণভাব নিশ্চয় করিতে পারেন না। বহির্বিধূমের কারণ, সম্বন্ধিত থাকিয়াও গর্ভিত প্রকৃতি ধূমের কারণ নহে, ইহা বুঝিতে হইলে যে তর্ক আশ্রয়ণীয়, তাহা ব্যাপ্তিমূলক, সুতরাং ব্যাপ্তিনিষ্ঠরে ব্যাপ্তির নিশ্চয়ের অপেক্ষা নিহত হইলে আত্মাশ্রয় ও অনবহাদোষ অনিবার্য। সুতরাং তাঁহাদিগের সিদ্ধান্তে চার্লসকের আপত্তি নিরাস কিছুতেই হইতে পারে না। পরন্তু শিংশপাও বৃক্ষের অন্তর্য পদার্থ নহে। তাহা হইলে বৃক্ষের জ্ঞান শিংশপাও সর্বত্রকে আছে, ইহা স্বীকার করিতে হয় এবং বৃক্ষের হেতুর দ্বারা বৃক্ষান্তরে শিংশপাওর অনুমানও যথার্থ বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। যদি বল যে, আমরা তাদাত্ম্য বলিয়া অত্যন্ত অভেদ বলি নাই। সামান্য বিশেষভাবে সেই পদার্থবিশেষের জ্ঞেয় থাকিবে। বৃক্ষের সামান্য, শিংশপাও বিশেষ। ঐ বিশেষ জ্ঞানজনক যেখানে সামান্য জ্ঞানরূপ অস্বীকারি হয়, সেখানে পূর্বোক্ত স্বভাব বা তাদাত্ম্যই ব্যাপ্তির নিয়ামক, ইহাই আমরা বলি। এতদ্বারা বলা হইয়াছে যে, তাহা হইলে ঐ স্থলে বৃক্ষের অনুমান হইতে পারে না। কারণ, বিশেষ জ্ঞান সামান্য-জ্ঞানপূর্বক। বিশেষ ধর্মটি নিশ্চিত হইয়াছে, কিন্তু সামান্য ধর্মটি অনিশ্চিত আছে, ইহা কখনই সম্ভব নহে। বৃক্ষের অনুমানের পূর্বে যে সময়ে শিংশপাও নিশ্চয় হইবে, তখন বৃক্ষরূপ সামান্য ধর্মের নিশ্চয়ও অবশ্য সেখানে থাকিবে। সুতরাং অনুমানের পূর্বেই বৃক্ষের নিশ্চয় হওয়ার তাহা অনুমান হইতে পারে না। পরন্তু ব্যাপ্তি, সম্বন্ধবিশেষ, তির পদার্থেই ঐ সম্বন্ধ থাকিতে পারে। পদার্থবিশেষের তাদাত্ম্য বা অভেদ সম্বন্ধ থাকিলে, সেখানে ব্যাপ্তিরূপ সম্বন্ধ থাকিতে পারে না। অন্তর্য পদার্থ কখনও সাধ্য ও সাধক হইতে পারে না। বাহ্য কোন নাথের সাধক হইবে, তাহা ঐ সাধ্য পদার্থ হইতে তির পদার্থই হইবে।<sup>১</sup> পরন্তু যেখানে কার্যাকারণভাবও নাই, স্বভাব বা তাদাত্ম্যও নাই, এমন স্থলেও

১। শ্রীমদ্ব্যচক্ষুশ্রুতি মিত্র প্রভৃতি প্রাচীনগণ ঐরূপ বলিলেও নব্য নৈরাসিক হুনাথ দিয়োরশি কিন্তু অন্তর্য পদার্থের বিস্তারিত ব্যাখ্যা আশঙ্কিত ভাবে সমর্থন করিয়াছেন এবং তিনি সেখানে অভেদ সম্বন্ধে শিংশপাওই ব্যাখ্যা



ব্যাপ্তিনিশ্চয়কর অহুমিতি ইহা থাকে। যেমন রসের উপলব্ধি করিয়া রসবিশিষ্ট জব্যে অন্ধের রূপের অহুমিতি ইহা থাকে। যে যে জব্যে রস আছে, তাহাতে রূপ আছে, এইরূপে রসপদার্থে রূপের ব্যাপ্তিনিশ্চয় হওয়ার, তৎকল্প সংকারবশতঃ ঐ ব্যাপ্তির স্বরূপ হইলে তখন রসহেতুক রূপের অহুমিতি হয়। কিন্তু রস, রূপের কার্য নহে; রস ও রূপে কার্যকারণতাব নাই এবং রূপ ও রস অভিন্ন পদার্থও নহে। বৌদ্ধদশম্প্রদায় তাঁহাদিগের কল্পনামুদারেও রসকে রূপের কার্য বলিতে পারেন না; কারণ, রস ও রূপ সমকালীন পদার্থ। কার্যোৎপত্তির পূর্বে কারণ থাকা আবশ্যক, নতঃ তাহা কারণই হয় না। রস ও রূপ যখন গোশৃঙ্গদ্বয়ের দ্বারা এক সময়েই উৎপন্ন হয়, তখন রূপ, রসের কারণ হইতে পারে না। রূপ ও রস অভিন্ন পদার্থ, ইহাও বলা যায় না। কারণ, তাহা হইলে অল্প ব্যক্তি যখন রস গ্রহণ করে, তখন সে রূপ গ্রহণও করে, ইহা স্বীকার করিতে হয়। রূপ যখন রসনাগ্রাহক নহে, তখন তাহা রসগ্রাহক বস্তু হইতে পারে না। সুতরাং পূর্বোক্ত বৌদ্ধ-সিদ্ধান্তানুসারে রসে রূপের ব্যাপ্তিনিশ্চয় হইতে না পারার পূর্বোক্ত প্রকার অহুমান কিছুতেই হইতে পারে না। বস্তুতঃ তাহা ইহা থাকে। এইরূপ আরও বহু বহু স্থল আছে, দেখানে পদার্থদ্বয়ের কার্যকারণতাবও নাই, স্বভাব বা অভেদও নাই, কিন্তু সেই পদার্থদ্বয়ের সাধ্যসাধনতাব আছে। তাহার এক পদার্থে ব্যাপ্তিনিশ্চয়কর তদ্বারা অপর পদার্থের অহুমান ইহা থাকে, ইহা স্বীকার করিবার উপায় নাই। সুতরাং কার্যকারণতাব অথবা স্বভাব, এই দুইটিমাত্রই ব্যাপ্তির নিয়ামক, ইহা কিছুতেই বলা যায় না। বস্তুতঃ কণিকদ্বাবী বৌদ্ধদশম্প্রদায় কার্যকারণতাবেরও উপপত্তি করিতে পারেন না। সুতরাং তাঁহাদিগের পূর্বোক্ত সিদ্ধান্ত কোনরূপেই উপপন্ন হইতে পারে না। অতএব বলিতে হইবে যে, নিরন্তরসদৃশ অহুমানের অর্থ। স্বাভাবিক সদৃশই নিরন্তরসদৃশ। ধূমের বহির সহিত সদৃশ স্বাভাবিক। ধূমের স্বভাবই এই যে, সে বহিঃসদৃশ ছাড়িয়া থাকিতে পারে না। কিন্তু ধূমের সহিত বহির সদৃশ স্বাভাবিক নহে। কারণ, ধূমশূন্য স্থানেও বহির উপলব্ধি ইহা থাকে। যে সময়ে বহির সহিত আর্দ্র কার্ত্তির সদৃশ হয়, তখনই ধূমের সহিত বহির সদৃশ হয়। সুতরাং ধূমের সহিত বহির সদৃশ ঐ আর্দ্র কার্ত্তিরূপ উপাধিজনিত, সুতরাং উহা স্বাভাবিক নহে, সে অল্প উহা নিরন্তরসদৃশ নহে। ধূমের বহির সহিত সদৃশ স্বাভাবিক। কারণ, দেখানে কোন উপাধির উপলব্ধি হয় না। কোন স্থানেই ধূমে বহির ব্যক্তিরূপের দর্শন না হওয়ার অহুপলভ্যমান উপাধিরও কল্পনা করা যায় না। অতএব নিরন্তরসদৃশই অহুমানের অর্থ। ব্যক্তিরূপের অজ্ঞান ও সহচরজ্ঞান তাহার গ্রাহক।

এক বুদ্ধকেই তাহার ব্যাপক বলিয়াছেন। শিশুপায়রূপে শিশুপায় বুদ্ধরূপে তুকের অভেদ সম্বন্ধে ব্যাপ্তিনিশ্চয় হয়। একেপের “তৎকল্পস্বরূপ” ব্যাপ্তিসিদ্ধান্তলক্ষণ-বীমিতি ত্রিহা।

১। তথাহি ধূমাবীনাং বহ্যাবিসদৃশঃ স্বাভাবিকঃ, নহুঃ বহ্যাবীনাং ধূমাবিতিঃ, তে হি বিনাশি ধূমাবিস্তিরূপ-  
নভাভে। যদা বহ্যেবকনাবিসদৃশমুভবতি, তদা ধূমাবিতিঃ সহ সম্ব্যভে। তস্মাদ্ধূমাবীনাং বহ্যেবকনাবিস্তিরূপ-  
নভাভে ন স্বাভাবিকঃ, ততো ন নিরন্তরঃ। স্বাভাবিকস্ত ধূমাবীনাং বহ্যাবিসদৃশ উপাধেঃসুপলভ্যমানত্বাৎ। কতি-  
ব্যক্তিরূপের অজ্ঞান ও সহচরজ্ঞান তাহার গ্রাহক। —তাৎপর্യാঙ্গীকা, ১ম, ২ পৃষ্ঠ।



তৎপৰ্য্যটিকাঙ্কার বাচস্পতি মিশ্র পুৰ্ণোক্তরূপে বোদ্ধমত খণ্ডন করিয়া স্বাভাবিক সম্বন্ধকেই ব্যাপ্তি বলিয়াছেন। কিন্তু ভবচিন্তামণিকার মহানৈরাসিক গবেশ উপাধ্যায় স্বাভাবিক সম্বন্ধ ব্যাপ্তি নহে, ইহা বলিয়াছেন। তিনি পুৰ্ণাচার্য্যগণের কথিত বহুবিধ ব্যাপ্তি-লক্ষণের উল্লেখপূৰ্ব্বক বহু বিচারদ্বারা তাহাতে যৌথ প্রদর্শন করিয়া নির্দোষ ব্যাপ্তিলক্ষণ বলিয়াছেন। কিন্তু গবেশ "বিশেষব্যাপ্তি" গ্রন্থে উদয়নাচার্য্যোক্ত "অনৌপাদিক"রূপ ব্যাপ্তিলক্ষণের পরিচয় করিয়া ব্যাখ্যা করায়, তদনুসারে তাহার ব্যাখ্যাত ঐ লক্ষণও তাহার মতে নির্দোষ বলিয়া বুঝা যাইতে পারে। তাহা হইলে বাচস্পতি মিশ্র যে অনৌপাদিক সম্বন্ধ বা স্বাভাবিক সম্বন্ধকে ব্যাপ্তি বলিয়াছেন, তাহা গবেশের ব্যাখ্যাত অনৌপাদিক বুলিলে, উহাও নির্দোষ হইতে পারে। সে যাহাই হউক, ব্যাপ্তির স্বরূপ যিনি যাহাই বলুন, ব্যাপ্তি যে অহুমানের অঙ্গ, ইহা সৰ্ব্বসম্মত। প্রভাকর প্রভৃতি নীমাংসকগণ ভূয়োদর্শনকে ব্যাপ্তির নিশ্চায়ক বলিয়াছেন, কিন্তু গবেশ বহু বিচারপূৰ্ব্বক ঐ মতের খণ্ডন করিয়াছেন। গবেশ বলিয়াছেন, ব্যক্তির অজ্ঞান সহিত সহচারজ্ঞানই ব্যাপ্তির গ্রাহক। সৰ্ব্বত্র ব্যক্তির সংশয় জন্মে না; যেখানে ঐ সংশয় জন্মে, সেখানে অহুকুল তর্কের দ্বারা তাহার নিবৃত্তি হয়। সুতরাং ব্যাপ্তিনিশ্চয় অসম্ভব নহে। জীবনাত্মই ব্যাপ্তিনিশ্চয়প্রযুক্ত অহুমানের দ্বারা লোকযাত্রা নির্বাহ করিতেছে। অহুমানের প্রামাণ্য না থাকিলে লোকযাত্রার উচ্ছেদ হইত। চার্কাক "অহুমান অগ্রমাণ" এ কথা মুখে বলিলেও বস্তৃতঃ তিনিও অহুমানের প্রামাণ্য স্বীকার করেন। লোকযাত্রানির্বাহের জন্য বহু বহু অপ্রত্যক্ষ পদার্থের যে নিশ্চয়্যাক জ্ঞান আবশ্যক হইতেছে, তাহা বহু স্থলেই অহুমানপ্রমাণের দ্বারা হইতেছে। সৰ্ব্বত্র ঐ সকল বিষয়ে সম্ভাবনারূপ সংশয়াক জ্ঞানই জন্মে এবং তদ্বারাই লোকযাত্রা নির্বাহ হয়, ইহা সত্য নহে। সত্যের অণুলাপ না করিলে চার্কাকেরও ইহা স্বীকার্য্য। চার্কাকের মতে ঐ সকল স্থলে সম্ভাবনারূপ সংশয়ও যে জন্মিতে পারে না, ইহাও উদয়ন প্রভৃতির কথাছারে পূৰ্ণে বলিয়াছি। মূলকথা, অহুমানের অপ্রামাণ্যরূপ পূৰ্ব্বগত কোনরূপেই সমর্থন করা যায় না। উহা সমর্থন করিতে গেলে অহুমান-প্রমাণকেই আশ্রয় করিতে হয়। বাহা অহুমান নহে, তাহাতে ব্যক্তির দেখাইয়া অহুমানের অপ্রামাণ্য সাধন করা যায় না। বাহা প্রকৃত অহুমান, তাহাতে ব্যক্তির নাই। সুতরাং "অহুমান অগ্রমাণ" এই পূৰ্ব্বগতের সাধক নাই। ৩৮।

অহুমান-পদার্থপ্রকরণ সমাপ্ত। ৫।

ভাষ্য। ত্রিকালবিষয়মহুমানং ত্রৈকাল্যগ্রহণাদিত্যুক্তমাত্র চ—

অনুবাদ। (অনুমান-প্রমাণের দ্বারা) ত্রিকালীন পদার্থের জ্ঞান হয়, এ জ্ঞান অনুমান ত্রিকালীন পদার্থবিষয়ক, ইহা বলা হইয়াছে, কিন্তু এই কালত্রয়ের মধ্যে—

সূত্র। বর্তমানাভাবঃ পততঃ পতিতপতিতব্য-

কালোপপত্তেঃ ॥ ৩৯ ॥ ১০০ ॥



অনুবাদ। (পূর্বপক্ষ) বর্তমান কাল নাই, যেহেতু পতনবিশিষ্টের পতিত ও পতিতব্য কালের উপপত্তি আছে [ অর্থাৎ বৃক্ষ হইতে যখন ফল পতিত হয়, তৎকালে তাহার পতনের অতীত কাল ও ভবিষ্যৎকালই উপপন্ন হওয়ায় বর্তমান কাল নাই ]।

ভাষ্য। বৃক্ষাং প্রচ্যুতস্ত ফলস্ত ভূমৌ প্রত্যাদীনতো বদুর্জং, স পতিতোহধ্বা, তৎসংযুক্তঃ কালঃ পতিতকালঃ। যোহধ্বস্তাং স পতিতব্যো-  
হধ্বা, তৎসংযুক্তঃ কালঃ পতিতব্যকালঃ। নেদানীং তৃতীয়োহধ্বা বিদ্যতে,  
যত্র পততীতি বর্তমানঃ কালো গৃহ্যেত, তস্মাদ্ভবর্তমানঃ কালো ন  
বিদ্যত ইতি।

অনুবাদ। বৃক্ষ হইতে প্রচ্যুত হইয়া ভূমিতে প্রত্যাপন্ন হইতেছে, এইরূপ ফলের যাহা উর্দ্ধদেশ, তাহা পতিত দেশ, তাহার সহিত সংযুক্ত কাল পতিত কাল। যাহা অধোদেশ, তাহা পতিতব্য দেশ, তাহার সহিত সংযুক্ত কাল পতিতব্য কাল। এখন তৃতীয় অধ্বা অর্থাৎ পূর্বোক্ত ফলের উর্দ্ধ ও অধঃস্থান ভিন্ন তৃতীয় কোন স্থান বা দেশ নাই, যাহা থাকিলে “পতিত হইতেছে” এইরূপে বর্তমান কাল গৃহীত হইতে পারে; অতএব বর্তমান কাল নাই।

টিপ্পনী। পূর্বপক্ষে মহর্ষি যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে অহুমান ত্রিকালীন পদার্থবিষয়ক, ইহা সূচিত হইয়াছে; ভাষ্যকার প্রথমাধ্যায়ে অহুমান-লক্ষণ-সূত্র-ভাষ্যেও অহুমানের ত্রিকালীন পদার্থবিষয়ক বলিয়া আদিরাছেন। মহর্ষি অহুমানের লক্ষণ পরীক্ষার দ্বারা অহুমান পরীক্ষা করিয়া, অহুমানের বিষয় পরীক্ষার দ্বারাও অহুমান পরীক্ষা করিতে এই সূত্রের দ্বারা পূর্বপক্ষ প্রকাশ করিয়াছেন। ভাষ্যকার এই পরীক্ষার অবতারণা করিতে প্রথমে বলিয়াছেন যে, অহুমান ত্রিকালবিষয় অর্থাৎ ত্রিকালীন বা ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান, এই কালত্রয়বর্ষী পদার্থই অহুমানের বিষয় হয়, ইহা বলা হইয়াছে। মহর্ষি পরসূত্রের দ্বারা ইহাতে পূর্বপক্ষ বলিয়াছেন যে, বর্তমান কাল নাই, সুতরাং অহুমান ত্রিকালীন পদার্থবিষয়ক, এই কথা বলা যাইতে পারে না। বর্তমান কাল নাই কেন? ইহা বুঝাইতে মহর্ষি হেতু বলিয়াছেন যে, যাহা পতিত হইতেছে, সেই ফলটির সম্বন্ধে পতিত কাল ও পতিতব্য কালেরই উপপত্তি (জ্ঞান) হয়, বর্তমান কালের জ্ঞান হয় না। ভাষ্যকার সূত্রার্থ বর্ণন করিতে বলিয়াছেন যে, বৃক্ষ হইতে প্রচ্যুত হইয়া যে ফলটি ভূমিতে প্রত্যাপন্ন অর্থাৎ ক্রমশঃ ভূমির নিকটবর্তী হইতেছে, তাহার উর্দ্ধ স্থান অর্থাৎ ঐ ফল হইতে উর্দ্ধগত বৃক্ষ পর্যন্ত স্থানকে পতিত অধ্বা বলে। ঐ ফল হইতে নিম্নস্থ ভূমি পর্যন্ত অধঃস্থানকে পতিতব্য অধ্বা বলে। ঐ পতিত অধ্বার সহিত সংযুক্ত কালকে অর্থাৎ যে কালে ঐ উর্দ্ধদেশে ফলের পতন হইয়াছে, ঐ কালকে সূত্রে বলা হইয়াছে “পতিত কাল”। এবং

পূর্বোক্ত পতিতব্য অক্ষার সহিত সংযুক্ত কালকে অর্থাৎ যে কালে ঐ অধোদেশে ফলের পতন হইবে, সেই কালকে সূত্রে বলা হইয়াছে পতিতব্য কাল। পূর্বোক্ত পতিত অক্ষা ও পতিতব্য অক্ষা ভিন্ন তৃতীয় কোন অক্ষা না থাকায়, পূর্বোক্ত কালব্যয়তির বর্তমান কাল নামে কোন কালের জ্ঞানের সম্ভাবনা নাই। বর্তমান কালের ব্যয়ক বা গ্রাহক না থাকায় বর্তমান কালের জ্ঞান হয় না, সুতরাং বর্তমান কাল নাই। পূর্বপক্ষবাদীর বিবক্ষা এই যে, বৃক্ষ হইতে “ফল পতিত হইতেছে” এইরূপ বলিলে যে ঐ পতনক্রিয়ার বর্তমান কাল বুঝা যায়, ইহা ঠিক নহে। কারণ, ঐ ফলটি বৃক্ষ হইতে প্রচ্যুত হইলে যে স্থান পর্যন্ত তাহার পতন হইয়াছে, সেই উচ্চ স্থানে তাহার পতন অতীত। এবং ভূমি পর্যন্ত নিম্ন স্থানে তাহার পতন ভবিষ্যৎ। বর্তমান পতন বেধানে নাই। সুতরাং পূর্বোক্ত পতন এবং ঐরূপ সমন্বিত ক্রিয়া হলেও বর্তমান কাল বুঝা যায় না; অতীত ও ভবিষ্যৎ কালই বুঝা যায়, তদন্তির বর্তমান কাল নাই। বর্তমান কাল অলীক হইলে তাহার অভাবেরও জ্ঞান হইতে পারে না; সুতরাং বর্তমান কালের অভাবও বলা যায় না, এ জন্য “বর্তমান কালের অভাব” এই কথা দ্বারা বুঝিতে হইবে, অতীত ও ভবিষ্যৎভিন্ন পদার্থে কালব্ধের অভাব। মূল কথা, যদি অতীত ও ভবিষ্যৎ কাল ভিন্ন তৃতীয় আর কোন কালের অস্তিত্ব না থাকে, তাহা হইলে অসম্মান ত্রিকালীন পদার্থবিষয়ক, এই কথা কোনরূপেই বলা যায় না। ৩৯।

## সূত্র। তয়োরপ্যভাবো বর্তমানাভাবে

তদপেক্ষত্বাৎ ॥৪০॥১০১ ॥

অমুবাদ। (উক্তর) বর্তমান কালের অভাব হইলে সেই কালব্যয়েরও অর্থাৎ পূর্বোক্ত অতীত ও ভবিষ্যৎ কালেরও অভাব হয়। কারণ, তদপেক্ষত্ব অর্থাৎ অতীত ও ভবিষ্যৎকালে বর্তমান-কাল-সাপেক্ষতা আছে।

ভাষ্য। নান্দ্রব্যন্ত্যঃ কালঃ, কিং তর্হি, ক্রিয়াব্যন্ত্যঃ পততীতি। যদা পতনক্রিয়া ব্যুপরতা ভবতি স কালঃ পতিতকালঃ। যদোৎপৎস্রতে স পতিতব্যকালঃ। যদা দ্রব্যো বর্তমানা ক্রিয়া গৃহ্যতে স বর্তমানঃ কালঃ। যদি চায়ং দ্রব্যো বর্তমানঃ পতনং ন গৃহ্ণাতি, কস্তোপরমমুৎপৎস্রমানতাং বা প্রতিপদ্যতে। পতিতঃ কাল ইতি ভূতা ক্রিয়া, পতিতব্যঃ কাল ইতি চোৎপৎস্রমানা ক্রিয়া। উভয়োঃ কালয়োঃ ক্রিয়াহীনং দ্রব্যং, অধঃ পততীতি ক্রিয়াসম্বন্ধং, সোহয়ং ক্রিয়াদ্রব্যয়োঃ সম্বন্ধং গৃহ্ণাতীতি বর্তমানঃ কালঃ। তদাশ্রয়ো চেতরৌ কারৌ তদভাবে ন জ্ঞাতামিতি।



অমুবাদ। কাল অক্ষব্যাত্ম্য অর্থাৎ দেশব্যাত্ম্য নহে। (প্রশ্ন) তবে কি ? (উত্তর) “পতিত হইতেছে” এইরূপে ক্রিয়াব্যাত্ম্য, অর্থাৎ ক্রিয়ার দ্বারা কাল বুঝা যায়। যে কালে পতন ক্রিয়া নিবৃত্ত হয়, তাহা পতিত কাল। যে কালে (পতন ক্রিয়া) উৎপন্ন হইবে, তাহা পতিতব্য কাল। যে কালে দ্রব্যে বর্তমান ক্রিয়া গৃহীত হয়, তাহা বর্তমান কাল। যদি ইনি অর্থাৎ বর্তমান কালের অভাববাদী পূর্বপক্ষী দ্রব্যে বর্তমান পতন না বুঝেন, (তাহা হইলে) কাহার ধ্বংস অথবা কাহার উৎপৎস্তমানতা বুঝিবেন ? পতিত কাল, এই প্রয়োগ স্থলে ক্রিয়া অর্থাৎ পতন অতীত। পতিতব্য কাল, এই প্রয়োগ স্থলে ক্রিয়া অর্থাৎ পতন ভবিষ্যৎ। উভয় কালেই দ্রব্য ক্রিয়াহীন। অধোদেশে পতিত হইতেছে, এই প্রয়োগস্থলে (দ্রব্য) ক্রিয়ার সহিত সম্বন্ধ। সেই ইনি অর্থাৎ পূর্বোক্ত পূর্বপক্ষবাদী ক্রিয়া ও দ্রব্যের সম্বন্ধ গ্রহণ করিতেছেন, এ অস্ত বর্তমান কাল (তাহার) স্বীকার্য। এবং তাহার (বর্তমান কালের) অভাবে তদাশ্রিত অপর কালব্যয় (অতীত ও ভবিষ্যৎ) থাকিতে পারে না।

টীকণী। পূর্বপক্ষোক্ত পূর্বপক্ষের নিরাস করিতে মহর্ষি এই স্থলের দ্বারা বলিয়াছেন যে, যদি বর্তমান কাল না থাকে, তাহা হইলে পূর্বপক্ষবাদীর স্বীকৃত অতীত ও ভবিষ্যৎকালও থাকে না। কারণ, ঐ কালব্যয় বর্তমান কালসাপেক্ষ। মহর্ষির গূঢ় তাত্পর্য এই যে, বাহার ধ্বংস বর্তমান, তাহাকে “অতীত” বলে এবং বাহার প্রাগভাব বর্তমান, তাহাকে “ভবিষ্যৎ” বলে। সুতরাং অতীত ও ভবিষ্যৎ বুঝিতে বর্তমান বুঝা আবশ্যক। বর্তমান না বুঝিলে অতীত ও ভবিষ্যৎ বুঝা যায় না। সুতরাং বর্তমান না থাকিলে অতীত ও ভবিষ্যৎকালও থাকে না। ভাব্যকার প্রথমে পূর্বপক্ষবাদীর যুক্তি খণ্ডন করিয়া, শেষে মহর্ষির হুত্বার্থ বর্ণন করিয়াছেন। পূর্বপক্ষবাদীর যুক্তি খণ্ডন করিতে ভাব্যকার বলিয়াছেন যে, “পতিত হইতেছে” এইরূপে ক্রিয়ার দ্বারাই কাল বুঝা যায়। কোন অক্ষা বা পঞ্চব্য দেশের দ্বারা কাল বুঝা যায় না। যে কালে কোন দ্রব্যে বর্তমান ক্রিয়ার গ্রহণ বা জ্ঞান হয়, তাহাই বর্তমান কাল। “পতিত হইয়াছে” এইরূপ বলিলে যে পতিত কাল বুঝা যায় এবং “পতিত হইবে” এইরূপ বলিলে যে পতিতব্য কাল বুঝা যায়, ঐ উভয় কালেই সেই দ্রব্যে পতনক্রিয়া নাই। “পতিত হইতেছে” এইরূপ বলিলে যে কাল বুঝা যায়, সেই কালে ঐ দ্রব্য পতনক্রিয়ার সহিত সম্বন্ধ। সেই কালে পতনক্রিয়া ও দ্রব্যের সম্বন্ধ জ্ঞান হয়। সেই সম্বন্ধবিশিষ্ট কালকেই বর্তমান কাল বলে। পূর্বপক্ষবাদী বলি বলেন যে, কোন দ্রব্যেই বর্তমান পতনজ্ঞান হয় না, তাহা হইলে তিনি পতনের অতীতত্ব ও ভবিষ্যৎ বুঝিতে পারেন না। কারণ, পতনের জ্ঞান হইলেই তাহার নিবৃত্তি অথবা উৎপৎস্তমানতা বুঝিয়া পতনের অতীতত্ব অথবা ভবিষ্যৎ বুঝা যাইতে পারে। পতন বর্তমান না হইলেও তাহার প্রত্যক্ষ জ্ঞান হইতে পারে না। উদ্যোতক বলিয়াছেন যে, বর্তমান ক্রিয়া

না বুকিলে অতীত ও ভবিষ্যৎ ক্রিয়াও বুঝা যায় না। কাল সর্বত্র বিদ্যমান আছে। ফলও “পতিত হইরাছে”, “পতিত হইতেছে,” “পতিত হইবে” এইরূপে জ্ঞানবিশেষের বিষয় হয়; সুতরাং কালও অতীত নহে, ফলও অতীত নহে, ক্রিয়ায়ই অতীতও সম্ভব; কাল বা ফলের অতীতও সম্ভব নহে। সুতরাং ক্রিয়াই কালের অভিব্যক্তি বা বোধের কারণ। অথবা অর্থাৎ সম্ভব দেশ ফলে পতনক্রিয়ার উৎপত্তির পূর্বেও যেমন থাকে, পতনক্রিয়ার উৎপত্তি হইলেও তদুপই থাকে, সুতরাং তাহা পূর্বাপরকালে অভিন্ন বলিয়া কালবোধের কারণ নহে। ৪০।

ভাষ্য। অথাপি।

সূত্র। নাতীতানাগতয়োরিতরেতরাপেক্ষা-

সিদ্ধিঃ ॥ ৪১॥১০২॥

অনুবাদ। পরস্পর অতীত ও ভবিষ্যৎকালের পরস্পর সাপেক্ষ সিদ্ধি হয় না।

ভাষ্য। বদ্যতীতানাগতাবিতরেতরাপেক্ষে সিধ্যোতাং, প্রতিপদ্যেমহি বর্তমানবিলোপং, নাতীতাপেক্ষাহনাগতসিদ্ধিঃ। নাপ্যনাগতাপেক্ষাহতীত-সিদ্ধিঃ। কয়া যুক্ত্যা? কেন কলেনাতীতঃ কথমতীতাপেক্ষাহনাগতসিদ্ধিঃ, কেন চ কলেনানাগত ইতি নৈতচ্ছক্যং বক্তু মব্যাকরণীয়মেতদ্বর্তমানলোপ ইতি। যচ্চ নশ্চেত হ্রস্বদীর্ঘয়োঃ স্থলনিম্নয়োঃ ছায়াতপর্যোচ যথেষ্টে-তরাপেক্ষয়া সিদ্ধিরেবমতীতানাগতয়োরিতি, তন্মোপপদ্যতে, বিশেষহেতু-ভাবাৎ। দৃষ্টান্তবৎ প্রতিদৃষ্টান্তোহপি প্রসজ্যতে, যথা রূপস্পর্শৌ গন্ধরসৌ নেতরেতরাপেক্ষৌ সিধ্যতঃ, এবমতীতানাগতাবিতি। নেতরে-তরাপেক্ষা কস্মচিৎ সিদ্ধিরিতি। বস্মাদেকাভাবেহ্যতরাভাবাভ্যুভয়াভাবঃ, যদ্যেকস্তান্মতরাপেক্ষা সিদ্ধিরন্যতরশ্চেদানীং কিমপেক্ষা? বদ্যন্যতরশ্চেদা-পেক্ষা সিদ্ধিরেকশ্চেদানীং কিমপেক্ষা? এবমেকস্তান্মতরাভাবেহ্যতরম্ সিধ্যতী-ভ্যুভয়াভাবঃ প্রসজ্যতে।

অনুবাদ। যদি অতীত ও ভবিষ্যৎ পরস্পর সাপেক্ষ হইয়া সিদ্ধ হইত, ( তাহা হইলে ) বর্তমান বিলোপ অর্থাৎ বর্তমান কালের অভাব স্বীকার করিতে পারিতাম। ( কিন্তু ) ভবিষ্যৎ কালের সিদ্ধি অতীত কালসাপেক্ষ হয় না। এবং অতীত কালের সিদ্ধি ভবিষ্যৎ কালসাপেক্ষ হয় না। ( প্রশ্ন ) কোন যুক্তিবশতঃ? ( উত্তর ) কি প্রকারে অতীত, কি প্রকারে ভবিষ্যৎ কালের সিদ্ধি অতীত কালসাপেক্ষ



এক কি প্রকারে ভবিষ্যৎ, ইহা বলিতে পারা যায় না ; বর্তমান কালের বিলোপ হইলে অর্থাৎ উহা না থাকিলে ইহা অব্যাকরণীয়, অর্থাৎ বর্তমান কাল না মানিলে, অতীত ও ভবিষ্যৎ কাল কি প্রকার, কি প্রকারে উহা পরস্পরসাপেক্ষ, ইহা ব্যাকরণ বা ব্যাখ্যা করা যায় না ।

আর যে মনে করিবে, হ্রস্ব ও দীর্ঘের, স্থল ও নিম্নের এবং ছায়া ও আতপের যেমন পরস্পর অপেক্ষায় সিদ্ধি হয়, এইরূপ অতীত ও ভবিষ্যতেরও ( পরস্পর অপেক্ষায় সিদ্ধি হইবে ) । তাহা উপপন্ন হয় না ; কারণ, বিশেষ হেতু নাই । অর্থাৎ প্রকৃত হেতু না থাকায় কেবল দৃষ্টান্তের দ্বারা ঐ সাধ্য সিদ্ধ হইতে পারে না । ( পরন্তু ) দৃষ্টান্তের দ্বারা প্রতিদৃষ্টান্তও প্রসক্ত হয় । ( কিরূপ প্রতিদৃষ্টান্ত, তাহা বলিতেছেন ) যেমন রূপ ও স্পর্শ, ( এবং ) গন্ধ ও রস পরস্পরসাপেক্ষ হইয়া সিদ্ধ হয় না, এইরূপ অতীত এবং ভবিষ্যৎও ( পরস্পরসাপেক্ষ হইয়া সিদ্ধ হয় না । ) ( বস্তুতঃ ) পরস্পরসাপেক্ষ হইয়া কাহারও সিদ্ধি হয় না । বেহেতু একের অভাবে অন্যতরের অভাব প্রযুক্ত উভয়েরই অভাব হয় । বিশদার্থ এই যে, যদি একের সিদ্ধি অন্যতরসাপেক্ষ হয়, ( তাহা হইলে ) এখন অন্যতরের সিদ্ধি কাহাকে অপেক্ষা করিয়া হইবে ( এবং ) যদি অন্যতরের সিদ্ধি একাপেক্ষ হয়, ( তাহা হইলে ) এখন একের সিদ্ধি কাহাকে অপেক্ষা করিয়া হইবে ? এইরূপ হইলে একের অভাবে অন্যতর অর্থাৎ ঐ একাপেক্ষ সিদ্ধি বলিয়া অভিমত অপর পদার্থটি সিদ্ধ হয় না, এ জন্ম উভয়েরই অভাব প্রসক্ত হয় ।

টিপ্পনী । পূর্বপক্ষবাদী যদি বলেন যে, অতীত ও ভবিষ্যৎ কালের সিদ্ধি অর্থাৎ জানে বর্তমান কালের কোন অপেক্ষা নাই । অতীত ও ভবিষ্যৎকাল পরস্পরসাপেক্ষ হইয়াই সিদ্ধ হয়, সুতরাং বর্তমান কাল স্বীকারের কোনই আবশ্যকতা নাই । মহর্ষি এই সূত্র দ্বারা ইহারও প্রতিবেদন করিয়াছেন । ভাষ্যকার প্রথমে “অথাপি” এই কথা দ্বারা পূর্বপক্ষবাদীর পূর্বোক্ত আশঙ্কার সূচনা করিয়া, তন্নিবারণ এই সূত্রের অবতারণা করিয়াছেন । অতীত কালকে অপেক্ষা করিয়া ভবিষ্যৎ কালের সিদ্ধি হয় না, ভবিষ্যৎ কালকে অপেক্ষা করিয়াও অতীত কালের সিদ্ধি হয় না, ইহার যুক্তি কি ? এতদ্বারা ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, কোন প্রকারে অতীত, কিরূপে ভবিষ্যতের সিদ্ধি অতীতসাপেক্ষ ? কোন প্রকারে ভবিষ্যৎ ? তাহা “কল্প” শব্দের অর্থ ‘প্রকার’ । ভাষ্যকারের কথা ভাব্যর্থ এই যে, বর্তমান কাল না থাকিলে কি প্রকারে অতীত ও ভবিষ্যতের জ্ঞান হইবে ? তাহা কোন প্রকারেই হইতে পারে না । তাহা হইলে অতীত ও ভবিষ্যৎ কালই থাকে না । অতীত কালকে অপেক্ষা করিয়া ভবিষ্যতের সিদ্ধি কিরূপে হইবে ? তাহা হইতে পারে না । অর্থাৎ বর্তমান কাল না থাকিলে অতীত



ও ভবিষ্যৎ কি প্রকার, কি প্রকারে ঐ উভয়ের জ্ঞান হয়, ইহা বলিতে পারা যায় না। ভাব্যকার "নৈতচ্ছক্যং বক্তব্যং" এই কথা দ্বারা ইহাই বলিয়া "অব্যাকরণীয়মেতদ্ববর্তমানলোপে" এই কথা দ্বারা ঐ পূর্বকথারই বিবরণ করিয়াছেন। পূর্বপক্ষবাদী বলিতে পারেন যে, হ্রস্বের বিপরীত দীর্ঘ, দীর্ঘের বিপরীত হ্রস্ব, স্থল অর্থাৎ জলশূত্র অকৃত্রিম ভূতগণের বিপরীত নিম্ন, তাহার বিপরীত স্থল, ছায়ার বিপরীত আতপ, তাহার বিপরীত ছায়া, এইরূপে যেমন হ্রস্বদীর্ঘ প্রকৃতি পদার্থের পরস্পর-পক্ষ জ্ঞান হয়, তদ্রূপ অতীত কালের বিপরীত কাল ভবিষ্যৎ কাল, ভবিষ্যৎকালের বিপরীত কাল অতীত কাল, এইরূপে ঐ কালদ্বয়ের পরস্পরপক্ষ জ্ঞান হইতে পারে। একত্বভরে ভাব্যকার বলিয়া-ছেন যে, প্রকৃত হেতু না থাকায় কেবল দৃষ্টান্ত দ্বারা উহা সিদ্ধ করা যায় না; পরন্তু দৃষ্টান্তের দ্বারা প্রতিদৃষ্টান্তও আছে। রূপ ও স্পর্শ এবং গন্ধ ও রস যেমন পূর্বোক্তরূপে পরস্পরপক্ষ হইয়া সিদ্ধ হয় না, তদ্রূপ অতীত ও ভবিষ্যৎকালও পরস্পরপক্ষ হইয়া সিদ্ধ হয় না, ইহাও বলিতে পারি। ভাব্যকার হ্রস্ব দীর্ঘ প্রকৃতির পূর্বোক্তরূপে পরস্পরপক্ষ সিদ্ধি স্বীকার করিয়াই প্রথমে অতীত ও ভবিষ্যতের পরস্পরপক্ষ সিদ্ধি হইতে পারে না, কারণ, তাহার বিশেষ হেতু অর্থাৎ সাধক হেতু নাই, এই কথা বলিয়াছেন। শেষে বাস্তব সিদ্ধান্তরূপে বলিয়াছেন যে, বস্তুর কোন পদার্থেরই পরস্পরপক্ষ জ্ঞান হইতে পারে না। কারণ, দুইটি পদার্থের পরস্পরপক্ষ জ্ঞান বলিতে গেলে ঐ উভয় পদার্থেরই অভাব হইয়া পড়ে। ভাব্যকার স্থপদবর্ণনের দ্বারা শেষে ইহা বুঝাইয়াছেন যে, যদি দুইটি পদার্থের মধ্যে একটির জ্ঞান অগ্নতরকে অর্থাৎ অপরটিকে অপেক্ষা করে এবং ঐ অগ্নতরটির জ্ঞান আবার প্রথমোক্ত এককে অপেক্ষা করে, তাহা হইলে প্রথমে ঐ একের জ্ঞান হইতে না পারায়, ঐ একের অভাবপ্রযুক্ত অগ্নতর অর্থাৎ অপরটিরও সিদ্ধি না হওয়ার, ঐ উভয়টিরই অভাব হইয়া পড়ে। যেমন হ্রস্ব ও দীর্ঘের পরস্পরপক্ষ সিদ্ধি বলিতে গেলে ঐ উভয়েরই অভাব হয়। কারণ, হ্রস্ব না বুঝিলে দীর্ঘ বুঝা যায় না, দীর্ঘ না বুঝিলেও হ্রস্ব বুঝা যায় না, এইরূপ হইলে দীর্ঘজ্ঞানের পূর্বে হ্রস্বজ্ঞান অসম্ভব; হ্রস্বজ্ঞান ব্যতীতও আবার দীর্ঘজ্ঞান অসম্ভব। এ ক্ষেত্রে অজ্ঞোক্তাশ্রয়দোষবশতঃ হ্রস্ব ও দীর্ঘ, এই উভয়ের জ্ঞান অসম্ভব হওয়ার ঐ উভয়েরই লোপাপত্তি হয়। এইরূপ প্রকৃত স্থলে অতীত কালের বিপরীত অথবা অতীত কাল ভিন্ন কালই ভবিষ্যৎকাল এবং ভবিষ্যৎকালের বিপরীত অথবা ভবিষ্যৎকাল ভিন্ন কালই অতীত কাল, এইরূপে ঐ কালদ্বয়ের পরস্পরপক্ষ জ্ঞান বলিতে গেলে পূর্বোক্তরূপে অজ্ঞোক্তাশ্রয়দোষবশতঃ ঐ কালদ্বয়ের কোনটিরই জ্ঞান হইতে না পারায়, ঐ উভয়ের লোপাপত্তি হয়। সুতরাং কোন পদার্থেরই পরস্পরপক্ষ জ্ঞান হয় না, ইহা স্বীকার্য। মূলকথা, বর্তমান কালের জ্ঞান ব্যতীত অতীত ও ভবিষ্যৎকালের জ্ঞান কোনরূপেই হইতে পারে না; সুতরাং অতীত ও ভবিষ্যৎ, এই কালদ্বয়টির বর্তমান কাল অবশ্য স্বীকার্য। ৪২১।

ভাষ্য। অর্থসাদৃশ্যব্যাখ্যাশ্চায়াং বর্তমানঃ কালঃ, বিদ্যাতে দ্রব্যং, বিদ্যাতে গুণঃ, বিদ্যাতে কশ্মেতি। যন্ত চায়াং নাস্তি তন্ত—



অনুবাদ । এই বর্তমান কাল অর্ধসদ্ব্যবস্থা<sup>৩</sup> অর্থাৎ পদার্থের অস্তিত্বক্রিয়ার দ্বারাও বর্তমান কালের জ্ঞান হয় । ( উদাহরণ ) দ্রব্য বিস্তারিত আছে, গুণ বিস্তারিত আছে, কর্ম বিস্তারিত আছে । [ অর্থাৎ উক্ত প্রয়োগে দ্রব্যাদির অস্তিত্বক্রিয়ার দ্বারা দ্রব্যাদির বর্তমান কালের জ্ঞান হয় ] কিন্তু বাহার ( মতে ) ইহা অর্থাৎ অস্তিত্বক্রিয়া-বিশিষ্ট বর্তমান নাই, তাহার ( মতে )—

সূত্র । বর্তমানাভাবে সর্বাগ্রহণং প্রত্যক্ষা-

রূপপত্তেঃ ॥৪২॥১০৩ ॥

অনুবাদ । বর্তমান কালের অভাব হইলে প্রত্যক্ষের অনুপপত্তিবশতঃ সর্ববস্তুর অগ্রহণ হয় ।

ভাষ্য । প্রত্যক্ষমিন্দ্রিয়ার্থসম্বন্ধজং, ন চাবিদ্যমানমসদ্ব্যবস্থায় সন্নিবৃত্তম্ভবে । ন চায়ং বিদ্যমানং সৎ কিঞ্চিদনুজানাতি, প্রত্যক্ষনিমিত্তং প্রত্যক্ষবিষয়ঃ প্রত্যক্ষজ্ঞানং সর্বং নোপপদ্যতে । প্রত্যক্ষানুপপত্তৌ তৎপূর্বকদ্বাদনুমানাগমরোরনুপপত্তিঃ । সর্বপ্রমাণবিলোপে সর্বাগ্রহণং ন ভবতীতি ।

উত্তরথা চ বর্তমানঃ কালো গৃহ্যতে, কচিদর্থ-সদ্ব্যবস্থায়, যথাহস্তি দ্রব্যমিতি । কচিৎ ক্রিয়াসন্তানব্যবস্থা, যথা পচতি ছিনন্তীতি । নানাবিধা চৈকার্থী ক্রিয়া ক্রিয়াসন্তানঃ ক্রিয়াভ্যাসশ্চ । নানাবিধা চৈকার্থী ক্রিয়া পচতীতি, স্থান্যধিগ্রহণমুদকাসেচনং তণ্ডুলাবপনমোধোহপসর্পণমগ্ন্যভি-  
জ্ঞানং দর্বাঘটনং মণ্ডুপ্রাবণমধোবতারণমিতি । ছিনন্তীতি ক্রিয়াভ্যাসঃ,  
—উদ্যম্যোদ্যম্য পরশুং দারুণি নিপাতয়ন্ ছিনন্তীত্ব্যচ্যতে । যচ্চেদং পচ্যমানং ছিদ্যমানঞ্চ তৎ ক্রিয়মাণং ।

অনুবাদ । প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়ার্থসম্বন্ধজং, কিন্তু অবিস্তারিত কি না অসং (অবর্তমান বস্তুর) ইন্দ্রিয়ার সহিত সম্বন্ধিত হয় না । ইনিও অর্থাৎ বর্তমান কালের অভাববাদী

১। বর্তমানপূর্ববর্তনপদ্যঃ ভাষ্যঃ অর্ধসদ্ব্যবস্থাস্থায়মিতি । অত্রার্থঃ, ন কেবলং পতনাক্রিয়াবাস্তবো বর্তমানঃ কালঃ, अपि तु अर्धसद्व्यवस्थेऽर्थकं सत्तावस्थि क्रियेति भावः तदा वाक्यः कालः । एतद्वक्तुं भवति, पतनावस्थेः क्रिया बर्तमानेवपद्यप्यप्यसि च, अस्ति क्रिया तु सर्ववर्तमानवापिनी, उपेक्षयति क्रियाविशिष्टं वर्तमानत्वात्वात् सत्ता-  
ग्रहणं अत्राकाशपत्तेः ।—तात्पर्यटीका ।

পূর্বপক্ষীও বিজ্ঞমান কি না সৎ (বর্তমান পদার্থ) কিছু স্বীকার করেন না। (তাহা হইলে) প্রত্যক্ষের নিমিত্ত অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ার্থসম্বন্ধির্ভূত প্রত্যক্ষ প্রমাণ, প্রত্যক্ষের বিষয়, প্রত্যক্ষ জ্ঞান, সমস্ত অর্থাৎ ইহার কোনটিই উপপন্ন হয় না। প্রত্যক্ষের অনুপপত্তি হইলে তৎপূর্বকল্পবশতঃ অর্থাৎ সকল জ্ঞানই সেই প্রত্যক্ষপূর্বক বলিয়া অনুমান ও আগমের (অনুমানপ্রমাণ ও শব্দপ্রমাণের) অনুপপত্তি হয়। সর্ব-প্রমাণের লোপ হইলে সর্ববস্তুর গ্রহণ হয় না।

পরন্তু উভয়প্রকারে বর্তমান কাল গৃহীত হয়। (১) কোন স্থলে (বর্তমান কাল) অর্থসদৃশ্যের দ্বারা ব্যঙ্গ্য অর্থাৎ পদার্থের সভা বা অস্তিত্ব ক্রিয়ার দ্বারা বর্তমান কাল বুঝা যায়। যেমন “দ্রব্য আছে” [ অর্থাৎ “দ্রব্যং অস্তি” বলিলে, দ্রব্যরূপ পদার্থের যে সম্ভাব্য অর্থাৎ সভা বা অস্তিত্ব, তদ্বারা বর্তমান কাল বুঝা যায় ] (২) কোন স্থলে (বর্তমান কাল) ক্রিয়াসম্পাদনের দ্বারা ব্যঙ্গ্য, যেমন “পাক করিতেছে”, “ছেদন করিতেছে” [ অর্থাৎ পাকাদি ক্রিয়াসমূহের দ্বারাও বর্তমান কাল বুঝা যায় ] একার্থ অর্থাৎ এক প্রয়োজনবিশিষ্ট নানাবিধ ক্রিয়া ক্রিয়াসম্পাদন, ক্রিয়ার অভ্যাসও (ক্রিয়া-সম্পাদন) [ অর্থাৎ একপ্রয়োজনবিশিষ্ট নানাবিধ ক্রিয়াকে ক্রিয়াসম্পাদন বলে, একবিধ ক্রিয়ার পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠানরূপ অভ্যাসকেও ক্রিয়াসম্পাদন বলে, ক্রিয়াসম্পাদন ঐরূপে বিবিধ ] (১) একপ্রয়োজনবিশিষ্ট নানাবিধ ক্রিয়া অর্থাৎ প্রথম প্রকার ক্রিয়াসম্পাদন “পাক করিতেছে” এই স্থলে। (এই স্থলে সেই নানাবিধ ক্রিয়া কি কি, তাহা বলিতেছেন) স্থানীয় অধিশ্রয়ণ অর্থাৎ চুল্লীতে স্থানীয় আরোপণ, জলনিঃক্ষেপ, তণুলনিঃক্ষেপ, কাষ্ঠের অপসর্পণ অর্থাৎ চুল্লীর অধোদেশে কাষ্ঠ নিঃক্ষেপ, অগ্নিছালন, দাবীর দ্বারা ঘট্টন, মণ্ডপ্রাবণ (মাড় গালা), অধোদেশে অবতারণ [ অর্থাৎ চুল্লীতে স্থানীয় আরোপণ হইতে অধোদেশে অবতারণ পর্য্যন্ত পূর্বাপর নানাবিধ ক্রিয়াকলাপই “পাক করিতেছে” এইরূপ প্রয়োগস্থলে ক্রিয়াসম্পাদন ]। (২) “ছেদন করিতেছে” এইরূপ প্রয়োগ স্থলে ক্রিয়ার অভ্যাস, ( কারণ ) কুঠারকে উদ্ধত করিয়া উদ্ধত করিয়া কাষ্ঠে নিপাত করতঃ “ছেদন করিতেছে” ইহা কথিত হয়। [ অর্থাৎ এখানে একবিধ ক্রিয়ারই পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠানরূপ অভ্যাস হয়, পাকক্রিয়ার হায় ছেদনক্রিয়া নানাবিধ ক্রিয়াসমূহরূপ প্রথম প্রকার ক্রিয়াসম্পাদন নহে ] আর এই যে পচ্যমান ও ছিষ্টমান (বস্ত), তাহা ক্রিয়মাণ (বর্তমান) [ অর্থাৎ পাক ও ছেদনক্রিয়ার কর্মকারক যে পচ্যমান ও

১। এখানে বৃত্তিত তৎপূর্বকর্তার সম্বন্ধের দ্বারা “ন তৎ ক্রিয়মানঃ” এইরূপ ভাষাপাঠও বুঝা যায়। “ন তৎ ক্রিয়মাণঃ বর্তমানক্রিয়ান্বতেন বর্তমানঃ ন তু বস্তপত ইত্যর্থঃ।”—তৎপূর্বকর্তা।



ছিদ্রমান বস্তু, তাহা স্বরূপতঃ বর্তমান নহে, কিন্তু বর্তমান ক্রিয়ার সহিত সম্বন্ধবশতঃই তাহাকে ক্রিয়মাণ অর্থাৎ বর্তমান বলে ] ।

টিপ্পনী। নহাষি পুরোক্ত পূর্বপক্ষের নিরাস করিতে শেষে এই সূত্রের দ্বারা চরম কথা বলিয়াছেন যে, বর্তমান কাল না থাকিলে প্রত্যক্ষলোপে সর্বপ্রমাণের লোপ হয়, তাহা হইলে কোন বস্তুরই জ্ঞান হইতে পারে না। কিন্তু যখন সকল পদার্থই জ্ঞানের বিবর হয়, তখন সকল জ্ঞানের মূলীভূত প্রত্যক্ষ জ্ঞান অবশ্য স্বীকার্য্য, তাহা হইলে বর্তমান কালও অবশ্য স্বীকার্য্য। কারণ, বর্তমানকালীন পদার্থই ইন্দ্রিয়সমিকৃষ্ট হইয়া প্রত্যক্ষবিদ্য হইতে পারে। অতীত অথবা ভবিষ্যৎ-কালীন বস্তুর প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। ভাষ্যকার নহাষির এই সূত্রের অবতারণা করিতে প্রথমে বলিয়াছেন যে, পদার্থের নষ্টাব্দ অর্থাৎ সত্তা বা অস্তিত্ব-ক্রিয়ার দ্বারা বর্তমান কালের জ্ঞান হয়। অর্থাৎ কেবল যে পতনানি ক্রিয়ার দ্বারাই বর্তমান কাল বুঝা যায়, তাহা নহে; পরন্তু অস্তিত্ব বা স্থিতি ক্রিয়ার দ্বারাও বর্তমান কাল বুঝা যায়। বর্তমান পদার্থের মধ্যে কোন কোন পদার্থে পতনানি ক্রিয়া থাকে এবং কোন কোন পদার্থে থাকে না; কিন্তু অস্তিত্ব ক্রিয়া-সকল বর্তমানব্যাপ্ত; সুতরাং “ভব্য আছে” এইরূপ বলিলে, পতনানি ক্রিয়ার দ্বারা বর্তমান জ্ঞান না হইলেও অস্তিত্ব-ক্রিয়ার দ্বারা বর্তমান বুঝা যায়। যিনি এইরূপ স্থলেও বর্তমান স্বীকার করিবেন না অর্থাৎ অস্তিত্বক্রিয়াবিশিষ্ট পদার্থেরও বর্তমান স্বীকার না করিয়া বলিবেন, বর্তমান নাই, তাহার মতে প্রত্যক্ষের অল্পপপত্তিবশতঃ সর্ববস্তুর অগ্রহণ হইয়া পড়ে। ভাষ্যকার সূত্রার্থ বর্ণন করিয়া শেষে ইহা বিশদরূপে বুঝাইয়াছেন যে, ইন্দ্রিয় ও বিষয়ের সহিত সন্নিবর্তন প্রত্যক্ষ জন্মে। কিন্তু অবিদ্যমান কোন পদার্থের সহিত ইন্দ্রিয়ের সন্নিবর্তন হইতে পারে না। পূর্বপক্ষবাদী যখন বিদ্যমান কোন পদার্থ স্বীকার করেন না, তাহার মতে অতীত ও ভবিষ্যৎ ভিন্ন কোন পদার্থ নাই, তখন তাহার মতে প্রত্যক্ষের নিষিদ্ধ যে বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সন্নিবর্তন, তাহা হইতে পারে না, সুতরাং প্রত্যক্ষের বিবর এবং প্রত্যক্ষজ্ঞানও উপপন্ন হয় না। প্রত্যক্ষের অল্পপপত্তি হইলে তদনুলক অভ্যাস প্রমাণেরও অল্পপপত্তি হওয়ায় সর্বপ্রমাণের বিলোপ হয়। সুতরাং প্রমাণ না থাকায় কোন বস্তুরই জ্ঞান হইতে পারে না। শব্দ-প্রমাণের অল্পপপত্তি হইলে উপমান-প্রমাণের মূলীভূত শব্দপ্রমাণ না থাকায় উপমান-প্রমাণও থাকিতে পারে না, এই অভিপ্রারেই ভাষ্যকার উপমান-প্রমাণের অল্পপপত্তি পৃথকরূপে না বলিয়াও সর্বপ্রমাণের বিলোপ বলিয়াছেন। “প্রত্যক্ষ” শব্দটি প্রত্যক্ষ প্রমাণ, প্রত্যক্ষ বিষয় এবং প্রত্যক্ষ জ্ঞান, এই ত্রিবিধ অর্থেই প্রযুক্ত হইয়া থাকে। ভাষ্যকার সূত্রোক্ত “প্রত্যক্ষ” শব্দের দ্বারা এখানে ঐ ত্রিবিধ অর্থেরই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অর্থাৎ বর্তমান না থাকিলে ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিবর্তন প্রত্যক্ষ প্রমাণ, প্রত্যক্ষ বিষয় ও প্রত্যক্ষ জ্ঞান, এই সমস্তই উপপন্ন হয় না। তাহা “অবিদ্যমানং” এই কথার পরে “অসং” এবং শেষে “বিদ্যমানং” এই কথার পরে “সং” এই কথা পূর্বকথারই বিবরণ। অসং বলিতে এখানে অলীক নহে। সং বলিতে বর্তমান, অসং বলিতে অবর্তমান (অতীত ও ভাবী)।



বর্তমান না থাকিলে প্রত্যক্ষের অমুপপত্তি হয় কেন? এক্ষত্রে উদ্যোক্তক বলিয়াছেন যে, কার্যমাত্রই বর্তমানাধার; প্রত্যক্ষ বহন কার্য, তখন তাহার আধার বর্তমানই হইবে। বর্তমান না থাকিলে প্রত্যক্ষ অনাধার হইয়া পড়ে। অনাধার কোন কার্য না থাকায় প্রত্যক্ষ থাকিতে পারে না। প্রত্যক্ষের অভাব হইলে সর্বপ্রমাণেরই অভাব হয়। উদ্যোক্তকের গূঢ় তাৎপর্য এই যে, যোগিগণের যোগজ সন্নিকর্ষবশতঃ অতীত ও ভবিষ্যৎ বিষয়েও প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। সুতরাং প্রত্যক্ষমাত্রই বর্তমানবিষয়ক, প্রত্যক্ষমাত্রই বিষয় কারণ বর্তমান না থাকিলে প্রত্যক্ষমাত্রেরই উচ্ছেদ হয়, ইহা বলা যায় না। প্রত্যক্ষ বহন কার্য, তখন যে আধারে প্রত্যক্ষ জন্মে, তাহা বর্তমানই বলিতে হইবে। কোন অতীত ও ভবিষ্যৎ পদার্থ তাহার আধার হইতে পারে না। কার্যমাত্রই বর্তমানাধার। সুতরাং বর্তমান না থাকিলে অনাধার হইয়া প্রত্যক্ষ থাকিতে পারে না, ইহাই সূত্রকারের বিবক্ষিত। তাৎপর্যটীকাকার এইরূপে উদ্যোক্তকের তাৎপর্য বর্ণন করিয়া শেষে বলিয়াছেন যে, ভাষ্যকারেরও এইরূপ তাৎপর্য বুঝিতে হইবে। প্রত্যক্ষের নিমিত্ত ইন্দ্রিয়ার্গসন্নিকর্ষ এবং অঙ্গদামির প্রত্যক্ষের বিষয় ঘটাদি পদার্থ এবং প্রত্যক্ষ জ্ঞান, এ সমস্তই বর্তমান কাল না থাকিলে অনাধার হওয়ার উপপন্ন হয় না, ইহাই ভাষ্যার্থ। ভাষ্যকারের সন্দর্ভের দ্বারা কিন্তু তাহার ঐরূপ বিবক্ষা মনে হয় না। বর্তমান না থাকিলে, প্রত্যক্ষরূপ কার্য অনাধার হওয়ার উপপন্ন হয় না, এরূপ কথা ভাষ্যকার বলেন নাই। উদ্যোক্তকের যুক্তি অমুগারে ঐরূপ কথা বলিলে বর্তমানের অভাবে কেবল প্রত্যক্ষরূপ কার্যের কেন, কার্যমাত্রেরই অমুপপত্তি বলা যায়। সূত্রকার মহর্ষি কিন্তু প্রত্যক্ষেরই অমুপপত্তি বলিয়া তৎপ্রযুক্ত সর্বাগ্রহণ বলিয়াছেন। ভাষ্যকারও প্রথমে বলিয়াছেন যে, অবর্তমান বিষয় ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষ হয় না; সুতরাং বর্তমান কোন পদার্থ স্বীকার না করিলে প্রত্যক্ষের অমুপপত্তিবশতঃ সর্বপ্রমাণের লোপ হওয়ার সর্বগ্রহণ হইতে পারে না। ভাষ্যকার লৌকিক প্রত্যক্ষেরই অমুপপত্তি বুঝাইতে প্রথমে ঐ সকল কথা বলিয়াছেন বুঝা যায়। তাহা হইলে যোগীদিগের যোগজ সন্নিকর্ষজ্ঞাত অলৌকিক প্রত্যক্ষ অতীত ও ভবিষ্যৎ বিষয়ে হইতে পারিলেও ভাষ্যকারের কথা অদৃষ্ট হয় নাই। ফলতঃ, বর্তমান না থাকিলে লৌকিক প্রত্যক্ষের অমুপপত্তিবশতঃ তন্মূলক কোন পদার্থের কোনরূপ জ্ঞান হয় না, হইতে পারে না, ইহাই সূত্রকার ও ভাষ্যকারের বিবক্ষিত বুঝিতে পারি। বর্তমান স্বীকারের পক্ষে উদ্যোক্তকের যুক্তিকে সূক্তান্তরূপেও গ্রহণ করিতে পারি।

ভাষ্যকার পূর্ণপক্ষবাদীর প্রথম কথা বলিয়াছেন যে, পতিত অধ্বা ও পতিতব্য অধ্বা তির তৃতীয় কোন অধ্বা অর্থাৎ সম্ভব দেশ না থাকায় অতীত ও ভবিষ্যৎ পতন ভিন্ন বর্তমান পতন নাই। অর্থাৎ বর্তমান কালের কোন ব্যঞ্জক না থাকায় বর্তমান কাল নাই। এক্ষত্রে ভাষ্যকার প্রথমে বলিয়াছেন যে, কাল অধ্বাব্যব নহে—ক্রিয়াব্যব। যে কালে কোন ব্যব্য বর্তমান ক্রিয়ার জ্ঞান হয়, তাহা বর্তমান কাল। অর্থাৎ বর্তমান ক্রিয়ার দ্বারা বর্তমান কালের জ্ঞান হয়। শেষে এই সূত্রের অবতারণা করিতে বলিয়াছেন যে, বর্তমান কাল কেবল পতনাদি ক্রিয়া-



যাহাই নহে; পরন্তু অৰ্গসিদ্ধাব্যবস্থাও। শেষে বৰ্তমান কাল স্বীকাৰের পক্ষে মহর্ষির এই সূত্রোক্ত চরম যুক্তির ব্যাখ্যা করিয়া, উহার পূৰ্ব্বকথিত বৰ্তমান কালব্যবস্থাকের বিশেষ ব্যাখ্যা করিতে বলিয়াছেন যে, বৰ্তমান কাল উভয় প্রকারে গৃহীত হয়;—কোন স্থলে অৰ্গসিদ্ধাব্যবস্থার দ্বারা এবং কোন স্থলে ক্রিয়াসম্বন্ধের দ্বারা বৰ্তমান কালের গ্রহণ হয়। “ত্ৰয় আছে” এইরূপ বলিলে অস্তিত্ব ক্রিয়ার দ্বারা বৰ্তমান কাল বুঝা যায় এবং “পাক করিতেছে”, “ছেদন করিতেছে” এই প্রয়োগস্থলে ক্রিয়াসম্বন্ধের দ্বারা বৰ্তমান কালের গ্রহণ হয়। ক্রিয়াসম্বন্ধ বিবিধ;—একপ্রয়োজনবিশিষ্ট নানাবিধ ক্রিয়া এক প্রকার ক্রিয়াসম্বন্ধ এবং একপ্রয়োজনবিশিষ্ট একবিধ ক্রিয়ার পুনঃ পুনঃ অমুৰ্ত্তানরূপ অত্যাপ বিত্তীয় প্রকার ক্রিয়াসম্বন্ধ। ছেদনক্রিয়াস্থলে ঐ ক্রিয়া সমস্তই একজাতীয়। পুনঃ পুনঃ কুঠারের উদ্যমনপূৰ্ব্বক কাঠে নিপাত করিলে “ছেদন করিতেছে” এইরূপ কথিত হয়। ঐ স্থলে অনেক ছেদন-ক্রিয়া অতীত হইলেও ছেদনক্রিয়ার অভ্যাসরূপ ক্রিয়াসম্বন্ধ থাকে পর্যন্ত অর্থাৎ যে পর্যন্ত কুঠারের উদ্যমনপূৰ্ব্বক কাঠে নিপাত চলিবে, যে পর্যন্ত ঐ ক্রিয়াসম্বন্ধের দ্বারা “ছেদন করিতেছে” এইরূপে বৰ্তমান কালের গ্রহণ হয়। “পাক করিতেছে” এই প্রয়োগস্থলে প্রথম প্রকার ক্রিয়াসম্বন্ধ। কারণ, চুন্নীতে স্থালীর আৱোপণ হইতে অধোদেশে অবতারণ পর্যন্ত নানাবিধ ক্রিয়াকলাপই পাকক্রিয়াসম্বন্ধ। উহার কোন ক্রিয়া অতীত ও কোন কোন ক্রিয়া অনাবদ্ধ হইলেও ঐ ক্রিয়াসমূহের মধ্যে কোন ক্রিয়ার বৰ্তমানতাবশতাই ঐ ক্রিয়াসম্বন্ধের দ্বারা “পাক করিতেছে” এইরূপে বৰ্তমান কালের গ্রহণ হয় এবং ঐ পচমান তণ্ডুল ও ছিদ্যমান কাঠরূপ কর্মকারণক সত্ত্বগুণঃ বৰ্তমান না হইলেও ঐ বৰ্তমান ক্রিয়ার সম্বন্ধবশতাই তাহাকে ক্রিয়মান অর্থাৎ বৰ্তমান বলে। পরসূত্রে ইহা ব্যক্ত হইবে। ৪২।

ভাষ্য। তস্মিন্ ক্রিয়মাণে—

সূত্র। কৃততাকৰ্তব্যাতোপপত্তেস্তু ভয়থা-

গ্রহণং ॥ ৪৩॥ ১০৪॥

অনুবাদ। সেই ক্রিয়মাণে অর্থাৎ পূৰ্ব্বোক্ত বিত্তমানক্রিয়াবিশিষ্ট পদার্থে কৃততা ও কৰ্তব্যতার অর্থাৎ অতীত ক্রিয়া ও চিকীষিত ভবিষ্যৎ ক্রিয়ার উপপত্তিবশতঃ কিন্তু উভয়প্রকারে ( বৰ্তমানের ) গ্রহণ হয়।

১। ভাষ্যকার ভাবি তদন্ত পাকক্রিয়াসমূহের বর্ণন করিতে চুন্নীতে স্থালীর আৱোপণকে প্রথম ক্রিয়া বলিয়াছেন। উদ্যোতক চুন্নীর অধোদেশে কাঠনিকেপকেই প্রথম ক্রিয়া বলিয়াছেন। ভাষ্যকারের পাকক্রিয়া বর্ণনের দ্বারা কেহ মনে করেন যে, তিনি ত্রিবিভূদেশীয় ছিলেন। কারণ, ত্রিবিভূদেশে অগ্নি ভোজ্য পদার্থের মধ্যে উত্তম, এবং ভাষ্যকারোক্ত একাত্রেই অৱশ্যাক্রম প্রচলিত। কেহ এইরূপ মনে করিলেও উহা ভাষ্যকারের ত্রিবিভূত বিবরণের নিস্তারক প্রমাণ হইতে পারে না। সেনাক্তরেও ঐরূপ অৱশ্যাক্রম বর্ণিত পাওয়া যায়। যাকিংশেবের পাকক্রিয়ার কথাও নির্ণয় করা যায় না।

ভাষ্য । ক্রিয়াসত্তানোহনারক্শচিকৌষিতোহনাগতঃ কালঃ, পক্ষ্যতীতি । প্রয়োজনাবসানঃ ক্রিয়াসত্তানোপরমোহতীতঃ কালোহপাকীদিতি । আরক্-ক্রিয়াসত্তানো বর্তমানঃ কালঃ, পচতীতি । তত্র যা উপরতা সা কৃততা, যা চিকৌষিতা সা কর্তব্যতা, যা বিদ্যমানা সা ক্রিয়মাণতা । তদেবং ক্রিয়াসত্তানস্বত্বেকাল্যসমাহারঃ—পচতি পচ্যত ইতি বর্তমানগ্রহণেন গৃহ্যতে । ক্রিয়াসত্তানস্ত হত্রোবিচ্ছেদোহভিধীয়তে, নারক্শো নোপরম ইতি । সোহরমুভয়থা বর্তমানো গৃহ্যতে অপবৃক্তো ব্যপবৃক্তচাতীতানাগতাভ্যাং । স্থিতিব্যপ্ত্যো বিদ্যতে দ্রব্যমিতি । ক্রিয়াসত্তানাবিচ্ছেদাভিধায়ী চ ত্রৈকাল্যা-দ্বিতঃ পচতি ছিনতীতি । অত্শচ প্রত্যাসত্তিপ্রভৃতেতরর্থস্ত বিবক্ষ্যাং তদভি-ধায়ী বহুপ্রকারো লোকেবুৎপ্রেক্ষিতব্যঃ । তস্মাদস্তু বর্তমানঃ কাল ইতি ।

অনুবাদ । অনারক ও চিকৌষিত, অর্থাৎ বাহ্য করা হয় নাই, কিন্তু করিতে ইচ্ছা জন্মিয়াছে, এমন ক্রিয়াসত্তান অনাগত কাল, অর্থাৎ ভবিষ্যৎকাল—(উদাহরণ) “পাক করিবে” । “প্রয়োজনাবসান” অর্থাৎ বাহার প্রয়োজনের অবসান (ফল-সমাপ্তি) হইয়াছে, এমন ক্রিয়াসত্তানের নিবৃত্তি অতীত কাল, (উদাহরণ) “পাক করিয়াছে” । আরক্ ক্রিয়াসত্তান বর্তমান কাল, (উদাহরণ) “পাক করিতেছে” । সেই ক্রিয়াসত্তানের মধ্যে যে ক্রিয়া উপরত অর্থাৎ নিবৃত্ত বা অতীত, তাহা কৃততা, যে ক্রিয়া চিকৌষিত, তাহা কর্তব্যতা, যে ক্রিয়া বর্তমান, তাহা ক্রিয়মাণতা । সেই এইরূপ ক্রিয়াসত্তানস্ব কালত্রয়ের সমাহার “পাক করিতেছে”, “পাক হইতেছে”, এইরূপ প্রয়োগস্থলে বর্তমান গ্রহণের দ্বারা অর্থাৎ বর্তমানকালবোধক শব্দের দ্বারা গৃহীত হয় । যেহেতু এই স্থলে ( “পাক করিতেছে”, “পাক হইতেছে” এই পূর্বোক্ত প্রয়োগস্থলে ) ক্রিয়াসত্তানের অর্থাৎ চূল্লিতে স্থালীর আরোপণ প্রভৃতি পূর্বোক্ত পাকক্রিয়াসমূহের অবিচ্ছেদ অভিহিত হয় । ক্রিয়াসত্তানের আরম্ভ অভিহিত হয় না, উপরম অর্থাৎ নিবৃত্তিও অভিহিত হয় না । সেই এই বর্তমান কাল উভয় প্রকারে গৃহীত হয় । অতীত ও ভবিষ্যৎকালের সহিত (১) অপবৃক্ত অর্থাৎ সম্পৃক্ত বা সম্বন্ধযুক্ত এবং অতীত ও ভবিষ্যৎকালের সহিত (২) ব্যপবৃক্ত অর্থাৎ অসম্পৃক্ত বা সম্বন্ধশূন্য । “দ্রব্য বিদ্যমান আছে” এইরূপ প্রয়োগস্থলে ( বর্তমান কাল ) স্থিতি-ব্যপ্ত্য । [ অর্থাৎ এইরূপ প্রয়োগস্থলে অস্তিত্ব বা স্থিতিক্রিয়ার দ্বারা যে বর্তমান কাল বুঝা যায়, তাহা অতীত ও ভবিষ্যৎকালের সহিত ব্যপবৃক্ত ( সম্বন্ধশূন্য ) অর্থাৎ



তাহা কেবল বর্তমান কাল ] ক্রিয়াসম্বন্ধের অবিচ্ছেদ্যপ্রতিপাদক “পাক করিতেছে”, “ছেদন করিতেছে” এইরূপ প্রয়োগ ত্রৈকাল্যাদিত অর্থাৎ অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ, এই কালত্রয়সম্বন্ধ। প্রত্যাসক্তি প্রভৃতি (নৈকটা প্রভৃতি) অর্থের বিবক্ষা হইলে অন্ত ও বহুপ্রকার তদভিধায়ী অর্থাৎ বর্তমান-প্রতিপাদক প্রয়োগ লোকে উৎপ্রেক্ষা করিবে (বুঝিয়া নইবে)। অতএব বর্তমান কাল আছে।

টিপ্পনী। বর্তমান কাল নাই, এই পূর্বপক্ষের অবতারণা করিয়া, তৎপরে স্বত্বকার মহর্ষি পূর্বোক্ত তিন স্বত্বের দ্বারা বর্তমান কাল আছে, ইহা অবশ্য স্বীকার্য, ইহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। কিন্তু বর্তমান কালের ব্যঞ্জক বা বোধক কি? কিসের দ্বারা কিরূপে বর্তমান কাল বুঝা যায়? তাহা বলা আবশ্যক। এ জ্ঞাত মহর্ষি এই স্বত্বের দ্বারা বলিয়াছেন যে, উভয় প্রকারে বর্তমান কালের জ্ঞান হয়। মহর্ষির গূঢ় বক্তব্য এই যে, কাল পদার্থ অথবা অর্থাৎ এক, বর্তমানাদিত্তে বক্তব্য কালের কোন ভেদ নাই। কিন্তু যে ক্রিয়ার দ্বারা কালের জ্ঞান হয়, সেই ক্রিয়ার বর্তমানবাদবিশতঃই কালে বর্তমানবাদের জ্ঞান হয়। এই জ্ঞানই ক্রিয়াকে কালের উপাধি বলে। ক্রিয়াগত বর্তমানবাদি ধর্ম কালে আরোপিত হয়; হুতরাং ক্রিয়াকে কালের উপাধি বলা যায়। ভাব্যকার এই অভিপ্রায়েই প্রথমে ভবিষ্যৎ ক্রিয়াকে ভবিষ্যৎকাল এবং অতীত ক্রিয়া বা ক্রিয়া-নিবৃত্তিকে অতীত কাল এবং বর্তমান ক্রিয়াকে বর্তমান কাল বলিয়াছেন। বর্তমান কালের উভয় প্রকারে জ্ঞান হয়, এই কথা দ্বারা সূচিত হইয়াছে যে, বর্তমান কাল বিবিধ;—কোন স্থলে ক্রিয়ামাত্রব্যঙ্গ্য, কোন স্থলে ক্রিয়ানন্তানব্যঙ্গ্য। ভাব্যকার মহর্ষির এই স্বত্বানুসারেই পূর্বস্বত্বভাষ্যে এ কথা বলিয়াছেন। তন্মধ্যে “ত্রব্য বিদ্যমানে আছে” এইরূপ প্রয়োগস্থলে অস্তিত্ব বা স্থিতিক্রিয়াব্যঙ্গ্য বর্তমান কাল। “পাক করিতেছে”, “ছেদন করিতেছে” এইরূপ প্রয়োগস্থলে পাকাদিক্রিয়ানন্তানব্যঙ্গ্য বর্তমান কাল। কিন্তু পূর্বোক্ত উভয়বিধ স্থলেই যদি বর্তমান ক্রিয়ার দ্বারা বর্তমান কাল বুঝা যায়, তাহা হইলে উভয় স্থলে এক প্রকারেই জ্ঞান হয়। বর্তমান কালের উভয় প্রকারে জ্ঞান হইবার হেতু কি? এই জ্ঞাত মহর্ষি তাহার হেতু বলিয়াছেন যে, কৃততা ও কর্তব্যতার উপপত্তি। ক্রিয়া অতীত হইলে সেই কার্যকে “কৃত” বলে। ক্রিয়া অনারম্ভ ও চিকীর্ণিত হইলে, সেই ভাবি কার্যকে “কর্তব্য” বলে। ক্রিয়া বর্তমান হইলে সেই কার্যকে ক্রিয়মাণ বলে। কৃত, কর্তব্য ও ক্রিয়মাণের ধর্ম বর্ণনাক্রমে কৃততা, কর্তব্যতা ও ক্রিয়মাণতা। হুতরাং অতীত ক্রিয়াকে “কৃততা” এবং ভবিষ্যৎ ক্রিয়াকে “কর্তব্যতা” এবং বর্তমান ক্রিয়াকে “ক্রিয়মাণতা” বলা যায়। ভাব্যকার তাহাই ব্যাখ্যা করিয়া মহর্ষি যে অতীত ক্রিয়াকেই “কৃততা” এবং ভবিষ্যৎ ক্রিয়াকেই “কর্তব্যতা” বলিয়াছেন, ইহা প্রকাশ করিয়াছেন এবং ভাব্যকারের প্রথমোক্ত কালত্রয়ের ব্যাখ্যানুসারে কৃততা ও কর্তব্যতা বলিতে কলতঃ বর্ণনাক্রমে অতীত ও ভবিষ্যৎকাল, ইহাও প্রকাশ করিয়াছেন। তাই পরেই বলিয়াছেন যে, এইরূপ ক্রিয়া-সম্বন্ধ কালত্রয়ের সমাহার “পাক করিতেছে”, “পাক হইতেছে” এইরূপ প্রয়োগস্থলে বর্তমান-বোধক শব্দের দ্বারা বুঝা যায়। কারণ, এইরূপ প্রয়োগস্থলে পাকক্রিয়াসম্বন্ধের অবিচ্ছেদ্যই বিবক্ষিত,



তাহাই ঐ স্থলে বর্তমানবোধক বিভক্তির দ্বারা কথিত হয়। চুল্লীতে স্থানীয় আরোহণ হইতে অবদোনে অবতারণ পর্যন্ত যে ক্রিয়াকলাপ, তাহা যথাক্রমে অবিচ্ছেদে হইতেছে, ইহা বুঝাইতেই “পাক করিতেছে” এইরূপ প্রয়োগ হয়। ঐ ক্রিয়াকলাপের আরম্ভের বিবক্ষাস্থলে “পাক করিবে” এবং উহার নিবৃত্তির বিবক্ষাস্থলে “পাক করিয়াছে” এইরূপই প্রয়োগ হয়। তাই ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, পূর্বোক্ত স্থলে তদানিতদন্ত ক্রিয়াকলাপের আরম্ভ কথিত হয় না, নিবৃত্তিও কথিত হয় না; তাহার অবিচ্ছেদই কথিত হয়; এই জন্যই “পাক করিতেছে” ইত্যাদি প্রকার কালক্রম-সম্বন্ধ বর্তমান প্রয়োগ হইয়া থাকে। মূল কথা, “পাক করিতেছে” ইত্যাদি প্রয়োগ স্থলে কেবল বর্তমান কালেরই জ্ঞান হয় না—কালক্রমেরই জ্ঞান হয়; কারণ, ঐ স্থলে কৃতত্ব ও কর্তব্যত্ব অর্থাৎ অতীত ক্রিয়া ও ভবিষ্যৎ ক্রিয়ারও উপপত্তি (জ্ঞান) আছে। “পাক করিতেছে” এইরূপ প্রয়োগ করিলে বুঝা যায়, পূর্বোক্ত তদানি-তদন্ত পাকক্রিয়া-সম্বন্ধের মধ্যে কতকগুলি ক্রিয়া অতীত, কতকগুলি ক্রিয়া অনাগত অর্থাৎ তাবী এবং একটি ক্রিয়া বর্তমান। কিন্তু “দ্রব্য বিদ্যমান আছে” এইরূপ প্রয়োগ স্থলে যে অস্তিত্ব বা স্থিতিক্রিয়ার দ্বারা বর্তমান কাল বুঝা যায়, সে ক্রিয়া এক এবং কেবল বর্তমান, সেখানে পূর্বোক্ত কৃতত্ব ও কর্তব্যত্বের জ্ঞান নাই; এজন্য কেবল বর্তমান কালেরই জ্ঞান হয়। সুতরাং “পাক করিতেছে” এবং “দ্রব্য বিদ্যমান আছে” এই উভয় স্থলে এক প্রকারেই বর্তমান কালের জ্ঞান হয় না—উভয় স্থলে উভয় প্রকারেই বর্তমান কালের জ্ঞান হয়। ভাষ্যকার মহর্ষি-মুদ্রাসূত্রে এখানে উভয় প্রকার বর্তমান কাল ব্যাখ্যা করিতে বলিয়াছেন, অতীত ও ভবিষ্যৎ কালের সহিত “অপবৃক্ত” বর্তমান কাল এবং অতীত ও ভবিষ্যৎ কালের সহিত “ব্যপবৃক্ত” বর্তমান কাল। উদ্যোতকের স্থিতিক্রিয়াব্যবস্থা বর্তমান কালকেই অতীত ও ভবিষ্যৎ কালের সহিত “ব্যপবৃক্ত” বলিয়াছেন<sup>১</sup>। ভাষ্যকারের সন্দর্ভের দ্বারা বুঝা যায়, স্থিতিব্যবস্থা বর্তমান কালকেই তিনি অতীত ও ভবিষ্যৎ কালের সহিত (১) অপবৃক্ত অর্থাৎ অসম্পৃক্ত বা সম্বন্ধশূন্য বলিয়াছেন। এবং পাকাদি ক্রিয়াসম্বন্ধ-ব্যবস্থা বর্তমান কালকেই অতীত ও ভবিষ্যৎ কালের সহিত (২) ব্যপবৃক্ত অর্থাৎ সম্পৃক্ত বা সম্বন্ধবৃদ্ধ বলিয়াছেন। কিন্তু উদ্যোতকের অসম্পৃক্ত অর্থে “ব্যপবৃক্ত” শব্দের প্রয়োগ করায় তাহার কথাসূত্রেই অমুবাদে পূর্বোক্তরূপ ভাষ্যব্যাখ্যা করা হইয়াছে। উদ্যোতকের কথাসূত্রে ভাষ্যকারের প্রথমোক্ত “অপবৃক্ত” শব্দের অর্থ বুঝিতে হইবে সম্পৃক্ত। এবং পূর্বোক্ত “পচতি পচাতে” এইরূপ প্রয়োগস্থলেই ঐ অপবৃক্ত বর্তমান কালের উদাহরণ বুঝিয়া, শেষোক্ত “বিদ্যাতে জব্যং” এইরূপ প্রয়োগ স্থলে শেষোক্ত ব্যপবৃক্ত বর্তমান কালের উদাহরণ বুঝিতে হইবে। “পচতি ছিন্তি” এইরূপ প্রয়োগ কালক্রম-সম্বন্ধ। কারণ, তাহা পাকাদি ক্রিয়াসম্বন্ধের অবিচ্ছেদ প্রতীপাদক, এই কথা বলিয়া শেষে ভাষ্যকার পূর্বোক্ত স্থিতিব্যবস্থা বর্তমান কাল হইতে পাকাদি ক্রিয়াসম্বন্ধব্যবস্থা বর্তমান কালের

১। কেবলমাত্র ব্যপবৃক্তত্বাতিতান্যতাত্ত্ব্য সম্পৃক্তত্বাৎ তাত্ত্ব্যমিতি। ক পুনর্বাণপৃক্তত্ব ? বিদ্যাতে প্রথমিতত্ত্বের বি-  
বেচনায় তত্ত্ব বর্তমানোহভিধায়তে। পচতি ছিন্তিতত্ত্ব সম্পৃক্তং। কথং ? কান্তিবর ক্রিয়া ব্যতীতঃ কান্তিসমন্যতঃ  
এক চ বর্তমান ইতি।—ভাষ্যবাস্তবিক।



ভেদ সমর্থনপূর্বক মহাবিশ্বমুক্ত বর্তমান কালের উভয় প্রকারে গ্রহণের কারণ সমর্থন করিয়াছেন এবং সূত্রের অবতারণা করিতে প্রথমে “তস্মিন্ ক্রিয়মাণে” এই কথা বলিয়া, পাকাদি ক্রিয়াসম্মান স্থলে বর্তমান ক্রিয়ার সম্বন্ধবশতঃই যে তত্বাদিকে ক্রিয়মাণ অর্থাৎ বর্তমান ক্রিয়াবিশিষ্ট বলে, তাহাতে সেই স্থলে অতীত ক্রিয়ারূপ কৃততা ও ভবিষ্যৎ ক্রিয়ারূপ কর্তব্যতারও জ্ঞান হওয়ায়, ঐ স্থলে ত্রিবিধ ক্রিয়াব্যঙ্গ্য ত্রিবিধ কালেরই জ্ঞান হয়, ইহাই সূত্রকারের অন্তিমত বলিয়া ভাষ্যকার প্রকাশ করিয়াছেন ।

ভাষ্যকার শেষে বর্তমান কালের অস্তিত্ব বিষয়ে আরও একটি যুক্তি প্রদর্শন করিতে বলিয়াছেন যে, নৈকট্য প্রভৃতি অর্থবিবক্ষায় স্থলে আরও বহু প্রকার বর্তমান প্রয়োগ আছে, তাহা বুঝিয়া লইবে । ভাষ্যকারের গূঢ় তাৎপর্য্য এই যে, লোকে কোন সময়ে অতীত স্থলেও বর্তমান প্রয়োগ হয় এবং অনাগত ভবিষ্যৎ স্থলেও বর্তমান প্রয়োগ হয় । যেমন কেহ আগমন করিয়া অর্থাৎ তাহার আগমন অতীত হইলেও বলিয়া থাকেন “এই আমি আসিলাম” এবং না যাইয়াও অর্থাৎ গমন-ক্রিয়ার অনারম্ভ স্থলেও বলিয়া থাকেন, “এই আসিতেছি” । পূর্বোক্ত দুই স্থলে বস্তুতঃ আগমনক্রিয়া অতীত ও ভবিষ্যৎ হইলেও তাহার নৈকট্য বিবক্ষা থাকার অর্থাৎ ঐরূপ বাক্যবক্তার আগমন-ক্রিয়া প্রত্যাশার বা নিকটবর্তী, তিনি কিয়ৎক্ষণ পূর্বেই আসিয়াছেন এবং কিয়ৎক্ষণ পরেই যাইবেন, এইরূপ বলিবার ইচ্ছাবশতঃই ঐরূপ বর্তমান প্রয়োগ হইয়া থাকে । নিকটাতীত ও নিকট-ভবিষ্যৎ স্থলে ঐরূপ বর্তমান প্রয়োগ সূচিরপ্রসিদ্ধ ও ব্যাকরণ শাস্ত্রসম্মত । ঐ বর্তমান প্রয়োগ মুখ্য নহে—উহা ভাক্ত বা গৌণ বর্তমান প্রয়োগ । কিন্তু যদি কোন স্থলে মুখ্য বর্তমান না থাকে, তাহা হইলে তন্মূলক গৌণ বর্তমান প্রয়োগও হইতে পারে না । গৌণ প্রয়োগ বলিতে গেলেই তাহার মুখ্য প্রয়োগ অবশ্যই দেখাইতে হইবে । সুতরাং যখন পূর্বোক্তরূপ বহু প্রকার গৌণ বর্তমান প্রয়োগ আছে, তখন কোন স্থলে মুখ্য বর্তমানের অবশ্য স্বীকার্য্য । যেখানে বর্তমানের বর্থাৎ জ্ঞান হয় ; অতএব বর্তমান কাল অবশ্যই আছে । বর্তমান কাল থাকিলে তৎসাপেক্ষ অতীত ও ভবিষ্যৎকালও আছে, সুতরাং অল্পমান ত্রিকালীন পদার্থবিষয়ক, এই সিদ্ধান্তের কোন বাধা নাই । ইহাই এই প্রকরণের দ্বারা মহাবিশ্ব সমর্থন করিয়াছেন ॥ ৪০ ॥

বর্তমান-পরীক্ষা-প্রকরণ সমাপ্ত ।

—০—

সূত্র । অত্যন্তপ্রায়ৈকদেশসাধর্ম্যাছুপমানা-

সিদ্ধিঃ ॥ ৪৪ ॥ ১০৫ ॥

অনুবাদ । ( পূর্বপক্ষ ) অত্যন্তসাধর্ম্যপ্রযুক্ত অর্থাৎ সর্ববাংশে সাদৃশ্যপ্রযুক্ত এবং প্রায়িক সাধর্ম্যপ্রযুক্ত অর্থাৎ বহু সাদৃশ্যপ্রযুক্ত এবং একদেশ-সাধর্ম্য-প্রযুক্ত অর্থাৎ আংশিক সাদৃশ্য প্রযুক্ত উপমানের সিদ্ধি হয় না [ অর্থাৎ পূর্বোক্ত ত্রিবিধ

সাদৃশ্য ভিন্ন আর কোন প্রকার সাদৃশ্য নাই। ঐ ত্রিবিধ সাদৃশ্যপ্রযুক্ত যখন উপমান সিদ্ধি হয় না, তখন সাদৃশ্যমূলক উপমান-প্রমাণ সিদ্ধ হইতে পারে না।]

ভাষ্য। অত্যন্তসাধর্ম্যাত্মপমানং ন সিধ্যতি। ন চৈবং ভবতি যথা গোরেবং গৌরিত্তি। প্রায়ঃ সাধর্ম্যাত্মপমানং ন সিধ্যতি, নহি ভবতি যথাহনড্রানেবং মহিব ইতি। একদেশসাধর্ম্যাত্মপমানং ন সিধ্যতি, নহি সর্বেষণ সর্বমুপমীয়ত ইতি।

অনুবাদ। অত্যন্ত সাধর্ম্যপ্রযুক্ত উপমান সিদ্ধ হয় না; যেহেতু ‘যেমন গো, এমন গো’ এইরূপ (উপমান) হয় না। প্রায়িক সাদৃশ্যপ্রযুক্ত উপমান সিদ্ধ হয় না; যেহেতু ‘যেমন বৃষ, এমন মহিব’ এইরূপ (উপমান) হয় না। একদেশ-সাধর্ম্যপ্রযুক্ত উপমান সিদ্ধ হয় না; যেহেতু সকল পদার্থের সহিত সকল পদার্থ উপমিত হয় না। (অর্থাৎ যদি আংশিক সাধর্ম্যপ্রযুক্ত উপমান স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে সকল পদার্থেই সকল পদার্থের আংশিক সাধর্ম্য থাকায় “যেমন মেরু, সেইরূপ সর্বপ” এইরূপও উপমান হইতে পারে। কারণ, মেরু ও সর্বপেও কোন অংশে সাধর্ম্য বা সাদৃশ্য আছে)।

টিপ্পনী। পূর্বাশ্রয়ণে বর্তমান-পরীক্ষা হইয়াছে। বর্তমান-পরীক্ষা অগ্রমান-পরীক্ষার অন্তর্গত। অগ্রমান-পরীক্ষার পরে উদ্দেশ্য ও লক্ষণের জ্ঞানদ্বারা এখন উপমানই অবসরপ্রাপ্ত। তাই মহাবি অবসর-সংগতিতে এখন উপমানের পরীক্ষা করিতেছেন। প্রথমাধ্যায়ে উপমানের লক্ষণ-সূত্রে বলা হইয়াছে যে, প্রসিদ্ধ অর্থাৎ প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাত পদার্থের সহিত নাবদ্যব্যপত্ত অর্থাৎ সেই সাধর্ম্য প্রত্যক্ষ-জ্ঞাত সাধের সিদ্ধি উপমিত্তি; তাহার কারণই উপমান-প্রমাণ। যেমন “যথা গো, তথা গবয়” এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া, অরুণ্যে গবয় পশুতে গোলাদৃশ্য প্রত্যক্ষ করিলে, ঐ পূর্বজ্ঞাত বাক্যার্থের দ্রবণ-সহকৃত ঐ সাদৃশ্য প্রত্যক্ষ “এইটি গবয়” এইরূপে সংজ্ঞা-সংজ্ঞি সম্বন্ধ-বোধের করণ হইয়া উপমান-প্রমাণ হয়। মহাবি এই সিদ্ধান্তে এই সূত্রের দ্বারা পূর্বপক্ষ বলিয়াছেন যে, আত্যন্তিক, প্রায়িক অথবা আংশিক সাধর্ম্যপ্রযুক্ত উপমান সিদ্ধ হইতে পারে না। ভাষ্যকার মহাবির বক্তব্য বুঝাইতে বাহা বলিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য্য বর্ণন করিতে তাৎপর্য্যটীকার বলিয়া-ছেন যে, “যথা গো, তথা গবয়” এই বাক্যে বনি গোর সহিত গবয়ের অত্যন্ত সাধর্ম্য অর্থাৎ গবয়ে গোপত সকল ধর্ম্ববস্তুরূপ সাধর্ম্যই বিবক্ষিত হয়, তাহা হইলে গবয় গোভিন্ন হয় না, গোবিশেষই হইয়া পড়ে। তাহা হইলে “যথা গো, তথা গবয়” এই বাক্যের অর্থ হয় “যথা গো, তথা গো”। তাই ভাষ্যকার বলিয়াছেন-যে, “যথা গো, তথা গো” এইরূপ উপমান হয় না। ভাষ্যে “ন চৈবং” এই ক্লে “চ” শব্দ বেদ্বর্গ। আঃ যদি “যথা গো, তথা গবয়” এই বাক্যে প্রায়িক সাধর্ম্য অর্থাৎ গবয়ে গোপত বহু ধর্ম্ববস্তুই বিবক্ষিত হয়, তাহা হইলে মহাবেও গোর বহু সাধর্ম্য থাকায় তাহাও



গবয়-পদবাচ্য হইয়া পড়ে। তাহা হইলে “বথা বৃষ, তথা গবয়” এই বাক্যের “বথা বৃষ, তথা মহিষ” এইরূপ অর্থ হইতে পারে। তাই ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, “বথা বৃষ, তথা মহিষ” এইরূপ উপমান হয় না। অর্থাৎ দেহেতু ঐরূপ উপমান হয় না, অতএব প্রায়িক সাধর্ম্যপ্রযুক্ত উপমান সিদ্ধ হইতে পারে না। তাহা হইলে মহিষও গোর বহু সাধর্ম্য থাকায়, তাহারও গবয়-পদবাচ্যতা হইয়া পড়ে। আংশিক সাধর্ম্য বিবক্ষিত হইলে সকল পদার্থের সহিতই সকল পদার্থের আংশিক সাধর্ম্য থাকায় “বথা গো, তথা গবয়” ইহার জায় “বথা মেষ, তথা সর্বপ” এইরূপও উপমান হইতে পারে। সুতরাং আংশিক সাধর্ম্য প্রযুক্ত উপমানের উপপত্তি হইতেই পারে না। ফলকথা, প্রথমাব্যয়ে উপমান-লক্ষণস্বত্রে যে “সাধর্ম্য” বলা হইয়াছে, সেই সাধর্ম্য কি আভাসিক? অথবা প্রায়িক? অথবা আংশিক? এই ত্রিবিধ ভিন্ন আর কোন প্রকার সাধর্ম্য হইতে পারে না। এখন যদি পূর্বোক্ত ত্রিবিধ সাধর্ম্যপ্রযুক্তই উপমান-সিদ্ধি না হয়, তাহা হইলে উপমান-প্রমাণ অসিদ্ধ, ইহাই পূর্বপক্ষ ॥ ৪৪ ॥

**সূত্র।** প্রসিদ্ধসাধর্ম্যাদুপমানসিদ্ধৈর্যথোক্তদোষানুপ-  
পত্তিঃ ॥৪৫॥১০৬॥

অনুবাদ। (উত্তর) প্রসিদ্ধ সাধর্ম্যপ্রযুক্ত অর্থাৎ প্রজ্ঞাত পদার্থের সহিত (কোন পদার্থের) প্রকরণাদিবশতঃ প্রজ্ঞাত সাধর্ম্যপ্রযুক্ত উপমানের সিদ্ধি হয়, এ জন্ম যথোক্ত দোষের (পূর্বসূত্রোক্ত দোষের) উপপত্তি হয় না।

ভাষ্য। ন সাধর্ম্যস্য কুৎসপ্রায়াল্লাভবমাপ্রিত্যোপমানং প্রবর্ততে, কিং তর্হি? প্রসিদ্ধসাধর্ম্যাং সাধ্যসাধনভাবমাপ্রিত্য প্রবর্ততে। যত্র চৈত-  
দন্তি, ন তত্রোপমানং প্রতিবেক্ষুং শক্যং, তস্মাদবধোক্তদোষো নোপ-  
পদ্যত ইতি।

অনুবাদ। সাধর্ম্যের কুৎসতা, প্রায়িক বা অল্পতাকেই আশ্রয় করিয়া উপমান (উপমান-বাক্য) প্রবৃত্ত হয় না। (প্রশ্ন) তবে কি? (উত্তর) প্রসিদ্ধ সাধর্ম্যপ্রযুক্ত সাধ্য-সাধন ভাব আশ্রয় করিয়া (উদ্দেশ্য করিয়া) (উপমান) প্রবৃত্ত হয়। যে স্থলে ইহা (প্রসিদ্ধ সাধর্ম্য) আছে, সে স্থলে উপমানকে প্রতিবেধ করিতে পারা যায় না। সুতরাং যথোক্ত দোষ উপপন্ন হয় না।

টীকনী। মহর্ষি এই স্বত্বের দ্বারা পূর্বসূত্রোক্ত পূর্বপক্ষের নিরাস করিয়াছেন। এইটি সিদ্ধান্ত-সূত্র। মহর্ষির বক্তব্য বুঝাইতে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, সাধর্ম্যের কুৎসতা, প্রায়িকত্ব, অথবা অল্পতাকেই উদ্দেশ্য করিয়া উপমান গ্রহণ হইতে পারে না। অর্থাৎ প্রথমে “বথা গো, তথা

গবয়" এইরূপ যে উপমান-বাক্য প্রয়োগ হয়, তাহাতে গবয়ে গোর আত্যন্তিক সাধর্ম্য অথবা প্রারম্ভিক সাধর্ম্য অথবা অল্প বা আংশিক সাধর্ম্যই যে নিয়মতঃ বক্তার বিবক্ষিত থাকে, তাহা নহে। ঐ সাধর্ম্য আত্যন্তিক, অথবা প্রারম্ভিক, অথবা আংশিক, এইরূপ কোন নিয়ম নাই। উপমানবাক্য-বাদী কোন স্থলে কোন সাদৃশ্যবিশেষ আশ্রয় করিয়াই ঐরূপ বাক্য প্রয়োগ করেন। সেই সাদৃশ্য বা সাধর্ম্য সেখানে আত্যন্তিক, অথবা প্রারম্ভিক, অথবা আংশিক, তাহা প্রকরণাদির সাহায্যে বুঝিয়া লইতে হইবে। তাৎপর্য্যটীকাকার তাৎপর্য্য বর্ণন করিয়াছেন যে, "বথা গো, তথা গবয়" এইরূপ বাক্য প্রকরণাদিনাগেণ হইয়াই স্বার্থবোধ জন্মায়। প্রকরণাদি জ্ঞান ব্যতীত ঐরূপ বাক্য দ্বারা প্রকৃতার্থ বোধ জন্মে না। প্রকরণাদি জ্ঞানবশতঃ সাধর্ম্যবোধক বাক্যের দ্বারা কোন স্থলে আত্যন্তিক সাধর্ম্য, কোন স্থলে প্রারম্ভিক সাধর্ম্য, কোন স্থলে আংশিক সাধর্ম্য বুঝা যায়। যে ব্যক্তি মহিষাদি জ্ঞানে, তাহার নিকটে "বথা গো, তথা গবয়" এইরূপ বাক্য বলিলে, তখন সেই ব্যক্তি মহিষাদিতে গোর যে সাদৃশ্য আছে, তদ্ব্তিম সাদৃশ্যই বক্তার বিবক্ষিত বলিয়া বুঝে। সুতরাং বনে বাইরা মহিষাদিতে গোর প্রারম্ভিক সাধর্ম্য বা ভূরি সাদৃশ্য দেখিয়াও মহিষাদিকে গবয়-পদবাচ্য বলিয়া বুঝে না। কারণ, প্রকরণাদি পর্য্যালোচনার দ্বারা মহিষাদিব্যাপ্ত সাধর্ম্যই পূর্কোক্ত বাক্যের দ্বারা সে বুঝিয়া থাকে। সে সাধর্ম্য গবয়ে গোর প্রারম্ভিক সাধর্ম্য। ফল কথা, যে ব্যক্তি মহিষাদি পদার্থ জ্ঞানে না, তাহার নিকটে পূর্কোক্ত বাক্য বলিলে সে ব্যক্তি বক্তার বিবক্ষিত মহিষাদি ব্যাপ্ত গোসাদৃশ্য বুঝিতে পারে না। সুতরাং তাহার দর্শনে ঐ বাক্য উপমান হইবে না। মহর্ষি "প্রসিদ্ধ সাধর্ম্য" বলিয়া পূর্কোক্তপ্রকার অভিপ্রায় হচনা করিয়াছেন। ভাব্যকারের মতে "প্রসিদ্ধ সাধর্ম্য" এই বাক্যটি তৃতীয়াতৎপুরুষ সমাস। প্রসিদ্ধ অর্থাৎ প্রসিদ্ধ-রূপে জ্ঞাত পদার্থের সহিত সাধর্ম্যই প্রসিদ্ধ সাধর্ম্য। সেই সাধর্ম্যও প্রসিদ্ধ হওয়া আবশ্যক। কারণ, সাধর্ম্য থাকিলেও তাহার জ্ঞান না হইলে উপমিতি জন্মিতে পারে না। সুতরাং প্রসিদ্ধ পদার্থের সহিত যে প্রসিদ্ধ সাধর্ম্য, তাহাই উপমিতির প্রযোজকরূপে মহর্ষি-স্বত্রে সূচিত বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ ঐ সাধর্ম্যজ্ঞানকেই মহর্ষি উপমান বলিয়া হচনা করিয়াছেন। ঐ সাধর্ম্য প্রসিদ্ধি অর্থাৎ সাধর্ম্য জ্ঞানও উপমান স্থলে দ্বিবিধ আবশ্যক। প্রথমে "বথা গো, তথা গবয়" এইরূপ বাক্যজন্ত গবয়ে গোর সাধর্ম্য জ্ঞান, ইহা শব্দ সাধর্ম্য জ্ঞান। পরে বনে বাইরা গবয়ে গোর যে সাধর্ম্যপ্রত্যক্ষ, ইহা প্রত্যক্ষরূপ সাধর্ম্য জ্ঞান। পূর্কোক্ত বাক্যজন্ত সাধর্ম্য জ্ঞান না হইলে কেবল শেযোক্ত প্রত্যক্ষরূপ সাধর্ম্য জ্ঞানের দ্বারা গবয়-পদবাচ্যত্বের উপমিতিকল্প নিশ্চয় হইতে পারে না। এবং গবয়ে গোর সাধর্ম্য প্রত্যক্ষ না করিয়া কেবল পূর্কোক্ত বাক্যজন্ত সাধর্ম্য জ্ঞানের দ্বারাও ঐরূপ নিশ্চয় হইতে পারে না। পূর্কোক্ত বাক্যজন্ত সাধর্ম্য-জ্ঞানজন্ত যে সংস্কার থাকে, ঐ সংস্কার বনে গবয়ে গোসাদৃশ্য প্রত্যক্ষের পরে উদ্ভূত হইয়া পূর্কোক্ত বাক্যার্থের স্মৃতি জন্মায়। ঐ স্মৃতিসহকৃত প্রত্যক্ষাত্মক সাধর্ম্য জ্ঞানই অর্থাৎ গবয়ে গোর সাদৃশ্য বর্ণনই "ইহা গবয়-পদবাচ্য" এইরূপে সেই প্রত্যক্ষদৃষ্ট গবয়বিশিষ্ট পদতত্তে গবয়-পদবাচ্যত্বের নিশ্চয় জন্মায়। ঐ নিশ্চয়ই ঐ স্থলে উপমিতি। পূর্কোক্ত সাদৃশ্য বর্ণন উপমান-প্রমাণ।



স্বাধীনতার জয়ন্ত ভট্ট বলিয়াছেন যে, বুদ্ধ নৈয়ায়িকগণ “বখা গো, তথা গবয়” এই বাক্যকেই পূর্বোক্ত স্থলে উপমান-প্রমাণ বলেন<sup>১</sup>। নগরবাদী, অরণ্যবাদীর পূর্বোক্ত বাক্য দ্বারা গবয় গবয়-পদবাচ্য নিশ্চয় করিতে পারে না, পূর্বোক্ত বাক্য শ্রবণ ও তাহার অর্থবোধের পরে, বনে বাইরা গবয়ে গোসাদৃশ্য প্রত্যক্ষ করিয়াই গবয়ে গবয়-পদবাচ্য নিশ্চয় করে। এ অল্প অরণ্য-বাদীও নগরবাদীকে তাহার ঐ নিশ্চয়ে সাদৃশ্যরূপ উপাস্ত্রের উপদেশ করে, সুতরাং অরণ্যবাদীর পূর্বোক্তরূপ বাক্য শব্দ হইয়াও শব্দপ্রমাণ হইবে না, উহা উপমান নামে প্রমাণাত্মক। যদি অরণ্যবাদী নগরবাদীকে গবয়ে গবয়-পদবাচ্য নিশ্চয়ে সাদৃশ্যরূপ উপাস্ত্রের উপদেশ না করিত এবং যদি নগরবাদীর অরণ্যবাদীর পূর্বোক্তরূপ বাক্যার্থ বুঝিয়াই সেই বাক্যের দ্বারা গবয়ে গবয়-পদবাচ্য নিশ্চয় হইত, তাহা হইলে উহা অবশ্য শব্দপ্রমাণ হইত। জয়ন্ত ভট্ট এইরূপ মুক্তির দ্বারা বুদ্ধ নৈয়ায়িকগণের মত সমর্থন করিয়া, শেষে বলিয়াছেন যে, ভাষাকারের সন্দর্ভের দ্বারাও তাঁহার এই মত বুঝিতে পারা যায় অর্থাৎ ভাষাকারও যেন এই মতাবলম্বী, ইহা বুঝা যায়। বস্তুতঃ উপমান-লক্ষণসূত্র-ভাষ্যে (১।১।৬) ভাষাকার “বখা গো, তথা গবয়”, “বখা মুদগ, তথা মুদগপর্ণী” ইত্যাদি সাদৃশ্যবোধক বাক্যকে “উপমান” বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এই সূত্র-ভাষ্যেও (তাৎপর্যটীকাকারের ব্যাখ্যাহুযারে) পূর্বোক্তরূপ বাক্যকে উপমান বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু তিনি যে ঐ বাক্যকে উপমান-প্রমাণই বলিয়াছেন, তাহা নিঃসংশয়ে বুঝা যায় না। জয়ন্ত ভট্টও নিঃসংশয়ে ভাষাকারের ঐ মত প্রকাশ করেন নাই। সাদৃশ্য-প্রতিপাদক পূর্বোক্তরূপ বাক্য উপমিত্তির প্রয়োজক বলিয়া তাহাকে ঐ অর্থে ভাষাকার উপমান বলিতে পারেন। পরন্তু প্রমিত্তির চরন কারণকেই ভাষাকার মুখ্য প্রমাণ বলিয়াছেন, ইহা প্রথমাব্যয়ে প্রমাণ-সূত্র-ব্যাখ্যায় পট্টয়াছি। উপমিত্তির পূর্বকণ্ঠে পূর্বকৃত সেই বাক্য থাকে না। তখন সেই বাক্যের জ্ঞান করণা করিয়া কোনরূপে ঐ বাক্যের উপমিত্তি করণের উপপাদন করারও কোন প্রয়োজন দেখা যায় না। জয়ন্ত ভট্ট, বুদ্ধ নৈয়ায়িকদিগের পূর্বোক্তরূপ মত ব্যাখ্যা করিয়া শেষে বলিয়াছেন যে, আধুনিক নৈয়ায়িকগণ ব্যাখ্যা করেন যে, পূর্বোক্তরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া শেষে অপ্রসিদ্ধ পদার্থে প্রসিদ্ধ পদার্থের যে সাদৃশ্য প্রত্যক্ষ, তাহাই উপমান-প্রমাণ। উদ্যোতকরও পূর্বোক্তরূপ বাক্যার্থ-স্মৃতিসহকৃত সাদৃশ্য প্রত্যক্ষকে উপমান-প্রমাণ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বাচস্পতি মিশ্র সাংখ্যতত্ত্ব-কৌমুদীতে উপমান-প্রমাণগুণনারস্তে “বখা গো, তথা গবয়” এইরূপ বাক্যকে উপমান বলিয়া উল্লেখ করিলেও তাৎপর্যটীকার পূর্বোক্তরূপ সাদৃশ্য প্রত্যক্ষকেই উপমান-প্রমাণ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। জয়ন্ত ভট্ট, বুদ্ধ নৈয়ায়িক বলিয়া উদ্যোতকরের পূর্ববর্তী নৈয়ায়িকদিগকেই লক্ষ্য করিয়াছেন, বুঝা যায়। উদ্যোতকর পূর্বোক্তরূপ বাক্যকে উপমান-প্রমাণ বলেন নাই। তত্ত্বচিন্তামণিকার গবেশ “উপমান-চিন্তামণি”তে জয়ন্ত ভট্ট প্রকৃতির মত বলিয়া যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে জয়ন্ত ভট্টও পূর্বোক্তরূপ বাক্যার্থ-

১। উপমিত্তিতে অভিধেয় বাক্যার্থ লোভই হয়। ঐ বাক্যার্থ মরম ব্যাপার। সাদৃশ্যবিশিষ্ট পিতৃবর্ধন সহকারী কাণ্ড, তাহা কণ্ড নহে, ইহা সাদৃশ্যবোধক মত বলিয়া, মহাভেদ ভট্টও বিনকরীতে লিখিয়াছেন।



স্বতি-বহুত সাদৃশ্য প্রত্যক্ষকেই উপমান-প্রমাণ বলিতেন, তিনি বৃদ্ধ নৈয়ায়িকদিগের মত মানিতেন না, ইহা পাওয়া যায়।<sup>১</sup> পূর্বমীমাংসকদিগের মধ্যে এক সম্প্রদায় পূর্বোক্তরূপ বাক্যকে এবং শব্দর স্বামীর সম্প্রদায় পূর্বোক্তরূপ সাদৃশ্য প্রত্যক্ষকে উপমান-প্রমাণ বলিতেন, ইহা জ্ঞানকন্দলীকার ত্রীধর ভট্ট লিখিয়াছেন। মূলকথা, উপমানের প্রমাণান্তরত্ববাদীদিগের মধ্যে উপমান-প্রমাণের কল বিধরে যেমন মতভেদ পাওয়া যায়, তজ্জপ উপমান-প্রমাণের স্বরূপ বিষয়েও পূর্বোক্তরূপ মতভেদ পাওয়া যায়। উদ্যোতকর প্রভৃতি জ্ঞানচর্চায় পূর্বোক্তরূপ বাক্যকে উপমান-প্রমাণ বলেন নাই। ভাষ্যকার যে তাহাই বলিয়াছেন, ইহাও উদ্যোতকর প্রভৃতি বলেন নাই। উদ্যোতকর ও বাচস্পতি মিশ্র ভাষ্যকারের ঐ মত বুঝিলে তাহারা ঐ মতের উল্লেখ ও সমালোচনা করিতেন। মহর্ষির স্বত্বের দ্বারাও পূর্বোক্তরূপ বাক্যই উপমান-প্রমাণ, ইহা বুঝা যায় না। মহর্ষি “প্রসিদ্ধ-সাদৃশ্যঃ” এই কথার দ্বারা সাদৃশ্যজ্ঞানবিশেষকে উপমান-প্রমাণ বলিয়াছেন, বুঝা যায়।

তাৎপর্যটীকাকার বাচস্পতি মিশ্র, মহর্ষি-স্বত্রোক্ত “সাদৃশ্য” শব্দকে ধর্মস্বত্রের উপলক্ষণ বলিয়া বৈধর্ম্যোপমিতিরও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অস্ত্রাত্ম পক্ষর বৈধর্ম্য জ্ঞানজ্ঞাত উষ্ট্রে যে করত-পদবাচ্য নিশ্চয় হয়, তাহা বৈধর্ম্যোপমিতি। জগন্ত ভট্টের মতে এই বৈধর্ম্যোপমিতির উপপত্তি হয় না, ইহা উপমান-চিন্তানিষ্ঠে গল্পে উপাখ্যায় লিখিয়াছেন। তিনিও বাচস্পতি মিশ্রের তাৎপর্যটীকারই আংশিক অনুবাদ করিয়া বৈধর্ম্যোপমিতির উদাহরণ প্রদর্শনপূর্বক তাহা স্বীকার করিয়াছেন। তর্কিকরূপকার বরদরাজও বাচস্পতি মিশ্রের মতানুসারে বৈধর্ম্যোপমিতিরও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ভাষ্যকার বাংলায়ন উপমান-লক্ষণস্বত্রভাষ্যশেবে যে বলিয়াছেন, “অস্ত্র ও উপমানের বিবর আছে,” ঐ কথার দ্বারা বাচস্পতি মিশ্র ও বরদরাজ পূর্বোক্তরূপ বৈধর্ম্যোপমিতিরই সমর্থন করিয়াছেন। ভগবান্ ভাষ্যকার উপমানের বহু উদাহরণ বলিয়াও শেষে পূর্বোক্তরূপ বৈধর্ম্যোপমিতিও যে আছে, ইহা প্রকাশ করিতেই সেখানে “অতোহপি” ইত্যাদি সন্দর্ভ বলিয়াছেন, ইহা বাচস্পতি ও বরদরাজের কথা। কিন্তু সংজ্ঞাসংজ্ঞি লক্ষ্যের জ্ঞান জ্ঞত পদার্থও যে উপমান-প্রমাণের বিবর হয়, ইহাই ভাষ্যকারের ঐ কথার দ্বারা সরল ভাবে বুঝা যায়। জ্ঞানস্বত্রবৃত্তিকার মহামনোদী বিশ্বনাথ, ভাষ্যকারে ঐ কথার উল্লেখপূর্বক যে উদাহরণ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাতে বৃত্তিকারও যে ভাষ্যকারের ঐরূপ মতই বুঝিয়াছিলেন, ইহা বুঝা যায়। জ্ঞানস্বত্রবিবরণকার রাবামোহন গোস্বামিতত্ত্বচর্চায়, ভাষ্যকারের ঐরূপ তাৎপর্য স্বব্যক্ত করিয়াই লিখিয়াছেন<sup>২</sup>। পরন্তু ভাষ্যকার প্রথমার্থ্যে নিগমন-স্বত্রভাষ্যে উপমান-বাক্যকে

১। তমরাগমপ্রত্যক্ষাভ্যাসনানুবোধমাত্রমুখ্যসিদ্ধিঃ সাদৃশ্যজ্ঞানমুপমানপ্রমাণমিতি নরনৈয়ায়িকবহুত-প্রভৃতাঃ।—উপমানচিন্তামনি।

২। “এক শব্দভিত্তিকমুপমানবিধি ইতি ভাষ্য। তথাহি কা ওহী জরং হস্তি ইতি প্রেতং বশবুল-সমোহরী। অথ হস্তিতি বাক্যার্থজ্ঞানানুসারহরণকর্তৃকমুপমিত্যাবিসরীকরিত ইত্যাদি।” ১।১।৩ স্বত্রবিবরণ। গোদামী ভট্টাচার্যের কথিত উদাহরণের দ্বারা আটান কালে যে কোন লক্ষ্যের ঐরূপ মত সমর্থন করিতেন, ইহা তত্ত্ব-চিন্তামণির লক্ষণের দীকার অনুবোধ তত্ত্বচর্চায়ের কথা বুঝা যায়। অনুবোধ ঐ দীকার প্রাক্তে সংজ্ঞা-বিচারে



উপমান-প্রমাণ ক্রিকে বুলিয়াছেন, ইহা চিন্তা করা আবশ্যক। উপনয়-বাক্যের মূলে উপমান-প্রমাণ থাকা সম্ভব না হইলে ভাষ্যকার ঐ কথা বলিতে পারেন না। সংজ্ঞাসংজ্ঞি সম্বন্ধ ভিন্ন আর কোন পদার্থই যদি কখনও কুত্রাপি উপমান-প্রমাণের প্রমের না হয়, তাহা হইলে সর্বত্র উপনয়-বাক্য-প্রতিপাদ্য পদার্থ উপমান-প্রমাণের দ্বারা বুঝা অসম্ভব। অবশ্য মহর্ষির পরবর্তী সিদ্ধান্তসূত্রে “গবয়” শব্দের প্রয়োগ থাকায় গবয়-পদবাচ্য মহর্ষি গোতমের মতে উপমান-প্রমাণের প্রমের, ইহা নিঃসন্দেহে বুঝা যায় এবং তদনুসারেই জ্ঞানার্থ্যাগণ গবয়-পদবাচ্য নিশ্চয়কে উপমিত্তির উদাহরণরূপে সর্বত্র উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু মহর্ষি যে অতরূপ কোন বিষয়কে উপমান-প্রমাণের প্রমের বলিতেন না, ইহাও ত বুঝা যায় না। অতঃ সপ্তদ্বার-সম্বন্ধ উপমান-প্রমাণের প্রমের তিনি ত নিবেদন করেন নাই। গবয় শব্দের শক্তি নির্ণয় উপমান ভিন্ন আর কোন প্রমাণের দ্বারা হইতে পারে না, ইহা সকলে স্বীকার করেন নাই, ঐ বিষয়ে মতভেদ আছে। মহর্ষি এই জন্ত ঐ স্থলেরই উল্লেখপূর্বক তাহার বিশেষ মত ও বিশেষ যুক্তি প্রকাশ করিয়া, ঐ উদাহরণের দ্বারা উপমানের প্রমাণাস্তর সমর্থন করিয়াছেন, ইহাও মনে করা যাইতে পারে। কিন্তু মহর্ষির উপমান-লক্ষণসূত্রের দ্বারা যদি অতরূপ উদাহরণেও উপমান-প্রমাণ বুঝা যায়, তাহা হইলে উহাও অবশ্য মহর্ষির সম্বন্ধ বলিয়া গ্রহণ করিতে হয়। পরন্তু যদি কেবল গবয়াদি শব্দের শক্তিজন্যই উপমান-প্রমাণের রূপ হয়, তাহা হইলে তাহার মোক্ষোপযোগিতা ক্রিকে হয়, ইহাও চিন্তা করা আবশ্যক। উদ্যোতকর প্রকৃতি জ্ঞানার্থ্যাগণ গোতমকে মোক্ষোপযোগী বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। বস্তুতঃ মোক্ষশাস্ত্রে মোক্ষের অনুপযোগী পদার্থের বর্ণন সংগত নহে। মহর্ষি গোতম এই জন্ত সমস্ত ভাব ও সমস্ত অভাব পদার্থের উল্লেখ করেন নাই। উপমান-প্রমাণ মোক্ষের অনুপযোগী হইলে মহর্ষি গোতম কেন তাহার উল্লেখ করিয়াছেন? জ্ঞানমঞ্জরীকার ভরতভট্টও এই মোক্ষশাস্ত্রে উপমান-লক্ষণের কোথায় উপযোগিতা আছে, এই প্রশ্ন করিয়া, “সত্যমেবং” এই কথার দ্বারা ঐ পূর্বশব্দের দৃঢ়তা স্বীকারপূর্বক তত্বতঃ বলিয়াছেন যে, বস্তু-বিশেষে যে গবয়ালঙ্ঘন আছে, তাহার বিধিবাক্যে “গবয়” শব্দ প্রযুক্ত থাকায় তাহার অর্থনিশ্চয় আবশ্যক, তাহাতে উপমান-প্রমাণের উপযোগিতা আছে। ভরতভট্ট নিজেরও এই উত্তরে সন্তুষ্ট হইতে না পারিয়া, শেষে বলিয়াছেন যে, কল্পনার্হবুদ্ভি মূনি সর্বত্রগ্রহণবুদ্ধিবশতঃ মোক্ষোপযোগী না হইলেও এই শাস্ত্রে উপমান-প্রমাণের নিরূপণ করিয়াছেন। ভরতভট্টের কথা স্বীকার চিন্তা করিবেন। উপমান-প্রমাণ যে মোক্ষোপযোগী নহে, ইহা শেষে ভরতভট্ট ঐ কথা বলিয়া স্বীকারই করিয়াছেন। কিন্তু যদি সংজ্ঞাসংজ্ঞি সম্বন্ধ ভিন্ন আরও অনেক পদার্থ উপমান-প্রমাণের দ্বারা বুঝা যায় এবং ভাষ্যকার উপমান-লক্ষণ-সূত্রভাষ্যে “অন্তোহপি” ইত্যাদি সন্দর্ভের দ্বারা যদি তাহাই বলিয়া থাকেন, তাহা হইলে উপমান-প্রমাণের মোক্ষোপযোগিতা উপপন্ন হইতে পারে। মহর্ষি গোতমের যে তাহাই মত নহে, ইহা নির্দিষ্ট প্রতাপন করিবার কি উপায় আছে? শেষকথা, মহর্ষি

পূর্বোক্ত উদাহরণের উল্লেখপূর্বক কোন ব্যাখ্যা করিয়া, শেষে ঐ মত স্বীকার করিয়াই অর্থাৎ শব্দশক্তি ভিন্ন আর কোন পদার্থ উপমিত্তির বিঘ্ন হয় না, এই প্রচলিত মতকেই সিদ্ধান্ত বলিয়া ঐ ব্যাখ্যার নিরাস করিয়াছেন।



গোতনের অভিপ্রায় বা মত তাহাই ইউক, ভাষ্যকারের কথার দ্বারা এবং ব্যক্তিকার বিশ্বনাথ ও রাধামোহন গোস্বামিতট্টাচার্যের ব্যাখ্যার দ্বারা ভাষ্যকারের যে ঐক্যই মত ছিল, ইহা আমরা বুঝিতে পারি। পূর্বোক্তরূপ চিন্তার কলেই প্রথমাব্দ্যে নিগমনহৃত্ত-ভাষ্যের টিপ্পনীতে এ বিষয়ে পূর্বোক্তরূপ আলোচনা করিয়াছি। সুবীণণ এখানকার আলোচনার মনোযোগপূর্বক বিচার দ্বারা প্রকৃত বিষয়ে ভাষ্যকারের মত নির্ণয় করিবেন ৷ ৪৫ ৷

ভাষ্য। অস্ত তর্হি উপমানমনুমানম্ ?

অনুবাদ। তাহা হইলে উপমান অনুমান ইউক ?

সূত্র। প্রত্যক্ষেণাপ্রত্যক্ষসিদ্ধেঃ ॥ ৪৬॥১০৭॥

অনুবাদ। (পূর্বপক্ষ) যেহেতু প্রত্যক্ষ পদার্থের দ্বারা অপ্রত্যক্ষ পদার্থের সিদ্ধি (জ্ঞান) হয় [ অর্থাৎ অনুমানের দ্বারা উপমানস্থলেও যখন প্রত্যক্ষ গো পদার্থের দ্বারা অপ্রত্যক্ষ গবয়ের জ্ঞান হয়, তখন উপমান অনুমান ইউক ? ]

ভাষ্য। যথা ধূমেন প্রত্যক্ষেণাপ্রত্যক্ষস্ত বহুগ্রহণমনুমানং এবং গবাপ্রত্যক্ষেণাপ্রত্যক্ষস্ত গবরস্ত গ্রহণমিতি নেদমনুমানাদ্বিশিষ্ট্যতে।

অনুবাদ। যেমন প্রত্যক্ষ ধূমের দ্বারা অপ্রত্যক্ষ বহির অনুমানরূপ জ্ঞান হয়, এইরূপ প্রত্যক্ষ গোর দ্বারা অপ্রত্যক্ষ গবয়ের জ্ঞান হয়। এ জন্য ইহা অর্থাৎ পূর্বোক্তরূপ গবয়জ্ঞান অনুমান হইতে বিশিষ্ট (ভিন্ন) নহে।

টিপ্পনী। মহর্ষি পূর্বহৃত্তের দ্বারা পূর্বপক্ষ নিরাস করিয়া উপমানের প্রামাণ্য সমর্থন করিয়াছেন। কিন্তু ইহাতেও পূর্বপক্ষ হইতে পারে যে, উপমান প্রমাণ হইলেও তাহা অনুমান হইতে ভিন্ন কোন প্রমাণ নহে। কারণ, অনুমান স্থলে যেমন প্রত্যক্ষ পদার্থের দ্বারা কোন একটি অপ্রত্যক্ষ পদার্থের জ্ঞান হয়, উপমান স্থলেও তাহাই হয়, সুতরাং উপমান বস্তুতঃ অনুমানই। মহর্ষি এই হৃত্তের দ্বারা এই পূর্বপক্ষেরই উল্লেখ করিয়াছেন। তাই ভাষ্যকার প্রথমে "অস্ত তর্হি" ইত্যাদি সন্দর্ভের দ্বারা মহর্ষির এই হৃত্তোক্ত হেতুর সাধ্য নির্দেশ করিয়াছেন। ভাষ্যকারের ঐ সন্দর্ভের সহিত হৃত্তের যোজন্য বুঝিতে হইবে। ভাষ্যকার হৃত্তার্থ বর্ণনার বলিয়াছেন যে, যেমন প্রত্যক্ষ ধূমের দ্বারা<sup>১</sup> অপ্রত্যক্ষ বহির অনুমানজ্ঞান হয়, তরূপ প্রত্যক্ষ গোর দ্বারা অপ্রত্যক্ষ গবয়ের জ্ঞান হয়।

১। এখানে ধূম হেতু, বহি সাধ্য, ইহা ভাষ্যকারের সিদ্ধান্ত স্পষ্ট বুঝা যায়। কিন্তু উদ্বোধকরের মতে "এই ধূম বহিঃসিদ্ধি" এইরূপ অনুমিতি হয়। তাহার মতে ঐ অনুমানে ধূমবর্ণ হেতু। তাই উদ্বোধকর এখানে লিখিয়াছেন, "যথা প্রত্যক্ষেণ ধূমবর্ণেণ উর্দ্ধগজাধিনাং প্রত্যক্ষে ধূমবর্ণেহিহিঃসুখীকৃতঃ।" উদ্বোধকরের এই মত ভট্ট কুমারিলক জ্যোতির্ভট্টকে উল্লেখ করিয়াছেন। ভাষ্যকার যখন "ধূমেন প্রত্যক্ষেণ" এইরূপ কথা লিখিয়াছেন, তখন উদ্বোধকরের কথাকে ভাষ্যের ব্যাখ্যা বলিয়া গ্রহণ করা যায় না।



সুতরাং উহা অহুমান হইতে বিশিষ্ট নহে। অর্থাৎ প্রত্যক্ষ পদার্থের দ্বারা অপ্রত্যক্ষ পদার্থের প্রতিপাদক বলিয়া উপমান অহুমানের অন্তর্গত, উহা অতিরিক্ত কোন প্রমাণ নহে। উদ্যোতকরও এইরূপে পূর্বপক্ষের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ভাষ্যকার ও উদ্যোতকরের ব্যাখ্যাহুমায়ে পূর্বপক্ষের তাৎপর্য বুঝা যায় যে, “যথা গো, তথা গবয়” এই বাক্য শ্রবণের পরে গো প্রত্যক্ষ করিলে তদ্বারা তখন অপ্রত্যক্ষ গবয়কে গবয়সংজ্ঞাবিশিষ্ট বলিয়া যে বোধ হয়, তাহা প্রত্যক্ষ গো পদার্থের দ্বারা অপ্রত্যক্ষ গবয় পদার্থের বোধ ; সুতরাং অহুমিতি। মহাবির পরবর্তী সিদ্ধান্তহুত্রে “নাপ্রত্যক্ষে গবয়ে” এই কথা থাকায় এই হুত্রে পূর্বপক্ষের পূর্বোক্তরূপ তাৎপর্য বুঝা যায়। বৃত্তিকার বিধনাব প্রকৃতি নব্যগণ পূর্বোক্তরূপ পূর্বপক্ষ ব্যাখ্যা সংগত না বুঝিয়াই ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, প্রত্যক্ষ গো-সাদৃশ্যবিশেষের দ্বারা অপ্রত্যক্ষ গবয়পদবাচ্যের সিদ্ধি হয় অর্থাৎ পূর্বোক্তরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া গবয়ে গোসাদৃশ্য প্রত্যক্ষ করিলে “অহং গবয়পদবাচ্যো গোসদৃশবাং” এইরূপে গবয়পদবাচ্যের অহুমিতি হয়। সুতরাং উপমান অহুমান হইতে ভিন্ন প্রমাণ নহে। এইরূপ পূর্বপক্ষ-ব্যাখ্যা সংগত হইলেও ইহাতে পরবর্তী সিদ্ধান্তহুত্রে ব্যাখ্যার কষ্টকলনা করিতে হয়। বৃত্তিকার প্রকৃতি কষ্ট-কলনা করিয়াই পরবর্তী হুত্রে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাৎপর্যটীকাকার এই হুত্রে পূর্বপক্ষের ব্যাখ্যার বলিয়াছেন যে, “যথা গো, তথা গবয়” এই বাক্য শ্রবণ করিয়া তখন গবয় প্রত্যক্ষ করে, সেই সময়ে ঐ পূর্বোক্ত বাক্যার্থবোধ হইতে অধিক কিছু বুঝে না। সংজ্ঞাসংজ্ঞি সম্বন্ধে ঐ বাক্য দ্বারাই বুঝিয়া থাকে। সুতরাং প্রত্যক্ষ গোর দ্বারা গবয়সংজ্ঞাবিশিষ্ট গবয়ের বোধ অহুমিতি। অহুমান ভিন্ন উপমান-প্রমাণ নাই। ৪৬।

ভাষ্য। বিশিষ্যত ইত্যাহ। কয়া যুক্ত্যা?

অনুবাদ। বিশিষ্ট হয় অর্থাৎ পূর্বোক্ত উপমান অহুমান হইতে বিশিষ্ট, ইহা (মহাবির গৌতম) বলিয়াছেন। (প্রশ্ন) কোন্ যুক্তিবশতঃ?

সূত্র। নাপ্রত্যক্ষে গবয়ে প্রমাণার্থমুপমানস্ত

পশ্চামঃ ॥ ৪৭ ॥ ১০৮ ॥

অনুবাদ। (উত্তর) গবয় অপ্রত্যক্ষ হইলে অর্থাৎ “যথা গো, তথা গবয়” এই বাক্য শ্রবণ ও গোদর্শন করিয়াও গবয় না দেখিলে উপমান-প্রমাণের সম্বন্ধে “প্রমাণার্থ” অর্থাৎ উপমান-প্রমাণের ফল উপমিতি দেখি না [ অর্থাৎ সেরূপ স্থলে উপমিতি হয় না, সুতরাং পূর্বোক্তরূপে গবয় জ্ঞান উপমিতি নহে। গবয় প্রত্যক্ষ করিলে যে উপমিতিরূপ জ্ঞান জন্মে, তাহা অহুমিতি হইতে পারে না। ]

ভাষ্য। যদা হ্রস্বমূপবৃত্তোপমানো গোদর্শী গবা সমানমর্থঃ পশ্যতি, তদা “হয়ং গবয়” ইত্যুক্ত সংজ্ঞাশব্দস্ত ব্যবস্থাং প্রতিপদ্যতে। ন চৈব-



মনুমানমিতি । পরার্থকোপমানং, যন্তু হুপমেয়মপ্রসিদ্ধং, তদর্থং প্রসিদ্ধো-  
ভয়েন ক্রিয়ত ইতি । পরার্থমুপমানমিতি চেন্ন স্বয়মধ্যবসায়ঃ । ভবতি  
চ ভোঃ স্বয়মধ্যবসায়ঃ, যথা গোরেবং গবয় ইতি । নাধ্যবসায়ঃ প্রতি-  
বিধ্যতে, উপমানস্ত তন্ন ভবতি, প্রসিদ্ধসাধর্ম্যাৎ সাধ্যসাধনমুপমানং । ন চ  
যন্তোভয়ং প্রসিদ্ধং, তং প্রতি সাধ্যসাধনভাবো বিদ্যত ইতি ।

অনুবাদ । যেহেতু গৃহীতোপমান গোদর্শী ব্যক্তি অর্থাৎ যে ব্যক্তি গো  
দেখিয়াছে এবং “যথা গো, তথা গবয়” এই উপমানবাক্য গ্রহণ করিয়াছে, সেই ব্যক্তি  
যে সময়ে গোসদৃশ পদার্থ দর্শন করে, সেই সময়ে “ইহা গবয়” এইরূপে এই সংজ্ঞা  
শব্দের ( গবয় শব্দের ) ব্যবস্থা বুঝে অর্থাৎ এই প্রত্যক্ষ গবয়বিশিষ্ট জন্তুই “গবয়”  
এই সংজ্ঞার বাচ্য, ইহা নির্ণয় করে । অনুমান কিন্তু এইরূপ নহে । অর্থাৎ অনুমান-  
স্থলে ঐরূপ কারণজন্তু ঐরূপ বোধ হয় না ; সুতরাং উপমান অনুমান হইতে বিশিষ্ট ।

এবং উপমান পরার্থ । যেহেতু বাহার সম্বন্ধে উপমেয় অপ্রসিদ্ধ অর্থাৎ  
যে ব্যক্তি গবয়াদি উপমেয় পদার্থ জানে না, তাহার নিমিত্ত প্রসিদ্ধোভয় ব্যক্তি অর্থাৎ  
যে ব্যক্তি উপমেয় ও উপমান ( প্রকৃতস্থলে গবয় ও গো ) এই উভয় পদার্থই  
জানে, সেই ব্যক্তি ( পূর্বোক্ত উপমান-বাক্য ) করে অর্থাৎ তাহাকে বুঝাইবার জন্তুই  
পূর্বোক্ত উপমান-বাক্য প্রয়োগ করে । ( পূর্বপক্ষ ) উপমান পরার্থ, ইহা যদি  
বল ? না, অর্থাৎ তাহা বলিতে পার না । কারণ, নিজেরও নিশ্চয় হয় । বিশদার্থ  
এই যে, নিজেরও অর্থাৎ পূর্বোক্ত উপমানবাক্যবাদীরও ( ঐ বাক্যজন্তু ) “যথা  
গো, তথা গবয়” এইরূপ বোধ জন্মে । ( উত্তর ) অধ্যবসায় অর্থাৎ ঐ বাক্যজন্তু  
ঐ বাক্যবাদীরও যে বোধ, তাহা নিষিদ্ধ হইতেছে না, কিন্তু তাহা ( ঐ বাক্যবাদীর  
সম্বন্ধে ) উপমান হয় না । ( কারণ ) প্রসিদ্ধ সাধর্ম্যপ্রযুক্ত সাধ্যসাধন অর্থাৎ  
প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাত বা প্রত্যক্ষ সাদৃশ্যপ্রযুক্ত, যদ্বারা সাধ্যসিদ্ধি হয়, তাহা উপমান ।  
বাহার সম্বন্ধে উভয় ( উপমেয় ও উপমান ) প্রসিদ্ধ অর্থাৎ যে ব্যক্তি উপমান ও  
উপমেয়, এই উভয়কেই জানে, তাহার সম্বন্ধে সাধ্যসাধন-ভাব বিদ্যমান নাই ।

টীকনী । মহর্ষি এই স্বত্রের দ্বারা পূর্বস্বত্রোক্ত পূর্বপক্ষের নিরাস করিয়াছেন । এইটি  
সিদ্ধান্ত-স্বত্র । ভাষ্যকার ও উদ্যোতকদের ব্যাখ্যানসারে স্বত্রকার মহর্ষির তাৎপর্য এই যে, গবয়  
প্রত্যক্ষ না হইলে সেই স্থলে উপমানের সম্বন্ধে বাহ্য প্রমাণার্থ অর্থাৎ উপমান-প্রমাণের ফল  
উপনিতি, তাহা হয় না । যে ব্যক্তি গো দেখিয়াছে, কিন্তু গবয় দেখে নাই, সে ব্যক্তি “যথা



গো, তথা গবয়" এই বাক্য শ্রবণপূর্বক গবয় গোসদৃশ, ইহা বুঝিয়া যখন সেই গোসদৃশ পদার্থকে (গবয়কে) দেখে, তখন "ইহা গবয়-শব্দবাচ্য" এইরূপে সেই প্রত্যক্ষদৃষ্ট গবয়-বিশিষ্ট পশুমাংসে গবয় শব্দের বাচ্যত্ব নিশ্চয় করে। ঐ বাচ্যত্ব-নিশ্চয়ই ঐ স্থলে উপমান-প্রমাণের রূপ উপমিতি। প্রত্যক্ষ গোর দ্বারা অপ্রত্যক্ষ গবয়ের জ্ঞান উপমিতি নহে। উপমান-প্রমাণের স্বরূপ না বুঝিলেই পূর্বোক্তপ্রকার পূর্বপক্ষের অবতারণা হয়। মহর্ষি এই স্বত্রের দ্বারা উপমান-প্রমাণের স্বরূপ ও উদাহরণ পরিষ্কৃত করিয়া পূর্বস্বত্রোক্ত ভ্রমমূলক পূর্বপক্ষের নিরাস করিয়াছেন। ভাষ্যকার, স্বত্রার্থ বর্ণন করিতে উপমানের উদাহরণ প্রদর্শন করিয়া দেখাইয়াছেন যে, অহুমান এইরূপ নহে। যেরূপ কারণজ্ঞত্ব যেরূপে প্রদর্শিত স্থলে সংজ্ঞাব্যক্তি সম্বন্ধনিশ্চয় বা গবয়বিশিষ্ট পশুমাংসে গবয় শব্দের বাচ্যত্বনিশ্চয়রূপ উপমিতি জন্মে, সেইরূপ কারণজ্ঞত্ব অহুমিতি জন্মে না। ঐরূপ কারণসমূহ-জ্ঞত্ব ঐরূপ জ্ঞান—অহুমিতি নহে, উহা অহুমিতি হইতে বিশিষ্ট; হুতরাং উপমান-প্রমাণ অহুমান-প্রমাণ হইতে বিশিষ্ট।

উপমান অহুমান হইতে ভিন্ন, এই সিদ্ধান্ত সমর্থন করিতে ভাষ্যকার শেষে নিজে একটি পৃথক যুক্তি বলিয়াছেন যে, উপমান পরার্থ। যে ব্যক্তি গবয়কে জানে না, কিন্তু গো দেখিয়াছে, তাহাকে গবয় পদার্থ বুঝাইবার জন্য গো এবং গবয় (উপমান ও উপমেয়) বিজ্ঞ ব্যক্তি "যথা গো, তথা গবয়" এই বাক্য বলে। উক্তোক্তকর এই কথা সমর্থন করিতে বলিয়াছেন যে, "যথা গো, তথা গবয়" এইরূপ বাক্য ব্যতীত কেবল গবয়ে গোসাদৃশ প্রত্যক্ষ উপমান নহে। কারণ, ঐ বাক্য শ্রবণ না করিলে কেবল সাদৃশ্য প্রত্যক্ষের দ্বারা পূর্বোক্তরূপ উপমিতি জন্মে না। অবার ঐ সাদৃশ্য প্রত্যক্ষ ব্যতীত পূর্বোক্ত বাক্যমাত্রও উপমান হইতে পারে না। কারণ, ঐ বাক্যার্থবোধের দ্বারাই পূর্বোক্তরূপ উপমিতি জন্মে না। এজন্য পূর্বোক্ত বাক্যজনিত সংস্কারজন্য "গবয় গোসদৃশ" এইরূপ বাক্যার্থ শ্রবণনাপেক্ষ সাদৃশ্য প্রত্যক্ষই উপমান-প্রমাণ। মূলকথা, উপমিতিস্থলে যখন পূর্বোক্তরূপ বাক্য শ্রবণ আবশ্যক, তাহার উপমিতি হইবে, তাহাকে যখন গো ও গবয়, এই উভয়পদার্থবিজ্ঞ ব্যক্তি পূর্বোক্ত বাক্য অবশ্যই বলিয়া থাকেন, নচেৎ তাহার উপমিতি হইতেই পারে না, তখন উপমান পরার্থ। অহুমানস্থলে ঐরূপ বাক্য আবশ্যক নহে। অহুমিতিতে কোন বাক্যার্থ শ্রবণ কাৰণ নহে। হুতরাং অহুমান পূর্বোক্তরূপে পরার্থ নহে। উপমান পরার্থ বলিয়া অহুমান হইতে ভিন্ন।

ভাষ্যকার যে উপমানকে পরার্থ বলিয়া অহুমান হইতে তাহার ভেদ বুঝাইয়াছেন, তাহাতে শেষে পূর্বপক্ষের অবতারণা করিয়াছেন যে, উপমান পরার্থ হইতে পারে না। কারণ, পূর্বোক্ত উপমানবাক্যবাদীর নিজেরও ঐ বাক্যজন্য বোধ জন্মিয়া থাকে। অর্থাৎ পূর্বপক্ষবাদী, সিদ্ধান্তবাদী ভাষ্যকারকে বলিয়াছেন যে, যদি "যথা গো, তথা গবয়" এই বাক্য কেবল অপর ব্যক্তিরই বোধ জন্মাইত, তাহা হইলে অবশ্য উপমান পরার্থ হইত; কিন্তু ঐ বাক্য যখন ঐ বাক্যবাদীর নিজেরও বোধ জন্মায়, তখন উহাকে পরার্থ বলা যায় না, উহা পরার্থ হইতে পারে না। এতদ্বত্তরে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, পূর্বোক্ত বাক্য দ্বারা ঐ বাক্যবাদীরও যে

“বথা গো, তথা গবর” এইরূপ বোধ জন্মে, তাহা নিবেশ করি না, তাহা অবশ্যই স্বীকার করি। কিন্তু ঐ বাক্যবাদীর সম্বন্ধে উহা উপমান নহে। কারণ, প্রসিদ্ধসাধর্ম্যপ্রযুক্ত বন্ধুরা সাধ্য সিদ্ধি হয়, তাহাই উপমান। যে ব্যক্তি গো এবং গবর, এই উভয়কেই জানে, গবরশব্দবিশিষ্ট পতনাত্মক গবর শব্দের বাচ্য, ইহা বাহার জানাই আছে, তাহার সম্বন্ধে ঐ স্থলে তাহার উচ্চারিত বাক্য বা তাহার অর্থবোধ, গবরে গবরশব্দবাচ্যত্বের সাধন নহে। তাহার সম্বন্ধে ঐ স্থলে গবরশব্দবাচ্য ও নিজের উচ্চারিত বাক্যার্থবোধে সাধ্য-সাধন-ভাব নাই। তাহার সেখানে উপমিতি জন্মে না। যে ব্যক্তির উপমিতি জন্মে, বাহার উপমিতি নিকীর্ষের জন্মই গো ও গবর, এই উভয় পদার্থবিশিষ্ট ব্যক্তি এইরূপ বাক্য প্ররোগ করে—দেই অপর ব্যক্তির সম্বন্ধেই উহা উপমান হয়, হুতরাং উপমান পরার্থ। এই তাৎপর্যবোধ উপমানকে পরার্থ বলা হইয়াছে। অনুমান এইরূপ পরার্থ নহে, হুতরাং উপমান অনুমান হইতে ভিন্ন। ৪৭।

ভাষ্য। অথাপি—

সূত্র। তথৈত্যপসংহারাদুপমানসিদ্ধেনাবিশেষঃ ॥

॥৪৮॥১০৯॥

অনুবাদ। এবং “তথা” অর্থাৎ তদ্রূপ, এইপ্রকার উপসংহার-(নিশ্চয়) বশতঃ উপমানসিদ্ধি (উপমিতি) হয়, এ জন্ম অবিশেষ নাই অর্থাৎ অনুমান ও উপমানে অভেদ নাই, ভেদই আছে।

ভাষ্য। তথৈতি সমানধর্মোপসংহারাদুপমানং সিধ্যতি, নানুমানম্। অয়ঞ্চানয়োর্বিশেষ ইতি।

অনুবাদ। “তথা” অর্থাৎ তদ্রূপ, এইরূপে সমান ধর্মের উপসংহারবশতঃ উপমান সিদ্ধ হয়, অনুমান সিদ্ধ হয় না অর্থাৎ উপমিতির দ্বারা কোন সমান ধর্ম বা সাদৃশ্য জ্ঞানবশতঃ অনুমিতি জন্মে না। ইহাও এই উভয়ের (অনুমান ও উপমানের) বিশেষ।

টীকণী। উপমান অনুমান হইতে ভিন্ন, এই সিদ্ধান্ত সমর্থন করিতে মহর্ষি শেষে এই সূত্রের দ্বারা একটি যুক্তি বলিয়াছেন যে, উপমানস্থলে “তথা” এইরূপে অর্থাৎ “বথা গো, তথা গবর” এইরূপে উপসংহার বা নিশ্চয়বশতঃ উপমান-প্রমাণের ফল উপমিতি জন্মে। কিন্তু অনুমানস্থলে “তথা” এইরূপে কোন বোধ জন্মে না। হুতরাং অনুমান হইতে উপমানের বিশেষ আছে। উদ্যোক্তকর বলিয়াছেন যে, “বথা ধূম, তথা অগ্নি” এইরূপ অনুমান হয় না। কিন্তু উপমান স্থলে “বথা গো, তথা গবর” এইরূপ বোধ জন্মে। হুতরাং অনুমান ও উপমান,



এই উভয় স্থলে প্রমিতির ভেদ অবগতই স্বীকার্য। তাহা হইলে উপমান অহুমান হইতে প্রমাণাত্মক, ইহা অবগত স্বীকার্য। কারণ, প্রমিতির ভেদ হইলে তাহার করণকে পৃথক্ প্রমাণই বলিতে হইবে। যেমন প্রত্যক্ষ ও অহুমিতিক্রম প্রমিতির ভেদবশতঃই প্রত্যক্ষ হইতে অহুমানকে পৃথক্ প্রমাণ স্বীকার করা হইয়াছে, তদ্রূপ অহুমিতি হইতে উপমিতির ভেদবশতঃ অহুমান হইতে উপমান-প্রমাণকে পৃথক্ প্রমাণ স্বীকার করিতে হইবে।

বক্তব্যঃ উপমিতি স্থলে “উপনিমোমি” অর্থাৎ “উপমিতি করিতেছি” এইরূপে ঐ উপমিতিক্রম জ্ঞানের মানস প্রত্যক্ষ (অহুব্যবসার) হয় এবং অহুমিতি স্থলে “অহুনিমোমি” অর্থাৎ “অহুমিতি করিতেছি,” এইরূপে ঐ অহুমিতিক্রম জ্ঞানের মানস প্রত্যক্ষ হয়। পূর্বোক্তরূপ মানস প্রত্যক্ষের দ্বারা বুঝা যায়, উপমিতি অহুমিতি হইতে ভিন্ন। উহা অহুমিতি হইলে উপমিতিকারী ব্যক্তির “আমি গবয়দ্ব্যবস্থাকে গবয় শব্দের দ্বারা বলিয়া অহুমিতি করিতেছি” এইরূপেই ঐ উপমিতি নামক জ্ঞানের মানস প্রত্যক্ষ হইত। তাহা যখন হয় না, যখন “উপমিতি করিতেছি” এইরূপেই ঐ উপমিতির মানস প্রত্যক্ষ হয়, তখন বুঝা যায়, উপমিতি অহুমিতি হইতে বিভাজ্য অহুভূতি। সুতরাং অহুভূতি বা প্রমিতির ভেদবশতঃ অহুমান হইতে উপমানকে পৃথক্ প্রমাণই বলিতে হইবে। ইহাই ভ্রাতাচার্য্য মহর্ষি গোতমের অন্ততঃ সমর্থনে প্রধান বুক্তি। মহর্ষি এই শেষ সূত্রের দ্বারা ফলতঃ এই বুক্তিরই সূচনা করিয়াছেন।

বৈশেষিক সূত্রকার মহর্ষি কণাদ পূর্বোক্তরূপ প্রমিতিভেদ স্বীকার করেন নাই। তাঁহার মতে উপমিতি অহুমিতিবিশেষ। উপমিতি স্থলেও “অহুমিতি করিতেছি” এইরূপেই ঐ উপমিতিমানক অহুমিতিবিশেষের মানস প্রত্যক্ষ হয়। ভ্রাতাচার্য্য মহর্ষি গোতম এই সূত্রে “তথৈতদুপসংহারঃ” এই কথার দ্বারা অহুমিতি হইতে উপমিতির ভেদ সমর্থন করিয়া, উপমিতি স্থলে “অহুমিতি করিতেছি” এইরূপে উপমিতির মানস প্রত্যক্ষ হইতে পারে না, ইহাও সূচনা করিয়াছেন। উপমিতি জ্ঞানের মানস প্রত্যক্ষ কিরূপে হইয়া থাকে, ইহা নইয়া পূর্বোক্তরূপ বিবাদ অবগতই হইতে পারে; সুতরাং তাহাতে মতভেদও হইয়াছে। মানস প্রত্যক্ষের দ্বারা উপমিতি অহুমিতি নহে, ইহা নির্দিষ্টবাদে নির্ণীত হইলে, ভ্রাতাচার্য্যগণের সৌত্তম মত সমর্থনের জন্ত বহু বিচার নিস্পত্তোক্তন হইত। উপমিতি অহুমিতি, উপমান অহুমান-প্রমাণ হইতে পৃথক্ প্রমাণ নহে, এই বৈশেষিক মতও সমর্থিত হইত না। বৈশেষিকাচার্য্যগণ উপমানের পৃথক্ প্রমাণ্য খণ্ডন করিয়াছেন। ভ্রাতাচার্য্যগণ সৌত্তম মত সমর্থনের জন্ত বলিয়াছেন যে, গবয়দ্ব্যবস্থাকে গবয় পদ্ব্যবস্থাকে গবয় শব্দের শক্তি বা ব্যাচ্যেবর যে অহুভূতি, তাহাই উপমিতি। ঐ অহুভূতি প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারা অসম্ভব। শব্দপ্রমাণের দ্বারাও উহা হয় না। কারণ, “দধা সো, তথা গবয়” এই পূর্ব-শ্রুত বাক্যের দ্বারা গবয়ে গোদাদ্ব্যবস্থাই বুঝা যায়। উহার দ্বারা গবয়দ্ব্যবস্থাকে গবয়ে গবয় শব্দের শক্তি বুঝা যায় না। বৈশেষিক সম্প্রদায় এবং আরও কোন কোন সম্প্রদায় যে অহুমানের দ্বারা ঐ অহুভূতি জন্মে বলিয়াছেন, তাহাও হইতে পারে না। কারণ, অহুমানের দ্বারা গবয়দ্ব্যবস্থাকে গবয়ে “গবয়” শব্দের ব্যাচ্য বুক্তিতে হইলে, তাহাতে হেতু ও সেই হেতুতে গবয়পদব্যবস্থার ব্যাপ্তি-



জ্ঞানাদি আবশ্যক। গোলাদৃশ্যকে ঐ অহুমানে হেতু বলা যায় না। কারণ, যে যে পদার্থে গোলাদৃশ্য আছে, তাহাই গবর শব্দের বাচ্য, এইরূপে ব্যাপ্তিজ্ঞান সেখানে জন্মে না। কারণ, যে কখনও গবর দেখে নাই, তাহার পূর্বে ঐরূপ ব্যাপ্তিজ্ঞান অসম্ভব। পূর্বেকৃত বাক্যের দ্বারাও পূর্বে ঐরূপ ব্যাপ্তিজ্ঞান জন্মিতে পারে না। কারণ, পূর্বেকৃত সেই বাক্য, গোলাদৃশ্যে গবর শব্দের বাচ্যত্বের ব্যাপ্তি আছে, এই তাৎপর্য্যে অর্থাৎ যে যে পদার্থে গোলাদৃশ্য, সে সমস্তই গবরবাক্যে গবর শব্দের বাচ্য, এই তাৎপর্য্যে কথিত হয় না। “গবর কীদৃশ ?” এইরূপ প্রশ্নের উত্তরেই “যথা গো, তথা গবর” এইরূপ বাক্য কথিত হয়। ঐ বাক্যের দ্বারা ব্যাপ্তি বুঝিলেও যে পদার্থে গবর শব্দের বাচ্য, তাহা গোলাদৃশ্য, এইরূপেই সেই ব্যাপ্তিজ্ঞান হইতে পারে। ঐরূপ ব্যাপ্তিজ্ঞানে গবর-শব্দবাচ্যত্ব হেতুরূপেই প্রতীত হয়, নাথাক্রমে প্রতীত হয় না। সুতরাং উহার দ্বারা গবরশব্দবাচ্যত্বের অহুমিতি জন্মিতে পারে না। গবর শব্দ কোন অর্থের বাচক, যেহেতু উহা সাধু পদ, এইরূপে অহুমান করিতে পারিলেও তদ্বারা গবর শব্দ যে গবরবাক্যে গবরের বাচক, ইহা নির্ণীত হয় না। সুতরাং ঐ অহুমানের দ্বারাও সৌতন-সম্বত উপমান-প্রমাণের কল সিদ্ধি হয় না। “গবর শব্দ গবরবাক্যবিশিষ্টের বাচক, যেহেতু গবর শব্দের অস্ত কোন পদার্থে বৃত্তি (শক্তি বা লক্ষণ) নাই এবং বৃত্তগণ গবরবাক্যবিশিষ্ট পদার্থেই ঐ গবর শব্দের প্রয়োগ করেন,” এইরূপে বৈশেষিক-সম্প্রদায় যে অহুমান-প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাও হয় না। কারণ, গবর শব্দের শক্তি কোথায়, গবর শব্দের বাচ্য কি, ইহা জানিবার পূর্বে ঐ শব্দের যে আর কোন পদার্থে শক্তি নাই, তাহা অবধারণ করা যায় না। সুতরাং পূর্বোক্তরূপ হেতু-জ্ঞান পূর্বে সম্ভব না হওয়ার, ঐ হেতুর দ্বারা ঐরূপ অহুমান অসম্ভব। তদ্বিচারমণিকার গবেশ এই অহুমানের উল্লেখপূর্বক প্রথমে ইহাও বলিয়াছেন যে, ঐ অহুমানের দ্বারা “গবর” শব্দটি গবরবাক্যবিশিষ্ট যে গবর পদার্থ, তাহার বাচক, ইহা বুঝা গেলেও গবরবাক্যে যে “গবর” শব্দের প্রতিনিধিনিমিত্ত অর্থাৎ শব্দভাবচ্ছেদক, তাহা উহার দ্বারা নিত হয় না। অর্থাৎ গবর শব্দের গবরবাক্যে গবর শক্তি, ইহা অবধারণ করাই উপমান-প্রমাণের কল। উহা পূর্বোক্তরূপ কোন অহুমানের দ্বারাও হইতে পারে না। উহার জ্ঞান উপমান নামক অতিরিক্ত প্রমাণ আবশ্যক। উদয়নাচার্য্য গ্রন্থকুহুমাজলি গ্রন্থে বৈশেষিক-সম্প্রদায়ের মতের সমর্থনপূর্বক পূর্বোক্ত প্রকার বহু বিচার দ্বারা তাহার খণ্ডন করিয়াছেন। তদ্বিচারমণিকার গবেশ “উপমানচিহ্নানি” গ্রন্থে উদয়নাচার্য্যের “গ্রন্থকুহুমাজলি” গ্রন্থের কথাকুলি গ্রহণ করিয়া, বহু বিচারপূর্বক বৈশেষিক মতের নিরাস করিয়াছেন। সুতরাং ঐ উত্তর গ্রন্থ পর্যালোচনা করিলে উপমান-প্রামাণ্য সম্বন্ধে উত্তর মতেরই সমালোচনা করিতে পারিবেন। সাংখ্যতত্ত্বকোমুদীতে বাচস্পতি মিশ্র উপমান-প্রামাণ্য খণ্ডন করিতে দ্বারা বলিয়াছেন, তাহারও খণ্ডন গবেশের উপমানচিহ্নানি গ্রন্থে পাওয়া যাইবে। বৈশেষিক মত-সমর্থক নর বৈশেষিকগণ বলিয়াছেন যে, “গবরপদং ন প্রতিনিধিনিমিত্তকং সাধুপদবাং” অর্থাৎ গবর শব্দ যেহেতু সাধু পদ, অতএব তাহার প্রতিনিধিনিমিত্ত অর্থাৎ শব্দভাবচ্ছেদক আছে, এইরূপে ঐ অহুমানের দ্বারা গবরবাক্যে গবর শব্দের শব্দভাবচ্ছেদক, ইহা নির্ণীত হয়। সুতরাং







## মূত্র। শব্দোহুমানমর্থস্থানুপলব্ধেরু-

মেয়ত্বাৎ ॥ ৪৯ ॥ ১১০ ॥

অনুবাদ। (পূর্বপক্ষ) অর্থের অর্থাৎ শব্দবোধ্য বাক্যার্থের প্রত্যক না হওয়ায় অনুমেয়বশতঃ শব্দ অনুমানপ্রমাণ।

ভাষ্য। শব্দোহুমানং, ন প্রমাণান্তরং, কস্মাৎ? শব্দার্থস্থানু-  
মেয়ত্বাৎ। কথমনুমেয়ত্বং? প্রত্যকতোহনুপলব্ধেঃ। যথাহনুপলভ্য-  
মানো লিঙ্গী মিতেন লিঙ্গেন পশ্চান্মীয়ত ইত্যনুমানং, এবং মিতেন শব্দেন  
পশ্চান্মীয়তেহর্থোহনুপলভ্যমান ইত্যনুমানং শব্দঃ।

অনুবাদ। শব্দ অনুমান, প্রমাণান্তর নহে অর্থাৎ অনুমান-প্রমাণ হইতে  
শব্দ পৃথক প্রমাণ নহে। (প্রশ্ন) কেন? অর্থাৎ শব্দ যে অনুমান-প্রমাণ, ইহার

অবলম্বন করিয়া বৈশেষিক-সম্প্রদায়ের পুণ্ডীক সম্বোধনের খণ্ডন করিয়াছেন, এই নিয়মটি না মানিলে আর  
এ কথা বলা যায় না। বৈশেষিক-সম্প্রদায়ে সমাধানও উদ্ভূত হইতে পারে। অনুমিত্বীতিরীতির স্বীকার সংশ্লিষ্ট  
কিছুকালে পরেই ভট্টাচার্য্যও এই মত লিখিয়াছেন যে, ব্যাপকভাবজ্ঞেয়কল্পেই সাধা অনুমিত্বির বিঘ্ন হয়,  
এই নিয়ম অবলম্বন করিয়া সিদ্ধান্তিগণ (নৈয়ায়িকগণ) উপমানের প্রামাণ্য ব্যবস্থাপন করেন। পক্ষান্তরে  
যদি নৈয়ায়িক গ্রন্থীণ তর্কীকতার কিছু ব্যাপকভাবজ্ঞেয়কল্পেও অনুমিতি হয়, ইহা বলিয়াছেন। কলকথা,  
বঙ্গেশ্যক পুণ্ডীকরণ নিয়ম সকল নৈয়ায়িকের সম্মত নহে। বঙ্গেশ্য-ব্যাখ্যাকার ভাষ্যচার্য্য উক্তকথাও ইঙ্গিত  
নিয়ম স্বীকার করেন নাই। উৎসাহে নিম্নবর্ত্ত উপমানের পৃথক প্রামাণ্য নাই (তুহনাম্বলি তৃতীয় পক্ষকে  
উপমানকিয়ারে বঙ্গেশ্য ব্যাখ্যার উক্তকথার আপত্তিও জটিল)। তুহন প্রকৃতি ভাষ্যকেনবিশেষণ উপমানের  
পৃথক প্রামাণ্য স্বীকার করেন নাই। ইহাতে মনে হয়, ইহাও পক্ষেশ্যক পুণ্ডীক নিয়ম না মানিয়া,  
বৈশেষিক-সম্প্রদায়ের পুণ্ডীকরণ অনুমানের ধারাই উপমানের ব্যাপ্তি স্বীকার করিতেন। উক্তকথা  
অনুমানও প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। কলকথা, কোন হেতুতে ব্যাপ্তিমান্যাদি ব্যক্তিরকেও পুণ্ডীকরণ উপমিতি  
জন্মে, পুণ্ডীক কোন হেতুতে ব্যাপ্তিমান্যাদির বিশেষ কারণও উপমিতি আনের বিশেষ বটে না এবং উপমিতিস্থলে  
“উপমিতি করিতেছি” এইরূপেই এই আনের মানস প্রত্যক হয়, এইরূপ অনুভববাহুনায়েই ভাষ্যচার্য্য মহর্ষি পোতন  
উপমানের পৃথক প্রামাণ্য স্বীকার করিয়াছেন। ই দুইটাই মহর্ষি পোতনকর্ত্তার হুল-মুক্তি। এই মুক্তি বা এই অনুভব  
অস্বীকার করিতেই মত সম্প্রদায়ে মতভেদ হইয়াছে।

বিদ্যনাথ সিদ্ধান্তমুক্তাবলী মধ্যে “শব্দ ব্যবহরণব্যাচ্য” এই আকারে উপমিতি হইলে পরবর্ত্তকালে পরে পক্ষের  
পক্ষ নির্ণয় হয় না, এই কথা বলিয়াছেন। কিন্তু ভাষ্যমুক্তাবলিতে “শব্দ ব্যবহরণব্যাচ্য” এইরূপে উপমিতি হয়  
লিখিয়াছেন। অতঃপাশ্চ শব্দে মিত্র প্রকৃতি অনেক আচার্য্যও “শব্দ” এইরূপে “ইদম্” শব্দের প্রয়োজনপূর্ণক উপ-  
মিত্বির আকার প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। যতঃ উপমিত্বির আকার বিঘ্নে (১) “শব্দো ব্যবহরণব্যাচ্য”, (২) “শব্দো ব্যবহরণ-  
ব্যাচ্য”, (৩) “শব্দো ব্যবহরণশব্দবিশিষ্টবাস্তব” —এই ত্রিবিধ আকারের মত পাওয়া যায়। “শব্দো ব্যবহরণব্যাচ্য”  
এইরূপ মুক্তির, শব্দ অর্থ্যৎ এতচ্ছাটী, এইরূপই দেখানো যোগ আছে, বলিতে হইবে।



হেতু কি ? ( উত্তর ) যেহেতু শব্দার্থের অনুমেয়ত্ব । ( প্রশ্ন ) অনুমেয়ত্ব কেন ? অর্থাৎ শব্দার্থ অনুমান-প্রমাণবোধ্য হইলে কেন ? ( উত্তর ) যেহেতু প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারা ( শব্দার্থের ) উপলব্ধি হয় না । যেমন মিত লিঙ্গের দ্বারা অর্থাৎ বার্থরূপে জ্ঞাত হেতুর দ্বারা পশ্চাৎ ( ঐ হেতুজ্ঞানের পরে ) অপ্রত্যক্ষ লিঙ্গী ( নাথ্য ) বার্থরূপে জ্ঞাত হয়, এ জন্ত ( তাহা ) অনুমান, এইরূপ মিত শব্দের দ্বারা অর্থাৎ বার্থরূপে জ্ঞাত শব্দের দ্বারা পশ্চাৎ ( ঐ শব্দজ্ঞানের পরে ) অপ্রত্যক্ষ অর্থ বার্থরূপে জ্ঞাত হয়—এ জন্ত শব্দ অনুমান-প্রমাণ ।

টিপ্পনী । মহাবি উপমান পরীকার পরে অবসরপ্রাপ্ত শব্দপ্রমাণের পরীক্ষা করিতে এই সূত্রের দ্বারা পূর্বপক্ষ বলিয়াছেন যে, শব্দ অনুমান-প্রমাণ অর্থাৎ প্রথমাদ্বায়ে প্রমাণবিভাগ-সূত্রে অনুমান হইতে শব্দকে যে পৃথক্ প্রমাণরূপে উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা অব্যক্ত । কারণ, শব্দ অনুমান-প্রমাণ হইতে পৃথক্ কোন প্রমাণ হইতে পারে না, উহা অনুমানবিশেষ । শব্দ অনুমান-প্রমাণ কেন ? ইহা বুঝাইতে মহাবি বলিয়াছেন যে, শব্দজন্ত যে শব্দার্থের অর্থাৎ বাক্যার্থের বোধ জন্মে, তাহা অহুমিতি, ঐ শব্দার্থ সেখানে অনুমেয় । শব্দার্থ অনুমেয় হইবে কেন ? ইহা বুঝাইতে মহাবি বলিয়াছেন, “অর্থজ্ঞাপনজ্ঞেঃ” । অনুপলব্ধি বলিতে এখানে বুঝিতে হইবে, অপ্রত্যক্ষ । অর্থাৎ শব্দার্থ যখন সেখানে প্রত্যক্ষের দ্বারা বুঝা যায় না, অথচ শব্দজন্ত শব্দার্থবোধ হইয়াও থাকে, সুতরাং অনুমানের দ্বারাই ঐ বোধ জন্মে, ঐ শব্দার্থবোধ বা শব্দবোধ অহুমিতি, ইহাই বলিতে হইবে । পূর্বপক্ষবাদী মহাবির ভাংপথ্য এই যে, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ, এই বিবিধ বিষয়েই অহুভূতি জন্মিয়া থাকে । তন্মধ্যে পরোক্ষবিষয়ে যে বোধ, তাহা প্রত্যক্ষ হইতে না পারায়, উহা অহুমিতিই হইবে । কারণ, যে অহুভূতির বিষয় প্রত্যক্ষের দ্বারা উপলভ্যমান নহে, তাহা অহুমিতি । যেমন “গৌরতি” এইরূপ বাক্য দ্বারা “অস্তিত্ববিশিষ্ট গো” এইরূপ যে বোধ জন্মে, তাহার বিষয় “অস্তিত্ববিশিষ্ট গো,” সেখানে ঐ বাক্যার্থবোধের দ্বন্ধে পরোক্ষ । প্রত্যক্ষ দ্বারা তিনি উহা বুঝেন না, সুতরাং ঐ বাক্যার্থ তাহার অনুমেয়, অনুমানের দ্বারাই তিনি ঐ বাক্যার্থ বুঝিয়া থাকেন, ইহা স্বীকার্য্য । উদ্যোতকরও এই ভাবে হুকার্ণ ব্যাখ্যা করিয়াছেন<sup>১</sup> । ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, অনুমান হলে যেমন বার্থরূপে লিঙ্গ বা হেতুর জ্ঞান হইলে তৎদ্বারা পশ্চাৎ সাধ্যের জ্ঞান হয়, শব্দ হলেও বার্থরূপে জ্ঞাত শব্দের দ্বারা পশ্চাৎ শব্দার্থ বা বাক্যার্থবোধ হওয়ার শব্দ অনুমান-প্রমাণ । ভাষ্যকার শব্দ বোধ হলে অহুমিতির কারণ সূচনা করিয়া পূর্বপক্ষ সমর্থন করিলেও হুকার্ণ পূর্বপক্ষসাধনে যে হেতু প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাতে আপত্তি হয় যে, হুকার্ণ যখন অপ্রত্যক্ষ বিষয়ে উপমিতিরূপ পৃথক্ অহুভূতিও স্বীকার করিয়াছেন, ইতঃপূর্বে তাহা সমর্থনও করিয়াছেন, তখন তিনি প্রত্যক্ষ ভিন্ন অহুভূতি বলিয়াই শব্দ বোধ

১। প্রত্যক্ষোপলব্ধিশব্দার্থবোধিতি হুকার্ণঃ ।—ভাষ্যকারিক ।

অনুমিতি, ইহা বলেন কিরূপে ? সূত্রকার এই সূত্রে যখন ঐরূপ নিয়মকে আশ্রয় করিয়াই পূর্ণপক্ষ বলিয়াছেন, তখন তিনি কলাদনিকাত্তকে আশ্রয় করিয়াই তাহার খণ্ডনের জন্য এখানে ঐরূপ পূর্ণপক্ষের অবতারণা করিয়াছেন, ইহা বুঝা যায়। প্রত্যক্ষ তিন অনুভূতিমাত্রই অনুমিতি ; উপনিতি ও শাক বোঝ অনুমিতিবিশেষ, ইহা বৈশেষিক সূত্রকার মহর্ষি কণাদেয় সিদ্ধান্ত। ভাষ-সূত্রকার মহর্ষি গোতম ইতঃপূর্বে উপমানের প্রমাণাস্তরক সমর্থন করিয়াও এই সূত্রে যে হেতুর উল্লেখ করিয়া “শব্দ অনুমান” এই পূর্ণপক্ষের অবতারণা করিয়াছেন, তদ্বারা বুঝা যায়, তিনি কলাদসূত্রের পরে ভাষসূত্র রচনা করিয়া, এখানে কলাদ-সিদ্ধান্তানুসারেই পূর্ণপক্ষ প্রকাশপূর্বক ঐ সিদ্ধান্তের খণ্ডন করিয়াছেন। সুধীগণ এই সূত্রোক্ত হেতুর প্রতি নানোন্মোহ করিয়া কবিতা বিষয়ে চিন্তা করিবেন। কলাদসূত্রে গোতম-সমর্থিত সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ নাই কেন ? ইহাও বিশেষরূপে প্রবিধান করা আবশ্যিক। ৪২।

ভাষা। ইতঃশচানুমানং শব্দঃ—

সূত্র। উপলব্ধেরদ্বিপ্রবৃত্তিত্বাৎ ॥৫০॥১১১॥

অনুবাদ। এই হেতুতেও শব্দ অনুমানপ্রমাণ—যেহেতু উপলব্ধির অর্থাৎ শব্দ ও অনুমানস্থলে যে উপলব্ধি বা পদার্থের অনুভূতি হয়, তাহার প্রকারভেদ নাই।

ভাষা। প্রমাণাস্তরভাবে দ্বিপ্রবৃত্তিরূপলব্ধিঃ। অন্যথা হ্যুপলব্ধিরনু-  
মানে, অন্যথোপমানে তদ্ব্যাখ্যাতং। শব্দানুমানয়োস্তুপলব্ধিরদ্বিপ্রবৃত্তিঃ,  
যথানুমানে প্রবর্ততে, তথা শব্দেহপি, বিশেষভাবানুমানং শব্দ ইতি।

অনুবাদ। প্রমাণাস্তর হইলে উপলব্ধি (প্রমিতি) দ্বিপ্রকার অর্থাৎ বিভিন্ন প্রকার হয়। যেহেতু অনুমান স্থলে অন্য প্রকার উপলব্ধি হয়, উপমান স্থলে অন্য প্রকার উপলব্ধি হয়, তাহা ব্যাখ্যাত হইয়াছে [অর্থাৎ অনুমান ও উপমান স্থলে যে বিভিন্ন প্রকার উপলব্ধি হয়, তৎসমস্ত উপমান অনুমান হইতে পৃথক্ প্রমাণ, ইহা পূর্বে বলিয়াছি] কিন্তু শব্দ ও অনুমান, এই উভয় স্থলে উপলব্ধি বিভিন্ন প্রকার নহে, অনুমানস্থলে যে প্রকার উপলব্ধি প্রবৃত্ত হয় অর্থাৎ যে প্রকার উপলব্ধি জন্মে, শব্দস্থলেও সেই প্রকার (উপলব্ধি জন্মে), বিশেষ না থাকায় অর্থাৎ ঐ উভয় স্থলীয় উপলব্ধির কোন বিশেষ বা প্রকারভেদ না থাকায় শব্দ অনুমান-প্রমাণ।

টীকণী। মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা তাহার পূর্বসূত্রোক্ত পূর্ণপক্ষের সমর্থনে আর একটি হেতু বলিয়াছেন। ভাষ্যকার “ইতঃ” এই কণার দ্বারা প্রথমে এই সূত্রোক্ত হেতুকেই গ্রহণ করিয়াছেন এবং এই সূত্রে প্রথমোক্ত পূর্ণপক্ষসূত্র হইতে “অনুমানং শব্দা” এই অংশের অমর্যুত্তি করিয়া স্বার্থ বুঝিতে হইবে। তাই ভাষ্যকার প্রথমে ঐ অংশের উল্লেখপূর্বক সূত্রের অবতারণা



করিয়াছেন। ভাষ্যকার স্বত্রকারের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, প্রমাণান্তর হইলে উপলব্ধির ভেদ হইয়া থাকে। যেমন অনুমান ও উপমান, এই উভয় স্থলে যে উপলব্ধি হয়, তাহার প্রকারভেদ আছে, এ ক্ষেত্রে উপমানকে অনুমান হইতে পৃথক্ প্রমাণ স্বীকার করা হইয়াছে, পূর্বে বলিয়াছি। এইরূপ প্রত্যক ও অনুমান স্থলেও উপলব্ধির প্রকারভেদ থাকার ঐ উভয়কে পৃথক্ প্রমাণ বলা হইয়াছে, ইহাও বুঝিতে হইবে। কিন্তু শব্দকর যে অপ্রত্যক পদার্থের বোধ জন্মে এবং অনুমানজন্য যে অপ্রত্যক পদার্থের বোধ জন্মে, ঐ উভয় বোধের কোন প্রকারভেদ নাই—উহা একই প্রকার; সুতরাং ঐ উভয় স্থলে প্রমিতির বিশেষ না থাকার শব্দ অনুমান-প্রমাণ, উহা অনুমান হইতে ভিন্ন কোন প্রমাণ হইতে পারে না। সুত্রে “অদ্বিপ্রবৃত্তির্ভাঃ” এই স্থলে প্রযুক্তি শব্দের অর্থ প্রকার। দ্বি-প্রবৃত্তির বলিতে বিপ্রকারতা। বিপ্রবৃত্তি নাই-অর্থৎ প্রকারভেদ নাই<sup>১</sup>। এখানে শব্দ বোধ অহুমিতি, যেহেতু উহা অহুমিতি হইতে প্রকারভেদশূন্য, এইরূপে পূর্বপক্ষবাদীর অনুমান বুঝিতে হইবে। যদি শব্দ বোধ অহুমিতি না হইত, তাহা হইলে উহা অহুমিতি হইতে ভিন্ন প্রকার হইত, এইরূপ তর্ককে ঐ অনুমানের সহকারী বুঝিতে হইবে। মহর্ষির পূর্বা-সূত্রোক্ত শব্দরূপ পক্ষে অনুমানব্ধের অনুমানে এই সূত্রোক্ত যথাক্রম হেতু অসিদ্ধ। মহর্ষির পূর্বা-সূত্রোক্ত প্রতিজ্ঞানুসারে এই সূত্রোক্ত হেতুবাক্যের দ্বারা অহুমিতি হইতে অভিন্নপ্রকার উপলব্ধি-করণকে হেতুরূপে বিবক্ষিত বুঝিতে হইবে। ১০।

### সূত্র। সম্বন্ধাক্ত ॥ ৫১ ॥ ১১২ ॥

অনুবাদ। সম্বন্ধ প্রযুক্তও অর্থাৎ সম্বন্ধবিশিষ্ট<sup>২</sup> পদার্থের প্রতিপাদন করে বলিয়াও ( শব্দ অনুমান-প্রমাণ )।

ভাষ্য। শব্দোহনুমানমিত্যানুবর্ততে। সম্বন্ধয়োশ্চ শব্দার্থয়োঃ সম্বন্ধ-প্রসিদ্ধৌ শব্দোপলব্ধেরর্থগ্রহণং, যথা সম্বন্ধয়োল্লিঙ্গলিঙ্গিনোঃ সম্বন্ধ-প্রত্যাতৌ লিঙ্গোপলব্ধৌ লিঙ্গিগ্রহণমিতি।

অনুবাদ। “শব্দ অনুমান” এই অংশ অনুবৃত্ত আছে [ অর্থাৎ প্রথমোক্ত পূর্ব-পক্ষ-সূত্র হইতে এই সূত্রেও ঐ অংশের অনুরূপ আছে ] এবং সম্বন্ধবিশিষ্ট শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ-জ্ঞান হইলে শব্দের জ্ঞানজন্য অর্থের জ্ঞান হয় অর্থাৎ এই হেতুতেও শব্দ অনুমান-প্রমাণ। যেমন সম্বন্ধবিশিষ্ট অর্থাৎ ব্যাপ্যব্যাপক ভাবরূপ সম্বন্ধবৃত্ত লিঙ্গ ও লিঙ্গীর ( হেতু ও সাধ্যের ) সম্বন্ধ জ্ঞান হইলে ( অর্থাৎ হেতু ও সাধ্য ধর্মের

১। অদ্বিপ্রবৃত্তিঃ প্রকারভেদবিহীনতা, যেতদানুমানেন তু পত্রোপলব্ধিরোপলব্ধিভেদাঃ প্রকারভেদবতী ইত্যর্থঃ। তাৎপর্যভীতিকা।

২। সম্বন্ধার্থপ্রতিপাদকবাক্যেতি ব্যাখ্যাঃ। সম্বন্ধার্থপ্রতিপাদকবাক্যমহুযং তথাচ শব্দ ইতি। ভাষ্যপট্টিকা।

ব্যাপ্যব্যাপকভাবরূপ সম্বন্ধ বুঝিলে) হেতুর জ্ঞান হইলে সাধের জ্ঞান (অনুমিতি) হয় [অর্থাৎ এই উদাহরণের দ্বারা বুঝা যায়,—যাহা সম্বন্ধবিশিষ্ট পদার্থের বোধক, তাহা অনুমান-প্রমাণ; শব্দ যখন সম্বন্ধবিশিষ্ট পদার্থেরই বোধক, তখন তাহাও অনুমান-প্রমাণ]।

টিগনী। এইটো মহাবির পুরোক্ত পূর্বপক্ষ সম্বন্ধে চরম পূর্বপক্ষহুই। তাই ভাব্যকার এখানে প্রথমোক্ত পূর্বপক্ষ-হুই হইতে “শব্দোহুমানঃ” এই অংশের এই সূত্রে অহুত্বের কথা বলিয়া প্রথমে তাহাই প্রকাশ করিয়াছেন। মহাবির এই সূত্রের দ্বারা তাহার পুরোক্ত পূর্বপক্ষ-সাধনে চরম হেতু বলিয়াছেন যে, শব্দ সম্বন্ধবিশিষ্ট অর্থের বোধক, এ জহাও শব্দ অহুমান-প্রমাণ। সূত্রে “সম্বন্ধ” শব্দের দ্বারা শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ আছে, ইহা মহাবির প্রকাশ করিয়াছেন। তদ্বারা অর্থ—শব্দের সহিত সম্বন্ধযুক্ত, ইহাও প্রকটিত হইয়াছে। তাহাতে শব্দ যে সম্বন্ধযুক্ত অর্থের বোধক, ইহাও প্রকটিত হইয়াছে। ঐ পর্য্যন্তই এখানে “সম্বন্ধ” শব্দের দ্বারা মহাবির বিবক্ষিত। সম্বন্ধযুক্ত অর্থের বোধক শব্দ আছে, সুতরাং ঐ হেতুর দ্বারা শব্দে অহুমান-রূপ সাধ্য সিদ্ধি মহাবির অভিপ্রেত। শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধজ্ঞান ব্যতীত শব্দজ্ঞান হইলেও অর্থবোধ হয় না। ঐ সম্বন্ধজ্ঞান থাকিলেই শব্দজ্ঞানজন্ত অর্থবোধ হয়। তাহা হইলে বলা যায়, শব্দ ঐ সম্বন্ধযুক্ত অর্থের বোধক বলিয়া তাহা অহুমান-প্রমাণ। কারণ, যাহা সম্বন্ধযুক্ত অর্থের বোধক, তাহা অহুমান-প্রমাণ। ভাব্যকার শেষে উদাহরণের দ্বারা এই ব্যাখ্যা প্রদর্শন করিয়াছেন। হেতু ও সাধের ব্যাপ্যব্যাপক-ভাব দ্বারা সম্বন্ধের জ্ঞান ব্যতীত হেতুজ্ঞান হইলেও সাধের অহুমিতি জন্মে না। ঐ ব্যাপ্যব্যাপক ভাব সম্বন্ধের জ্ঞান হইলেই হেতুজ্ঞানজন্ত অহুমিতি হয়। হেতু ও সাধের ব্যাপ্যব্যাপক-ভাব-সম্বন্ধ আছে। অহুমান-প্রমাণ ঐ হেতুসম্বন্ধ সাধ্য পদার্থেরই বোধক হয়। সুতরাং যাহা সম্বন্ধবিশিষ্ট পদার্থের বোধক, তাহা অহুমান-প্রমাণ, এইরূপে ব্যাখ্যানিচ্ছয়বশতঃ ঐ অহুমানের দ্বারা শব্দ অহুমান-প্রমাণ, ইহা নিত হইতেছে। শব্দকে অহুমান বণিতে গেলে শব্দ বোধ হলে হেতু আবশ্যক এবং ঐ হেতুতে শব্দার্থরূপ অহুমানের বা সাধ্য বস্তুটির ব্যাখ্যান-সম্বন্ধ আবশ্যক, নচেৎ শব্দার্থবোধ বা শব্দ বোধ অহুমিতি হইতেই পারে না। এ জন্ত পূর্বপক্ষবাদী মহাবির এই সূত্রে “সম্বন্ধ” শব্দের দ্বারা শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ প্রকাশ করিয়া, শব্দ ও অর্থের ব্যাপ্যব্যাপকভাবরূপ সম্বন্ধেরও উপপত্তি স্থানা করিয়াছেন। উত্তরপক্ষে ইহার প্রতিবেদ করিবেন। ৫১।

ভাষ্য। যতাবদর্থস্থানুমেয়ত্বাদিতি, তন্ন—

সূত্র। আপ্তোপদেশসামর্থ্যাচ্ছন্দাদর্থসম্প্রত্যয়ঃ ॥

॥৫২ ॥১১৩ ॥

অনুবাদ। (উত্তর) অর্থের অনুমেয়বশতঃ (শব্দ অনুমান-প্রমাণ) ইহা যে



( বলা হইয়াছে ), তাহা নহে । ( কারণ ) আপ্ত ব্যক্তির উপদেশের অর্থাৎ আপ্ত বাক্যরূপ শব্দের সামর্থ্যবশতঃ শব্দ হইতে অর্থের সম্প্রত্যয় ( বথার্থ বোধ ) হয়, [ অর্থাৎ শব্দজন্তু যে বাক্যার্থবোধ বা শব্দ বোধ জন্মে, তাহা অনুমানের দ্বারা জন্মে না, কারণ, শব্দ আপ্তবাক্য বলিয়াই তাহার সামর্থ্যবশতঃ তদ্বারা বথার্থ শব্দ বোধ জন্মে । অনুমান ঐরূপ কারণজন্তু নহে ] ।

ভাষ্য । স্বর্গঃ, অপ্সরসঃ, উত্তরাঃ কুরবঃ, সপ্ত স্বীপাঃ, সমুদ্রো লোক-সম্মিবেশ ইত্যেবমাদেবপ্রত্যক্ষস্বার্থস্ত ন শব্দমাত্রাৎ সম্প্রত্যয়ঃ । কিং তর্হি আট্টেরয়মুক্তঃ শব্দ ইত্যতঃ স প্রত্যয়ঃ, বিপর্যয়ে সম্প্রত্যয়াভাবাৎ, ন হেবমনুমানমিতি ।

যৎ পুনরুপলব্ধেরদিপ্রবৃত্তিরাদিত্তি, অয়মেব শব্দানুমানয়োরুপলব্ধেঃ প্রবৃত্তিভেদঃ, তত্র বিশেষে সত্যহেতুর্বিশেষেভাবাদিত্তি ।

বৎ পুনরিতঃ সম্বন্ধাচ্ছেতি, অস্তি চ শব্দার্থয়োঃ সম্বন্ধোহনুজাতঃ, অস্তি চ প্রতিষিদ্ধঃ । অস্তেদমিতি যষ্ঠীবিশিষ্টস্ত বাক্যস্বার্থবিশেষোহনুজাতঃ প্রাপ্তিলক্ষণস্ত শব্দার্থয়োঃ সম্বন্ধঃ প্রতিষিদ্ধঃ । কস্মাৎ ? প্রমাণতো-হনুপলব্ধেঃ । প্রত্যক্ষতত্ত্বাবৎ শব্দার্থপ্রাপ্তে নোপলব্ধিরতীন্দ্রিয়ত্বাৎ । যেনেন্দ্রিয়েণ গৃহ্যতে শব্দস্তস্ত বিপর্যয়াবমতিবৃত্তোহর্থো ন গৃহ্যতে । অস্তি চাতীন্দ্রিয়বিপর্যভূতোহপ্যর্থঃ । সমানেন চেন্দ্রিয়েণ গৃহ্যমাণয়োঃ প্রাপ্তি-গৃহ্যত ইতি ।

অনুবাদ । স্বর্গ, অপ্সরা, উত্তরকুরু, সপ্তরীপ, সমুদ্র, লোকসম্মিবেশ (যথাসম্মিষ্ট তুলোক, ভুবলোক, স্বর্লোক প্রভৃতি) ইত্যাদি প্রকার অপ্রত্যক্ষ পদার্থের শব্দমাত্র হইতে সম্প্রত্যয় ( বথার্থ বোধ ) হয় না । ( প্রশ্ন ) তবে কি ? ( উত্তর ) এই শব্দ আপ্তগণ কর্তৃক কথিত, এ জন্ত ( তাহা হইতে পূর্বোক্ত প্রকার পদার্থের ) বথার্থ-

১। উত্তরকুরু অপরীণের বর্ণনা। ইহারের দ্রাবর্ণ ( ১১৪ ) উত্তরকুর উল্লেখ আছে । ব্রাহ্মণে অরণ্য-কাণ্ডে ( ৩১১৩ ), তিচ্ছিকাকাণ্ডে ( ১৩৩১৩৩ ) উত্তরকুর উল্লেখ আছে । মহাভারত ভীষ্মপর্বে আছে ( ৫ অঃ ) । হেমচন্দ্র উত্তর ও নীলপর্বতের কক্ষিণ পার্বে উত্তরকুরু অবস্থিত । হরিশ্বে আছে,—“ততোহর্থাৎ বনুর্ভীষ্ম বৃজ-পুত্রমাস্ত বধঃ । অগ্নেন সমভিজাতা বহুবানসেব চ ॥” ( ১৭০১৩ ) । ইহা দ্বারা বুঝা যায়, সমুদ্রতীর হইতে বহুবানস পর্বত পর্যন্ত বহুদূর স্থগত উত্তরকুরু । দ্রাবর্ণের তিচ্ছিকাকাণ্ডে আছে,—“তমভিজনা শৈবেজ্যবৃত্তঃ পুত্রবান নিধিঃ ।” ( ৩১৪৩ ) ।

বোধ হয়। যেহেতু বিপর্যয়ে অর্থাৎ শব্দ আপ্ত ব্যক্তির উক্ত না হইলে (তাঁহা হইতে) বর্থাৎবোধ হয় না। অনুমান কিন্তু এইরূপ নহে [অর্থাৎ অনুমান স্থলে কোন আপ্তবাক্যপ্রযুক্ত বোধ জন্মে না, তাহাতে আপ্তবাক্যের কোন আবশ্যকতা নাই; সুতরাং শব্দ বোধ অনুমিতি না হওয়ায় শব্দ অনুমানপ্রমাণ নহে।]

আর যে (বলা হইয়াছে) “উপলব্ধিরবিপ্রবৃত্তিহাৎ” (৫০ সূত্র), (ইহার উত্তর বলিতেছি) শব্দ ও অনুমানে অর্থাৎ ঐ উভয় স্থলে উপলব্ধির ইহাই (পূর্বোক্ত) প্রকারভেদ আছে। সেই বিশেষ (প্রকারভেদ) থাকায় “বিশেষাভাবাৎ” অর্থাৎ “যেহেতু বিশেষ নাই” ইহা অহেতু [অর্থাৎ শব্দ অনুমানপ্রমাণ, এই পূর্বপক্ষ সাধন করিতে শব্দ ও অনুমান স্থলে প্রমিতির বিশেষ নাই, এই যে হেতু বলা হইয়াছে, তাহা অসিদ্ধ। কারণ, ঐ উভয় স্থলে প্রমিতির বিশেষ আছে। সুতরাং ঐ হেতু অসিদ্ধ হওয়ায় উহা হেতুই হয় না, উহা হেতুভাস।]

আর এই যে (বলা হইয়াছে) “সম্বন্ধাচ্চ” (৫১ সূত্র) অর্থাৎ সম্বন্ধবিশিষ্ট অর্থের বোধক বলিয়াও শব্দ অনুমানপ্রমাণ, (ইহার উত্তর বলিতেছি)। শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ স্বীকৃতও আছে, প্রতিবিদ্ধও আছে। বিশদার্থ এই যে, “ইহার ইহা” অর্থাৎ এই শব্দের এই অর্থ বাচ্য, এই যতী বিভক্তিমুক্ত বাক্যের অর্থ বিশেষ অর্থাৎ ঐ বাক্যবোধ্য শব্দ ও অর্থের বাচ্যবাচকভাবরূপ সম্বন্ধ স্বীকৃত, কিন্তু প্রাপ্তিরূপ সম্বন্ধ অর্থাৎ শব্দ ও অর্থের স্বাভাবিক সম্বন্ধ প্রতিবিদ্ধ [অর্থাৎ শব্দ ও অর্থের বাচ্যবাচকভাবরূপ সম্বন্ধই স্বীকার করি, স্বাভাবিক সম্বন্ধ স্বীকার করি না। সুতরাং শব্দ ও অর্থের ব্যাপ্তি-নির্বাহক সম্বন্ধ না থাকায় “সম্বন্ধাচ্চ” এই সূত্রোক্ত হেতু অসিদ্ধ, উহা হেতুই হয় না।]

(প্রশ্ন) কেন? অর্থাৎ শব্দ ও অর্থের প্রাপ্তিরূপ সম্বন্ধ নাই কেন? (উত্তর) যেহেতু প্রমাণের দ্বারা অর্থাৎ কোন প্রমাণের দ্বারাই (ঐ সম্বন্ধের) উপলব্ধি হয় না। [ক্রমে ইহা বুঝাইতেছেন] অতীন্দ্রিয়বশতঃ প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারা শব্দ ও অর্থের প্রাপ্তিরূপ সম্বন্ধের উপলব্ধি হয় না। বিশদার্থ এই যে, যে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা শব্দ গৃহীত

১। ভাষ্যোক্ত “সম্বন্ধাচ্চ” এই বাক্য যতী বিভক্তিমুক্ত। সম্বন্ধার্থ যতী বিভক্তির দ্বারা ঐ বাক্যে তাৎপর্য্যভূমারে বাচ্যবাচকভাব সম্বন্ধও বুঝা যাইতে পারে। ভাষ্যকারের ঐ স্থলে তাহাই বিধিকৃত। ভাষ্যে “অর্থবিশেষ” শব্দের দ্বারা ভাষ্যকার ঐ বাক্যেও পূর্বোক্ত বাচ্যবাচকভাবসম্বন্ধরূপ অর্থবিশেষই প্রকাশ করিয়াছেন। বাস্তবিক বাংলায় তাৎপর্য্যসীকারও ইহাই বলিয়াছেন। “সম্বন্ধাচ্চ” এই বাক্যটি “কত শব্দভাষ্যার্থে বাচ্য” এইরূপ অর্থ তাৎপর্য্যেই কথিত হইয়াছে।



(প্রত্যক) হয়, সেই ইন্দ্রিয়ের বিষয়ভাবাতীত অর্থাৎ সেই ইন্দ্রিয়ের বাহ্য বিষয়ই হয় না, এমন অর্থ (সেই ইন্দ্রিয়ের দ্বারা) গৃহীত হয় না। এবং অতীন্দ্রিয় বিষয়ভূত অর্থও আছে। এক ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গৃহ্যমান পদার্থদ্বয়েরই প্রাপ্তিরূপ সম্বন্ধ গৃহীত হয় [অর্থাৎ শব্দ অবগেন্দ্রিয়গ্রাহ্য, তাহার অর্থ, ঐ ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য নহে, চক্ষুরাদি কোন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য এবং কোন ইন্দ্রিয়েরই গ্রাহ্য নহে, এমন (অতীন্দ্রিয়) অর্থও আছে। একরূপ স্থলে শব্দ ও অর্থের প্রাপ্তিরূপ সম্বন্ধের প্রত্যক অসম্ভব। যে দুইটি পদার্থ এক ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য, তাহাদিগেরই উভয়ের প্রাপ্তিরূপ সম্বন্ধের প্রত্যক হইতে পারে। যেমন অঙ্গুলিদ্বয়ের উভয়ের প্রাপ্তি বা সংযোগ সম্বন্ধের প্রত্যক হয়।

টিপ্পনী। মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা পূর্বোক্ত পূর্বপক্ষের নিরাস করিয়াছেন। এইটি সিদ্ধান্ত-সূত্র। ভাষ্যকারের ব্যাখ্যাসূত্রে মহর্ষির কথা এই যে, স্বর্গাদি অনেক পদার্থ আছে, তাহা সকলের প্রত্যক নহে। তাহার স্বর্গ, অক্ষর, উভয়ভুক্ত প্রকৃতি প্রত্যক করেন নাই, তাহার ঐ সকল পদার্থপ্রতিপাদক আশ্রয়বাক্যকে আশ্রয়বাক্য-নিবন্ধন প্রমাণরূপে বুঝিয়া, তাহার সামর্থ্যবশতঃ তদ্বারা ঐ সকল অপ্রত্যক পদার্থ বুঝিয়া থাকেন। শব্দনাম হইতে ঐ স্বর্গাদি পদার্থ বুঝা যায় না। কারণ, ঐ সকল পদার্থপ্রতিপাদক কোন বাক্যকে অনাশ্রয় বাক্য বা অপ্রমাণ বলিয়া বুঝিলে তদ্বারা ঐ সকল পদার্থের বোধার্থ বোধ জন্মে না। সুতরাং শব্দ অহুমান-প্রমাণ হইতে পারে না। অহুমান-প্রমাণ হলে কোন শব্দকে আশ্রয়বাক্য বলিয়া বুঝিয়া, তাহার সামর্থ্যবশতঃ তদ্বারা কেহ প্রমের বুঝে না। সুতরাং শব্দ ও অহুমান স্থলে উপলব্ধি বা প্রমিতিও যে ভিন্ন প্রকার, ইহাও স্বীকার্য। মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা উপলব্ধির প্রকারভেদ বা বিশেষ নাই, এই পূর্বোক্ত পূর্বপক্ষসাধক হেতুরও অসিদ্ধতা হুচনা করিয়া, উহা অস্বত্ব অর্থাৎ হেতুভাঙ্গ, ইহাও হুচনা করিয়াছেন। তাই ভাষ্যকার এখানে এই সূত্র-স্থিতি উপলব্ধির প্রকারভেদ বা বিশেষ প্রদর্শন করিয়া পূর্বপক্ষসাধকের গৃহীত অবিশেষরূপ হেতুর অসিদ্ধতা দেখাইয়াছেন। মূল কথা, মহর্ষি এই প্রথমোক্ত সিদ্ধান্ত-সূত্রের দ্বারা বলিয়াছেন যে, শব্দ বোধ মেরূপ কারণ জন্ম, অহুমিতি ঐরূপ কারণ-জন্ম নহে। অহুমিতি আশ্রয়বাক্যপ্রযুক্ত জ্ঞান নহে। সুতরাং শব্দ বোধকে অহুমিতি বলিয়া শব্দকে অহুমান-প্রমাণ বলা যায় না,—শব্দ বোধ অহুমিতি হইতেই পারে না। আশ্রয়বাক্য দ্বারা পদার্থের বোধার্থ শব্দ বোধ হইলে, তাহার পরে “আমি এই শব্দের দ্বারা এইরূপে এই পদার্থকে শব্দ বোধ করিতেছি, অহুমিতি করিতেছি না” এইরূপেই ঐ শব্দ বোধের মানস প্রত্যক হয়, ঐ অহুত্বের অপলাপ করিয়া শব্দ বোধকে অহুমিতি বলা যায় না। পূর্বোক্ত কারণে শব্দ বোধ হইতে অহুমিতি ভিন্নপ্রকার বোধ বলিয়া প্রতিপন্ন হইলে শব্দ ও অহুমান স্থলে প্রমিতির বিশেষ নাই,

১। ন হ্যসং শব্দমাত্রেণ স্বর্গাদীনু প্রতিপন্ন্যতে, কিন্তু পূর্ববিশেষণাভিহিতত্বের প্রমাণরূপে প্রতিপন্ন্য তদ্ব্যবহৃত্যং শব্দং স্বর্গাদীনু প্রতিপন্ন্যতে; ন ত্রৈবমহুমানো, তদ্ব্যবহৃত্যং শব্দ ইতি।—ভাষ্যকারিক।

ইহাও বলা যায় না; সুতরাং পূর্ণগণকবাদীর ঐ হেতুও অসিদ্ধ। এই পর্য্যন্তই এই হুম্মের দ্বারা মহাবির বিবক্ষিত।

মহাবির পূর্বে “সম্বন্ধাচ্চ” এই হুম্মের দ্বারা পূর্বোক্ত পূর্ণগণক সাধনে যে হেতু বলিয়াছেন, ভাষ্যকার এখানে তাহারও উল্লেখপূর্বক ঐ হেতুরও অসিদ্ধতা বুঝাইয়াছেন। মহাবির পরবর্তী সিদ্ধান্ত-হুম্মের দ্বারা ঐ হেতুর অসিদ্ধতা সমর্থন করিয়া পূর্ণগণকের নিরাস করিয়াছেন। ভাষ্যকার এখানে বলিয়াছেন যে, শব্দ ও অর্থের বাচ্যবাচকতাব সম্বন্ধই আছে, কিন্তু প্রাপ্তিরূপ সম্বন্ধ নাই। কারণ, কোন প্রমাণের দ্বারাই শব্দ ও অর্থের ঐ সম্বন্ধের উপলব্ধি হয় না। বাহ্য কোন প্রমাণ-সিদ্ধ নহে, তাহার অস্তিত্ব নাই, তাহা অলীক। ভাষ্যকারের গূঢ় তাৎপর্য্য এই যে, শব্দ ও অর্থের যে বাচ্যবাচকতাব সম্বন্ধ আছে, ঐ সম্বন্ধ স্বাভাবিক সম্বন্ধ বা ব্যাপ্তি নহে; উহার দ্বারা শব্দে অর্থের ব্যাপ্তিনিশ্চয়ও হয় না। যদি শব্দ ও অর্থের প্রাপ্তিরূপ সম্বন্ধ থাকিত, তামা হইলে স্বাভাবিক সম্বন্ধ নিশ্চয় হইতে পারিত। কিন্তু তাহা নাই, সুতরাং “সম্বন্ধাচ্চ” এই হুম্মোক্ত হেতু অসিদ্ধ। ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য বর্ণন করিতে তাৎপর্য্যটীকার এখানে বলিয়াছেন যে, শব্দ ও অর্থের তাদাত্ম্য সম্বন্ধ, অথবা প্রতিপাদ্য-প্রতিপাদকতাব সম্বন্ধ, অথবা প্রাপ্তিসম্বন্ধ থাকিলে, ঐরূপ সম্বন্ধ স্বাভাবিক সম্বন্ধ হইতে পারে। তন্মধ্যে শব্দ অর্থের তাদাত্ম্য সম্বন্ধ প্রত্যক্ষ-হুম্মে “অব্যপদেশঃ” শব্দের দ্বারা নিরাকৃত হইয়াছে। শব্দ ও তাহার অর্থ অভিন্ন, এই বৈষাকরণ নত ভাষ্যকার প্রথমাব্যয়ে প্রত্যক্ষ-লক্ষণ-সূত্রভাবো ধণ্ডন করিয়াছেন (১ম খণ্ড, -১২০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। শব্দ ও অর্থের প্রাপ্তিরূপ সম্বন্ধ খণ্ডিত হইলে, তাহাতে শব্দ ও অর্থের স্বাভাবিক প্রতিপাদ্য-প্রতিপাদকতাব সম্বন্ধ নাই, ইহাও প্রতিপন্ন হইবে। এই অভিসন্ধিতে ভাষ্যকার এখানে শব্দ ও অর্থের প্রাপ্তিরূপ সম্বন্ধের নিরাকরণ করিতেছেন। শব্দ ও অর্থের প্রাপ্তিরূপ সম্বন্ধ নাই, ইহা প্রতিপন্ন করিতে ভাষ্যকার এখানে বলিয়াছেন যে, কোন প্রমাণের দ্বারাই ঐরূপ সম্বন্ধের উপলব্ধি হয় না। ইহা বুঝাইতে প্রথমে দেখাইয়াছেন যে, প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারা ঐ সম্বন্ধ বুঝা যাইতে পারে না। কারণ, শব্দ ও অর্থের প্রাপ্তিরূপ সম্বন্ধ থাকিলে, ঐ সম্বন্ধ অতীন্দ্রিয়ই হইবে। ঐ সম্বন্ধ অতীন্দ্রিয় কেন হইবে, ইহা বুঝাইতে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, যে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা শব্দের প্রত্যক্ষ হয়, সেই ইন্দ্রিয়ের দ্বারা তাহার অর্থের প্রত্যক্ষ হয় না। কারণ, ঐ অর্থ (বটাদি) শব্দগ্রাহক ইন্দ্রিয়ের (শ্রবণেন্দ্রিয়ের) বিষয়ই হয় না। এবং অতীন্দ্রিয় অর্থাৎ শব্দগ্রাহক শ্রবণেন্দ্রিয়ের অবিসর এবং ইন্দ্রিয়বাহকের অবিসর, এমন বিষয়বৃত্ত (শব্দ-প্রমাণের বিষয়) অর্থও আছে। তাহাতে শব্দ ও অর্থের প্রাপ্তিরূপ সম্বন্ধের প্রত্যক্ষ না হইতে পারিবে কেন? এ জন্ত শেষে বলিয়াছেন যে, এক ইন্দ্রিয়গ্রাহ পদার্থদ্বয়েরই প্রাপ্তিসম্বন্ধের প্রত্যক্ষ হয়। অর্থাৎ যেমন এক চক্ষুরিন্দ্রিয়গ্রাহ অঙ্গুলিষরের প্রাপ্তি বা সংযোগ-সম্বন্ধকে চক্ষুর দ্বারা প্রত্যক্ষ করা যায়, কিন্তু বায়ু ও মৃৎকের

১। শব্দগ্রাহকেন্দ্রিয়াভিগতিত ইন্দ্রিয়বাহকেন্দ্রিপতিভক্তাভিগতিয়া, ন চ বিষয়বৃত্তভক্তিত কর্ণধারায়।—তাৎপর্য্য-সিদ্ধা।



প্ৰাপ্তি বা সংযোগ-সম্বন্ধকে প্ৰত্যক্ষ কৰা যায় না; কাৰণ, বায়ু ও বৃক্ষ এক ইন্দ্ৰিয়গ্ৰাহ্য নহে (প্ৰাচীন মতে বায়ু ইন্দ্ৰিয়গ্ৰাহ্যই নহে, উহা স্পৰ্শাদি হেতুৰ দ্বাৰা অনুমেয়); তজপ শব্দ ও অৰ্থ এক ইন্দ্ৰিয়গ্ৰাহ্য নহে বলিবা তাহাৰ প্ৰাপ্তিসম্বন্ধেৰ প্ৰত্যক্ষ হইতে পারে না, উহা কঠীন্দ্ৰিয়। ইত্যৰং প্ৰত্যক্ষ প্ৰমাণেৰ দ্বাৰা শব্দ ও অৰ্থেৰ প্ৰাপ্তিৰূপ সম্বন্ধেৰ নিশ্চি অসম্ভব। ৫২।

ভাষ্য। প্ৰাপ্তিলক্ষণে চ গৃহ্যমাণে সম্বন্ধে শব্দার্থয়োঃ শব্দান্তিকে বাহৰ্থঃ স্তাৎ ? অৰ্থান্তিকে বা শব্দঃ স্তাৎ ? উভয়ং বোভয়ত্ৰ ? অথ খলুভয়ং ?

অনুবাদ। এবং শব্দ ও অৰ্থেৰ প্ৰাপ্তিৰূপ সম্বন্ধ গৃহ্যমাণ হইলে অৰ্থাৎ যদি বল, অনুমানপ্ৰমাণেৰ দ্বাৰা শব্দ ও অৰ্থেৰ প্ৰাপ্তিৰূপ সম্বন্ধ বুকা যায়, তাহা হইলে, (প্ৰশ্ন) শব্দেৰ নিকটে অৰ্থ থাকে ? অথবা অৰ্থেৰ নিকটে শব্দ থাকে ? অথবা উভয়ই উভয় স্থলে থাকে ? [অৰ্থাৎ শব্দেৰ নিকটেও অৰ্থ থাকে, অৰ্থেৰ নিকটেও শব্দ থাকে, শব্দ ও অৰ্থ পরস্পৰ প্ৰাপ্তিসম্বন্ধবিশিষ্ট] যদি বল, উভয়ই অৰ্থাৎ শব্দ ও অৰ্থ, এই উভয়ই পরস্পৰ উভয়েৰ নিকটে থাকে, এই তৃতীয় পক্ষই বলিব ?

সূত্র। পূরণ-প্ৰদাহ-পাটনানুপপত্তেঃ চ সম্বন্ধা-  
ভাবঃ ॥ ৫৩ ॥ ১১৪ ॥

অনুবাদ। (উত্তর) পূরণ, প্ৰদাহ ও পাটনেৰ উপপত্তি (উপলক্ষি) না হওয়ায় অৰ্থাৎ অন্ন শব্দ উচ্চারণ কৰিলে অন্নদ্বাৰা মুখ পূৰণেৰ উপলক্ষি কৰি না, অগ্নি শব্দ উচ্চারণ কৰিলে অগ্নি পদাৰ্থেৰ দ্বাৰা মুখপ্ৰদাহেৰ উপলক্ষি কৰি না, অসি শব্দ উচ্চারণ কৰিলে অসিদ্বাৰা মুখ পাটন বা মুখচ্ছেদনেৰ উপলক্ষি কৰি না, এ জ্ঞাত এক যেনানে শব্দেৰ অৰ্থ ঘটাদি থাকে, সেই ভূতনাদি স্থানে কণ্ঠ তালু প্ৰভৃতি শব্দোচ্চারণ-স্থান এবং উচ্চারণেৰ কৰণ প্ৰবন্ধবিশেষ না থাকায় অৰ্থাৎ সেই অৰ্থেৰ নিকটে শব্দোৎপত্তি অসম্ভব বলিয়া (শব্দ ও অৰ্থেৰ) সম্বন্ধ নাই, অৰ্থাৎ পূৰ্বোক্ত প্ৰাপ্তিৰূপ সম্বন্ধ নাই।

ভাষ্য। স্থানকরণান্তবাদিতি “চা”র্থঃ। ন চায়মনুমানতোহপ্পূপ-  
লভ্যতে। শব্দান্তিকেহৰ্থ ইত্যোতশ্চিন্ পক্ষেইপ্যস্ত স্থানকরণো-  
চ্চারণীয়ঃ শব্দন্তদন্তিকেহৰ্থ ইতি অম্মাধ্যমিশব্দোচ্চারণে পূরণ-প্ৰদাহ-  
পাটনানি গৃহ্যেৰন, ন চ গৃহ্যন্তে, অগ্ৰহণামানুমেয়ঃ প্ৰাপ্তিলক্ষণঃ সম্বন্ধঃ।  
অৰ্থান্তিকে শব্দ ইতি স্থানকরণাসম্ববাদনুচ্চারণং। স্থানং কণ্ঠাদয়ঃ

করণঃ প্রযত্নবিশেষঃ, তস্যার্থান্তিকেহমুপপত্তিরিতি । উভয়প্রতিবেদ্যচ্চ  
নোভয়ঃ । তস্মান্ন শব্দে নার্থঃ প্রাপ্ত ইতি ।

অনুবাদ । স্থান ও করণের অভাব হেতুক, ইহা চ-কারের অর্থ । অর্থাৎ  
সূত্রস্থ চ-কারের দ্বারা স্থানকরণাভাবরূপ হেতুস্তর মহর্ষির বিবক্ষিত ।

ইহা অর্থাৎ শব্দ ও অর্থের প্রাপ্তিরূপ সম্বন্ধ অনুমান-প্রমাণের দ্বারাও উপলব্ধ  
(সিদ্ধ) হয় না । কারণ, শব্দের নিকটে অর্থ থাকে অর্থাৎ যেখানে যেখানে শব্দ  
থাকে, সেখানে তাহার অর্থ থাকে, এই পূর্বোক্ত প্রথম পক্ষেও আস্থস্থান  
( মুখের একদেশ কণ্ঠাদি স্থান ) ও করণের ( প্রযত্নবিশেষের ) দ্বারা শব্দ উচ্চারণীয়,  
তাহার নিকটে অর্থাৎ কণ্ঠ তালু প্রভৃতি স্থানে উৎপন্ন শব্দের নিকটে অর্থ থাকিবে,  
ইহা হইলে অন্ন, অগ্নি ও অসি শব্দের উচ্চারণ হইলে পূরণ, প্রদাহ ও পাটন  
উপলব্ধ হউক ? কিন্তু উপলব্ধ হয় না, [অর্থাৎ অন্ন শব্দ উচ্চারণ করিলে  
তাহার অর্থ অন্নের দ্বারা মুখ পূরণ এবং অগ্নি শব্দ উচ্চারণ করিলে তাহার অর্থ অগ্নির  
দ্বারা মুখ প্রদাহ এবং অসি শব্দ উচ্চারণ করিলে তাহার অর্থ অস্ত্রের দ্বারা মুখচ্ছেদন,  
এগুলি কাহারও অসম্ভব হয় না ] এবং না হওয়ায় অর্থাৎ ঐরূপ স্থলে মুখপূর্ণাদির  
অসম্ভব না হওয়ায় ( শব্দ ও অর্থের ) প্রাপ্তিরূপ সম্বন্ধ অসুমেয় নহে, অর্থাৎ তাহা  
অনুমানপ্রমাণের দ্বারা বুঝা যায় না ।

অর্থের নিকটে শব্দ থাকে, এই পক্ষে অর্থাৎ যেখানে যেখানে অর্থ থাকে, সেখানে  
তাহার বোধক শব্দ থাকে, এই পূর্বোক্ত-দ্বিতীয় পক্ষে স্থান ও করণের অসম্ভব প্রযুক্ত  
(অর্থের আধার ভূতলাদি স্থানে শব্দের) উচ্চারণ নাই । বিশদার্থ এই যে, স্থান কণ্ঠাদি  
করণ প্রযত্নবিশেষ, অর্থের নিকটে তাহার উপপত্তি (সত্তা) নাই । উভয় প্রতিবেদ্যবশতঃ  
উভয়ও থাকে না [অর্থাৎ যখন শব্দের নিকটে অর্থ থাকে, ইহাও প্রতিষিদ্ধ, অর্থের  
নিকটে শব্দ থাকে, ইহাও প্রতিষিদ্ধ, উভয় পক্ষই যখন বলা যায় না, তখন শব্দ ও  
অর্থ এই উভয়ই উভয়ের নিকটে থাকে, এই (পূর্বোক্ত পূর্বপক্ষবাদীর এইত)  
তৃতীয় পক্ষও বলা যায় না, তাহাও সূত্রস্থ প্রতিষিদ্ধ] অতএব শব্দ কর্তৃক অর্থ প্রাপ্ত  
নহে অর্থাৎ শব্দ ও অর্থের প্রাপ্তিরূপ সম্বন্ধ নাই ।

টীকনী । শব্দ ও অর্থের প্রাপ্তিরূপ সম্বন্ধ প্রত্যেক ঐনাণের দ্বারা সিদ্ধ হইতে পারে না,  
ইহা ভাষ্যকার পূর্বে বুঝাইয়াছেন । এখন ঐ সম্বন্ধ যে অনুমান-প্রমাণের দ্বারাও সিদ্ধ হয় না,  
ইহা বুঝাইতে “প্রাপ্তিনক্ষণে চ” ইত্যাদি ভাষ্যের দ্বারা মহর্ষি-হৃদয়ের অবতারণা করিয়া, সূত্রকারের



ভাষ্যার্থ্য বর্ণনাপূর্বক এই সম্বন্ধ যে অহুমান-প্রমাণের দ্বারাও সিদ্ধ হয় না, ইহা বুঝাইয়াছেন। উপমান বা শব্দ-প্রমাণের দ্বারা এই সম্বন্ধ সিদ্ধ হইবার সম্ভাবনাই নাই। সুতরাং এখন অহুমান-প্রমাণের দ্বারা এই সম্বন্ধ সিদ্ধ হয় না, ইহা প্রতিপন্ন করিলেই কোন প্রমাণের দ্বারা এই সম্বন্ধ সিদ্ধ হয় না, সুতরাং শব্দ ও অর্থের প্রাপ্তিরূপ সম্বন্ধই নাই, ইহা প্রতিপন্ন হইবে। তাই ভাষ্যকার মহর্ষি-সূত্রের দ্বারা শব্দ ও অর্থের প্রাপ্তিরূপ সম্বন্ধ অহুমান-প্রমাণের দ্বারাও সিদ্ধ হয় না, ইহা বুঝাইয়াছেন। অর্থাৎ শব্দ ও অর্থের প্রাপ্তিরূপ সম্বন্ধ প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারা সিদ্ধ হওয়া একেবারেই অসম্ভব; উপমান-প্রমাণের দ্বারা সিদ্ধ হওয়াও অসম্ভব। এই বিষয়ে কোন শব্দ-প্রমাণও নাই। পরন্তু পূর্বপক্ষবাদী বৈশেষিক-মতাবলম্বী হইলে তাহার মতে উপমান ও শব্দ-প্রমাণ অহুমান-প্রমাণের মধ্যে গণ্য। সুতরাং শব্দ ও অর্থের প্রাপ্তিরূপ সম্বন্ধ অহুমান-প্রমাণের দ্বারা সিদ্ধ হইতে পারে না; কারণ, এই উভয়ের ব্যাপ্য-ব্যাপক সম্বন্ধ নাই, ইহা প্রতিপন্ন করিলেই শব্দ ও অর্থের প্রাপ্তিরূপ সম্বন্ধ কোন প্রমাণসিদ্ধ না হওয়ার উহা নাই, ইহা প্রতিপন্ন হইয়া গাইবে। এই অভিনবদ্বিতেই মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা তাহাই প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

শব্দ ও অর্থের প্রাপ্তিরূপ সম্বন্ধ অহুমান-প্রমাণের দ্বারা কেন সিদ্ধ হইতে পারে না, ইহা বুঝাইতে ভাষ্যকার প্রথমে বলিয়াছেন যে, অহুমান-প্রমাণের দ্বারা শব্দ ও অর্থের প্রাপ্তিরূপ সম্বন্ধ সাধন করিতে হইলে শব্দের নিকটে অর্থ থাকে, অথবা অর্থের নিকটে শব্দ থাকে, অথবা উভয়েরই নিকটে উভয় থাকে, ইহার কোন পক্ষ বলা আবশ্যক। কারণ, তাহা না বলিলে শব্দ ও অর্থের প্রাপ্তিরূপ সম্বন্ধ অহুমানসিদ্ধ হওয়া অসম্ভব। শব্দ ও অর্থ যদি বিভিন্ন স্থানেই থাকে, উহার মধ্যে কেহ কাহারই নিকটে না থাকে, তাহা হইলে উহাদিগের পরস্পর প্রাপ্তিসম্বন্ধ থাকিতেই পারে না। ভাষ্যকার এই অভিনবদ্বিতেই প্রথমে পূর্বোক্তরূপ ত্রিবিধ প্রশ্ন করিয়া, মহর্ষি-সূত্রের উল্লেখপূর্বক পূর্বোক্ত ত্রিবিধ করাই যে উপপন্ন হয় না, তাহা বুঝাইয়াছেন। অর্থাৎ মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা পূর্বোক্ত ত্রিবিধ করেই অহুপপত্তি দেখাইয়া, শব্দ ও অর্থের প্রাপ্তিরূপ সম্বন্ধ নাই, উহা অহুমানসিদ্ধ হইতে পারে না, ইহা বলিয়াছেন, ইহাই ভাষ্যকারের মূল বক্তব্য। তাই ভাষ্যকার সূত্রার্থ বর্ণনার প্রথমেই বলিয়াছেন যে, সূত্রার্থ "চ" শব্দের দ্বারা স্থান ও করণের অভাব-রূপ হেতুর মহর্ষির বিবক্ষিত। এই হেতুর দ্বারা "অর্থের নিকটে শব্দ থাকে" এই দ্বিতীয় পক্ষের অহুপপত্তি স্থচিত হইয়াছে, ইহা ভাষ্যকার পরে বুঝাইয়াছেন। ভাষ্যকার প্রথম পক্ষে অহুপপত্তির ব্যাখ্যা করিতে বলিয়াছেন যে, "শব্দের নিকটে অর্থ থাকে" এই প্রথম পক্ষেও অর্থাৎ পূর্বপক্ষবাদী যদি বলেন যে, যেখানে যেখানে শব্দ থাকে, সে সমস্ত স্থানেই তাহার অর্থ থাকে, তাহা হইলে "আত্ম স্থানে" অর্থাৎ মূখের একদেশে কণ্ঠ তালু প্রভৃতি স্থানে "করণ" অর্থাৎ উচ্চারণের অহুকূল প্রাণবিশেষের দ্বারা শব্দ উচ্চারিত হয়, ইহা অবশ্য এ পক্ষেও বলিতে হইবে। তাহা হইলে মুখমধ্যে যখন শব্দ উৎপন্ন হয়, তখন তাহার নিকটে তাহার অর্থ যে বস্তু, তাহাও তখন মুখমধ্যে উপস্থিত হয়, ইহা স্বীকার করিতে হয়। নচেৎ শব্দের নিকটে তাহার অর্থ থাকে, ইহা কিভাবে বলা যাইবে? তাহা স্বীকার করিলে "অন্ন," "অধি" ও "অসি" শব্দ



উচ্চারণ করিলে সেখানে মুখমধ্যে এই অল্প প্রভৃতি শব্দের অর্থ অল্প, অগ্নি ও বহুলাং থাকায় অসঙ্গতির দ্বারা মুখের পূরণ, দাঁহ ও ছেদন কেন উপলব্ধি করি না? তাহা যখন কেহই উপলব্ধি করেন না, তখন শব্দের নিকটে অর্থ থাকে, এই প্রথম পক্ষ সমর্থন করা অসম্ভব। সুতরাং শব্দের নিকটে অর্থ থাকে, এই হেতুর দ্বারাও শব্দ ও অর্থের প্রাপ্তিরূপ সম্বন্ধ নিদ্ধ হইতে পারে না। কারণ, এই হেতুই অসিদ্ধ। মহর্ষি “পূরণপ্রদাহপাটনামুপপত্তেঃ” এই কথার দ্বারা শব্দের নিকটে অর্থ থাকে, এই প্রথম পক্ষের অসম্ভবর সূচনা করিয়া এই হেতুরও অসিদ্ধতা সূচনা করিয়াছেন।

স্বত্রে “চ” শব্দের দ্বারা হান ও কথনের অভাবরূপ হেতু সূচনা করিয়া, মহর্ষি অর্থের নিকটে শব্দ থাকে, এই দ্বিতীয় পক্ষেরও অসম্ভবর সূচনা করিয়া, এই হেতুরও অসিদ্ধতা সূচনা করিয়াছেন। ভাষ্যকার ইহা বুঝাইতে বলিয়াছেন যে, যেখানে বটাদি অর্থ থাকে, সেই তুতলাদি স্থানে উচ্চারণ-স্থান কণ্ঠ তানু প্রভৃতি ও উচ্চারণের অনুরূপ প্রায়বিশেষ না থাকায় শব্দের উচ্চারণ হইতে পারে না। সুতরাং অর্থের নিকটে শব্দ থাকে, এই পক্ষও অসম্ভব। সুতরাং এই হেতুর দ্বারাও শব্দ ও অর্থের প্রাপ্তিরূপ সম্বন্ধ নিদ্ধ হইতে পারে না। কারণ, এই হেতুই অসিদ্ধ।

পূর্বোক্ত উভয় পক্ষই যখন প্রতিষিদ্ধ হইল, তখন উভয়ের নিকটেই উভয় থাকে, এই তৃতীয় পক্ষ সুতরাং প্রতিষিদ্ধ। ভাষ্যকার স্বত্রেয় অবতারণা করিতে “অথ বলুভয়ং” এই কথার দ্বারা এই তৃতীয় পক্ষের গ্রহণ করিয়া, মহর্ষি-স্বত্রেয় দ্বারা তাহার পূর্বোক্ত শব্দদ্বয়ের অসিদ্ধির ব্যাখ্যা করিয়াই এই তৃতীয় পক্ষের অসিদ্ধি প্রতিপন্ন করিয়াছেন। কারণ, যদি শব্দের নিকটে অর্থ থাকে, ইহা বলা না যায় এবং অর্থের নিকটে শব্দ থাকে, ইহাও বলা না যায়, তাহা হইলে উভয়ের নিকটেই উভয় থাকে, ইহা বলা অসম্ভব। শব্দের নিকটে অর্থ নাই, অর্থের নিকটেও শব্দ নাই, ইহা প্রতিপন্ন হইলে উভয়ের নিকটে উভয় নাই, ইহাও প্রতিপন্ন হইবে। তাই বলিয়াছেন,— “উভয়প্রতিবেদ্যজ নোত্তরং।”

শব্দের নিকটে অর্থ থাকে অথবা অর্থের নিকটে শব্দ থাকে, এই বে দুইটি পক্ষ ভাষ্যকার বলিয়াছেন, তাহার ব্যাখ্যার উচ্চাতকর বলিয়াছেন যে, যে স্থানে শব্দ উৎপন্ন হয়, সেই স্থানে কি অর্থ উপস্থিত হয় অর্থাৎ আগমন করে? অথবা যেখানে অর্থ থাকে, সেখানে শব্দ আগমন করে? শব্দের নিকটে অর্থ আগমন করে, এই পক্ষে লোকব্যবহারের উদ্দেশ্য হয়। কারণ, তাহা হইলে মুর্ধনান্ পদার্থ মৌলিক প্রভৃতি গবাদির জার আগমন কল্পিতেছে, ইহা উপলব্ধি হউক? মহর্ষি “পূরণপ্রদাহ-পাটনামুপপত্তেঃ” এই কথার দ্বারা এই লোকব্যবহারের উদ্দেশ্যও প্রকাশ করিয়াছেন। অর্থের নিকটে শব্দ আগমন করে, ইহাও অসম্ভব। কারণ, শব্দ শুণ্ণপদার্থ, তাহার গতি অসম্ভব। ব্যব্যপদার্থেরই গমনক্রিয়া সম্ভব হইতে পারে। পূর্বপক্ষবাদী যদি

১। নাশ্বনানোপি, বিকল্পামুপপত্তেঃ। শব্দো বাহির্দেশমুপসম্প্রাপ্যতে, অর্থো বা শব্দদেশং, উত্তরং বা। ন ভাববর্ধঃ শব্দদেশমুপসম্প্রাপ্যতে।—ভাষ্যকার্ত্তিক। প্রাপ্তিসম্বন্ধে ত্রয়োবি ভাষ্য ব্যাচ্যে নাশ্বনানোপীতি। উপ-সম্প্রাপ্যতে প্রাপ্তোহি, আশঙ্ক্যতীতি খ্যং। আশঙ্করূপলভ্যতে মোককারিঃ ন ভোগলভ্যতে, তদাশ্রয়শ্চতি শব্দবর্ধঃ।—ভাষ্যকার্ত্তিক।



বলেন যে, অর্থের নিকটে শব্দ আগমন করে না, কিন্তু উৎপন্ন হয়। কঠাঙ্গি স্থানে প্রথম শব্দ উৎপন্ন হইলেও বীচিভারক ভাবে শেষে অর্থদেশেও উহা উৎপন্ন হয়। শব্দ হইতে শব্দান্তরের উৎপত্তি নিম্নোক্তব্যবহারীও স্বীকার করেন। এতদ্বারা উল্লেখ্যতর বলিয়াছেন যে, পূর্বপক্ষবাদী যখন শব্দকে নিত্য বলেন, তখন অর্থদেশে শব্দ উৎপন্ন হয়, ইহা তিনি বলিতে পারেন না। শব্দ নিত্যও বটে এবং অর্থদেশে উৎপন্নও হয়, ইহা ব্যাহত। শব্দান্তরের স্বাভাবিক সম্বন্ধবাদী, শব্দনিত্যবাদী নীমাংসক ইহা বলিতে পারেন না। পূর্বপক্ষবাদী নীমাংসক যদি বলেন যে, অর্থদেশে শব্দ আগমনও করে না, উৎপন্নও হয় না, কিন্তু অস্তিত্ব হয়। উল্লেখ্যতর এ কথারও উল্লেখপূর্বক এখানে ইহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। দ্বিতীয় আদিকে শব্দের অনিত্য-পরীক্ষা-প্রকরণে এ সকল কথার বিশদ আলোচনা পাওয়া যাইবে।

মূলকথা, শব্দ ও অর্থের প্রান্তিক সন্ধি কোন প্রমাণসিদ্ধ না হওয়ার উহা নাই। অতরাং উহাদিগের স্বাভাবিক সন্ধি নাই। যে হেতুতে উহাদিগের প্রান্তিক সন্ধি নাই বুঝা গেল, সেই হেতুতেই উহাদিগের স্বাভাবিক প্রতিপাদ্য-প্রতিপাদকতাব সন্ধিও নাই বুঝা যায়। অতঃপর কোনরূপ সন্ধি বুঝিয়া উহাদিগের ব্যাখ্যাপ্রকৃত্য সন্ধি বুঝা যায় না। স্বাভাবিক সন্ধি থাকিলেই তাহা বুঝা যায়; কিন্তু তাহা প্রমাণসিদ্ধ নহে। অতরাং শব্দ যে অসম্মান-প্রমাণের দ্বারা স্বাভাবিক সন্ধিবিশিষ্ট অর্থের প্রতিপাদক বলিয়া অসম্মান-প্রমাণ, এই পূর্বপক্ষ প্রতিষিদ্ধ হইল। পূর্বোক্ত "সম্বন্ধ" এই শব্দোক্ত হেতুর অসিদ্ধি জ্ঞাপন করিয়া মহর্ষি এই শব্দের দ্বারা পূর্বোক্ত পূর্বপক্ষের নিরাস করিলেন। ৫০।

### সূত্র। শব্দার্থব্যবস্থানাদপ্রতিবেদঃ ॥ ৫৪॥১১৫ ॥

অনুবাদ। (পূর্বপক্ষ) শব্দ ও অর্থের ব্যবস্থাবশতঃ অর্থাৎ শব্দার্থবোধের ব্যবস্থা আছে বলিয়া (শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধের) প্রতিবেদ নাই [অর্থাৎ যখন কোন শব্দ কোন অর্থবিশেষই বুঝায়, শব্দমাত্র হইতে অর্থমাত্রের বোধ হয় না, তখন শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধের প্রতিবেদ করা যায় না। এই সম্বন্ধ থাকতেই শব্দার্থবোধের পূর্বোক্তরূপ ব্যবস্থা উপপন্ন হয়, অতরাং উহা স্বীকার্য্য]

ভাষ্য। শব্দার্থপ্রত্যয়স্বা ব্যবস্থাদর্শনাদনুমীয়তেহিতি শব্দার্থসম্বন্ধো ব্যবস্থাকারণঃ। অসম্বন্ধে হি শব্দমাত্রাদর্থমাত্র প্রত্যয়প্রসঙ্গঃ, তস্মাদপ্রতিবেদঃ সম্বন্ধস্তেতি।

অনুবাদ। শব্দার্থবোধের ব্যবস্থা (নিয়ম) দেখা যায়, এ জন্য (এ) ব্যবস্থার কারণ শব্দার্থসম্বন্ধ আছে, (ইহা) অনুমিত হয়। কারণ, (শব্দ ও অর্থের) সম্বন্ধ না থাকিলে শব্দমাত্র হইতে অর্থমাত্রবিষয়ে বোধের প্রসঙ্গ হয়, অর্থাৎ সকল শব্দ

হইতেই সকল অর্থের বোধের আপত্তি হয়। অতএব ( শব্দ ও অর্থের ) সম্বন্ধের প্রতিবেদ নাই।

টিপ্পনী। মহর্ষি পূর্বশব্দের দ্বারা শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ নাই বলিয়া পূর্বোক্ত "সম্বন্ধাক্ত" এই ব্রহ্মসমর্পিত পূর্বপক্ষের নিরাস করিয়াছেন। শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ প্রমাণসিদ্ধ নহে, ইহা ভাষ্যকার বুঝাইয়াছেন। কিন্তু তাহারা শব্দ ও অর্থের স্বাভাবিক সম্বন্ধ স্বীকার করেন, তাহারা অন্য হেতুর দ্বারা ঐ সম্বন্ধের অস্বীকার করেন। উহা অস্বীকারসিদ্ধ নহে, ইহা তাহারা স্বীকার করেন না। মহর্ষি সেই অস্বীকারেরও বণ্ডন করিবার উদ্দেশ্যে এখানে এই ব্রহ্মের দ্বারা পূর্বপক্ষ বলিয়াছেন যে, শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধের প্রতিবেদ (অভাব) নাই অর্থাৎ ঐ সম্বন্ধ আছে। কারণ, যদি শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ না থাকিত, তাহা হইলে সকল শব্দের দ্বারাই সকল অর্থের বোধ হইত। যখন তাহা বুঝা যায় না, যখন শব্দবিশেষের দ্বারা অর্থবিশেষই বুঝা যায়, এইরূপ ব্যবস্থা বা নিয়ম আছে, ইহা সর্বসম্মত, তখন তদ্বারা শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ আছে, ইহা অস্বীকার করা যায়। ঐ সম্বন্ধই পূর্বোক্ত ব্যবস্থার কারণ। অর্থাৎ যে অর্থের সহিত যে শব্দের সম্বন্ধ আছে, সেই অর্থই সেই শব্দের দ্বারা বুঝা যায়। অন্য অর্থের সহিত সেই শব্দের সম্বন্ধ না থাকতেই তদ্বারা অন্য অর্থ বুঝা যায় না। শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ স্বীকার না করিলে পূর্বোক্তরূপ নিয়মের উপপত্তি হয় না। ফল কথা, শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ অস্বীকারপ্রমাণসিদ্ধ, সুতরাং উহার প্রতিবেদ নাই। ৫৪৪

ভাষ্য। অত্র সমাধিঃ—

অনুবাদ। এই পূর্বপক্ষে সমাধান ( উত্তর )।

সূত্র। ন সাময়িকত্বাচ্ছদার্থসম্প্রত্যয়শ্চ ॥ ৫৫ ॥ ১১৬ ॥

অনুবাদ। ( উত্তর ) না, অর্থাৎ শব্দার্থসম্বন্ধের অপ্রতিবেদ নাই—প্রতিবেদই আছে, যেহেতু শব্দার্থবোধ সাময়িক অর্থাৎ সংস্কৃতজনিত। [ অর্থাৎ এই শব্দের এই অর্থই বাচ্য, এইরূপ যে সংস্কৃত, তৎপ্রযুক্তই শব্দবিশেষ হইতে অর্থবিশেষের বোধ জন্মে ; সুতরাং পূর্বোক্ত সম্বন্ধ স্বীকার অনাবশ্যক ]।

ভাষ্য। ন সম্বন্ধকারিতং শব্দার্থব্যবস্থানং, কিং তর্হি ? সময়কারিতং। যন্তদবোচাম, অস্ত্রোদমিতি যন্ত্রীবিশিষ্টশ্চ বাক্যস্তার্থবিশেষোহনুজাতঃ শব্দার্থয়োঃ সম্বন্ধ ইতি, সময়ং তদবোচামেতি। কঃ পুনরয়ং সময়ঃ ? অস্যা শব্দস্যোদমর্গজাতমভিধেয়মিতি অভিধানাভিধেয়নিয়মনিয়োগঃ। তন্নিম্নপু-  
নুক্তে শব্দার্থসম্প্রত্যয়ো ভবতি। বিপর্যয়া হি শব্দভ্রবণেহপি প্রত্যয়া-



ভাষাঃ। সম্বন্ধবাদিনোহপি চায়ং ন বর্জনীয় ইতি। প্রযুক্ত্যমানগ্রহণাত  
সময়োপযোগো লৌকিকানাং।\* সময়পরিপালনার্থকেনং পদলক্ষণায়া  
বাচোহদ্বাধ্যানং ব্যাকরণং বাক্যলক্ষণায়া বাচোহর্ধলক্ষণং। পদসমূহো  
বাক্যমর্থপরিসমাপ্তাবিতি। তদেবং প্রাপ্তিলক্ষণস্য শব্দার্থসম্বন্ধন্যর্থত্ববোহ-  
প্যামুমানহেতুর্ন ভবতীতি।

অনুবাদ। শব্দার্থের ব্যবস্থা অর্থাৎ শব্দ হইতে অর্থবোধের পূর্বোক্তরূপ নিয়ম  
সম্বন্ধপ্রযুক্ত নহে। (প্রশ্ন) তবে কি? (উত্তর) “সময়” প্রযুক্ত। সেই যে  
বলিয়াছি, “ইহার ইহা” অর্থাৎ এই শব্দের এই অর্থ বাচ্য, এই বস্তু বিভক্তিব্যুক্ত  
বাক্যের অর্থ বিশেষরূপ অর্থাৎ বাচ্যবাচকভাবসম্বন্ধরূপ শব্দার্থসম্বন্ধ স্বীকৃত, তাহা  
“সময়” বলিয়াছি। (প্রশ্ন) এই “সময়” কি? (উত্তর) এই শব্দের এই অর্থসমূহ  
অভিধেয় (বাচ্য), এইরূপ অভিধান ও অভিধেয়ের (শব্দ ও অর্থের) নিয়ম বিধয়ে  
নিয়োগ। [অর্থাৎ এই শব্দের ইহাই অর্থ, এইরূপ নিয়ম বিধয়ে “এই শব্দ হইতে  
এই অর্থই বোদ্ধব্য” ইত্যাকার যে পুরুষবিশেষের ইচ্ছাবিশেষরূপ নিয়োগ (সম্বন্ধে),  
তাহাই “সময়”, পূর্বের উহাকেই শব্দার্থসম্বন্ধ বলিয়াছি] সেই সময় উপযুক্ত (গৃহীত)  
হইলে, অর্থাৎ পূর্বোক্তরূপ সম্বন্ধের জ্ঞান হইলেই শব্দ হইতে অর্থবোধ হয় (অর্থাৎ  
ঐ সম্বন্ধজ্ঞান শব্দ বোধে কারণ) যেহেতু বিপর্যয়ে অর্থাৎ ঐ সম্বন্ধজ্ঞান না  
হইলে শব্দশ্রবণ হইলেও (অর্থের) বোধ হয় না। পরন্তু এই “সময়” অর্থাৎ  
পূর্বোক্ত ইচ্ছাবিশেষরূপ সম্বন্ধে সম্বন্ধবাদীরও বর্জনীয় নহে [অর্থাৎ যিনি শব্দ ও  
অর্থের স্বাভাবিক সম্বন্ধ স্বীকার করেন, তাহারও পূর্বোক্ত সময় বা সম্বন্ধ স্বীকার্য,  
তুতরাং তাহার দ্বারাই শব্দার্থবোধাদির উপপত্তি হইলে আর শব্দ ও অর্থের স্বাভাবিক  
সম্বন্ধ স্বীকার অনাবশ্যক]।

\* “সমুদায়িকবাসিন্যনুসংহা” গ্রন্থে ভাষ্যকার ব্যাকরণের এই সম্বন্ধটি উদ্ধৃত হইয়াছে। কিন্তু তাহাতে “সময়-  
জ্ঞানার্থকিয়া পদলক্ষণায়া বাচোহদ্বাধ্যানং ব্যাকরণং বাক্যলক্ষণায়া বাচোহর্ধলক্ষণং” এইরূপ পাঠ উদ্ধৃত দেখা যায়।  
ভাষ্যপট্টিকাচার ব্যাচ্যপতি বিস্ত “সময়পরিপালনার্থঃ” এইরূপ ভাষ্য-পাঠের উল্লেখ করায়, ঐ পাঠই মূল গৃহীত  
হইল। প্রচলিত ভাষ্যপুস্তকের এইরূপ পাঠ দেখা যায়। কিন্তু প্রচলিত পুস্তকের “লক্ষ্য লক্ষণং” এইরূপ পাঠ  
অকৃত নহে। বৈয়াকরণসিদ্ধান্তমহত্ব্যর উদ্ধৃত “অর্থলক্ষণং” এইরূপ পাঠই প্রকৃত বলিয়া মূল তাহাই গৃহীত  
হইল। “লক্ষ্য লক্ষ্যত্বেনন” এইরূপ ব্যাচ্যপতিতে “অর্থলক্ষণং” বসিতে এখানে বুঝিতে হইবে অর্থজ্ঞাপক।  
“লক্ষ্যলক্ষ্যত্বেনন” এইরূপ ব্যাচ্যপতিতে “লক্ষ্যলক্ষণং” শব্দের দ্বারা বুঝিতে হইবে অনুশাসন। সম্বন্ধপরিপালনার্থ  
অর্থাৎ সম্বন্ধের জ্ঞান বা জ্ঞান প্রদায়ক প্রয়োজন এবং পদরূপ শব্দের অনুশাসন এই ব্যাকরণ। ব্যাকরণ শব্দের অর্থ-  
লক্ষণ অর্থাৎ অর্থজ্ঞাপক, ইহাই ভাষ্য।

প্রযুক্ত্যমান ( শব্দের ) জ্ঞানপ্রযুক্তই অর্থাৎ সূচিরকাল হইতে বুদ্ধগণ যে যে অর্থে যে যে শব্দের প্রয়োগ করিতেছেন, তাহাদিগের জ্ঞানবশতঃই লৌকিক ব্যক্তি-দিগের সময়ের উপযোগ ( সংকেতের জ্ঞান ) হয়। [ অর্থাৎ প্রথমতঃ বুদ্ধব্যবহারের দ্বারাই অজ্ঞ লৌকিক ব্যক্তিগণের পূর্বোক্তরূপ শব্দসংকেতের জ্ঞান জন্মে ]।

সংকেত পরিপালনার্থ অর্থাৎ পূর্বোক্তরূপ সংকেত রক্ষা বা সংকেতজ্ঞান যাহার প্রয়োজন, এমন পদস্বরূপ শব্দের অধ্যাখ্যান ( অনুশাসন ) এই ব্যাকরণ, বাক্য-স্বরূপ শব্দের অর্থলক্ষণ অর্থাৎ অর্থজ্ঞাপক। অর্থ পরিসমাপ্তি হইলে পদসমূহ বাক্য হয় [ অর্থাৎ যে কএকটি পদের দ্বারা প্রতিপাদ্য অর্থ সমাপ্ত বা তাহার সম্পূর্ণ বোধ জন্মে, তাদৃশ পদসমূহকে বাক্য বলে ]।

অতএব এইরূপ হইলে অর্থাৎ পূর্বোক্তরূপ “সময়” বা সংকেতের দ্বারাই শব্দার্থ-বোধের নিয়ম উপপন্ন হইলে এবং ঐ সংকেত উভয় পক্ষের স্বীকার্য হইলে প্রাপ্তিরূপ শব্দার্থসম্বন্ধের অনুমানের হেতু অর্থলেশও নাই, অর্থাৎ উহার অনুমাপক কিছুমাত্র নাই, ঐ অনুমানের প্রয়োজনও কিছুমাত্র নাই।

টিরনী। মরহি এই সূত্রের দ্বারা তাহার সিদ্ধান্ত জ্ঞাপন করিয়া পূর্বসংকেত পূর্বপক্ষের নিরাস করিয়াছেন। এইটি সিদ্ধান্তসূত্র। মরহি বলিয়াছেন যে, শব্দার্থবোধ সাময়িক অর্থাৎ উহা শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধপ্রযুক্ত নহে, উহা “সময়” অর্থাৎ সংকেতপ্রযুক্ত। অতঃপাশ্চ শব্দবিশেষ হইতে যে অর্থবিশেষেরই বোধ জন্মে, সকল শব্দ হইতে সকল অর্থের বোধ জন্মে না, এই নিয়মেরও অতুপপত্তি নাই। কারণ, ঐ নিয়ম শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধপ্রযুক্ত বলি না, উহা সংকেতপ্রযুক্ত। মরহি এই সূত্রে যে “সময়” বলিয়াছেন, ঐ সময় কি, ইহা বুঝাইতে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, শব্দ ও অর্থের নিয়ম বিষয়ে নিয়োগই সময়। অর্থাৎ এই শব্দের এই অর্থই বাচ্য, এইরূপ যে নিয়ম, তাহাযে “এই শব্দ হইতে এই অর্থই বোঝব্য” ইত্যাকার যে নিয়োগ অর্থাৎ স্বাষ্টর প্রথমে পুরুষবিশেষকৃত অর্থবিশেষে শব্দবিশেষের যে সংকেত, তাহাই “সময়”।

এই অর্থ এই শব্দের বাচ্য, এইরূপ বাকী বিভক্তিদ্বিত্ব বাক্যের দ্বারা যে বাচ্যবাচকতাব সম্বন্ধ বুঝা যায়, তাহা অবশ্য স্বীকার করি, উহাকেই আমরা সময় বা সংকেত বলি। কিন্তু ঐ সম্বন্ধ শব্দ ও অর্থের প্রাপ্তিরূপ অর্থাৎ পরস্পর সংশ্লেষরূপ ( সংযোগাদি ) কোন সম্বন্ধ নহে। শব্দ ও অর্থ পরস্পর অপ্রাপ্ত বা বিস্তৃষ্ট হইয়া বিভিন্ন স্থানে থাকে। তাহাতে বাচ্যবাচকতাব সম্বন্ধ অবশ্য থাকিতে পারে। কিন্তু প্রাপ্তিরূপ সম্বন্ধ ব্যতীত এইরূপ সম্বন্ধ স্বাভাবিক সম্বন্ধ হইতে পারে না। শব্দ ও অর্থের ঐ সংকেতরূপ সম্বন্ধের জ্ঞান ব্যতীত শব্দ অর্থ করিলেও অর্থবোধ জন্মে না। ভাষ্যকার এই কথা বলিয়া পরেই বলিয়াছেন যে, এই সময় বা সংকেত সম্বন্ধ-বাদীরও স্বীকার্য। অর্থাৎ সীমান্দক বা বৈয়াকরণগণ যে শব্দ ও অর্থের স্বাভাবিক সম্বন্ধ স্বীকার করেন, তাহাদিগেরও



পূর্বোক্তরূপ সংকেত অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কারণ, শব্দ ও অর্থের স্বাভাবিক সম্বন্ধ থাকিলেও তাহার জ্ঞান না হইলে শকার্ণবোধে ভ্রান্তিতে পড়িতে পারে না। সকল অর্গের সহিত সকল অর্গের স্বাভাবিক সম্বন্ধ স্বীকার করা হইবে না। কারণ, তাহা হইলে শকার্ণবোধের ব্যবস্থা বা নিয়মের উপপত্তি হইবে না। সম্বন্ধবাদীর মতেও সকল শব্দ হইতে সকল অর্থের বোধের আগতি হইবে। সুতরাং অর্থবিশেষের সহিত শব্দবিশেষের যে স্বাভাবিক সম্বন্ধ স্বীকার করিতে হইবে, তাহার জ্ঞানের উপায় কি ? ইহা সম্বন্ধবাদীকে অবশ্যই বলিতে হইবে। এই সম্বন্ধ-জ্ঞান ব্যতীত শকার্ণবোধ কখনই হইতে পারিবে না। সুতরাং “এই শব্দ এই অর্থের বাচক” অথবা “এই শব্দ হইতে এই অর্থ বোদ্ধব্য” এইরূপ সংকেতই এই সম্বন্ধবোধের উপায় বলিতে হইবে। তাহা হইলে শকার্ণের স্বাভাবিক সম্বন্ধবাদীকেও পূর্বোক্তরূপ শব্দসংকেত স্বীকার করিতে হইবে; তিনিও তাহা অস্বীকার করিতে পারিবেন না। এখন যদি পূর্বোক্তরূপ শব্দসংকেত প্রমাণসিদ্ধ হইয়া সর্বসন্দেহ হইল, তাহা হইলে তদ্বারাই শকার্ণবোধের ব্যবস্থা বা নিয়মের উপপত্তি হওয়ায় এই নিয়মের উপপত্তির জন্য শব্দ ও অর্থের স্বাভাবিক সম্বন্ধ স্বীকার অনাবশ্যক। সুতরাং শকার্ণবোধের নিয়ম আছে, এই হেতুর দ্বারা শব্দ ও অর্থের স্বাভাবিক সম্বন্ধ সিদ্ধ হইতে পারে না। যে নিয়ম পূর্বোক্তরূপ সর্বসন্দেহ সংকেতপ্রযুক্তই উপপন্ন হয়, তাহা শব্দ ও অর্থের স্বাভাবিক সম্বন্ধের সাব্যস্ত হইতে পারে না। সুতরাং পূর্বোক্ত শকার্ণব্যবস্থা হেতুক অমুমানের দ্বারাও শব্দ ও অর্থের স্বাভাবিক সম্বন্ধ সিদ্ধ হইতে পারে না।

এখন হইতে পারে যে, পূর্বোক্তরূপ শব্দসংকেত বুঝিবার উপায় কি ? যদি কোন শব্দের সহিত তাহার অর্থের স্বাভাবিক সম্বন্ধ না থাকে, তাহা হইলে কিরূপে অজ্ঞ পৌকিক ব্যক্তিরা এই সংকেত বুঝিবে ? ভাষ্যকার “প্রযুক্ত্যমানপ্রযোজ্য” ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা এই প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন। ভাষ্যকারের কথা এই যে, শব্দগুলি স্থিরকাল হইতে সংকেতাহ্বারে বুদ্ধ-ব্যবহারে প্রযুক্ত্যমান হইয়া আসিতেছে। এই বুদ্ধব্যবহারের দ্বারা শব্দের সংকেতবিষয়ে অজ্ঞ বালকগণও সেই সেই শব্দের সংকেত বুঝিতেছে। এখন বুদ্ধব্যবহারের দ্বারাই শব্দের সংকেতজ্ঞান হয়। যেমন কোন এক বুদ্ধ (প্রযোজক) অজ্ঞ বুদ্ধকে (প্রযোজ্য বুদ্ধ ভূত্যাধিকে) “গো আনয়ন কর” এই কথা বলিলে তখন প্রযোজ্য বুদ্ধ এই বাক্যার্থ বোধের পরেই গো আনয়ন করে। ইহা এই স্থলে বুদ্ধ-ব্যবহার। এই সময়ে পার্থক্য অজ্ঞ বালক এই প্রযোজ্য বুদ্ধের গো আনয়ন দেখিয়া তাহার ভবিষ্যে প্রবৃত্তির অমুমানপূর্বক তাহার এই প্রবৃত্তির জনক কর্তব্যতা জ্ঞানের অমুমান করিয়া, শেষে এই কর্তব্যতা জ্ঞান পূর্বোক্ত বাক্যশ্রবণজন্য, ইহা অমুমান করে। কারণ, গোর আনয়ন কর্তব্য, এইরূপ জ্ঞান পূর্বোক্ত বাক্য শ্রবণের পরেই এই প্রযোজ্য বুদ্ধের জন্মিচ্ছিল, ইহা এই বালক তখন বুঝিতে পারে। তদ্বারা এই বালক তাহার পরিদৃষ্ট (প্রযোজ্য বুদ্ধের আনীত গো) পরাধিকে “গো” শব্দের অর্থ বলিয়া নির্ণয় করে। অর্থাৎ পূর্বোক্তরূপে বুদ্ধব্যবহারমূলক অমুমানপরম্পরার দ্বারা তখন বালকের “গো” শব্দের সংকেত-জ্ঞান জন্মে। এইরূপ আরও অজ্ঞাত শব্দের সংকেতজ্ঞান প্রথমতঃ সকল মানবেরই পিতা মাতা প্রভৃতি বুদ্ধগণের







অন্য কাল হইতেই সঙ্কেতজ্ঞানও হইতেছে। প্রত্যয়ের পাত্র পুনঃ সৃষ্টির প্রারম্ভে সঙ্কেতজ্ঞানের উপায় কি? এতদ্বারা “জায়কুসুমাজলি” গ্রন্থে উদয়নাচার্য্য বলিয়াছেন,—“সাম্যবৎ সমবাদয়ঃ” (২।২) অর্থাৎ সৃষ্টির প্রথমে পরমেশ্বরই মারাবীর দ্বারা প্রয়োজ্য ও প্রয়োজক-ভাবাপন্ন শব্দীয়ত্ব পরিগ্রহ-পূর্বক পূর্বোক্তরূপে বুদ্ধব্যবহার করিয়া, তদানীন্তন ব্যক্তিসিগের শব্দসঙ্কেতজ্ঞান সম্পাদন করেন। তদানীন্তন সেই সকল ব্যক্তিসিগের ব্যবহার-পরম্পরার দ্বারা পরে অল্প লোকের শব্দসঙ্কেতজ্ঞান জন্মিয়াছে। এইরূপ বুদ্ধব্যবহারপরম্পরার দ্বারা অল্প বৌদ্ধিক ব্যক্তিসিগের সঙ্কেতজ্ঞান চিরকাল হইতেই জন্মিতেছে ও জন্মিবে।

পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তে আপত্তি হইতে পারে যে, শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ স্বাভাবিক না হইয়া সাক্ষেতিক হইলে ব্যাকরণ শাস্ত্র নিরর্থক হইয়া পড়ে। কারণ, শব্দের সাধুত্ব ও অসাধুত্ব বুঝাইবার জন্যই ব্যাকরণ শাস্ত্র আবশ্যক হইয়াছে। যে শব্দের বাচক স্বাভাবিক, তাহা সাধু, তত্ত্বিত শব্দ অসাধু, ইহাই বলা যায়। কিন্তু শব্দের বাচক সাক্ষেতিক হইলে কোন্ শব্দ সাধু ও কোন্ শব্দ অসাধু, ইহা বলা যায় না—সকল শব্দই সাধু, অথবা সকল শব্দই অসাধু হইয়া পড়ে। সুতরাং শব্দের সাধুত্ব ও অসাধুত্বের বোধক ব্যাকরণ শাস্ত্র নিরর্থক। এতদ্বারা বলিয়াছেন যে, ব্যাকরণ পূর্বোক্ত “সমর” পরিপালনার্থ। তাত্ত্বপর্থাটীকাকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, পরমেশ্বর সৃষ্টির প্রথমে যে “সমর” অর্থাৎ অর্থবিশেষে শব্দবিশেষের সঙ্কেত করিয়াছেন, তাহার পরিপালন ব্যাকরণের প্রয়োজন। অর্থাৎ পরমেশ্বর যে অর্থে যে শব্দের সঙ্কেত করিয়াছেন, সেই শব্দই সেই অর্থে সাধু, তত্ত্বিত শব্দ সেই অর্থে অসাধু, ইহা বুঝাইতে ব্যাকরণ সার্থক। তাহা তাত্ত্বপর্থাটীকাকারের উদ্ধৃত পাঠান্তরে নন্দ্রের পরিপালন বলিতে সঙ্কেতের জ্ঞান বা আপনই বুদ্ধিতে হইবে। সঙ্কেতের আপনই তাহার পালন। পূর্বোক্তরূপ সঙ্কেতজ্ঞাপক ব্যাকরণ পরমেশ্বর শব্দের অধ্যয়ন অর্থাৎ অধ্যয়ন এবং বাচ্যরূপ শব্দের অর্থলক্ষণ অর্থাৎ অর্থজ্ঞাপক, এই কথা বলিয়া তাহার ব্যাকরণ শাস্ত্রের আরও প্রয়োজন বর্ণন করিয়াছেন। তাহা এখানে কেবল শব্দান্ত্র অর্থে ছই বার “বাচ” শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। পররূপ শব্দ ও বাচ্যরূপ শব্দের অর্থজ্ঞান ব্যাকরণের অধীন। ব্যাকরণ শাস্ত্র পদের প্রকৃতি-প্রত্যয় বিভাগ দ্বারা সাধুত্ব-বোধক। পরমরূপ বাচ্যের অর্থ বুদ্ধিতেও ব্যাকরণ আবশ্যক। কারণ, বাচ্যের বটক পদের জ্ঞান এবং প্রকৃতি-প্রত্যয় বিভাগের দ্বারা পদের অর্থজ্ঞান ব্যাকরণের অধীন। ইহা বুঝাইতেই ভাষাকার পরেই প্রাচীন-সম্বত বাচ্যের লক্ষণ বলিয়াছেন। ব্যাকরণ পররূপ শব্দের অধ্যয়ন, এই জন্যই ব্যাকরণকে “শব্দাধ্যয়ন” বলা হইয়াছে। মহাজ্ঞানো ব্যাকরণের প্রয়োজন বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে। স্বায়মজরীকার অরন্ত তট বহু বিভাবপূর্বক বাচ্য-রণের প্রয়োজন সমর্থন করিয়াছেন।

ভাষাকার উপসংহারে তাহার মূল প্রতিপাদ্য বলিয়াছেন যে, পূর্বোক্তরূপে সর্বসম্বত শব্দ-সঙ্কেতের দ্বারা ই বর্ণন শব্দার্থবোধের নিয়ম উপপন্ন হয়, তখন উহার দ্বারাও শব্দ ও অর্থের প্রাপ্তি-রূপ সম্বন্ধ অধ্যয়ন করা যায় না। অল্প অধ্যয়নের হেতুও পূর্বে নিরস্ত হইয়াছে। সুতরাং

শব্দ ও অর্থের প্রাপ্তিরূপ সম্বন্ধের অনুমান করিবার হেতু কিছুমান্য নাই। ঐ অনুমানের হেতু পরামর্শেণও নাই। ভাষ্যে "অর্থতুবোহপি" ইহাই প্রকৃত পাঠ্য। "তুব" শব্দ বেশ অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। অর্থ শব্দের দ্বারা এখানে প্রয়োজন অর্থও বুঝা যায়। প্রাপ্তিরূপ সম্বন্ধের অনুমান করা নিশ্চয়োক্ত, উহার হেতু প্রয়োজনলেশও নাই, ইহাও ভাষ্যকারের বিবক্ষিত বুঝা যাইতে পারে ॥২৪॥

## সূত্র । জাতিবিশেষে চানিয়মাৎ ॥৫৬॥১১৭॥

অনুবাদ । পরস্তু যেহেতু জাতিবিশেষে নিয়ম নাই [ অর্থাৎ যখন একই শব্দ হইতে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন জাতি বিভিন্ন অর্থও বুঝিতেছে, সর্বদেশে সর্বজাতি সমান ভাবে সেই শব্দের সেই অর্থবিশেষই বুঝে, এইরূপ নিয়ম নাই, তখন শব্দ ও অর্থের স্বাভাবিক সম্বন্ধ উপপন্ন হয় না । ]

ভাষ্য । সাময়িকঃ শব্দানর্থসংপ্রত্যয়ো ন স্বাভাবিকঃ । স্বাব্যর্থ্য-  
শ্লেক্ষানাং যথাকামং শব্দপ্রয়োগোহর্থপ্রত্যয়নায় প্রবর্ততে । স্বাভা-  
বিকে হি শব্দস্বার্থপ্রত্যয়কত্বে, যথাকামং ন স্তাৎ, যথা তৈজসস্য প্রকাশস্ত  
রূপপ্রত্যয়হেতুত্বং ন জাতিবিশেষে ব্যভিচারতীতি ।

অনুবাদ । শব্দ হইতে অর্থবোধ সাময়িক অর্থাৎ পূর্বোক্ত সঙ্কেতপ্রযুক্ত, স্বাভাবিক নহে অর্থাৎ শব্দ ও অর্থের স্বভাবসম্বন্ধপ্রযুক্ত নহে । ( কারণ ) অর্থ-  
বিশেষ বুঝাইবার জন্য ঋষিগণ, আৰ্য্যগণ ও শ্লেক্ষগণের ইচ্ছানুসারে শব্দপ্রয়োগ  
প্রবৃত্ত হইতেছে । শব্দের অর্থবোধকত্ব স্বাভাবিক হইলে (পূর্বোক্ত ঋষি প্রভৃতির)  
ইচ্ছানুসারে ( শব্দপ্রয়োগ ) হইতে পারে না । যেমন তৈজস প্রকাশের অর্থাৎ  
আলোকের রূপপ্রকাশক জাতিবিশেষ ব্যভিচারী হয় না । [ অর্থাৎ আলোক যে  
রূপ প্রকাশ করে, তাহা সর্বদেশে সর্বজাতির সম্বন্ধেই করে । কোন দেশে  
আলোকের রূপপ্রকাশকত্বের অভাব নাই । ]

টিপ্পনী । মহর্ষি পূর্বশ্লোকের দ্বারা বলিয়াছেন যে, প্রমাণসিদ্ধ সংকেতের দ্বারাই শব্দার্থবোধের  
। নরনের উপপত্তি হওয়ার শব্দ ও অর্থের স্বাভাবিক সম্বন্ধ স্বীকার অনাবশ্যক । এইরূপ সম্বন্ধ বিদ্যে  
কোনই প্রমাণ নাই । এখন এই শ্লোকের দ্বারা বলিতেছেন যে, শব্দ ও অর্থের স্বাভাবিক সম্বন্ধ  
উপপন্ন হয় না । অর্থাৎ উহার যেমন সাধক নাই, তদ্রূপ বাধকও আছে । কারণ, জাতিবিশেষে  
শব্দার্থবোধের নিয়ম নাই । ভাষ্যকার মহর্ষির এই কথা বুঝাইতে বলিয়াছেন যে, ঋষিগণ, আৰ্য্যগণ

১। অর্থবোধকতা দেশোপবৃত্ত্য, ন নান্তি, কেবলং পঠ্যঃ প্রাপ্তিরূপঃ সম্বন্ধঃ কল্পিত ইত্যর্থঃ । ওখ্যত  
স্বাভাবিকসম্বন্ধাভাবানুমানভাৱ্যঃ অব্যবহাৰ্য্যসিদ্ধার্থঃ স্বাভাবিকসম্বন্ধজাতিবাদবল্লভমিতি সিদ্ধং ।—ভাষ্যপৰ্য্যটিকা ।



ও রেজ্জগণের ইচ্ছানুসারে অর্থবিশেষে শব্দবিশেষের প্রয়োগ দেখা যায়। যদি, অর্থ ও রেজ্জগণ যে একই অর্থে সদান ভাবে শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহা নহে। তাহার ইচ্ছানুসারে একই শব্দের বিভিন্ন অর্থও প্রয়োগ করিয়াছেন। যদি শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ স্বাভাবিকই হইত, তাহা হইলে ইচ্ছানুসারে অর্থবিশেষে কেহ শব্দ প্রয়োগ করিতে পারিতেন না। কারণ, যে শব্দটি দ্বারা স্বাভাবিক, তাহা জাতি বা দেশভেদে অন্তর্গত হয় না। যেমন আলোকের রূপপ্রকাশকর শব্দ স্বাভাবিক, উহা জাতি বা দেশবিশেষে ব্যভিচারী নহে। অর্থাৎ কোন জাতি বা দেশবিশেষে আলোকের রূপপ্রকাশকর নাই, ইহা নহে—সকল দেশেই আলোকের রূপপ্রকাশকর আছে। এইরূপ শব্দের অর্থবিশেষ-বোধকর স্বাভাবিক হইলে সকল জাতি বা সকলদেশের লোকই সেই শব্দের দ্বারা সেই অর্থবিশেষই বুঝিত এবং সেই এক অর্থই সেই শব্দের প্রয়োগ করিত; ইচ্ছানুসারে শব্দার্থবোধ ও শব্দ প্রয়োগ করিতে পারিত না। অতঃপর জাতিবিশেষে শব্দার্থবোধের নিয়ম না থাকায় উহা স্বভাবসম্বন্ধসমূহ নহে, উহা সাংকেতিক।

সূত্রে “অনিয়ম” শব্দ ব্যভিচার অর্থে উক্ত হইয়াছে। “নিয়ম” শব্দের অর্থ ব্যাপ্তি। নব্য নৈয়ায়িকগণও ব্যাপ্তি অর্থে “নিয়ম” শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন (১ অ., ২ অ., ৫ স্বত্বভাষ্যটির নীচে)। তাই মহর্ষি “অনিয়ম” বলিয়া ব্যভিচারই প্রকাশ করিয়াছেন। নিয়ম অর্থাৎ ব্যাপ্তি না থাকিলেই ব্যভিচার থাকিবে। ভাষ্যকারও “ন জাতিবিশেষে ব্যভিচারতি” এই কথা দ্বারা সূত্রোক্ত “অনিয়ম” শব্দের ব্যভিচারগণ অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন। শব্দ হইলেই তাহা সর্বদা একরূপ অর্থই বুঝাইবে, এইরূপ নিয়ম অর্থাৎ ব্যাপ্তি নাই; কারণ, জাতি বা দেশবিশেষে উহার ব্যভিচার আছে, ইহাই মহর্ষির তাৎপর্য। এই ব্যভিচারের উদাহরণ ভাষ্যকার ও উদ্যোক্তকর বলেন নাই। যদি, অর্থ ও রেজ্জগণের যে ইচ্ছানুসারে শব্দ প্রয়োগ বা শব্দার্থ-বোধ হয়, ইহা ভাষ্যকার বলিয়াছেন। তাহার উদাহরণ বলিতে তাৎপর্যটীকাকার বলিয়াছেন যে, আর্ঘ্যগণ দীর্ঘশুক পদার্থে (যাহা এ বেশে বৎ নামে প্রসিদ্ধ) “বব” শব্দ প্রয়োগ করেন, তাহার দ্বা শব্দের দ্বারা ঐ অর্থই বুঝেন। কিন্তু রেজ্জগণ কল্প অর্থে (কাউন) বব শব্দের প্রয়োগ করেন, তাহার দ্বা শব্দের দ্বারা ঐ অর্থই বুঝেন। এইরূপ শব্দগণ নবসংখ্যক জাতীয় মতবিশেষ অর্থে “ত্রিবৎ” শব্দের প্রয়োগ করেন। তাহার “ত্রিবৎ” শব্দের দ্বারা ঐ অর্থ বুঝেন। কিন্তু আর্ঘ্যগণ লজাবিশেষ (তেউতী) অর্থে “ত্রিবৎ” শব্দের প্রয়োগ করেন, তাহার ত্রিবৎ শব্দের দ্বারা লজাবিশেষ বুঝেন। ত্রিধরতট্ট স্রাবকন্দলীতে বলিয়াছেন যে, “চৌর” শব্দের দ্বারা দক্ষিণাত্যগণ ভক্ত (ভাত) বুঝেন। কিন্তু আর্ঘ্যাবর্তবাসিগণ উহার দ্বারা তত্তর বুঝেন। অরহু তট্টও স্রাবকন্দলীতে বলিয়াছেন যে, তত্তরবাসী “চৌর” শব্দ দক্ষিণাত্যগণ ভক্ত অর্থাৎ ভর অর্থে প্রয়োগ করেন। সুত্রোক্ত “জাতিবিশেষে” শব্দের দ্বারা

১। “ত্রিবৎবিশেষং” ইতি প্রত্যয়ী ত্রিবৎগণ ইচ্ছানুসারে লোকবিশেষে, দাক্ষিণাত্যবাসীরা ভক্তকে স্রাবকন্দলীতে বসি পুথানারিকগণের দ্বারা ভক্ত নামে “উপাধি” প্রাপ্ত হইয়া ইত্যাদি বাক্যের ব্যবহার।  
—সাম দ্বিতীয়াধ্যায়।

এখানে দেশবিশেষ অর্থই অভিপ্রেত, ইহা উদ্যোতক বলিয়াছেন। তাৎপর্যটীকাকার উদ্যোতকরের এই ব্যাখ্যার কারণ বর্ণন করিতে বলিয়াছেন যে, আর্থ্যদেশবর্তী যে সকল রোজ, তাহার আর্থ্যবিশেষ ব্যবহারের দ্বারাই শব্দের সংকেত নিশ্চয় করে, সুতরাং তাহারও আর্থ্যগানের দ্বার সেই শব্দ হইতে সেই অর্থবিশেষই বুঝে। তাহা হইলে জাতিবিশেষে শব্দার্থবোধের নিয়ম নাই, এ কথা বলা যায় না। কারণ, অনেক রোজ জাতিও আর্থ্য জাতির দ্বার এক শব্দ হইতে একরূপ অর্থই বুঝে। এই জন্যই উদ্যোতকর জাতিবিশেষ বলিতে এখানে দেশবিশেষই মহাবির অভিপ্রেত, ইহা বলিয়াছেন। তাহা হইলে মহাবির কথিত অনিয়মের অন্তর্গত নাই। কারণ, দেশবিশেষে শব্দার্থবোধের অনিয়ম স্বীকার্য। অতঃপর ভট্টও জায়নতরীতে “জাতিশব্দেনাশ দেশে বিবক্ষিতঃ” এই কথা বলিয়া দেশবিশেষেই শব্দপ্রয়োগাদির অনিয়ম দেখাইতে থাকিয়াভাগ “চৌর” শব্দের ওজন অর্থে প্রয়োগ করেন, ইহা বলিয়াছেন। মূল কথা, দেশভেদে একই শব্দের নানার্থে প্রয়োগ হওয়ায় শব্দ ও অর্থের স্বাভাবিক সম্বন্ধ নাই। শব্দার্থ-সম্বন্ধ স্বাভাবিক হইলে দেশভেদে শব্দার্থ-বোধের পূর্বোক্তরূপ অব্যবস্থা বা অনিয়ম থাকিত না। আলোকের স্বাভাবিক রূপপ্রকাশক স্বর্ক-দেশেই আছে। আলোক হইলেই তাহা রূপ প্রকাশ করিবে, এই নিয়মের কোন দেশেই ভঙ্গ নাই।

পূর্বপক্ষবাদী বলি বলেন যে, সকল শব্দেরই সকল অর্থের সহিত স্বাভাবিক সম্বন্ধ আছে। বিভিন্ন দেশে যে অর্থে সেই শব্দের প্রয়োগ হয়, সেই অর্থের সহিতও সেই শব্দের স্বাভাবিক সম্বন্ধ আছে। দেশবিশেষে অর্থবিশেষেই সেই শব্দের সংকেতজ্ঞানপ্রযুক্ত অর্থবিশেষেরই বোধ জন্মিয়া থাকে। অথবা আর্থ্যদেশপ্রসিদ্ধ অর্থই প্রকৃত, রোজদেশপ্রসিদ্ধ অর্থ গ্রাহ্য নহে। মেজগণ সংকেতভ্রমবশতই অর্থবিশেষে শব্দবিশেষের প্রয়োগ করেন। জায়নতরীকার জটিল ভট্ট এই সকল কথা ও মীমাংসা-ভাব্যকার শব্দ স্বামীর স্বপক সমর্থনের কথার উল্লেখ করিয়া সকল মতের খণ্ডনপূর্বক পূর্বোক্ত জায়নতরীর বিশেষরূপ সমর্থন করিয়াছেন। তাৎপর্যটীকাকার বাচস্পতি নিশ্চয় বলিয়াছেন যে, সকল পদার্থের সহিতই সকল শব্দের স্বাভাবিক সম্বন্ধ আছে বলিলে, সকল শব্দের দ্বারাই সকল অর্থের বোধের আপত্তি হয়। সুতরাং স্বাভাবিক সম্বন্ধবাদীর অর্থবিশেষের সহিতই শব্দবিশেষের স্বাভাবিক সম্বন্ধ স্বীকার করিতে হইবে। তাহা হইলে আবাত দেশভেদে যে একই শব্দের নানার্থে প্রয়োগ, তাহা উপপন্ন হইবে না। অর্থনাত্তের সহিত শব্দ-নাত্তের স্বাভাবিক সম্বন্ধ থাকিলেও অর্থবিশেষে শব্দবিশেষের পূর্বোক্তরূপ সংকেত স্বীকার করার শব্দার্থবোধের ব্যবস্থা বা নিয়ম উপপন্ন হয়, ইহা বলিতে পারিলেও অর্থনাত্তের সহিত শব্দনাত্তের স্বাভাবিক সম্বন্ধ আছে, এ বিষয়ে কোন প্রমাণ না থাকার উহা স্বীকার করা যায় না। দেশভেদে যে একই শব্দের বিভিন্ন অর্থে প্রয়োগাদি দেখা যায়, তাহা পূর্বোক্তরূপ সংকেতভ্রম প্রযুক্তও উপপন্ন হইতে পারায়, অর্থনাত্তের সহিত শব্দনাত্তের স্বাভাবিক সম্বন্ধ স্বীকার অনাবশ্যক। তাৎপর্যটীকাকার দেশবিশেষে সংকেতভ্রমের কারণ সমর্থন করিতে বলিয়াছেন যে, সংকেত পূর্বসম্বন্ধাধীন। পূর্বসম্বন্ধ ইচ্ছার নিয়ম না থাকায় সংকেতও নানাপ্রকার হইয়াছে। দেশবিশেষে অর্থবিশেষেই সেই শব্দের সংকেতপ্রযুক্ত এই সংকেতের জ্ঞানমাত্র অর্থবিশেষের বোধ হইতেছে।



স্বষ্টির প্রথমে স্বয়ং ঈশ্বরই শব্দসংকত করিয়াছেন, ইহা ভাষ্যকার ও উদ্যোতকর স্পষ্ট বলেন নাই। শব্দ ও অর্থে বাচ্যবাচকভাব লক্ষ্যরূপ সংকত পৌরুষের, অনিত্য, ইহা উদ্যোতকর বলিয়াছেন। বাচস্পতি মিশ্র ঐ সংকত ঈশ্বরই করিয়াছেন, ইহা স্পষ্ট বলিয়াছেন। অবশ্য আধুনিক অপভ্রংশাদি শব্দের সংকতও যে ঈশ্বরকৃত, ইহা তাৎপর্যটীকাকার বলেন নাই। কিন্তু পূর্ণ-পূর্ণপ্রবৃত্ত অনেক সাধু শব্দের দেশবিশেষে বিভিন্ন অর্থে যে সংকত, তাহাও ঈশ্বরকৃত, ইহা তাৎপর্যটীকাকারের মত বুঝা যায়।

নব্য নৈয়ায়িক গদাধর ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি বিশেষ বিচারপূর্বক “এই শব্দ হইতে এই অর্থ বোদ্ধব্য” ইত্যাদি প্রকার ঈশ্বরেচ্ছাবিশেষকেই শব্দের শক্তি নামক সংকত বলিয়াছেন। ঈশ্বরেচ্ছা নিত্য, হুতরাং পূর্ণোক্তরূপ সংকতও নিত্য। অপভ্রংশাদি ( গাছ, মাছ প্রভৃতি ) শব্দের ঐরূপ নিত্য সংকত নাই। কারণ, তাহা থাকিলে অনাদি কাল হইতে “গো” প্রভৃতি সাধু শব্দের জায় ঐ সকল শব্দেরও প্রয়োগ হইত। অর্থবিশেষে শক্তিভ্রমবশতাই অপভ্রংশাদি শব্দের প্রয়োগ ও তাহা হইতে অর্থসাধন হইতেছে, এবং পারিভাষিক অনেক শব্দও প্রযুক্ত হইয়াছে ও হইতেছে; তাহাতে পূর্ণোক্ত ঈশ্বরেচ্ছাবিশেষরূপ নিত্য সংকত নাই। আধুনিক সংকতরূপ পরিভাষাবিশিষ্ট শব্দকে পারিভাষিক শব্দ বলে। পূর্ণোক্ত নিত্য সংকতবিশিষ্ট শব্দকে “বাচক” শব্দ বলে। শাব্দিক-শিল্পোদগি তর্কহরিও বলিয়াছেন,—সংকত বিবিধ। (১) আত্মানিক এবং (২) আধুনিক। নিত্য সংকতকে আত্মানিক সংকত বলে এবং তাহাই “শক্তি” নামে কথিত হয়। কদাচিত্তক সংকত অর্থাৎ শাস্ত্রকারাবিকৃত সংকতকে আধুনিক সংকত বলে; ইহা নিত্যসংকতরূপ শক্তি নহে। কারণ, পারিভাষিক শব্দগুলির অনাদি কাল হইতে প্রয়োগ নাই। যে সকল শব্দের অনাদিকাল হইতে অর্থবিশেষে প্রয়োগ হইতেছে, সেই সকল শব্দের সেই অর্থবিশেষেই ঈশ্বরেচ্ছাবিশেষরূপ অনাদি নিত্য সংকত আছে, বুঝা যায়। রেচ্ছগণ “বব” শব্দের দ্বারা কতু অর্থ বুঝিলেও ঐ অর্থে বব শব্দের ঐ নিত্য সংকত নাই। তাহারা ঐ অর্থে নিত্য সংকতরূপ শক্তি ভ্রমেই বব শব্দের দ্বারা কতু বুঝিয়া থাকে। কারণ, বাচ্যশব্দের জায় দীর্ঘশূক পদার্থেই “বব” শব্দের শক্তি নির্ণয় করা যায়। কতু অর্থেও “বব” শব্দের শক্তি থাকিলে অবশ্য শাস্ত্রান্তিতে তাহার উল্লেখ থাকিত। যেখানে একই শব্দের বিভিন্ন অর্থে শক্তির গ্রাহক আছে, সেখানে সেই সমস্ত অর্থেই সেই শব্দের শক্তি নির্ণয় হইবে। মূল কথা, গদাধর প্রভৃতির মতে স্বষ্টির প্রথমে ঈশ্বর যে দেহ ধারণ করিয়া

১। যেখানে আছে,—“ববমরশতকর্তব্যি।” এখানে ভাষ্যকরসে বব শব্দের বিবিধ অর্থে প্রয়োগ দেখা যায় বলিয়া বব শব্দার্থ সংকত বাচ্যশব্দের দ্বারা বব শব্দের দীর্ঘশূক পদার্থে শক্তি নির্ণয় হয় এবং সেই শক্তি নির্ণয়ের জন্যই বাচ্যশব্দ বলা হইয়াছে,—

ববমর শতপতনিঃ কাণ্ডে পজশ্যতম।

মৌবদানন্দ ভিট্টিমি ববঃ কপিপশালিনঃ।

ইহার দ্বারা নির্ণয় হয় যে, কপিপশুক পদার্থে অর্থাৎ দীর্ঘশূক পদার্থে “বব” শব্দের বাচ্য। কতু ( কাটন ) বব শব্দের বাচ্য নহে। হুতরাং রেচ্ছগণ শক্তিভ্রম বশতাই কতু অর্থে “বব” শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন।



শব্দসংকেত করিয়াছেন, তাহা নহে। ঈশ্বরের ইচ্ছাবিশেষরূপ সংকেত অনাদি নিষ্ক, নিত্য। ঈশ্বর প্রথমে বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিকে এই সংকেত বুঝাইয়াছেন। পরে সেই বুদ্ধগণের ব্যবহারপদ্ধতিগণ্য জন্মে সাধারণের শব্দসংকেত জ্ঞান হইয়াছে। প্রথমে ঈশ্বরই জ্ঞানগুরু। তাঁহার ইচ্ছা ও অনুগ্রহেই জগতে জ্ঞানের প্রচার হইয়াছে।

এখন একটি কথা বিবেচ্য এই যে, জারহুজ্জকার মহর্ষি গৌতম যে শব্দ ও অর্থের স্বাভাবিক সম্বন্ধ খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা নীমাংসক ও বৈয়াকরণগণ সমর্থনপূর্বক স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার ঐ স্বাভাবিক সম্বন্ধ স্বীকার করিলেও শব্দপ্রমাণকে অহুমিত্তির অন্তর্গত বলেন নাই। শব্দ অহুমান, ইহা কেবল বৈশেষিক হুজ্জকার মহর্ষি কণাদেবই সিদ্ধান্ত। মহর্ষি কণাদ “এতেন শব্দং ব্যাখ্যাতঃ” (১ অঃ, ২ অঃ, ৩ হুঃ) এই হুজ্জের দ্বারা শব্দ বোধকে অহুমিত্তি বলিয়া, ঐ সিদ্ধান্তকেই প্রকাশ করিয়াছেন, ইহাই পূর্বাভ্যাসগণ ঐকমত্যে বলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু মহর্ষি কণাদ যে শব্দ ও অর্থের স্বাভাবিক সম্বন্ধবাদী ছিলেন এবং মহর্ষি গৌতমকে “সম্বন্ধাত্ত” এই হুজ্জোক্ত হেতুর দ্বারা শব্দকে অহুমানপ্রমাণ বলিয়া সমর্থন করিতেন, ইহা কেহ বলেন নাই। পরন্তু বৈশেষিকচাৰ্য্য শ্রীধর ভট্ট “জায়কন্যো”তে বিশেষ বিচার দ্বারা শব্দ ও অর্থের স্বাভাবিক সম্বন্ধ “খণ্ডনপূর্বক গৌতমোক্ত প্রকারে পূর্বোক্তরূপ শব্দসংকেতেরই সমর্থন করিয়াছেন। তাৎপর্য্যটীকাকার বাচস্পতি মিশ্রও নীমাংসক ও বৈয়াকরণদিগকেই শব্দ ও অর্থের স্বাভাবিক সম্বন্ধবাদী বলিয়া টীকিত করিয়াছেন। কিন্তু ঐ স্বাভাবিক সম্বন্ধের অগ্রপন্থির ব্যাখ্যা করিয়া, উপসংহারে বলিয়াছেন যে, অতঃপাশ্চ শব্দ অহুমানপ্রমাণ, ইহা সিদ্ধ করিতে শব্দ ও অর্থের যে স্বাভাবিক সম্বন্ধ-কথন, তাহা অযুক্ত। শব্দ অহুমানপ্রমাণ, ইহা কিন্তু শব্দার্থের স্বাভাবিক সম্বন্ধবাদী নীমাংসক ও বৈয়াকরণগণ নিষ্ক করিতে মান নাই। ঐ পূর্বপক্ষবাদী কাহারো ? ইহাও তাৎপর্য্যটীকাকার প্রতীতি বলেন নাই। মহর্ষি কণাদ ভিন্ন আর কোন ঋষি যে শব্দার্থের স্বাভাবিক সম্বন্ধ স্বীকারপূর্বক শব্দকে অহুমানপ্রমাণ বলিয়া সমর্থন করিতেন, ইহাও পাওয়া যায় না। একেজ্ঞে মহর্ষি কণাদই শব্দার্থের স্বাভাবিক সম্বন্ধ স্বীকারপূর্বক শব্দকে অহুমানপ্রমাণ বলিতেন, শ্রীধর ভট্ট বৈশেষিক মত ব্যাখ্যায় স্বাভাবিক সম্বন্ধ-পক্ষ খণ্ডন করিলেও মহর্ষি কণাদেব উহা সিদ্ধান্তই ছিল, ইহা কল্পনা করা বাইতে পারে। এই প্রকরণোক্ত জারহুজ্জকার পূর্বাভ্যাস পর্যালোচনার দ্বারা ঐরূপ বুঝা নাইতে পারে। মহর্ষি গৌতম এই প্রকরণে কণাদ-সিদ্ধান্তেরই সমর্থনপূর্বক খণ্ডন করিয়াছেন, ইহা বুঝা যায়। অথবা মহর্ষি গৌতম “সম্বন্ধাত্ত” এই হুজ্জ কণাদেব অসম্মত হেতুর দ্বারাও পূর্বোক্ত পূর্বপক্ষের সমর্থনপূর্বক তাহারও খণ্ডনের দ্বারা ঐ পূর্বপক্ষ যে কোনরূপেই নিষ্ক হয় না, স্বাভাবিক সম্বন্ধবাদী অতঃ কেহও উহা সমর্থন করিতে পারেন না, ইহাই প্রতিপন্ন করিয়া গিয়াছেন, ইহাই বুদ্ধিতে হইবে।

বৈশেষিক হুজ্জকার মহর্ষি কণাদ শব্দ বোধকে অহুমিত্তি বলিয়াছেন। কিন্তু শব্দ-প্রবণাদির পরে কিরূপ হেতুর দ্বারা কিরূপে সেই অহুমিত্তি হয়, তাহা বলেন নাই। পরবর্তী বৈশেষিক-চাৰ্য্যগণ নানা প্রকারে অহুমানপ্রমাণী প্রদর্শন করিয়া কণাদ-মতের সমর্থন করিয়াছেন। তাৎপর্য্য



টীকাকার বাচস্পতি মিশ্র ও জায়চার্য্য উভয়ন, জয়ন্ত ভট্ট, গঙ্গেশ ও জগদীশ তর্কালঙ্কার প্রভৃতি বৈশেষিকসম্মত অমুনানের উল্লেখপূর্বক তাহার সম্বন্ধেই বর্ণন করিয়াছেন। জায়চার্য্যগণের কথা এই যে, শব্দ শ্রবণের পরে পদজ্ঞানমাত্র যে পদার্থগুলির জ্ঞান করে, তাহা শব্দ বোধ নহে। সকল পদার্থবিষয়ক সমূহালম্বন স্থিতির পরে ঐ পদার্থগুলির যে পরস্পর সম্বন্ধ বোধ হয়, তাহাই অমরবোধ নানক শব্দ বোধ। যেমন “গৌরবিত্তি” এইরূপ শব্দ শ্রবণের পরে অস্তিত্ব এবং গো প্রভৃতি পদার্থ-বোধ শব্দবোধ নহে। অস্তিত্বের সহিত গোপদার্থের যে সম্বন্ধ-বোধ অর্থব্য “অস্তিত্ব-বিশিষ্ট গো” এইরূপ যে চরম বোধ, তাহাই সেখানে অমরবোধ। এই প্রকার অমরবোধরূপ শব্দ বোধ অস্বীকৃত হইতে পারে না। ঐ বিশিষ্ট অমরভূতির করণরূপে অমুনান ভিন্ন শব্দপ্রবণ স্বীকার্য্য। কারণ, পূর্বোক্ত প্রকার অমরবোধ অমুনানপ্রদানের দ্বারা ইচ্ছা বঞ্চিত, তাহা ঐ স্থলে কোন্ হেতুর দ্বারা কিরূপে হইবে, তাহা বলা আবশ্যক। এইরূপ অমরবোধে শব্দই হেতু হয়, ইহা বলা যায় না। কারণ, যে গো পদার্থে অস্তিত্বের অস্বীকৃতি হইবে, সেই গো পদার্থে শব্দ না থাকার উহা হেতু হইতে পারে না। এইরূপ বৈশেষিকচার্য্যগণের প্রদর্শিত অজ্ঞাত হেতুও অনিচ্ছ বা ব্যক্তিরাদি কোন দোষযুক্ত হওয়ার তাহাও হেতু হইতে পারে না। পরন্তু কোন হেতুতে ব্যাপ্তিজ্ঞানাদিপূর্বকই পূর্বোক্ত স্থলে “অস্তিত্ববিশিষ্ট গো” এইরূপ অমরবোধ আছে, ইহা অস্বীকার্য্য নহে। কোন হেতুতে ব্যাপ্তিজ্ঞানাদি ব্যতীতই শব্দশ্রবণাদি কারণবশতঃ পূর্বোক্তরূপ অমরবোধ আছে, ইহাই অস্বীকার্য্য নহে। ব্যাপ্তিজ্ঞানাদির বিলম্ব কাহারও শব্দ বোধের বিলম্ব হয় না। পদজ্ঞান, পদার্থজ্ঞান প্রভৃতি অমরবোধের কারণগুলি উপস্থিত হইলে তখনই শব্দ বোধ হইয়া যায়। তাহাতে কোন হেতু জ্ঞান ও ব্যাপ্তিজ্ঞানাদির অপেক্ষা থাকে না। এবং “অস্তিত্ব-বিশিষ্ট গো,” এইরূপ শব্দ বোধ হইলে “গো আছে, ইহা শুনিলাম” এইরূপেই ঐ শব্দ বোধের মানন প্রত্যক্ষ (অমরব্যবসায়) হয়। শব্দ বোধ অস্বীকৃতি হইলে পূর্বোক্ত স্থলে “অস্তিত্বরূপে গোকে অমুনান করিলাম” ইত্যাদি প্রকারেই ঐ বোধের মানন প্রত্যক্ষ হইত, কিন্তু তাহা হয় না। সুতরাং শব্দ বোধ বা অমরবোধ যে অস্বীকৃতি হইতে বিজাতীয় অমরভূতি, ইহা বুঝা যায়। বৈশেষিকচার্য্যগণ পূর্বোক্তরূপ অমরব্যবসায় ভেদ স্বীকার করেন নাই। কিন্তু জায়চার্য্যগণ শব্দ বোধস্থলেও যে “আমি অস্বীকৃতি করিলাম” এইরূপেই ঐ বোধের অমরব্যবসায় (মানন প্রত্যক্ষ) হয়, ইহা একবারেই অস্বীকার্য্য নহে। বলায়ছেন এবং তাহার আরও বহু যুক্তির দ্বারা শব্দ বোধ যে অস্বীকৃতি হইতেই পারে না অর্থব্য শব্দ শ্রবণাদির পরে যে আকারে অমরবোধরূপ শব্দ বোধ আছে, তাহা সেখানে অমুনানপ্রদানের দ্বারা জড়িতেই পারে না, ইহা সমর্থন করিয়াছেন। মূল কথা, কোন হেতুতে ব্যাপ্তিজ্ঞানাদির পরেই শব্দ বোধরূপ অস্বীকৃতিবিশেষ আছে, উহা অস্বীকৃতি হইতে বিলম্ব অমরভূতি নহে। সর্বত্রই পদ-পদার্থজ্ঞানের পরে গো প্রভৃতি পদার্থে অস্তিত্ব প্রভৃতি পদার্থের অথবা তাহার সম্বন্ধের সাধক কোন হেতুজ্ঞানও তাহাতে ব্যাপ্তিজ্ঞান ও পরামর্শ আছে, অথবা বেই বাক্যার্থবিহীন কোন মাধ্যম সাধক কোন হেতু পদার্থের জ্ঞান ও তাহাতে ব্যাপ্তিজ্ঞানাদি আছে, তাহার ফলেই সেই স্থলে অমুনানপ্রদানের দ্বারা সেই



বাক্যার্থবোধ বা শব্দবোধ জন্মে, এই বৈশেষিক সিদ্ধান্ত অমূল্যবিরুদ্ধ বলিয়াই স্মার্তাচার্যগণ স্বীকার করেন নাই। সর্বত্রই শব্দ শ্রবণাদির পরে কোন হেতুজ্ঞান ও তাহাতে ব্যাপ্তি-জ্ঞানাদি উপস্থিত হইবে, তাহার কলেই শব্দবোধ অনুমিতি হইবে, শব্দ বোধ অনুমিতি হইতে বিভ্রাতীর অমূল্যত্ব নহে, ইহা স্মার্তাচার্য্য প্রকৃতি আর কেহই স্বীকার করেন নাই। বৌদ্ধমতপ্রদায় শব্দকে প্রমাণ বলিতেন না। শব্দের অব্যবহিত পরেই শব্দ বোধ না হওয়ায় উহা কোন অমূল্যত্বের কারণ হইতে না পারে প্রমাণই হইতে পারে না। শব্দ শ্রবণাদির পরে যে চরম বোধ জন্মে, তাহা মানস প্রত্যক্ষবিশেষ। "গৌরব্ধি" এইরূপ বাক্য প্রয়োগ করিলে পদপদার্থ জ্ঞানাদির পরে মনের দ্বারা ই অস্তিত্ববিশিষ্ট গো, এইরূপ বোধ জন্মে। তত্ত্ব-চিন্তামণিকার গবেষণ শব্দচিন্তামণির প্রায়স্তে এই মতের খণ্ডন করিয়া, পরে পূর্বোক্ত বৈশেষিক মত খণ্ডন করিয়াছেন। চীকাকার মণুমানাথ গবেষণের ষড়্ভিত প্রথমোক্ত মতকে বৌদ্ধ মত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। নব্য নৈয়ায়িক জগদীশ তর্কালঙ্কারও শব্দশক্তিপ্রকাশিকার প্রায়স্তে শব্দ বোধ মানস প্রত্যক্ষবিশেষ, এই মতের খণ্ডন করিয়া, পরে বৈশেষিক মতের খণ্ডন করিয়াছেন<sup>১</sup>। শব্দ বোধ প্রত্যক্ষ নহে, ইহা বুঝাইতে জগদীশ বলিয়াছেন যে, প্রাণান্তকরে উপস্থিত পদার্থও প্রত্যক্ষের বিষয় হইয়া থাকে, কিন্তু শব্দ বোধ হলে সেই সেই অর্থে সাক্ষাৎ পদার্থ তির অত কোন পদার্থ শব্দ বোধের বিষয় হয় না। শব্দ বোধ যদি মানস প্রত্যক্ষ হইত, তাহা হইলে "গৌরব্ধি" এইরূপ বাক্য শ্রবণাদির পরে অমুমানাদির দ্বারা কোন অপর একটি পদার্থ যেখানে জ্ঞানবিষয় হইয়াছে, সেখানে সেই অপর পদার্থও ( ঘটাদি ) ঐ শব্দ বোধের বিষয় হইতে

১। জগদীশ সর্বশেষে একটি অকটা দুক্তি বলিয়াছেন যে, "বটাবল্লভ", এইরূপ বাক্য প্রয়োগ করিলে তদ্বারা "ঘটভেদবিশিষ্ট" এইরূপই বোধ জন্মে, ইহা সর্বজননিষিদ্ধ। ই হলে পটাদির পরেই ঐ বোধের বিষয়্য হইলেও ঘটাবল্লভে তাহা জ্ঞানবিষয় হয় না। কারণ, পটাবল্লভে পটাদি পদার্থের উপস্থাপক কোন শব্দ ঐ বাক্যে নাই। সুতরাং ঐ বাক্যজন্ত যে শব্দ বোধ, তাহাকে নিরবচ্ছিন্ন বিশেষ্যাত্মক বোধ বলে। যেভাবে যে পদার্থ কোন পদের দ্বারা উপস্থাপিত হয়, সেইভাবে সেই পদার্থই শব্দ বোধের বিষয় হইয়া থাকে। যেখানে পটাবল্লভে পটাদি পদার্থ কোন পদের দ্বারা উপস্থাপিত হয় নাই, সেখানে পটাবল্লভে পটাদি পদার্থ শব্দ বোধের বিষয় হইতে পারে না, পটাদি পদার্থই সেখানে শব্দ বোধের বিষয় হয়। কিন্তু অনুমিতি এইরূপ হইতে পারে না। অনুমিতি হলে যে পদার্থ বিশেষ্য হয়, তাহা বিশেষ্যতাবচ্ছেদক বর্ধকপেই অনুমিতির বিশেষ্য হয়। যেমন "সর্বত্রো বহিমান্" এইরূপ অনুমিতিক্ত পদার্থ বিশেষ্য, পদার্থের বিশেষ্যতাবচ্ছেদক। সেখানে পদার্থবল্লভেই পদার্থে বহি বাপা ধূমের জ্ঞান ( প্রসার ) হওয়ায় পদার্থবল্লভেই পদার্থে বহির অনুমিতি হয়। কেবল "বহিমান্" এইরূপ অনুমিতি কাহারই হয় না ও হইতে পারে না, এইরূপ সর্বলক্ষ্যত সিদ্ধান্তানুসারে "বটাবল্লভ" এই পূর্বোক্ত বাক্যের দ্বারা পূর্বোক্ত একান্ত সর্বলক্ষ্যত শব্দ বোধ অনুমানের দ্বারা কিছুতেই নির্বাহ করা যায় না। কারণ, যেহেতু কেবল "বহিমান্" এইরূপ অনুমিতি হইতে পারে না, তদ্বৎ কেবল "ঘটভেদবিশিষ্ট" এইরূপও অনুমিতি হইতে পারে না। কিন্তু পূর্বোক্ত "বটাবল্লভ" এই বাক্য হইতে কেবল "ঘটভেদবিশিষ্ট" এইরূপ শব্দ বোধ সর্বজননিষিদ্ধ। যিনি শব্দ বোধকে অনুমিতি বলেন, তিনি অনুমান দ্বারা কোন মতেই ঐরূপ বোধ নির্বাহ করিতে পারেন না। সুতরাং শব্দ বোধ অনুমিতি নহে। শব্দ অনুমান হইতে পূর্বক প্রমাণ।



পারিত, কিন্তু তাহা হয় না। পূর্বেকৃত স্থলে “অস্তিত্ববিশিষ্ট গো” এইরূপে ঐ পদার্থই শব্দ বোধের বিষয় হয়। পরন্তু যদি শব্দ বোধ প্রত্যক্ষ হইত, তাহা হইলে পূর্বেকৃত স্থলে “অস্তিত্ব-বিশিষ্ট গো” এইরূপ বোধের স্থায় “অস্তিত্ব গোবিশিষ্ট” এইরূপেও ঐ মানস প্রত্যক্ষ হইতে পারিত। তাহা যখন হয় না, তখন শব্দ বোধ প্রত্যক্ষ নহে, ইহা স্বীকার্য। পরন্তু শব্দ বোধকে প্রত্যক্ষ বলিলে বিভিন্ন বিষয়ে শব্দবোধের সামগ্রী প্রত্যক্ষের প্রতিবন্ধক হয়, এই কথাও বলা যায় না। কারণ, ঐ মতে শব্দ বোধ নিজেও প্রত্যক্ষ। শব্দ বোধের প্রতি তাহার সামগ্রী প্রতিবন্ধক, ইহা কিছুতেই হইতে পারে না। ভাষাসূত্রকার ও ভাষ্যকার যাহা বলিয়াছেন, তাহা পূর্বেই যথাস্থানে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। শব্দ বোধ ও অহুমিত্তির কারণ-ভেদবশতঃ ঐ দুইটি বিধাতীর বিভিন্ন প্রকার অহুমিত্তি। শব্দ বোধের বিশিষ্ট কারণের দ্বারা কোথাওও অহুমিত্তি জন্মে না, অহুমিত্তি ঐরূপ বোধ নহে। এবং শব্দ ও অর্থের কোন স্বাভাবিক সম্বন্ধ না থাকায় শব্দ বোধ অহুমিত্তি হইতে পারে না। কারণ, ব্যাপ্তিনির্দাহক সম্বন্ধ ব্যতীত অহুমিত্তির সম্ভাবনা নাই। শব্দ ও অর্থের যে বাচ্যবাচক-ভাবরূপ সম্বন্ধ আছে, তাহা ঐ উভয়ের প্রাপ্তিরূপ (পরস্পর সংস্পর্শরূপ) সম্বন্ধ নহে। কারণ, শব্দ ও অর্থ বিভিন্ন স্থলে থাকিলেও তাহাতে ঐ বাচ্যবাচকভাবরূপ সম্বন্ধ আছে। সুতরাং উহা ব্যাপ্তিনির্দাহক সম্বন্ধ হইতে পারে না। সুতরাং শব্দ বোধ অহুমিত্তি, শব্দ অনুমানপ্রমাণ, ইহা বলাই যায় না, ইহাই সূত্রকার ও ভাষ্যকারের মার কথা ॥ ৫৬ ॥

শব্দনানাক্রপরীক্ষা-প্রকরণ সমাপ্ত।

সূত্র। তদপ্রামাণ্যমনৃত-ব্যাঘাত-পুনরুক্ত-

দোষেভ্যঃ ॥৫৭॥১১৮॥

অনুবাদ। (পূর্বপক্ষ) অনৃতদোষ, ব্যাঘাতদোষ এবং পুনরুক্তদোষবশতঃ অর্থাৎ বেদে মিথ্যা কথা আছে, পদবয় বা বাক্যবয়ের পরস্পর বিরোধ আছে এবং পুনরুক্তি-দোষ আছে, এ জন্য তাহার (বেদরূপ শব্দবিশেষের) প্রামাণ্য নাই।

ভাষ্য। পুত্রকামেষ্টিবনান্ভ্যামেয়ু। তস্মেতি শব্দবিশেষমেনাবধি-  
কুরুতে ভগবানৃষিঃ। শব্দস্ত প্রমাণত্বং ন সম্ভবতি। কস্মাৎ? অনৃত-  
দোষাৎ পুত্রকামেকৌ। পুত্রকামঃ পুত্রেক্ত্যা যজ্ঞেতেতি নেকৌ সংস্থিতায়াং  
পুত্রজন্ম দৃশ্যতে। দৃষ্টার্থস্ত বাক্যস্থানৃতত্বাৎ অদৃষ্টার্থমপি বাক্যং  
“অগ্নিহোত্রং জুহুয়াৎ স্বর্গকাম” ইত্যাদ্যানৃতমিতি জায়তে।

বিহিতব্যাঘাতদোষাচ্চ হবনে। “উদিতে হোতব্যং, অনুদিতে হোতব্যং, সময়াধ্যুষিতে হোতব্যং”মিতি বিধায় বিহিতং ব্যাহস্তি, “শ্চাবোহ-  
স্তাহুতিমভ্যবহরতি য উদিতে জুহোতি, শবলোহস্তাহুতিমভ্যবহরতি  
যোহনুদিতে জুহোতি, শ্চাবশবলৌ বাহস্তাহুতিমভ্যবহরতো যঃ সময়া-  
ধ্যুষিতে জুহোতি”। ব্যাঘাতাকান্তরনুমিথ্যেতি।

পুনরুক্তদোষাচ্চ অভ্যাসে দেন্দ্রমাণে। “ত্রিঃ প্রথমামদ্বাহ,  
ত্রিরক্তমা”মিতি পুনরুক্তদোষো ভবতি, পুনরুক্তঞ্চ প্রমত্তবাক্যমিতি।  
তস্মাদপ্রমাণং শব্দোহনৃতব্যাঘাতপুনরুক্তদোষেভ্য ইতি।

অমুবাদ। পুত্রকাম ব্যক্তির যজ্ঞে (পুত্রেষ্টি যজ্ঞে) এবং হবনে (উদিতাদি  
কালে বিহিত হোমে) এবং অভ্যাসে (মন্ত্রবিশেষের পাঠের আবৃত্তিতে)  
[ অর্থাৎ পুত্রেষ্টি যজ্ঞ প্রভৃতির বিধায়ক বেদবাক্যে যথাক্রমে অনৃত, ব্যাঘাত ও  
পুনরুক্তদোষবশতঃ বেদরূপ শব্দবিশেষের প্রামাণ্য নাই ] “তত্ত্ব” এই কথার  
দ্বারা অর্থাৎ সূত্রস্থ তৎশব্দের দ্বারা ভগবান্ ঋষি (সূত্রকার অক্ষপাদ) শব্দবিশেষ-  
কেই অধিকার করিয়াছেন,—অর্থাৎ সূত্রে “তৎ” শব্দের দ্বারা শব্দবিশেষ বেদই  
সূত্রকার মহর্ষির বুদ্ধি। (সূত্রার্থ বর্ণন করিতেছেন) শব্দের অর্থাৎ বেদরূপ  
শব্দবিশেষের প্রামাণ্য সম্ভব হয় না অর্থাৎ বেদের প্রামাণ্য নাই। (প্রশ্ন)  
কেন? অর্থাৎ ইহার হেতু কি? (উত্তর) যেহেতু পুত্রকাম ব্যক্তির যজ্ঞে  
অর্থাৎ পুত্রেষ্টি যজ্ঞবিধায়ক বেদবাক্যে অনৃতদোষ আছে। (সে কিরূপ, তাহা  
বলিতেছেন) “পুত্রকাম ব্যক্তি পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করিবে”—এই যজ্ঞ অর্থাৎ এই বেদ-  
বাক্যবিহিত যজ্ঞ অশুষ্ঠিত হইলে পুত্র জন্ম দেখা যায় না [ অর্থাৎ পূর্বোক্ত  
বেদবাক্যানুসারে পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করিলেও যখন অনেকের পুত্র লাভ হয় না, তখন ঐ  
বেদবাক্য অনৃতদোষযুক্ত অর্থাৎ উহা মিথ্যা ]। দৃষ্টার্থ বাক্যের অনৃতবশতঃ  
অর্থাৎ পূর্বোক্ত দৃষ্টার্থক বেদবাক্য মিথ্যা বলিয়া “স্বর্গকাম ব্যক্তি অগ্নিহোত্র  
হোম করিবে” ইত্যাদি অদৃষ্টার্থক বাক্যও মিথ্যা, ইহা বুঝা যায়। এবং হবনে  
অর্থাৎ উদিতাদি কালত্রয়ে হোমবিধায়ক বেদবাক্যে বিহিত ব্যাঘাত দোষবশতঃ  
(বেদের প্রামাণ্য নাই)। [ সে কোথায় কিরূপ, তাহা বলিতেছেন। ]  
“উদিত কালে হোম করিবে, অনুদিত কালে হোম করিবে, সময়াধ্যুষিত কালে  
(সূর্য ও নক্ষত্রশূন্য কালে) হোম করিবে” এই বাক্যের দ্বারা (কালত্রয়ে হোম)



বিধান করিয়া (অপর বাক্যের দ্বারা) বিহিতকে অর্থাৎ পূর্বোক্ত বাক্যের দ্বারা কালক্রমে বিহিত হোমকে ব্যাহত করিয়াছে। (সে ব্যাঘাতক বাক্য কি, তাহা বলিতেছেন) “যে ব্যক্তি উদিতকালে হোম করে, “শ্রাব” অর্থাৎ শ্রাব নামক কুর্জর ইহার আছতি ভোজন করে। যে ব্যক্তি অনুদিত কালে হোম করে, “শবল” অর্থাৎ শবল নামক কুর্জর ইহার আছতি ভোজন করে। যে ব্যক্তি সময়ানুবৃত্তি কালে হোম করে, শ্রাব ও শবল ইহার আছতি ভোজন করে”। ব্যাঘাতপ্রযুক্ত অর্থাৎ শেযোক্ত বেদবাক্যের সহিত পূর্বোক্ত বেদবাক্যের বিরোধবশতঃ অন্ততর অর্থাৎ ঐ বাক্যদ্বয়ের মধ্যে একতর বাক্য মিথ্যা। এবং বিদ্যমান অভ্যাসে অর্থাৎ মন্ত্রবিশেষের অভ্যাস বা পুনরাবৃত্তির বিধায়ক বেদবাক্যে পুনরুক্ত-দোষবশতঃ (বেদের প্রামাণ্য নাই)। [ সে কোথায় কল্পিত, তাহা বলিতেছেন ] “প্রথম মন্ত্রকে তিন বার অনুবচন করিবে, অন্তিম মন্ত্রকে তিনবার অনুবচন করিবে” ইহাতে অর্থাৎ এই বেদবাক্যের দ্বারা প্রথম ও অন্তিম সামিধেনীর তিনবার পাঠের বিধান করায় পুনরুক্ত-দোষ হয়। পুনরুক্ত প্রমত্তবাক্য। অতএব অনৃত, ব্যাঘাত ও পুনরুক্তদোষবশতঃ শব্দ অর্থাৎ বেদনামক শব্দবিশেষ অপ্রমাণ।

বিবৃতি। বেদ প্রমাণ হইতে পারে না, ইহার প্রথম হেতু, বেদে মিথ্যা কথা আছে। বেদে আছে—পুত্রোষ্ট বহু করিলে পুত্র হয়। কিন্তু অনেক ব্যক্তি পুত্রোষ্ট বহু করিয়াও পুত্রলাভ করেন নাই ও করিতেছেন না, ইহা স্বীকার্য। সুতরাং বেদের ঐ কথা মিথ্যা, ইহা স্বীকার্য। যিনি বেদে ঐ কথা বলিয়াছেন, তিনি মিথ্যাবাদী বলিয়া আশ্চর্য নহেন। সুতরাং তাহার অন্ত বাক্যও মিথ্যা। অমিহোজ হোম করিলে স্বর্গ হয়, ইত্যাদি বেদবাক্যও পূর্বোক্ত বাক্যের দৃষ্টান্তে মিথ্যা বলিয়া বুঝা যায়। যে বক্তা মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছেন, তিনি আশ্চর্য না হওয়ার তাহার অন্ত বাক্যগুলিও আশ্চর্যবাক্য নহে। সুতরাং তাহাও প্রমাণ হইতে পারে না। বেদ প্রমাণ হইতে পারে না, ইহার দ্বিতীয় হেতু—বেদে ব্যাঘাত বা বিরোধ-দোষ আছে। বেদে “উদিত”, “অনুদিত” ও “সময়ানুবৃত্তি” নামক কালক্রমে হোমের বিধান করিয়া, পরে আবার ঐ কালক্রমেই বিহিত হোমের নিষেধ করা হইয়াছে; সেই নিষেধের দ্বারা কলতঃ পূর্বোক্ত কালক্রমে হোম অকর্তব্য, ইহাই বলা হইতেছে। সুতরাং পূর্বে যে বিধিবাক্যের দ্বারা কালক্রমে হোম কর্তব্য বলা হইয়াছে, সেই বিধিবাক্যের সহিত শেযোক্ত অর্থবাদ-বাক্যের বিরোধ হওয়ার উহা প্রমাণ হইতে পারে না। ঐ বিরোধবশতঃ উহার মধ্যে যে-কোন একটির মিথ্যা বলিতেই হইবে। কালক্রমে হোমের কর্তব্যতাবোধক বাক্য মিথ্যা অথবা কালক্রমে হোমের নিষেধবোধক শেযোক্ত বাক্য মিথ্যা। পরন্তু যিনি ঐরূপ বিরুদ্ধার্থক বাক্যবাদী, তিনি আশ্চর্য হইতে পারেন না। প্রথম ব্যক্তিকে আশ্চর্য বলা যায় না। সুতরাং তাহার কোন বাক্যই আশ্চর্যবাক্য না হওয়ার তাহা প্রমাণ হইতে পারে না।



বেদ প্রমাণ হইতে পারে না, ইহার তৃতীয় হেতু—বেদে পুনরুক্তসৌৰ আছে। বেদে যে একাদশটি “নানিদেশনৌ” অর্থাৎ অগ্নিপ্রজ্ঞান-মন্ত্র বলা হইয়াছে, তন্মধ্যে প্রথমটিকে তিনবার ও অষ্টমটিকেও তিনবার উচ্চারণ করিবার বিধান করার পুনরুক্ত-সৌৰ হইয়াছে। একই মন্ত্রকে তিনবার উচ্চারণ করিলে পুনরুক্তি হয়। প্রমত্ত ব্যক্তিই ঐরূপ পুনরুক্তি করে। সুতরাং পুনরুক্ত হইলে তাহা প্রমত্ত-ব্যক্তিই বলিতে হইবে। প্রমত্ত ব্যক্তি আশ্রয় নহেন, সুতরাং তাহার বাক্য আশ্রয়বাক্য না হওয়ায় তাহা প্রমাণ হইতে পারে না। অতএব পূর্বোক্তরূপ (১) অনৃত, (২) ব্যাঘাত ও (৩) পুনরুক্তসৌৰবশতঃ বেদ প্রমাণ নহে, ইহাই পূর্বপক্ষ।

টিপ্পনী। মহর্ষি পূর্ব-প্রকরণে শব্দনামাত্র পরীকার দ্বারা অহুমানপ্রমাণ হইতে শব্দ-প্রমাণের ভেদ সমর্থন করিয়া, এখন শব্দবিশেষ বেদের প্রামাণ্য পরীক্ষা করিতে এই সূত্রের দ্বারা পূর্বপক্ষ বলিয়াছেন। এইটি পূর্বপক্ষসূত্র। তাৎপর্যটীকাকার পূর্বপ্রকরণের সহিত এই প্রকরণের সংগতি দেখাইবার জন্ত বলিয়াছেন যে, শব্দ অহুমানপ্রমাণের অন্তর্গত হইলে কদাচিৎ অর্গের ব্যাণ্টি থাকার শব্দের প্রামাণ্য হইতে পারে। কিন্তু শব্দ অহুমানপ্রমাণের বহির্ভূত হইলে সহজেই শব্দের অপ্রামাণ্য সমর্থন করা যায়, ইহা মনে করিয়াই শব্দের অপ্রামাণ্যরূপ পূর্বপক্ষবাদী মহর্ষি প্রথমে অহুমানপ্রমাণ হইতে শব্দের ভেদ সমর্থন করিয়া, শব্দের অপ্রামাণ্যরূপ পূর্বপক্ষ বলিয়াছেন। কেহ বলিয়াছেন যে, শব্দের প্রামাণ্য থাকিলেই শব্দ অহুমান হইতে ভিন্ন, কি অভিন্ন, এই বিচার হইতে পারে। সুতরাং শব্দের প্রামাণ্য সমর্থন করা আবশ্যক। দূর্ভার্থক ও অদূর্ভার্থক ভেদে প্রমাণ শব্দ দ্বিবিধ, ইহা মহর্ষি প্রথমাধ্যয়ে বলিয়াছেন। তন্মধ্যে প্রামাণ্যাত্মকের দ্বারা দূর্ভার্থক শব্দের প্রতিপাদ্য নির্ণয় করিলে তাহার প্রামাণ্য নিশ্চয় হয়। কিন্তু অদূর্ভার্থক শব্দের প্রামাণ্যনিশ্চয়ের উপায় কি? ইহা বলিবার জন্তই মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা প্রথমে বেদের অপ্রামাণ্যরূপ পূর্বপক্ষের সমর্থন করিয়াছেন।

বস্তুতঃ মহর্ষি এই প্রকরণের দ্বারা শব্দমাত্রের প্রামাণ্য পরীক্ষা করেন নাই, শব্দবিশেষ বেদেরই প্রামাণ্য পরীক্ষা করিয়াছেন; মহর্ষির পূর্বপক্ষসূত্র ও সিদ্ধান্তসূত্রের দ্বারা ইহা বুঝা যায়। সূত্রে “তদপ্রামাণ্যং” এই বাক্যটি “তত্ত্ব অপ্রামাণ্যং” এইরূপ বিগ্রহে স্বীকৃতপুরুষ সমাস। ভাব্যকার ইহা জানাইতেই “তদ্যোতি” এইরূপ বাক্যের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, সূত্রের “তৎ” শব্দের দ্বারা শব্দবিশেষ বেদই মহর্ষির বুদ্ধিহ। উদ্যোতকের “তদিত্তি” এইরূপ বাক্যের উল্লেখপূর্বক ঐ ভাব্যের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন যে, সূত্রস্থ “তৎ” শব্দের দ্বারা অধিকৃত শব্দের অভিধানবশতঃ শব্দবিশেষের অধিকার। তাৎপর্যটীকাকার ইহা বুঝাইতে বলিয়াছেন যে, নিম্নোক্তরূপ শব্দের জন্তই এই শাস্ত্র কথিত হইয়াছে। সুতরাং বেদপ্রামাণ্য ব্যুৎপাদন এই শাস্ত্রে অধিকৃত হওয়ার বেরূপ শব্দ এই শাস্ত্রে অধিকৃত। সুতরাং উদ্যোতকের অধিকৃত শব্দ বলিয়া বেরূপ শব্দবিশেষকেই বলিয়াছেন। ফলকথা, মহর্ষি, সূত্রে “তৎ” শব্দের দ্বারা বেরূপ শব্দকেই অধিকার বা গ্রহণ করিয়াছেন। অন্যথা তিনি “তদপ্রামাণ্যং” এই কথা না বলিয়া “অপ্রামাণ্য শব্দঃ” এইরূপ কথাই বলিতেন, ইহাও উদ্যোতকের বলিয়াছেন।



স্বপ্নে যে অন্ত, ব্যাখ্যাত ও পুনরুক্তদের বলা হইয়াছে, তাহা বেদে কোথায় আছে, ইহা মহাবি-  
 যলেন নাই। বেদের সর্বত্রই যে ঐ সকল বোঝ আছে, ইহা বলা যায় না। তাই ভাষ্যকার  
 প্রথমেই মহাবির বুঝিবে ঐ বক্তব্য প্রকাশ করিতে বলিয়াছেন, “পুত্রকামেষ্টীবনাত্যাসেহু”।  
 স্বজ্ঞকারের পক্ষমী বিতর্কিত বাক্যের সহিত ভাষ্যকারের প্রথমোক্ত ঐ দ্বন্দ্বমী বিতর্কিত বাক্যের  
 যোগ করিয়া স্বার্থ বুঝিতে হইবে; তাহাই ভাষ্যকারের অভিপ্রেত। ভাষ্যকার প্রথমে ঐ  
 বাক্য প্রয়োগ করিয়া স্বজ্ঞবাক্যের পূরণ করিয়াছেন। বেদের অগ্রমাণ্য সাধন করিতে মহাবির  
 প্রথম হেতু অন্ততঃ। অন্ততঃ ও অগ্রমাণ্য একই পদার্থ হইলে, তাহা ঐ স্থলে হেতু হইতে  
 পারে না। কারণ, তাহা সাধ্য, তাহাই হেতু হয় না। এ জন্য উদ্যোক্তকর বলিয়াছেন যে,  
 অগ্রমাণ্য বলিতে প্রকৃতার্থের অবোধকত্ব। অন্ততঃ বলিতে অর্থার্থ-কথন। পূত্র জন্মিলে তাহার  
 পুষ্টি প্রভৃতির জন্যও বেদে এক প্রকার পুত্রেষ্টী-বজ্ঞের বিধান আছে। কিন্তু এখানে পুত্রকাম  
 ব্যক্তির কষ্টব্য পুত্রেষ্টী বজ্ঞই অভিপ্রেত, ইহা প্রকাশ করিতে ভাষ্যকার প্রথমে “পুত্রকামেষ্টী” শব্দ  
 প্রয়োগ করিয়াছেন। এইরূপ ‘কারীরা’ প্রভৃতি দৃষ্টকলক বজ্ঞও উহার দ্বারা বুঝিতে হইবে।  
 কারীরা বজ্ঞ করিলে বৃষ্টি হয়, ইহা বেদে আছে; কিন্তু অনেক স্থলে তাহা না হওয়ার বেদের ঐ কথা  
 মিথ্যা। পুত্রেষ্টী ও কারীরা প্রভৃতি বজ্ঞের ফল ঐহিক। সুতরাং তত্ত্ববোধক বেদবাক্য দৃষ্টার্থক।  
 দৃষ্টার্থক বেদ-বাক্যের মিথ্যাত্ব বুঝিয়া তদনুষ্ঠানে অদৃষ্টার্থক বেদ-বাক্যও মিথ্যা, ইহা বুঝা যায়।  
 অগ্নিহোত্র হোম করিলে স্বর্গ হয়, ইহা বেদে আছে। ইহলোকে ঐ স্বর্গকল দেখা বা অনুভব করা  
 যায় না। পরলোকে উহা বুঝা যায় বলিয়াই ঐ বাক্যকে অদৃষ্টার্থক বাক্য বলা হইয়াছে। কিন্তু  
 পূর্নোক্ত দৃষ্টার্থক বেদবাক্যবক্তা যখন মিথ্যাবাদী, তখন তাঁহার অদৃষ্টার্থক পূর্নোক্ত বেদবাক্যও  
 যে মিথ্যা, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। যে বাক্য সত্য, কি মিথ্যা, তাহা ইহলোকেই বুঝিয়া লওয়া  
 যায়, সেই বাক্যও যিনি মিথ্যা বলিয়াছেন, তিনি সাধারণ নম্রবোধ্যের দ্বারা মিথ্যাবাদী অনাগ, ইহা  
 অবশ্যই বুঝা যায়। সুতরাং তাঁহার অদৃষ্টার্থক বাক্যগুলিও সত্য হইতেই পারে না, ইহাই পূর্ণ-  
 পক্ষবাদের মনের কথা। বেদে ব্যাখ্যাত অর্থাৎ বিরোধ-দোষ আছে, ইহা বুঝাইতে ভাষ্যকার  
 যাহা বলিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য্য এই যে, বেদে স্বর্গকাম ব্যক্তি অগ্নিহোত্র হোম করিলে,  
 এই কথা বলিয়া, তাহা কোন্ কালে করিবে, এই আকাঙ্ক্ষার পূর্নোক্ত বিহিত হোমের  
 অনুবাদ করিয়া “উদিত”, “অনুদিত” ও “অমরাধু্যবিত” নামে কালত্রয়ের বিধান করা  
 হইয়াছে। কিন্তু পরেই আবার ঐ কালত্রয়ে বিহিত হোমের নিন্দা করা হইয়াছে। তাহার  
 পূর্নোক্ত কালত্রয়ে হোমের নিবেদন বুঝা যায়। সুতরাং প্রথমোক্ত বাক্যের দ্বারা যে কালত্রয়ে  
 হোম ইষ্টসাধন, ইহা বুঝা গিয়াছে, শেষোক্ত নিবেদনের দ্বারা ঐ কালত্রয়ে হোমকে অনিষ্টসাধন  
 বলিয়া বুঝা যাইতেছে। তাহা হইলে এইরূপ ব্যাখ্যাত বা বাক্যদ্বয়ের বিরোধবশতঃ উহা  
 অগ্রমাণ্য, ইহা প্রতিপন্ন হইতেছে। উদ্যোক্তকর ঐ স্থলে অত্র প্রকারেও ব্যাখ্যাত দেখাইয়াছেন যে,  
 পূর্নোক্ত কালত্রয়েই হোমের নিবেদন করিলে হোমের কালই থাকে না। কারণ, মধ্যাক, অপরাহ্ন ও  
 সায়াহ্ন, এগুলিও উদিত কাল বলিয়া তাহাতেও হোম করা যাইবে না। যদি কেহ বলেন যে,



সূর্য্যোদয়ের অব্যবহিত পরবর্ত্তিকালমাত্রই উদিত কাল। তাহাতে হোম নিষেধ করিলেও মধ্যাহ্ন প্রভৃতি কালে হোম করিতে পারে। হোমের কাল থাকিবে না কেন? উদ্ভোতকর এই বাকীকে লক্ষ্য করিয়া শেষে বলিয়াছেন যে, তাহা হইলেও “উদিত কালে হোম করিবে”, “অমুদিত কালে হোম করিবে” এবং “সমসামুদিত কালে হোম করিবে” এই বাক্যত্রয় পরস্পর বিরুদ্ধ। কারণ, একই হোম ঐ কালত্রয়ে করা অসম্ভব। বেদে সূর্য্যোদয়ের পরবর্ত্তী কালকে “উদিত” কাল এবং সূর্য্যোদয়ের পূর্বে অরুণ-কিরণ ও অন্ন নক্ষত্রবিশিষ্ট কালকে “অমুদিত” কাল এবং সূর্য্য ও নক্ষত্র-পূর্ণ কালকে “সমসামুদিত” কাল বলা হইয়াছে।) তাহোক্ত বেদবাক্যে যে “শ্রাব” ও “শবল” শব্দ আছে, তাহার অর্থ শ্রাব ও শবল নামে কুজুর। বায়ুপুরাণের পুরাকৃত্য-প্রকরণে মন্ত্রবিশেষে শ্রাব ও শবল নামে কুজুরের কথা পাওয়া যায়। শ্রাম শবল এবং শ্রাম শবল, এইরূপ পাঠও কোন কোন গ্রন্থে দেখা যায়। জায়নজরীকার জরজ ভট্ট “শ্রামশবলৌ” এইরূপ পাঠ উল্লেখ করিয়াছেন। বেদে পুনরুক্ত-দোষ আছে, ইহা দেখাইতে ভাষ্যকার “ত্রিঃ প্রথমামহাঃ ত্রিকৃতমাং” এই বেদবাক্যের উল্লেখ করিয়াছেন। কেহ কেহ ব্যাখ্যা করেন যে, সামিধেনীর মধ্যে যে ঋকৃটি প্রথম, সেইটিই উত্তম। সুতরাং প্রথমাকে তিনবার পাঠ করিবে বল্যতেই উত্তমার তিনবার পাঠ বুঝা যায়। পুনরার “ত্রিকৃতমাং” এই কথা বলার পুনরুক্ত-দোষ হইয়াছে। এই ব্যাখ্যায় পুনরুক্ত-দোষ সহজে বুঝা গেলেও বস্তুতঃ ইহা প্রকৃতার্থব্যাখ্যা নহে। যে ঋকৃ পাঠ করিয়া হোতা অগ্নি প্রজ্ঞালন করিবেন, তাহার নাম “সামিধেনী”। শতপথব্রাহ্মণে এই “সামিধেনী” নামের নির্ভ্রুচন আছে। “অগ্নিঃ সামিধে বাতিঃ ঋকৃতিঃ” এইরূপ ব্যুৎপত্তিতে অগ্নি প্রজ্ঞালনের সাধন ঋকৃগুলিকে “সামিধেনী” বলা হইয়াছে। ব্যক্তিককার কাভ্যায়ন অন্তরূপে “সামিধেনী” শব্দের সাধন করিয়াছেন। যে ঋকের দ্বারা সামিধের আধান করা হয়, এই অর্থে ঐ ঋকৃকে সামিধেনী বলে। বেদে এই “সামিধেনী” একাদশটি বলা হইয়াছে (তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ, ৩.৫ ব্রহ্ম্য)। ঐ সামিধেনীগুলির পৃথক্ পৃথক্ সংস্কাও আছে। তন্মধ্যে “প্রবোবাজা” ইত্যাদি ঋকৃটি প্রথম,

১। উদিতঃসুদিতঃ চৈব সমসামুদিতঃ তথা।

সর্ব্বথা বর্ত্ততে যজ ইতীহঃ বৈবিকী শ্রুতিঃ।—সমুদয়বিত্ত। ২।১৭।

“সমসামুদিত”পদেন সমুদয়েনৈব উভয়ঃ কাল উচ্যতে।—সেবাতিথি। সূর্য্যনক্ষত্রবর্জিতঃ কালঃ সমসামুদিত-শব্দেনোচ্যতে। উদিতঃ পূর্ব্বনক্ষত্রকিরণবান্ অবিগলিতঃকোহমুদিতকালঃ।—কুজু ভট্ট।

২। যৌ শবলৌ শ্রামশবলৌ বৈবশতকুলোদ্ভবৌ।

ভাভাঃ বলিঃ অথচ্ছাদি ভ্রাতামেভাবহিস্যকৌ।—বায়ুপুরাণ ১১০৮।৩১।

৩। “...সমিধে সামিধেনীতিহোতা তন্ময়ঃ সামিধেনো নাম।”—শতপথ। ১ম কা। ৩৪ অঃ। ৫ম ব্রঃ।

হোতা চ সামিধেনীতিঃ “প্রবোবাজা” ইত্যাবিতিঃ ঋকৃতিঃ অগ্নিঃ সামিধে অতঃ সমিধসসাধনত্বাৎ তস্মৈনগ্নিঃ “সামিধেনঃ” ইতি নাম নিপন্নঃ।—সারণভাষ্য।

৪। “সমিধাযাযানেষোপাশ্ৰুতিঃ”।—কাভ্যায়নের ব্যক্তিকবৃত্তে।। যদা যচা সমিধাযীকৃতঃ সামিধেনীভাষ্যঃ।

“প্রবোবাজা অতিবাব” ইত্যাবাঃ “সামিধোতা দ্বাবততঃ” ইত্যাবাঃ সামিধেনঃ ইতি ব্যবহিকৃতঃ।—সিদ্ধান্তকৌমুদীর ভাববাদিনী ব্যাখ্যা।



উহার নাম "প্রবর্তী" এবং "আজ্ঞাহোতা ছাবজত" ইত্যাদি ককট যে সর্বশেষে বলা হইয়াছে, তাহাই একাদশী "সানিধেনী", তাহার নাম "উত্তমা"। শতপথব্রাহ্মণ প্রকৃতিতে ঐ একাদশটি সানিধেনীর প্রথমকে তিনবার এবং উত্তমাকে অর্থাৎ শেষটিকে তিনবার পাঠ করিবার বিধি বলা হইয়াছে<sup>১</sup>। তাহাতে পূর্বপক্ষবাদীর কথা এই যে, শতপথব্রাহ্মণ প্রকৃতিতে "ত্রিঃ প্রথমাদম্বাহ জিক্তম্বাহ" এই কথার দ্বারা সানিধেনীর প্রথমটি ও শেষটির তিনবার উচ্চারণের বিধান করার পুনরুক্তি সোধ হইয়াছে। কারণ, অভ্যাস বা পুনরাবৃত্তিই পুনরুক্তি। একই মন্ত্রের পুনরাবৃত্তি করিলে পুনরুক্ত-সোধ অবশ্যই হইবে। পূর্বোক্ত বেদে ঐ অভ্যাস বা পুনরুক্তারনের বিধান করার ফলতঃ বেদে প্রথমা ও উত্তমা সানিধেনীর পুনরুক্তি হইয়াছে। যে অর্থ প্রকাশ করিতে যে বাক্য বলা হয়, তাহা একবার বলিলেই তাহার ফলসিদ্ধি হওয়ার পুনর্বীর তাহা বলা পুনরুক্তি-সোধ। বেদে এই পুনরুক্ত-সোধ থাকার তাহা প্রমাণ হইতে পারে না। যদিও বেদের সকল বাক্যেই পূর্বোক্ত অন্তত, ব্যাঘাত ও পুনরুক্ত-সোধ নাই, তাহা হইলেও যে সকল বাক্যে ঐ সকল সোধ আছে, তদ্ব্যতীতে অভ্যাস বেদবাক্যেরও এককর্তৃকত্ব বা বেদবাক্যের হেতুর দ্বারা অগ্রাধাণা নিশ্চয় করা যায়। ইহাই পূর্বপক্ষবাদীর চরম কথা<sup>২</sup>। ৫৭।

**সূত্র।** ন, কর্ম-কর্তৃ-সাধন-বৈগুণ্যঃ ॥৫৮॥১১৯॥

অনুবাদ। (উত্তর) না, অর্থাৎ পুত্রোপ্তি-বিধায়ক বেদবাক্যে অন্ততদোষ বা মিথ্যাব্যব নাই। বেহেতু কর্ম, কর্তা ও সাধনের বৈগুণ্যবশতঃ (কলাভাবের উপপত্তি হয়)। [ অর্থাৎ কোন স্থলে পুত্রোপ্তি-যজ্ঞের নিফলত্ব দেখিয়া পুত্রোপ্তি-যজ্ঞবিধায়ক বেদবাক্যকে মিথ্যা বলিয়া নির্ণয় করা যায় না। কারণ, কর্ম, কর্তা ও সাধনের (দ্রব্য ও মন্ত্রাদির) বৈগুণ্য হইলেও ঐ যজ্ঞ নিফল হয় ]।

ভাষ্য। নান্তদোষঃ পুত্রকামেষ্ঠৌ, কস্মাৎ? কর্ম-কর্তৃ-সাধন-বৈগুণ্যঃ। ইক্যা পিতরৌ সংযুজ্যমানৌ পুত্রং জনয়ত ইতি। ইক্টে:

১। ন বৈ ত্রিঃ প্রথমাদম্বাহ। জিক্তম্বাহ, ত্রিভুংপ্রাচ্যার্থি বজ্রত্বদ্বয়নাম্বাহ ত্রিঃ প্রথমাদম্বাহ জিক্তম্বাহ। ৩।  
—শতপথ, ১ম অঃ। ৩৪ অঃ, ১ম ব্রঃ। প্রথমোক্তম্বাহজিক্তম্বাহঃ বিধিতে ন বৈ ত্রিঃ। "প্রাচ্যপরিমার্গো-  
ত্রিবার্জনত বজ্রলিঙ্গং অম্বাহি প্রথমোক্তম্বাহোত্রিবার্জিঃ কার্যোভিহাঃ।"—সায়নভাষ্য। ত্রিঃ প্রথমাদম্বাহ  
জিক্তম্বাহ ইত্যাদি।—ভৈতিলীরসংহিতা, ২য় কাণ্ড, ১ম অধ্যায়ঃ।

২। ত্রিঃ প্রথমাদম্বাহ জিক্তম্বাহিভ্যাস্যোবিনাহ্য প্রথমোক্তম্বাহঃ সানিধেনোত্রিক্তম্বাহ শৌনকভ্যঃ।  
সকলপুণ্যভবেন তৎপ্রাচ্যোক্তম্বাহভ্যাস্যোবিনাহ্য জিক্তম্বাহঃ।—ভাষ্যমন্তব্যঃ। "ত্রিঃ প্রথমাদম্বাহ জিক্তম্বাহম্বাহ ইত্যাদেন  
প্রথমোক্তম্বাহিভ্যোত্রিক্তম্বাহভিধানাৎ শৌনকভ্যসেব।"—বৈশেবিকের উপকারঃ। ১। ৩য় পৃঃ।

৩। দুষ্টায়নৈতানি বাক্যান্যাপ্যন্ত এককর্তৃকতেন শেবাক্যানামগ্রমাণত্বমিতি।—ভাষ্যমন্তব্যঃ। দুষ্টাক্ষয়েনতি।  
অনন্তর গ্রন্থোপঃ—পুত্রকামেষ্ঠৌবিনাহ্যাদিবাক্যানি অগ্রমাণঃ অন্ততবাহিত্যাঃ অপিক্তবাহিত্যিতি। এবং শেবাণি  
বাক্যানি অগ্রমাণঃ শেবাক্যান্যং পুত্রকামেষ্ঠৌবিনাহ্যিতি।—ভাষ্যমন্তব্যঃ।

করণং সাধনং, পিতরৌ কর্তারৌ, সংযোগঃ কৰ্ম্ম, ত্রয়াণাং গুণযোগাৎ পুত্রজন্ম, বৈগুণ্যাদ্বিপৰ্য্যয়ঃ ।

ইচ্ছাশ্রয়ং তাবৎ কৰ্ম্ম-বৈগুণ্যং সনীহাভ্রেষঃ । কর্তৃ-বৈগুণ্যং অবিদ্বান্ প্রয়োক্তা কপূরাচরণশ্চ । সাধন-বৈগুণ্যং হবিরসং সংস্কৃতং উপহতমিতি, মন্ত্রা ন্যূনাধিকাঃ স্বরবর্ণহীনা ইতি,—দক্ষিণা ছুরাগতা হীনা নিন্দিতা চেতি । অখোপজনাশ্রয়ং কৰ্ম্ম-বৈগুণ্যং মিথ্যা সংপ্রয়োগঃ । কর্তৃ-বৈগুণ্যং যোনি-ব্যাপদো বীজোপদাতশ্চেতি । সাধনবৈগুণ্যং ইচ্ছাবিহিতং । লোকে “চাম্বিকামো দারুণী মথুরাদিতি” বিধিবাक्यং, তত্র কৰ্ম্ম-বৈগুণ্যং মিথ্যাভি-ম্বনং, কর্তৃবৈগুণ্যং প্রজ্ঞাপ্রয়ত্তগতঃ প্রমাদঃ । সাধনবৈগুণ্যং আত্ম-স্বধিরং দার্কিৰিতি । তত্র ফলং ন নিষ্পাদ্যত ইতি নানুতদোষঃ । গুণযোগেন ফলনিষ্পত্তিদর্শনাৎ । ন চেদং লৌকিকাদভিদ্যতে “পুত্রকামঃ পুত্রেচ্ছ্যা যজ্ঞেতে”তি ।

অনুবাদ । পুত্রকামেষ্টিতে অর্থাৎ পুত্রকাম ব্যক্তির কর্তব্য পুত্রেষ্টি-যজ্ঞবিধায়ক বেসবাক্যে অনুত-দোষ ( মিথ্যাত্ব ) নাই । ( প্রশ্ন ) কেন ? ( উত্তর ) কৰ্ম্মকর্তা ও সাধনের বৈগুণ্যবশতঃ । ( কৰ্ম্ম, কর্তা ও সাধনের স্বরূপকথনপূর্বক ইহা বুঝাইতেছেন ) যজ্ঞের দ্বারা ( পুত্রেষ্টি-যজ্ঞের দ্বারা ) সংযুজমান মাতা ও পিতা পুত্র উৎপাদন করেন । ( এই স্থলে ) যজ্ঞের করণ ( ত্রয় ও মন্ত্রাদি ) “সাধন” । মাতা ও পিতা “কর্তা” । সংযোগ অর্থাৎ মাতা ও পিতার বিলম্বন সংযোগ ( রতি ) “কৰ্ম্ম” । তিনের অর্থাৎ পূর্বোক্ত সাধন, কর্তা ও কৰ্ম্মের গুণযোগ ( অঙ্গসম্পন্নতা ) বশতঃ পুত্রজন্ম হয় । বৈগুণ্যবশতঃ অর্থাৎ পূর্বোক্ত ত্রয়ের কোনটির বা সকলটির অঙ্গহানিশ্রযুক্ত বিপর্য্যয় ( পুত্রের অনুৎপত্তি ) হয় । ৯

৯ ভাষ্যকার “বৈগুণ্যাদ্বিপৰ্য্যয়ঃ” এই কথাই দ্বারা পুত্রোক্ত কর্তৃ-কর্তৃ-সাধন-বৈগুণ্যকে কলাভাবের প্রয়োজক-রূপে ব্যাখ্যা করার সূত্রোক্ত বেতুবাক্যের পরে “কলাভাবাৎ” এইরূপ বাক্যের অধ্যাহার তাহার অভিশ্রুত বলিয়া বুঝা দাইতে পারে । আত্মীনগণ “৩৭” শ্লোক অঙ্গ অর্থেও প্রয়োগ করিয়াছেন । কর্তৃ, কর্তা ও সাধনের বেতুলি অঙ্গ অর্থাৎ বেতুলি বাতীত ঐ কর্তৃদি ফলজনক হয় না, সেগুলি থাকাই তাহাধিগের গুণযোগ । সেই গুণ বা যজ্ঞের দ্বারাই তাহাধিগের বৈগুণ্য । মাতা ও পিতার যজ্ঞরূপ কর্তৃবে গুণ্য, কর্তৃবৈগুণ্য ও সাধনবৈগুণ্য, তাহা যজ্ঞাধিত কর্তৃবৈগুণ্য । এং মাতা ও পিতা সংযুক্ত হইয়া যে পুত্রোৎপাদন করিলেন, সেই কর্তৃবে কর্তৃবৈগুণ্য ও কর্তৃবৈগুণ্য, তাহাকে ভাষ্যকার বলিয়াছেন, উপজনাস্থিত কর্তৃবৈগুণ্য ও কর্তৃবৈগুণ্য । উপজন লব্ধের অর্থ এখানে উপজনন বা উৎপাদন । যজ্ঞরূপে যে সাধনবৈগুণ্য বলা হইয়াছে, তদ্বিত্ত এখানে আর সাধনবৈগুণ্য নাই । কর্তৃ-



[ প্রকৃত স্থলে কর্মবৈশুণ্য, কর্তৃবৈশুণ্য ও সাধনবৈশুণ্য কি, তাহা বলিতেছেন ] সমীহার অর্থাৎ অঙ্গবজ্ঞের অনুষ্ঠানের ভ্রংশ অর্থাৎ তাহার অনুষ্ঠান না করা বজ্ঞাশ্রিত কর্মবৈশুণ্য। প্রয়োক্তা ( বজ্ঞের কর্তা পুরুষ ) অবিবান্ ও নিম্নিতাচারী অর্থাৎ বজ্ঞকর্তার অবিবদ্ব ও পাতিত্যাদি কর্তৃবৈশুণ্য। হবিঃ ( হবনীয় দ্রব্য ) অসংক্লত অর্থাৎ অপূত বা অপ্ৰোক্ষিত এবং উপহত অর্থাৎ কুঙ্কর কিড়ানাদির দ্বারা বিনষ্ট, মদ্র ন্যূন ও অধিক, স্বরহীন ও বর্ণহীন, দক্ষিণা “দুরাগত” অর্থাৎ নৌতা-দ্যুত ও উৎকোচাদি-দ্রষ্ট উপায়ে সংগৃহীত এবং হীন ও নিম্নিত, এগুলি অর্থাৎ পূর্বোক্ত হবিঃাদির অসংক্লতত্বাদি, সাধনবৈশুণ্য। এবং মিথ্যা সংপ্রয়োগ ( বিপরীত রতি প্রভৃতি ) উপজনাশ্রিত অর্থাৎ মাতা ও পিতার পুত্রজননক্রিয়াগত কর্মবৈশুণ্য। যোনিব্যাপৎ ( চরকোক্ত বিংশতিপ্রকার স্ত্রী-রোগবিশেষ ) এবং বীজোপঘাত ( বীর্ঘানাশ বা ক্রৈব্যাবিশেষ ) কর্তৃবৈশুণ্য। সাধনবৈশুণ্য যজ্ঞে কথিত হইয়াছে ( অর্থাৎ বজ্ঞাশ্রিত সাধনবৈশুণ্য ভিন্ন উপজনাশ্রিত সাধনবৈশুণ্য আর পৃথক্ নাই )। লোকেও “অগ্নিকাম ব্যক্তি কাষ্ঠদ্বয় মন্হন করিবে” এই বিধিবাক্য আছে। তাহাতে অর্থাৎ ঐ মন্হনকার্যে মিথ্যা-মন্হন (যেদ্রব্য মন্হনে অগ্নি উৎপন্ন হয় না) কর্মবৈশুণ্য। বুদ্ধি ও প্রযত্নগত প্রমাদ কর্তৃবৈশুণ্য। আর্দ্র ও ছিন্ন কাষ্ঠ অর্থাৎ কাষ্ঠের আর্দ্রত্বাদি সাধনবৈশুণ্য। তাহা থাকিলে অর্থাৎ পূর্বোক্ত কর্মবৈশুণ্যাদি থাকিলে কল ( অগ্নি ) নিষ্পন্ন হয় না, এ জ্ঞাত্য ( ঐ লৌকিক বিধিবাক্য ) অনৃত-দোষ নাই। যেহেতু গুণযোগবশতঃ অর্থাৎ কারণগুলির সর্ববান্ধবসম্পন্নতা-বশতঃ ফলনিষ্পত্তি দেখা যায়। “পুত্রকাম ব্যক্তি পুত্রোষ্টি বাগ করিবে” ইহা

বৈশুণ্য ও কর্তৃবৈশুণ্য দ্বারা পৃথক্ বলা হইয়াছে, তাহাই উপজনাশ্রিত পৃথক্ বৈশুণ্য। ভাষ্যকার “অন্যোপজনাশ্রিত” ইত্যাদি ভাবের দ্বারা তাহা প্রকাশ করিয়াছেন। তাহা ঐ স্থলে “অব” শব্দের অর্থ সমুত্তর। অব শব্দের সমুত্তর অর্থও কোথায় কথিত আছে। বলা—“অবাস্থো সংপদে জাতাবধিকারে চ মজ্জলৈ। বিব্রজানস্বরোহদকার্যোহয়সমুচ্চয়ে”।—মেদিনী।

১। সমীহা ভবনসমিবিকল্পাপ্রধানং ভক্ত্যভ্যাসো জ্ঞানোহনুষ্ঠানমিতি বাহ্যঃ।—তাৎপর্ঘ্যটীকা।

২। অবিবান্ অপ্রোক্ষিত। বিব্রজো অধিকারঃ সার্বভৌমঃ। অতএব স্ত্রীপুত্রতিরশ্চামনবর্ধনামনবিকারঃ। বিধানি ববি বিস্মৃতিতর্পণানিহেতুঃ কর্ম ব্রহ্মজ্ঞানাদি কৃতবান্, তৎকৃতবানি কর্ম কলানে ন কল্পতে কর্তৃবে বৈশুণ্যাবিতি বর্ণরতি কল্পেরতি। কপুং নিম্নিতঃ কর্ম দ্যুতরতীত্যভরণঃ পুরুষঃ।—তাৎপর্ঘ্যটীকা।

৩। হবিরন্যকৃতবপুঃপ্রোক্ষিতং বা। উপহতঃ সমর্জ্যরাবিত্তিঃ। মদ্রা ন্যূনাঃ ক্রবিশেষেণ। দক্ষিণা দুরাগতা নৌতাহুতোথকেচ্যবেহুঃ স্তুপারাবাগতত্যাঃ।—তাৎপর্ঘ্যটীকা।

৪। মিথ্যাসংপ্রয়োগঃ পুত্রদারিত্যাঃ সাতরি যোনিব্যাপসো নানাবিধাঃ পুত্রজননপ্রতিবন্ধকতয়া যোজিতভেদেণ বীজোপঘাত উপহতঃ যতঃ পুত্রলভ্য ন ভবতি।—তাৎপর্ঘ্যটীকা।

অর্থাৎ এই বৈদিক বিধিবাক্যও লৌকিক হইতে অর্থাৎ ( পূর্বোক্ত লৌকিক বিধিবাক্য হইতে ) ভিন্ন অর্থাৎ বিভিন্ন প্রকার নহে ।

বিবৃতি । কোন স্থলে পুত্রের যজ্ঞের ফল না দেখিয়া ঐ হেতুর দ্বারা “পুত্রকাম ব্যক্তি পুত্রেরই যজ্ঞ করিবে” এই বেদবাক্য মিথ্যা বলিয়া সিদ্ধান্ত করা যায় না । কারণ, একমাত্র পুত্রেরই যজ্ঞ বা তজ্জন্ম অদুর্ভবিশেষই পুত্র জন্মের কারণ নহে । তাহাতে মাতা ও পিতার উপযুক্ত সংযোগও আবশ্যক । মাতা ও পিতার পুত্রজন্মপ্রতিবন্ধক কোন ব্যাধি না থাকিলেও আবশ্যক । যে মাতা ও পিতার পুত্রজন্মপ্রতিবন্ধক কোন ব্যাধি নাই, তাহাদিগের পুত্রেরই যজ্ঞের অদুর্ভবিশেষ বাক্যে তাহাদিগের উপযুক্ত সংযোগরূপ দৃষ্ট কারণের সহিত মিলিত হইয়া পুত্রজন্মের কারণ হয় । দৃষ্ট কারণ ব্যতীত কেবল পুত্রেরই যজ্ঞের অদুর্ভবিশেষই পুত্রজন্মের কারণ হয় না । পূর্বোক্ত বেদবাক্যের তাহা অর্থ নহে । আবার পুত্রেরই যজ্ঞও যথাবিধি অনুষ্ঠিত না হইলে তাহা সেই পুত্রজন্মক অদুর্ভবিশেষ জন্মাইতে পারে না । যদি পুত্রেরই যজ্ঞ কর্তৃবা অন্তর্ভুক্তাদির অনুষ্ঠান না করা হয় ( কণ্ঠবৈগুণ্য ), অথবা যজ্ঞকর্তা অবিবান্ অথবা পাতিত্যাদি দোষে যজ্ঞে অনধিকারী হন ( কণ্ঠবৈগুণ্য ), অথবা যজ্ঞের উপকরণ-দ্রব্যাদি অথবা মন্ত্র ও দক্ষিণার কোন দোষ হয় ( সাধনবৈগুণ্য ), তাহা হইলে ঐ যজ্ঞ যথাবিধি অনুষ্ঠিত না হওয়ার তজ্জন্ম পুত্রজন্মক অদুর্ভবিশেষ জন্মিতে পারে না । পূর্বোক্ত কণ্ঠবৈগুণ্য, কণ্ঠবৈগুণ্য এবং সাধনবৈগুণ্য অথবা উহার মধ্যে যে কোন প্রকার বৈগুণ্যবশতঃ সেখানে পুত্রেরই যজ্ঞের ফল হয় নাই, সেখানে ফল না দেখিয়া পূর্বোক্ত বেদবাক্যকে মিথ্যা বলিয়া সিদ্ধান্ত করা যায় না । চিকিৎসাশাস্ত্রে যে রোগ নিবৃত্তির জন্ত যে সকল উপকরণের দ্বারা সেরূপে যে ঔষধ প্রস্তুত করিতে বলা হইয়াছে এবং রোগীকে যে নিয়মে সেই ঔষধ সেবন করিতে বলা হইয়াছে, চিকিৎসক যদি বধাশাস্ত্র সেই ঔষধ প্রস্তুত করিতে না পারেন, অথবা রোগী যদি বধাশাস্ত্র সেই ঔষধ সেবন না করেন, তাহা হইলে সেখানে ঔষধ সেবনের ফল না দেখিয়া কি সেই চিকিৎসাশাস্ত্র-বাক্যকে মিথ্যা বলিয়া সিদ্ধান্ত করা হয় ? কোন স্থলেই কি সেই চিকিৎসা-শাস্ত্র-বাক্যের সত্যতা বুঝা যায় না ? “অগ্নিকামনার কাঠবন মনন করিবে” ইহা লৌকিক বিধিবাক্য আছে । কিন্তু উপযুক্ত মনন না হইলে অথবা কাঠ আর্দ্র বা ছিন্ন হইলে অর্থাৎ অগ্নি জ্বলাইবার অযোগ্য হইলে সেখানে অগ্নি জন্মে না । তাই বলিয়া কি ঐ হেতুর দ্বারা পূর্বোক্ত লৌকিক বিধিবাক্যকে মিথ্যা বলিয়া সিদ্ধান্ত করা হয় ? কোন স্থলেই কি কাঠ মননে অগ্নির উৎপত্তি দেখা যায় নাই ? এইরূপ পূর্বোক্ত বৈদিক বিধিবাক্যও ঐ লৌকিক বিধিবাক্যের সত্য বৃত্তিতে হইবে । লৌকিক বিধিবাক্যহুনারে কাঠবন মনন করিলে, কণ্ঠাদি-বৈগুণ্য না থাকিলে যেমন অগ্নি জন্মে, এবং তাহাই ঐ বিধিবাক্যের অর্থ, সেইরূপ বৈদিক বিধিবাক্যহুনারে পুত্রেরই যজ্ঞ করিলে পূর্বোক্ত কণ্ঠাদি-বৈগুণ্য না থাকিলে পুত্র জন্মে এবং তাহাই ঐ বিধিবাক্যের অর্থ । পূর্বোক্ত বৈদিক বিধিবাক্য লৌকিক বিধিবাক্য হইতে অন্য প্রকার নহে ।

টিপ্পনী । মহর্ষি পূর্বোক্ত পূর্বপক-স্থলে বেদবাক্যের অপ্রাণাণ্য সাধন করিতে যে অন্ত-



সৌকে প্রথম হেতুরূপে উল্লেখ করিয়াছেন, এই হুত্রে ঐ হেতুর অসিদ্ধতা সন্দর্ভন করিয়া পূর্বোক্ত পূর্বপক্ষের নিরাস করিয়াছেন। পুত্রোষ্ট-বজ্রাদি-বিধায়ক বেদবাক্যে অন্ততঃ অসিদ্ধ কেন, ইহা বুঝাইতে মহর্ষি বলিয়াছেন, “কশ্বকর্জুনাধনবৈগুণ্যং”। মহর্ষির ঐ বাক্যের পরে “কলাভাবোপপত্ত্যে” এই বাক্যের অধ্যাহার উহার অভিপ্রেত। অর্থাৎ দেখেছ কশ্ব, কর্জু ও নাগনের বৈগুণ্যপ্রযুক্ত পুত্রোষ্ট বজ্রাদি বৈদিক কশ্বের কলাভাবের উপপত্তি হয় অতএব কোন স্থলে কলাভাববশতঃ পুত্রোষ্ট-বজ্রাদি বিধায়ক বেদবাক্যের মিথ্যাত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না। পূর্বপক্ষবাদী কলাভাব দেখাইয়া ওদ্বারা পূর্বোক্ত বেদবাক্যের মিথ্যাত্ব সাধন করিবেন এবং ঐ মিথ্যাত্ব হেতুর দ্বারা পূর্বোক্ত বেদবাক্যের অপপ্রামাণ্য সাধন করিবেন। কিন্তু কলাভাব বখন অল্প প্রকারেও উপপন্ন হয়, তখন উহা পূর্বোক্ত বেদবাক্যের মিথ্যাত্ব সিদ্ধ করিতে পারে না। “অভিকান ব্যক্তি কাঠবর মন্বন করিবে” এইরূপ শৌকিক বিধিবাক্য আছে। ঐ বিধিবাক্যদ্বারা কাঠবর মন্বন করিলেও উপযুক্ত মন্বনের অভাবে অথবা উপযুক্ত কাঠের অভাবে অনেক স্থলে অযিক্ত ফল হয় না। কিন্তু তাই বলিয়া পূর্বোক্ত বিধিবাক্য মিথ্যা নহে। সুতরাং কলাভাব বিধিবাক্যের মিথ্যাত্বের ব্যতিকারী, ইহা স্বীকার্য। বাহ্য ব্যতিকারী, তাহা হেতু নহে—তাহা হেতুভাস। সুতরাং কলাভাবরূপ ব্যতিকারী হেতুর দ্বারা বিধিবাক্যের মিথ্যাত্ব সাধন করা যায় না। সুতরাং পুত্রোষ্ট বজ্রাদিবিধায়ক বেদবাক্যে অন্ততঃ-নোব বা মিথ্যাত্ব সিদ্ধ না হওয়ার উহার দ্বারা ঐ বাক্যের অপপ্রামাণ্য সাধন করা যায় না। বাহ্য অসিদ্ধ, তাহা হেতু হয় না, তাহা হেতুভাস, সুতরাং তাহা অপপ্রামাণ্যের সাধক হইতে পারে না ইহাই সূত্রকার মহর্ষির তাৎপর্য। ফল কথা, পূর্বপক্ষবাদীর গৃহীত প্রথম হেতুর অসিদ্ধতা প্রদর্শন করিয়া, উহা পূর্বোক্ত বেদবাক্যের অপপ্রামাণ্য-সাধক হয় না, ইহা বলাই মহর্ষির এই হুত্রের উদ্দেশ্য। তিনি এখানে হেদের প্রামাণ্য-সাধক কোন হেতু বলেন নাই। তিনি এই হুত্রে কশ্বকর্জুনাধনবৈগুণ্যকে কলাভাবের প্রবোদ্ধকরূপে উল্লেখ করিয়া, কলাভাব যে বিধিবাক্যের মিথ্যাত্বের ব্যতিকারী, সুতরাং উহা মিথ্যাত্বের সাধক না হওয়ার বিধিবাক্যে মিথ্যাত্ব অসিদ্ধ, ইহাই বলিয়াছেন।

অবৈদিক সম্প্রদায় ইহার প্রতিবাদ করিয়া বলিতেন যে, যেখানে পুত্রোষ্ট প্রকৃতি বজ্রের ফল হয় না, সেখানে তাহা কশ্ব, কর্জু ও নাগনের বৈগুণ্য-প্রযুক্ত, অথবা বৈদিক বিধিবাক্যের মিথ্যাত্ব-প্রযুক্ত, ইহা কিরূপে বুঝিব ? আমরা বলিব, ঐ সকল বৈদিক বিধিবাক্য মিথ্যা বলিয়াই সেখানে ফল হয় না। কাকতালীয় ভাবে কোন স্থলে ফল দেখা যায়। উদ্যোতকর এই কথা উল্লেখ করিয়া, এতদ্ব্যতীত বলিয়াছেন যে, পুত্রোষ্ট-বজ্রকারীঃ কলাভাব যে কশ্ব, কর্জু ও নাগনের বৈগুণ্য-প্রযুক্তই নহে, তাহাই বা কিরূপে বুঝিব ? আমরা বলিব, বৈদিক বিধিবাক্য মিথ্যা নহে, কশ্বাদির বৈগুণ্যবশতঃই স্বলবিশেষে ফল হয় না। কেবল পুত্রোষ্ট-বজ্রই পুত্রজন্মের কারণ নহে। কোন স্থলে পুত্রোষ্ট-বজ্রের ফল না হইলে পুত্রজন্মের সন্দেহ কারণ দেখানে নাই, কোন কারণবিশেষের অভাবেই পুত্র জন্মে নাই, ইহাই বুঝা যায়। যদি বল, বেদবাক্যের মিথ্যাত্ববশতঃও যখন কলাভাবের উপপত্তি হয়, তখন কশ্বাদির বৈগুণ্যবশতঃই যে সেখানে পুত্র জন্মে নাই, ইহা



কিরাপে নিশ্চয় করা যায়? সুতরাং উহা সন্দিগ্ধ। এতদ্ব্যতীত উচ্ছ্যাতকর বলিয়াছেন যে, তাহা বলিলে তোমার নিজস্বত্বানি হয়। কারণ, পূর্বে বলিয়াছি, বেশ মিথ্যা বলিয়া অগ্রমাণ, এখন বলিতেছি, বেশের মিথ্যাক সন্দেহে তাহার প্রামাণ্য সন্দিগ্ধ। সুতরাং পূর্বকথা পরিত্যক্ত হইয়াছে। যদি বল, এই সন্দেহ উভয় পক্ষেই সমান। পুত্রোত্তর বক্তের কল না হওয়া কি কৰ্মাদির বৈশিষ্ট্য-বশতঃ, অথবা বেশের অপ্রামাণ্যবশতঃ, ইহা উভয় পক্ষেই সন্দিগ্ধ। কৰ্মাদির বৈশিষ্ট্যবশতঃই যে পুত্রোত্তর বক্তের কল হয় না, ইহা নিশ্চয় করিবার উপায় কি আছে? এতদ্ব্যতীত উচ্ছ্যাতকর বলিয়াছেন যে, আমি বেশবাক্য প্রমাণ, কি অপ্রমাণ, তাহা সাধন করিতেছি না। তুমি বেশবাক্য অপ্রমাণ, ইহা সাধন করিতেছ, তাহাতে আমি তোমার হেতুকে অসিদ্ধ বলিয়া, উহা বেশবাক্যের অপ্রামাণ্য-সাধক হয় না, ইহাই বলিতেছি। তুমি যদি তোমার গৃহীত মিথ্যাক হেতুকে বেশবাক্যে সন্দিগ্ধ বলিয়া স্বীকার কর, তাহা হইলেও উহা অপ্রামাণ্য-সাধক হইবে না। কারণ, সন্দিগ্ধ হেতু সাধ্যসাধন হয় না, উহাও সন্দিগ্ধাসিদ্ধ বলিয়া হেতুভাৱ। প্রমাণাত্মকের দ্বারা বেশের প্রামাণ্য সিদ্ধ হইলে, তাহাতে প্রামাণ্য সন্দেহও হইতে পারে না। সে প্রমাণ পরে প্রদর্শিত হইবে। উচ্ছ্যাতকর পূর্বপক্ষ ব্যাখ্যায় অন্ততঃ ও অপ্রামাণ্যের ভেদ ব্যাখ্যা করিয়া, এখানে আবার বলিয়াছেন যে, বস্তুতঃ অন্ততঃ ও অপ্রামাণ্য একই পদার্থ। সুতরাং অপ্রামাণ্যের অন্তর্যমানে অন্ততঃ হেতুও হইতে পারে না। কারণ, বাহ্য প্রতিক্ষাৰ্থ বা নাথ্য, তাহাই হেতু হয় না। ভাষ্করমঞ্জরীকার অমৃত তট্টও পূর্বোক্ত বিষয়ে বহু বিচার করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, কাশীরী বজ্র বখাবিধি অমৃততট্ট হইলে বজ্র-সমাপ্তির পরেই বৃষ্টিফল দেখা যায়। পুত্রোত্তর কল ঐহিক হইলেও তাহা পুত্রোত্তর প্রতীতি বজ্র-সমাপ্তির পরেই হইতে পারে না। আকাশ হইতে যেমন বৃষ্টি পতিত হয়, তজ্জন্ম বজ্র-সমাপ্তির পরেই পুত্র পতিত হইতে পারে না। কারণ, তাহা ত্রীপুরুষ-সংযোগাদি কারণাত্মক-সাপেক্ষ। "চিহ্না" বাগ করিলে পশুলাভ হয়, "সংগ্রহণী" বাগ করিলে গ্রামলাভ হয়। এই পশু প্রতীতি কল প্রতীগ্রহাদির দ্বারা কোন ব্যক্তির বাগ-সমাপ্তির পরেও দেখা যায়। স্বরূপ তট্ট ইহা সমর্থন করিতে দুর্ভাস্তরূপে উল্লেখ করিয়াছেন যে, "আমার পিতামহই গ্রাম কাননায় 'সংগ্রহণী' নামক বজ্র করিয়াছিলেন। তিনি ঐ বজ্র-সমাপ্তির পরেই 'গৌরমুগক' নামক গ্রাম লাভ করেন।" স্বরূপ তট্ট ইহাও বলিয়াছেন যে, যেখানে বখাবিধি বজ্র-অমৃততট্ট হইলেও পুত্র ও পশু প্রতীতি ফল দেখা যায় না, কালাস্তরেও যেখানে বজ্রাদি কৰ্মের ফল হয় নাই, সেখানে কোন প্রাক্তন চরদৃষ্টবিশেষকে প্রতিবন্ধকরূপে বুঝিতে হইবে। মহর্ষি গোতম "কৰ্ম-কৰ্তৃসাধন-বৈশিষ্ট্য" শব্দটি উপলক্ষণের জন্ত প্রয়োগ করিয়াছেন। অর্থাৎ উহার দ্বারা প্রাক্তন চরদৃষ্টবিশেষও বুঝিতে হইবে। কারণ, তাহাও অনেক স্থলে ফলাভাবের প্রয়োজক হয়। কৰ্ম, কৰ্ত্তা ও সাধনের বৈশিষ্ট্য না থাকিলেও কৰ্মাস্তরপ্রতিবন্ধবশতঃ ফল জন্মে না, এ কথা তাৎপৰ্য্যটীকাকারও বলিয়াছেন। ৫৭।

মূত্র। অভ্যুপেত্য কালভেদে দোষবচনাৎ ॥৫৯॥১২০॥



অনুবাদ। ( উত্তর ) [ হোমবিধায়ক বেদবাক্যে ব্যাঘাত-দোষ নাই ] যেহেতু স্বীকার করিয়া কালভেদ করিলে অর্থাৎ অগ্ন্যাধানকালে উদিতাদি কোন কালবিশেষ স্বীকার করিয়া, তদন্তর কালে হোম করিলে দোষ বলা হইয়াছে।

ভাষ্য। ন ব্যাঘাতো হবনে ইত্যনুবর্ততে। যোহভ্যুপগতং হবন-কালং ভিনন্তি ততোহন্যত্র জুহোতি, তত্রায়মভ্যুপগতকালভেদে দোষ উচ্যতে, “শ্রাবোহন্যাহুতিনভ্যবহরতি য উদিতে জুহোতি”। তদিদং বিধিভ্রেষে নিন্দাবচনমিতি।

অনুবাদ। হবনে অর্থাৎ পূর্বোক্ত উদিতাদি কালে হোমবিধায়ক বেদবাক্যে ব্যাঘাত নাই, ইহা অনুবৃত্ত হইতেছে, অর্থাৎ প্রকরণানুসারে তাহা এখানে মহর্ষির বক্তব্য বুঝিতে হইবে। ( নৃত্যার্থ বর্ণন করিতেছেন ) যে ব্যক্তি স্বীকৃত হোমকালকে ভেদ করে, তাহা হইতে ভিন্ন কালে হোম করে, সেই স্বীকৃত কালভেদে অর্থাৎ ঐরূপ স্থলে এই দোষ বলা হইয়াছে, —“যে ব্যক্তি উদিত কালে হোম করে, ‘শ্রাব’ ইহার আভিপ্রায় ভোজন করে”। সেই ইহা বিধিভ্রংশ হইলে নিন্দাবচন।

টীপনী। মহর্ষি পূর্বোক্ত পূর্বপক্ষ-সূত্রে বেদবাক্যের অগ্রাশাধ্য সাধন করিতে যে ব্যাঘাত-দোষকে দ্বিতীয় হেতুরূপে উল্লেখ করিয়াছেন, এই সূত্রে ঐ হেতুর অসিদ্ধতা সমর্থন করিয়া, ঐ পূর্বপক্ষের নিরাস করিয়াছেন। তাই ভাষ্যকার প্রথমে “ন ব্যাঘাতো হবনে” এই কথাটির পূরণ করিয়া সূত্রার্থ বর্ণন করিয়াছেন। পূর্বসূত্র হইতে “নঞ” শব্দের অমুভূতি মহর্ষির অভিপ্রায় আছে। তাহার পরে যোগ্যতা ও তাৎপর্যানুসারে “ব্যাঘাতো হবনে” এই কথাটির যোগও মহর্ষির অভিপ্রায় বুঝা যায়। তাই ভাষ্যকার “ন ব্যাঘাতো হবনে” এই পর্য্যন্ত বাক্যকেই অমুভূত বলিয়াছেন।

মহর্ষির কথা এই যে, উদিতাদি কালভ্রমে হোমবিধায়ক বেদবাক্যে ব্যাঘাত বা বিরোধ নাই। কারণ, অগ্ন্যাধানকালে যে ব্যক্তি উদিতকালেই হোম করিবে বলিয়া সংকল্প করিয়াছে, সেই ব্যক্তি ঐ স্বীকৃত কালকে ত্যাগ করিয়া, অমুদিত কাল বা সমন্বাধ্যুষিত কালে হোম করিলে, বেদে তাহারই দোষ বলা হইয়াছে। এইরূপ অমুদিত কাল বা সমন্বাধ্যুষিত কালে হোমের সংকল্প করিয়া, ঐ স্বীকৃত কাল পরিত্যাগপূর্বক উদিতাদি কালান্তরে হোম করিলে, বেদে তাহারই দোষ বলা হইয়াছে। বেদের ঐ নিন্দার্থবাদের দ্বারা বুঝা যায়, “উদিতে হোতবাং” ইত্যাদি বিধিবাক্যভ্রমের দ্বারা কল্পিত বিচিত্র ব্যক্তির অগ্নিহোত্র হোমে উদিতাদি কালভ্রমের বিধান হইয়াছে। সকল ব্যক্তিকেই ঐ কালভ্রমেই হোম করিবেন, ইহা ঐ বিধিবাক্যের তাৎপর্য্য নহে। ঐ কালভ্রমের মধ্যে ইচ্ছানুসারে যে কোন কালে হোম করিলেই অগ্নিহোত্র হোম সিদ্ধ হইবে। কিন্তু যিনি যে কালে





অমুবাদ। অভ্যাসে অর্থাৎ পূর্বোক্ত সামিধেনীবিশেষের অভ্যাস বা পুনরুচ্চারণ-বিধায়ক বেদবাক্যে পুনরুক্ত-দোষ নাই, ইহা প্রকৃত (প্রকরণলক্ষ)। অর্থাৎ প্রকরণানুসারে এখানে উহা সূত্রকারের বক্তব্য বলিয়া বুঝা যায়। নিম্নপ্রয়োজন অভ্যাস পুনরুক্ত। সপ্রয়োজন অভ্যাস অমুবাদ। “প্রথমাকে তিনবার অনুবচন করিবে, উত্তমাকে তিনবার অমুবচন করিবে”, এই যে অভ্যাস, ইহা সপ্রয়োজনবশতঃ অমুবাদ উপপন্ন হয়। যেহেতু প্রথমা ও উত্তমার তিনবার পাঠের দ্বারা সামিধেনীর পঞ্চদশত্ব হয়। মন্ত্রসংবাদও সেইরূপ আছে। (সে কিরূপ, তাহা বলিতেছেন) “আমি ভাতৃব্যকে” (শত্রুকে) পঞ্চদশাবর বাগ্‌বজ্রের দ্বারা এই পীড়ন করিতেছি, যে আমাদিগকে ঘেঁষ করে, আমরাও বাহাকে ঘেঁষ করি”, এই বজ্রমন্ত্র পঞ্চদশ সামিধেনী বলিতেছেন, অর্থাৎ ঐ মন্ত্রের দ্বারাও সেই যজ্ঞে পঞ্চদশ সামিধেনীর প্রয়োগ বুঝা যাইতেছে। তাহা অর্থাৎ বেদোক্ত একাদশ সামিধেনীর পঞ্চদশত্ব অভ্যাস ব্যতীত অর্থাৎ তন্মধ্যে প্রথমা ও উত্তমার তিনবার পাঠ ব্যতীত হইতে পারে না।

টিপ্পনী। মহর্ষি “ন কৰ্ণ-কৰ্ণ-সাধনবৈগুণ্যঃ” ইত্যাদি তিন স্থানের দ্বারা বথাক্রমে পূর্বোক্ত অনৃত-দোষ প্রকৃতি হেতুজ্ঞের অসিদ্ধতা সমর্থন করার গুহ্যেইবিধায়ক বেদবাক্যে অনৃত-দোষ নাই, এবং অগ্নিহোত্র হোমবিধায়ক বেদবাক্যে ব্যাঘাত-দোষ নাই এবং “সামিধেনী” মন্ত্রবিশেষের পুনরাবৃত্তিবিধায়ক বেদবাক্যে পুনরুক্ত-দোষ নাই, ইহাই বথাক্রমে মহর্ষিসূত্রোক্ত হেতুজ্ঞের সাধ্য বুঝা যায়। তাই ভাষ্যকার হৃদ্যর্প বর্ণন করিতে প্রথমে ঐরূপ সাধ্যবোধক বাক্যের পূরণ করিয়া, মহর্ষির সাধ্য বুঝাইয়াছেন। এই হৃদ্যভাষ্যে “পুনরুক্ত-দোষোহভ্যাসে ন” এই

১। বান্‌ শব্দে ৪১১০৪—এই পাণিনিব্রাহ্মসারে ভাতৃ শব্দের পরে “বান্‌” গত্যে এই ভাতৃব্য শব্দটি নিপন্ন। ভাত্যার অপভ্রা শব্দ হইলে, সেই অর্থে ভাতৃ শব্দের পরে বান্‌ প্রত্যয় হয়। “ভাতৃবান্‌” আরম্ভে প্রকৃতিপ্রত্যয়সমূহাদেয় শব্দেী বাজে। ভাতৃব্যঃ শব্দঃ।—সিদ্ধান্ত-কৌমুদী। ভাতৃগণ্যং বহি পঞ্চমত্বা ভাতৃশব্দাৎ কাসে ভাৎ, নতু ব্যচ্ছৌ ইত্যর্থঃ।—তৎসাবিনী। শতপথ ব্রাহ্মণের ভাষ্যে (৩২ পৃষ্ঠা) দাহণ্যচাৰ্য্যও সিদ্ধিহাছেন, “বান্‌ শব্দে” ইতি সূত্রে ভাতৃব্যঃ শব্দঃ। ইদমহং ইত্যাদি মন্ত্রে “পঞ্চদশাবর” এইরূপ পাঠেই বহু পুস্তকে দেখা যায়। কোন ভাষ্যপুস্তকে “পঞ্চদশাবর” এইরূপ পাঠ আছে। অতঃ পরে ভট্টের ভাষ্যমঞ্জরীতে এবং ভাষ্যপটীকা গ্রন্থেও “পঞ্চদশাবর” এইরূপ পাঠ দেখা যায়। বস্তুতঃ “পঞ্চদশাবর” এইরূপ পাঠেই প্রকৃত। বেদে আরও অনেক সামিধেনী মন্ত্র ও তাহাদের পাঠের বিধান আছে। উহাতে বাগ্‌বজ্র ও বজ্রমন্ত্র বলা হইয়াছে। যে বজ্রমন্ত্রে পঞ্চদশ বজ্রই বর্ণনোক্ত। অপর অর্থাৎ মূল, এই অর্থে বহুব্রীহি সম্বন্ধে ঐ “পঞ্চদশাবর” শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। ভাষ্য-কারোক্ত ঐ বহুব্রীহি অনুসন্ধান করিয়াও দেখিতে পাই নাই। ঐ বহুব্রীহি অর্থে বিধান শতপথ ব্রাহ্মণে দেখা যায়। পর পৃষ্ঠার পাদটীকা দ্রষ্টব্য।



বাক্যের পূরণ করিয়া ভাষাকার বলিয়াছেন, ইহা “প্রকরণলক্ষ” অর্থাৎ প্রকরণ জ্ঞানের দ্বারাই ঐ সাধাই এখানে মহাবির বিবক্ষিত বুঝা যায়। ভাষাকার মহাবির প্রথমোক্ত পূর্ণপক্ষসূত্র হইতে “পুনরুক্ত্যদোষ শব্দ” এবং সেই সূত্রে মহাবির বুঝি “অভ্যাস” শব্দ এবং প্রথমোক্ত সিদ্ধান্তসূত্র হইতে “নঞ” শব্দ গ্রহণ করিয়াই এখানে ঐরূপ বাক্যের পূরণ করিয়াছেন এবং ইহার পূর্ণসূত্রেও ঐরূপে শব্দ গ্রহণ করিয়াই “ন ব্যাঘাতো হবনে” এইরূপ বাক্যের পূরণ করার সেখানে ঐ বাক্যকে অমুযুক্ত বলিয়াই উল্লেখ করিয়াছেন।

মহাবির কথা এই যে, অভ্যাস-বিধায়ক বেদবাক্যে পুনরুক্ত্যদোষ নাই, উহা অসিদ্ধ। কারণ, নিম্নপ্রয়োজন অভ্যাসকেই “পুনরুক্ত্য” বলে, তাহাই দোষ। সপ্রয়োজন অভ্যাসের নাম “অমুবাদ” ; উহা আবশ্যক বলিয়া দোষ নহে। প্রয়োজনবশতঃ পুনরুক্তি কর্তব্য হইলে, তাহা দোষ হইতে পারে না। বেদে যে সামিথেনীর মধ্যে প্রথমাকে ও উত্তমাকে তিনবার পাঠ করিবার বিধি বলা হইয়াছে, বেদোক্ত ঐ অভ্যাস “অমুবাদ”। কারণ, উহার প্রয়োজন আছে, সুতরাং উহা পুনরুক্ত্যদোষ নহে। ভাষাকার ঐ অভ্যাসের প্রয়োজন বুঝাইতে বাহা বলিয়াছেন, তাহার গুঢ় তাৎপর্য্য এই যে, একাদশটি সামিথেনীই বেদে পাঠিত হইয়াছে (ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, ১।৫।২ ত্রুট্য)। কিন্তু দর্শ ও পূর্ণমাস যাগে পঞ্চদশ সামিথেনী পাঠের কথাও বেদে আছে<sup>১</sup>। বেদে যে “ইদমহং ভ্রাতৃব্যং” ইত্যাদি মন্ত্রের দ্বারা দেবকে স্মরণপূর্ব্বক পায়ে অঙ্গুষ্ঠদ্বয়ের দ্বারা ভূমিতে পীড়নের বিধি আছে, ঐ মন্ত্রের দ্বারাও (বাহাকে বহুময় বলা হইয়াছে) পঞ্চদশ সামিথেনী পাঠের বিধি বুঝা যায়। কিন্তু একাদশ সামিথেনী পঞ্চদশ হইতে পারে না, তাই “ত্রিঃ প্রথমাদবাহ জিরুতমাং” এই বাক্যের দ্বারা ঐ একাদশ সামিথেনীর মধ্যে প্রথমাকে ও উত্তমাকে তিনবার পাঠ করিবার বিধি বলা হইয়াছে। কারণ, ঐরূপ অভ্যাস ব্যতীত একাদশ সামিথেনীর পঞ্চদশ সম্ভব হয় না। ঐরূপ অভ্যাসের বিধান করার একাদশ সামিথেনীর মধ্যে নয়টির নয় বার পাঠ ও প্রথমা ও উত্তমা, এই দুইটির তিনবার করিয়া ছয়বার পাঠে ঐ সামিথেনীর পঞ্চদশ হইতে পারে। ফল কথা, বেদে বহু-বিশেষের ফল সিদ্ধির জন্ত একাদশ সামিথেনীর মধ্যে প্রথমটি ও শেষটিকে তিনবার পাঠ করিবার বিধান করিয়া যে পঞ্চদশ সংখ্যা পূরণের ব্যবস্থা করা হইয়াছে, তাহাতে পুনরুক্ত্যদোষ হইতে পারে না। হোতা বেদের আদেশেই একাদশ সামিথেনীর মধ্যে প্রথমা ও উত্তমাকে তিনবার পাঠ করিবেন, নচেৎ হোতার কাজের ফলশ্রুতি হইবে না। সুতরাং ঐ পুনরাবৃত্তি নিরপেক্ষ পুনরুক্তি নহে। পূর্ণনীমাংসাদর্শনে মহাবির জৈমিনিও অভ্যাসের দ্বারাই সামিথেনী মন্ত্রের সংখ্যাপূরণ সিদ্ধান্ত

১। “একাদশাবাহ” ইত্যাদি শতপথ। “স বৈ ত্রিঃ প্রথমাদবাহ জিরুতমাং” ইত্যাদি শতপথ। “তাং পঞ্চদশ সামিথেন্যঃ সম্প্রহায়ে। পঞ্চদশো বৈ বজ্রো বীর্ধিং বজ্রো বীর্ধাসৈবৈকং সামিথেনীরত্ৰিসম্প্রহায়েতি, তন্মাসত্যমদু-মানাহ ৭৭ মিথ্যা তদবজ্রভ্যামবাহতেতদবহমবহবাহ ইতি ত্রয়েনমোতেন বজ্রোপাবাহতে। ৭। শতপথ। ১ম কাণ্ড ৩৪ অঃ, ৪ম ব্রাহ্মণ। “পঞ্চদশসামিথেন্যো বর্ণপূর্ণমাসয়োঃ। সম্বলশেইপঞ্চদশানাং।” সাংখ্যভাষ্যের উক্ত লিপিবদ্ধত্ব।



করিয়াছেন<sup>১</sup>। মূল কথা, অভ্যাসবিধায়ক পুরোক্ত বেদবাক্যে পুনরুক্ত-রোব নাই। সুতরাং উহা অসিদ্ধ বলিয়া হেতুভাস। উহার দ্বারা পুরোক্ত বেদের অপ্রামাণ্য সিদ্ধ করা অসম্ভব। ১০০।

## সূত্র। বাক্যবিভাগস্ত চার্থগ্রহণাৎ ॥৩১॥১২২॥

অনুবাদ। পরন্তু বাক্যবিভাগের অর্থগ্রহণ প্রযুক্ত অর্থাৎ লৌকিক বাক্যের জ্ঞায় বিভক্ত বেদবাক্যের অর্থ জ্ঞান হয় বলিয়া (বেদ প্রমাণ)।

ভাষ্য। প্রমাণং শব্দো যথা লোকে।

অনুবাদ। শব্দ অর্থাৎ বেদরূপ শব্দ প্রমাণ, যেমন লোকে,—[ অর্থাৎ লৌকিক বাক্য যেমন বিভাগ প্রযুক্ত বিভিন্নরূপ অর্থবোধক হওয়ায় প্রমাণ, তদ্রূপ বেদবাক্যও বিভাগপ্রযুক্ত বিভিন্নরূপ অর্থবোধক বলিয়া প্রমাণ হইতে পারে। ]

টীকা। মহর্ষি পুরোক্ত তিন সূত্রের দ্বারা বেদের অপ্রামাণ্য সাধনে পরিপূরিত হেতুত্রয়ের উদ্ধার করিয়া অর্থাৎ ঐ হেতুত্রয়ের অসিদ্ধতা সাধন করিয়া, বেদ অপ্রমাণ হইতে পারে না, ইহা বুঝাইয়া, এখন ঐ সূত্রের দ্বারা বেদের প্রামাণ্য সম্ভাবনার হেতু বলিয়াছেন। কারণ, কেবল বেদের অপ্রামাণ্য পক্ষের হেতু খণ্ডন করিলেই তাহার প্রামাণ্য সিদ্ধ হয় না; বেদের প্রামাণ্য পক্ষেও হেতু বলা আবশ্যক। কিন্তু যে পক্ষ সম্ভাবিতই নহে, তাহা হেতুর দ্বারা সিদ্ধ করা যায় না। এ জন্য মহর্ষি বেদের প্রামাণ্য সাধন করিতে প্রথমে উহা যে সম্ভাবিত, তাহাই ঐ সূত্রের দ্বারা সমর্থন করিয়াছেন। মহর্ষির কথা এই যে, বেদ প্রমাণ হইতে পারে। কারণ, লৌকিক বাক্যের দ্বারা বেদবাক্যেরও বিভাগ দেখা যায়। যেমন লৌকিক বাক্যগুলি নানাবিধ বিভাগপ্রযুক্ত নানারূপ অর্থবোধক হইয়া প্রমাণ হইতেছে, তাহাদিগের প্রামাণ্য অস্বীকার করা যায় না, তাহা হইলে লোকবাক্যই উদ্ভেদ হয়, তদ্রূপ বেদবাক্যগুলিও নানাবিধ বিভাগ প্রযুক্ত নানারূপ অর্থ প্রকাশ করিতেছে বলিয়া লৌকিক বাক্যের দ্বারা বেদবাক্যও প্রমাণ হইতে পারে। ভাষ্যকার মহর্ষি-সূত্রের পরে “প্রমাণং শব্দো যথা লোকে” এই বাক্যের পূরণ করিয়া সূত্রকারের বক্তব্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সূত্রবাক্যের সহিত ভাষ্যকারের ঐ বাক্যের যোজন্য করিয়া, সূত্রার্থ বুঝিতে হইবে। উল্লেখ্যতকর সূত্রকারোক্ত হেতুকে “অর্থবিভাগ” বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। বাক্যের

১। “অভ্যাসেন তু সংখ্যাপূরণং সান্নিবেশীকৃত্যন্যত্রকৃত্যিহাৎ”—পূর্বদীপ্যমানবর্ণন, ১০৪ অঃ, ৪২ পাদ, ২৭ বৃজ। প্রকৃত্যে অভ্যাসেন সংখ্যা পূরিতা। ত্রিঃ প্রথমসংখ্যাহ ত্রিকৃত্যসান্নিতি। কথং? পঞ্চদশ সান্নিবেশ ইতি ত্রিভিঃ। একাংশ চ সংখ্যাত্তাঃ। তত্রাত্ত্যাসেনাৎসেন সাংখ্যায়ঃ পূরিতব্যার্থাৎ অভ্যাস উক্ত, ত্রিঃ প্রথমসংখ্যাহ ত্রিকৃত্যসান্নিতি। সেনেন নিব্বসেন অর্থসংখ্যাকৃত্যসংখ্যাসঃ কর্তব্য ইতি। বাৎসক্যকৃত্যসংখ্যাসে ত্রিভিঃপাণে পঞ্চদশসংখ্যা পূরিত্য তাৎপর্যসংখ্যাসংখ্যাস ইত্যেকত্বত্বেন ত্রিভিঃ।—পঞ্চদশপাণ।

বিভাগ থাকিলে তাহার অর্থেরও বিভাগ থাকিবে। বাক্য নানাধি বন্নিয়া তাহার অর্থও তদনুসারে নানাধি। সুতরাং উচ্চ্যোক্তক স্বত্কারোক্ত হেতুকে অর্থবিভাগ বন্নিয়াই গ্রহণ করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, মবাদি বাক্যের দ্বার অর্থবিভাগ থাকায় বেদবাক্য প্রমাণ। মবাদি বাক্যে যেমন অর্থবিভাগ থাকায় তাহার প্রামাণ্য আছে, তদ্রূপ বেদবাক্যেও অর্থবিভাগ থাকায় তাহার প্রামাণ্য আছে।

বৃত্তিকার বিশ্বনাথ প্রভৃতি নব্যগণ ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, মহর্ষি এই স্বত্বে দ্বারা তাহার পূর্বস্বত্বে অত্বেদের সার্থকত্ব লোকসিদ্ধ, ইহাই বন্নিয়াছেন। শিষ্টগণ বাক্যবিভাগের অর্থ অত্বেদরূপে বিভক্ত বাক্যের অর্থগ্রহণ অর্থ প্রয়োজন স্বীকার করিয়াছেন, সুতরাং উহার সার্থকত্ব লোকসিদ্ধ, ইহাই স্বত্বে। বৃত্তিকার প্রভৃতির ব্যাখ্যায় মহর্ষির পরবর্তী স্বত্বে অত্বেদগতি বৃদ্ধি বায় না। পরন্তু মহর্ষি ইহার পরে পূর্বপক্ষের অবতারণা করিয়া অত্বেদের সার্থকত্ব সমর্থন করিয়াছেন। সুতরাং এই স্বত্বে তিনি অত্বেদের সার্থকত্ব সম্বন্ধে কিছু বন্নিয়াছেন, ইহা মনে হয় না। সুধীগণ প্রামাণ্যপূর্বক মহর্ষির তাৎপর্য চিন্তা করিবেন। তাৎকার প্রভৃতির তাৎপর্য পরে পরিষ্কৃত হইবে। ৩১।

ভাষ্য। বিভাগশ্চ ব্রাহ্মণবাক্যানাং ত্রিবিধঃ—

অনুবাদ। ব্রাহ্মণ-বাক্যগুলির বিভাগ ত্রিবিধ। অর্থঃ “মন্ত্র” ও “ব্রাহ্মণ”-রূপ বেদের মধ্যে ব্রাহ্মণ-ভাগ তিন প্রকার।

সূত্র। বিদ্যার্থবাদানুবাদবচনবিনিয়োগাৎ ॥৩২॥১২৩॥

অনুবাদ। যেহেতু (ব্রাহ্মণবাক্যগুলির) বিধিবচন, অর্থবাদ-বচন ও অনুবাদ-বচনরূপে বিভাগ আছে।

ভাষ্য। ত্রিধা খলু ব্রাহ্মণবাক্যানি বিনিয়ুক্তানি, বিধিবচনানি, অর্থবাদ-বচনানি, অনুবাদবচনানীতি।

অনুবাদ। ব্রাহ্মণবাক্যগুলি তিন প্রকারেই বিভক্ত,—(১) বিধিবাক্য, (২) অর্থবাদবাক্য, (৩) অনুবাদবাক্য।

টীকণী। মহর্ষি পূর্বস্বত্বে বে বাক্যবিভাগের কথা বন্নিয়াছেন, তাহা বেদবাক্যের বিভাগই

১। সমস্তানি বা বেদবাক্যানি পক্ষীভুক্তাভিধীয়তে “প্রমাণং” বেদবাক্যানি অর্থবিভাগবদ্বাং মবাদিবাক্যবৎ।  
২। মবাদিবাক্যোক্তবিভাগবত্তি, অর্থবিভাগবৎ সতি প্রামাণ্য, তথাচ বেদবাক্যোক্তবিভাগবত্তি তদ্বাৎ প্রামাণ্যমিতি।  
—ভাষ্যার্থিক।



বুঝা যায়। কারণ, বেদবাক্যই এখানে প্রস্তুত। এই প্রকরণে বেদের প্রামাণ্য পরীক্ষাই মহর্ষি করিয়াছেন। বেদবাক্যের বিভাগ আছে বলিলে, সে বিভাগ কিরূপ, ইহা জিজ্ঞাস্য হয়; সুতরাং তাহা বলিতে হয়, তাহা না বলিলে পূর্বসূত্রের কথাও সমর্থিত হয় না। এ জন্ত মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা বলিয়াছেন যে, যেহেতু বিধিবাক্য, অর্থবাদবাক্য ও অত্ববাদবাক্যরূপে বিভাগ আছে, অতএব ব্রাহ্মণ-বাক্যের বিভাগ তিন প্রকার। ভাষ্যকার প্রথমে “বিভাগঃ” ইত্যাদি সন্দর্ভের দ্বারা মহর্ষির বক্তব্য প্রকাশ করিয়া, সূত্রের অবতারণা করিয়াছেন। ভাষ্যকারের ঐ সন্দর্ভের সহিত সূত্রের বোঝনা করিয়া সূত্রার্থ বুঝিতে হইবে। বেদের মন্ত্রভাগের সূত্রোক্ত-রূপ বিভাগ নাই, এ জন্ত ব্রাহ্মণভাগের ত্রিবিধ বিভাগই সূত্রকার বলিয়াছেন, বুঝিতে হইবে। তাই ভাষ্যকারও যোগ্যতাসম্মত্রে মহর্ষির তাৎপর্য্য নির্ণয় করিয়া ব্রাহ্মণ-বাক্যের ত্রিবিধ বিভাগই সূত্রার্থ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। মহর্ষি বেদবাক্যের বিভাগ দেখাইতে ব্রাহ্মণভাগেরই বিভাগ দেখাইয়াছেন কেন? মন্ত্রভাগের কোনরূপ বিভাগ না দেখাইবার কারণ কি? এইরূপ প্রশ্ন হইতে পারে। এতদ্বত্তরে বক্তব্য এই যে, মহর্ষি পূর্বসূত্রে লৌকিক বাক্যের দ্বারা বেদবাক্যের বিভাগই বলিয়াছেন। বেদবাক্যে লৌকিক বাক্যের সাম্য প্রদর্শন করিয়া, লৌকিক বাক্যের দ্বারা বেদবাক্যেরও প্রামাণ্য আছে, ইহা বলাই পূর্বসূত্রে মহর্ষির অভিপ্রেত। ভাষ্যকারও মহর্ষির ঐরূপ তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সুতরাং লৌকিক বাক্য যেমন বিধি, অর্থবাদ ও অত্ববাদ, এই তিন প্রকার, বেদবাক্যও ঐরূপ তিন প্রকার, ইহা বলিতে ব্রাহ্মণভাগেরই ঐরূপ প্রকারভেদ বলিতে হইয়াছে। মন্ত্রভাগের ঐরূপ প্রকারভেদ নাই। অতরূপ প্রকারভেদ থাকিলেও লৌকিক বাক্যে সেইরূপ প্রকারভেদ নাই। সুতরাং মহর্ষি লৌকিক বাক্যের দ্বারা বেদবাক্যের প্রকারভেদ দেখাইতে ব্রাহ্মণভাগেরই ঐরূপ প্রকারভেদ দেখাইয়াছেন। বেদের সমস্ত প্রকারভেদ বর্ণন করা এখানে অনাবশ্যক; মহর্ষির তাহা উদ্দেশ্যও নহে। ভাষ্যকারের ব্যাখ্যাসম্মত্রে লৌকিক বাক্যের দ্বারা বেদবাক্যের বিভাগ প্রদর্শনই এখানে তাহার উদ্দেশ্য এবং পূর্বসূত্রোক্ত বক্তব্য সমর্থনে তাহাই আবশ্যক।

সমস্ত বেদ “মন্ত্র” ও “ব্রাহ্মণ” নামে দুই ভাগে বিভক্ত। মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ ভিন্ন কোন বেদ নাই। মহর্ষি আপত্ত্যও “মন্ত্রব্রাহ্মণযোর্বৈদনামধেয়ং” এই সূত্রের দ্বারা তাহাই বলিয়াছেন। বেদের মন্ত্রভাগ ত্রিবিধ—(১) ঋক্, (২) যজুঃ, (৩) সাম। পাদবদ্ধ গায়ত্র্যাধি ছন্দোবিশিষ্ট মন্ত্রগুলি ঋক্। গীতিবিশিষ্ট মন্ত্রগুলি সাম। এই উভয় হইতে বিলক্ষণ অর্থাৎ বেগুলি ছন্দোবিশিষ্ট ও গীতিবিশিষ্ট নহে, এমন মন্ত্রগুলি যজুঃ<sup>১</sup>। কশ্যপাওরূপ বেদের বক্তাই মুখ্য প্রতিপাদ্য। পূর্বোক্ত মন্ত্রাখ্যক ত্রিবিধ বেদেরই যজ্ঞে প্রয়োগ ব্যবহৃত। ঐ ত্রিবিধ বেদকে অবলম্বন করিয়াই যজ্ঞ প্রতিষ্ঠিত, এ জন্ত উহার নাম “ঋষী”। অপর বেদের যজ্ঞে ব্যবহার না থাকায় তাহা “ঋষীর” মধ্যে পরিগণিত হয় নাই। কিন্তু তাই বলিয়া অথর্বক-বেদ বেদই নহে, ইহা শাস্ত্রকারদিগের

১। তেজস্বর্য্যজার্ঘ্যধেনু পাঠ্যব্যবহা। গীতিসু সামাখ্যা। শেষে যজুঃ শব্দঃ। পূর্ববীমামাহার। ২য় অ., ১ম পাদ। ৩৪। ৩৫। ৩৬।



সিদ্ধান্ত নহে। ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব, এই চারি বেদের সংহিতা অংশে যে সকল মন্ত্র আছে, তন্মধ্যে অথর্ববেদসংহিতার মন্ত্রগুলিও মন্ত্রাত্মক বেদ। তাহাকে গ্রহণ করিয়া বেদের মন্ত্রভাগ চতুর্বিধ। পাক্ষাত্য পণ্ডিতগণ বেদের “ত্রয়ী” নামের প্রতি নির্ভর করিয়া অথর্ব বেদকে বেদ বলিয়া স্বীকার করেন না। কিন্তু ঐ মত বা যুক্তি তাহাদিগেরই উদ্ভাবিত নহে। গবেষণ উপাধ্যায়ের পূর্ববর্তী জয়ন্তভট্ট ভায়নমঞ্জরীতে ঐরূপ অনেক যুক্তি প্রদর্শন করিয়া, কেহ যে অথর্ববেদের প্রামাণ্য স্বীকার করিতেন না, ইহা বলিয়া বহু বিচারপূর্বক ঐ মতের ভ্রান্তত্ব প্রতিপাদন করিয়া গিয়াছেন। জয়ন্তভট্ট শতপথ ব্রাহ্মণ, ছান্দোগ্যোপনিষৎ প্রভৃতি গ্রন্থে অথর্ব-বেদের উল্লেখ দেখাইয়াছেন<sup>১</sup>। ছান্দোগ্যোপনিষদে নারদ-সনৎকুমার-সংবাদে চতুর্থ বেদ বলিয়া অথর্ববেদের উল্লেখ দেখা যায়। যজুর্বক্তাসংহিতা ও বিষ্ণুপুরাণে চতুর্দশ বিদ্যার পরিগণনার চতুর্কেলের উল্লেখ হইয়াছে (প্রথম ষণ্ডের তুমিকার দ্বিতীয় ও তৃতীয় পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। জয়ন্তভট্ট গোপথব্রাহ্মণের প্রশ্নাৎ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন যে, অথর্ববেদের যজ্ঞও উপযোগিতা আছে। অথর্ববেদবিৎ পুরোহিতকে সোমযাগে ব্রহ্মরূপে বরণ করার উপদেশ বেদে আছে। জয়ন্তভট্ট শেষে ইহাও সমর্থন করিয়াছেন যে, অথর্ববেদ ত্রয়ীবাহুও নহে, উহা “ত্রয়ী”রূপ। তিনি বলেন, অথর্ববেদে ঋক্, যজুঃ ও সাম, এই ত্রিবিধ মন্ত্রই আছে। তিনি অথর্ববেদে কোন কোন যজ্ঞবিশেষের বিম্শষ্ট উপদেশ আছে, ইহা বলিয়া কুমারিলের তত্ত্ববৃত্তিকের কথার প্রতিবাদ করিয়াছেন। মূলতঃ, অথর্ববেদ চতুর্থ বেদ, জয়ন্তভট্ট বিষ্ণু পঙ্কের সমস্ত যুক্তি ধওন করিয়া ইহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। চারি বেদের সংহিতা অংশ প্রধানতঃ মন্ত্রাত্মক। তৈত্তিরীয় সংহিতার মন্ত্র ভিন্ন ব্রাহ্মণও আছে। মন্ত্রাত্মক বেদ ভিন্ন বেদের অবশিষ্ট অংশের নাম “ব্রাহ্মণ”। পূর্বসূরীমাংসা-দর্শনে মন্তব্য জৈমিনিও “শেষে ব্রাহ্মণশব্দঃ” (২ অঃ, ১ পাদ, ৩০) এই সূত্রের দ্বারা তাহাই বলিয়াছেন। মন্ত্রত্রয়ী স্ববিগণ যেগুলি মন্ত্ররূপে বিনিয়োগে পরিয়াছেন, সেইগুলিই মন্ত্র এবং যাহার দ্বারা সেই মন্ত্র-বিনিয়োগাদি জানা যায়, সেই অংশ ব্রাহ্মণ। মন্ত্র দ্বারা যে যজ্ঞ, যে নমস্, যে কালে, যে উদ্দেশ্যে, যেভাবে কর্তব্য, তাহার বিধিপদ্ধতি ব্রাহ্মণভাগে বর্ণিত হইয়াছে। পাক্ষাত্য পণ্ডিতগণ কেবল মন্ত্রভাগকেই বেদ বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। তাহাদিগের মতে প্রথমে বেদমন্ত্রই প্রচলিত ছিল। পরে পুরোহিতগণ প্রথমে ব্রাহ্মণ ও পরে আরণ্যক এবং সূর্যশেষে উপনিষৎসমূহ রচনা করিয়াছেন, ঐগুলি বেদ নহে। মন্ত্রই বেদ; সেই মন্ত্রগুলিও তাহাদিগের মতে ঈশ্বরবাক্য বা অর্পোকষের বাক্য নহে। ভারতীয় পূর্বাচার্যগণ বেদ-বিষয়ে নানাবিধ পূর্বপক্ষের অবতারণা করিয়া যেভাবে তাহার সমাধান করিয়া গিয়াছেন, তাহা পর্যালোচনা

১। “অথ তৃতীয়েহহনীত্বাপক্ৰমতাক্রমণে পরিগণাধানে সোমযজ্ঞাথর্বয়ো বেদঃ”। ১০ প্রকরণ, ৩ প্রপাঠক। ৭ কণ্ডিকা। শতপথ। “ঋগ্বেদো যজুর্কেলঃ সামবেদ অথর্ববেদচতুর্থঃ”। ছান্দোগ্য উপনিষৎ, ৭ অঃ। ৬ খণ্ড। “অথর্বগামদ্বিঃসং প্রতীতিঃ”। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ, শেষ প্রপাঠক, ১০ অঃ। “বেদানাং যথথর্বাস্থিরনঃ”। শতপথ, ১১ অঃ, ৩ ব্রাঃ। এবং ছান্দোগ্য উপনিষৎ। ৩। ৪। ২। বৃহদারণ্যক ২। ৪। ১০। তৈত্তিরীয় ২। ৩। ১। প্রম ২। ৮। মূলক ১১। ৬ দ্রষ্টব্য।



করিলে এবং নানা ভাগে বিভক্ত বেদবাক্যগুলির পদ্যপদ্য সম্বন্ধে দৃষ্টান্ত দিলে আধুনিক-  
নিগের সিদ্ধান্ত অসার বা অমূলক বলিয়াই প্রতিপন্ন হইবে। জ্ঞানদর্শনকার জরাজীর্ণ বেদ  
বিষয়ে নানাবিধ পূর্বপক্ষের অবতারণা করিয়া, তাহার সমাধান করিয়াছেন। সাময়িকার্ঘ্য ঋগ্বেদ-  
সংহিতার ভাষ্যে উপোদ্ভূতপ্রকরণে মহর্ষি জৈমিনির পূর্ব-নীমাংসাত্মকগুলির উদ্ধার ও  
ব্যাখ্যা করিয়া বেদ-বিষয়ে নানাবিধ পূর্বপক্ষের নিরাস করিয়াছেন। অমুসন্ধিৎসু তাহা পাঠ  
করিলেন। প্রকৃত বিষয়ে বক্তব্য এই যে, যে যজ্ঞে মন্ত্রের প্রয়োগ, সেই যজ্ঞ ক্রিয়াকে করিতে  
হইবে, তাহার সমস্ত বিধিপদ্ধতি ব্রাহ্মণ-ভাগে বর্ণিত, সূত্ররাং ব্রাহ্মণ-ভাগ বাতীত যজ্ঞ সম্পাদন  
অসম্ভব। যজ্ঞাদি কর্মকলাহুসারেই নানাবিধ সৃষ্টি হইয়াছে। কর্মকলের বৈচিত্র্যবশতঃই সৃষ্টির  
বৈচিত্র্য। সূত্ররাং অনাদি কাল হইতেই যজ্ঞাদি কর্মের অমুষ্ঠান চলিতেছে, ইহাই শাস্ত্রীয়  
সিদ্ধান্ত। অতি প্রাচীন কালেও যে উদরকুপ্তে নানা যজ্ঞের অমুষ্ঠান হইয়াছে, ইহা পাশ্চাত্যগণও  
এখন আর অস্বীকার করিতে পারেন না। সূত্ররাং বেদের মন্ত্র-ভাগ ও ব্রাহ্মণ-ভাগের যেরূপ সম্বন্ধ,  
তাহাতে ব্রাহ্মণ-ভাগ পরবর্তী কালে অজ্ঞের রচিত, মন্ত্র-ভাগই কেবল মূল বেদ, এই মত নির্ভুল  
অজ্ঞতা-প্রসূত, সন্দেহ নাই। ভিন্ন ভিন্ন বেদের ভিন্ন ভিন্ন ব্রাহ্মণ আছে। যেমন ঋগ্বেদের  
ঐতরের ও কৌষীতকী ব্রাহ্মণ। কৃষ্ণ যজুর্বেদের তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ। শুক্ল যজুর্বেদের  
শতপথ ব্রাহ্মণ। সামবেদের ছান্দোগ্য ও তান্ত্র্য ব্রাহ্মণ এবং অথর্ব-বেদের গোপথ ব্রাহ্মণ।  
এইরূপ আরও অনেক ব্রাহ্মণ আছে ও অনেক ব্রাহ্মণ বিলুপ্ত হইয়াছে। প্রত্যেক ব্রাহ্মণের  
অপর ভাগ আরণ্যক ও উপনিষৎ। যেমন ঐতরের ব্রাহ্মণের ঐতরের আরণ্যক, তৈত্তিরীয়  
ব্রাহ্মণের তৈত্তিরীয় আরণ্যক ইত্যাদি। উপনিষদগুলি ঐ সকল আরণ্যকেই শেষ ভাগ।  
এ জন্ত উহাকে “বেদান্ত” বলে। অনেক আরণ্যক বিলুপ্ত হওয়ার অনেক উপনিষদও বিলুপ্ত  
হইয়াছে। আরণ্যক ও উপনিষদ বেদের জ্ঞানকাণ্ড। সংহিতা ও ব্রাহ্মণ বেদের কর্মকাণ্ড।  
যজ্ঞক্রমে কর্মকাণ্ডহুসারে কর্ম করিয়া, চিত্তশুদ্ধি সম্পাদনপূর্বক জ্ঞানকাণ্ডে অধিকারী হইতে  
হয়। জ্ঞানকাণ্ডহুসারে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া পরমপুরুষার্থ মোকলাভ হয়। এই ভাবে কর্মকাণ্ড ও  
জ্ঞানকাণ্ড-ভেদে বেদ দ্বিবিধ। কর্মকাণ্ডের অন্তর্গত ব্রাহ্মণ ভাগকে সাময়িকার্ঘ্য প্রকৃতি  
“বিধি” ও “অর্থবাদ” নামে দ্বিবিধ বলিয়াছেন। জ্ঞানদর্শনকার মহর্ষি গোতম ব্রাহ্মণ ভাগকে  
ত্রিবিধ বলিয়াছেন। গোতম যাহাকে “অমুবাদ” বলিয়াছেন, তাহাকে সকলে গ্রহণ করেন  
নাই। নীমাংসাত্মকগণ বেদকে ১। বিধি, ২। মন্ত্র, ৩। নামধেয়, ৪। নিবেদ, ৫। অর্থবাদ,  
এই পাঁচ নামে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। তাহাদিগের মতে অর্থবাদ তিন প্রকার।  
১। গুণবাদ, ২। অমুবাদ, ৩। ভূতার্থবাদ। মহর্ষি গোতম যে অর্থবাদকে চতুর্বিধ বলিয়াছেন,  
তাহাও সর্বসম্মত। পরে ইহা ব্যক্ত হইবে। ৬২।

ভাষ্য। তত্বে।

১। দ্বিবিধে গুণবাদঃ স্তাদমুবাদোহর্থবাদিতি। ভূতার্থবাস্তবজ্ঞানার্থবাদদ্বিধা নতঃ।

## সূত্র । বিধির্বিধায়কঃ ॥৬৩॥১২৬॥

অনুবাদ । তন্মধ্যে—বিধায়ক অর্থাৎ প্রবর্তক বাক্য বিধি ।

ভাষ্য । যদ্বাক্যং বিধায়কং চোদকং স বিধিঃ । বিধিস্ত নিয়োগোহনুজ্ঞা বা । যথা “ইয়িহোত্রং জুহুয়াৎ স্বর্গকামঃ” ইত্যাদি । (মৈত্র উপ । ৬।৩৬॥)

অনুবাদ । যে বাক্য বিধায়ক—কি না প্রবর্তক, তাহা বিধি । বিধি কিন্তু নিয়োগ এবং অনুজ্ঞা । যেমন “স্বর্গকাম ব্যক্তি অগ্নিহোত্র হোম করিবে” ইত্যাদি বাক্য ।

টিপ্পনী । মহর্ষি পূর্বসূত্রে বেদের ত্রিবিধ বিভাগ বলিতে যে বিধি, অর্থবাদ ও অনুবাদ বলিয়াছেন, তাহাদিগের লক্ষণ বলা আবশ্যক বুঝিয়া, যথাক্রমে তিন সূত্রের দ্বারা এই বিধি প্রকৃতি তিনটির লক্ষণ বলিয়াছেন । তন্মধ্যে এই প্রথম সূত্রের দ্বারা প্রথমোক্ত বিধির লক্ষণ বলিয়াছেন । ভাষ্যকার “তত্র” এই কথার পূরণ করিয়া সূত্রের অবতারণা করিয়াছেন । ভাষ্যকার সূত্রার্থ বর্ণন করিয়াছেন যে, যে বাক্য বিধায়ক অর্থাৎ তাহা সেই কর্মবিশেষে অপ্রবৃত্ত ব্যক্তির প্রবর্তক, তাহাই বিধিবাক্য । “স্বর্গকাম ব্যক্তি অগ্নিহোত্র হোম করিবে” ইত্যাদি বাক্য উহার উদাহরণ । এই বিধিবাক্য বাতীত কোন ব্যক্তিও এই কাম অগ্নিহোত্রে প্রবৃত্তি হইত না । এই বিধিবাক্যের দ্বারা অগ্নিহোত্র হোমকে স্বর্গরূপ ইষ্টের সাধন বুঝিয়া, স্বর্গকাম ব্যক্তি এই কর্মে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে, এ অজ্ঞ উহা বিধায়ক অর্থাৎ প্রবর্তক বাক্য, উহা বিধিবাক্য । অগ্নিহোত্র হোম স্বর্গসাধন, ইহা পূর্কোক্ত বিধিবাক্য বাতীত আর কোন প্রমাণের দ্বারা বুঝা যায় না । সুতরাং এই বাক্য অপ্রাপ্ত পদার্থের প্রাপক হওয়ার উহা বিধিবাক্য ।

ভাষ্যকার সূত্রার্থ বর্ণনপূর্বক আবার “বিধিস্ত নিয়োগোহনুজ্ঞা বা” এই কথার দ্বারা বিধিকে নিয়োগ এবং অনুজ্ঞা বলিয়াছেন । উদ্যোতকর ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে,<sup>১</sup> যে বাক্য “ইহা কর্তব্য” এইরূপে বিধান করে, তাহা নিয়োগ । যে বাক্য কর্তাকে অনুজ্ঞা করে, তাহা অনুজ্ঞা-বাক্য । পূর্কোক্ত অগ্নিহোত্র হোমবিধায়ক বাক্যই এই নিয়োগ-বাক্য ও অনুজ্ঞা-বাক্যের উদাহরণ । তাৎপর্যটীকাকর ইহা বুঝাইয়াছেন যে, অপ্রবৃত্তপ্রবর্তক এই বাক্য অগ্নিহোত্র হোমে কর্তার স্বর্গসাধনের বুঝাইয়া বিধি হইয়াছে । এই বাক্যই আবার এই অগ্নিহোত্র হোমের সাধন ত্র্যাদি লাভে প্রবৃত্তিনম্পন্ন ব্যক্তিকে অনুজ্ঞা করিতেছে । অর্থাৎ অগ্নিহোত্র-হোম-বিধায়ক পূর্কোক্ত হোম-বিধায়ক বাক্যই প্রমাণান্তরের দ্বারা অপ্রাপ্ত অগ্নিহোত্র হোমে বিধি এবং

১। যদ্বাক্যং বিধেঃ ইং বুধ্যাদিত্তি স নিয়োগঃ । অনুজ্ঞা তু সংকর্তারমমুজ্ঞানাতি তদনুজ্ঞাবাক্যং । যথাইয়িহোত্রাবাক্যমৈবতৎ সাধনাবাপ্তিশ্রবৃত্তিপূর্বকমমুজ্ঞানাতি ।—সারবার্তিক । তন্মধ্যে ত্র্যেবায়িহোত্রাদিবাক্য-মপ্রাপ্তেইয়িহোত্রাসৌ বিধিরজ্ঞাতঃ প্রাপ্তে তৎসাধনেহনুজ্ঞেতি সিদ্ধম্ । সসূক্তরে “বা” শব্দঃ ।—তাৎপর্যটীকা ।



প্রমাণান্তরপ্রাপ্ত অগ্নিহোত্র-সাধন ধন্যজ্ঞানাদি কার্যে অমুজ্ঞা। তাৎপর্যসূচীকার ভাষ্যে “বা” শব্দের অর্থ বলিয়াছেন—সমুচ্চয়। কলকথা, উচ্চোতকর ও বাচস্পতি মিশ্রের ব্যাখ্যানসারে ভাষ্যে “নিয়োগ” ও “অমুজ্ঞা” শব্দের অর্থ নিয়োগ-বাক্য ও অমুজ্ঞা-বাক্য। পূর্বোক্ত অগ্নিহোত্র গেমবিধায়ক বাক্যই ইহার উদাহরণ। বাহা বিধিবাক্য, তাহা অমুজ্ঞা-বাক্যও হয়, ইহাই “বিধিত্ত” ইত্যাদি সন্দর্ভের দ্বারা ভাষ্যকার বলিয়াছেন।

বিধিবাক্যকে যেমন “বিধি” বলা হইয়াছে (নহি পোতম এখানে তাহাই বলিয়াছেন), তদ্রূপ বিধিবাক্যে যে বিধিলিঙ্ প্রভৃতি প্রত্যয় থাকে, তাহার অর্থকেও পূর্বাচার্য্যগণ বিধি বলিয়াছেন এবং ঐ প্রত্যয়কেও বিধিপ্রত্যয় বলিয়াছেন। বিধিপ্রত্যয়ের অর্থরূপ বিধি বিষয়ে পূর্বাচার্য্যগণ বহু আলোচনা করিয়াছেন। ঐ বিষয়ে বহু মতভেদ আছে। নব্য নৈয়ায়িকগণ ইষ্টসাধনকে বিধিপ্রত্যয়ের অর্থ বলিয়া বিশেষরূপে সন্নিহন করিয়াছেন। ঐ মত নব্য নৈয়ায়িকদিগেরই উদ্ভাবিত নহে। উদয়নাচার্য্য স্মারকসূত্রগুলির পঞ্চম স্তবকে বিধি প্রত্যয়ের অর্থ বিষয়ে বহু পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়া প্রচুর আলোচনা করিয়াছেন। তিনি ইষ্টসাধনকেই বিধিপ্রত্যয়ের অর্থ, এই প্রাচীন মতের প্রকাশ করিয়া, নিজ মতে ঐ ইষ্টসাধনকেই অমুজ্ঞাপক আত্মপ্রতি-প্রত্যয়কেই বিধি-প্রত্যয়ের অর্থ বলিয়াছেন। তাহার মতে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি বিষয়ে আপ্ত বক্তার ইচ্ছাবিশেষই বিধি-প্রত্যয়ের দ্বারা বুঝা যায়। ঐ ইচ্ছাবিশেষের দ্বারা কর্তা সেই কর্ত্তের ইষ্টসাধন-কের অমুজ্ঞানরূপ জ্ঞানবশতঃ তাহাতে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। [ বিধির্জ্ঞানপ্রতিপ্রায়ঃ ” ইত্যাদি ৩ম স্তবক, ১৪শ কারিকা জটব্য ] উদয়নাচার্য্য ঐ বিধিপ্রত্যয় আত্মপ্রতিপ্রায়কে নিয়োগ শব্দের দ্বারাও প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,—বিধি, প্রেরণা, প্রবর্তনা, নিবৃত্তি, নিয়োগ, উপদেশ এইগুলি একই পদার্থ। অর্থাৎ বিধি বুঝাইতে ঐ সকল শব্দের প্রয়োগ হয়। বেদে বিধিবাক্যে যে বিধিলিঙ্ প্রভৃতি প্রত্যয় আছে, তদ্বারা বধন কোন আপ্ত ব্যক্তির ইচ্ছা-বিশেষই বুঝা যায়, তখন ঐ বাক্যবক্তা কোন আপ্ত ব্যক্তি আছেন, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য। অতঃ কোন আপ্ত ব্যক্তি বেদবক্তা হইতে পারেন না, সুতরাং নিত্য সর্বজ্ঞ ঈশ্বরই বেদের বক্তা স্বীকার্য্য, ইহাই উদয়নের সেখানে মূলকথা<sup>১</sup>। প্রকৃত বিষয়ে কথা এই যে, উদয়ন যে বিধিপ্রত্যয়ের অর্থকে নিয়োগ শব্দের দ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন, ঐ নিয়োগ শব্দের অর্থ আপ্ত বক্তার অতিপ্রায়। ভাষ্যকার “বিধিত্ত” ইত্যাদি সন্দর্ভের দ্বারা বিধি-প্রত্যয়ের অর্থরূপ বিধিকে ঐরূপ নিয়োগ এবং কমান্বরে অমুজ্ঞা বলিয়াছেন কি না, ইহা চিত্তনীয়। বিধিপ্রত্যয়ের অর্থরূপ বিধি বিষয়ে নানা আলোচনা ও নানা মতভেদ সূত্রিকাল হইতেই হইয়াছে। পূর্বাচার্য্যগণের

১। জিহাধিপ্রত্যয়ঃ হি পুত্রবৎসোরেননিরোধার্থী ভবন্তস্ত্য প্রতিপাদয়ন্তি। অত্য়াবন্ত জ্ঞানঃ প্রবর্তকননীবিজ্ঞাঃ প্রাপ্তে সৌধবিশেষ্যঃ তল জ্ঞাপকে বাহুবিশেষ্যে বিধিঃ প্রেরণা প্রবর্তনা নিবৃত্তিঃ নিয়োগ উপদেশ ইত্যন্বাধ্বরাংসি হি তে বিভাষ্যতে।—কুহবাজলি, ৪ম স্তবক, ১৪ কারিকা বাখ্যা জটব্য। নিয়োগোহতিপ্রায়ঃ অন্তথাঃ লিঙার্থে বাধকত্ব বক্তব্যাদিত্যর্থঃ।—প্রকাশসূচী।

উহা একটি প্রধান বিচার্য ছিল। ভাষ্যকার প্রথমে হুত্বাহুসারে বিধিবাক্যের লক্ষণ ব্যাখ্যা করিয়া, পরে আবার “বিধিভ” ইত্যাদি সন্দর্ভের দ্বারা বিধি-প্রত্যয়ের অগবিধয়ে নিম্ন-মত ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন কি না, এবং তাঁহার পূর্বোক্ত বিধিবাক্য বিধিপ্রত্যয়ের দ্বারা নিয়োগ অর্থাৎ আপ্তাভিপ্রায় বুঝাইয়া তদ্বারা ইষ্টসাধনত্বের অহমাপক হইয়া প্রসূক্ত হয়, এই আপ্তাভিপ্রায় তদ্বারা প্রকাশ করিয়া, তাঁহার পূর্বোক্ত কথায়ই সমর্থন করিয়াছেন কি না, ইহা সুবীণন উপেক্ষা না করিয়া, চিন্তা করিবেন। নিয়োগ অর্থাৎ আপ্তাভিপ্রায়ই বিধিপ্রত্যয়ের অর্থ, এই মত উদয়ন বিশেষরূপে সমর্থন করিয়াছেন। নব্যগণ উহাতে দোষ প্রদর্শন করিলেও ভাষ্যকারের উহাই মত ছিল, ইহা বুঝিবার কোন বাধা নাই। ভাষ্যকার কল্পাস্তরে সর্বত্রই অমুজ্ঞাকে বিধি-প্রত্যয়ের অর্থ বলিয়াছেন, ইহা বুঝিবারও কোন কারণ নাই। কোন স্থানে অমুজ্ঞাও বিধি-প্রত্যয়ের দ্বারা বুঝা যায়, ইহা ভাষ্যকার বলিতে পারেন। উদয়ন অমুজ্ঞাকেও ইচ্ছা-বিশেষ বলিয়া, কোন স্থলে উহাও লিঙ-বিতক্তির দ্বারা বুঝা যায় ইহা বলিয়াছেন। মূল কথা, উদয়নাচার্যের গ্রন্থাহুসারে ভাষ্যকারের “বিধিভ” ইত্যাদি সন্দর্ভের পূর্বোক্তরূপ ব্যাখ্যা করা যায় কি না, তাহা সুবীণন চিন্তা করিবেন। উক্তোক্তকর ও বাচস্পতির কথা প্রথমেই বলিয়াছি। নব্বি গোতম তাঁহার পূর্বহুত্রোক্ত বিধিবাক্যের লক্ষণ বলিয়াছেন, কিন্তু উহার কোন বিভাগ বা বিশেষ লক্ষণ বলেন নাই। এখানে তাহা বলা তাঁহার আবশ্যক নহে। সোমংসাত্ম্যগণ (১) উৎপত্তিবিধি, (২) অধিকারবিধি, (৩) বিনিয়োগবিধি ও (৪) প্রয়োগবিধি, এই চারি নামে বিধিবাক্যকে চতুর্বিধ বলিয়াছেন। নিয়মবিধি ও পরিসংখ্যাবিধি প্রভৃতি পূর্বোক্ত চতুর্বিধ বিধির অন্তর্ভুক্ত। সোমংসা-শাস্ত্রে পূর্বোক্ত বিভিন্ন প্রকার বিধিবাক্যের লক্ষণ ও উদাহরণ দ্রষ্টব্য ৬৩।

সূত্র । স্তুতিনিন্দা পরকৃতিঃ পুরাকল্প

ইত্যর্থবাদঃ ॥৬৪॥১২৫॥

অমুবাদ । স্তুতি, নিন্দা, পরকৃতি, পুরাকল্প এইগুলি অর্থবাদ অর্থাৎ বেদের ঐ সকল বাক্যকে অর্থবাদ বলে।

ভাষ্য । বিধেঃ কলবাদলক্ষণা যা প্রশংসা, সা স্তুতিঃ সম্প্রত্যয়ার্থী,— স্তুয়মানং প্রদধোতেতি । প্রবর্তিকা চ, কলপ্রবণাং প্রবর্ত্যতে “সর্বজিতা বৈ দেবাঃ সর্বমজয়ন্ত সর্বস্রষ্টাঃ সর্বস্র জিতৈ, সর্বমোবৈতেনাপ্রোতি সর্বা জয়ন্তী”ত্যেবমাদি । ( তাণ্ড্য ব্রাঃ ১৬।৭।২ ) ।

অনিষ্টকলবাদো নিন্দা বর্জনমর্থী, নিন্দিতং ন সমাচরেদিতি । “এষ বাব



প্রথমো যজ্ঞো যজ্ঞানাং ( যজ্ঞজ্যোতিষ্ঠৌমো ) য এতেনানিক্ৰীধাহন্তেন  
যজ্ঞতে গৰ্ভপত্যমেব তজ্ জীয়তে বা প্র বা মীয়তে” ইত্যেবমাদি<sup>১</sup>।

অন্যকৰ্ত্তৃকস্ত ব্যাহতস্ত বিধেৰ্বাদঃ পরকৃতিঃ, “ছত্বা বপামেবাগ্ৰেহভি-  
ঘারয়ন্তি অথ পৃষদাজ্যং, তদুহ চরকাধ্বৰ্য্যবঃ পৃষদাজ্যমেবাগ্ৰেহভিঘারয়ন্তি,  
অগ্নেঃ প্রাণাঃ পৃষদাজ্যস্তোমমিত্যেবমভিদধতী”ত্যেবমাদি।

ঐতিহ্যসমাচরিতো বিধিঃ পুরাকল্প ইতি। “তস্মাদ্ বা এতেন পুরা  
ব্রাহ্মণা বহিষ্পবমানং সামস্তোমমন্তৌষন্ যোনে যজ্ঞং প্রতনবামহে”  
ইত্যেবমাদি।

কথং পরকৃতিপুরাকল্পাবৰ্থবাদাবিতি, স্তুতিনিন্দাবাক্যোন্নিভিসম্বন্ধাদ-  
বিধ্যাশ্রয়স্ত কস্তচিদর্থস্ত দ্যোতনাদর্থবাদাবিতি।

অনুবাদ। বিধিবাক্যের ফলকথনরূপ যে প্রশংসা, সেই স্তুতি সম্প্রত্যয়ার্থ অর্থাৎ  
শ্রদ্ধার্থ ( কারণ ) স্তুয়মানকে শ্রদ্ধা করে এবং ( সেই স্তুতি ) প্রবর্তিকা অর্থাৎ  
প্রযুক্তিরও প্রয়োজক। ( কারণ ) ফল শ্রবণবশতঃ প্রবৃত্ত হয়। ( উদাহরণ ) “সর্বজিৎ  
যজ্ঞের দ্বারা দেবগণ সমস্ত জয় করিয়াছেন, সকলের প্রাপ্তির নিমিত্ত, সকলের জয়ের  
নিমিত্ত, ইহার দ্বারা সমস্তই প্রাপ্ত হয়, সমস্তই জয় করে” ইত্যাদি।

অনিষ্ট-ফল-কথনরূপ নিন্দা বর্জ্জনার্থ, ( কারণ ) নিন্দিতকে আচরণ করে না।  
( উদাহরণ ) “এই যজ্ঞই যজ্ঞের মধ্যে প্রথম, ( যাহা জ্যোতিষ্ঠৌম, ) যে ব্যক্তি এই  
যজ্ঞ না করিয়া অন্য যজ্ঞ করে, সেই ব্যক্তি গৰ্ভপতনের ত্ৰায় জীর্ণ হয় অথবা  
মৃত হয়” ইত্যাদি।

অন্য কৰ্ত্তৃক ব্যাহত বিধির অর্থাৎ বিরুদ্ধ অনুষ্ঠানের কথন পরকৃতি।  
( উদাহরণ ) “হোম করিয়া ( শুক্ল যজুৰ্বেদজ্ঞত ঋত্বিজগণ ) অগ্নে বপাকেই অর্থাৎ

১। তাহাে মহাব্রাহ্মণের ১৩শ অধ্যায়ের ১ম খণ্ডে (২) এইরূপ কৃতি দেখা যায়। ভাষ্যকার দ্বারপ ব্যাখ্যা  
করিয়াছেন “অধ্যায়েন” যজ্ঞকর্তৃনা যজ্ঞতে “তব” ন যজ্ঞমানঃ গৰ্ভপত্যং গৰ্ভপতনং বধা ভবন্তি তথৈব জীর্ণত,  
জীবনমোহনাবিতি ধাতুঃ। অথবা প্রমীয়তে ত্রিভুক্ত। নীমান্দোদর্শনের দ্বিতীয়খণ্ডের চতুর্থপাদের অষ্টম পুত্রের  
শবর ভাষ্যেও এইরূপ কৃতি উদ্ধৃত হইয়াছে। ইতরং প্রচলিত ভাষ্যশুল্বে উদ্ধৃত কৃতি পাঠ গৃহীত হইল না।  
এখানে ভাষ্যকারের উদ্ধৃত কৃত্ত দুইটি কৃতি অনুসন্ধান করিয়াও পাই নাই। শতপথব্রাহ্মণের শেষ ভাষ্যে  
অনুসন্ধান।

(যজ্ঞীয় পশুর মেদকেই) অভিধারণ করেন, অনন্তর পৃথদাজ্য (দধিযুক্তবৃত্ত) অভিধারণ করেন, তাহাতে চরকাধব্যাগণ (কৃষ্ণ বজ্রবেদজ্ঞাধ্বিকগণ) পৃথদাজ্যকেই অগ্নে অভিধারণ (করেন), পৃথদাজ্যস্তোম অগ্নির প্রাণ এইরূপ বলেন" ইত্যাদি।

ঐতিহ্যবশতঃ সমাচরিত বিধি (৪) পুরাকল্প। (উদাহরণ) "অন্তএব ইহার দ্বারা পূর্বকালে ব্রাহ্মণগণ বহিষ্পবমান সামস্তোমকে (সামবেদীয় মন্ত্রবিশেষকে) স্তব করিয়াছিলেন, বাহার দ্বারা (আমরা) যজ্ঞ করিতেছি" ইত্যাদি।

(পূর্বপক্ষ) পরকৃতি ও পুরাকল্প অর্থবাদ কেন? অর্থাৎ উদাহৃত পরকৃতি ও পুরাকল্প নামক বাক্যদ্বয় বিধায়ক বাক্য হইয়া বিধি হইবে না কেন? (উত্তর) স্মৃতি ও মিন্দাবাক্যের সহিত সম্বন্ধবশতঃ বিধিবাক্যাশ্রিত কোন অর্থের প্রকাশ করে বলিয়া (পরকৃতি ও পুরাকল্প) অর্থবাদ।

টিপ্পনী। মহর্ষি অর্থবাদের বিভাগ করিয়াই তাহার লক্ষণ সূচনা করিয়াছেন। স্মৃতি স্মৃতি প্রভৃতির অন্ততমবহি অর্থবাদের সামান্য লক্ষণ। যে সকল অর্থবাদ বিবিশেষ, বিধিবাক্যের সহিত বাহাদিগের একবাক্যতা আছে, মহর্ষি তাহাদিগেরই স্মৃতি প্রভৃতি নামে বিভাগ করিয়া, পূর্বেক্তরূপ লক্ষণ সূচনা করিয়াছেন। তদাধো যে বাক্য বিধির আবক, যদ্বারা বিধির ফল কীর্তন করা হইয়াছে, তাহাই স্মৃতি বা স্মৃত্যর্থবাদ। ফলকথা, বিধ্যর্থের প্রশংসাপর বাক্যই স্মৃতিনামক অর্থবাদ। ঐ স্মৃতির ছুটি উপযোগিতা আছে। বিধির দ্বারা প্রবৃত্তি জন্মে, কিন্তু স্মৃতির দ্বারা সেই কর্মকে প্রশস্ত বলিয়া বুকিলে প্রবর্তমান পুরুষ অধিকতর প্রবৃত্তিসম্পন্ন হইয়া থাকেন। সুতরাং বিধির কার্য প্রবৃত্তিতে ঐ স্মৃতির সহকারিতা আছে। ভাষ্যকার "প্রবর্তিকা চ" এই কথা দ্বারা ঐ স্মৃতির পূর্বেক্ত প্রকারে (১) বিধিসহকারিতা প্রকাশ করিয়াছেন এবং শ্রদ্ধাবান ব্যক্তিরই প্রবৃত্তিজন্ম ধর্ম হয়, শ্রদ্ধাহীনের তাহা হয় না; সুতরাং প্রবৃত্তির কার্য ধর্মে শ্রদ্ধার সহকারিতা আছে। স্মৃতির দ্বারা সূচ্যমান বিষয়ে শ্রদ্ধা জন্মে, সুতরাং স্মৃতি ঐ শ্রদ্ধার নিমিত্ত হইয়া প্রবৃত্তির কার্য ধর্মে সহকারী হয়। ভাষ্যকার প্রথমে "স্তূয়মানং শ্রদ্ধবীত" এই কথা দ্বারা স্মৃতির এই (২) উপযোগিতা সমর্থন করিয়াছেন। "সর্কজিৎ যজ্ঞ করিবে," এইরূপ বিধিবাক্যের পরে "দেবগণ সর্কজিৎ যজ্ঞের দ্বারা সমস্ত জয় করিয়াছেন" ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা ঐ যজ্ঞের প্রশংসা বা ফল কীর্তন করায় বেদের ঐ বাক্য স্মৃত্যর্থবাদ।

অনিষ্ট ফলের কীর্তন "নিন্দা" নামক দ্বিতীয় অর্থবাদ। নিন্দা করিলে, সেই নিন্দিত কর্ম করিবে না, তাহা বর্জন করিবে, সেই বর্জ্যার্থ নিন্দা করা হইয়াছে। "জ্যোতিষ্ঠোম যজ্ঞ করিবে" এইরূপ বিধিবাক্য বলিয়া, "জ্যোতিষ্ঠোম যজ্ঞ যজ্ঞের মধ্যে প্রথম, যে ব্যক্তি



এই যজ্ঞ না করিয়া অল্প যজ্ঞ করে, সে জীর্ণ বা মৃত হয়" ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞ না করিয়া, অল্প যজ্ঞের অল্পত্বানের নিন্দা করায়, এই বাক্য নিন্দার্থবাদ।

অল্প কর্তৃক ব্যাহত বিধির কথন, অর্থাৎ কৰ্ম্মবিশেষের পুরুষবিশেষগত পরস্পর বিরুদ্ধ বাদ "পরকৃতি" নামক তৃতীয় অর্থবাদ। যেমন বেদবাক্য আছে যে, "অগ্নে বপার অভিধারণ করিয়া, পরে পৃথক্‌গো। অভিধারণ করেন। কিন্তু চরকাধ্বযুগল পৃথক্‌জ্যেই অগ্নে অভিধারণ করেন।" এখানে চরকাধ্বযুগল অল্প ঋত্বিক পুরুষ হইতে বিপরীত আচরণ করেন, ইহা বলায় পুরুষবিশেষগত এই পরস্পর বিরুদ্ধ বাদ "পরকৃতি" নামক অর্থবাদ। ঋত্বিকগণের মধ্যে বাহারা যজুর্বেদজ্ঞ, তাহারা যজুর্বেদেরই প্রয়োগ করিবেন, তাহাদিগের নাম "অধ্বযু"। কৃষ্ণ যজুর্বেদের শাখাবিশেষের নাম "চরকা"। তদনুসারে কৰ্ম্মকারী ঋত্বিকদিগকে "চরকাধ্বযু" বলা যায়।

ঐতিহ্য অর্থাৎ জনশ্রুতিরূপে প্রসিদ্ধ ব্যক্তির আচরিত বলিয়া যে কীর্তন, তাহা পুরাকল্প নামক চতুর্থ অর্থবাদ। যেমন বেদবাক্য আছে,—"ব্রাহ্মণগণ পূর্বকালে বহিষ্পবমান সামন্তোমকে (সামবেদীয় মন্ত্রবিশেষের সমষ্টি) স্তব করিয়াছিলেন।" এখানে জনশ্রুতিরূপে পূর্বকালে ব্রাহ্মণগণের সামন্তোম মন্ত্রের স্ততির এই ভাবে কীর্তন "পুরাকল্প" নামক অর্থবাদ। ভাষ্যকার "পরকৃতি" ও "পুরাকল্পের" বৈরূপ স্বরূপ ও উদাহরণ বলিয়াছেন, তাহা সকলে বলেন নাই। উদাহতে পূর্বাচাৰ্য্যগণের মধ্যে মতভেদ বুঝা যায়। ভট্ট কুমারিল পরকৃতি ও পুরাকল্পের ভেদ বলিয়াছেন যে, এক পুরুষ কর্তৃক উপাখ্যান "পরকৃতি"। বহু পুরুষ কর্তৃক উপাখ্যান "পুরাকল্প"। দুই পুরুষ কর্তৃক উপাখ্যানেও পুরাকল্প হইবে, ইহা ভট্ট সোমেশ্বর ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

ভাষ্যকার যুক্তোক্ত চতুর্বিধ অর্থবাদের স্বরূপ ও উদাহরণ বলিয়া, পরে পূর্বপক্ষের অবতারণা করিয়াছেন যে, "পরকৃতি" ও "পুরাকল্প" অর্থবাদ হইবে কেন? তাৎপর্য্যটীকার পূর্বপক্ষের তাৎপর্য্য বর্ণন করিয়াছেন যে, বপাহোম এবং পৃথক্‌জ্যের অভিধারণ বধাক্রমে বিহিত আছে। বপাহোম করিয়াই পৃথক্‌জ্যের অভিধারণ কর্তব্য। কিন্তু ভাষ্যকারের উদাহৃত পরকৃতিবাক্যে চরকাধ্বযু পুরুষের সম্বন্ধ শ্রবণশব্দতঃ উহা সেই পুরুষের পক্ষে ক্রমভেদের বিধায়ক হইয়া বিধিব্যাক্যই হইবে। চরকাধ্বযুগল অগ্নে পৃথক্‌জ্যের অভিধারণ করিবেন, তাহাদিগের পক্ষে এই ক্রমভেদ প্রমাণান্তরের দ্বারা অপ্রাপ্ত। সুতরাং এই বাক্যই এই অপ্রাপ্ত ক্রমভেদকে চরকাধ্বযু পুরুষবিশেষের দ্বন্দ্বরূপে বিধান করিয়া বিধিব্যাক্যই কেন হইবে না? উহা অর্থবাদ হইবে কেন? এবং ভাষ্যকারের উদাহৃত পুরাকল্পবাক্যে বহিষ্পবমান সামন্তোম মন্ত্র সম্বন্ধ পূর্বকালীন পুরুষের বলিঙ্গ শ্রবণ করা খাইতেছে। সুতরাং এই বাক্য এই মন্ত্র-সম্বন্ধকে ইদানীন্তন পুরুষের দ্বন্দ্বরূপে বিধান করিয়াছে। অর্থাৎ ইদানীন্তন ব্রাহ্মণগণ এই সামন্তোম মন্ত্রকে স্তব করিবেন, এইরূপ বিধান করিয়াছে। তাহা হইলে এই পুরাকল্পবাক্য ঐকপে বিধায়ক হওয়ার বিধিব্যাক্যই কেন হইবে না, উহা অর্থবাদ হইবে কেন? এতদ্ভিন্ন ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, স্ততিবাক্য বা নিন্দাবাক্যের সহিত সম্বন্ধপ্রযুক্ত কোন



অর্থবিশেষের প্রকাশ করার পরকৃতি ও পুরাকল্প অর্থবাদ বলিয়াই কথিত হইয়াছে। অর্থাৎ উহাও কোন বিশিষ্ট শেবভূত স্ততি বা নিন্দাবাক্যের সম্বন্ধবশতঃ তাহারই দ্বারা বিদ্যাস্থিত অর্থবিশেষের প্রকাশ করার স্ততি ও নিন্দার দ্বারা অর্থবাদ। তাৎপর্য্যটীকাকার ইহার গুঢ় তাৎপর্য্য বর্ণন করিয়াছেন যে, ঐ সমস্ত বাক্যে বিশিষ্টবর্ণনাই—উহা সিদ্ধ পরার্থের বোধক বাক্য। ঐ স্থলে অশ্রয়মাণ বিধি করনা করা অপেক্ষার পূর্বজ্ঞাত বিধিবাক্যের সহিত একবাক্যতা করা পক্ষেই লাভব। অশ্রয়মাণ বিধি করনা করিলে তাহার সহিত ঐ বাক্যের একবাক্যতা করনাও করিতে হইবে। তাহা হইলে এ পক্ষে বিধিকরনা ও তাহার একবাক্যতা করনা, এই উভয় করনা করিতে হয়; কিন্তু উভয়পক্ষে কেবলমাত্র প্রতীত বিধির সহিত একবাক্যতা করনা করিতে হয়। সুতরাং বিধিকরনা না করা পক্ষেই লাভব। ঐ লাভববশতঃ ঐ পক্ষই সিদ্ধান্ত হওয়ায়—পরকৃতি ও পুরাকল্প অর্থবাদ, উহা বিধায়ক না হওয়ার বিধি নহে। পরকৃতি ও পুরাকল্পেও গুঢ়ভাবে স্ততি ও নিন্দা আছে, কিন্তু ক্ষুদ্রতর স্ততি ও নিন্দার প্রতীতি না হওয়ার স্ততি ও নিন্দা হইতে পরকৃতি ও পুরাকল্পের পৃথগভাবে উল্লেখ হইয়াছে, ইহাও তাৎপর্য্যটীকাকার বলিয়াছেন।

নীমাংসার্চ্যগণ (১) গুণবাদ, (২) অণুবাদ, (৩) ভূতার্থবাদ, এই নামদ্বয়ে অর্থবাদকে সামান্ততঃ ত্রিবিধ বলিয়াছেন। যেখানে বখাস্কৃত বেদার্থ প্রমাণাস্তরবিরুদ্ধ, সেখানে সাদৃশ্য-সম্বন্ধরূপ গুণযোগবশতঃ ঐ বেদবাক্য গুণবাদ। যেমন বেদে আছে,—“যজমানঃ প্রস্তরঃ,” “আদিত্যো যুগঃ” ইত্যাদি। প্রস্তর শব্দের অর্থ আন্তর্য্যকূশ। যজমান পুরুষ প্রস্তর নহেন, যুগও আদিত্য নহে, ইহা প্রত্যক প্রমাণসিদ্ধ। সুতরাং ঐ বেদার্থ প্রত্যক প্রমাণ-বিরুদ্ধ। এজন্য ঐ স্থলে প্রস্তর শব্দ ও আদিত্য শব্দের যথাক্রমে প্রস্তরদৃশ এবং আদিত্যদৃশ অর্থে লক্ষণা বুদ্ধিতে হইবে। যজমান প্রস্তরদৃশ অর্থাৎ প্রস্তর যেমন যজ্ঞাপ, তদ্রূপ যজমানও যজ্ঞাপ এবং যুগ সূর্যের দ্বারা উজ্জ্বল, ইহাই ঐ স্থলে ঐ বেদবাক্যের অর্থ। শব্দের সুখ্যার্থের সাদৃশ্য সম্বন্ধকে “গুণ” বলা হইয়াছে। সেই গুণরূপ অর্থের কখনই গুণবাদ। পূর্বোক্ত সাদৃশ্যবিশেষবোধক পারিভাষিক “গুণ” শব্দ হইতেই “গৌণ” শব্দ প্রসিদ্ধ হইয়াছে। প্রমাণাস্তরের দ্বারা যাহা অবধারণিত আছে, তাহার কখনই অণুবাদ। যেমন বেদে আছে,—“অগ্নির্মিত্র ভেবন্নম্”। অগ্নি যে হিমের ঔষধ, ইহা অস্ত্র প্রমাণেই অবধারণিত আছে, সুতরাং তাহাই ঐ বাক্যের দ্বারা প্রকাশ করার উহা অণুবাদ। পূর্বোক্ত প্রমাণাস্তরবিরোধ ও প্রমাণাস্তরের দ্বারা অবধারণ না থাকিলে সেইরূপ স্থগীর অর্থবাদ (৩) ভূতার্থবাদ। যেমন বেদে আছে,—“ইন্দ্রো বুভার বজ্রমুদযচ্ছৎ।” অর্থাৎ ইন্দ্র বুভোর প্রতি বজ্র উন্মাত করিয়া-  
ছিলেন। এইরূপ উপনিষদ্ বা বেদান্তবাক্যগুলিও ভূতার্থবাদ। নীমাংসকগণ বেদের অর্থবাদ-  
গুলিকে অপ্রমাণ বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন নাই; উহা তীর্থাদিগের পূর্বপক্ষ। নীমাংসাত্মককার  
মধ্বি জৈমিনির পূর্বপক্ষ-স্বত্বকে সিদ্ধান্তস্বত্বরূপে বুদ্ধিতে ঐরূপ ভ্রম হইয়া থাকে।  
নীমাংসার্চ্যগণ বিধি বা নিষেধের সহিত একবাক্যতাবশতঃই অর্থবাদের প্রামাণ্য স্বীকার



করিয়াছেন। সান্নাভূতঃ অর্থবাদকে ত্রিবিধ বলিলেও নীমাংসকগণ শিষ্য-হিতের জন্ত আরও  
বহু প্রকারে অর্থবাদের বিভাগ করিয়াছেন। নীমাংসাত্তিকার বেদের ত্রাক্ষণভাগকে বহু  
প্রকারে বিভক্ত করিয়াছেন। ভাষাকার শবর স্বামীও সেগুলির উল্লেখ করিয়াছেন। মহাবি  
গোতমোক্ত চতুর্বিধ অর্থবাদও তাহার মধ্যে কথিত হইয়াছে। ( পূর্বনীমাংসাদর্শন, ২ অঃ,  
১ পাদ, ৫৩ সূত্রের শবরভাষ্য ও “নীমাংসাবলপ্রকাশ” প্রভৃতি গ্রন্থে দ্রষ্টব্য ) ॥ ৬৪ ॥

**সূত্র ।** বিধিবিহিতস্থানুবচনমনুবাদঃ ॥ ৬৫ ॥ ১২ ৬ ॥

অনুবাদ । বিধি ও বিহিতের অনুবচন অর্থাৎ বিধানুবচন (শব্দানুবাদ) ও  
বিহিতানুবচন ( অর্থানুবাদ )—অনুবাদ ।

ভাষ্য । বিধানুবচনশব্দানুবাদো বিহিতানুবচনঞ্চ । পূর্বঃ শব্দানু-  
বাদোহপ্যরোহর্থানুবাদঃ । যথা পুনরুক্তঃ দ্বিবিধমেবমনুবাদোহপি ।  
কিমর্থঃ পুনর্বিহিতমনুদ্যতে ? অধিকারার্থঃ, বিহিতমধিকৃত্য স্তুতির্বোধ্যতে  
নিন্দা বা, বিধিশেষো বাহস্তিধীরতে । বিহিতানন্তরার্থোহপি চানুবাদো  
ভবতি, এবমন্তদপ্যুৎপ্রেক্ষণীয়ম্ ।

লোকেহপি চ বিধিরর্থবাদোহনুবাদ ইতি চ ত্রিবিধং বাক্যম্ । “ওদনং  
পচে”দिति বিধিবাক্যম্ । অর্থবাদবাক্য “মায়ুর্বর্ষো বলং যুখং প্রতিভান-  
কায়ৈ প্রতিষ্ঠিতম্ ।” অনুবাদঃ “পচতু পচতু ভবানি”ত্যভ্যাসঃ, ক্ষিপ্রং  
পচ্যতামিতি বা, অল্প পচ্যতামিত্যধ্যেষার্থঃ, পচ্যতামেবেতি বাহবধারণার্থম্ ।

যথা লৌকিকে বাক্যে বিভাগেনার্থগ্রহণাৎ প্রমাণত্বং এবং বেদ-  
বাক্যানামপি বিভাগেনার্থগ্রহণাৎ প্রমাণত্বং ভবিতুমর্হতীতি ।

অনুবাদ । বিধানুবচনও অনুবাদ, বিহিতানুবচনও অনুবাদ । প্রথমটি ( বিধানু-  
বচন ) শব্দানুবাদ, অপরটি ( বিহিতানুবচন ) অর্থানুবাদ । যেমন পুনরুক্ত দ্বিবিধ,  
এইরূপ অনুবাদও দ্বিবিধ । ( প্রশ্ন ) কি নিমিত্ত বিহিতকে অনুবাদ করা হয় ?  
( উত্তর ) অধিকারের নিমিত্ত ; বিহিতকে অধিকার করিয়া স্তুতি অথবা নিন্দা জ্ঞাপন  
করা হয়,—অথবা বিশেষে অভিহিত হয় । বিহিতের অনন্তরার্থও অর্থাৎ বিহিতের  
আনন্তর্য্য বিধানের নিমিত্তও অনুবাদ হয় । এইরূপ অন্তও উৎপ্রেক্ষা করিবে ।  
অর্থাৎ বিহিতের অনুবাদের প্রয়োজন আরও আছে, তাহা বুঝিয়া লইবে ।

লোকেও বিধি, অর্থবাদ ও অনুবাদ, এই ত্রিবিধ বাক্য আছে । ( উদাহরণ ) “ওদন  
পাক করিবে” ইহা বিধিবাক্য । “মায়ু, তেজঃ, বল, যুখ এবং প্রতিভা ( বুদ্ধিবিশেষ )

অঙ্গে প্রতিষ্ঠিত” ইহা অর্থবাদবাক্য। “আপনি পাক করুন, পাক করুন” এই অভ্যাস (পুনরুক্তি) শীঘ্র পাক করুন—এই নিমিত্ত, অথবা পুনর্ব্যবহার পাক করুন, এইরূপে অধ্যেষণার্থ, অথবা পাকই করুন—এইরূপ অবধারণার্থ অমুবাদ।

যেমন লৌকিক বাক্যে বিভাগপ্রযুক্ত অর্থবিশেষের বোধবশতঃ প্রামাণ্য, এইরূপ বেদবাক্যসমূহেরও বিভাগপ্রযুক্ত অর্থবিশেষের বোধবশতঃ প্রামাণ্য হইতে পারে।

টিপ্পনী। সূত্রে “অমুবচনং” এই কথার দ্বারা মহর্ষি অমুবাদের লক্ষণ সূচনা করিয়াছেন। অমুবচন বলিতে পশ্চাত্তখন বা পুনর্জন্ম। উহা সপ্রয়োজন হইলেই তাহাকে অমুবাদ বলে। সূত্রার্থ “সপ্রয়োজনম্বে সতি” এই বাক্যের পূরণ করিয়া, মহর্ষি-কথিত অমুবাদের লক্ষণ ব্যাখ্যা করিতে হইবে। সূত্রোক্ত “অমুবচনং” সপ্রয়োজনম্বে বিশেষণ মহর্ষির বিবক্ষিত আছে, ইহা পূর্ববর্তী সূত্রের দ্বারাও প্রকটিত হইয়াছে। অমুবাদ দ্বিবিধ, ইহা বলিতে মহর্ষি বলিয়াছেন, “বিধিবিহিতস্ত”। সূত্রের ঐ বাক্য সমাহার দ্বন্দ্ব সমাস। বিধির অমুবচন ও বিহিতের অমুবচন অমুবাদ। শব্দামুবাদকে বলিয়াছেন—বিধ্যমুবচন এবং অর্থামুবাদকে বলিয়াছেন—বিহিত্যমুবচন। পুনরুক্তও যেমন শব্দ-পুনরুক্ত ও অর্থ-পুনরুক্ত-ভেদে দ্বিবিধ, অমুবাদও পূর্কোক্তরূপে দ্বিবিধ। “অনিত্যোহনিত্যঃ” এইরূপ বাক্য বলিলে তাহা শব্দ-পুনরুক্ত। কারণ, “অনিত্য” শব্দই পুনর্ব্যবহার কথিত হইয়াছে। “অনিত্যো নিরোধধর্মকঃ” এইরূপ বাক্য বলিলে তাহা অর্থ-পুনরুক্ত। কারণ, ঐ বাক্যে অনিত্য শব্দই পুনর্ব্যবহার কথিত হয় নাই, কিন্তু অনিত্য বলিয়া পরে “নিরোধধর্মক” শব্দের দ্বারা ঐ অনিত্যরূপ অর্থেরই পুনরুক্তি করা হইয়াছে। “নিরোধ অর্থঃ বিনাশ অনিত্য পদার্থের ধর্ম; সূত্রার্থ বাহ্য অনিত্য, তাহাই নিরোধ-ধর্মক। পূর্কোক্ত বাক্যে ঐ একই অর্থের পুনরুক্তি হওয়ার উহা অর্থ-পুনরুক্ত। এইরূপ “বটো বটঃ” এইরূপ বাক্য শব্দ-পুনরুক্ত। “বটঃ কলসঃ” এইরূপ বাক্য অর্থ-পুনরুক্ত। এইরূপ পূর্কোক্ত একাদশ সামিধেনীর মধ্যে প্রথম ও উত্তমার তিনবার পাঠরূপ যে অভ্যাস, তাহা শব্দামুবাদ। কারণ, সেখানে সেই মতরূপ শব্দেরই পুনরুক্তি হয়। ঐ স্থলে বেদের আদেশানুসারে একাদশ সামিধেনীর পঞ্চদশম সম্পাদন করিতে ঐ পুনরুক্তি করিতে হয়, সূত্রার্থ উহা সপ্রয়োজন বলিয়া অমুবাদ, উহা পুনরুক্ত নহে। এইরূপ প্রয়োজনবশতঃ বিহিতের অমুবচন হইলে তাহা অর্থামুবাদ। বেদে ইহার বহু উদাহরণ আছে। বিহিতের অমুবচনের প্রয়োজন কি? প্রয়োজন না থাকিলে তাহা ত অমুবাদ হইতে পারে না, তাহা পুনরুক্তই হয়। এই প্রশ্নের উত্তরে ভাষ্যকার বলিয়াছেন, “অধিকারার্থঃ” অর্থঃ বিহিতকে অধিকার করার জন্য তাহার অমুবচন বা পুনরুক্তি হইয়াছে। বিহিতকে অধিকার করার প্রয়োজন কি? তাই শেষে বলিয়াছেন যে, বিহিতকে অধিকার বা উদ্দেশ্য করিয়া তত্ত্ব অথবা নিন্দা জ্ঞাপন করা হয়, অথবা বিধিবেশ অভিহিত হয়। যেমন বিধি আছে,—“অখমেনে বজ্জত” অখমেনে বজ্জ করিবে। এই বিধির অর্থবাদ,—“তত্ত্বত মৃত্যুং, তত্ত্বত পাপ্যানং যোহম্মেনে বজ্জত” অর্থঃ যে ব্যক্তি অখমেনে বজ্জ করে, সে মৃত্যু উত্তীর্ণ হয়, পাপ উত্তীর্ণ হয়। এখানে পূর্কোক্ত বিধিবাক্যের দ্বারাই অখমেনে বজ্জ বিহিত হইয়াছে।



পরে ঐ বিহিত অধ্বনি বজের ত্বতি প্রকাশ করিবার জন্য “বোধমধেন বজ্জত” এই বাক্যের দ্বারা ঐ বিহিত অধ্বনি বজেরই পুনরুত্থান হইয়াছে। উহার পুনরুত্থান ব্যতীত উহার ঐরূপ ত্বতি জ্ঞাপন করা যায় না। তাই ঐ বিহিতকেই অধিকার করিয়া ঐরূপ ত্বতি প্রকাশ করা হইয়াছে এবং “উদিত হোতব্যঃ” ইত্যাদি বিধিবাক্যের দ্বারা অগ্নিহোত্র হোমে যে কালজর বিহিত হইয়াছে, অধিকারি-বিশেষের পক্ষে তাহার নিন্দা করিবার জন্য “ভ্রাবো বাহুত্ৰাহতিমভ্যবহরতি” ইত্যাদি বাক্য ঐ বিধিবাক্যের অর্থবাদ বলা হইয়াছে। ঐ অর্থবাদ-বাক্যে “যে উদিত জুহোতি” এই স্থলে পূর্বোক্ত বিধি-বিহিত উদিত কালের পুনরুত্থান হইয়াছে। ঐ পুনরুত্থান ব্যতীত উহার ঐরূপ নিন্দা জ্ঞাপন করা যায় না। তাই ঐ বিহিত উদিত কালকেই অধিকার করিয়া, ঐরূপে নিন্দা প্রকাশ করা হইয়াছে। পূর্বোক্ত উভয় স্থলে পূর্বোক্তরূপ প্রয়োজনবশতঃ বিহিত অর্থের অনুবচন বা পুনরুত্থান হওয়ার উহা অর্গনুবাদ। ভাব্যকার বিহিতের অনুবচনের আর একটি প্রয়োজন বলিয়াছেন যে, বিহিতকে অধিকার করিয়া বিশেষ অভিহিত হয়। যেমন “অগ্নিহোত্রঃ জুহোতি” এই বিধিবাক্যের দ্বারা যে অগ্নিহোত্র হোম বিহিত হইয়াছে, তাহাকে অনুবাদ করিয়া বিশেষ বলা হইয়াছে—“দদ্রা জুহোতি” অর্থাৎ দদ্রি দ্বারা হোম করিবে। “দদ্রা জুহোতি” এই বাক্যে “জুহোতি” এই পদের দ্বারা যে হোম উক্ত হইয়াছে, তাহা পূর্বোক্ত বিধিবাক্যের দ্বারাই প্রাপ্ত, সুতরাং উহা ঐ বাক্যে বিধের নহে। ঐ বিহিত হোমকে অনুবাদ করিয়া, তাহাতে দবিরূপ গুণ বা ভ্রমবিশেষেরই বিধান করা হইয়াছে। অর্থাৎ পূর্বোক্ত বিধিবাক্যপ্রাপ্ত অগ্নিহোত্র হোম কিম্বদ্বারা করিবে? এইরূপ আকাজকন্যারে “দদ্রা” এই কথা দ্বারা তাহাতে করণরূপে দদ্রিই বিধি হইয়াছে। কিন্তু কেবল “দদ্রা” এই কথা বলা যায় না। কারণ, উদ্দেশ্য না বলিয়া বিধের বলা যায় না, বিধের স্থান ব্যতীত বিধের প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না, এ জন্য “জুহোতি” এই পদের প্রয়োগ করিয়া, ঐ দবিরূপ বিধের উদ্দেশ্য প্রকাশ করা হইয়াছে। তাহা করিতেই “জুহোতি” শব্দের দ্বারা পূর্বপ্রাপ্ত হোমের পুনরুত্থান করার উহা অর্গনুবাদ। ঐ স্থলে বিহিত হোমকে অধিকার করিয়া, ঐ বিশেষ—(দদ্রা জুহোতি এই বাক্য) বলা হইয়াছে।

ভাব্যকার অনুবাদের আরও একটি প্রয়োজন বলিয়াছেন যে, অনুবাদ বিহিতের অনন্ত্যর্থও হয় অর্থাৎ বিহিত কর্তৃবিশেষের আনন্তর্য্য বিধান করিতেও কোন স্থলে উভয়ের অনুবাদ হইয়াছে। যেমন সোম বাগ বিহিত আছে এবং দর্শ ও পৌর্ণমাস বাগও বিহিত আছে। কিন্তু ঐ উভয়ের আনন্তর্য্য বিধান করিতে অর্থাৎ দর্শ ও পৌর্ণমাসের পরে সোম বাগের কর্তব্যতা বলিতে বেদ বলিয়াছেন—“দর্শপৌর্ণমাসাত্মানিহু। সোমেন যজ্ঞত”। অর্থাৎ দর্শ ও পৌর্ণমাস বাগ করিয়া, সোম বাগ করিবে। এখানে পূর্বিহিত দর্শ ও পৌর্ণমাসের এবং সোমবাগের যে অনুবাদ বা পুনরুত্থান হইয়াছে, তাহা ঐ উভয়ের আনন্তর্য্য বিধানের জন্য। উহাদিগের পুনরুত্থান ব্যতীত ঐ আনন্তর্য্য বিধান করা অসম্ভব। তাই ঐ স্থানে ঐ প্রয়োজনবশতঃ ঐ পুনরুত্থান অনুবাদ। উহা বিহিতের অনুবচন বলিয়া অর্গনুবাদ। এইরূপ আরও নানা প্রয়োজনবশতঃ অনুবাদ আছে, তাহা ভাব্যকার না বলিয়া পুঝি গইতে বলিয়াছেন।



ভাষ্যকার পূর্বে (৩১ স্বত্র-ভাষ্যে) লৌকিক বাক্যের স্তায় বেদেরও বাক্যবিভাগবশতঃ অর্থগ্রহণ হয়, এই কথা বলিয়া যে বক্তব্যের সূচনা করিয়াছেন, এখানে সেই বাক্য-বিভাগের ব্যাখ্যার পরে তাহার সেই মূল বক্তব্য স্পষ্ট করিয়া বলিবার জন্ত বলিয়াছেন যে, বেদবাক্যের স্তায় লৌকিক বাক্যেরও বিধি, অর্থবাদ ও অনুবাদ, এই ত্রিবিধ বিভাগ আছে। “অন্ন পাক করবে” ইহা লৌকিক বিধিবাক্য। “আয়, তেঃঃ, বল, সুখ ও প্রতিভা অন্নে প্রতিষ্ঠিত” ইহা ঐ বিধিবাক্যের অর্থবাদ-বাক্য। ঐ স্ততিরূপ অর্থবাদের দ্বারা পূর্বোক্ত বিধিবিহিত অন্নপাকে অধিকতর প্রবৃতি জন্মে। “আপনি পাক করুন, পাক করুন” এইরূপ বাক্য ঐ স্থানে অনুবাদ। ঐ অনুবাদের প্রয়োজন কি? প্রয়োজন ব্যতীত ঐরূপ পুনরুক্তি অনুবাদ হইতে পারে না, এজন্য ভাষ্যকার “ক্ষিপ্তং পচ্যতাং” এই বাক্যের দ্বারা উহার একটি প্রয়োজন বলিয়াছেন। অর্থাৎ প্রথম “পচতু” শব্দের দ্বারা পাক কর্তব্য, এইমাত্র বুঝা যায়, দ্বিতীয় “পচতু” শব্দের দ্বারা শীঘ্র পাক কর্তব্য, এই অর্থ প্রকটিত হয়। “পাক করুন, পাক করুন” এইরূপ বলিলে শীঘ্র পাক কর্তব্য, এই প্রতীতি জন্মে, সেইজন্যই ঐরূপ পুনরুক্তি করা হয়, উহা অনুবাদ। ভাষ্যকার শেষে “অন্ন পচ্যতাং” এই কথা বলিয়া পূর্বোক্ত অনুবাদের আরও এক প্রকার প্রয়োজন বলিয়াছেন যে, অথবা অর্থবাদের নিমিত্ত ঐরূপ অনুবাদ করা হয়। সম্মানপূর্বক কর্মে নিয়োজনকে অধ্যেষণ বলে; “অন্ন পচ্যতাং” এইরূপ বাক্যের দ্বারাও ঐ অধ্যেষণ প্রকাশিত হইতে পারে। অব্যয় ‘অন্ন শব্দ’ যেমন সোধেদন অর্থ প্রকাশ করে, তজ্জপ “পুনর্যার” এই অর্থও প্রকাশ করে। কাহাকে সম্মান সহকারে পাক-কর্মে নিযুক্ত করিতেও “পাক করুন, পাক করুন” এইরূপ পুনরুক্তি হয়। উহা ঐরূপ অর্থোৎসর্গ বলিয়া সপ্রয়োজন হওয়ার অনুবাদ। ভাষ্যকার কলান্তরে শেষে আরও একটি প্রয়োজন বলিয়াছেন যে, কোন হুণে “পাকই করুন” এইরূপ অবধারণের জন্তও “পাক করুন, পাক করুন” এইরূপ পুনরুক্তি হয়। সুতরাং ঐরূপেও উহা সপ্রয়োজন হইয়া অনুবাদ। ভাষ্যে “পচতু পচতু ভবানু” এই বাক্যই লৌকিক অনুবাদ-বাক্যের উদাহরণ। ঐ অনুবাদের প্রয়োজন প্রদর্শন করিতেই পরের কথাগুলি বলা হইয়াছে।

ভাষ্যকার ত্রিবিধ লৌকিক বাক্যের উদাহরণ বলিয়া, উপসংহারে প্রকৃত বিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন যে, যেমন বিভাগপ্রযুক্ত অর্থবোধক বলিয়া লৌকিক বাক্য প্রমাণ, তজ্জপ বিভাগ-প্রযুক্ত অর্থবোধক বলিয়া বেদবাক্যও প্রমাণ হইতে পারে। তাৎপর্য্যটীকাকার “প্রামাণ্যং ভবিতুমর্হতি” এইরূপ পাঠ উল্লেখ করিয়া, তাহার ব্যাখ্যার বলিয়াছেন,—“প্রামাণ্যং ভবতীত্যর্থঃ”। কিন্তু বিভাগপ্রযুক্ত অর্থবোধক অথবা বিভাগবিশিষ্ট বাক্যের অর্থবোধক অথবা উদ্যোত-করের পরিগৃহীত অর্থবিভাগবদ্ধ যে বেদ প্রামাণ্য সম্ভাবনারই হেতু, উহা বেদপ্রামাণ্যের সাধন হয় না, এ কথা তাৎপর্য্যটীকাকার স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন। লৌকিক বাক্যের স্তায় বেদবাক্যেরও প্রামাণ্য হইতে পারে, অর্থাৎ উহা সম্ভব, ইহা ভাষ্যকারের উপসংহার-বাক্যের দ্বারা বুঝা যায়। ভাষ্যকার “প্রামাণ্যং ভবতি” না বলিয়া, “প্রামাণ্যং ভবিতুমর্হতি” এই কথাই বলিয়াছেন।



তাৎপর্যটীকাকার কেন যে এখানে "প্রামাণ্যং ভবতি" বলিয়া উহার অন্তরূপ ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন, তাহা অধোগণ চিন্তা করিবেন। বিভাগপ্রযুক্ত অর্থবোধকর বা অগণবিভাগবৎ যে প্রামাণ্যের সাধক নহে, উহা প্রামাণ্যের ব্যভিচারী, এ কথা তাৎপর্যটীকাকার ইহার পরেই বলিয়াছেন। সেখানে ইহা ব্যক্ত হইবে ১৬৫।

**সূত্র।** নানুবাদপুনরুক্তয়োর্বিশেষঃ

**শব্দাভ্যাসোপপত্তেঃ ॥ ৬৬ ॥ ১২৭ ॥**

অনুবাদ। (পূর্বপক্ষ) অনুবাদ ও পুনরুক্তের বিশেষ নাই, যেহেতু (উভয় স্থলেই) শব্দের অভ্যাসের উপপত্তি (সভা) আছে।

ভাষ্য। পুনরুক্তমসাদু, সাধুরনুবাদ ইত্যয়ং বিশেষো নোপপদ্যতে। কস্যাং ? উভয়ত্র হি প্রতীতিত্বাৎ শব্দোহভ্যাস্যতে, চরিতার্থস্য শব্দস্তাভ্যাস-  
দুভয়মসাধ্বিত্বিতি।

অনুবাদ। পুনরুক্ত অসাদু, অনুবাদ সাধু, এই বিশেষ উপপন্ন হয় না। (প্রশ্ন) কেন ? অর্থাৎ পুনরুক্ত ও অনুবাদের অসাদুত্ব ও সাধুরূপ বিশেষ উৎপন্ন হয় না কেন ? (উত্তর) উভয় স্থলেই অর্থাৎ পুনরুক্ত ও অনুবাদ, এই উভয় থাকেই প্রতীতিত্ব (বাহার অর্থ পূর্বের বুঝা গিয়াছে) শব্দ অভ্যাস্ত হয়, প্রতীতিত্ব শব্দের অভ্যাস (পুনরুক্তি) বশতঃ উভয় (পুনরুক্ত ও অনুবাদ) অসাদু।

টিপ্পনী। পুনরুক্ত হইতে অনুবাদের বিশেষ ভাষ্যকার বলিয়াছেন, কিন্তু ঐ বিশেষ না বুঝিলে যে পূর্বপক্ষের অবতারণা হয়, নহিঁ এই সূত্রে তাহার উল্লেখপূর্বক পরদত্তী সিদ্ধান্ত-সূত্রের দ্বারা পুনরুক্ত হইতে অনুবাদের ভেদ সমর্থন করিয়াছেন। এইটি পূর্বপক্ষসূত্র। পূর্বপক্ষবাদীর কথা এই যে, যে শব্দের প্রতিপাদ্য অর্থ পূর্ব প্রতীত, সেই প্রতীতিত্ব শব্দের অভ্যাস পুনরুক্ত ও অনুবাদ, এই উভয়ের সমান। অর্থাৎ পুনরুক্তেও প্রতীতিত্ব শব্দের অভ্যাস বা পুনরাবৃত্তি হয়, অনুবাদেও প্রতীতিত্ব শব্দের অভ্যাস হয়। সুতরাং পুনরুক্ত ও অনুবাদ, উভয়ই সমান। তাহা হইলে পুনরুক্ত অসাদু এবং অনুবাদ সাধু, ইহা বলা যায় না। ঐ উভয়ই সমান বলিয়া, ঐ উভয়কেই অসাদু বলিতে হয়। যেমন "পচতু পচতু" এই বাক্য বলিলে দ্বিতীয় "পচতু" শব্দের প্রতিপাদ্য অর্থ প্রথম "পচতু" শব্দের দ্বারা প্রতীত হইয়াছে। সুতরাং দ্বিতীয় "পচতু" শব্দের প্রয়োগ—প্রতীত শব্দের অভ্যাস। উহা পুনরুক্ত স্থলেও যেমন, অনুবাদ স্থলেও তদ্রূপ। সুতরাং পুনরুক্ত অসাদু হইলে অনুবাদও অসাদু হইবে। পুনরুক্ত হইতে অনুবাদের বিশেষ না থাকায় পুনরুক্ত হইলে তাহা দোষ, কিন্তু অনুবাদ হইলে তাহা দোষ নহে, এই সিদ্ধান্ত বলা যায় না। সুতরাং বেদে যে পুনরুক্ত-দোষ নাই, ইহাও সমর্থন করা যায় না। ৬৬।

## সূত্র । শীঘ্রতরগমনোপদেশবদভ্যাসান্না-

বিশেষঃ ॥ ৬৭ ॥ ১২৮ ॥

অনুবাদ । ( উত্তর ) শীঘ্রতর গমনের উপদেশের ছায় অভ্যাসবশতঃ অর্থাৎ “শীঘ্র গমন কর” বলিয়া ও “শীঘ্রতর গমন কর” এইরূপ বাক্য যেমন সার্থক, তদ্রূপ অনুবাদেরূপ অভ্যাসও সার্থক বলিয়া ( পুনরুক্ত ও অনুবাদের ) অবিশেষ নাই, অর্থাৎ ঐ উভয়ের ভেদ আছে ।

ভাষ্য । নানুবাদপুনরুক্ত্যেরবিশেষঃ । কস্মাৎ ? অর্থবতোহভ্যাস-  
স্থানুবাদভাবাৎ । সমানেহভ্যাসে পুনরুক্তমনর্থকঃ । অর্থবানভ্যাসেহনু-  
বাদঃ । শীঘ্রতরগমনোপদেশবৎ শীঘ্রং শীঘ্রং গম্যতামিতি ক্রিয়াতি-  
শয়োহভ্যাসেনৈবোচ্যতে । উদাহরণার্থক্ষেদম্ । এবমন্তোহপ্যভ্যাসাঃ ।  
পচতি পচতীতি ক্রিয়ানুপরমঃ । গ্রামো গ্রামো রমণীয় ইতি ব্যাপ্তিঃ ।  
পরিপরি ত্রিগর্ভেভ্যো বৃকৌ দেব ইতি বর্জনম্ । অধ্যাদিকৃত্যং  
নিষঙ্গমিতি সামীপ্যম্ । তিক্ততিল্কমিতি প্রকারঃ । এবমনুবাদস্য  
স্তুতি-নিন্দা-শেষ-বিধিধিকারার্থতা বিহিতানন্তরার্থতা চেতি ।

অনুবাদ । অনুবাদ ও পুনরুক্ত্যের অবিশেষ নাই, অর্থাৎ ঐ উভয়ের বিশেষ বা  
ভেদ আছে । ( প্রশ্ন ) কেন ? ( উত্তর ) সপ্রয়োজন অভ্যাসের অনুবাদবশতঃ ।  
সমান অভ্যাসে অর্থাৎ নির্বিশেষে অভ্যাস স্থলে পুনরুক্ত্য অনর্থক । অর্থবান্ অর্থাৎ  
সার্থক অভ্যাস অনুবাদ । শীঘ্রতর গমনের উপদেশের ছায় অর্থাৎ “শীঘ্রতর গমন কর”  
এই বাক্যের ছায় “শীঘ্র শীঘ্র গমন কর” এই স্থলে অর্থাৎ ঐ বাক্যে অভ্যাসের  
দ্বারাই ( শীঘ্র শব্দের বিরুক্তির দ্বারাই ) ক্রিয়াতিশয় ( গমন-ক্রিয়ার শীঘ্রত্বের  
আধিক্য ) উক্ত হয় । ইহা উদাহরণার্থ, অর্থাৎ একটা দৃষ্টান্ত প্রদর্শনের জন্যই  
ঐ স্থলটি বলা হইয়াছে । এইরূপ অন্যও বহু অভ্যাস আছে । ( কএকটি

১। প্রচলিত ভাষ্যপুস্তকে “তিক্তং তিল্কং” এইরূপ পাঠ আছে । কিন্তু “প্রকারে শুদ্ধবচনভ” এই শব্দের  
দ্বারা প্রকার অর্থাৎ যাদৃশ অর্থে বিবর্তন হইলে সেই প্রয়োগ কর্তব্যরহস্য হইবে, ইহা ভট্টাচার্য্যবিরুদ্ধিতা প্রকৃতি বাখ্যা  
করিয়াছেন । সুতরাং “তিক্ততিল্কং” এইরূপ পাঠই গৃহীত হইয়াছে । কিন্তু বেদান্তে কালিদাস “কণিষ্ঠ কণিষ্ঠ”  
“মনঃ মনঃ” এইরূপ প্রয়োগও করিয়াছেন । সিদ্ধান্ত-কৌমুদী তত্ত্ব-সোপানী বাখ্যাকার “নবং নবং” এই প্রয়োগে  
বীজার্থে বিবর্তন বলিয়াছেন এবং কালিদাসের বেদান্তের প্রয়োগ উল্লেখপূর্বক কথকিং অন্তরূপে বাখ্যা  
করিয়াছেন । কিন্তু কালিদাসের এইরূপ প্রয়োগের প্রকৃতার্থ কি, তাহা স্থলগণের চিন্তনীয় ।



উদাহরণ বলিতেছেন)। “পাক করিতেছে, পাক করিতেছে” এই স্থলে ক্রিয়ার অনিবৃত্তি (পাকের অবিচ্ছেদ)। “গ্রাম গ্রাম (প্রত্যেক গ্রাম) রমণীয়” এই স্থলে ব্যাপ্তি (গ্রামমাত্রের সহিত রমণীয়তার সম্বন্ধ)। “ত্রিগর্তকে অর্থাৎ ত্রিগর্ত নামক দেশবিশেষকে (পরি পরি) বর্জজন করিয়া দেব বর্ষণ করিয়াছেন” এই স্থলে বর্জজন। “অধ্যধিকুডা” অর্থাৎ কুড়োর (ভিত্তির) সমীপে নিষণ, এই স্থলে সামীপ্য। “তিলু তিলু” অর্থাৎ তিলসদৃশ, এই স্থলে প্রকার (সাদৃশ্য) [ অর্থাৎ পূর্বোক্ত বাক্যগুলিতে যথাক্রমে ক্রিয়ার অনিবৃত্তি ব্যাপ্তি, বর্জজন, সামীপ্য ও সাদৃশ্য শব্দের অভ্যাস বা বিরক্তির দ্বারাই উক্ত বা দ্যোতিত হয়। ]

এইরূপ স্তুতি, নিন্দা ও শ্বেষবিধি অর্থাৎ বিশেষ্যবাক্যে অনুবাদে অধিকারার্থতা, এবং বিহিতের অনন্তরার্থতা আছে। [ অর্থাৎ স্তুতি, নিন্দা অথবা বিশেষ্যবাক্য প্রকাশ করিতে বিহিতকে অধিকার করিতে হয়—সেই বিহিতাধিকার এবং কোন কোন স্থলে বিহিতের আনন্তর্য্য বিধান, ইহাও অনুবাদের প্রয়োজন ]।

উদাহরণ। পুনরুক্ত হইতে অনুবাদের বিশেষ বুঝাইতে মহর্ষি শীঘ্রতর গমনের উপদেশকে অর্থাৎ “শীঘ্রতর গমন কর” এই বাক্যকে দৃষ্টান্তরূপে উল্লেখ করিয়াছেন। মহর্ষির তাৎপর্য্য এই যে, যেমন শীঘ্র গমন কর, এই কথা বলিয়া, পরেই আবার শীঘ্রতর গমন কর, এই বাক্য বলিলে পুনরুক্ত হয় না। কারণ, “শীঘ্রতর” শব্দে যে “তরপ” প্রত্যয় আছে, তদ্বারা গমন-ক্রিয়ার অতিশয় বোধ জন্মে, ঐ বিশেষ বোধের জন্মই পরে “শীঘ্রতর গমন কর” এই বাক্য বলা হয়—তরুপ “শীঘ্র শীঘ্র গমন কর” এই বাক্যে শীঘ্র শব্দের অভ্যাস বা বিরক্তিবশতঃ ক্রিয়াতিশয়-বোধ জন্মে, ঐ বিশেষ বোধের জন্মই ঐ বাক্যে শীঘ্র শব্দের বিরক্তি করা হয়। একবার মাত্র শীঘ্র শব্দের উচ্চারণে ঐ বিশেষ বোধ জন্মে না। পূর্বোক্তরূপ অভ্যাসই অনুবাদ, উহা বিশেষ বোধের হেতু বলিয়া সার্থক। অনুবাদের সার্থকতা সাধনের প্রয়োগ প্রদর্শন করিয়া<sup>১</sup> উচ্চ্যাতকর তাৎপর্য্য বর্ণন করিয়াছেন যে, যেমন “শীঘ্র” শব্দের পরে আবার “শীঘ্রতর” শব্দের প্রয়োগ করিলে বোধ-বিশেষের হেতু বলিয়া ঐ শীঘ্রতর শব্দ পুনরুক্ত-দোষ লাভ করে না, তরুপ অনুবাদরূপ অভ্যাসও বোধবিশেষের হেতু বলিয়া পুনরুক্ত-দোষ লাভ করিবে না। “শীঘ্র শীঘ্র গমন কর” এই বাক্যে শীঘ্র শব্দের বিরক্তিবশতঃ ঐ ক্রিয়াতিশয়রূপ বিশেষের বোধ জন্মে। ঐ স্থলে শীঘ্রতর গমনক্রিয়ার বিশেষণ। ঐ শীঘ্রতর অতিশয়কেই ভাষ্যকার প্রভৃতি ঐ স্থলে ক্রিয়াতিশয় বলিয়া উল্লেখ

১। ভাস্কর দেশের নাম ত্রিগর্ত। ঐ দেশের বিবরণ বৃহৎসংহিতা, ১৪শ অধ্যায়ের দ্রষ্টব্য।

২। অত্র প্রয়োগঃ—অর্থগাননুবাদনক্ষণেঃভাস্করঃ প্রত্যয়বিশেষকেতুঃ। শীঘ্রতরগমনোপদেশবাবিতি। যথা শীঘ্রশব্দঃ শীঘ্রতরশব্দঃ প্রযুক্তবানঃ প্রত্যয়বিশেষকেতুঃ। পুনরুক্তদোষঃ লভতে, তথাঃশীঘ্রতর-শব্দস্যোপাভ্যাসঃ প্রত্যয়বিশেষকেতুঃ। পুনরুক্তদোষঃ লভ্যত ইতি। “পুনরুক্তে তু ন কশ্চিদ্বিশেষো গম্যত ইতি মহান্ বিশেষঃ পুনরুক্তানুবাদয়োঃ”।—ভাষ্যান্তিকঃ।

করিয়াছেন। তাৎপর্যটীকাকার বলিয়াছেন যে, ক্রিয়াবিশেষণের অভিধায় ও ক্রিয়াতিশয়। “শীঘ্রতর গমন কর” এই বাক্যে যেমন “তরপ্” প্রত্যয়ের দ্বারা ঐ ক্রিয়াতিশয় বুঝা যায়, তদ্রূপ “শীঘ্র শীঘ্র গমন কর” এই বাক্যে উহা শীঘ্র শব্দের অভিধায় বা বিকল্পের দ্বারাই বুঝা যায়। ভাষ্যকার এই কথা বলিয়া শেষে বলিয়াছেন যে, ইহা একটা উদাহরণপ্রদর্শনের জন্যই বলা হইয়াছে। আরও বহুবিধ অভিধায় আছে। ক্রিয়াতিশয়ের দ্বারা ক্রিয়ার অনিবৃতি, ব্যাপ্তি, বর্জন, সামীপ্য ও সাদৃশ্য প্রভৃতি অর্থবিশেষও অভিধায় বা বিকল্পের দ্বারাই বুঝা যায়। এইরূপ কোন বিশেষ বোধের হেতু বলিয়া, সেট সকল অভিধায়ও অনুবাদ, তাহা সার্থক বলিয়া পুনরুক্ত নহে। উদ্যোতকর “পচতু পচতু” এই বাক্যকে গ্রহণ করিয়া বলিয়াছেন যে, প্রথম “পচতু” শব্দের দ্বারা পাক কর্তব্য, এইরূপ বোধ জন্মে। দ্বিতীয় “পচতু” শব্দের দ্বারা আনারই পাক করিতে হইবে, এইরূপ অবধারণ বোধ জন্মে। অথবা সত্যত পাক কর্তব্য, এইরূপে পাকক্রিয়ার অবচ্ছেদ্যবিশয়ে বোধ জন্মে। অথবা পাক করিতে আমাকেই অধিকার করিতেছেন, এইরূপে অধ্যেষণ বোধ জন্মে। অথবা শীঘ্র পাক কর্তব্য, এইরূপে পাক-ক্রিয়ার শীঘ্র বোধ জন্মে। পূর্বোক্তরূপ কোন বিশেষ বোধের হেতু বলিয়াই পূর্বোক্ত বাক্যে দ্বিতীয় “পচতু” শব্দ সার্থক। সুতরাং উহা পুনরুক্ত নহে—উহা অনুবাদ। পুনরুক্ত হলে এইরূপ কোন বিশেষের বোধ হয় না; সুতরাং পুনরুক্ত ও অনুবাদের মহান বিশেষ বা ভেদ অবশ্য স্বীকার্য। ভাষ্যকার “পচতি পচতি” এই বাক্যের উল্লেখ করিয়া, ঐ স্থলে কেবল ক্রিয়ার অনিবৃতিকেই ঐ অনুবাদবোধ্য বিশেষ বলিয়াছেন। পাক-ক্রিয়ার নিবৃতি নাই অর্থাৎ সত্যত পাক করিতেছে, ইহা ঐ বাক্যে “পচতি” শব্দের অভিধায় বা বিকল্পের দ্বারাই বুঝা যায়। ভাষ্যকার ঐ স্থলে একটি মাত্র বিশেষ বলিলেও উদ্যোতকরের কথিত অগ্ৰান্ত বিশেষগুলিও ভিন্ন ভিন্ন স্থলে বক্তার তাৎপর্যানুসারে বুঝা যায়, তাহা উদ্যোতকরের দ্বারা সকলেরই সম্মত। কোন দেশের সকল গ্রামই রমণীয়, ইহা বলিতে “গ্রামো গ্রামো রমণীয়ঃ” এই বাক্য বলা হয়। ঐ বাক্যে “গ্রাম” শব্দের অভিধায় বা বিকল্পের দ্বারাই ব্যাপ্তি অর্থাৎ গ্রামনাতির সহিত রমণীয়তার সম্বন্ধ বুঝা যায়। “পরি পরি ত্রিগর্ভেভ্যঃ” ইত্যাদি বাক্যে “পরি” শব্দের অভিধায় বা বিকল্পের দ্বারাই বর্জন অর্থ বুঝা যায়। একটি মাত্র “পরি” শব্দের প্রয়োগ করিলে তাহা বুঝা যায় না। “অধ্যাবিকুডং” ইত্যাদি বাক্যে “অধি” শব্দের অভিধায় বা বিকল্পের দ্বারাই সামীপ্য অর্থ বুঝা যায়। একটি মাত্র “অধি” শব্দের প্রয়োগে তাহা বুঝা যায় না। “তিক্ততিক্তং” এই বাক্যে তিক্ত শব্দের অভিধায় বা বিকল্পের দ্বারাই সাদৃশ্য অর্থ বুঝা যায়। অর্থাৎ ঐ বাক্যের দ্বারা তিক্ত সদৃশ বা ঈবং তিক্ত, এইরূপ অর্থ বোধ হয়। একটি মাত্র তিক্ত শব্দের প্রয়োগে ঐরূপ অর্থ বোধ হয় না। পূর্বোক্তরূপ বিভিন্ন অর্থবিশেষের প্রকাশ হইলে ব্যাকরণশাস্ত্রে ঐ সকল স্থলে বিপর্যয়নের বিধান হইয়াছে। ঐ বিপর্যয়নের দ্বারাই ঐ সকল স্থলে ঐরূপ অর্থবিশেষ প্রকটিত হয়। অতথা তাহা হইতে পারে না?।

১। “নিভাবীপদোঃ”—পার্বণি হুজ ৮১১, আতীক্ষ্যে বীপায়াং দোহো বিকটনং সাং। আতীক্ষ্য



ভাবাকার লৌকিক বাক্যে অনুবাদেৰ সাৰ্থকত্ব বা প্ৰয়োজন দেখাইয়া উপসংহাৰে বেদবাক্যে অনুবাদেৰ প্ৰয়োজন বলিৱাছেন। বেদবাক্যে অনুবাদেৰ এই প্ৰয়োজন ভাবাকার পূৰ্বেও বলিৱাছেন। এখানে আবার তাহাই উল্লেখ কৰিয়া লৌকিক বাক্যেৰ ত্ৰায় বেদেও যে অনুবাদ আছে, উহা সপ্ৰয়োজন বলিয়া পুনৰুক্ত নহে, এই মূল বক্তব্যটি প্ৰকাশ কৰিৱাছেন। বেদে যে বিহিতকে অধিকাৰ কৰিয়া জ্ঞতি বা নিন্দা প্ৰকাশ কৰা হইয়াছে, এবং কোন স্থলে বিধিৰূপে বলা হইয়াছে, এবং কোন স্থলে বিহিতের আনুষ্ঠান্য বিধান কৰা হইয়াছে, ইহা অৰ্থাৎ বেদবাক্যে ঐ সকল অনুবাদেৰ প্ৰয়োজন ও উদাহৰণ পূৰ্বেই (৬ঃ সূত্ৰভাষ্যে) বলা হইয়াছে। নীমাংসকগণ “অগ্নিৰ্হিমন্ত ভেষজম্” ইত্যাদি বাক্যকে যে অনুবাদ বলিৱাছেন, ত্ৰায়সূত্ৰকাৰ মহৰ্ষি গোতম বেদবিভাগ বলিতে সে অনুবাদকে গ্ৰহণ করেন নাই। কাৰণ, মহৰ্ষি গোতম লৌকিক বাক্যেৰ সহিত বেদবাক্যেৰ সাম্য দেখাইতে বেদবাক্যেৰ সৰ্ব্বপ্ৰকাৰ বিভাগ বলা আবশ্যক মনে করেন নাই। বেদেৰ যে সকল বাক্য বিধি বা বিধিসমভিব্যাহত, অৰ্থাৎ বিধিৰ সহিত যাদ্যদিগেৰ একবাক্যতা আছে, সেই সকল বাক্যেৰই তিনি বিভাগ বলিৱাছেন। সূত্ৰৱাং নীমাংসকদিগেৰ কথিত গুণবাদ, অনুবাদ ও ভূতাত্ত্ববাদকে তিনি উল্লেখ করেন নাই এবং এই জন্তই তিনি বেদেৰ নিবেদ্য-বাক্যকেও গ্ৰহণ করেন নাই। কাৰণ, তাহা বিধি বা বিধি-সমভিব্যাহত বাক্য নহে। সমগ্র বেদেৰ বিভাগ বলিতে নীমাংসকগণ বলিৱাছেন—বেদ পঞ্চবিধ। (১) বিধি, (২) মন্ত্ৰ, (৩) নামধেয়, (৪) নিবেদ্য ও (৫) অৰ্ঘবাদ। এই অৰ্ঘবাদ ত্ৰিবিধ,—(১) গুণবাদ, (২) অনুবাদ, (৩) ভূতাত্ত্ববাদ। মহৰ্ষি গোতমোক্ত বিধি-সমভিব্যাহত অনুবাদও নীমাংসকসম্মত অৰ্ঘবাদৰূপে অনুবাদেৰ লক্ষণাক্ৰান্ত। গুণবাদ এবং অন্তৰূপ অনুবাদ এবং বেদান্তবাক্য প্ৰকৃতি ভূতাত্ত্ববাদ—বিধি-সমভিব্যাহত বাক্য নহে, অৰ্থাৎ সাক্ষাৎ সহজে বিধিৰ সহিত তাহাদিগেৰ একবাক্যতা নাই। ৩৭।

ভাষ্য। কিং পুনঃ প্ৰতিবেদ্যহেতুং ক্ৰাদেব শব্দস্ত প্ৰামাণ্যং সিধ্যতি ?  
ন, অতশ্চ—

অনুবাদ। (প্ৰশ্ন) প্ৰতিবেদ্য হেতুগুলিৰ উক্তাৰ প্ৰযুক্তই কি বেদেৰ প্ৰামাণ্য সিদ্ধ হয় ? (উত্তৰ) না, এই হেতুবশতঃও অৰ্থাৎ পৰৱৰ্ত্তি-সূত্ৰোক্ত সাধক হেতুবশতঃও (বেদেৰ প্ৰামাণ্য সিদ্ধ হয়)।

তিত্তেদ্যবায়নজ্ঞককুম্ভেণ ৮। পচতি পচতি ভূক্তা ভূক্তা। বীশায়াং বৃক্ষং বৃক্ষং সিদ্ধতি, গ্রামো গ্রামো  
রমণীয়ঃ—সিদ্ধান্ত-কৌমুদী। “পণ্ডেৰ্বজ্ঞানে। সূত্ৰ ৮।১।৫ পৰি পৰি ব্ৰহ্মেন্তা। বৃষ্টে বৈদ্য বজ্জান্ পৰিহৃত্য  
ইত্যৰ্থঃ—সিদ্ধান্ত-কৌমুদী। উপধাৰ্য্যবসঃ সামীপো। সূত্ৰ ৮।১।৭ অধ্যাযিৱ্যং হংক্ৰোপরিহৃত্য সৰীপকাণে  
হুঃসমিত্যৰ্থঃ—সিদ্ধান্ত-কৌমুদী। প্ৰকাৰে গুণবচনস্ত। সূত্ৰ ৮।১।১২ নাকুন্তে সোক্তো গুণবচনস্ত যে স্তত্তচ্চ  
কৰ্ণধাৱয়ক। পট্ পটী, পট্ পটুঃ, পট্‌সদৃশঃ স্তবং পট্‌সিতি বাবং—সিদ্ধান্ত-কৌমুদী।

## সূত্র । মন্ত্রায়ুর্বেদপ্রামাণ্যবচ্চ তৎপ্রামাণ্যমাপ্ত- প্রামাণ্যাত্ ॥ ৬৮ ॥ ১২৯॥

অমুবাদ । মন্ত্র ও আয়ুর্বেদের প্রামাণ্যের চায় আপ্ত ব্যক্তির অর্থাৎ বেদবক্তা আপ্ত ব্যক্তির প্রামাণ্যবশতঃ তাহার ( বেদরূপ শব্দের ) প্রামাণ্য ।

বিবৃতি । বেদ প্রমাণ—কারণ, বেদ আপ্তবাক্য । যিনি তত্ত্ব দর্শন করিয়াছেন এবং দয়াবশতঃ ঐ তত্ত্বখ্যাপনে ইচ্ছুক হইয়া তাহার উপদেশ করেন, অপরের হিতসাধন ও অহিত নিবৃত্তির জন্য যথানুষ্ঠিত প্রকাশ করেন, তাঁহাকে বলে আপ্ত, তাঁহার বাক্য আপ্তবাক্য । বেদে বহু বহু অলৌকিক তত্ত্ব বর্ণিত আছে, যাহা সাধারণ ব্যক্তির জ্ঞানের গোচরই নহে । ঐ সকল তত্ত্ব বলিতে গেলে তাহার দর্শন আবশ্যক ; সুতরাং যিনি ঐ সকল তত্ত্ব বলিয়াছেন, তিনি অলৌকিক তত্ত্বদর্শী, সন্দেহ নাই এবং তিনি যে জীবের প্রতি দয়াবশতঃ তাঁহার যথানুষ্ঠিত তত্ত্বের বর্ণন করিয়াছেন, তাহাতেও সন্দেহ নাই এবং যিনি ঐ সকল অলৌকিক তত্ত্বদর্শী, তিনি যে সর্বজ্ঞ, তাহাতেও সন্দেহ নাই । কারণ, সর্বজ্ঞ ব্যতীত বেদবর্ণিত ঐ সকল তত্ত্ব আর কেহ বলিতে সমর্থই নহেন এবং যিনি ঐ সকল তত্ত্বদর্শী, তিনি জীবের সম্মুখ বিধানে—জীবের চুঃখমোচনে অবশ্যই ইচ্ছুক হইবেন এবং তজ্জন্তু তাঁহার যথানুষ্ঠিত তত্ত্বের উপদেশ করিবেন, তিনি দ্বন্দ্ব বা প্রত্যাহার হইতেই পারেন না । পূর্বোক্ত তত্ত্বদর্শিতা ও জীবের দয়া প্রভৃতিই সেই আপ্ত ব্যক্তির প্রামাণ্য, উহাই তাঁহার আপ্তবাক্য ; সুতরাং তাঁহার বাক্য বেদ—পূর্বোক্তরূপ আপ্তপ্রামাণ্যবশতঃ প্রমাণ ; যেমন—মন্ত্র ও আয়ুর্বেদ । বিধ, তৃত ও বজ্রের নিবর্তক যে সকল মন্ত্র আছে, তাহার দ্বারা বিধাদি নিবৃত্তি হইয়া থাকে, ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই । যিনি ঐ সকল মন্ত্রের সাফল্য স্বীকার করিবেন না, তাঁহাকে উহার ফল দেখাইয়াই তাহা স্বীকার করান যাইবে এবং আয়ুর্বেদের সত্যার্থতা কেহই অস্বীকার করেন না । তাহা হইলে মন্ত্র ও আয়ুর্বেদ যে প্রমাণ, ইহা নির্বিকার । মন্ত্র ও আয়ুর্বেদের প্রামাণ্যের হেতু কি, তাহা বলিতে হইলে ইহাই বলিতে হইবে যে, উহা আপ্তবাক্য, উহার বক্তা আপ্ত ব্যক্তির পূর্বোক্তরূপ প্রামাণ্যবশতঃই উহা প্রমাণ । যিনি মন্ত্র ও আয়ুর্বেদের বক্তা, তিনি যে ঐ সকল তত্ত্ব দর্শন করিয়া, জীবের প্রতি করুণাবশতঃ তাহা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ থাকিতে পারে না ; সুতরাং ঐ সকল তত্ত্বদর্শিতা ও দয়া প্রভৃতি তাঁহার আপ্তবাক্য বা প্রামাণ্য, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য । সেই আপ্ত-প্রামাণ্যবশতঃ যেমন মন্ত্র ও আয়ুর্বেদ প্রমাণ, তজ্জন্তু আপ্তপ্রামাণ্যবশতঃ অদৃষ্টার্থক বেদও প্রমাণ । যে হেতুতে মন্ত্র ও আয়ুর্বেদ প্রমাণ, সেই হেতু অজ্ঞাত থাকিলে তাহাও প্রমাণই হইবে, তাহা অপ্রমাণ হইতে পারে না,—সে হেতু আপ্তবাক্য । লৌকিক বাক্যের মধ্যেও বাহ্য আপ্তবাক্য, তাহা প্রমাণ, সেই বাক্যবক্তা আপ্ত ব্যক্তির প্রামাণ্যবশতঃই তাহার প্রামাণ্য, ইহা স্বীকার না করিলে লোকব্যবহার চলিতে পারে না । কোন ব্যক্তিরই কোন কথাই সত্যার্থতা কেহই স্বীকার



না করিলে লোকবাজার উচ্ছেদ হয়,—বস্তুতঃ লৌকিক বাক্যের মধ্যেও আগ্নেয়বাক্যগুলিকে সেই আগ্নেয় প্রামাণ্যবশতঃ সকলেই প্রামাণ্যরূপে গ্রহণ করিতেছেন; সুতরাং আগ্নেয় প্রামাণ্যবশতঃ যে আগ্নেয়বাক্যের প্রামাণ্য, ইহা স্বীকার্য। মত্ৰ, আয়ুর্কেন্দ এবং দৃষ্টার্থক অন্ত্যস্ত বেদ ও বহু বহু লৌকিক বাক্য ইহার উদাহরণ। সেই দৃষ্টান্তে অদৃষ্টার্থক বেদ-বাক্যও আগ্নেয়প্রামাণ্যবশতঃ প্রমাণ। ঐ সকল বেদবাক্য যে আগ্নেয়বাক্য, তাহাতে সন্দেহ করিবার কারণ নাই। কারণ, যিনি পূর্বোক্তরূপ আগ্নেয়বাক্য-সম্পন্ন নহেন, তিনি বেদে ঐ সকল অলৌকিক ভবের বর্ণন করিতে সক্ষমই নহেন।

টিপ্পনী। মহর্ষি বেদের প্রামাণ্য পরীক্ষা করিতে প্রথমে বেদের অপ্রামাণ্যরূপ পূর্বপক্ষের সমর্থনপূর্বক তাহার নিরাস করিয়াছেন। তাহার পরে বেদে বাক্যবিভাগের উল্লেখ করিয়া বেদের প্রামাণ্যসম্ভাবনার হেতু বলিয়াছেন। কিন্তু কেবল ইহাতেই বেদের প্রামাণ্য সিদ্ধ হইতে পারে না। বেদের প্রামাণ্যসাধক প্রমাণ বলা আবশ্যক। এ জন্য মহর্ষি শেষে এই সূত্রের দ্বারা বেদপ্রামাণ্যের সাধক বলিয়াছেন। ভাষ্যকার “কিং পুনঃ” ইত্যাদি ভাষ্যসন্দর্ভের দ্বারা প্রেরণপূর্বক “অতশ্চ” এই কথার দ্বারা মহর্ষিসূত্রের অবতারণা করিয়াছেন। ভাষ্যকারের “অতশ্চ” এই কথার সহিত সূত্রোক্ত “আগ্নেয়প্রামাণ্যং” এই কথার যোগ করিয়া সূত্রার্থ ব্যাখ্যা করিতে হইবে। অর্থাৎ বেদের অপ্রামাণ্য সাধনে সূত্রোক্ত হেতুগুলির উদ্ধারবশতঃ এবং আগ্নেয়প্রামাণ্যবশতঃ বেদ প্রমাণ। উদ্যোতকর প্রথমে বলিয়াছেন যে, পূর্বোক্ত অর্থবিভাগবহু-রূপ হেতুর সমুচ্চয়ের জন্য সূত্রে “চ” শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। অর্থাৎ পূর্বোক্ত অর্থবিভাগবহু-বশতঃ এবং আগ্নেয়প্রামাণ্যবশতঃ বেদ প্রমাণ। উদ্যোতকর সূত্রোক্ত হেতুবাক্যের ফলিতার্থরূপে পূর্ববিশেষ্যভিহিতত্বকে হেতু গ্রহণ করিয়া, সূত্রার্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, যেমন মত্ৰ ও আয়ুর্কেন্দ-বাক্যগুলি পূর্ববিশেষ্যের উক্ত বলিয়া প্রমাণ, সেইরূপ বেদবাক্যগুলি প্রমাণ, ইহাতে পূর্ববিশেষ্যভিহিতত্ব—হেতু। তাৎপর্যটীকাকার উদ্যোতকরের তাৎপর্য বর্ণন করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে, বেদ প্রামাণ্য বিষয়ে প্রমাণ কি? এতদ্ব্যতীত উদ্যোতকর প্রথমে অর্থবিভাগবহুকে বেদপ্রামাণ্য সম্ভাবনার প্রমাণ বলিয়াছেন; ঐ অর্থবিভাগবহু কিন্তু বেদপ্রামাণ্য বিষয়ে প্রমাণ বা সাধন নহে। কারণ, বুদ্ধাদি প্রণীত শাস্ত্রেও পূর্বোক্তরূপ অর্থবিভাগ আছে; কিন্তু তাহা অপ্রমাণ বলিয়া অর্থবিভাগ প্রামাণ্যের ব্যতিক্রমী, সুতরাং উহা বেদপ্রামাণ্যে প্রমাণ নহে। বেদপ্রামাণ্যে বাহ্য প্রমাণ, অর্থাৎ যে হেতু বেদপ্রামাণ্যের সাধক, তাহা মহর্ষির এই সূত্রেই উক্ত হইয়াছে। এই সূত্রোক্ত হেতুই বস্তুতঃ বেদপ্রামাণ্যসাধনে হেতু। সূত্রকার “চ” শব্দের দ্বারা উদ্যোতকরের কবিত যে অর্থবিভাগবহুরূপ হেতুর সমুচ্চয় করিয়াছেন, তাহা বেদপ্রামাণ্য সম্ভাবনার হেতু। বেদপ্রামাণ্য সাধন করিতে মহর্ষি পূর্বে ঐ প্রামাণ্য সম্ভাবনারই হেতু বলিয়াছেন। কারণ, সম্ভাবিত পক্ষই হেতুর দ্বারা সিদ্ধ করা যায়। বাহ্য অসম্ভাবিত, তাহা কোন হেতুর দ্বারা ই সিদ্ধ হইতে পারে না। উদ্যোতকর যে পূর্ববিশেষ্যভিহিতত্বকে বেদপ্রামাণ্যের সাধকরূপে

উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার ব্যাখ্যায় তাৎপর্যটীকাকার বলিয়াছেন যে, পুরুষ বেদকর্তা ভগবান, তাঁহার বিশেষ বলিতে তত্ত্বনিষ্ঠা, ভূতদয়া এবং যথাদৃষ্ট তত্ত্বব্যাপনেচ্ছা এবং ইন্দ্রিয়াদির পটুতা। এই সকল বিশেষের দ্বারাই পুরুষ পুরুষান্তর হইতে বিশিষ্ট হইয়া থাকেন। জলকথা—বেদকর্তা পুরুষ যে স্বয়ং ঈশ্বর, ইহাই উদ্যোতকের অভিমত বলিয়া তাৎপর্যটীকাকার বলিয়াছেন। কিন্তু উদ্যোতকর ইহা স্পষ্ট করিয়া বলেন নাই। তিনি বলিয়াছেন—বেদ, পুরুষবিশেষাভিহিত। পরে ইহার আলোচনা পাওয়া যাইবে।

ভাষ্য। কিং পুনরাযুর্বেদস্ত প্রামাণ্যম্ ?—যন্তদায়ুর্বেদেনোপদিশ্যতে ইদং কৃত্ত্বেক্ষমধিগচ্ছতীদং বর্জয়িত্বাহনিষ্ঠং জহাতি, তন্মানুষ্ঠীয়মানস্ত তথাভাবঃ সত্যার্থতাহবিপর্যয়ঃ। মন্ত্রপদানাঞ্চ বিবৃতাশনিপ্রতি-  
ষেধার্থানাং প্রয়োগেহর্থস্ত তথাভাব এতৎপ্রামাণ্যম্। কিং কৃতমেতৎ ?  
আপ্তপ্রামাণ্যকৃতম্। কিং পুনরাপ্তানাং প্রামাণ্যম্ ? সাক্ষাৎকৃতধর্মতা-  
ভূতদয়া যথা ভূতার্থচিখ্যাপরিবেতি। আপ্তাঃ খলু সাক্ষাৎকৃতধর্মগ ইদং  
হাতব্যমিদমস্ত হানিহেতুরিদমস্তাধিগন্তব্যমিদমস্তাধিগমহেতুরিতি ভূতা-  
স্তনুকম্পস্তে। তেষাং খলু বৈ প্রাণভূতাং স্বয়মনববুধ্যমানানাং নাত্মরূপ-  
দেশাদববোধকারণমস্তি। ন চানববোধে সমীহা বর্জনং বা, নবাহকৃত্বা  
স্বস্তিভাবো নাপ্যস্তাত্ম উপকারকোহপ্যস্তি। হস্ত বরমেভ্যো যথাদর্শনং  
যথাস্মৃতমুপদিশামস্ত ইমে ব্রহ্ম প্রতীপদ্যমানা হেয়ং হ্যস্তান্তাধিগন্তব্য-  
মেবাধিগমিষ্যন্তীতি। এবমাপ্তোপদেশ এতেন ত্রিবিধেনাপ্তপ্রামাণ্যেন  
পরিগৃহীতোহনুষ্ঠীয়মানোহর্থস্য সাধকো ভবতি এবমাপ্তোপদেশঃ প্রমাণং,  
এবমাপ্তাঃ প্রমাণম্।

দৃষ্টার্থেনাপ্তোপদেশেনায়ুর্বেদেনাদৃষ্টার্থে বেদভাগোহনুমাতব্যঃ প্রমাণ-

জ্ঞান্যং পক্ষঃ সাক্ষ্যেতৎ হেতুনা। ন তস্য হেতুজ্ঞান্যনুৎপত্তয়েন যো হতঃ। "পক্ষ" বলিতে এখানে প্রতিজ্ঞাব্যাক-  
বোধ সাধ্যবর্ধনবিশিষ্ট বর্ণ্য। উহা অগত্যাভিত হইলে কোন হেতুর দ্বারাই সিদ্ধ হইতে পারে না। যেমন "জানার  
জননী বধ্যা" এইরূপ প্রতিজ্ঞা হয় না। উহা কোন হেতুর দ্বারাই সিদ্ধ হয় না। তাৎপর্যটীকাকার তাঁহার ভাষ্যটী  
গ্রন্থেও ব্রহ্মবিধের প্রমাণের ব্যাখ্যা করিতে গ্রন্থে তাব্যাকার শব্দরও যে ব্রহ্মব্রহ্মণের সজ্ঞানমাই বলিয়াছেন, ইহা  
ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সেখানে "যথাহর্নৈয়ারিকাঃ" এই কথা বলিয়া পূর্বোক্ত কারিকাটি (২য় পুত্রভাষ্য ভাষ্যটীতে)  
উদ্ধৃত করিয়াছেন। আরও কোন কোন গ্রন্থে ঐ কারিকাটি উদ্ধৃত দেখা যায়। কিন্তু ঐটি দ্বারাই রচিত কারিকা,  
ইহা বাচস্পতিমিশ্র প্রকৃতি বলেন নাই।



মিতি । অস্ত্যপি চৈকদেশো “গ্রামকামো যজ্ঞেতে”ত্যেবমাদিদৃষ্টার্থ-  
স্তেনানুমাতব্যমিতি ।

লোকে চ ভূমানুপদেশাশ্রয়ো ব্যবহারঃ । লৌকিকস্বাপ্যপদেক্ষু-  
রূপদেক্ষব্যার্থজ্ঞানেন পরানুজিহ্বকরা যথাকৃতার্থচিৎখাপরিঘরা চ প্রামাণ্যং,  
তৎপরিগ্রহাদাপ্তোপদেশঃ প্রমাণমিতি । দ্রষ্টৃপ্রবক্তৃসামান্যাক্তানুমানং,  
—য এবাপ্তা বেদার্থানাং দ্রষ্টারঃ প্রবক্তারশ্চ, ত এবায়ুর্বেদপ্রভৃতীনাং,  
ইত্যায়ুর্বেদপ্রামাণ্যবদবেদপ্রামাণ্যমুমানাতব্যমিতি ।

অনুবাদ । ( প্রশ্ন ) আয়ুর্বেদের প্রামাণ্য কি ? ( উত্তর ) সেই আয়ুর্বেদ  
কর্তৃক যাহা উপদিষ্ট হইয়াছে, “ইহা করিয়া ইষ্ট লাভ করে, ইহা বর্জন করিয়া  
অনিষ্ট ত্যাগ করে,” অনুভূতীয়মান তাহার অর্থাৎ আয়ুর্বেদোক্ত সেই কর্তব্যের  
করণ ও অকর্তব্যের অকরণ বা বর্জনের তথ্যভাব—কি না সত্যার্থতা, অবিপর্যয় ।  
( অর্থাৎ আয়ুর্বেদের ঐ সকল উপদেশের সত্যার্থতা বা বিপর্যয় না হওয়াই তাহার  
প্রামাণ্য ) এবং বিষ, ভূত ও বজ্রের নিবারণার্থ অর্থাৎ বিষাদি নিবৃতি যাহাদিগের  
প্রয়োজন, এমন মন্ত্রপদগুলির প্রয়োগে অর্থের তথ্যভাব অর্থাৎ সত্যার্থতা,  
ইহাদিগের ( মন্ত্রপদগুলির ) প্রামাণ্য । ( প্রশ্ন ) ইহা অর্থাৎ আয়ুর্বেদ ও মন্ত্রের  
পূর্বেবাক্ত প্রামাণ্য কি প্রযুক্ত ? ( উত্তর ) আপ্তদিগের প্রামাণ্যপ্রযুক্ত ।  
( প্রশ্ন ) আপ্তদিগের প্রামাণ্য কি ? ( উত্তর ) সাক্ষাৎকৃতধর্ম্মতা অর্থাৎ উপদেষ্টব্য  
তত্ত্বের সাক্ষাৎকার, জীবে দয়া ( ও ) যথাকৃত পদার্থের খ্যাপনেচ্ছা । যে হেতু  
সাক্ষাৎকৃতধর্ম্মতা অর্থাৎ যাহারা উপদেষ্টব্য পদার্থের সাক্ষাৎ করিয়াছেন, এমন  
আপ্তগণ, “ইহা ত্যাজ্য, ইহা ইহার ত্যাগের হেতু, ইহা ইহার প্রাপ্য, ইহা ইহার প্রাপ্তি  
হেতু, এইরূপ উপদেশের দ্বারা প্রাণিগণকে দয়া করেন । যেহেতু স্বয়ং অনববুধ্যমান  
অর্থাৎ যাহারা নিজে বুকিতে পারে না, সেই প্রাণিগণের উপদেশ ভিন্ন  
( আপ্তদিগের বাক্য ভিন্ন ) জ্ঞানের কারণ নাই । জ্ঞান না হইলেও সমীহা ও  
বর্জন অর্থাৎ কর্তব্যের আচরণ ও অকর্তব্যের ত্যাগ হয় না, না করিয়াও অর্থাৎ  
কর্তব্যের আচরণ ও অকর্তব্যের ত্যাগ না করিলেও ( জীবের ) স্বস্তিভাব  
( মঙ্গলোৎপত্তি ) হয় না, এবং ইহার অর্থাৎ স্বস্তিভাবের অন্য় ( আপ্তোপদেশ  
ভিন্ন ) উপকারকও ( সম্পাদকও ) নাই । আহা, আমরা ইহাদিগকে যথাদর্শন  
অর্থাৎ যেরূপ তত্ত্ব দর্শন করিয়াছি, তদনুসারে যথাকৃত ( যথার্থ ) উপদেশ করিব,

ইহারা তাহা শ্রবণ করিয়া বোধ করতঃ ত্যাজ্য ত্যাগ করিবে, প্রাপ্যই প্রাপ্ত হইবে। এইরূপ আপ্তোপদেশ—এই ত্রিবিধ আপ্তপ্রামাণ্যবশতঃ অর্থাৎ আপ্তগণের পূর্বোক্ত তত্ত্বসাক্ষাৎকার, জীবে দয়া এবং যথাভূত পদার্থের খ্যাপনেচ্ছা, এই ত্রিবিধ প্রামাণ্যবশতঃ পরিগৃহীত হইয়া অমুদীয়মান হইয়া অর্থের (প্রয়োজনের) সাধক হয়। এইরূপ আপ্তোপদেশ প্রমাণ, এইরূপ (পূর্বোক্তরূপ) আপ্তগণ প্রমাণ।

দৃষ্টার্থক আপ্তোপদেশ আয়ুর্বেদ দ্বারা অর্থাৎ পূর্বোক্তরূপ সর্বসম্মত-প্রামাণ্য আয়ুর্বেদকে দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করিয়া, অদৃষ্টার্থক বেদভাগ প্রমাণরূপে অনুমেয় এবং ইহারও একদেশ অর্থাৎ অদৃষ্টার্থক বেদেরও অংশবিশেষ “গ্রামকাম ব্যক্তি যাগ করিবে” ইত্যাদি (বাক্য) দৃষ্টার্থ; তাহার দ্বারা অর্থাৎ তাহাকে দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করিয়া (অদৃষ্টার্থক বেদভাগের প্রামাণ্য) অনুমেয়।

লোকেও বহু বহু উপদেশাশ্রিত ব্যবহার আছে। লৌকিক উপদেষ্টার ও উপদেষ্টব্য পদার্থের জ্ঞানবশতঃ পরের প্রতি অনুগ্রহের ইচ্ছাবশতঃ—এবং যথাভূত পদার্থের খ্যাপনেচ্ছাবশতঃ প্রামাণ্য, অর্থাৎ লৌকিক আপ্তদিগেরও পূর্বোক্তরূপ ত্রিবিধ প্রামাণ্য,—সেই প্রামাণ্যের পরিগ্রহবশতঃ আপ্তোপদেশ (লৌকিক আপ্তবাক্য) প্রমাণ।

দ্রষ্টা ও বক্তার সমানতা-প্রযুক্তও অনুমান হয়। বিশদার্থ এই যে, যে সকল আপ্তগণ বেদার্থের দ্রষ্টা ও বক্তা, তাঁহারা ই আয়ুর্বেদপ্রভৃতির দ্রষ্টা ও বক্তা, এই হেতু দ্বারা আয়ুর্বেদের প্রামাণ্যের ন্যায় বেদপ্রামাণ্য অনুমেয়।

টিপ্পনী। ময় ও আয়ুর্বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করা যায় না; উহা সর্বসাধারণের জ্ঞাত না হইলেও পরীক্ষকগণ উহা স্বীকার করেন, তাঁহারা উহা জানেন। তাই মহর্ষি উহাকে বেদপ্রামাণ্যের দৃষ্টান্তরূপে উল্লেখ করিয়াছেন। কেবল পরীক্ষকমাত্র-বেদ্য পদার্থও যে বাদী ও প্রতিবাদীর স্বীকৃত প্রমাণনিষ্ঠ হইলে দৃষ্টান্ত হইতে পারে, ইহা প্রথমোক্তে দৃষ্টান্তের ব্যাখ্যায় বলা হইয়াছে। ময় ও আয়ুর্বেদের প্রামাণ্য যে প্রমাণনিষ্ঠ, ইহা বুঝাইয়া উহার দৃষ্টান্ত স্ব সমর্থন করিতেই ভাষ্যকার প্রথমে বলিয়াছেন যে, আয়ুর্বেদে উপদিষ্ট কর্তব্যের করণ ও অকর্তব্যের বর্জন অনুজ্ঞা-মান হইলে তাহার ফল ইষ্টলাভ ও অনিষ্টনিবৃত্তি (যাহা আয়ুর্বেদে কথিত) হইয়া থাকে। সুতরাং আয়ুর্বেদে উপদিষ্ট কর্তব্যের ‘তথাভাব’ই দেখা যায়,—“তথাভাব” বলিতে সত্যার্থতা। আয়ুর্বেদোক্ত কর্তব্যের অহুষ্ঠান করিলে তাহার আয়ুর্বেদোক্ত প্রয়োজন বা ফল সত্য দেখা যায়, সুতরাং উহা সত্যার্থ। ভাষ্যকার পরে আবার “অবিপর্যয়” শব্দের দ্বারা প্রথমোক্ত ঐ সত্যার্থতাই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অর্থাৎ আয়ুর্বেদোক্ত কর্তব্যের, আয়ুর্বেদোক্ত ফলের বিপর্যয় হয় না, ইহাই তাহার তথাভাব বা সত্যার্থতা এবং উহাই আয়ুর্বেদের প্রামাণ্য। আয়ুর্বেদ প্রমাণ না হইলে



পূর্বোক্তরূপ সত্যার্থতা-কখনই দেখা যায় না। এইরূপ বিষ, ভূত ও বস্তুনিবারণার্থ যে সকল মন্ত্র আছে, তাহার বখাবিধি প্রয়োগ হইলে তাহারও অর্থ কি না—প্রয়োজনের 'তথ্যার্থ'ই দেখা যায়। অর্থাৎ সেই সেই স্থলে মন্ত্রপ্রয়োগের প্রয়োজন বিবাদি নিবৃত্তি সেইরূপই হইয়া থাকে, তাহারও বিপর্যয় দেখা যায় না। সুতরাং সেই সকল মন্ত্রেরও প্রামাণ্য অবশ্য স্বীকার্য। এখন যদি মন্ত্র ও আয়ুর্বেদের প্রামাণ্য প্রমাণসিদ্ধ হইল, তাহা হইলে উহা দৃষ্টান্ত হইতে পারে, এবং ঐ প্রামাণ্যের বাহ্যি হেতু, সেই হেতুর দ্বারা ঐ দৃষ্টান্তে বেদেরও প্রামাণ্য সিদ্ধ হইতে পারে। তাই ভাষ্যকার পূর্বোক্ত মন্ত্র ও আয়ুর্বেদের প্রামাণ্য কি-প্রযুক্ত? এই প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছেন যে, উহা আপ্ত-প্রামাণ্য-প্রযুক্ত। ইহাতে আপ্তের লক্ষণ কি, তাহাদিগের প্রামাণ্য কি, ইহা বলা আবশ্যক। আপ্ত-প্রামাণ্য কি, তাহা না বুঝিলে তৎপ্রযুক্ত মন্ত্র ও আয়ুর্বেদের প্রামাণ্যের দ্বারা বেদের প্রামাণ্য বুঝা যায় না। এ জন্ত ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, সাক্ষাৎকৃতধর্মতা, ভূতদ্বারা এবং বখাভূত পদার্থের ধ্যাপনেচ্ছা—এই ত্রিবিধ ধর্মই আপ্তপ্রামাণ্য। ভাষ্যকার প্রথমাধ্যায়ে শব্দপ্রমাণের লক্ষণ-সূত্র-ভাষ্যে ( ৭ম সূত্রভাষ্যে ) আপ্ত শব্দের ব্যুৎপত্তি ও আপ্তের লক্ষণ বলিয়াছেন। সেখানে বলিয়াছেন যে, যিনি ধর্ম অর্থাৎ উপদেশের পদার্থকে সাক্ষাৎকার করিয়া, সেই বখাদৃষ্ট পদার্থের ধ্যাপনেচ্ছা-বশতঃ বাক্যপ্রয়োগে কৃতবর এবং বাক্যপ্রয়োগ বা উপদেশ করিতে সমর্থ, এমন ব্যক্তিকে আপ্ত বলে। তাৎপর্যটীকাকার সেখানে ভাষ্যকারের “সাক্ষাৎকৃতধর্মতা” এই কথায় বাখ্যা করিয়াছেন যে, যিনি ধর্মকে অর্থাৎ হিতার্থ ও আহিতনিবৃত্ত্যর্থ পদার্থগুলিকে সাক্ষাৎকার করিয়াছেন, অর্থাৎ কোন স্পষ্ট প্রমাণের দ্বারা নিশ্চয় করিয়াছেন, তিনি সাক্ষাৎকৃতধর্মতা। লৌকিক আপ্তগণ কোন তর প্রত্যক্ষ না করিয়াও অল্প কোন স্পষ্ট প্রমাণের দ্বারা নিশ্চয় করিয়া তাহার উপদেশ করেন, তাহাও আদ্যোপদেশ। ঐ স্থলে সেই লৌকিক ব্যক্তিও আপ্ত হইবেন, তাহাকে ঐ স্থলে অনাপ্ত বলা যাইবে না, ইহাই তাৎপর্যটীকাকারের ঐরূপ ব্যাখ্যার মূল। ভাষ্যকার প্রথমাধ্যায়ে আপ্তের লক্ষণে প্রয়োজনবশতঃ অস্তান্ত বিশেষণ বলিলেও এখানে আপ্ত-প্রামাণ্য কি, ইহাই বলিতে পূর্বোক্তরূপ সাক্ষাৎকৃতধর্মতা, ভূতদ্বারা এবং বখাভূত পদার্থের ধ্যাপনেচ্ছা, এই তিনটি ধর্মই বলিয়াছেন। পূর্বোক্ত আপ্তলক্ষণসম্পন্ন ব্যক্তির ঐ তিনটি ধর্ম থাকতেই তাহার বখা উপদেশ করেন, সুতরাং উহাই তাহাদিগের প্রামাণ্য বলা যায়। উদ্যোতকর এখানে পূর্বোক্ত ত্রিবিধ বিশেষণবিশিষ্ট ব্যক্তিকেই আপ্ত বলিয়াছেন। তাৎপর্যটীকাকার বলিয়াছেন যে, উদ্যোতকরের “ত্রিবিধেন বিশেষণেন” এই কথা উপলক্ষণ। উহার দ্বারা করণপাটবও বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ পূর্বোক্ত ত্রিবিধ বিশেষণবিশিষ্ট হইলেও যদি তাহার শব্দ প্রয়োগের কারণ কর্তাদি বা ইচ্ছাদির পটুতা না থাকে, তবে তিনি আপ্ত হইতে পারেন না। সুতরাং আপ্তের লক্ষণে করণের পটুতাও বিশেষণ বলিতে হইবে। বস্তুতঃ ভাষ্যকারও প্রথমাধ্যায়ে আপ্তের লক্ষণ বলিতে “উপদেষ্টা” এই কথায় দ্বারা উপদেশসমর্থ ব্যক্তিকে আপ্ত বলিয়া করণপাটব বিশেষণেরও প্রকাশ করিয়াছেন, এবং সেখানে “প্রযুক্ত” শব্দের দ্বারা অলপ্তহীনতা বিশেষণেরও প্রকাশ করিয়াছেন। আপ্তের লক্ষণে ভূতদ্বারা উল্লেখ করেন নাই। আপ্তের লক্ষণ বলিতে সেখানে



ভূতদ্বার উল্লেখের কোন প্রয়োজন মনে করেন নাই। এখানে আগের প্রামাণ্য কি? একত্বত্বের ভাষাকার তিনটি ধর্মের উল্লেখ করিয়া, পরে উহা সমর্থন করিতে বলিয়াছেন যে, সাক্ষাৎকৃতধর্ম। আগুগণ জীবের তাজা ও ত্যাগের হেতু, এবং প্রাণ্য ও প্রাণির হেতু উপদেশ করিয়া জীবকে রূপা করেন। কারণ, অজ জীব নিজ তাহাদিগের তাজা ও গ্রাহ প্রভৃতি বুঝিতে পারে না। তাহাদিগের কর্তব্য ও অকর্তব্য বুঝিবার পক্ষে আগুগণের উপদেশ ভিন্ন আর কোন উপায় নাই। কর্তব্য না বুঝিলে জীব তাহা করিতে পারে না; অকর্তব্য না বুঝিলেও তাহা বর্জন করিতে পারে না। কর্তব্যের অহুষ্ঠান ও অকর্তব্যের বর্জন না করিয়া যথেষ্টচারী হইলে মঙ্গল নাই, তাহাতে জীবের দুঃখনিবৃত্তি অসম্ভব। আশোপদেশ বাতীত জীবের মঙ্গলের আর কোন উপায়ও নাই। এই জন্ত জীবের দুঃখমোচনে ব্যগ্র আগুগণ দয়াজ্ঞ হইয়া মনে করেন যে, আমরা জীবের দুঃখনিবৃত্তি ও সুখের জন্ত ইহাদিগকে আমাদিগের দর্শন বা জ্ঞানানুসারে যথাকৃত তত্ত্বের উপদেশ করিব; ইহারা তাহা শুনিয়া ও বুঝিয়া, তদনুসারে তাজা ত্যাগ করিবে, গ্রাহ গ্রহণ করিবে, অর্থাৎ কর্তব্যের অহুষ্ঠান ও অকর্তব্যের বর্জন করিবে, তাহাতে ইহারা সুখী ও দুঃখমুক্ত হইবে।

ভাষাকার “আপ্তাঃ খলু” ইত্যাদি সন্দর্ভের দ্বারা পূর্বোক্ত কথাগুলি বলিয়া, সাক্ষাৎকৃতধর্মতা বা তবদর্শিতা এবং ভূতদ্বার ও যথাকৃত পদার্থের খাপনেন্দ্ৰ, এই ত্রিবিধ আগুপ্রামাণ্যের সমর্থন করিয়াছেন। ভাষাকারের মূল তাৎপর্য্য এই যে, আয়ুর্বেদাদির বাহারা বক্তা, তাঁহারা নিশ্চয়ই সেই উপদিষ্ট তত্ত্বের সাক্ষাৎকার করিয়াছেন। কারণ, ঐ সকল তত্ত্বের সাক্ষাৎকার বাতীত তাহার ঐরূপ উপদেশ করা যায় না। সুতরাং আয়ুর্বেদাদির বক্তাকে তবদর্শী বলিতে হইবে, এবং দয়াবান ও যথাদৃষ্ট তত্ত্ব খাপনে ইচ্ছুকও বলিতে হইবে। তাঁহারা অজ বা ভ্রান্ত হইলে তাহাদিগের বাক্য আয়ুর্বেদাদি কখনই পূর্বোক্তরূপ প্রমাণ হইত না। তাঁহারা নির্দয় বা প্রতারণা হইলেও তাহা হইত না। তাঁহারা জীবের প্রতি দয়াবশতঃ যথাদৃষ্ট তত্ত্ব খাপনে ইচ্ছুক না হইলেও আয়ুর্বেদাদি বলিতেন না। সুতরাং পূর্বোক্ত ত্রিবিধ আগুপ্রামাণ্য অবশ্য স্বীকার্য্য। ঐ আগুপ্রামাণ্যবশতঃই আশোপদেশ আয়ুর্বেদাদি গৃহীত হইয়া থাকে এবং উহা অহুষ্ঠান হইয়া ফলসাপেক্ষ হয়। অর্থাৎ আয়ুর্বেদাদির বক্তা আগুগণের পূর্বোক্তরূপ প্রামাণ্যবশতঃই আয়ুর্বেদাদিকে গ্রহণপূর্বক তাহার বিধিনিষেধের প্রতিপালন করিয়া যথোক্ত ফল লাভ করে। এইরূপে আশোপদেশ প্রমাণ এবং পূর্বোক্তরূপে আগুগণও প্রমাণ। পূর্বোক্ত তবদর্শিতা প্রভৃতি ত্রিবিধ গুণই আগুনিগের প্রামাণ্য। তৎপ্রযুক্তই তাহাদিগের উপদেশ প্রমাণ।

ভাষাকার সূত্রকারোক্ত মন্ত্র ও আয়ুর্বেদের প্রামাণ্য সমর্থন করিয়া, উহা আগুপ্রামাণ্য-প্রযুক্ত, ইহা বলিয়া, ঐ আগুপ্রামাণ্যের স্বরূপ বর্ণন ও সমর্থনপূর্বক শেষে প্রকৃত কথা বলিয়াছেন যে, দৃষ্টার্ণক আশোপদেশ যে আয়ুর্বেদ, তদ্বারা অর্থাৎ তাহাকে দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করিয়া, অদৃষ্টার্ণক বেদভাগকে অর্থাৎ “বর্গকামোহনেনধেন যজ্ঞত” ইত্যাদি বেদভাগকে প্রমাণ বলিয়া অহুমান করা যায়। অদৃষ্টার্ণক বেদের মধ্যেও “গ্রামকামো যজ্ঞত” ইত্যাদি যে দৃষ্টার্ণক বেদ আছে, তাহাকে দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করিয়াও অদৃষ্টার্ণক বেদের প্রামাণ্য অহুমান করা যায়। কারণ, গ্রাম



কামনার এই বেদের বিধি অনুসারে “স্বাঃপ্রবী” যাগ করিলে গ্রাম লাভ হয়, ইহা বহু স্থলে দেখা গিয়াছে; সুতরাং এই সকল দৃষ্টান্তক বেদের প্রামাণ্য অবশ্য স্বীকার্য। তাহা হইলে এই দৃষ্টান্তে বেদের অল্প অংশকেও প্রমাণ বলিয়া অস্বাভাবিক-প্রমাণের দ্বারা নিশ্চয় করা যায়। বেদের অংশ-বিশেষ প্রমাণ হইলে অল্প অংশ অপ্রমাণ হইতে পারে না। কারণ, প্রামাণ্যের বাহ্য প্রবোজক, তাহা এই উভয় অংশেই এক। ভাষ্যকার শেষে ইহাও বলিয়াছেন যে, লোকেও উপদেশাশ্রিত ব্যবহার বহু বহু চলিতেছে। বহু বহু লৌকিক বাক্যের প্রামাণ্যবশতঃ তদনুসারে ব্যবহার চলিতেছে। সেই লৌকিক বাক্যবক্তাব্যাপ্তি, ইহা অবশ্য স্বীকার্য। তাঁহাদিগেরও পুরোক্তরূপ জীবিত প্রামাণ্য থাকার তাঁহাদিগের বাক্য প্রমাণ। কল কথা, মহর্ষি, মন্ত্র ও আয়ুর্বেদের প্রামাণ্যকে বেদ-প্রামাণ্যের দৃষ্টান্তরূপে উল্লেখ করিলেও অদৃষ্টান্তক বেদের অংশ-বিশেষ দৃষ্টান্তক বেদভাগ এবং বহু বহু লৌকিক বাক্যের প্রামাণ্যকেও বেদের প্রামাণ্যের দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করা যায় এবং তাহাও স্বতন্ত্রকার মহর্ষির অভিপ্রেত, ইহাই ভাষ্যকার শেষে জানাইয়াছেন এবং অস্বাভাবিক মন্ত্র, আয়ুর্বেদ, দৃষ্টান্তক বেদ ও লৌকিক আপ্তবাক্যকেই দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করিতে হইবে, স্বতন্ত্রকারের ভাগই বিবক্ষিত, ইহাও ভাষ্যকার জানাইয়াছেন। ভাষ্যকার শেষে অল্প রূপ হেতুর দ্বারাও যে আয়ুর্বেদাদি দৃষ্টান্ত অবলম্বনে বেদের প্রামাণ্যের অস্বাভাবিকতা করা যায় এবং তাহাও স্বতন্ত্রকারের বিবক্ষিত আছে, ইহা জানাইতে বলিয়াছেন যে, যে সকল আপ্তগণ বেদার্থের ত্রুটি ও বক্তা, তাঁহারাও যখন আয়ুর্বেদ প্রভৃতির ত্রুটি ও বক্তা, তখন আয়ুর্বেদাদি প্রমাণ হইলে, বেদও প্রমাণ হইবে। বেদ ও আয়ুর্বেদ প্রভৃতির ত্রুটি ও বক্তা সমান হইলে, আয়ুর্বেদ প্রভৃতি প্রমাণ হইবে, কিন্তু বেদ প্রমাণ হইবে না, ইহা কখনই হইতে পারে না। আয়ুর্বেদ প্রভৃতির বক্তার আপ্তব নিশ্চয় হওয়ার বেদের বক্তাও যে আপ্ত, ইহাতে সন্দেহ হইতে পারে না। কারণ, বেদ ও আয়ুর্বেদ প্রভৃতির ত্রুটি ও বক্তা অভিন্ন।

যুক্তিকার বিখ্যাত এবং তদন্তাত্ত্ববর্তী নব্যগণ মহর্ষির স্বার্থ ব্যাখ্যা করিতে বলিয়াছেন যে, বিবাদিনাশক মন্ত্র ও আয়ুর্বেদ-ভাগ বেদেরই অন্তর্গত। মন্ত্র ও আয়ুর্বেদের প্রামাণ্য যখন নিশ্চিত, তখন তদনুসারে বেদমাত্রকেই প্রমাণ বলিয়া অস্বাভাবিক দ্বারা নিশ্চয় করা যায়। কারণ, বেদের অংশবিশেষ প্রমাণ বলিয়া নিশ্চিত হইলে অল্প অংশও প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। অবশ্য কোন ঋষের অংশবিশেষ প্রমাণ হইলেও ঋষকারের স্রমপ্রমাদাদিবশতঃ তাহার অংশবিশেষ অপ্রমাণও হইতে পারে ও হইয়া থাকে, কিন্তু মন্ত্র ও আয়ুর্বেদরূপ বেদভাগের প্রামাণ্য নিশ্চয়ের ফলে তাহার বক্তা যে অলৌকিকার্থবর্ণী কোন সর্বজ্ঞ অত্রাণ পুরুষ, অর্থাৎ স্বয়ং ঈশ্বর, ইহা নিশ্চয় করা যায়। সর্বজ্ঞ ঈশ্বর ব্যতীত মন্ত্র ও আয়ুর্বেদের কর্তা আর কেহ হইতেই পারেন না। সুতরাং বেদের অল্প অংশও যে মন্ত্র ও আয়ুর্বেদের দৃষ্টান্তে প্রমাণ হইবে, এ বিষয়ে সংশয়

১। অল্প অংশঃ—প্রমাণ বেদবাক্যানি বহু বিশেষাভিহিততঃ মন্ত্রাঃ প্রমাণবাক্যবিশিষ্ট। এককর্তৃকত্বেন বা মন্ত্রাঃ প্রমাণবাক্যানি পক্ষান্ততঃ অলৌকিকবিষয়-প্রতিপাদকত্বেন বৈশ্বাত্মকত্বকর্তব্যঃ।—ভাষ্যকারিক। মন্ত্রাঃ প্রমাণবাক্যানি সর্বজ্ঞপূর্ণকণি, মহাজন-পরিগ্রহে সতি অলৌকিকার্থপ্রতিপাদকত্বাৎ ইত্যাদি।—তৎপরিচয়িকা।



হইতে পারে না। বেদের অংশবিশেষ মন্ত্র ও আয়ুর্বেদ যদি ঈশ্বর-প্রণীত বলিয়া স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে সমগ্র বেদই ঈশ্বর-প্রণীত, ইহা স্বীকার্য। অদৃষ্টার্থ বেদভাগ ঈশ্বর-প্রণীত নহে, উহা অপরের প্রণীত, এ বিষয়ে কোন প্রমাণ নাই। সুতরাং বেদকর্তা ঈশ্বরের ভ্রম-প্রমানাদি না থাকায় তাঁহার কৃত বেদের কোন অংশই অপ্রমাণ হইতে পারে না। মন্ত্র ও আয়ুর্বেদেরূপ বেদভাগকে দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করিয়া বেদমাত্রের প্রামাণ্য অস্বীকার্য। বৃত্তিকার প্রভৃতি পুরোক্তরূপ ব্যাখ্যা করিলেও ভাষ্যকার প্রভৃতি প্রাচীনগণের ব্যাখ্যার দ্বারা মহর্ষি পোতম যে এই সূত্রে বেদের অন্তর্গত মন্ত্র ও আয়ুর্বেদের প্রামাণ্যকেই দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করিয়া, বেদমাত্রের প্রামাণ্য সাধন করিয়াছেন, তাহা নিঃসংশয়ে বুঝা যায় না। পরন্তু ভাষ্যকার বেদার্থের দ্রষ্টা ও বক্তাকেই আয়ুর্বেদ প্রভৃতির দ্রষ্টা ও বক্তা বলার তিনি যে এখানে স্বত্রোক্ত মন্ত্র ও আয়ুর্বেদকে মূল বেদ হইতে পৃথক্ বলিয়াছেন, ইহা বুদ্ধিতে পারা যায়। একই বেদব্যাঙ্গ বহুবিধ বিভিন্ন শাস্ত্রের বক্তা হইয়াছেন। সুতরাং দ্রষ্টা বা বক্তা অভিন্ন হইলেই যে শাস্ত্র এক হইবে, ইহা বলা যায় না। ভাষ্যকার চতুর্থাদ্যায়ের ৩২ স্বত্র-ভাষ্যে মন্ত্র, ব্রাহ্মণ, ইতিহাস, পুরাণ ও ধর্ম-শাস্ত্রের বক্তা ও দ্রষ্টাকেও অভিন্ন বলিয়াছেন। পরন্তু ভাষ্যকার “অদৃষ্টার্থক বেদভাগ” বলিয়া এখানে আয়ুর্বেদকে দৃষ্টার্থক বেদরূপে গ্রহণ করিয়াছেন, ইহাও বুঝা যায় না। কারণ, অদৃষ্টার্থক বেদভাগের অন্তর্গত দৃষ্টার্থক বেদের দ্বার অথর্ববেদের অন্তর্গত আরও বহু বহু দৃষ্টার্থক বেদ আছে। ভাষ্যকার “তস্তাপি চৈকদেশঃ” এই কথা দ্বারা তাহাকেও দৃষ্টান্তরূপে স্বীকৃতি করিয়াছেন। “চ” শব্দের দ্বারা অন্যান্য সমস্ত দৃষ্টার্থক বেদেরও সমুচ্চয় করিয়াছেন, ইহাও বুঝা যাইতে পারে। পরন্তু মহর্ষি চরক ও সুশ্রুত বাহ্যকে আয়ুর্বেদ বলিয়াছেন, তাহা যে মূল বেদেরই অংশবিশেষ, ইহা বুঝা যায় না। চরকসংহিতার আয়ুর্বেদজগণ চতুর্বেদের মধ্যে কোন বেদের উল্লেখ করিবেন, এই প্রশ্নোত্তরে অথর্ব বেদের উল্লেখ করা হইয়াছে। কারণ<sup>১</sup>, অথর্ববেদ দান, স্বত্যয়ন, বলি, মঙ্গল, হোম, নিয়ম, প্রায়শ্চিত্ত, উপবাস ও ময়াদির পরিগ্রহবশতঃ চিকিৎসা বলিয়াছেন। ইহার দ্বারা ঐ আয়ুর্বেদ অথর্ববেদমূলক শাস্ত্রান্তর, ইহা বুঝা যায়। অথর্ববেদে আয়ুর্বেদের মূল তত্ত্ব থাকিলেও চরকোক্ত আয়ুর্বেদ যে মূল বেদেরই অংশবিশেষ, ইহা বুঝা যায় না। তাহা হইলে চরক, আয়ুর্বেদের শাখতত্ত্ব সমর্থন করিতে অন্তরূপ নানা হেতুর উল্লেখ করিবেন কেন? পরন্তু সুশ্রুত, আয়ুর্বেদকে অথর্ববেদের উপাদ বলিয়া উল্লেখপূর্বক আয়ুর্বেদের উৎপত্তি বর্ণনায় বলিয়াছেন যে<sup>২</sup>, “স্বয়ম্ প্রজা স্বষ্টীর পূর্বেই সহস্র অব্যায় ও শত সহস্র শ্লোক করিয়া-ছিলেন। পরে মহাভাগ্যশ্রীর অন্ন মেধা ও অন্ন আয়ু দেখিয়া পুনর্বার অষ্ট প্রকারে প্রণয়ন করেন।” সুশ্রুতের কথায় বুঝা যায়, স্বয়ম্ভূত সেই সহস্র অব্যায়, শত সহস্র শ্লোকই আয়ুর্বেদ শব্দের

১। কোনো হি অথর্বা দান-স্বত্যয়ন-বলি-মঙ্গল-হোম-নিয়ম-প্রায়শ্চিত্তোপবাসময়াদি-পরিগ্রহাভিকিৎসাঃ প্রাঃ।—চরকসংহিতা, স্বত্যয়ন, ৩০ অঃ।

২। ইহ পঞ্চায়ুর্বেদো নান বহুশাখাঅথর্ববেদভাঃস্বপাঠোব প্রজাঃ শ্লোকশতসহস্রাব্যায়সহস্রক কৃতবান্ স্বয়ম্। ততোহন্যস্তু, সমসেব স্বকাবলোক্য নরপাণ্ডু ক্রোহিত্বা প্রণীতবান্।—সুশ্রুতসংহিতা, ১ম অঃ।



বাচ্য, উহা অর্থক্বেদের উপাঙ্গ অর্থাৎ অঙ্গসদৃশ। সুশ্রুতোক্ত ঐ আয়ুর্কেন্দ মূল অর্থক্বেদেরই অংশবিশেষ হইলে, সুশ্রুত তাহাকে অর্থক্বেদের উপাঙ্গ বলিবেন কেন? বেদের অংশবিশেষকে কুত্রাপি বেদের উপাঙ্গ বলা হয় নাই। বেদ ভিন্ন শাস্ত্রবিশেষকেই বেদের উপাঙ্গ বলা হইয়াছে— যেমন জ্যোতিষ শাস্ত্র এবং অঙ্গসদৃশ অর্থাৎ ঐ “উপাঙ্গ” শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। সাদৃশ্য অর্থে “উপ” শব্দের প্রয়োগ চিরদিন। ভাষ্যকার বাৎস্যায়নও প্রথমাধ্যায়ে উপমান-প্রমাণের ব্যাখ্যায় “উপ” শব্দের সাদৃশ্য অর্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। পরন্তু সুশ্রুত, আয়ুর্কেন্দ শব্দের “বদ্বার” আয়ু লাভ করা যায়, অথবা বাহাতে আয়ু বিদ্যমান আছে” এইরূপ বৌদ্ধিক অর্থ ব্যাখ্যা করার “আয়ুর্কেন্দ” শব্দের অন্তর্গত বেদ শব্দটি প্রতিবোধক নহে, ইহাও স্বীকার্য। চরকসংহিতাতেও “আয়ুর্কেন্দ” শব্দের ব্যুৎপত্তি ও আয়ুর্কেন্দের উৎপত্তি বর্ণিত আছে। প্রথমে “ত্রিহৃত” ছিল, ইহাও চরক বলিয়াছেন। ঋষিগণ ইন্ড্রের নিকট বাইরা বাঁধির উপশমের উপায় জিজ্ঞাসা করিলে, ইন্ড্র তাহানিগকে আয়ুর্কেন্দের বার্তা বলিয়াছিলেন, ইহা চরকসংহিতার প্রথমাধ্যায়ে বর্ণিত আছে। মূলকথা, চরক ও সুশ্রুত-বর্ণিত আয়ুর্কেন্দ মূল অর্থক্বেদের অংশ নহে, ইহা চরকাদির কথার দ্বারাই স্পষ্ট বুঝা যায়। মহর্ষি গোতম ঐ আয়ুর্কেন্দের মূল অর্থক্বেদোংশকে এখানে “আয়ুর্কেন্দ” শব্দের দ্বারা গ্রহণ করিয়াছেন, ইহাও মনে হয় না। কারণ, স্মৃতির মূল ভূমিতে যেমন স্মৃতি শব্দের প্রয়োগ হয় না, তজ্জপ আয়ুর্কেন্দের মূল বেদেও আয়ুর্কেন্দ শব্দের প্রয়োগ সমুচিত নহে। পরন্তু আয়ুর্কেন্দের মূল অর্থক্বেদোংশকে “আয়ুর্কেন্দ” বলা গেলে আয়ুর্কেন্দের বেদও বিষয়ে পূর্বাচাৰ্য্যগণের বিবাদও হইতে পারে না। পূর্বাচাৰ্য্য জরস্তু ভট্ট “ভাদমঞ্জরী” গ্রন্থে অর্থক্বেদের বেদস্ব সম্বন্ধে করিতে বাহা বলিয়াছেন, তাহাতে তিনি আয়ুর্কেন্দের বেদস্ব স্বীকার করিতেন না, ইহা স্পষ্ট জানা যায় (ভাদমঞ্জরী, ২৫৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। তব্ধিচ্ছান্দনিকার গঙ্গেশ শব্দচিন্তামণির তাৎপর্য্যবাদ গ্রন্থে আয়ুর্কেন্দ প্রভৃতিকে বেদের লক্ষণের লক্ষ্যরূপে গ্রহণ করেন নাই। সেখানে চীকাকার মধুরানাত, দৃষ্টার্থক আয়ুর্কেন্দ প্রভৃতির বেদস্ব সর্বসম্মত নহে, ইহা বলিয়া, গঙ্গেশের বেদলক্ষণের দোষ পরিহার করিয়াছেন (তাৎপর্য্য-মাধুরী, ৩৪৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। চরণব্যাহকার শৌনক আয়ুর্কেন্দকে স্বগবেদের উপবেদ বলিয়া শল্যশাস্ত্রকে অর্থক্বেদের উপবেদ বলিয়াছেন। সুশ্রুতের সহিত শৌনকের আংশিক মতভেদ থাকিলেও তাহার মতেও আয়ুর্কেন্দ যে মূল বেদ নহে, ইহা বুঝা যায়। পরন্তু বিষ্ণুপুরাণে যে অষ্টাদশ বিদ্যার পরিগণনা আছে, তাহাতে বেদচতুষ্টয় হইতে আয়ুর্কেন্দের পৃথক উল্লেখ থাকায় বিষ্ণুপুরাণে আয়ুর্কেন্দ যে মূল বেদচতুষ্টয় হইতে ভিন্নই কথিত হইয়াছে, ইহা স্পষ্টই বুঝা যায়। মহর্ষি যাক্ষবল্য ধর্ম্মস্থান চতুর্দশ বিদ্যারই উল্লেখ করার আয়ুর্কেন্দ প্রভৃতি বিষ্ণুপুরাণোক্ত চারিটি বিদ্যার উল্লেখ করেন নাই। কারণ, আয়ুর্কেন্দ প্রভৃতি বিদ্যাস্থান হইলেও ধর্ম্মস্থান নহে। মূল কথা, আয়ুর্কেন্দ মূল বেদ না হইলেও তাহার প্রামাণ্য যেমন সর্বসম্মত—কারণ, তাহার বক্তা আপ্ত, তাহার প্রামাণ্য আছে,

১। শাস্ত্রবিশিষ্ট বিদ্যাজ্ঞানেন বা, আয়ুর্কেন্দতীতায়ুর্কেন্দঃ।—সুশ্রুতসংহিতা, ১ম অা।

২। প্রথম খণ্ডের হুমিকার তৃতীয় পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।



তজপ সৰ্বশাস্ত্রের মূল বেদও প্রমাণ—কারণ, তাহার বক্তা আপ্ত, তাহার প্রামাণ্য আছে, ইহাই ভাষ্যকারের মতে স্বত্বকার মহর্ষির তাৎপর্য বুঝা যায়।

স্বাত্মস্বত্বকার মহর্ষি গোতম বেদপ্রামাণ্য সমর্থন করিতে "আপ্তপ্রামাণ্যং" এই কথা বলায় বেদ আপ্ত পুরুষের বাক্য, তাহা তাহার মত বুঝা যায় এবং তিনি শব্দ ও অর্থের স্বাভাবিক সম্বন্ধবাদ খণ্ডন করার এবং শব্দের নিত্য মত খণ্ডন করিয়া অনিত্য মতের সংস্থাপন করার নীতিসম্মত বেদের অপৌরুষেয় মত তাহার সম্মত নহে, ইহা বুঝা যায়। কিন্তু সূত্রে "আপ্তপ্রামাণ্যং" এই স্থলে আপ্ত শব্দের দ্বারা তিনি কাহাকে লক্ষ্য করিয়াছেন, ইহা স্পষ্ট বুঝা যায় না। উদ্যোতকর স্বত্বার্থের বর্ণনায় বেদকে পুরুষবিশেষাভিহিত বলিয়াছেন। সেই পুরুষবিশেষ আপ্ত। উদ্যোতকরের কথার দ্বারা তাহার মতে ঐ আপ্ত পুরুষ যে স্বরং ঐশ্বর, তাহা বুঝা যায় না। তিনি স্পষ্ট করিয়া বেদকর্তাকে ঐশ্বর বলেন নাই। ভাষ্যকারও তাহা বলেন নাই। তিনি বলিয়াছেন, আপ্তগণ বেদার্থের ত্রুটি ও বক্তা। কোন এক ব্যক্তিই যে সকল বেদের বক্তা, ইহাও ভাষ্যকারের মত বুঝা যায় না। তাৎপর্যটীকাকার উদ্যোতকরের অভিপ্রায় বর্ণন করিতে বেদকে পুরুষবিশেষ ঐশ্বরের প্রণীত বলিয়াই সমর্থন করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, ভগৎকর্তা ভগবান্ পরম-কারণিক ও সৰ্বজ্ঞ। ইষ্টলাভ ও অনিষ্টনিবৃত্তির উপায় বিবরে অস্ত্র এবং বিবিধ দুঃখানলে নিরত দহমান জীবের দুঃখমোচনের জন্ত তিনি অবশ্যই উপদেশ করিয়াছেন। কৰুণাময় ভগবান্ জীবের পিতা, তিনি জীব সৃষ্টি করিয়া কৰ্মফলানুসারে দুঃখভোগী জীবের দুঃখমোচনের জন্ত উপদেশ না করিয়াই থাকিতে পারেন না। সুতরাং তিনি যে সৃষ্টির পরেই জীবগণকে হিতপ্রাপ্তি ও অহিত-নিবৃত্তির উপায় উপদেশ করিয়াছেন, এ বিবরে সংশয় নাই। বেদই ভগবানের সেই উপদেশ-বাক্য। শাক্য প্রভৃতি কাহারও শাস্ত্র ভগবানের বাক্য নহে। কারণ, শাক্য প্রভৃতি ভগৎকর্তা নহেন, তাহা-দিগের সৰ্বজ্ঞতাও সন্দিগ্ধ। ঋষি মহর্ষি প্রভৃতি মহাজনগণ শাক্য প্রভৃতির শাস্ত্রকে ঐশ্বর-বাক্য বলিয়াও গ্রহণ করেন নাই। বর্ণাশ্রমচার-ব্যবস্থাপক বেদই সকল শাস্ত্রের আদি এবং সৰ্বাঙ্গে তাহাই ঋষি মহর্ষি মহাজনদিগের পরিগৃহীত। মন্ত্র ও আয়ুর্বেদের স্তার মহাজন-পরিগৃহীত বর্ণাশ্রমচারব্যবস্থাপক বেদ আপ্তের উক্ত বলিয়া অর্থাৎ ঐশ্বর-প্রণীত বলিয়া প্রমাণ। মন্ত্র ও আয়ুর্বেদ যে প্রমাণ, ইহা সকলেরই স্বীকার্য। তাহাতে বৈদিক, শাস্ত্রিক ও পৌষ্টিক কৰ্মের অহুমোদন থাকায় এবং আয়ুর্বেদ, রসায়নাদি ক্রিয়ারস্ত্রে বেদবিহিত চোত্রায়াদি প্রায়শ্চিত্তের উপদেশ করায় আপ্তপ্রণীত আয়ুর্বেদও বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করিয়াছেন। সুতরাং তাহা সৰ্বসম্মত প্রমাণ, সেই আয়ুর্বেদের দ্বারাও বেদের প্রামাণ্য ও মহাজনপরিগ্রহ নিশ্চয় করা যায়। তাৎপর্যটীকাকার বাচস্পতি মিশ্র যোগভাব্যের টীকাতেও যোগভাব্যকারের মত ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন যে, মন্ত্র ও আয়ুর্বেদ ঐশ্বর-প্রণীত, সৰ্বজ্ঞ ব্যতীত আর কোন ব্যক্তিই ঐরূপ অব্যর্থফল মন্ত্র ও আয়ুর্বেদ প্রণয়ন করিতে পারে না। সৰ্বজ্ঞ ঐশ্বরই মন্ত্র ও আয়ুর্বেদ প্রণয়ন করিয়াছেন; সুতরাং তাহার প্রামাণ্য নিশ্চিত। এইরূপ অভ্যাস ও নিঃশ্রেয়সের উপদেশক বেদসমূহও ঐশ্বরের প্রণীত, ঐশ্বর ব্যতীত আর কেহ তাহা প্রণয়ন করিতে পারে না, ঐশ্বরের বুদ্ধিস্বরূপকর্ষ বা সৰ্বজ্ঞতাই শাস্ত্রের মূল। ঐশ্বরের সৰ্বজ্ঞতাবশতঃ যেমন



মন্ত্র ও আয়ুর্বেদ প্রমাণ, তরুণ এই দৃষ্টান্তে ঈশ্বর-প্রণীত বলিয়া বেদমাত্রই প্রমাণ বলিয়া নিশ্চয় করা যায়। বাচস্পতি মিশ্রের যোগভাবের চীকার কথার তাহার মতে আয়ুর্বেদও, বেদ, ইহা মনে করা গেলেও তাৎপর্যচীকার তিনি যখন বলিয়াছেন যে, রসায়নাদি জিয়ারন্তে আয়ুর্বেদ, বৈদ্যবিহিত চান্দ্রায়ণাদি প্রাশস্তিত্তের উপদেশ করায় আয়ুর্বেদও বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করিয়াছেন, তখন তাহার এই কথার দ্বারা আয়ুর্বেদ বেদভিন্ন শাস্ত্রাস্তর, ইহাই তাহার মত বুঝা যায়। সে বাহা হউক, প্রকৃত কথা, বাচস্পতি মিশ্র, জায়মত ব্যাখ্যায় জায় পাতঞ্জল মত ব্যাখ্যাতেও বেদ ঈশ্বর-প্রণীত এবং তৎপ্রযুক্তই তাহার প্রামাণ্য, এই মতেরই সমর্থন করিয়াছেন। (সমাধিপাদ, ২৪ সূত্র-ভাষ্যটীকা ত্রুটব্য)। বাচস্পতি মিশ্রের জায় উদয়নাচার্য্য, জয়ন্তভট্ট ও গঙ্গেশ প্রভৃতি পরবর্তী সমস্ত জায়চার্য্যও বহু বিচারপূর্বক এই মতেরই সমর্থন করিয়াছেন। উদয়নাচার্য্য বলিয়াছেন যে, বিশ্বস্থিতিসমর্থ, অগ্নিমানি সর্কৈশ্বর্য্যাসম্পন্ন, সর্বজ্ঞ পুরুষ ব্যতীত আর কেহ বহু বহু অনৌকিকার্থপ্রতিপাদক, সকল জ্ঞানবিজ্ঞানের আকর বেদ রচনা করিতে পারেন না। বাহাদিগের সর্ববিষয়ক নিত্য জ্ঞান নাই, তাহাদিগের অনৌকিক তত্ত্বের উপদেশে বিশ্বাস হয় না—তাহাদিগের বাক্যের নিরূপক প্রামাণ্য নহিৎ<sup>১</sup>। যদি কপিলাদি মহর্ষিকে বিশ্বস্থিতিসমর্থ ও সর্কৈশ্বর্য্যাসম্পন্ন, সর্বজ্ঞ বলিয়া তাহাদিগকেই বেদকর্তা বলিতে হয়, তাহা হইলে ঐরূপ একমাত্র পুরুষই লাভবতঃ স্বীকার করা উচিত; ঐরূপ বহু পুরুষ স্বীকার নিষ্ঠায়োজন, তাহাতে দোষও আছে। সুতরাং সর্ববিষয়ক যথার্থ নিত্যজ্ঞানসম্পন্ন একই পুরুষ বেদকর্তা; তিনিই ঈশ্বর। উদয়নাচার্য্য এই ভাবে বেদকর্তৃত্বরূপে ঈশ্বরের সাধন করিয়াছেন। বেদ যখন নিত্য হইতে পারে না—কারণ, শব্দের নিত্য অনন্তর, তখন বেদকর্তা কোন পুরুষ অবশ্য স্বীকার্য্য। বিশ্বনিষ্ঠানে সমর্থ, সর্কৈশ্বর্য্যাসম্পন্ন, সর্বজ্ঞ পুরুষ ভিন্ন আর কেহ বেদ রচনা করিতে পারেন না, সুতরাং ঐরূপ পুরুষকেই বেদকর্তা বলিতে হইবে। সেই বেদকর্তা পুরুষই ঈশ্বর, ইহাই উদয়নাচার্য্যের কথিত ঈশ্বর-সাধক অন্ততম যুক্তি। তাহার মতে মহর্ষি গোতম “আপ্তপ্রামাণ্যং” এই বাক্যে “আপ্ত” শব্দের দ্বারা ঈশ্বরকেই গ্রহণ করিয়াছেন। সেই আপ্ত ঈশ্বরের প্রামাণ্য বুঝিতে হইবে—সর্বদা সর্ববিষয়ক প্রমা। প্রমা-জ্ঞানের করণরূপ প্রমাণত্ব ঈশ্বরে নাই। ঈশ্বরের প্রমাজ্ঞান নিত্য, তাহার করণ থাকিতে পারে না। সর্বদা সর্ববিষয়ক প্রমাবান্, এই অর্থেই ঈশ্বরকে “প্রমাণ” বলা হইয়াছে, ইহাও উদয়নাচার্য্য বলিয়াছেন<sup>২</sup>। এইরূপ প্রমাতা পুরুষকে অনেক হলে প্রমার কর্তা অর্গাৎ প্রমাণ বা প্রমাণ-পুরুষ বলা হইয়াছে এবং প্রমাজ্ঞানের কারণ-মাত্র অর্গেও প্রদীপাদিকে প্রমাণ বলা হইয়াছে।

সর্বজ্ঞ ঈশ্বর ভিন্ন অন্য কোন পুরুষ হইতে যে সর্বজ্ঞকর, সর্বজ্ঞশাসিত বেদের সম্ভব

১। প্রমাণঃ পরস্তত্রাৎ সর্বপ্রণয়সম্ভবাৎ। তবজ্ঞানিহানামার বিদ্যাস্তরসম্ভবঃ।—কৃষ্ণাঙ্গলি, ২য় স্তবক,

১ম কারিকা।

২। নিত্যিঃ সমাক্ পরিচ্ছিত্ত্বত্বত্রাৎ প্রমাকৃত্য।

তদবোধাবাবচ্ছেদঃ প্রামাণ্যং দৌভবে মতে।—কৃষ্ণাঙ্গলি, ৩য় স্তবক, ২ কারিকা।



হইতে পারে না, ইহা আচার্য্য শঙ্করও শারীরক ভাষ্যে (৩য় সূত্র-ভাষ্যে) যুক্তির দ্বারা বুঝাইয়াছেন। বেদাদি শাস্ত্র সেই ভগবানেরই নিঃস্বাস, ইহা বৃহদারণ্যক উপনিষদে কথিত আছে (২।৪।১০)। আচার্য্য শঙ্কর বলিয়াছেন যে, ঈশ্বর প্রথমেই দ্বারা লীলার দ্বারা সর্বজ্ঞ ঈশ্বর হইতে পুরুষের নিখাসের দ্বারা বেদের উৎপত্তি হইয়াছে। শঙ্কর প্রকৃতির মতে সৃষ্টির প্রথমে বেদ, ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়া, প্রলয়কালে ভ্রষ্ট হইয়া লয় প্রাপ্ত হয়। পুনরায় কলান্তরে ঈশ্বর, হিরণ্যগর্ভকে পূর্ব-কল্পীয় বেদের উপদেশ করেন। হিরণ্যগর্ভ বরাচি প্রকৃতিকে উপদেশ করেন। এইরূপে সম্প্রদায়ক্রমে পুনরায় বেদের প্রচার হয়। বেদ ঈশ্বর হইতে নিঃস্বাসের দ্বারা অর্থাৎ অপ্রযুক্ত বা ঈশ্বর প্রথমেই দ্বারা সমুদ্ভূত হইলেও বেদে ঈশ্বরের স্বাতন্ত্র্য নাই। অর্থাৎ ঈশ্বর গত করে যে রূপ বেদবাক্য রচনা করিয়াছেন, কলান্তরেও সেইরূপই বেদবাক্য রচনা করিয়াছেন ও করিবেন; সর্বকালেই অগ্নিহোত্র যাগে স্বর্ণ হইয়াছে ও হইবে, এবং ব্রহ্মহত্যার নরক হইয়াছে ও হইবে; কোন কালেই ইহার বিপরীত হইবে না। বেদবক্তা পুরুষের স্বাতন্ত্র্য থাকিলে তিনি বেদবাক্যের আন্তর্য্যপূর্ব্বের যেমন অল্পথা করিতে পারেন, তদ্রূপ বেদার্থেরও অল্পথা করিতে পারেন। কলান্তরে বেদের বাক্য ও প্রতিপাদ্য অন্তরূপ হইতে পারে। কোন কালে ব্রহ্মহত্যাদির ফল স্বর্ণ ও অগ্নিহোত্রাদির ফল নরক হইতে পারে। কিন্তু তাহা হয় না, ইহাই তৎসদৃশী ঋষিদিগের অনুভূত সিদ্ধান্ত। সুতরাং সর্বজ্ঞ পুরুষ ঈশ্বর বেদবক্তা হইলেও বেদে তাঁহার স্বাতন্ত্র্য নাই, ইহা বুঝা যায়। যে পুরুষের যে বাক্য রচনার স্বাতন্ত্র্য আছে, যিনি বাক্য বা তাহার প্রতিপাদ্য পরার্থের অল্পথা করিয়া বাক্য রচনা করিতে পারেন, তাঁহার বাক্যকেই পৌরুষের বলা হয়। আর তাঁহার পূর্ব্বোক্তরূপ স্বাতন্ত্র্য নাই, তাঁহার বাক্য পুরুষ-নির্ম্মিত হইলেও তাহাকে পৌরুষের বলা হয় না। পূর্ব্বোক্ত অর্থে বেদ স্বতন্ত্র পুরুষ-নির্ম্মিত না হওয়ায় অপৌরুষের ও নিতা বলিয়া কথিত হইয়াছে। শঙ্কর প্রকৃতি এইরূপ বলিলেও পুরুষ-নির্ম্মিত হইলে তাহা অপৌরুষের হইতে পারে না, বেদের পৌরুষের দ্বারা জ্ঞানযোগ্য এই মতই সমর্থন করিয়াছেন। মূল কথা, বেদ যে ঈশ্বর হইতেই উদ্ভূত, ইহা উপনিষদদ্বারা আচার্য্য শঙ্করও সমর্থন করিয়াছেন।

বৈশেষিক সূত্রকার মহর্ষি কণাদ বৈশেষিক দর্শনের তৃতীয় সূত্র ও চরম সূত্র বলিয়াছেন,—  
 “তদ্বচনাদান্নায়ত্ত প্রমাণ্যং”। বৈশেষিকের উপস্কারকার শঙ্কর মিশ্র প্রথমে কলান্তরে ঐ সূত্রের “তৎ” শব্দের দ্বারা অন্তরূপ অর্থের ব্যাখ্যা করিলেও শেষ সূত্রের ব্যাখ্যায় “তৎ” শব্দের দ্বারা ঈশ্বরকেই গ্রহণ করিয়া, কণাদের মতে বেদ যে ঈশ্বরের প্রণীত, ইহা সমর্থনপূর্ব্বক প্রকাশ করিয়াছেন। ফলকথা, শঙ্কর মিশ্রের যে উহাই সিদ্ধান্ত, ইহা তাঁহার শেষ ব্যাখ্যায় দ্বারা নিঃসন্দেহে বুঝা যায়। কিন্তু প্রাচীন বৈশেষিকাচার্য্য প্রশস্তপাদ আৰ্য্য জ্ঞানের ব্যাখ্যা করিতে বলিয়াছেন, “আম্মায়বিধাতৃশাস্ত্রোণ”। জ্ঞানকল্পনীকার প্রাচীন শ্রীধরভট্ট উহার ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন, “আম্মায়ো বেদোত্তম বিধাতার কৰ্ত্তারো যে ঈশ্বরঃ”। শ্রীধর ভট্টের ব্যাখ্যাদ্বারা প্রশস্ত-পাদের মতে এবং শ্রীধরের মতেও ঋষিরাই বেদকর্ত্তা, ইহা বুঝা যায়। শ্রীধরভট্ট কণাদের “তদ-



বচনাদার্যাক্ত প্রামাণ্য” এই সূত্রের ব্যাখ্যাত্তেও “তৎ” শব্দের দ্বারা অস্বয়িন্দিষ্ট বক্তাই কণাদের অভিপ্রেত, ইহা বলিয়াছেন। সেখানেও তিনি ঈশ্বরকেই বেদবক্তা বলিয়া প্রকাশ করেন নাই। ভাষ্যকার বাৎসর্য্যনও আশুপুত্রকে বেদার্থের ত্রুটি ও বক্তা বলিয়া ঋষিদিগকেই বেদবক্তা বলিয়াছেন, ইহা বুঝা যায়। ভাষ্যকার প্রথমার্ধাধারে (অষ্টম সূত্র-ভাষ্যে) মহাবি গোতমোক্ত দৃষ্টান্তিক ও অদৃষ্টান্তিক, এই দ্বিবিধ শব্দের ব্যাখ্যা করিয়া বলিয়াছেন যে, এইরূপ ঋষিবাক্য ও লৌকিক বাক্যের বিভাগ। এবং তৎপূর্ব্বসূত্রভাষ্যে আশুপুত্র লক্ষণ বলিয়া, বলিয়াছেন যে, ইহা ঋষি, আর্ঘ্য ও য়েচ্ছনীগের সমান লক্ষণ। ভাষ্যকার এখানে ঈশ্বরের পৃথক্ উল্লেখ করেন নাই। ঋষিবাক্যের দ্বারা ঈশ্বরবাক্যেরও পৃথক্ উল্লেখ করেন নাই। এবং প্রথমার্ধাধারে (৩২ সূত্র-ভাষ্যে) প্রতিজ্ঞার মূলে আগম আছে, প্রতিজ্ঞা-বাক্য নিজেরই আগম নহে, ইহা বুঝাইতে হেতু বলিয়াছেন যে, ঋষি ভিন্ন ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য নাই। সুতরাং তিনি বেদবাক্যকেও ঋষিবাক্য বলিতেন, ইহা বুঝা যায়।

এখন কথা এই যে, তাৎপর্য্যটীকাকার বাচস্পতি মিশ্র এবং উদয়ন প্রভৃতি দ্বারাচাৰ্য্যগণ বেদ ঈশ্বর-প্রণীত, ইহা স্থপঠ প্রকাশ করিয়াছেন এবং তাঁহারা উহা বিশেষরূপে সমর্থন করিতেছেন। কিন্তু ভাষ্যকার বাৎসর্য্যন তাহা কেন করেন নাই, প্রশস্তপাদ ও ত্রীধর তত্বেই বা তাহা কেন করেন নাই, ইহা বিশেষ চিন্তনীয়। ঋগ্বেদের পুরুষসূক্ত মন্ত্রেও পাইতেছি,—“তদ্বাদ্যজাতং সৰ্ব্বহত্যঃ ঋচঃ সামানি জজিরে। জ্ঞানাসি জজিরে তদ্বাদ্যজুত্বাদজায়ত।” সারণ প্রভৃতির ব্যাখ্যানসারে পুরুষসূক্ত মন্ত্রে পূৰ্ব্বোক্ত সহস্রশীর্ষা পুরুষ ঈশ্বর হইতেই ঋক্ প্রভৃতি বেদের উৎপত্তি বর্ণিত হইয়াছে, ইহা বুঝা যায়। এইরূপ বেদে আরও বহু স্থানে ঈশ্বর হইতেই যে বেদের উৎপত্তি হইয়াছে, ইহা পাওয়া যায়। ঈশ্বরই বেদকর্তা, ইহা শ্রুতি ও যুক্তিসিদ্ধ বলিয়াই উদয়ন প্রভৃতি দ্বারাচাৰ্য্যগণ ঐ মন্তেরই সমর্থন করিয়াছেন। কিন্তু ভাষ্যকার বাৎসর্য্যনের কথার দ্বারা তাঁহার মতে ঈশ্বরই যে বেদার্থের ত্রুটি ও বক্তা, তাহা বুঝা যায় না। তিনি বলিয়াছেন, যে সকল আশু ব্যক্তি বেদার্থের ত্রুটি ও বক্তা, তাঁহারা ই আয়ুর্কোদ প্রভৃতির ত্রুটি ও বক্তা এবং চতুর্থাধারে তাঁহাদিগকেই ইতিহাস, পুরাণ ও ধর্ম্মশাস্ত্রেরও ত্রুটি ও বক্তা বলিয়াছেন। বাৎসর্য্যনের কথার দ্বারা আশু ঋষিগণ ঈশ্বরানুগ্রহে বেদার্থের দর্শন করিয়া, সুরচিত বাক্যের দ্বারা তাহা বলিয়াছেন; তাঁহাদিগের ঐ বাক্যই বেদ, ইহা বুঝা যাইতে পারে। ঐ সমস্ত ঋষিগণই বেদার্থ দর্শন করিয়া, তদনুসারে পরে স্মৃতি পুত্রাণাদিও রচনা করিয়াছেন, ইহাও বুঝাইতে পারে। তাঁহারা প্রথমে বেদবাক্য বলিয়াছেন। পরে ঐ বেদার্থেরই বিশদ ব্যাখ্যার জন্য স্মৃতি-পুরাণাদি শাস্ত্রান্তর বলিয়াছেন, ইহা বুঝা যাইতে পারে। তাহা হইলে তাহারা ই বেদার্থের ত্রুটি ও বক্তা, তাহারা ই স্মৃতি-পুরাণাদিরও বক্তা, এই কথাও বলা যাইতে পারে এবং ঈশ্বরানুগ্রহে ও ঈশ্বরের দ্বারা বেদার্থ দর্শন করিয়া ঋষিগণই বেদ রচনা করিয়াছেন, ইহা প্রশস্তপাদ ও ত্রীধরেরও মত বুঝা যাইতে পারে। ঈশ্বরই প্রথমে হিরণ্যগর্ভকে মনের দ্বারা বেদ উপদেশ করেন, তিনিই সর্ব্বাঙ্গে বেদার্থের প্রকাশক বা উপদেশক, এই তাৎপর্য্যই পুরুষসূক্ত মন্ত্রাদিতে ঈশ্বর হইতে বেদের উৎপত্তি বর্ণিত হইয়াছে, ইহাও বলা যাইতে পারে।



ঋষিগণ ঈশ্বর-প্রেরিত না হইয়াই নিজ বুদ্ধি অনুসারে বেদ রচনা করিয়াছেন, ইহা কিন্তু বাংলায়ন প্রতীতি বলেন নাই। বাংলায়ন বেদবক্তা আগুদিগকে বেদার্থের ত্রুটি বলায়, তাঁহারা ঈশ্বরেচ্ছায় ঈশ্বরানুগ্রহেই সর্বজ্ঞ, সকল-গুরু ঈশ্বর হইতেই বেদ লাভ করিয়া অর্থাৎ বেদার্থ দর্শন করিয়া, তাহা বাক্যের দ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন, ইহাও বাংলায়নের কথায় বুঝিতে পারি। সুতরাং এ পক্ষেও বাংলায়নের মতে যে, বেদের সহিত ঈশ্বরের কোনই সম্বন্ধ নাই, ইহা বুঝিবার কারণ নাই। ঈশ্বর বেদার্থের প্রদর্শক বা প্রকাশক হইলেও, বাহারা তাহা গ্রহণ করিয়া বেদ-বাক্য বলিয়াছেন, বেদবাক্যের দ্বারা ঈশ্বর-প্রকাশিত বেদার্থের বর্ণন করিয়াছেন, তাঁহাদিগের ভ্রম-প্রবাদাদি থাকিলে ঐ বাক্যের প্রামাণ্য হইতে পারে না। তাঁহারা ঈশ্বর-প্রদর্শিত বেদার্থ বিস্মৃত হইলে বা প্রত্যয়ক হইয়া অন্যথা বর্ণন করিলে, তাঁহাদিগের ঐ বাক্য প্রমাণ হইতে পারে না। এ জন্য বাংলায়ন ঐ বেদার্থত্রুটিদিগেরই আগুদ সমর্থন করিয়া, তাঁহাদিগের প্রামাণ্যবশতঃ বেদের প্রামাণ্য সমর্থন করিতে পারেন। মহর্ষি গোতমও ঐ জন্য “ঈশ্বর-প্রামাণ্য্য” এইরূপ কথা না বলিয়া “আগুদপ্রামাণ্য্য” এইরূপ কথা বলিতে পারেন। গোতম বা বাংলায়নের ঐ কথার দ্বারা ঈশ্বর-নিরপেক্ষ আগু ঋষিগণ স্ববুদ্ধির দ্বারা বেদ রচনা করিয়াছেন, ইহা বুঝিবার কোন কারণ নাই। ঈশ্বর যে প্রথমে আদিকবি হিরণ্যগর্ভকে মনের দ্বারাই বেদ উপদেশ করেন, ইহা শ্রীমদ্ভগবতের প্রথম স্লোকেও আমরা দেখিতে পাই<sup>১</sup>। ঈশ্বর বাহাদিগকে বেদার্থ দর্শন করাইয়াছেন, বাহারা বেদার্থের ত্রুটি, তাঁহাদিগকে ঋষি বলা যায়। সুতরাং ঐ অর্থে হিরণ্যগর্ভকেও ঋষি বলা যায়। প্রশস্তপাদও ঐ অর্থে “ঋষি” শব্দের প্রয়োগ করিয়া, বেদার্থদর্শী ঋষির্বিংশতিদিগকে বেদকর্তা বলিতে পারেন। তাঁহারা ঈশ্বর-প্রেরিত না হইয়া, ঈশ্বর হইতে বেদার্থের কোন উপদেশ না পাইয়া, স্ববুদ্ধির দ্বারাই বেদ রচনা করিয়াছেন, ইহাই প্রশস্তপাদের কথায় বুঝিবার কারণ নাই। মূল কথা, বিচার্য বিষয়ে বাংলায়ন প্রতীতির পূর্বোক্তরূপ তাৎপর্য্য বুঝিলে, ঈশ্বর প্রথমে মনের দ্বারাই হিরণ্যগর্ভকে বেদ উপদেশ করেন, তিনি বেদবাক্যের উচ্চারণপূর্বক হিরণ্যগর্ভকে বেদের উপদেশ করেন নাই, হিরণ্যগর্ভ অন্য ঋষিকে বেদের উপদেশ করিয়াছেন, এইরূপে মূল ঈশ্বর হইতেই সেই সেই আগু ঋষি বেদলাভ বা বেদার্থ দর্শন করিয়া বেদ রচনা করিয়াছেন, তাঁহাদিগের সেই বাক্যই বেদ, ঈশ্বর স্বয়ং বেদবাক্য রচনা করেন নাই, ইহাই বাংলায়ন প্রতীতির মত বুঝিতে হয়। এই পক্ষে বেদবক্তা ঋষিদিগের প্রতি অবিশ্বাস বা তাঁহাদিগের ভ্রম শঙ্কারও কোন কারণ নাই। কারণ, সর্বজ্ঞ, সকল-গুরু, অস্রান্ত ঈশ্বরই তাঁহাদিগকে বেদার্থ দর্শন করাইয়াছেন, তাঁহারা ঈশ্বরপ্রকাশিত তত্ত্বেরই বর্ণন করিয়াছেন, ঈশ্বরই তাঁহাদিগকে মনের দ্বারা বেদার্থের উপদেশ করিয়া, তাঁহাদিগের দ্বারা বেদবাক্য রচনা করাইয়াছেন।

১। “তেনে ব্রহ্ম হৃদা য় আদিকবয়ে”। আদিকবয়ে ব্রহ্মপেংপি ব্রহ্ম বেকা যন্তেনে প্রকাশিতবান্। “যো ব্রহ্মাণ্য বিব্রাতি পূর্বো যো বৈ বেদাং” প্রব্রোতি তস্মৈ। তংহ বেদবাক্যবুদ্ধিপ্রকাশং মনুজুর্ভে শরণমহং প্রপদো” ইতি শ্রুতঃ। নহু ব্রহ্মাণ্যহুততো বেদাধারনবপ্রদিক্, সত্যং, তত্ত্বং হৃদা মনসৈব তেনে বিবৃতবান্।  
—ঐদ্যবাবিসীকা।



স্বতরাং বেদ বক্তব্যঃ ঈশ্বরের উচ্চারিত বাক্য না হইলেও উহা পূর্বোক্ত কারণে ঈশ্বর-বাক্য-তুল্য। ঈশ্বর মনের দ্বারা উপদেশ করিয়া, কাহারও দ্বারা কোন তব প্রকাশ করিলে, সেই তব-প্রকাশক বাক্য অস্ত্রের কথিত হইলেও উহাও ঈশ্বরবাক্যব্যং প্রমাণ হইবে, সন্দেহ নাই এবং ঐ বাক্যেরও পূর্বোক্ত কারণে ঈশ্বর-বাক্য বলিয়া কীর্তন বা ব্যবহার হইতে পারে, সন্দেহ নাই। মূলকথা, ঋষিগণই বেদবাক্যের রচয়িতা, এই মতই বাহারা যুক্তিসংগত মনে করেন, অশ্রুতসংহিতার "ঋষিবচনং বেদঃ" এই কথার দ্বারা এবং বাংতায়ন প্রভৃতি অনেক প্রাচীন গ্রন্থকারের কথার দ্বারা এখন বাহারা ঐ মত সমর্থন করেন, তাঁহাদিগের কথা স্বীকার করিয়াই, ঐ পক্ষে পূর্বোক্তরূপ সিদ্ধান্ত ব্যাখ্যা করা যায়। কিন্তু বেদের পৌরুষেয়ত্ব মত সমর্থন করিতে বাচস্পতি নিশ্চ, উদয়নাচার্য্য, জয়ন্ত ভট্ট, গবেশ প্রভৃতি পূর্বাচার্য্যগণ ও পরবর্তী নৈয়ায়িকগণ ঈশ্বরকেই বেদের কর্তা বলিয়া সমর্থন করিয়াছেন। ইহাদিগের মতে যে ভাবেই হউক, ঈশ্বরই সমস্ত বেদবাক্যের রচয়িতা। বেদে যিনি বেদমন্ত্রের ঋষি বলিয়া কথিত হইরাছেন, তিনিই সেই মন্ত্রের রচয়িতা নহেন, তিনি সেই মন্ত্রের ত্রষ্টা। ঈশ্বর-প্রণীত মন্ত্রাদিরূপ বেদবাক্যকেই ঋষিগণ দর্শন করিয়া, তাহার প্রকাশ করিয়াছেন। পুরুষসূক্ত মন্ত্রাদিতে ঈশ্বর হইতেই বেদের উৎপত্তি বর্ণিত হওয়ার ঈশ্বরকেই বেদকর্তা বলিয়া বুঝা যায় এবং ঈশ্বর ভিন্ন আর কাহারও নিত্য-সিদ্ধ সর্বজন্যতা না থাকার আর কেহ বেদ রচনা করিতে পারেন না, অত্ৰ কাহারও বাক্যের নিরপেক্ষ প্রামাণ্য বিশ্বাস করা যায় না। বেদের পৌরুষেয়ত্ববাদী বহু আচার্য্য এই সমস্ত যুক্তির দ্বারা ঈশ্বরকেই বেদকর্তা বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ভাষ্যকার বাংতায়ন ইহা না বলিলেও ঈশ্বর বেদকর্তা নহেন, ঈশ্বর ভিন্ন ঋষিগণই বেদবক্তা, ইহাও বলেন নাই। তিনি যে আগুদিগকে বেদার্থের ত্রষ্টা ও বক্তা বলিয়াছেন, তাঁহারা ই বেদের প্রথম বক্তা বা কর্তা কি না, ইহাও তিনি বলেন নাই। ঈশ্বরই বেদের প্রথম বক্তা অর্থাৎ কর্তা, আগু ঋষিগণ ঐ বেদার্থের দর্শন করিয়া, জীবের কল্যাণের নিমিত্ত সেই ঈশ্বরকৃত বেদ প্রকাশ করিয়াছেন, ইহাও ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য বলা যাইতে পারে। তবে ঈশ্বর নিজেই বেদের কর্তা হইলে, ভাষ্যকার ঈশ্বরের প্রামাণ্য-প্রযুক্ত বেদের প্রামাণ্য ব্যাখ্যা না করিয়া, আগুদিগের প্রামাণ্য ব্যাখ্যা করিয়া, তৎপ্রযুক্তই বেদের প্রামাণ্য সমর্থন করিয়াছেন কেন? এক ঈশ্বরকে বেদের কর্তা না বলিয়া, বহু আগু ব্যক্তিকে বেদার্থের ত্রষ্টা ও বক্তা বলিয়া স্পষ্ট উল্লেখ করিয়াছেন কেন? ইহা অবশ্যই জিজ্ঞাস্য হইবে। এতদ্বত্তরে বক্তব্য এই যে, ভাষ্যকার যে সকল আগু পুরুষকে গ্রহণ করিয়া, তাঁহাদিগকে বেদার্থের ত্রষ্টা ও বক্তা বলিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই বিভিন্ন শরীরধারী ঈশ্বর। ঈশ্বরের বহুবিধ অবতার শাস্ত্রে বর্ণিত দেখা যায়। শাস্ত্রবক্তা মহর্ষিগণ ভগবানের আবেশ-অবতার, ইহাও পুরাণে বর্ণিত আছে। পুরুষসূক্ত মন্ত্রে যে ঈশ্বর হইতেই বেদের উৎপত্তি বর্ণিত হইরাছে, ইহা সমর্থন করিতে সায়নাচার্য্য ঐ মন্ত্র ব্যাখ্যায় বাহা বলিয়াছেন<sup>১</sup>, তাহাও অবশ্য

১। "সহস্রশীর্ষা পুরুষ" ইত্যুত্থাৎ পরমেশ্বরঃ "বজ্রাচ্" বজ্রনীরাৎ পূজনীরাৎ "সর্বজতঃ" সর্বৈর্জতঃ রমানাৎ। বহুপি ইন্দ্রাদিত্যত্বং হুয়ন্তে তথাপি পরমেশ্বরস্যেব ইন্দ্রাদিত্যপেণাধান্যবিকারেণ। তথাচ স্বরূপঃ, ইন্দ্রঃ সিন্ধুঃ মাহরথো বরগ্ৰিণমদিত্যঃ সতপর্ণো গরুড়ান্দ। একঃ সন্নিধা বহুবা বহুজ্ঞাশ্চিৎ বহুঃ সাত্ত্বিকান্যমাহরিতি।—সায়নভাষ্য।



গ্রহণ করিতে হইবে। সাংখ্যচার্য্য শব্দবেদসংহিতার উপোদ্ভবাত ভাষ্যে বেদের অপৌরুষেয়ত্বের ব্যাখ্যা করিতে ইহাও বলিয়াছেন যে, কর্মকলরূপ শরীরধারী কোন জীব বেদকর্তা নহে, এই অর্থেও বেদকে অপৌরুষেয় বলা যায় না। কারণ, জীববিশেষ যে অগ্নি, বায়ু ও আদিত্য, তাহারা বেদত্রয়ের উৎপাদন করিয়াছেন, ইহা বেদই বলিয়াছেন। সাংখ্যচার্য্য এই কথা বলিয়া পরেই আবার বলিয়াছেন যে, ঈশ্বরের অগ্নি প্রভৃতির প্রেরকত্ববশতঃ বেদকর্তৃত্ব বৃত্তিতে হইবে<sup>১</sup>। সাংখ্যের কথায় বুঝা যায়, ঈশ্বরই অগ্নি, বায়ু ও আদিত্যকে বেদের উৎপাদনে প্রেরিত বা প্রবৃত্ত করিয়া, তাহাদিগের দ্বারা বেদত্রয়ের উৎপাদন করিয়াছেন, ঐ ভাবে ঈশ্বর বেদকর্তা। তাহা হইলে বলিতে পারি যে, ঈশ্বরই অগ্নি প্রভৃতি জীব-শরীরে অধিষ্ঠিত হইয়া বেদ রচনা করিয়াছেন। নচেৎ বেদে ঈশ্বর হইতে যে বেদের উৎপত্তি বর্ণিত হইয়াছে, তাহা কিরূপে সম্ভব হইবে? তাহা হইলে ইহাও বলিতে পারি যে, ভাষ্যকার বাংলায়ন ঐ অগ্নি প্রভৃতি আগুনিগকেই বেদকর্তা বলিয়া গ্রহণ করিয়া, আগুণগণ বেদবক্তা, এইরূপ কথা বলিয়াছেন। ভাষ্যকারের্ত আগুণগণ ঈশ্বর-প্রেরিত বা ঈশ্বরেরই অবতারণাবিশেষ, ইহা বুঝিবার কোন যথক নাই। পরন্তু যে উদয়নাচার্য্য ঈশ্বর ভিন্ন আর কাহারও বেদকর্তৃত্ব স্বীকার করেন নাই, একমাত্র ঈশ্বরই বেদকর্তা, এই সিদ্ধান্তের সমর্থন করিয়াছেন, তিনিও বলিয়াছেন যে, ঈশ্বর “কঠ” প্রভৃতি বিভিন্ন শরীরে অধিষ্ঠিত হইয়া, বেদের “কাঠক”, “কালাপক” প্রভৃতি শাখা রচনা করিয়াছেন। নচেৎ বেদ-শাখার “কাঠক”, “কালাপক” প্রভৃতি নাম হইতে পারে না<sup>২</sup>। বেদের অপৌরুষেয়বাদী মীমাংসক সম্প্রদায় বলিয়াছেন যে, “কঠ” প্রভৃতি নামক বেদাধ্যায়ীর সেই সেই শাখার অধ্যয়নাদি প্রযুক্তই তাহার “কাঠক” প্রভৃতি নাম হইয়াছে। উদয়নাচার্য্য ইহার প্রতিবাদ করিয়াছেন যে, তাহা হইলে অধ্যোক্তবর্গের অনন্তত্বনিবন্ধন তাহাদিগের অধীত সেই সেই শাখার আরও বিভিন্নরূপ অসংখ্য নাম হইত। বাহারা সেই সেই শাখার প্রকৃষ্ট অধ্যয়নাদি করিয়াছিলেন, তাহাদিগের নামানুসারেই ঐ সকল শাখার “কাঠক” প্রভৃতি নাম হইয়াছে, ইহাও মীমাংসকগণ বলিতে পারেন না। কারণ, অনাদি সংসারে ঐ সকল শাখার প্রকৃষ্ট অধ্যোক্তা বা প্রকৃষ্ট বক্তা কয় জন? ইহার নিয়ামক নাই। সুতরাং ঐরূপ ব্যক্তিও অসংখ্য, ইহা বলা বাইতে পারে। সৃষ্টির প্রথমে যে সকল ব্যক্তি অগ্রে ঐ সকল শাখার অধ্যয়নাদি করিয়াছিলেন, তাহাদিগের নামানুসারেই ঐ সকল বেদশাখার “কাঠক” প্রভৃতি নাম হইয়াছে, ইহাও মীমাংসকগণ বলিতে পারেন না। কারণ, তাহারা ঐরূপ স্বীকার না করায় তাহাদিগের মতে প্রলয়ের পরে সৃষ্টি না থাকায় সৃষ্টির প্রথম কাল অসম্ভব।

১। কর্মকলরূপশরীরধারীজীবনির্ধিতত্বাত্বাবমাত্রোপৌরুষেয়ত্বং বিবক্ষিতমিতি চেদ্র, জীববিশেষেরদ্বিবাধুনিষ্ঠা-  
র্থেনানুপপাদিতত্বাৎ “শব্দবেদেব এবায়েরজাহত, যজুর্কেদো বাহোঃ সামবেদে আদিত্য” ইতি প্রত্যেঃ। ঈশ্বরদ্বাভ্যা-  
দপ্রেরকত্বেন নির্ধাতৃকঃ স্টবায়।—সাংখ্যভাষ্য।

২। “সম্যথাপি ন শাখানামাধ্যাপচনাতুতঃ”। তদ্বাচন্যাববৃত্ত্যনেননির্ধিত এবাক্ সন্মত্যাধিশেষবসম্বত ইতোব  
সাম্বিত্তি।—সুহৃদাঙ্কলি। ৫। ১৭।

তদ্বাদিত্তি। কঠানিপরমমিষ্ঠায় সর্গাধাবীষ্মরেন বা শাখা কৃত্য সা তৎসম্যথোতি পরিশেব ইত্যর্থঃ।—প্রকাশসূত্রিকা।



উদয়নাচার্য্য এই ভাবে মীমাংসক মতের প্রতিবাদ করিয়া, তায়কুহ্মাঙ্গলির শেষে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, ঈশ্বরই সৃষ্টির প্রথমে “কঠ” প্রকৃতি নামক শরীরে অধিষ্ঠান করিয়া, বেদের সেই সেই শাখা রচনা করায়, তাহাদিগের কাঠক প্রকৃতি নাম হইয়াছে। অন্তথা কোনরূপেই বেদশাখার ঐ সকল নাম হইতে পারে না। তাহা হইলে উদয়নের সিদ্ধান্তানুসারেও বলিতে পারি যে, ভাষ্যকার বাৎস্তায়ন “কঠ” প্রকৃতি শরীরের ভেদ অবলম্বন করিয়া, আপ্তগণ বেদার্থের দৃষ্টা ও বক্তা, এই কথা বলিতে পারেন। অর্থাৎ ঈশ্বরই প্রথমে হিরণ্যগর্ভরূপে ও কঠাদিরূপে বিভিন্ন শরীরে অধিষ্ঠিত হইয়াই বেদ রচনা করিয়াছেন। তিনি একই শরীরে অধিষ্ঠিত হইয়া সকল বেদ রচনা করেন নাই। কিন্তু বহু শরীরে অধিষ্ঠিত হইয়া বেদ রচনা করায়, সেই সেই শরীর-ভেদ অবলম্বন করিয়াই বাৎস্তায়ন আপ্তগণকে বেদবক্তা বলিয়াছেন, বস্তুতঃ ঐ সমস্ত বেদবক্তা আপ্তগণ ঈশ্বর হইতে অভিন্ন। বেদে যখন অগ্নি, বায়ু ও আদিত্যকে বেদের জনক বলা হইয়াছে এবং উদয়নাচার্য্যও যখন কঠাদি-শরীরধারী ঈশ্বরকে বেদকর্তা বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, তখন এই ভাবে ভাষ্যকার বাৎস্তায়নের তাৎপর্য্য বর্ণন করা যাইতে পারে। বেদের প্রামাণ্যসাধনে বেদবক্তা ঈশ্বরের প্রামাণ্যকেই হেতু না বলিয়া, আপ্তদিগের প্রামাণ্যকে হেতু বলার কারণ এই যে, বাৎস্তায়ন ও উদ্যোতকর বেদের প্রামাণ্য নাধনে লৌকিক আপ্তবাক্যকেও দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। তাহাদিগের মতে সৃজকার মহর্ষিরও মন্ত্র ও আয়ুর্বেদের ভাষ্য লৌকিক আপ্তবাক্যেরও দৃষ্টান্তরূপে অভিমত আছে। সুতরাং ঈশ্বরপ্রণীতত্ব ঐ অহুমানো হেতু হইতে পারে না। লৌকিক আপ্তবাক্যরূপ দৃষ্টান্তে ঈশ্বর-প্রণীতত্ব না থাকায় মহর্ষি “আপ্তপ্রামাণ্যং” এই কথার দ্বারা আপ্তবাক্যমাত্রগত আপ্তবাক্য বা পুরুষবিশেষের উক্তত্বকেই বেদপক্ষে প্রামাণ্যের অহুমানো হেতুরূপে স্থচনা করিয়াছেন। তাই উদ্যোতকরও “পুরুষ-বিশেষাভিহিতত্বং হেতুঃ” এই কথার দ্বারা ঐ হেতুই মহর্ষির অভিনতরূপে উল্লেখ করিয়াছেন। অন্তান্ত আপ্তবাক্যের প্রামাণ্যবিষয়ে বিবাদ করিলেও লৌকিক আপ্তবাক্যের প্রামাণ্য কেহ অস্বীকার করিতে পারিবে না, তাহা করিলে লোকব্যবহারেরই উচ্ছেদ হয়। তাই ভাষ্যকার শেষে লৌকিক আপ্তবাক্যকে দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করা আবশ্যক বুঝিয়া, তাহাও করিয়াছেন। লৌকিক আপ্তবাক্য যেমন আপ্তপ্রামাণ্য-প্রযুক্ত প্রমাণ, তরূপ বেদও আপ্তপ্রামাণ্য-প্রযুক্ত প্রমাণ। বেদপক্ষে ঐ “আপ্ত-প্রামাণ্য” শব্দের দ্বারা আপ্ত ঈশ্বরের প্রামাণ্যই গ্রহণ করিতে হইবে, এবং ঈশ্বররূপ আপ্ত পুরুষের উক্তত্বই তাহাতে পুরুষবিশেষের উক্তত্ব বলিয়া বুঝিতে হইবে। মূলকথা, ভাষ্যকার বাৎস্তায়ন ও বার্তিককার উদ্যোতকরের কথায় তাহাদিগের মতে ঈশ্বরই বেদকর্তা, এই সিদ্ধান্ত স্পষ্ট প্রকটিত না থাকিলেও বেদের পৌরুষবৈত্ববাদী উদয়ন প্রকৃতি ভাষ্যচার্য্যগণের সিদ্ধান্তানুসারে পুরোক্তরূপে বাৎস্তায়ন ও উদ্যোতকরের তাৎপর্য্য বুঝা যায়। বাচস্পতি মিশ্রও বাৎস্তায়ন ও উদ্যোতকরের অল্প কোনরূপ তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করেন নাই। ভাষ্য ও বার্তিকের দ্বারা অত্ররূপ তাৎপর্য্য বুঝা গেলেও তিনি তাহার কোনই আলোচনা করেন নাই। ফলকথা, সাধারণাচার্য্যের উদ্ধৃত শ্রুতিতে যখন অগ্নি, বায়ু ও আদিত্য হইতে বেদত্রয়ের উৎপত্তির কথা পাওয়া যাইতেছে, এবং সাধন উহা স্বীকারপূর্ব্বক কে অগ্নিঈশ্বর প্রকৃতির প্রেরক বলিয়াই বেদকর্তা বলিয়াছেন, তখন ঈশ্বর-প্রেরিত ঐ অগ্নি প্রকৃতি



আপ্তগণকেও ভাষ্যকার বেনার্ণের দ্রষ্টা ও বক্তা বলিতে পারেন। অগ্নি প্রভৃতি ঈশ্বর-প্রেরিত হইয়া বেদজয় উৎপাদন করিয়াছেন, অথবা ঈশ্বরই অগ্নি প্রভৃতি এবং উদয়নোক্ত কণ্ঠ প্রভৃতির শরীরে অধিষ্ঠান করিয়া বেদ নির্মাণ করিয়াছেন, ইহাও ভাষ্যকারের অতিমত বুঝা যাইতে পারে। সুধীগণ উক্ত পক্ষেরই পর্যালোচনা করিয়া ভাষ্যকারের মত নির্ণয় করিবেন।

ভাষ্য। নিত্যত্বাদ্বেদবাক্যানাং প্রমাণত্বে তৎপ্রামাণ্যমাপ্তপ্রামাণ্যাদিত্যযুক্তং। শব্দস্য বাচকত্বাদর্থপ্রতিপত্তৌ প্রমাণত্বং ন নিত্যত্বং। নিত্যত্বে হি সর্বস্য সর্বেষাং বচনাৎ শব্দার্থব্যবস্থানুপপত্তিঃ। নানিত্যত্বে বাচকত্বমিতি চেৎ? ন, লৌকিকেদমদর্শনাৎ। তেহপি নিত্য ইতি চেৎ, অনাপ্তোপদেশাদর্থবিসংবাদোহনুপপন্নঃ, নিত্যত্বাদ্বি শব্দঃ প্রমাণমিতি। অনিত্যঃ স ইতি চেৎ? অবিশেষবচনং, অনাপ্তোপদেশো লৌকিকো ন নিত্য ইতি কারণং বাচ্যমিতি। যথানিয়োগার্থস্য প্রত্যায়নান্নামধেয়শব্দানাং লোকে প্রামাণ্যং, নিত্যত্বং প্রামাণ্যানুপপত্তিঃ। যত্রার্থে নামধেয়শব্দো নিযুক্ত্যতে লোকে তস্য নিয়োগসামর্থ্যাৎ প্রত্যায়কো ভবতি ন নিত্যত্বং। মন্বন্তরযুগান্তরেণ চাতীতানাগতেষু সম্প্রদায়াভ্যামপ্রয়োগাবিচ্ছেদো বেদানাং নিত্যত্বং। আপ্তপ্রামাণ্যচ্চ প্রামাণ্যং, লৌকিকেণ শব্দেষু চৈতৎ সমানমিতি।

ইতি বাংস্ফায়নীয়ে শ্রায়ভাষ্যে দ্বিতীয়াধ্যায়শ্রাদ্যামাহিকং ॥

অনুবাদ। (পূর্বপক্ষ) নিত্যত্ব প্রযুক্ত বেদবাক্যের প্রামাণ্য হইলে আপ্ত-প্রামাণ্য-প্রযুক্ত তাহার প্রামাণ্য, ইহা অযুক্ত। (উত্তর) শব্দের বাচকত্ববশতঃ অর্থের বোধ হওয়ায় প্রামাণ্য—নিত্যত্ব-প্রযুক্ত নহে। যেহেতু নিত্যত্ব হইলে সমস্ত শব্দের দ্বারা সমস্ত অর্থের বচন হওয়ায় শব্দ ও অর্থের ব্যবস্থার অর্থাৎ শব্দবিশেষের দ্বারা অর্থবিশেষেরই বোধ হয়, এই নিয়মের উপপত্তি হয় না। (পূর্বপক্ষ) অনিত্যত্ব হইলে বাচকত্বের অভাব, ইহা যদি বল? (উত্তর) না, অর্থাৎ অনিত্য হইলেই অবাচক হইবে, ইহা বলা যায় না, যেহেতু লৌকিক শব্দগুলিতে দেখা যায় না, অর্থাৎ লৌকিক শব্দগুলি অনিত্য হইয়াও অর্থবিশেষের বাচক, তাহাতে অবাচকত্বের দর্শন (জ্ঞান) নাই। (পূর্বপক্ষ) তাহারাও অর্থাৎ লৌকিক শব্দগুলিও নিত্য, ইহা যদি বল? (উত্তর) না, (তাহা বলিলে) অনাপ্ত ব্যক্তির বাক্য হইতে অর্থবিসংবাদ (অর্থার্থ বোধ) উপপন্ন হয় না, যেহেতু নিত্যত্ববশতঃ



শব্দ প্রমাণ [ অর্থাৎ লৌকিক শব্দও যদি নিত্য হয় এবং নিত্যবশতঃই যদি প্রমাণ হয়, তাহা হইলে অনাপ্ত ব্যক্তির কথিত শব্দও নিত্য বলিয়া প্রমাণ হওয়ায় তাহা হইতে যথার্থ বোধই মানিতে হয়, তাহা হইতে যে অবতারণা বোধ হয়, তাহার উপপত্তি হইতে পারে না ] ( পূর্বপক্ষ ) তাহা অর্থাৎ অনাপ্ত ব্যক্তির উপদেশ বা বাক্য অনিত্য, ইহা যদি বল ? ( উত্তর ) বিশেষবচন হয় নাই অর্থাৎ অনাপ্তোক্ত লৌকিক শব্দ অনিত্য, ইহার বিশেষ হেতু বলা হয় নাই। বিশদার্থ এই যে, লৌকিক অনাপ্তের উপদেশ ( শব্দ ) নিত্য নহে, ইহার কারণ ( বিশেষ হেতু ) বলিতে হইবে। যথানিয়োগই অর্থাৎ সংকেতানুসারেই অর্থবোধকবশতঃ লোকে সংজ্ঞা-শব্দগুলির প্রামাণ্য, নিত্য প্রযুক্ত প্রামাণ্যের উপপত্তি হয় না। বিশদার্থ এই যে, লোকে সংজ্ঞাশব্দ যে অর্থে নিযুক্ত অর্থাৎ সংকেতিত আছে, নিয়োগ-সামর্থ্য অর্থাৎ ঐ সংকেতের সামর্থ্যবশতঃ ( শব্দ ) সেই অর্থের বোধক হয়, নিত্যবশতঃ নহে, অর্থাৎ শব্দ নিত্য বলিয়াই অর্থবিশেষের বোধক হয় না। অতীত ও ভবিষ্যৎ মনস্তর ও যুগান্তরসমূহে সম্প্রদায়, অভ্যাস ও প্রয়োগের অবিচ্ছেদ বেদের নিত্য, আপ্তপ্রামাণ্য-প্রযুক্তই ( বেদের ) প্রামাণ্য, ইহা অর্থাৎ আপ্তপ্রামাণ্য-প্রযুক্ত প্রামাণ্য লৌকিক শব্দসমূহেও সমান।

বাংস্তায়ন-প্রণীত তায়দাৰ্শ্যে দ্বিতীয়াধ্যায়ের প্রথম আঙ্কিক সমাপ্ত।

উল্লিখিত। ভাষ্যকার মহর্ষি-স্বত্রানুসারে আপ্ত-প্রামাণ্য-প্রযুক্ত বেদ-প্রামাণ্যের সমর্থন করিয়া, মহর্ষি গোতম-সম্মত বেদের পৌরুষেয় ব্যবস্থাপন করিয়াছেন। কিন্তু নীমাংসক-সম্প্রদায় বেদকে অপৌরুষেয় বলিয়াই সমর্থন করিয়াছেন। তাহানিগের কথা এই যে, বেদ নিত্য, বেদ কোন পুরুষের প্রণীত হইলে, ঐ পুরুষের ভ্রম-প্রমাদাদি দোষের আশঙ্ক্যবশতঃ বেদেরও অপ্রামাণ্য শঙ্কা হয়। বাহাতে ভ্রম-প্রমাদাদি দোষের কোন শঙ্কাই হয় না, এমন পুরুষ নাই। সুতরাং বেদ কোন পুরুষ-প্রণীত নহে, উহা নিত্য ; তাহা হইলে আর বেদের অপ্রামাণ্যের কোন শঙ্কাই হইতে পারে না। বাহা নিত্য, বাহা কোন পুরুষ-প্রণীত নহে, এমন বাক্য অপ্রমাণ হইতেই পারে না, এখন যদি নিত্যপ্রযুক্ত বা অপৌরুষেয়প্রযুক্তই বেদ-প্রামাণ্য স্বীকার করিতে হয়, পুরুষ-বিশেষ-প্রণীতরূপ পৌরুষেয়প্রযুক্ত বেদের প্রামাণ্য সিদ্ধ না হয়, তাহা হইলে মহর্ষি গোতম যে আপ্ত-প্রামাণ্য-প্রযুক্ত বেদপ্রামাণ্য বলিয়াছেন, ইহা অযুক্ত। ভাষ্যকার এখানে এই পূর্বপক্ষের অবতারণা করিয়া, তদুত্তরে বলিয়াছেন যে, শব্দবিশেষ অর্থবিশেষের বাচক বলিয়াই তাহা হইতে অর্থবিশেষের যথার্থ বোধ হওয়ায় তাহা প্রমাণ হয়। শব্দ নিত্য বলিয়াই যে প্রমাণ, তাহা নহে। কারণ, শব্দে নিত্য বলিলে শব্দ ও অর্থের নিত্য সম্বন্ধ স্বীকার করিতে হয়। তাহা হইলে সকল শব্দের সহিত সকল অর্থের নিত্য-সম্বন্ধ স্বীকার করিতে হয়। তাহা হইলে সকল শব্দই সকল



অর্থের বাচক হওয়ার শব্দবিশেষের দ্বারা যে অর্থবিশেষেরই বোধ হয়, এই নিয়মের উপপত্তি হয় না। যদি বল, শব্দ অনিত্য হইলে তাহা কোন অর্থের বাচক হইতে পারে না। বাহা বাহা অনিত্য, সে সমস্তই অবাচক, এইরূপ নিয়ম বলিব। ভাষ্যকার এতদ্বারা বলিয়াছেন যে, এইরূপ নিয়ম হইতে পারে না। কারণ, লৌকিক শব্দ অনিত্য হইলেও তাহার বাচকত্ব সর্বসম্মত। অর্থাৎ পূর্বপক্ষবাদীও লৌকিক শব্দকে অনিত্য বলিবেন, কিন্তু তাহাতে অবাচকত্ব না থাকায় পূর্বোক্ত নিয়মে ব্যাভিচারবশতঃ ঐ নিয়ম বলিতে পারিবেন না। পূর্বপক্ষবাদী লৌকিক শব্দকেও যদি নিত্য বলেন, তাহা হইলে অনাপ্ত ব্যক্তির কথিত লৌকিক শব্দও তাহার মতে নিত্য হওয়ার নিত্যত্ববশতঃ তাহাকেও প্রমাণ বলিতে হইবে, উহাকে আর তিনি অপ্রমাণ বলিতে পারিবেন না। কিন্তু এইরূপ অনাপ্তবাক্য হইতে যথার্থ শব্দ বোধ না হওয়ার উহা যে অপ্রমাণ, ইহা সর্বসম্মত। পূর্বপক্ষবাদী তাহার মতে নিত্য অনাপ্তবাক্য হইতে যে অর্থার্থ বোধ হয়, তাহা উপপন্ন করিতে পারিবেন না। পূর্বপক্ষবাদী যদি বলেন যে, লৌকিক শব্দের মধ্যে অনাপ্তের কথিত শব্দগুলি অনিত্য, এই জ্ঞানই তাহার প্রামাণ্য নাই, তাহা হইতে যথার্থ বোধ হয় না। ভাষ্যকার এতদ্বারা বলিয়াছেন যে, অনাপ্তের কথিত শব্দ অনিত্য, ইহার বিশেষ অর্থার্থ বিশেষক হেতু কিছু বলা হয় নাই, তাহা না বলিলে উহা স্বীকার করা যায় না, সুতরাং তাহা বলা আবশ্যক। তাৎপর্য্য এই যে, পূর্বপক্ষবাদী ঐ বিশেষ হেতু কিছু বলিতে পারিবেন না—কারণ, উহা নাই। লৌকিক অনাপ্তবাক্য যদি নিত্য হয়, তাহা হইলে লৌকিক অনাপ্তবাক্যও অনিত্য হইতে পারে না, সুতরাং পূর্বপক্ষবাদীর ঐ কথা গ্রাহ্য নহে। তাহা হইলে অনিত্য হইলেই অবাচক হইবে, এইরূপ নিয়মে ব্যাভিচারবশতঃ ঐ নিয়মও গ্রাহ্য নহে। সুতরাং শব্দের বাচকত্ব আছে বলিয়াই যে, তাহা নিত্যই বলিতে হইবে, অনিত্য হইলে বাচক হইতে পারে না, ইহাও বলা গেল না।

ভাষ্যকার শেষে বলিয়াছেন যে, ঘটপটাদি সংজ্ঞা-শব্দগুলির যে অর্থে সঙ্কেত আছে, ঐ সঙ্কেতানুসারেই তৎপ্রযুক্ত ঐ সকল শব্দ ঘটপটাদি পদার্থ-বিষয়ক যথার্থ বোধ জন্মাইয়া থাকে, সুতরাং ঐ সকল শব্দ প্রমাণ। প্রমেরবিষয়ে যথার্থ অনুভূতির সাধন হওয়াতেই উহাদিগের প্রামাণ্য, নিত্যত্বনিবন্ধন উহাদিগের প্রামাণ্য উপপন্ন হয় না। মহর্ষি পূর্বে শব্দপ্রামাণ্য পরীক্ষা করিতে শব্দ ও অর্থের স্বাভাবিক সম্বন্ধবাদ খণ্ডন করিয়া, শব্দার্থবোধ যে সঙ্কেত-প্রযুক্ত, এই নিয়মত সমর্থন করিয়াছেন। ভাষ্যকার সেখানেই বিচার দ্বারা মহর্ষির সিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়াছেন। এখানে সেই সমর্থিত সিদ্ধান্তেরই অনুবাদ করিয়া নিত্যত্ববশতঃই যে শব্দের প্রামাণ্য নহে, তাহা হইতেই পারে না, ইহা বলিয়া প্রথমোক্ত পূর্বপক্ষের নিরাস করিয়াছেন। বস্তুতঃ মহর্ষি গোতম এই অধ্যায়ের দ্বিতীয় আদিক মীমাংসকসম্মত শব্দের নিত্যত্বপক্ষ খণ্ডন করিয়া, অনিত্যত্ব পক্ষের সমর্থন করার বেদে নিত্যত্ব হেতুই নাই, বেদ অপৌরুষেয় হইতেই পারে না। ভাষ্যকার্য্য উদয়ন প্রভৃতি বহু বিচার দ্বারা শব্দের অনিত্যত্ব সমর্থন করিয়া বেদের পৌরুষেয়ত্ব ব্যবস্থাপন করিয়াছেন। উদ্যোতকরও এখানে বেদের নিত্যত্ব বা অপৌরুষেয়ত্ব অসিদ্ধ বলিয়া তৎপ্রযুক্ত বেদের প্রামাণ্য বলা যায় না, ইহা সমর্থন করিয়াছেন। উদ্যোতকর এখানে আরও বলিয়াছেন



যে, কেহ কেহ প্রমাণপদার্থ নিত্য হইতে পারে না, নিত্য কোন প্রমাণ নাই, এই কথা বলিয়া বেদকে অনিত্য বলেন, কিন্তু ইহা সহস্র নহে। কারণ, প্রমাণ শব্দটি যথার্থ জ্ঞানের কারণ মাত্রকেই বুঝায়। সুতরাং মন এবং আত্মাও প্রমাণ, প্রদীপকেও প্রমাণ বলা হয়। মন ও আত্মা নিত্য পদার্থ হইলেও যখন তাহাকে প্রমাণ বলা হয়, তখন নিত্য কোন প্রমাণ নাই, ইহা বলা যায় না। উদ্যোতকর এই কথা বলিয়া পরমত খণ্ডনপূর্বক নিজ মত বলিয়াছেন যে, লৌকিক বাক্য যেমন অর্থবিভাগ বা বাক্যবিভাগ থাকায় তাহা অনিত্য, তদ্রূপ বেদবাক্যও অর্থবিভাগ থাকায় তাহাও অনিত্য। অর্থবিভাগ থাকিলেও বেদবাক্য নিত্য হইবে, লৌকিক বাক্য অনিত্য হইবে, ইহার বিশেষ হেতু নাই। উদ্যোতকর এইরূপে লৌকিক বাক্যকে দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করিয়া অর্থবিভাগবহ হেতুর দ্বারা এবং পরে অজ্ঞান বহু হেতুর দ্বারা বেদের অনিত্যত্ব সমর্থন করিয়া, নিত্যত্ব-প্রযুক্তই যে বেদের প্রামাণ্য, এই পূর্বপক্ষের নিরাসের দ্বারা আশ্র-প্রামাণ্য-প্রযুক্তই বেদের প্রামাণ্য, এই গৌতম সিদ্ধান্তের সমর্থন করিয়াছেন। বস্তুতঃ বর্ণকে নিত্য বলিয়া কেহ সিদ্ধান্ত করিলেও বর্ণসমূহরূপ পদ ও পদসমূহরূপ বাক্যকে কেহ নিত্য বলিতে পারেন না। সুতরাং বেদবাক্য নিত্য, ইহা সিদ্ধান্ত হইতেই পারে না। শ্রীমদ্বাচস্পতি মিশ্র "ভ্রামতী" গ্রন্থে বলিয়াছেন যে, ঐহ্যারা বর্ণকে নিত্য বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তাঁহারা পদ ও বাক্যের অনিত্যত্ব অবগত হইয়া কহিবেন? বাচস্পতি মিশ্র ইহা অজ্ঞানরূপ যুক্তির দ্বারা প্রতিপন্ন করিলেও ছায়াচাৰ্য্যগণ বর্ণের অনিত্যত্ব সমর্থন করিয়াই বর্ণসমূহরূপ পদ ও পদসমূহরূপ বাক্যের অনিত্যত্ব সমর্থন করিয়াছেন। বর্ণ অনিত্য হইলে পদ ও বাক্য নিত্য হইতে পারে না, ইহা তাহাদিগের যুক্তি। বাচস্পতি মিশ্র দেখাইয়াছেন যে, বর্ণ নিত্য হইলেও পদ ও বাক্য নিত্য হইতে পারে না। দ্বিতীয় আক্ষিকে শব্দের অনিত্যত্ব-পরীক্ষা-প্রকরণে সত্বেল কথা ব্যক্ত হইবে।

পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তে প্রতিবাদ হইতে পারে যে, বেদ নিত্য, এইরূপ কথা লোকপ্রসিদ্ধ আছে। শাস্ত্রেও অনেক স্থানে বেদ নিত্য, এইরূপ কথা পাওয়া যায়। শব্দের নিত্যত্ব-বোধক ক্রটিও আছে। পূর্বসমীমাংসাসূত্রকার মহর্ষি জৈমিনিও শেবে ঐ ক্রটির কথা বলিয়া, তাঁহার স্থপক্ষদাতক যুক্তিকেই প্রবল বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন। সুতরাং বেদের অনিত্যত্ব মত শাস্ত্রবিরুদ্ধ ও লোকবিরুদ্ধ বলিয়া উহা গ্রহণ করা যায় না। ভাষ্যকার এই জন্তই শেবে বলিয়াছেন যে, অতীত ও ভবিষ্যৎ মনস্তর এবং দুর্গাশ্রয়ে সম্প্রদায়, অভ্যাস ও প্রয়োগের বিচ্ছেদ না হওয়াই বেদের নিত্যত্ব। "সম্প্রদায়" শব্দটি বেদ ও অজ্ঞান অর্থেও প্রযুক্ত হইয়াছে। এখানে বাহাদিগকে বেদাদি শাস্ত্র সম্প্রদান করা হয়, এইরূপ ব্যুৎপত্তিতে শিষ্যপরম্পরা অর্থেই "সম্প্রদায়" শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে বুঝা যায়। এবং "অভ্যাস" শব্দের দ্বারা বেদাভ্যাস ও "প্রয়োগ" শব্দের দ্বারা বেদপ্রতিপাদিত কার্যের অনুষ্ঠানই ভাষ্যকারের বিবক্ষিত বুঝা যায়। সম্প্রদায়ের অভ্যাস ও প্রয়োগ, এইরূপ অর্থও ভাষ্যকারের বিবক্ষিত বুঝা যাইতে পারে। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি, এই চারি যুগে এক দিব্য যুগ

১। দেখি ভাষ্যে বর্ণানং নিত্যত্বাশ্রিত্য, তৈরপি শব্দবাক্যাদীনানি নিত্যত্ববস্তুপেক্ষ ইত্যাদি।

( বেদান্তদর্শন—৩য় পূত্র-ভাষ্য, ভ্রামতী ) উক্ত।



হয়। ভাষ্যে “যুগ” শব্দের দ্বারা এই দিব্য যুগই অভিপ্রেত। উদ্যোতকর “মবন্তরচতুর্যুগান্তরেবু” এইরূপ কথাই লিখিয়াছেন। চতুর্যুগের নাম দিব্য যুগ। একদণ্ডি (৭১) দিব্য যুগে এক মবন্তর হয়। ভাষ্যকারের গূঢ় তাৎপর্য এই যে, অতীত ও ভবিষ্যৎ মবন্তরে অর্থাৎ চতুর্দশ মবন্তরের মধ্যে এক মবন্তরের পরে যখন অত্র মবন্তরকাল উপস্থিত হইয়াছে এবং আবার যখন ঐরূপ উপস্থিত হইবে এবং এক দিব্য যুগের পরে যখন অত্র দিব্য যুগ উপস্থিত হইয়াছে এবং আবার যখন ঐরূপ উপস্থিত হইবে, তখনও পূর্ববৎ বেদের সম্প্রদায় এবং তাহাদিগের বেদাভ্যাস ও বৈদিক কস্মাহুষ্ঠান ছিল ও থাকিবে। তখন যে সম্প্রদায় লোণ ও বেদাভ্যাসাদির বিলোপ হইয়াছিল এবং ঐরূপ সময় উপস্থিত হইলে পরেও ঐরূপ সম্প্রদায় বিলোপাদি হইবে, তাহা নহে। অতীত ও ভবিষ্যৎ সমস্ত মবন্তর ও যুগান্তরের প্রারম্ভে বেদ-সম্প্রদায়াদির বিচ্ছেদ হয় না, তখনও বেদের অধ্যাপক ও শিষ্য এবং তাহাদিগের বেদাভ্যাস ও বৈদিক কস্মাহুষ্ঠান অব্যাহত থাকে—এই ভ্রমাই লোকে বেদ নিত্য, এইরূপ প্রয়োগ হয়। শাস্ত্রেও অনেক স্থানে ঐ তাৎপর্য্যেই বেদকে নিত্য বলা হইয়াছে। বস্তুতঃ বেদ যে উৎপত্তি-বিনাশ-মুক্ত নিত্য, তাহা নহে। সূত্রগ্রন্থ বুঝা যায় যে, শাস্ত্রও বেদকে ঐরূপ নিত্য বলেন নাই। শাস্ত্রে যে আছে, “বেদের কেহ কর্তা নাই, বেদ স্রস্তু, ঈশ্বর হইতে অবি পর্য্যন্ত বেদের কর্তা—কর্তা নহেন”, ইত্যাদি বাক্যেরও ঐরূপ কোন তাৎপর্য্য বুঝিতে হইবে। ঐ সকল বাক্য বেদের তত্ত্ব, ইহাই বুঝিতে হইবে। কারণ, যে অর্থ অসম্ভব, তাহা শাস্ত্রার্থ হইতে পারে না, শাস্ত্র কিছুতেই তাহা বলিতে পারেন না, ইহাই ভাষ্যকার প্রকৃতি ভ্রাতার্য্যগণের কথা। উদ্যোতকর বলিয়াছেন যে, যেমন পূরিত ও নদী অনিত্য হইলেও পূরিত নিত্য, নদী নিত্য, এইরূপ প্রয়োগ হয়, তজপ বেদ অনিত্য হইলেও পূরিত সম্প্রদায়াদির অবিচ্ছেদ তাৎপর্য্যেই বেদ নিত্য, এইরূপ প্রয়োগ হয়। উদ্যোতকর শেষে ইহাও বলিয়াছেন যে, বেদের যেরূপ নিত্যতা বলা হইল, তাহা মহাদি-বাক্যেও আছে, অর্থাৎ বেদের দ্বারা মহাদি স্মৃতিরও মবন্তর ও যুগান্তরে সম্প্রদায়াদির বিচ্ছেদ হয় না।

বেদের অপৌরুষেয়তাবাদী মীমাংসকসম্প্রদায় প্রলয় অস্বীকার করিয়া বলিয়াছেন যে, অনাদি কাল হইতে অধ্যাপক ও অধ্যাতৃগণ অপৌরুষেয় বেদের অভ্যাসাদি করিতেছেন। কোন কালেই বেদের সম্প্রদায়াদির বিচ্ছেদ হয় নাই ও হইবে না; বেদশূন্য কোন কাল নাই, সূত্রগ্রন্থ প্রবাহরূপেও বেদের নিত্যতা অস্বীকার্য্য। বেদশূন্য কাল না থাকা বা কোন কালেই বেদের অভাব না থাকাকে তাহারা বলিয়াছেন—প্রবাহরূপে বেদের নিত্যতা। ভ্রাতার্য্য উদয়ন ও গঙ্গেশ প্রমাণ দ্বারা প্রলয় সমর্থন করিয়া মীমাংসক-সম্প্রদায়ের ঐ মতেরও বণ্ডন করিয়াছেন। তাৎপর্য্য-টীকাকার বাচস্পতি মিশ্রও এখানে বলিয়াছেন যে, মহাপ্রলয়ে ঈশ্বর বেদ প্রণয়ন করিয়া সৃষ্টির প্রথমে সম্প্রদায় প্রবর্তন করেন। অর্থাৎ মবন্তর ও যুগান্তরে বেদের সম্প্রদায়াদির বিচ্ছেদ না হইলেও মহাপ্রলয়ে উহার বিচ্ছেদ অবশ্যস্বাভাবী। পুনঃ সৃষ্টির প্রারম্ভে ঈশ্বরই আবার স্বপ্রণীত বেদের সম্প্রদায়

১। “মবন্তরেতি। মহাপ্রলয়ে স্বীকৃত্যেণ বেদান্। এবীর স্বষ্ট্যাদৌ সম্প্রদায়ঃ প্রবর্ত্যত এবমিতি ভাব্য।”—  
ভাষ্যদ্বিতীয়া।



প্রবর্তন করেন। ঈশ্বর ভিন্ন উহা আর কেহ করিতে পারেন না, এ জ্ঞাত ঈশ্বর অবশ্য স্বীকার্য। যে মহাপ্রলয়ের পরে আর সৃষ্টি হইবে না, এমন মহাপ্রলয় বাচস্পতি মিশ্র প্রভৃতি স্বীকার করেন নাই। মূলকথা, প্রলয় প্রমাণসিদ্ধ বলিয়া সর্বকালেই বেদের সম্প্রদায়দিগ বিচ্ছেদ হয় না, এই মত ত্রায়চাৰ্য্যগণ খণ্ডন করিয়াছেন। ভাষ্যকার উপসংহারে মূলসিদ্ধান্ত বলিয়াছেন যে, আগু-প্রামাণ্যপ্রযুক্তই বেদের প্রামাণ্য ইহা লৌকিক বাক্যে সমান। অর্থাৎ লৌকিক বাক্যের প্রামাণ্য বধন অবশ্য স্বীকার্য, তখন তদুদ্যোক্ত বেদপ্রামাণ্যও অবশ্য স্বীকার্য। লৌকিক বাক্য নিত্য, নিত্যপ্রযুক্তই তাহার প্রামাণ্য, ইহা বলা হইবে না, কোন সম্প্রদায়ই তাহা বলেন নাই ও বলিতে পারেন না। লৌকিক বাক্যের বক্তা আগু হইলে তাহার প্রামাণ্যপ্রযুক্তই ঐ বাক্যের প্রামাণ্য, ইহাই সকলের স্বীকার্য। সুতরাং বেদবাক্যের প্রামাণ্য ও বেদ-বক্তা আগু ব্যক্তির প্রামাণ্যপ্রযুক্ত, ইহাই স্বীকার্য। ভাষ্যকার পরে লৌকিক বাক্যের দৃষ্টান্ত স্বচনা করিয়া বেদের প্রামাণ্যসাধনে উদাহকেই চরম দৃষ্টান্তরূপে প্রকাশ করিয়াছেন।

বৈশেষিক হুত্রকার মহর্ষি কণাদও “বুদ্ধিপূর্ক বাক্যকৃতির্বেদে” (৬১) এই হুত্রের দ্বারা লৌকিক আগুবাক্যের দৃষ্টান্ত স্বচনা করিয়া বেদের পৌরুষেরই সমর্থন করিয়াছেন। কণাদের কথা এই যে, বেদবাক্য-রচনা বুদ্ধিপূর্কক। বেদবাক্যের বক্তা, ঐ বাক্যার্থ বোধপূর্ককই বেদ-বাক্য বলিয়াছেন। কারণ, যে ব্যক্তি যে বিষয়ে অভ্যাস ও অপ্রত্যয়ক, তাহার বাক্যই ওদ্বিধেরে প্রমাণ হয়, ইহা লৌকিক আগুবাক্য স্থলে দেখা যায়, এবং ঐ লৌকিকবাক্যের বক্তা ঐ বাক্যার্থ বোধপূর্ককই সেই বাক্য বলেন। সুতরাং লৌকিক আগুবাক্যের দৃষ্টান্তে বেদবাক্যেরও অবশ্য কেহ বক্তা আছেন, তিনি ঐ বাক্যার্থবোধপূর্ককই ঐ বাক্য বলিয়াছেন, ইহা স্বীকার্য। মহর্ষি গোতমের দ্বারা মহর্ষি কণাদও—বেদকর্তা, আগু পুরুষ, ঈশ্বর, ইহা স্পষ্ট না বলিলেও তাহার মতেও নিত্যজ্ঞানসম্পন্ন জগৎস্রষ্টা ঈশ্বরই বেদের স্রষ্টা, ইহাই সিদ্ধান্ত বৃদ্ধিতে হইবে। কারণ, ঋগ্বেদের গুরুবস্তুক মন্ত্রাদিতে ঈশ্বর হইতেই বেদের উৎপত্তি বর্ণিত আছে। বেদানি সকল বিদ্যাই সেই সর্বজ্ঞ ঈশ্বর হইতে উদ্ভূত, ইহা উপনিষদেও বর্ণিত আছে। ঈশ্বরই বিভিন্ন মূর্তিতে বেদানি-বিদ্যা বলিয়াছেন। পাতঞ্জলদর্শনের স্থানতাত্ত্ব্য ও বাচস্পতি মিশ্রের টীকার দ্বারাও এই সিদ্ধান্ত বুঝা যায়। (২৫-হুত্র ভাষ্যটীকা স্রষ্টব্য)। বেদান্তহুত্রে বেদবাস্যও ঈশ্বরকেই “শাস্ত্রযোনি” বলিয়াছেন। সর্বজ্ঞ ঈশ্বর ভিন্ন আর কেহই সকল জ্ঞানের আকর বেদ নির্মাণ করিতে পারেন না, ইত্যাদি প্রকার ব্যক্তির দ্বারা ভাষ্যকার শব্দরও উপনিষৎ ও ব্রহ্মসূত্রের ঐ সিদ্ধান্তেরই সমর্থন করিয়াছেন। পরন্তু, বেদকর্তা পুরুষের স্বাতন্ত্র্যবিষয়ে বিবাদ করিলেও বেদ যে, কোন পুরুষের প্রণীতই নহে, ইহা বলা যায় না। বেদ স্বতন্ত্র পুরুষের প্রণীত নহে, এই অর্থে কেহ বেদকে অপৌরুষেয় বলিলেও তাহাতে বেদ যে, কোন পুরুষের প্রণীতই নহে, ইহা বলা হয় না। (বেদান্তদর্শন, তৃতীয় হুত্রভাষ্য—ভান্ডারী স্রষ্টব্য)। বস্তুতঃ সকল জ্ঞান-বিজ্ঞানের আকর বেদই পৃথিবীর আদিময়, উহার পূর্ণের আর কোন শাস্ত্র বা গ্রন্থ ছিল না, ইহা কাহারও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সুতরাং বেদকর্তা যে শাস্ত্রাদির অধ্যয়নাদির দ্বারা জ্ঞান লাভ করিয়া, বেদ রচনা



করিয়াছেন, ইহাও কেহ বলিতে পারেন না। কিন্তু বেদে যে সকল ভূক্তের তবের, অতীন্দ্রিয় তবের বর্ণন দেখা যায়, তাহা অতীন্দ্রিয়ার্থদর্শী সর্বজ্ঞ পুরুষ ভিন্ন আর কেহই বর্ণন করিতে পারেন না। সুতরাং ময়ও আত্মকর্মেদের দ্বারা নিত্যজ্ঞানসম্পন্ন সর্বজ্ঞ ঈশ্বরই জীবের মঙ্গলের জন্য বেদ রচনা করিয়াছেন ইহাই স্বীকার্য। বেদার্থবোধের পূর্বে আর কোন ব্যক্তিই বেদপ্রতিপাদিত ঐ সকল অতীন্দ্রিয় তব জানিতে পারেন না, এবং ঈশ্বর ব্যতীত আর কাহাকেও সর্ববিষয়ক নিত্যজ্ঞানসম্পন্ন বলিয়া স্বীকার করা যায় না, তাদৃশ বহু ব্যক্তি স্বীকারের অপেক্ষার ঐরূপ এক ব্যক্তির স্বীকারই কর্তব্য, তিনিই ঈশ্বর,—তিনিই বেদকর্তা, ইহাই দ্বারাচার্য্যগণের সমর্থিত সিদ্ধান্ত।

বেদের পৌরুষবেদ্য ও অর্শৌরবেদ্য বিষয়ে আন্তিক-সম্প্রদায়ের মতভেদ থাকিলেও বেদের প্রামাণ্য বিষয়ে তাহাদিগের কোন মতভেদ নাই। বর্ণাশ্রম ধর্ম্মাবলম্বী ঋষি প্রভৃতি মহাজনদিগের পরিগ্রহবশতঃ অর্থাৎ মহাজনগণ—বেদকে প্রামাণ্যরূপ গ্রহণ করিয়া, বেদপ্রতিপাদিত কর্ম্মাদির অনুষ্ঠান করার বেদের প্রামাণ্য নিশ্চয় করা যায়, ইহাও পূর্বাচার্য্যগণ বলিয়াছেন। বুদ্ধ প্রভৃতির শাস্ত্র বেদ-বিরুদ্ধ এবং উহা ঋষি প্রভৃতি মহাজন-পরিগৃহীত নহে। ঋষিগণ বেদবিরুদ্ধ ঐ মত গ্রহণ করেন নাই, এজন্য পূর্বাচার্য্যগণ উহাকে প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করেন নাই। কিন্তু জ্ঞান-মঞ্জরীকার জয়ন্ত ভট্ট পূর্বোক্ত প্রকার নিজ মত সমর্থন করিয়া, তদানীন্তন মতান্তররূপে ইহাও বলিয়াছেন যে, ঈশ্বরই সর্বশাস্ত্রের প্রণেতা। ঈশ্বরই অধিকারিবেশেষের জন্য অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন অধিকারিসমূহের বিভিন্নরূপ যোগ্যতা বা অধিকার বুঝিয়া নিজ মহিমার দ্বারা নানা শরীর গ্রহণ করিয়া “অর্হৎ,” “কপিল,” “সুগত” প্রভৃতি নামে অবতীর্ণ হইয়া, ভিন্ন ভিন্ন প্রকার মোক্ষোপায়ের উপদেশ করিয়াছেন ও চিরকাল ঐরূপই করিবেন। ঈশ্বর বৈদিক মার্গের উপদেশ দ্বারা অসংখ্য জীবকে অনুগ্রহ করিয়াছেন এবং অবৈদিক মার্গের উপদেশ দ্বারা অসংখ্যক জীবকে অনুগ্রহ করিয়াছেন, এই জন্য মহাজনগণ বেদকেই গ্রহণ করিয়াছেন। অধিকারিবেশেষের উদ্ধারের জন্য বুদ্ধ প্রভৃতি শরীরধারী ঈশ্বরের কথিত শাস্ত্র মহাজনগণ গ্রহণ করেন নাই। বেদ এবং বুদ্ধাদি শাস্ত্র বস্তুতঃ এক ঈশ্বরের কথিত হইলেও যেমন অধিকারিবেশেষের জন্য বেদেও পরস্পর-বিরুদ্ধ বাদ কথিত হইয়াছে, তজ্জন বুদ্ধাদি-শাস্ত্রেও অধিকারিবেশেষের জন্য বেদবিরুদ্ধ বাদ কথিত হইয়াছে। জয়ন্ত ভট্ট এই মত সমর্থন করিয়া, পরে আর একটি মত বলিয়াছেন যে, অপর সম্প্রদায় বুদ্ধাদি-শাস্ত্রকেও বেদমূলক বলিয়া প্রমাণ বলেন। বুদ্ধাদি শাস্ত্রোক্ত মতও বেদে আছে। কপিল ও বুদ্ধ প্রভৃতি শরীরধারী ঈশ্বরই অধিকারিবেশেষের জন্য নানাবিধ শাস্ত্র বলিয়াছেন, ঐ সমস্ত শাস্ত্রই বেদমূলক, সুতরাং প্রমাণ। জয়ন্ত ভট্ট এই মতেরও আপত্তিনিরাসের দ্বারা সমর্থন করিয়াছেন। প্রাচীন জয়ন্ত ভট্টের এই সকল কথা সুধীগণের বিশেষরূপে চিন্তনীয়। (জায়মঞ্জরী, কালী সংস্করণ,—২৬৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। বেদাদি শাস্ত্রের প্রামাণ্য সবন্ধে অজ্ঞাত কথা চতুর্থ অধ্যায়ে ১ আঙ্কিক, ৩২ বৃজভাষ্যে দ্রষ্টব্য)। ৬৮।

শব্দবিশেষপরীক্ষাপ্রকরণ ও প্রথম আঙ্কিক সমাপ্ত।



## দ্বিতীয় আন্বিক

ভাষ্য । অর্থার্থঃ প্রমাণোদ্দেশ ইতি মত্বাহ—

অনুবাদ । প্রমাণের উদ্দেশ অর্থার্থঃ প্রমাণের বিভাগরূপ উদ্দেশ যথার্থ হয় নাই, ইহা মনে করিয়া মহর্ষি বলিতেছেন—

সূত্র । ন চতুষ্কটমৈতিহ্যার্থাপত্তি-সম্ভবাব-  
প্রমাণ্যাং ॥১৥১৩০॥

অনুবাদ । ( পূর্ববাক্য ) [ প্রমাণের ] চতুষ্কট নাই, অর্থার্থঃ প্রমাণ পূর্বোক্ত চারি প্রকারই নহে, বেহেতু ঐতিহ্য, অর্থাপত্তি, সম্ভব ও অভাবের প্রমাণ্য আছে ।

ভাষ্য । ন চতুর্থোইব প্রমাণানি, কিং তর্হি ? ঐতিহ্যমর্থাপত্তিঃ সম্ভবোহভাব ইত্যেতান্যপি প্রমাণানি । “ইতি হোচু”রিত্যানির্দিষ্ট-প্রবক্তৃকং প্রবাদপারম্পর্যমৈতিহ্যং । অর্থাদাপত্তিরর্থাপত্তিঃ, আপত্তিঃ প্রাপ্তিঃ প্রসঙ্গঃ । যত্রাহিভিধীয়মানৈহর্থৈ যোহন্যোহর্থঃ প্রসজ্যতে সোহর্থাপত্তিঃ । যথা মেঘেষসংস্থ রুষ্টির্ম ভবতীতি । কিমত্র প্রসজ্যতে ? সংস্থ ভবতীতি । সম্ভবো নামাবিনাভাবিনোহর্থস্ত সত্তাগ্রহণাদন্যস্ত সত্তাগ্রহণং । যথা দ্রোণস্ত সত্তাগ্রহণাদাটকস্ত সত্তাগ্রহণং, আটকস্ত সত্তাগ্রহণাৎ প্রস্থশ্চেতি । অভাবো বিরোধীভূতং ভূতস্ত, অবিদ্যমানং বর্ষকস্ত বিদ্যমানস্ত বায়ুভ্রমং-যোগস্ত প্রতিপাদকং । বিধারকে হি বায়ুভ্রমংযোগে গুরুত্বাদপাং পতন-কর্ম ন ভবতীতি ।

অনুবাদ । প্রমাণ চারিই নহে, অর্থার্থঃ প্রত্যেক প্রভৃতি পূর্বোক্ত চারি প্রকারই নহে । ( প্রশ্ন ) তবে কি ? ( উত্তর ) ঐতিহ্য, অর্থাপত্তি, সম্ভব, অভাব, এইগুলিও প্রমাণ । ( বক্তৃগণ ) প্রবাদ বলিয়া গিয়াছেন, এইরূপে অনির্দিষ্টপ্রবক্তৃক, অর্থার্থঃ যাহার মূল বক্তা কে, তাহা জানা যায় না, এমন প্রবাদপারম্পর্য (১) ঐতিহ্য । অর্থতঃ আপত্তি, অর্থাপত্তি, আপত্তি কি না প্রাপ্তি, প্রসঙ্গ । ফলিতার্থ এই যে, যেখানে অর্থ, অর্থার্থঃ যে কোন বাক্যার্থ অভিধীয়মান হইলে যে অন্য অর্থ প্রসক্ত হয়, তাহা অর্থার্থঃ ঐ অন্ত্যর্থের প্রসক্তি বা জ্ঞানবিশেষ (২) অর্থাপত্তি । যেমন মেঘ না হইলে

বৃষ্টি হয় না, (প্রশ্ন) এখানে কি প্রসঙ্গ হয় ? (উত্তর) হইলে, অর্থাৎ সেব হইলে (বৃষ্টি) হয়। (৩) “সম্ভব” বলিতে অবিনাশাবিশিষ্ট অর্থাৎ ব্যাপ্তিবিশিষ্ট পদার্থের সম্ভাজ্ঞানপ্রযুক্ত অন্য পদার্থের সম্ভাজ্ঞান। যেমন দ্রোণের (পরিমাণবিশেষের) সম্ভাজ্ঞানপ্রযুক্ত আড়কের (পরিমাণবিশেষের) সম্ভাজ্ঞান, আড়কের সম্ভাজ্ঞানপ্রযুক্ত প্রস্থের (পরিমাণবিশেষের) সম্ভাজ্ঞান। বিদ্যমান পদার্থের সম্বন্ধে অবিদ্যমান বিরোধী পদার্থ (৪) অভাব, অর্থাৎ অভাব নামক অষ্টম প্রমাণ। (উদাহরণ) অবিদ্যমান বৃষ্টিকর্ম অর্থাৎ বৃষ্টি না হওয়া বায়ুর সহিত মেঘের সংযোগের প্রতিপাদক (নিশ্চায়ক) হয়। যেহেতু, বিধারক অর্থাৎ মেঘাস্তর্গত জলের পতন-প্রতিবন্ধক বায়ু ও মেঘের সংযোগ থাকিলে গুরুত্বপ্রযুক্ত জলের পতনক্রিয়া হয় না।

টিপ্পনী। মহর্ষি প্রথমাদ্বায়ের তৃতীয় সূত্রে প্রমাণকে প্রত্যক, অনুমান, উপমান ও শব্দ, এই চারি প্রকার বলিয়া শেবে তাহাদিগের প্রত্যেকের লক্ষণ বলিয়াছেন। দ্বিতীয়াদ্বায়ের প্রথম আঙ্কিকে সামান্ততঃ প্রমাণ-পরীক্ষার পবে বিশেষ করিয়া ঐ প্রত্যক্ষাদি প্রমাণচতুষ্টয়ের পরীক্ষার দ্বারা উহাদিগের প্রমাণ্য সম্বন্ধ নির্দেশ করিয়াছেন। মহর্ষি পূর্বোক্ত চতুর্বিধ প্রমাণেরই উদ্দেশ্য ও লক্ষণ করার তদনুসারে ঐ চতুর্বিধ প্রমাণের পরীক্ষা করিয়াই প্রমাণ-পরীক্ষা সমাপ্ত করিয়াছেন। কিন্তু তাহার মহর্ষি গোতম-প্রোক্ত প্রত্যক্ষাদি প্রমাণচতুষ্টয়ের ভিন্ন “ঐতিহ্য,” “অর্গাপত্তি,” “সম্ভব” ও “অভাব” এই চারিটি প্রমাণও স্বীকার করিয়াছেন, তাহাদিগের মতে মহর্ষি গোতমের প্রমাণ-বিভাগ যথার্থ হয় নাই। তাহাদিগের মত খণ্ডন না করিলে মহর্ষির প্রমাণ-বিভাগ যথার্থ হয় না, তাহার প্রমাণ-পরীক্ষাও সমাপ্ত হয় না, এ জন্য মহর্ষি দ্বিতীয় আঙ্কিকের প্রথমোক্ত ব্রাহ্মের পূর্বপক্ষরূপে পূর্বোক্ত মতবাদীদিগের পূর্বপক্ষ বলিয়াছেন যে, প্রমাণের চতুষ্টই নাই, অর্থাৎ প্রমাণ যে কেবল প্রত্যক প্রভৃতি চারি প্রকার, তাহা নহে। কারণ, ঐতিহ্য, অর্গাপত্তি, সম্ভব ও অভাব, এই চারিটিও প্রমাণ। সুতরাং প্রমাণ আট প্রকার, উহা চারি প্রকার বলা সংগত হয় নাই। ভাষ্যকার প্রথমে এই পূর্বপক্ষের প্রকাশ করিয়াই, এই পূর্বপক্ষ-সূত্রের অবতারণা করিয়া সূত্রার্থ বর্ণনপূর্বক সূত্রোক্ত ঐতিহ্য, অর্গাপত্তি, সম্ভব ও অভাব নামক প্রমাণচতুষ্টয়ের স্বরূপবর্ণন ও উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন। ভাষ্যে ঐতিহ্যের উদাহরণ প্রদর্শিত না হইলে ভাষ্যকারের কঠব্যবহান হয়, এ জন্য মনে হয়, ভাষ্যকার ঐতিহ্যেরও উদাহরণ বলিয়াছিলেন, তাহার সে পাঠ বিলুপ্ত হইয়াছে। কিন্তু উদ্যোতকরের বার্তিকেরও ঐতিহ্যের উদাহরণ দেখা যায় না। ঐতিহ্যের উদাহরণ সুপ্রসিদ্ধ বলিয়াই ভাষ্যকার ও বার্তিককার তাহা বলেন নাই, ইহাও বুঝা যায়। “ঐতিহ্য” এই শব্দটি অব্যয়, উহার অর্থ পরম্পরাগত বাক্য বা প্রবাদ-পরম্পরা। “ঐতিহ্য” শব্দের উৎপত্তি স্বার্থে তদ্ধিত-প্রত্যয়ে “ঐতিহ্য” শব্দটি সিদ্ধ হইয়াছে।

১। অনুবাদসমিতির ভেদব্যাঞ্জকঃ—পারিদিন্দ্র, ৭৮৭২। “পারম্পর্যোপদেশে ভাষ্যেইতিহ্যমিতিহ্যব্যাং” —অনুবাদক, প্রথমঃ ১২। অনুবাদে “ঐতিহ্য” এইরূপ অর্থই বলিয়াছেন, ইহা অনেকের মত। কিন্তু পারিদিন্দ্রে “ঐতিহ্য” শব্দই দেখা যায়।



তাক্ষিকরক্ষার টাকার মন্নিবাণও ইহাই বলিয়াছেন<sup>১</sup>। ভাষ্যে “ইতি হোচুঃ” এই কথা দ্বারা ঐতিহ্যের স্বরূপ প্রদর্শন করা হইয়াছে। বৃদ্ধমণ “ইতিহ” অর্থাৎ পূর্বোক্তরূপ প্রবাদ বলিয়া গিয়াছেন, তন্মধ্যে প্রথমে কোন্ বৃদ্ধ উহা বলিয়াছেন, ইহা জানা যায় না। মূল বক্তার বিশেষ নির্ণয় নাই, এইরূপে যে প্রবাদপরম্পরা জানা যায়, তাহাই ঐতিহ্য। যেমন “এই বটবৃক্ষে বক বাস করে, এই গ্রামে প্রত্যেক বটবৃক্ষে কুবের বাস করেন” ইত্যাদি প্রবাদ-বাক্য<sup>২</sup>। পৌরাণিকগণ ঐতিহ্যকে পৃথক প্রমাণ স্বীকার করিয়াছেন। ঐতিহ্য নামক প্রবাদ-বাক্যের মূল বক্তার আশুত্ব নিশ্চয়ের সম্ভাবনা নাই, সুতরাং উহা শব্দপ্রমাণ হইতে পারে না, উহা শব্দপ্রমাণ হইতে পৃথক প্রমাণ, ইহাই তাঁহাদিগের সমস্ত সমর্থনের যুক্তি।

অর্থাপত্তি প্রমাণের ব্যাখ্যায় ভাষ্যকার প্রথমে ‘অর্থতঃ আপত্তি’ অর্থাপত্তি, এই কথা বলিয়া অর্থাপত্তি শব্দের ব্যুৎপত্তি প্রদর্শনপূর্বক ঐ আপত্তি শব্দের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন—“প্রাপ্তি,” তাহার ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন—“প্রসঙ্গ”। পরে উহার ফলিতার্থ বর্ণন করিয়াছেন যে, যেখানে বাক্যের দ্বারা কোন অর্থবিশেষ বলিলে তদ্বিত্তি কোন অর্থের প্রসঙ্গ হয়, সেখানে ঐ অর্থান্তরপ্রসঙ্গই অর্থাপত্তি। সেখানে কথিত অর্থপ্রযুক্তই ঐ অর্থান্তরের আপত্তি বা প্রসঙ্গ জন্মে, এজন্য উহার নাম অর্থাপত্তি। অর্থাপত্তির বহু উদাহরণ থাকিলেও ভাষ্যকার উদাহরণ বলিয়াছেন যে, “মেঘ না হইলে বৃষ্টি হয় না” এই কথা বলিলে, মেঘ হইলে বৃষ্টি হয়, ইহা প্রসঙ্গ হয়, অর্থাৎ ঐ বাক্যার্থ-প্রযুক্ত মেঘ হইলে বৃষ্টি হয়, ইহা অবশ্য বুঝা যায়। তাহা হইলে মেঘ হইলে বৃষ্টি হয়, এই যে বোধ, তাহা অর্থাপত্তি নামক বোধ বলা যায়। ভাষ্যকার ঐরূপ প্রমিতিকেই ঐ স্থলে অর্থাপত্তির উদাহরণরূপে প্রদর্শন করিয়া, ঐ প্রমিতির করণই অর্থাপত্তি প্রমাণ, ইহা সূচনা করিয়াছেন। বস্তুতঃ অর্থাপত্তি প্রমাণ ও তজ্জন্য প্রমিতি, এই উভয়ই “অর্থাপত্তি” শব্দের দ্বারা কথিত হইয়াছে। ভাষ্যকার অর্থাপত্তির স্বরূপ বলিতে প্রমিতিরূপ অর্থাপত্তিরই স্বরূপ বলিয়াছেন, তদ্ব্যতীত অর্থাপত্তি-প্রমাণেরও স্বরূপ প্রকটিত হইয়াছে। পরন্তু ভাষ্যকার প্রকৃতির মতে প্রমিতিও (প্রথম অধ্যায়োক্ত) হানাদি-বুদ্ধিরূপ ফলের প্রতি প্রমাণ হওয়ার অর্থাপত্তি-প্রমাণের স্বরূপ বলিতে ভাষ্যকার অর্থাপত্তিবলীর প্রমিতিরও স্বরূপ বলিতে পারেন। প্রথম অধ্যায়ে প্রমাণ ব্যাখ্যায় উদ্যোক্তকর প্রকৃতির কথাহুসারে এইরূপ সমাধানও বলা হইয়াছে। মূল কথা, অর্থতঃ যে আপত্তি অর্থার্থ জ্ঞানবিশেষ, তাহাই অর্থাপত্তি-প্রমাণ-জন্য অর্থাপত্তি নামক জ্ঞান। “মেঘ না হইলে বৃষ্টি হয় না,” এই কথা বলিলে “মেঘ হইলে বৃষ্টি হয়” এইরূপ যে জ্ঞান জন্মে, তাহা প্রত্যেক প্রমাণের দ্বারা জন্মে না, ইহা সর্বসন্দেহত। অহুমান প্রমাণের দ্বারাও ঐ স্থলে ঐ বোধ জন্মে না। কারণ, কোন হেতুতে ব্যাপ্তিজ্ঞানপূর্বক ঐ বোধ জন্মে না। “মেঘ হইলে বৃষ্টি হয়” এইরূপ বাক্য

১। ইতি হেতি নিগাতসমুদায়ঃ প্রবাববাচী, ইতিহেব ঐতিহ্যঃ প্রবাদঃ। “অনন্তাবসম্বেতিহ ভেদজ্ঞানক্কাঃ” ইতি পার্বে ক্কাঃ। অন্তানির্দিষ্টত্যানি লক্ষণঃ, ইতি হোচুঃ ইতি স্বরূপপ্রদর্শনঃ।—তাক্ষিকরক্ষার মন্নিবাণটীকা।

২। বহা—“বটে বটে বৈশ্রবশ্বকবরে চক্রে নিঃ।

পক্ষতে পক্ষতে রামঃ সর্বত্র অনুবহনঃ।”—ইত্যাদি। তাক্ষিকরক্ষা, ১১৭ পৃষ্ঠা।



প্রযুক্ত না হওয়ায় ঐ বোধকে শব্দ বোধও বলা যায় না। কিন্তু মেঘ না হইলে বুড়ি হয় না, এইরূপ বাক্য বলিলে ঐ বাক্যার্থপ্রযুক্তই মেঘ হইলে বুড়ি হয়, ইহা বুঝা যায়। অর্থতঃই উহার আপত্তি বা আপত্তি হয়। অর্থাৎ ঐ বাক্যার্থ-জ্ঞান-বশতঃই এইরূপ অর্থ পাওয়া যায় বা বুঝা যায়, ঐ অর্থের প্রসঙ্গ অর্থাৎ এইরূপ জ্ঞানবিশেষ জন্মে। ঐ জ্ঞান অর্থাপত্তি নামক জ্ঞান, উহা প্রত্যক্ষাদি জ্ঞান হইতে বিভ্রান্তির, সুতরাং উহার করণও অর্থাপত্তি নামে পৃথক্ প্রমাণ।

ব্যাপ্তিবিশিষ্ট কোন পদার্থের সত্তা-জ্ঞানপ্রযুক্ত অল্প পদার্থের সত্তাজ্ঞানকে ভাষ্যকার “সম্ভব” বলিয়াছেন। সম্ভব-প্রমাণের উদাহরণ বলিতে ভাষ্যকার যে “দ্রোণ”, “আঢ্যক” ও “প্রস্থ” বলিয়াছেন, উহা পরিমাণবিশেষ। ৬৪ মুষ্টি পরিমাণকে এক “পুঙ্কল” বলে। চারি পুঙ্কলকে এক আঢ্যক বলে। চারি আঢ্যককে এক দ্রোণ বলে। সুতরাং দ্রোণ পরিমাণ থাকিলে সেখানে আঢ্যক অবশ্যই থাকিবে। আঢ্যক ব্যতীত দ্রোণ হয় না, সুতরাং দ্রোণে আঢ্যকের অবিনাশ্য অর্থাৎ ব্যাপ্তি আছে। তাহা হইলে কোন স্থানে ধাতাদির দ্রোণ পরিমাণ আছে, ইহা জানিলে সেখানে তাহার আঢ্যক পরিমাণ আছেই, ইহা বুঝা যায়, এবং আঢ্যক পরিমাণ আছে, ইহা জানিলে প্রস্থ পরিমাণ আছে, ইহাও বুঝা যায়; কারণ, বাহাকে “পুঙ্কল” বলা হইয়াছে, তাহারই নামান্তর প্রস্থ। চারি পুঙ্কল বা প্রস্থকে আঢ্যক বলে। দ্রোণ পরিমাণে আঢ্যক পরিমাণের ব্যাপ্তি থাকিলেও ঐ ব্যাপ্তিজ্ঞান ব্যতীতই দ্রোণসত্তা জ্ঞান হইলে আঢ্যকের সত্তাজ্ঞান হইয়া থাকে, সুতরাং উহা অল্পমান প্রমাণের দ্বারা হয় না, উহা “সম্ভব” নামক অতিরিক্ত প্রমাণের দ্বারা হয়, ইহাই “সম্ভবে”র প্রমাণান্তরবাদীদিগের কথা। ভাষ্যকার অভাব প্রমাণের স্বরূপ বলিয়াছেন যে, ভূত অর্থাৎ বিদ্যমান পদার্থের সথকে অভূত অর্থাৎ অবিদ্যমান বিরোধী পদার্থ ‘অভাব’। “ভূত” শব্দটি এখানে অন্ বাত্ হইতে নিস্পন্ন। বায়ুর সহিত মেঘের সংযোগবিশেষ হইলে উহা মেঘান্তর্গত জলের গুরুত্ব প্রতিবন্ধ করে, সুতরাং জলের গুরুত্ব-প্রযুক্ত যে পতন, তাহা সেই স্থলে হয় না। মেঘাভ্রমের পরে বুড়ি না হইলে বুঝা যায়, ঐ মেঘ বায়ু-সঞ্চালিত হইয়াছে। এখানে অবিদ্যমান বুড়ি অভূত পদার্থ, উহা বায়ু ও মেঘের সংযোগবিশেষরূপ ভূত

১। অষ্টমুষ্টিভবং কুপি: কুপয়োঃস্তৌ তু পুঙ্কলং।

পুঙ্কলানি চ চত্বারি আঢ্যক: গরিকীর্ষিতঃ।

চতুরাঢ্যকো ভবেদ্রোণ ইত্যাতদ্ব্যাসিকণঃ।—বিতাকরাবৃত্ত বচন।

ষাঙ্গিশংগদিকং প্রস্থমুক্তং বয়বকর্ণণা।

আঢ্যকস্ত চতুঃপ্রস্থকত্ববিশিষ্টো আঢ্যকঃ।—আর্ষ বচনবচন বচন। (আরম্ভিতত্ত্বে “চৌরান্নাতবিনির্ভয়ঃ”

—এই প্রকরণেই হইবে।)

সত্তাভেদে, ৮ আঢ্যক ১ দ্রোণ। পলাং প্রকৃৎকং মুষ্টি: কুড়বাকতুষ্টিঃ। চত্বার: কুড়বা: প্রস্থ: চতুঃপ্রস্থমখাঢ্যকঃ।

অষ্টাঢ্যকো ভবেদ্রোণঃ” ইত্যাদি অন্যকোনের রঘুনাথ চক্রবর্ত্তিকৃত টীকাবৃত্ত বচন। বৈজ্ঞানিক, ৮৮ শ্লোক হইবে।

২। বিরোধভূতঃ ভূতঃ। কপালব্রজ, ৩১১১।

বিরোধিলিঙ্গব্রূহরতি। অতুতঃ বর্গঃ ভূতঃ বায়ু,অন্যযোগতঃ লিঙ্গঃ।—উপকার।



(বিদ্যমান) পদার্থের নিশ্চয় জ্ঞান। অর্থাৎ বৃষ্টির অভাব জ্ঞানমান হইলে, তাহা সেখানে বায়ু ও মেঘের সংযোগবিশেষের জ্ঞানে অভাব নামক প্রমাণ হয়। জ্ঞানমান বৃষ্টির অভাব বা বৃষ্টির অভাব-জ্ঞানই ঐ স্থলে অভাব প্রমাণ বৃত্তিতে হইবে। বায়ু ও মেঘের সংযোগ ও বৃষ্টি পরস্পর বিরুদ্ধ পদার্থ, সুতরাং অবিদ্যমান বৃত্তিকে বিরোধী পদার্থ বলা হইয়াছে। বৈশেষিক সূত্রকার মহর্ষি কণাদ ঐরূপ পদার্থকে অনুমানে “বিরোধী” নামে এক প্রকার হেতু বলিয়াছেন। ভাষ্যকার কণাদ-সূত্রের অনুরূপ ভাষার দ্বারাই এখানে অভাব-প্রমাণের স্বরূপ বলিয়াছেন। অন্তান্ত কথা পরসূত্রে ব্যক্ত হইবে। ১।

**সূত্র।** শব্দ ঐতিহানর্থান্তরভাবানুমানার্থ-  
পত্তিসম্ভাবাভাবানর্থান্তরভাবাচ্চা প্রতিষেধঃ ॥২॥১৩১॥

অনুবাদ। (উত্তর) ঐতিহ্যের শব্দপ্রমাণে অন্তর্ভাববশতঃ এবং অর্থাপত্তি, সম্ভব ও অভাবের অনুমান-প্রমাণে অন্তর্ভাববশতঃ প্রতিষেধ নাই অর্থাৎ প্রমাণের চতুর্দৈর্য প্রতিষেধ (অভাব) নাই (প্রমাণের চতুর্দৈর্য আছে)।

ভাষ্য। সত্যমেতানি প্রমাণানি, ন তু প্রমাণান্তরাণি, প্রমাণান্তরঞ্চ মন্থমানেন প্রতিষেধ উচ্যতে, সৌহর্যমনুপপন্নঃ প্রতিষেধঃ। কথং? “আপ্তোপদেশঃ শব্দ” ইতি। ন চ শব্দলক্ষণমৈতিহ্যাদ্যাবর্ততে, সৌহর্য ভেদঃ সামান্যং সংগৃহ্যত ইতি। প্রত্যক্ষেনাপ্রত্যক্ষস্ত সম্বন্ধস্ত প্রতিপত্তিরনুমানং, তথা চার্ধাপত্তিসম্ভাবাভাবাঃ। ব্যাক্যর্থসংপ্রত্যয়ে-  
নানভিহিতস্তার্থস্ত প্রত্যনীকভাবাদ্গ্রহণমর্থাপত্তিরনুমানমেব। অবিনা-  
ভাববৃত্ত্য চ সম্বন্ধয়োঃ সমুদায়সমুদায়িনোঃ সমুদায়েনেতরস্ত গ্রহণং সম্ভবঃ, তদপ্যনুমানমেব। অগ্নিন্ সতীদং নোপপদ্যত ইতি বিরোধিত্তে  
প্রসিদ্ধে কার্য্যানুৎপত্ত্যা কারণস্ত প্রতিবন্ধকমনুমীয়তে। সৌহর্য  
যথার্থ এব প্রমাণোদ্দেশ ইতি।

অনুবাদ। এইগুলি অর্থাৎ পূর্বোক্ত ঐতিহ্য, অর্থাপত্তি, সম্ভব ও অভাব—প্রমাণ সত্য, কিন্তু প্রমাণান্তর নহে, প্রমাণান্তরই মনে করিয়া (পূর্বপক্ষবাদী) প্রতিষেধ (প্রমাণের চতুর্দৈর্য প্রতিষেধ) বলিতেছেন, সেই এই প্রতিষেধ উপপন্ন হয় না। (প্রশ্ন) কেন? (উত্তর) “আপ্তের উপদেশ শব্দপ্রমাণ”। শব্দপ্রমাণের (পূর্বোক্ত) লক্ষণ ঐতিহ্য হইতে নিবৃত্ত হয় না, সেই এই ভেদ (ঐতিহ্য) সামান্য



ইহাতে অর্থাৎ শব্দপ্রমাণের সামান্যলক্ষণ ইহাতে সংগৃহীত হইয়াছে। প্রত্যক্ষ পদার্থের দ্বারা অপ্রত্যক্ষ সম্বন্ধ (ব্যাপকত্বসম্বন্ধবিশিষ্ট) পদার্থের জ্ঞান অনুমান। অর্থাপত্তি, সম্ভব ও অভাব সেই প্রকারই, [অর্থাৎ অনুমানস্থলে বেরূপে জ্ঞান জন্মে, অর্থাপত্তি প্রভৃতি স্থলেও সেইরূপ প্রত্যক্ষ পদার্থের দ্বারা অপ্রত্যক্ষ পদার্থের জ্ঞান জন্মে, সুতরাং অর্থাপত্তি প্রভৃতি প্রমাণত্রয় অনুমান-লক্ষণাক্রান্ত হওয়ায়, উহা অনুমান] বাক্যার্থ জ্ঞানের দ্বারা বিরোধিত্ব প্রযুক্ত অনুল্ল পদার্থের জ্ঞানরূপ অর্থাপত্তি অনুমানই। এবং অবিনাভাব সম্বন্ধে সম্বন্ধ সমুদায় ও সমুদায়ীর মধ্যে সমুদায়ের দ্বারা অপরিটির অর্থাৎ সমুদায়ীর জ্ঞান সম্ভব, তাহাও অনুমানই। ইহা থাকিলে, ইহা উপপন্ন হয় না—এইরূপে বিরোধিত্ব প্রসিদ্ধ (জাত) থাকিলে কার্যের অনুৎপত্তির দ্বারা কারণের প্রতিবন্ধক অনুমিত হয়। সেই এই, অর্থাৎ বিচার্যমাণ প্রমাণোদ্দেশ (প্রথমাধ্যায়োক্ত প্রমাণ বিভাগ) যথার্থই হইয়াছে।

টিপ্পন। মহর্ষি এই স্থানের দ্বারা পূর্বস্থজ্ঞাত পূর্বপক্ষের উত্তর বলিয়াছেন যে, প্রমাণের চতুর্থেই প্রতিবেশ নাই, অর্থাৎ প্রমাণ যে চারিপ্রকার বলিগাছি, তাহার অতিরিক্ত কোন প্রমাণ নাই। কারণ, বাহ্যকে ঐতিহ্য প্রমাণ বলা হইয়াছে, তাহা শব্দপ্রমাণের অন্তর্গত। অর্থাপত্তি, সম্ভব ও অভাব অনুমান-প্রমাণের অন্তর্গত। ঐতিহ্য প্রভৃতি যে প্রমাণই নহে, তাহা বলি না, কিন্তু উহা প্রমাণান্তর নহে। ভাষ্যকার মহর্ষির সিদ্ধান্ত সমর্থন করিতে বলিয়াছেন যে, মহর্ষি প্রথম অধ্যায়ে শব্দপ্রমাণের যে সামান্য লক্ষণ বলিয়াছেন, তদ্বারা ঐতিহ্যও সংগৃহীত হইয়াছে, ঐ লক্ষণ ঐতিহ্য ইহাতে নিবৃত্ত নহে, উহা ঐতিহ্যেও আছে। আপ্তের উপদেশ শব্দপ্রমাণ। সুতরাং যে ঐতিহ্য আপ্তের বাক্য, অর্থাৎ বাহার বক্তা আপ্ত, ইহা নিশ্চয় করা গিয়াছে, তাহাই প্রমাণ হইবে<sup>১</sup>; যে ঐতিহ্যের বক্তার আপ্তত্ব নিশ্চয় হইবে না, তাহা প্রমাণই হইবে না। কলকথা, ঐতিহ্য-মাজই প্রমাণ নহে; যে ঐতিহ্য প্রমাণ, তাহা শব্দপ্রমাণই হইবে, তাহা অতিরিক্ত প্রমাণ নহে, ইহাই সূত্রকার ও ভাষ্যকার প্রভৃতির সিদ্ধান্ত বুঝা যায়। ভাষ্যকার শেষে সামান্ততঃ অর্থাপত্তি, সম্ভব ও অভাব যে অনুমানই, ইহা সমর্থন করিয়া, পরে আবার বিশেষ করিয়া উহাদিগের অনুমানত্ব বুঝাইয়াছেন। সামান্ততঃ বলিয়াছেন যে, প্রত্যক্ষ পদার্থের দ্বারা অপ্রত্যক্ষ পদার্থের জ্ঞান, অনুমান। অর্থাপত্তি, সম্ভব ও অভাব প্রমাণও ঐরূপ বলিয়া উহাও অনুমানই হইবে। বিশেষ করিয়া বলিয়াছেন যে, কোন বাক্যার্থ বোধ হইলে তদ্বারা বিরোধিত্ববশতঃ অনুল্ল পদার্থের যে বোধ, তাহা অর্থাপত্তি, ইহাও অনুমানই।

ভাষ্যকারের কথার দ্বারা বুঝা যায়, কেহ কোন বাক্য প্রয়োগ করিলে, তাহার অর্থ বুঝিয়া তদ্বারা যে অনুল্ল অর্থাপ্তের বোধ, তাহা অর্থাপত্তি, ইহা এক প্রকার স্রুতর্থাপত্তি। “নেব না

১। যৎ যৎ অনিদিষ্টপ্রযুক্তকং পারম্পর্যমৈতিহ্যং তত্ত্ব জ্ঞেয়ং কন্তা নাবধারণতঃ, ততস্তৎ প্রমাণমেব ন ভবতীতি।



হইলে বুটি হয় না"—এই বাক্য বলিলে, মেঘ হইলে বুটি হয়, এইরূপ বোধ জন্মে। মেঘ হইলে বুটি হয়, এই অর্থ পূর্বোক্ত ঐ বাক্যে উক্ত হয় নাই। কিন্তু ঐ অর্থ পূর্বোক্ত বাক্যার্থের বোধ হইলে বুঝা যায়। ঐ স্থলে "মেঘ না হইলে" এইরূপ জ্ঞান "মেঘ হইলে" এইরূপ জ্ঞানের বিরোধী; এবং "বুটি হয় না" এইরূপ জ্ঞান "বুটি হয়" এইরূপ জ্ঞানের বিরোধী। মেঘাভাব ও মেঘ, এবং বুটির অভাব ও বুটি পরস্পর বিরুদ্ধ পদার্থ। তাই বলিয়াছেন, "প্রত্যনৌক্যভাবঃ"। 'প্রত্যনৌক্য' শব্দের অর্থ বিরোধী। পূর্বোক্ত অর্থাপত্তি স্থলে "মেঘ না হইলে বুটি হয় না" এই বাক্যার্থ বুঝিলে, যেহেতু মেঘ না হইলে বুটি হয় না, অতএব মেঘ হইলে বুটি হয়, অর্থাৎ মেঘ বুটির কারণ, এইরূপে অনুমানের দ্বারা ঐ অল্পকৃত অর্থের বোধ জন্মে। বুটি হইলে ঐ বুটি দেখিয়া মেঘের জ্ঞানকে ভাষাকার অর্থাপত্তির উদাহরণরূপে উল্লেখ করেন নাই। কোন বাক্যার্থবোধের দ্বারা অল্পকৃত পদার্থের বোধবিশেষকেই তিনি অর্থাপত্তি বলিয়াছেন। অর্থাপত্তির প্রমাণাত্মকত্ববাদী নীমাংসক-সম্প্রদায় অর্থাপত্তি বহুপ্রকার বলিয়াছেন এবং বহু প্রকারে সমস্ত সমর্থন করিয়াছেন। সাংখ্যাত্ত্ব-কৌমুদীতে বাচস্পতি মিশ্র এবং জ্ঞানকুসুমাজলির তৃতীয় স্তবকে উদয়নাচার্য্য বহু বিচারপূর্বক নীমাংসক-মতের খণ্ডন করিয়াছেন। ভাষাকার প্রাচীননীমাংসক-প্রদর্শিত পূর্বোক্ত অর্থাপত্তির লক্ষণ ও উদাহরণ গ্রহণ করিয়াই অর্থাপত্তির অনুমানত্ব ব্যবস্থাপন করিয়াছেন। বিশেষ ভিজ্ঞাসু "সাংখ্যাত্ত্ব-কৌমুদী" ও "জ্ঞান-কুসুমাজলি" প্রভৃতি গ্রন্থ দেখিবেন। ভাষাকার "সম্ভব" প্রমাণের অনুমানত্ব সমর্থন করিতে বলিয়াছেন যে, অবিনাভাব সম্বন্ধে সম্বন্ধে যে সমুদায় ও সমুদায়ী, তাহার মধ্যে সমুদায়ের দ্বারা সমুদায়ীর জ্ঞান "সম্ভব"। এখানে ব্যাপ্তি-সম্বন্ধকেই "অবিনাভাববৃত্তি" বলা হইয়াছে। ব্যাপ্তি অর্থে প্রাচীনগণ "অবিনাভাব" শব্দেরও প্রয়োগ করিতেন। চারি আটকে এক দ্রোণ হয়, সুতরাং আটক ব্যতীত দ্রোণ হয় না, দ্রোণে আটকের অবিনাভাব সম্বন্ধ (ব্যাপ্তি) আছে। চারি আটক মিলিত হইলে দ্রোণ হয়, সুতরাং দ্রোণকে সমুদায় বলা যায়, আটককে সমুদায়ী বলা যায়। দ্রোণরূপ সমুদায়ের দ্বারা অর্থাৎ আটকের ব্যাপ্য দ্রোণের দ্বারা আটকরূপ সমুদায়ীর যে জ্ঞান জন্মে, তাহা ব্যাপ্যজ্ঞানপ্রযুক্ত ব্যাপকের জ্ঞান বলিয়া অনুমানই হইবে। দ্রোণ থাকিলেই সেখানে আটক থাকে, এইরূপে দ্রোণে আটকের ব্যাপ্তিবিষয়ক সংস্কার থাকার সর্বত্র ঐ সংস্কারমূলক ব্যাপ্তিস্বরূপবশতঃ দ্রোণজ্ঞানের দ্বারা আটকের অনুমানই হইয়া থাকে। ঐরূপ স্থলে সর্বত্র ঐরূপে অনুমান স্বীকার করিলে "সম্ভব" নামে অতিরিক্ত প্রমাণস্বীকার অনাবশ্যক। বস্তুতঃ অর্থাপত্তি ও সম্ভব প্রমাণের উদাহরণস্থলে সর্বত্রই প্রমাণ পদার্থটি অপর পদার্থের ব্যাপক হইবেই। ব্যাপ্যব্যাপকভাবশূন্য পদার্থস্থলে অর্থাপত্তি ও সম্ভব-প্রমাণের উদাহরণ হইতেই পারে না। সুতরাং অর্থাপত্তি ও সম্ভবকে অনুমানবিশেষ বলাই সম্ভব, সর্বত্র ব্যাপ্তি স্বরূপপূর্বকই পূর্বোক্তরূপ অর্থাপত্তি ও সম্ভব নামক জ্ঞান জন্মে, ইহাই স্বীকার্য্য। নীমাংসক ভট্ট-সম্প্রদায় ও বৈদান্তিক-সম্প্রদায় অভাবের জ্ঞানে "অনুপলব্ধি" নামক যে বস্তু প্রমাণ স্বীকার করিয়াছেন, নানা গ্রন্থে তাহাও "অভাব" প্রমাণ নামে কথিত হইয়াছে। ঘট্যভাব প্রকৃতি অভাব পদার্থের প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারা বোধ হয়, তাহাতে

প্রতিযোগীর অল্পপল্লি বিশেষ কারণ হইলেও কারণ নহে, সুতরাং অল্পপল্লি প্রমাণ নহে। অতীত অনেক অভাব পদার্থের অহুমানাদি প্রমাণের দ্বারা বোধ হয়। সুতরাং অভাব জ্ঞানের জন্য “অল্পপল্লি” নামক প্রমাণ স্বীকার অনাবশ্যক। এইরূপে স্মারচাচাঃগণ বহু বিচারপূর্বক “অল্পপল্লি”র প্রমাণান্তরক বওন করিয়াছেন। কিন্তু মহর্ষি গোতম যে ঐ অল্পপল্লিকেই অভাব প্রমাণ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা বুঝা যায় না। মহর্ষি অভাব প্রমাণকে অহুমানের অন্তর্গত বলিয়াছেন। ইহা থাকিলে তাহা উপপন্ন হয় না, এইরূপে বিরোধিতা জ্ঞান থাকিলে কার্যাহুৎপত্তির দ্বারা কারণের প্রতিবন্ধক অহুমিত হয়, এই কথা দ্বারা এখানে ভাষ্যকার শেষে অভাব প্রমাণ যে অহুমানের অন্তর্গত, তাহা বুঝাইয়াছেন। ভাষ্যকারের পূর্বোক্ত উদাহরণে, বায়ুর সহিত মেঘের সংযোগবিশেষ থাকিলে বৃষ্টি উপপন্ন হয় না, এইরূপে বায়ু ও মেঘের সংযোগবিশেষে বৃষ্টির বিরোধিতা জ্ঞান আছে। বায়ুর সহিত মেঘের সংযোগবিশেষ হইলে বৃষ্টিরূপ কার্য হয় না। ঐ বৃষ্টিরূপ কার্যের অহুৎপত্তির দ্বারা মেঘ হইতে জল পতনের কারণবিশেষ যে ঐ জলের গুরুত্ব, তাহার প্রতিবন্ধকের অহুমান হয়। বায়ু ও মেঘের সংযোগবিশেষই সেই প্রতিবন্ধক, তাহাই অহুমের। বৃষ্টির অভাবজ্ঞানই ঐ স্থলে অহুমান প্রমাণ<sup>১</sup>। মূলকথা, কার্যের অভাবের জ্ঞানের দ্বারা কারণের অভাব অথবা কারণসত্তা তাহার প্রতিবন্ধক নিশ্চয় করা যায়। ঐ নিশ্চয় অভাব নামক প্রমাণান্তরের দ্বারাই জনে, ইহা বলিয়া কোন সপ্তমীর অভাব নামক অতিরিক্ত প্রমাণ স্বীকার করিতেন। অভাব পদার্থ অহুমানের হেতু হইতে পারে না, ভাবপদার্থস্থিত ব্যাপ্তিই অহুমানের অঙ্গ, ইহাই তাহাদিগের কথা। বৃত্তিকার বিশ্বনাথও শেষে এইরূপেই অভাব প্রমাণের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ভাবপদার্থের দ্বারা অভাব-পদার্থও অহুমানে হেতু হয়, অভাব পদার্থস্থিত ব্যাপ্তি অহুমানের অঙ্গ হয় না, ইহা নিযুক্তিক, এই অভিপ্রায়ে মহর্ষি গোতম পূর্বোক্ত অভাব প্রমাণকে অহুমানের অন্তর্গত বলিয়াছেন। তর্কিকরক্ষাকার বরদরাজ মহর্ষি গোতমের স্বত্রের উদ্ধার করিয়া “অভাব” প্রমাণকে অহুমানের অন্তর্গত বলিয়া, পরে প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের অন্তর্গতও বলিয়াছেন<sup>২</sup>; কিন্তু মহর্ষি গোতমের এই স্বত্রে পাঠভেদ থাকিলেও স্মারচাচাঃগণ প্রভৃতির সম্মত স্বত্রেপাঠে অভাব প্রমাণ অহুমানান্তর্গত বলিয়াই মহর্ষিসম্মত বুঝা যায়। স্বত্রে “শব্দে” এইরূপ সপ্তমী বিভক্তান্ত পদ প্রযুক্ত হইয়াছে। অর্থান্তরভাব বলিতে ভিন্নপদার্থতা; “অনর্থান্তরভাব” বলিতে ভিন্নপদার্থতা বুঝা যায়। সুতরাং উহার দ্বারা কলিতার্থরূপে এখানে অন্তর্ভাব অর্থ বুঝা যাইতে পারে। বৃত্তিকার প্রভৃতিও এইরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ভাষ্যকার ঐতিহ্যের শব্দপ্রমাণান্তর্গতত্ব ও অর্থাপত্তি, সম্ভব ও অভাবের অহুমানান্তর্গতত্ব সমর্থন করিয়া উপসংহারে পূর্বপক্ষের

১। বর্ধভাবপ্রত্যয়ক বাব্, অসংযোগে অহুমানমূলক।—ভাবপদার্থীক।

২। ভরদ্বাজ স্বত্রচাঃগণের “ন চতুর্ভু,”.....মিতি পরিচোবনাপূর্বকঃ শব্দ ইতিহাসবর্ণিতরভাববহুমানের অর্থাপত্তি-সম্ভাব্যভাববর্ণিতরভাববহুমান প্রত্যক্ষাবর্ণিতরভাববহুমানাদি সমর্থিত।—তর্কিকরক্ষা, ২৭ পৃষ্ঠাঃ



নিরাস করিতে বলিয়াছেন যে, প্রমাণের বিভাগরূপ উদ্দেশ্য বথার্থই হইয়াছে : অর্থাৎ প্রথমাবধায়ে প্রমাণকে যে চারি প্রকার বলা হইয়াছে, তাহা ঠিকই বলা হইয়াছে। কারণ, প্রমাণ অষ্ট প্রকার নহে। ঐতিহ্য প্রভৃতি চতুর্বিধ প্রমাণ—অতিরিক্ত কোন প্রমাণ নহে।

পৌরাণিকগণ ঐতিহ্য ও সম্ভবকে অতিরিক্ত প্রমাণরূপে স্বীকার করিতেন। অর্থাপত্তি ও অভাবকেও তাহারা অতিরিক্ত প্রমাণরূপে স্বীকার করিতেন। তাহারা অষ্টপ্রমাণবাদী, ইহা তাত্ত্বিকরূপকারের কথায় পাওয়া যায়<sup>১</sup>। ‘অর্থাপত্তি’ ও ‘অভাব’ প্রমাণের স্বরূপবিষয়ে পরবর্তী কালে মতভেদ হইলেও উহাও প্রাচীন কালে সম্প্রদায়বিশেষের সম্মত ছিল, ইহা বুঝা যায়। মহর্ষি গোতম পৌরাণিক-সম্মত চতুর্বিধ অতিরিক্ত প্রমাণকেই গ্রহণ করিয়া, এখানে শব্দপ্রমাণে ও অনুমানে তাহার অন্তর্ভাব বলিতে পারেন। § ২।

ভাষ্য। সত্যমেতানি প্রমাণানি, ন তু প্রমাণান্তরানীতুক্তং, অত্রার্থা-  
পত্তেঃ প্রমাণভাবাভানুজ্ঞা নোপপদ্যতে, তথাহীরং—

**সূত্র। অর্থাপত্তিরপ্রমাণমনৈকান্তিকত্বাৎ ॥ ৩। ১৩২ ॥**

অনুবাদ। (পূর্বপক্ষ) এইগুলি (ঐতিহ্য প্রভৃতি) প্রমাণ, কিন্তু প্রমাণান্তর নহে, ইহা বলা হইয়াছে, এখানে অর্থাপত্তির প্রমাণই স্বীকার উপপন্ন হয় না, তাহা সমর্থন করিতেছেন, এই অর্থাপত্তি অনৈকান্তিকত্ব অর্থাৎ ব্যাভিচারিত্বপ্রযুক্ত অপ্রমাণ।

ভাষ্য। অসংস্র মেঘেবু বৃষ্টির্ন ভবতীতি সংস্র ভবতীত্যেতদর্থা-  
দাপদ্যতে, সংস্রপি চৈকদা ন ভবতি, সেয়মর্থাপত্তিরপ্রমাণমিতি।

অনুবাদ। মেঘ না হইলে বৃষ্টি হয় না, এই বাক্যের দ্বারা মেঘ হইলে বৃষ্টি হয়, ইহা অর্থতঃ প্রাপ্ত হয়। কিন্তু মেঘ হইলেও কোন সময়ে বৃষ্টি হয় না, সেই এই অর্থাপত্তি অপ্রমাণ।

টিপ্পনী। মহর্ষি অর্থাপত্তির প্রামাণ্য স্বীকার করিয়া, তাহাকে অনুমানের অন্তর্গত বলিয়া পূর্ব-  
সূত্রে সিদ্ধান্ত বলিয়াছেন। কিন্তু যদি অর্থাপত্তির প্রামাণ্যই না থাকে, তাহা হইলে মহর্ষির ঐ সিদ্ধান্ত অসঙ্গত হয়; এ জন্য মহর্ষি অর্থাপত্তির প্রামাণ্য সমর্থন করিতে প্রথমে পূর্বপক্ষ বলিয়াছেন যে, অর্থাপত্তি অপ্রমাণ। হেতু বলিয়াছেন, অনৈকান্তিকত্ব। অনৈকান্তিক শব্দের অর্থ ব্যাভিচারী। বাহ্য ব্যাভিচারী, তাহা প্রমাণ নহে, ইহা সর্বসম্মত। অর্থাপত্তি যখন ব্যাভিচারী, তখন উহা

১। অর্থাপত্তা সইহন্তানি চত্বার্বিধ প্রভাকরঃ।

অভাববর্ত্তানোতানি ত্যাগী বেদান্তিনস্তথা।

সম্ভবৈতিকত্বানি তানি পৌরাণিকা যজ্ঞঃ—তাত্ত্বিকরূপ, ৩৩ পৃষ্ঠা।

প্রমাণ হইতে পারে না, উহা অপ্রমাণ। অর্থাপত্তি ব্যভিচারী কেন? ইহা বুঝাইতে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, “মেঘ না হইলে বৃষ্টি হয় না”—এই বাক্য বলিলে মেঘ হইলে বৃষ্টি হয়, ইহা অর্থন্তঃ পাওয়া যায়, অর্থাৎ ঐরূপ বোধকে অর্থাপত্তি প্রমাণজন্য বোধ বলা হইয়াছে। কিন্তু মেঘ হইলেও যখন কোন কোন সময়ে বৃষ্টি হয় না, তখন মেঘ হইলেই বৃষ্টি হয়, ঐরূপ নিয়ম বলা যায় না। মেঘ হইলেও কোন কোন সময়ে বৃষ্টি না হওয়ায় পূর্বোক্ত অর্থাপত্তিবিষয়ে ব্যভিচারবশতঃ অর্থাপত্তি ব্যভিচারী, সুতরাং উহা প্রমাণ হইতে পারে না, উহা অপ্রমাণ। ভাষ্যকার প্রথমে অর্থাপত্তির প্রমাণ স্বীকার উপপন্ন হয় না, এই কথার দ্বারা পূর্বপক্ষবাদের অভিপ্রায় বর্ণনপূর্বক “তথাহীয়ং” এই কথার দ্বারা মহর্ষির এই পূর্বপক্ষ-সূত্রের অবতারণা করিয়াছেন। প্রতিপাদ্য বিষয়ের সমর্থন করিতে হইলে প্রাচীনগণ প্রথমে “তথাহি” এই শব্দ প্রয়োগ করিতেন। “তথাহি” অর্থাৎ তাহা সমর্থন করিতেছি, ঐরূপ অর্থই উহার দ্বারা বিবক্ষিত বুঝা যায়। ভাষ্যকারের “হীয়ং” এই বাক্যের সহিত সূত্রের প্রথমোক্ত “অর্থাপত্তিঃ”, এই বাক্যের যোগ করিয়া ব্যাখ্যা করিতে হইবে। এই অর্থাপত্তি অপ্রমাণ, অর্থাৎ যে অর্থাপত্তি পূর্বে উদাহৃত এবং তাহা অনুমানের অন্তর্গত বলিয়া সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে, তাহা অপ্রমাণ, ইহাই ভাষ্যকারের বিবক্ষিত ৩ ॥

ভাষ্য। নানৈকান্তিকত্বমর্থাপত্তেঃ—

সূত্র। অনর্থাপত্তাবর্থাপত্ত্যভিমানাৎ ॥৪॥১৩৩ ॥

অনুবাদ। (উত্তর) অর্থাপত্তির অনৈকান্তিকত্ব নাই; যেহেতু অনর্থাপত্তিতে অর্থাৎ বাহ্য অর্থাপত্তিই নহে, তাহাতে অর্থাপত্তি ভ্রম হইয়াছে।

ভাষ্য। অসতি কারণে কার্য্যং নোৎপদ্যত ইতি বাক্যাৎ প্রত্যনৌক-  
ভূতোহর্থঃ সতি কারণে কার্য্যমুৎপদ্যত ইত্যর্থাদাপদ্যতে। অতাবস্ত  
হি ভাবঃ প্রত্যনৌক ইতি। সোহয়ং কার্য্যোৎপাদঃ সতি কারণেহর্থাদা-  
পদ্যমানো ন কারণস্ত সত্তাং ব্যভিচরতি। ন খল্বসতি কারণে কার্য্যমুৎ-  
পদ্যতে, তস্মান্নানৈকান্তিকী। যত্ত্ব সতি কারণে নিমিত্তপ্রতিবন্ধাৎ  
কার্য্যং নোৎপদ্যত ইতি, কারণধর্ম্মোহসৌ, ন স্বর্থাপত্তেঃ প্রমেয়ং।  
কিং তর্হ্যস্তাঃ প্রমেয়ং? সতি কারণে কার্য্যমুৎপদ্যত ইতি, বোহসৌ  
কার্য্যোৎপাদঃ কারণসত্তাং ন ব্যভিচরতি তদস্তাঃ প্রমেয়ং। এবস্ত  
সত্যনর্থাপত্তাবর্থাপত্ত্যভিমানং কৃত্বা প্রতিবেদ উচ্যত ইতি। দৃষ্টশ্চ  
কারণধর্ম্মো ন শক্যঃ প্রত্যাখ্যাতুমিতি।



অনুবাদ। কারণ না থাকিলে কার্য উৎপন্ন হয় না, এই বাক্য হইতে কারণ থাকিলে কার্য উৎপন্ন হয়, এই বিরোধীভূত পদার্থ অর্থতঃ প্রাপ্ত হয়। যেহেতু ভাব পদার্থ অভাবের বিরোধী। কারণ থাকিলে সেই এই কার্যোৎপত্তি অর্থতঃ প্রাপ্ত (জ্ঞানবিষয়) হইয়া কারণের সত্তাকে ব্যভিচার করে না, অর্থাৎ কারণের সত্তা নাই, কিন্তু কার্যের উৎপত্তি হইয়াছে, ইহা কখনও হয় না। যেহেতু, কারণ না থাকিলে কার্য উৎপন্ন হয় না, অতএব (অর্থপত্তি) অনৈকান্তিক নহে। কিন্তু কারণ থাকিলে নিমিত্তের (কারণবিশেষের) প্রতিবন্ধবশতঃ কার্য যে উৎপন্ন হয় না, ইহা কারণের ধর্ম, কিন্তু অর্থপত্তির প্রমেয় নহে। (প্রশ্ন) তবে অর্থপত্তির প্রমেয় কি? (উত্তর) কারণ থাকিলে কার্য উৎপন্ন হয়। এই যে কার্যের উৎপত্তি কারণের সত্তাকে ব্যভিচার করে না, তাহা ইহার (অর্থপত্তির) প্রমেয়। এইরূপ হইলে কিন্তু অনর্থপত্তিতে অর্থাৎ যাহা অর্থপত্তিই নহে, তাহাতে অর্থপত্তি ভ্রম করিয়া প্রতিষেধ (অর্থপত্তি অপ্রমাণ এই প্রতিষেধ) কথিত হইয়াছে। দৃষ্ট কারণ-ধর্মও প্রত্যাখ্যান করিতে পারা যায় না।

উত্তর। মহর্ষি এই হৃদয়ের দ্বারা পূর্বহৃত্তোক্ত পূর্বপক্ষের উত্তর হুতনা করিয়াছেন। ভাষ্যকার প্রথমে “নানৈকান্তিকত্বমর্থপত্তেঃ”—এই কথা দ্বারা মহর্ষির সাধ্য নির্দেশ করিয়া হৃদয়ের অবতারণা করিয়াছেন। ভাষ্যকারের ঐ বাক্যের সহিত হৃদয়ের যোগ করিয়া হৃত্তোক্ত বৃত্তিতে হইবে। অর্থপত্তি অনৈকান্তিক নহে, এই সাধ্যসাধনে অর্থপত্তিই হেতু বলা যাইতে পারে। পূর্বপক্ষবাদী যাহাকে অর্থপত্তি বলিয়া গ্রহণ করিয়া অনৈকান্তিক বলিয়াছেন, তাহা অর্থপত্তিই নহে, সুতরাং অর্থপত্তি অনৈকান্তিক হয় নাই। যাহা অর্থপত্তিই নহে, তাহাকে অর্থপত্তি বলিয়া ভ্রম করিয়া তাহাতে অনৈকান্তিকত্ব হেতুর দ্বারা অপ্রামাণ্য সাধন করা হইয়াছে, কিন্তু যাহা প্রকৃত অর্থপত্তি, তাহাতে অনৈকান্তিকত্ব হেতু অসিদ্ধ বলিয়া উহা তাহার অপ্রামাণ্য সাধন করিতে পারে না, মহর্ষি এই হৃদয়ের দ্বারা ইহাও প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাতে প্রকৃত অর্থপত্তি কি? অর্থপত্তির প্রমেয় কি, ইহা বুঝা আবশ্যক। তাই ভাষ্যকার তাহা বুঝাইয়া মহর্ষির সিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়াছেন। ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, “কারণ না থাকিলে কার্য উৎপন্ন হয় না”—এই বাক্য হইতে কারণ থাকিলে কার্য উৎপন্ন হয়, ইহা অর্থতঃ বুঝা যায়। ভাবপদার্থ অভাবের বিরোধী। সুতরাং কারণের সত্তা কারণের অসত্তার বিরোধী, এবং কার্যের উৎপত্তি কার্যের অন্তঃপত্তির বিরোধী। তাহা হইলে কারণ থাকিলে কার্য উৎপন্ন হয়, এই অর্থ, কারণ না থাকিলে কার্য উৎপন্ন হয় না, এই অর্থের প্রত্যানীকত্ব, অর্থাৎ বিরোধীভূত। ঐ বিরোধীভূত অর্থই পূর্বোক্ত হলে অর্থতঃ বুঝা যায়। কিন্তু কারণ থাকিলে সর্বত্রই কার্যোৎপত্তি হয়, ইহা ঐ হলে পূর্ব-বাক্যার্থবোধের দ্বারা অর্থতঃ বুঝা যায় না, তাহা বুঝিলে ভ্রম বুঝা হয়। কার্যের উৎপত্তি কারণের সত্তাকে ব্যভিচার করে না, অর্থাৎ কার্যের উৎপত্তি হইয়াছে, কিন্তু সেখানে কারণ নাই,

ইহা কোথায়ও দেখা যায় না। এই অর্থই পূর্বোক্ত স্থলে অর্থাপত্তির বিষয় বা প্রমের। অর্থাৎ মেঘ না হইলে বৃষ্টি হয় না - এই কথা বলিলে মেঘ হইলে সর্বত্রই বৃষ্টি হয়, ইহা অর্থাপত্তির দ্বারা বুঝা যায় না। মেঘ বৃষ্টির কারণ, বৃষ্টি কার্যের উৎপত্তি মেঘরূপ কারণের সত্তার ব্যভিচারী নহে, অর্থাৎ বৃষ্টি হইয়াছে কিন্তু মেঘ হয় নাই, বিনা মেঘেই বৃষ্টি হইয়াছে, ইহা কখনও হয় না, এই অর্থই অর্থাপত্তির প্রমের। ঐ প্রমের বোধের করণই ঐ স্থলে প্রকৃত অর্থাপত্তি, উহাতে কোন ব্যভিচার না থাকায় অর্থাপত্তি ব্যভিচারী হয় নাই। বাহ্য অর্থাপত্তি নহে, তাহাকে অর্থাপত্তি বলিয়া ভ্রম করিয়া পূর্বপক্ষবাদী অর্থাপত্তির প্রমাণ্যপ্রতিবেদ বলিয়াছেন। কিন্তু মেঘ হইলেই সর্বত্র বৃষ্টি হয়, ইহা অর্থাপত্তির প্রমের নহে, ঐ অর্থবোধের করণ অর্থাপত্তিই নহে, উহাতে ব্যভিচার থাকিলে অর্থাপত্তি ব্যভিচারী হয় না। আপত্তি হইতে পারে যে, মেঘ বৃষ্টির কারণ হইলে সর্বত্র মেঘ নহে বৃষ্টি কেন হয় না, কারণ না থাকিলে যেমন কার্য হইবে না, তদ্রূপ কারণ থাকিলে সর্বত্র তাহার কার্য অবশ্যই হইবে, নচেৎ তাহাকে কারণই বলা যায় না। এই জ্ঞাত ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, কারণ থাকিলেও কোন প্রতিবন্ধকের দ্বারা কারণান্তর প্রতিবন্ধ হইলে কার্য জন্মে না, ইহা কারণসম্বন্ধ দেখা যায়। ঐ দৃষ্ট কারণসম্বন্ধকে অপলাপ করিয়া দৃষ্টের অপলাপ করা যায় না। প্রকৃত স্থলে মেঘরূপ কারণ থাকিলেও কোন সময়ে ঐ মেঘ হইতে জলপতনরূপ বৃষ্টি কার্যের কারণান্তর যে ঐ জলগত গুরুত্ব, তাহা বায়ু ও মেঘের সংযোগ-বিশেষের দ্বারা প্রতিবন্ধ হওয়ার জলপতন হইতে পারে না। কিন্তু এই যে কারণ থাকিলেও কারণান্তর প্রতিবন্ধ বশতঃ কার্যের অনুৎপত্তি, ইহাও অর্থাপত্তির প্রমের নহে। কার্যের উৎপত্তি কারণের সত্তাকে ব্যভিচার করে না ইহাই অর্থাপত্তির প্রমের।

উদ্যোতকর সূত্রকারোক্ত পূর্বপক্ষের নিরাস করিতে প্রথমে নিজে বলিয়াছেন যে, পূর্বপক্ষবাদী অর্থাপত্তি মাত্রকেই ধর্মিক্রমে গ্রহণ করিয়া অনৈকান্তিকত্ব হেতুর দ্বারা তাহাতে অপ্রমাণ্য সাধন করিতে পারেন না। কারণ অর্থাপত্তিমাত্রই অনৈকান্তিক বলা যায় না। বহু বহু অর্থাপত্তি আছে, বাহ্য পূর্বপক্ষবাদীও অনৈকান্তিক বলিতে পারিবেন না। পূর্বপক্ষবাদী যদি বলেন যে, অনৈকান্তিক অর্থাপত্তিবিশেষকে ধর্মিক্রমে গ্রহণ করিয়া তাহাতেই অপ্রমাণ্য সাধন করিব, কিন্তু তাহা হইলে অনৈকান্তিকত্বরূপ হেতু প্রতিজ্ঞাবাক্যে ধর্মীর বিশেষণ হওয়ার উহা হেতু হইতে পারে না। কারণ বাহ্য অনৈকান্তিক তাহা অপ্রমাণ ইহা পূর্বে সিদ্ধ থাকায় ঐরূপ প্রতিজ্ঞা হইতে পারে না। ঐরূপ প্রতিজ্ঞা নিরর্থকও হয়। পরন্তু অনৈকান্তিক অর্থাপত্তি অপ্রমাণ। এই কথা বলিলে ঐকান্তিক অর্থাপত্তি প্রমাণ, ইহা স্বীকৃত হয়। সুতরাং অর্থাপত্তি অপ্রমাণ - এই কথাই বলা যায় না। ৪।

**সূত্র। প্রতিবেদ্য প্রামাণ্যঞ্চানৈকান্তিকত্বাৎ ॥৫॥১৩৪॥**

অনুবাদ। অনৈকান্তিকত্ব প্রযুক্ত প্রতিবেদ্য বাক্যের অপ্রামাণ্যও হয় [ অর্থাৎ যদি যে কোন বিষয়ে অনৈকান্তিক হইলেই তাহা অপ্রমাণ হয়, তাহা হইলে পূর্ব-



পক্ষবাদীর পূর্বোক্ত প্রতিবেদবাক্যও যে কোন বিষয়ে অনৈকান্তিক হওয়ায় অপ্রমাণ হইবে, উহার দ্বারা অর্থাপত্তির অপ্রামাণ্যসিদ্ধি হইবে না ] ।

ভাষ্য । অর্থাপত্তিৰ্ণ প্রমাণমনৈকান্তিকত্বাদিতি বাক্যং প্রতিবেদঃ । তেনানেনাৰ্থাপত্তেঃ প্রমাণত্বং প্রতিবিধ্যতে, ন সদ্ভাবঃ, এবমনৈকান্তিকো ভবতি । অনৈকান্তিকত্বাপ্রমাণেনানেন ন কশ্চিদর্থঃ প্রতিবিধ্যাত ইতি ।

অমুবাদ । অনৈকান্তিকত্ব প্রযুক্ত অর্থাপত্তি প্রমাণ নহে, এইবাক্য প্রতিবেদ, অর্থাৎ ইহাই পূর্বপক্ষবাদীর অর্থাপত্তির প্রামাণ্যপ্রতিবেদবাক্য । সেই এই প্রতিবেদ-বাক্যের দ্বারা অর্থাপত্তির প্রামাণ্য প্রতিষিদ্ধ হইতেছে, সদ্ভাব ( অর্থাপত্তির অস্তিত্ব ) প্রতিষিদ্ধ হইতেছে না, এইরূপ হইলে ( ঐ প্রতিবেদ ) অনৈকান্তিক হয় । অনৈকান্তিকত্ব প্রযুক্ত অপ্রমাণ এই প্রতিবেদবাক্যের দ্বারা কোন পদার্থ প্রতিষিদ্ধ হয় না ।

টিপ্পনী । অর্থাপত্তি অনৈকান্তিক নহে, কারণ অর্থাপত্তির যাহা প্রেমের ভবিষ্যে কুত্রাপি ব্যক্তিচার নাই, এই কথা বলিয়া পূর্বোক্ত পূর্বপক্ষের নিরাস করা হইয়াছে । এখন এই সূত্রের দ্বারা মহর্ষি বলিতেছেন যে, যদি সামান্ততঃ যে কোন বিষয়ে অনৈকান্তিকত্বপ্রযুক্ত অর্থাপত্তিকে অপ্রমাণ বল তাহা হইলে “অনৈকান্তিকত্বপ্রযুক্ত অর্থাপত্তি অপ্রমাণ” এই প্রতিবেদ বাক্যও অপ্রমাণ হইবে, উহার দ্বারাও কোন পদার্থের প্রতিবেদ করা যাইবে না । পূর্বোক্ত প্রতিবেদ-বাক্য কিরূপে অনৈকান্তিক হয় ? ইহা বুঝাইতে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, ঐ প্রতিবেদ-বাক্যের দ্বারা অর্থাপত্তির প্রামাণ্যই প্রতিবেদ করা হইয়াছে, উহার দ্বারা অর্থাপত্তির অস্তিত্ব প্রতিবেদ করা হইতেছে না । ঐ প্রতিবেদবাক্যের দ্বারা অর্থাপত্তির অস্তিত্ব প্রতিবেদ করাই যায় না । কারণ যাহা অনৈকান্তিক তাহার অস্তিত্বই নাই, ইহা কিছুতেই বলা যায় না । তাহা হইলে ঐ প্রতিবেদবাক্য অর্থাপত্তির অস্তিত্বপ্রতিবেদক না হওয়ার উহাও ঐ অর্থাপত্তির অস্তিত্ব নিষেধের পক্ষে অনৈকান্তিক হইয়াছে । তাৎপর্য্যটীকাকার তাৎপর্য্য বর্ণন করিয়াছেন যে, যে বিষয়ে অর্থাপত্তি বস্তুতঃ অনৈকান্তিক নহে, ঐকান্তিক, তাহা হইতে ভিন্ন বিষয় অর্থাৎ যাহা অর্থাপত্তির বিষয়ই নহে, এমন বিষয় বলনা করিয়া পূর্বপক্ষবাদী যদি অর্থাপত্তিকে অনৈকান্তিক বলেন, তাহা হইলে তাঁহার প্রতিবেদ বিষয় যে অর্থাপত্তির প্রামাণ্য, তাহা হইতে বিষয়ান্তর যে, অর্থাপত্তির অস্তিত্ব, তাহাকে প্রতিবেদ বিষয় বলনা করিয়া প্রতিবেদ-বাক্যের অপ্রামাণ্য বলিতে পারি । ফলকথা যে কোন বিষয়ে অনৈকান্তিক হইলেই যদি তাহা অপ্রমাণ হয়, তাহা হইলে পূর্বপক্ষবাদীর প্রতিবেদবাক্যও অপ্রমাণ হইবে । কারণ পূর্বপক্ষবাদীর ঐ প্রতিবেদ-বাক্য অর্থাপত্তির প্রামাণ্য-নিষেধক হইলেও অস্তিত্বের নিষেধক নহে । তাহা হইলে অস্তিত্ব নিষেধের সম্বন্ধে ঐ বাক্য অনৈকান্তিক হওয়ার যে কোন বিষয়ে অনৈকান্তিক হইয়াছে ।

অনৈকান্তিকত্ব প্রযুক্ত অপ্রমাণ হওয়ায় ঐ প্রতিবেদ-বাক্যের দ্বারাও কিছু প্রতিবিত্ত হইতে পারে না ৷ ৫ ৷

ভাষ্য । অথ মন্যসে নিয়তবিষয়েষ্বৰ্থেবু স্ববিষয়ে ব্যভিচারো ভবতি, ন চ প্রতিষেধস্ত সদ্ভাবো বিষয়ঃ, এবং তর্হি—

অনুবাদ । যদি স্বীকার কর, পদার্থসমূহ নিয়ত-বিষয় হইলে, অর্থাৎ সকল পদার্থই সকল প্রমাণের বিষয় হয় না, প্রমাণের নিয়মবদ্ধ বিষয় আছে, সুতরাং নিজ বিষয়েই ব্যভিচার হয়, কিন্তু সদ্ভাব অর্থাৎ অর্থাপত্তির অস্তিত্ব, প্রতিষেধের বিষয় নহে—এইরূপ হইলে অর্থাৎ পূর্বোক্ত প্রতিষেধবাক্যের প্রামাণ্যরক্ষার্থ এই পক্ষান্তর স্বীকার করিলে—

সূত্র । তৎপ্রামাণ্যে বা নার্থাপত্ত্যপ্রামাণ্যং ॥৬॥১৩৫॥

অনুবাদ । পক্ষান্তরে তাহার ( পূর্বোক্ত প্রতিষেধ-বাক্যের ) প্রামাণ্য হইলে, অর্থাৎ নিজ বিষয়ে ব্যভিচার নাই বলিয়া পূর্বোক্ত প্রতিষেধ-বাক্যের প্রামাণ্য স্বীকার করিলে অর্থাপত্তির অপ্রামাণ্য হয় না ।

ভাষ্য । অর্থাপত্তেরপি কার্যোৎপাদেন কারণসত্তয়া অব্যভিচারো বিষয়ঃ, ন চ কারণধর্মো নিমিত্তপ্রতিবন্ধাৎ কার্য্যানুৎপাদকত্বমিতি ।

অনুবাদ । অর্থাপত্তির ও কার্যোৎপত্তি কর্তৃক কারণের সত্তার ব্যভিচারের অভাব বিষয়, অর্থাৎ কার্যের উৎপত্তি কারণের সত্তাকে ব্যভিচার করে না, ইহাই অর্থাপত্তির বিষয়, নিমিত্তের প্রতিবন্ধবশতঃ কার্যের অনুৎপাদকত্বরূপ কারণধর্ম ( অর্থাপত্তির বিষয় ) নহে ।

উপনী । মহর্ষি পূর্বস্থত্রে বাহা বলিয়াছেন, তাহাতে পূর্বপক্ষবাদী অবজ্ঞাই বলিবেন যে, যে কোন বিষয়ে অনৈকান্তিক হইলে তাহা অপ্রমাণ হয় না । প্রমাণের বিষয়গুলি নিয়ত, অর্থাৎ নিয়মবদ্ধ আছে । সকল পদার্থই সকল প্রমাণের বিষয় হয় না । যে বিষয়টি সাধন করিতে যাহাকে প্রমাণ বলিয়া উপস্থিত করা হইবে, তাহাই ঐ প্রমাণের স্ববিষয় বা নিজ বিষয় । ঐ স্ববিষয়ে ব্যভিচার হইলেই তাহার অপ্রামাণ্য হয় । যে কোন বিষয়ে ব্যভিচারবশতঃ প্রমাণের অপ্রামাণ্য হইতে পারে না । “অনৈকান্তিকত্বপ্রযুক্ত অর্থাপত্তি অপ্রমাণ” এই প্রতিষেধ-বাক্যের দ্বারা অর্থাপত্তির প্রামাণ্যেরই প্রতিষেধ করা হইয়াছে । অর্থাপত্তির অস্তিত্বের প্রতিষেধ করা হয় নাই, সুতরাং প্রামাণ্যই ঐ প্রতিষেধের বিষয়, অস্তিত্ব উহার বিষয় নহে । তাহা হইলে অর্থাপত্তির অস্তিত্ব বিষয়ে ঐ প্রতিষেধ-বাক্যের যে ব্যভিচার, তাহা উহার নিজ বিষয়ে ব্যভিচার



নহে। সুতরাং উহার দ্বারা ঐ প্রতিবেদ-বাক্যের অপ্রামাণ্য সাধন করা যায় না। ঐ প্রতিবেদ-বাক্য বিদ্যাসক্তের অনৈকান্তিক হইলেও নিজ বিষয়ে অনৈকান্তিক না হওয়ার উহা অপ্রমাণ হইতে পারে না। মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা এই পক্ষান্তরে বলিয়াছেন যে, যদি নিজ বিষয়ে ব্যভিচার না থাকায় ঐ প্রতিবেদ-বাক্যের প্রামাণ্য বল, তাহা হইলে অর্থাপত্তিরও নিজ বিষয়ে ব্যভিচার না থাকায় অপ্রামাণ্য হইতে পারে না। অর্থাৎ নিজ বিষয়ে ব্যভিচার না থাকিলে তাহা অপ্রমাণ হয় না, এই কথা বলিয়া পূর্বপক্ষবাদী তাঁহার প্রতিবেদ-বাক্যের অপ্রামাণ্য বণ্ডন করিতে গেলে অর্থাপত্তিরও প্রামাণ্য স্বীকার করিতে বাধ্য হইবেন। কারণ, অর্থাপত্তিরও নিজ বিষয়ে ব্যভিচার নাই। ভাষ্যকার এখানে অর্থাপত্তির নিজ বিষয় দেখাইতে বলিয়াছেন যে, কার্যের উৎপত্তি কারণের সত্যকে ব্যভিচার করে না—ইহাই অর্থাপত্তির বিষয়। নিমিত্তান্তরের প্রতিবন্ধ-বশতঃ কার্যের অনুৎপাদকত্ব কারণের দ্বারা, উহা অর্থাপত্তির বিষয় নহে। মূলকথা, মেঘ হইলে বৃষ্টি হইবেই, ইহা অর্থাপত্তির বিষয় নহে। বৃষ্টি হইলে মেঘ সেখানে থাকিবেই। বৃষ্টিরূপ কার্য হইয়াছে, কিন্তু মেঘ সেখানে হয় নাই, ইহা কখনই হয় না,—ইহাই অর্থাপত্তির বিষয় বা প্রমের। ঐ নিজ বিষয়ে অর্থাপত্তির ব্যভিচার না থাকায় অর্থাপত্তি অপ্রমাণ নহে, ইহা পূর্বপক্ষবাদীরও স্বীকার্য। তাহা হইলে “নৈকান্তিকত্বপ্রযুক্ত অর্থাপত্তি অপ্রমাণ” এই কথা আর বলা যাইবে না। সুতরাং অর্থাপত্তি প্রমাণ হওয়ার তাহা অনুমানের অন্তর্গত, এ কথাও সঙ্গত হইয়াছে। ৬।

ভাষ্য। অভাবস্ত তর্হি প্রমাণভাবানুজ্ঞা নোপপদ্যতে, কথমিতি ?

অনুবাদ। তাহা হইলে, অর্থাৎ অর্থাপত্তির প্রামাণ্য স্বীকার করিলেও “অভাবের” প্রামাণ্য স্বীকার উপপন্ন হয় না। (প্রশ্ন) কেন ? অর্থাৎ ইহার হেতু কি ?

সূত্র। নাভাবপ্রামাণ্যং প্রমেয়াসিদ্ধেঃ ॥৭॥১৩৬॥

অনুবাদ। (পূর্বপক্ষ) অভাবের অর্থাৎ অভাব-জ্ঞানের প্রামাণ্য নাই, যেহেতু প্রমেয়ের অর্থাৎ অভাব-জ্ঞানের বিষয় অভাবপদার্থের সিদ্ধি নাই।

ভাষ্য। অভাবস্ত ভূয়সি প্রমেয়ে লোকসিদ্ধে বৈবাত্যাছুচ্যতে, “নাভাবপ্রামাণ্যং প্রমেয়াসিদ্ধে”রিতি।

অনুবাদ। অভাবের অর্থাৎ অভাব-জ্ঞানের বহু বহু প্রমেয় (বিষয়) লোকসিদ্ধ থাকিলেও বৈবাত্য<sup>১</sup> অর্থাৎ ভ্রষ্টতা<sup>২</sup>বশতঃ (পূর্বপক্ষবাদী) বলিতেছেন, অভাবের (অভাব জ্ঞানের) প্রামাণ্য নাই, যেহেতু প্রমেয়ের সিদ্ধি নাই।

১। নাভাবজ্ঞানং প্রমাণং, কত্বে? প্রমেয়ন্ত অভাবজ্ঞানসিদ্ধেঃ। নো বস্তু সর্গোপাখ্যাঃ হিতঃ প্রমাণজ্ঞানবিষয়-ভাবমুভবতি। কেবলং কালমিকোদয়মভাবব্যবহারো মৌলিকানামিতি পূর্বপক্ষঃ।—তাত্ত্বপর্জীকা।

২। “বিবাত” শব্দের অর্থ ভ্রষ্ট, অর্থাৎ নির্লব্ধ। “গুপ্তে গুণস্য বিবাতস্ত”।—অমরকোষ, বিশেষান্নিরবর্ণ—২৫। বৈবাত্য শব্দের অর্থ ভ্রষ্টতা। বৈবাত্যঃ সুরভিবঃ।—মাৎ, ২। ৪৪।



উপনী। মহর্ষি অর্থাপত্তির প্রামাণ্য সমর্থন করিয়া, এখন অভাব নামক প্রমাণের প্রামাণ্য সমর্থন করিতে পূর্বপক্ষ বলিয়াছেন,—“নাভাবপ্রামাণ্য”।—অভাবপদার্থ অজ্ঞানমান হইলে তাহা কোন বিষয়ের প্রমাণ জন্মাইতে না পারায়, প্রমাণ হইতে পারে না, সুতরাং অভাব জ্ঞানকেই প্রমাণ বলিতে হইবে। উদ্যোতকর ও বাচস্পতি মিশ্র ইহাই বলিয়াছেন। কিন্তু যদি অভাব বলিয়া কোন পদার্থই না থাকে, তাহা হইলে অভাবজ্ঞান প্রমাণ, এ কথা বলা যায় না। অভাবজ্ঞান প্রমাণ না হইলে, “অভাব” নামক প্রমাণ অনুমানের অন্তর্গত—এ কথাও বলা যায় না। বস্তুতঃ অভাবপদার্থ অনেকে স্বীকার করেন নাই। অভাবের কোন স্বরূপ নাই, সুতরাং উহা প্রমাণের বিষয়ই হইতে পারে না। লোকে করুণা করিয়াই অভাব ব্যবহার করে; বস্তুতঃ কাল্পনিক ব্যবহারের বিষয় অভাবপদার্থের সত্যই নাই। এই সকল কথা বলিয়া তাহার অভাবপদার্থ মানেন নাই, তাহাদিগের মতে অভাব-জ্ঞান প্রমাণ হওয়া অসম্ভব, সুতরাং মহর্ষি গোতম যে উহাকে অনুমানের অন্তর্গত বলিয়াছেন, তাহাও অসম্ভব। তাই মহর্ষি এখানে পূর্বপক্ষের অবতারণা করিয়া অভাবপদার্থের অস্তিত্ব সমর্থন দ্বারা তাহার নিজের উক্তির সমর্থন করিয়াছেন। অভাবপদার্থ যে মহর্ষি গোতমের স্বীকৃত প্রামাণ্যসিদ্ধ, ইহা সমর্থনপূর্বক প্রকাশ করাও এই প্রসঙ্গে মহর্ষির উদ্দেশ্য। তাৎপর্য্যটীকাকার পূর্বপক্ষের ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, অভাবজ্ঞান প্রমাণ নহে, যেহেতু প্রেমের অর্থাৎ অভাবপদার্থ অসিদ্ধ। উদ্যোতকর ও বাচস্পতি মিশ্র এখানে অভাব-জ্ঞানকেই “অভাব” প্রমাণ বলিয়া ব্যাখ্যা করার তাহার যে নীমাংসক-সম্বত অনুপলব্ধি প্রমাণকেই এখানে অভাব প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করেন নাই, ইহা স্পষ্ট বুঝা যায়। মহর্ষি গোতমও অভাব প্রমাণকে অনুমানের অন্তর্গত বলায় অনুপলব্ধিকেই যে তিনি “অভাব” শব্দের দ্বারা গ্রহণ করেন নাই, ইহা বুঝা যায়। ভাষ্যকারও পূর্বে অভাব প্রমাণের ব্যাখ্যায় বায়ু ও মেঘের সংযোগবিশেষরূপ ভাবপদার্থকেও অভাব প্রমাণের প্রমেররূপে উল্লেখ করিয়াছেন। এখন চিন্তনীয় এই যে, যদি ভাবপদার্থও “অভাব” প্রমাণের প্রমের হয়, তাহা হইলে অভাবপদার্থ না মানিলেও “অভাব” প্রমাণের প্রমের অসিদ্ধ হইতে পারে না। ভাষ্যকার যে বায়ু ও মেঘের সংযোগবিশেষরূপ ভাবপদার্থকে অভাব প্রমাণের প্রমের বলিয়া উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন, সে পদার্থ সর্বসম্বত, সুতরাং প্রমের অসিদ্ধ বলিয়া অভাব প্রমাণ হইতে পারে না, এই পূর্বপক্ষ কিরূপে সঙ্গত হয়? এতদ্বত্তরে বক্তব্য এই যে, অভাবজ্ঞানই “অভাব” নামক প্রমাণ, ইহা পূর্বে বলা হইয়াছে। ঐ অভাবজ্ঞান প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের দ্বারা জন্মে। অভাবজ্ঞানরূপ যে প্রমা-জ্ঞান, তাহার বিষয় অভাব, সুতরাং অভাব ঐ প্রমা-জ্ঞানের বিষয় বলিয়া তাহাকে প্রমের বলা যায়। কলকথা, অভাবজ্ঞানের বিষয় যে অভাবরূপ প্রমের,—তাহা অসিদ্ধ বলিয়া অভাবজ্ঞান জন্মিতেই পারে না। সুতরাং তাহা প্রমাণ হওয়া অসম্ভব, ইহাই পূর্বপক্ষ। অভাবজ্ঞানের বিষয়রূপ প্রমের অর্থাৎ অভাবপদার্থ অসিদ্ধ, এই তাৎপর্য্যই সূত্রে “প্রমেরাসিদ্ধেঃ” এই কথা বলা হইয়াছে। “প্রমের” শব্দের দ্বারা স্বত্বকার মহর্ষি এখানে অভাবজ্ঞানরূপ প্রমাণজ্ঞানের বিষয় অভাব পদার্থকেই গ্রহণ করিয়াছেন। ভাষ্যকার মহর্ষির সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিতে এখানে বলিয়াছেন যে, অভাব প্রমাণের বহু বহু প্রমের লোক-



সিদ্ধ, অর্থাৎ অভাবজ্ঞানের বিষয় বহু বহু অভাব লোকসিদ্ধ আছে। সার্বজনীন অভাব ব্যবহার কার্যনিক হইতে পারে না। বাহ্যকে নিঃস্বরূপ বা অলীক বলিবে, এমন বিষয়ে কল্পনারূপ ভ্রম জ্ঞানও জন্মিতে পারে না। সুতরাং লোকসিদ্ধ অভাব পদার্থ অবশ্যস্বীকার্য। তথাপি পূর্বপক্ষবাদী যুগ্মতাবশতঃ অভাব পদার্থকে অস্বীকার করিয়া “নাভাবপ্রমাণ্যং প্রমেয়সিদ্ধিঃ”— এই কথা বলিয়াছেন। অর্থাৎ এই পূর্বপক্ষ যুগ্মতামূলক। অভাব প্রমাণের প্রমেয়ই নাই, ইহা কেহই বলিতে পারেন না; কারণ, উহা বহু বহু লোকসিদ্ধ আছে। সর্বলোকসিদ্ধ অভাব পদার্থকে অস্বীকার করিয়া ঐক্যপূর্বপক্ষ বলা যুগ্মতামূলক। ভাষ্যকারের “অভাবস্ত ত্বয়সি প্রমেয়ে লোকসিদ্ধিঃ”—এই কথার তাৎপর্য ইহাও বুঝিতে পারি যে, অনেক ভাবপদার্থও যখন অভাবপ্রমাণের প্রমেয় আছে, তখন অভাবপদার্থ না মানিলেও অভাবপ্রমাণের প্রমেয় অসিদ্ধ হইতে পারে না। পরন্তু বহু বহু অভাবপদার্থও লোকসিদ্ধ আছে। সেগুলির অপলাপ করা অসম্ভব, সুতরাং “নাভাবপ্রমাণ্যং” ইত্যাদি বাক্য যুগ্মতামূলক। মহর্ষি যুগ্মতামূলক ঐ পূর্বপক্ষের অবতারণা করিয়া তদ্বত্তরে অভাবপদার্থেরই অস্তিত্ব সমর্থন করিয়াছেন। কারণ, পূর্বপক্ষবাদী অভাব পদার্থই স্বীকার করেন না; কোন ভাবপদার্থকেও অভাব প্রমাণের প্রমেয় বলেন না। সুতরাং অভাব পদার্থের অস্তিত্ব সমর্থন করিয়াই মহর্ষি এখানে তাহার খলিকান্ত সমর্থন ও পূর্বপক্ষের নিরাস করিয়াছেন। ৭ ৭।

ভাষ্য। অধায়মর্থবহুত্বাদর্থৈকদেশ উদাহ্রিয়তে—

অনুবাদ। অনন্তর অর্থের (অভাবপদার্থের) বহুববশতঃ এই অর্থৈকদেশ অর্থাৎ অভাবপদার্থের একদেশ (অভাববিশেষ) প্রদর্শন করিতেছেন [ অর্থাৎ বহু বহু অভাব পদার্থ লোকসিদ্ধ আছে, তাহার সবগুলি প্রদর্শন করা অসম্ভব, এ জন্য মহর্ষি পরসূত্রের দ্বারা অভাব-বিশেষই উদাহরণরূপে গ্রহণ করিয়া সিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়াছেন ]।

সূত্র। লক্ষিতেষলক্ষণলক্ষিতত্বাদলক্ষিতানাং তৎ-  
প্রমেয়সিদ্ধিঃ ॥৮॥১৩৭॥

অনুবাদ। (উত্তর) তাহার অর্থাৎ অভাবজ্ঞানরূপ অভাবনামক প্রমাণের প্রমেয়ের সিদ্ধি হয়, অর্থাৎ অভাবরূপ প্রমেয় সিদ্ধ হয়। যেহেতু, লক্ষিত অর্থাৎ কোন লক্ষণ বা চিহ্ন-বিশিষ্ট পদার্থ থাকিলে অলক্ষিত পদার্থগুলির অলক্ষণ-লক্ষিত্ব অর্থাৎ ঐ লক্ষণের অভাবের দ্বারা লক্ষিতত্ব আছে।

ভাষ্য। তস্ম্যভাবস্ত সিধ্যতি প্রমেয়ং, কথং? লক্ষিতেষু বাসঃস্ব অনুপাদেয়েষু উপাদেয়ানামলক্ষিতানামলক্ষণলক্ষিতত্বাৎ লক্ষণাভাবেন



লক্ষিতত্বাৎ। উভয়সমিধাবলক্ষিতানি বাস্যাংস্থানয়েতি প্রযুক্তো যেষু বাসঃশ্চ লক্ষণানি ন ভবন্তি, তানি লক্ষণাভাবেন প্রতিপদ্যতে, প্রতিপদ্য চানয়তি, প্রতিপত্তিহেতুশ্চ প্রমাণমিতি।

অনুবাদ। সেই অভাবের অর্থাৎ অভাবজ্ঞানরূপ অভাব নামক প্রমাণের প্রমেয় (অভাব পদার্থ) সিদ্ধ হয়। (প্রশ্ন) কি প্রকারে? (উত্তর) যেহেতু, লক্ষিত অগ্রাহ্য বস্ত্রগুলি থাকিলে, অর্থাৎ যেখানে কতকগুলি লক্ষিত (কোন লক্ষণবিশিষ্ট) অগ্রাহ্য বস্ত্র আছে সেখানে, গ্রাহ্য অলক্ষিত বস্ত্রগুলির অলক্ষণলক্ষিতত্ব আছে (অর্থাৎ) লক্ষণের অভাবের দ্বারা লক্ষিতত্ব (বিশিষ্টত্ব) আছে। তাৎপর্য্য এই যে—উভয় সমিধানে অর্থাৎ যেখানে লক্ষিত ও অলক্ষিত, দ্বিবিধ বস্ত্র আছে, সেখানে “অলক্ষিত বস্ত্রগুলি আনয়ন কর”—এই বাক্যের দ্বারা প্রেরিত ব্যক্তি যে সকল বস্ত্রে লক্ষণ নাই, সেই সকল বস্ত্রকে লক্ষণের অভাববিশিষ্ট বলিয়া বুঝে, বুঝিয়া অর্থাৎ লক্ষণাভাব-বিশিষ্ট সেই সকল বস্ত্রকেই আনতব্য বলিয়া বুঝিয়া, আনয়ন করে, বোধের হেতু—প্রমাণ। [ অর্থাৎ ঐ স্থলে সেই সকল বস্ত্রকে লক্ষণাভাব-বিশিষ্ট বলিয়া যখন বুঝে, তখন লক্ষণের অভাবজ্ঞান ঐ বোধের করণ হওয়ায় প্রমাণ হয়, তাহা হইলে উহার বিষয় লক্ষণাভাবরূপ অভাব পদার্থ স্বীকার্য্য। ]

টিপ্পনী। অভাবজ্ঞান প্রমাণ হইতে পারে না, কারণ তাহার বিষয় অভাবরূপ প্রমের অসিদ্ধ; অভাবপদার্থের অস্তিত্বই নাই। এই পূর্বপক্ষের উত্তরে মহর্ষি এই স্থলে বলিয়াছেন, “তৎপ্রমেয়-সিদ্ধিঃ”। অর্থাৎ অভাবজ্ঞানের বিষয়রূপ যে প্রমের (অভাবপদার্থ) তাহা সিদ্ধ হয়, অর্থাৎ প্রমাণের দ্বারা জানা যায়। কি প্রকারে তাহা সিদ্ধ হয়? অর্থাৎ অভাব যে প্রমাণসিদ্ধ পদার্থ, তাহা বুঝিব কিরূপে? ইহা বুঝাইতেই মহর্ষি বলিয়াছেন, “লক্ষিতেষ্বলক্ষণলক্ষিতত্বাদলক্ষিতানাং”। কোন লক্ষণ বা চিহ্নবিশিষ্ট পদার্থই লক্ষিত পদার্থ। সেই লক্ষণশূন্য পদার্থই অলক্ষিত পদার্থ। অলক্ষিত পদার্থকে বুঝিতে হইলে ঐ লক্ষণাভাব বুঝা আবশ্যক। অলক্ষিত পদার্থগুলিতে সেই লক্ষণ না থাকার সেগুলি অলক্ষণের দ্বারা অর্থাৎ ঐ লক্ষণের অভাব দ্বারা লক্ষিত; — সুতরাং সেগুলিকে বুঝিতে হইলে তাহাতে ঐ লক্ষণের অভাব বুঝিতে হইবে। দ্বিহারা অলক্ষিত পদার্থ বুঝিয়া থাকেন, তাহারা তাহাতে লক্ষণের অভাব অবগতই বুঝিয়া থাকেন, প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের দ্বারা অলক্ষিত পদার্থে লক্ষণের অভাব বুঝা যায়, সুতরাং অভাবপদার্থ অসিদ্ধ নহে, উহা প্রমাণ-সিদ্ধ। ভাষ্যকার প্রথমে মহর্ষির সূত্রার্থ বর্ণন করিয়া পরে, মহর্ষির তাৎপর্য্য বর্ণন করিয়াছেন যে, যেখানে কতকগুলি লক্ষিত বস্ত্র আছে, এবং কতকগুলি অলক্ষিত বস্ত্রও আছে, লক্ষিত বস্ত্র-গুলিতে এমন কোন লক্ষণ অর্থাৎ চিহ্ন আছে, যে জ্ঞাত সেগুলি অগ্রাহ্য; অলক্ষিত বস্ত্রগুলিতে ঐ লক্ষণ না থাকার সেগুলি গ্রাহ্য। ঐ লক্ষিত ও অলক্ষিত, এই দ্বিবিধ বস্ত্র থাকিলে সেখানে



যদি কেহ কোন বোঝা ব্যক্তিকে বলেন যে, “তুমি অলঙ্কিত বস্ত্রগুলি আনয়ন কর,”—তাহা হইলে ঐ ব্যক্তি যে সকল বস্ত্রে ঐ লক্ষণের অভাব দেখে, সেইগুলিকেই অলঙ্কিত অর্থাৎ লক্ষণাভাব-বিশিষ্ট বলিয়া বুঝে, সুতরাং সেই বস্ত্রগুলিই তাহাকে আনিতে হইবে, ইহা বুঝিয়া আনয়ন করে। ঐ স্থলে সেই সকল বস্ত্রে ঐ ব্যক্তি লক্ষণের অভাব বুঝিরাছে, নচেৎ সে ব্যক্তি অলঙ্কিত বস্ত্রের আনয়নে প্রেরিত হইয়া অলঙ্কিত বস্ত্র কিরূপে আনয়ন করে? তাহার সেই সকল বস্ত্রে লক্ষণাভাবজ্ঞান অলঙ্কিত বস্ত্র-বিষয়ক জ্ঞান সম্পাদন করিয়া ঐ স্থলে প্রমাণ হয়<sup>১</sup>। সুতরাং ঐ স্থলে বস্ত্রবিশেষে লক্ষণের অভাবজ্ঞান অবশ্যস্বীকার্য্য, তাহা হইলে অভাবপদার্থ প্রমাণসিদ্ধ হইয়া অবশ্যস্বীকার্য্য হইতেছে। এইরূপ বহু বহু অভাবপদার্থ প্রমাণসিদ্ধ আছে, অভাবপদার্থের বহুত্ব বশতঃ সকল অভাবপদার্থ প্রদর্শন করা সম্ভব নহে, এ জন্য মহর্ষি লক্ষণাভাবরূপ অভাববিশেষই প্রদর্শন করিয়া স্বসিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়াছেন। ভাষ্যকার প্রথমে এই কথা বলিয়াই সূত্রের অবতারণা করিয়াছেন ॥ ৮ ॥

**সূত্র।** অসত্যর্থো নাভাব ইতি চেদান্যলক্ষণোপ-  
পত্তেঃ ॥৯॥১৩৮॥

অনুবাদ। (পূর্বপক্ষ) পদার্থ না থাকিলে অভাব থাকে না, ইহা যদি বল? (উত্তর) না, যেহেতু অন্তত্বে, অর্থাৎ লক্ষিত পদার্থে লক্ষণের উপপত্তি (সম্ভা) আছে।

ভাষ্য। যত্র ভূত্বা কিঞ্চিন্ন ভবতি তত্র তস্ম্যভাব উপপদ্যতে, অলঙ্কিতেষু চ বাসঃস্ব লক্ষণানি ন ভূত্বা ন ভবন্তি, তস্ম্যভাবেন লক্ষণাভাবোহ-  
নুপপন্ন ইতি। ‘নান্যলক্ষণোপপত্তেঃ’—যথাহরমন্ত্রেষু বাসঃস্ব লক্ষণানামুপ-  
পত্তিং পশ্যতি, নৈবমলঙ্কিতেষু, সৌহরং লক্ষণাভাবং পশ্যাম্ভাবেনার্থঃ  
প্রতিপদ্যত ইতি।

অনুবাদ। (পূর্বপক্ষ) যে স্থানে কোন পদার্থ উৎপন্ন হইয়া নাই, অর্থাৎ বিনষ্ট হইয়াছে, সে স্থানে তাহার অভাব উপপন্ন হয়। অলঙ্কিত বস্ত্রগুলিতে লক্ষণ-  
গুলি উৎপন্ন হইয়া নাই (ইহা) নহে, অর্থাৎ তাহাতে লক্ষণগুলি উৎপন্ন হইয়া বিনষ্ট হয় নাই, অতএব তাহাতে লক্ষণের অভাব উপপন্ন হয় না। (উত্তর) না, অর্থাৎ অলঙ্কিত বস্ত্রে কখনও লক্ষণ ছিল না বলিয়া, তাহাতে লক্ষণের অভাব থাকিতে পারে না—ইহা বলা যায় না; যেহেতু অন্তত্বে (লক্ষিত পদার্থান্তরে) লক্ষণের উপপত্তি

১। প্রতিপদ্য চানয়তি। লক্ষণাভাবেন বিশেষণেনাবজ্জিরাভ্যাসেনতথায়েন প্রতিপদ্যানয়তি। এতচ্ছবং ভবতি লক্ষণাভাবজ্ঞান বিশিষ্ট বাসি প্রত্যক্ প্রবচন সাধকভবদ্বাং প্রমাণ ভবতি।—ভাঃপঞ্জীক।



(সত্তা) আছে। যেমন, এই ব্যক্তি অর্থাৎ লক্ষিত ও অলক্ষিত বস্তুর দ্রষ্টা ব্যক্তি অন্য বস্তুগুলিতে (লক্ষিত বস্তুগুলিতে) লক্ষণগুলির সত্তা দেখে, এইরূপ অলক্ষিত বস্তুগুলিতে লক্ষণগুলির সত্তা দেখে না, সেই এই ব্যক্তি লক্ষণের অভাব দর্শন করতঃ অভাববিশিষ্ট পদার্থ (লক্ষণাভাব-বিশিষ্ট পূর্বোক্ত অলক্ষিত বস্তু) বুঝিয়া থাকে।

উপনী। মহর্ষি পূর্বসূত্রে বলিয়াছেন যে, অভাবজ্ঞানের বিবরণরূপ যে প্রমেয়, অর্থাৎ অভাবপদার্থ, তাহা সিদ্ধ। কারণ, কোন স্থানে কোন লক্ষণবিশিষ্ট ও ঐ লক্ষণশূন্য পদার্থ থাকিলে ঐ লক্ষণশূন্য (অলক্ষিত) পদার্থে ঐ লক্ষণের অভাব বুঝিয়াই ঐ অলক্ষিত পদার্থ বুঝে, ঐ পদার্থ অলক্ষণ অর্থাৎ লক্ষণাভাবের দ্বারা লক্ষিত। সুতরাং ঐ অলক্ষিত পদার্থে লক্ষণাভাবরূপ অভাবের জ্ঞান হওয়ার অভাবপদার্থ সিদ্ধ হয়, উহা অবশ্য স্বীকার করিতে হয়। এই সূত্রে মহর্ষি পূর্ব সূত্রোক্ত সিদ্ধান্ত সমর্থন করিবার জন্ত প্রথমে পূর্বপক্ষ বলিয়াছেন যে, যদি বল, পদার্থ না থাকিলে সেখানে তাহার অভাব থাকিতে পারে না। পূর্বপক্ষের তাৎপর্য এই যে, অলক্ষিত পদার্থে কখনও লক্ষণ ছিল না, তাহাতে সেই লক্ষণগুলি উৎপন্নই হয় নাই, সুতরাং তাহাতে সেই লক্ষণের অভাব কিরূপে থাকিবে? যেখানে বাহা কখনও ছিল না—বাহা যেখানে উৎপন্নই হয় নাই, সেখানে তাহার অভাব থাকিতে পারে না। যেখানে লক্ষণ পূর্বে বিদ্যমান ছিল, সেখানে ঐ লক্ষণ বিনষ্ট হইলেই, তখন সেখানে তাহার অভাব থাকে, সুতরাং লক্ষিত পদার্থে লক্ষণ বিনষ্ট হইলেই তাহাতে লক্ষণের অভাব উপপন্ন হয়। অলক্ষিত পদার্থে লক্ষণ উৎপন্ন না হওয়ার তাহাতে অব্যবস্থাপন ঐ লক্ষণের অভাব থাকিতে পারে না, তাহাতে লক্ষণাভাব উপপন্ন হয় না।

উদ্যোতকর এই সূত্রে চলসূত্র বলিয়াছেন। তাৎপর্য্যটীকাকার উহার তাৎপর্য্য বর্ণন করিয়াছেন যে, অভাবের প্রতিযোগী পদার্থ পূর্বে বিদ্যমান থাকিলেই অভাব উপপন্ন হয়। যেমন, ধ্বংস। ধ্বংসরূপ অভাবের প্রযোজী, অর্থাৎ যে পদার্থের ধ্বংস হইয়াছে, সেই পদার্থ পূর্বে বিদ্যমান ছিল, পরে সেখানে তাহার বিনাশ হওয়ার, ধ্বংসরূপ অভাব সেখানে আছে। অলক্ষিত পদার্থে কখনও লক্ষণ না থাকায়, তাহার অভাব সেখানে থাকিতে পারে না। এইরূপ সামান্য চলই এই সূত্রের দ্বারা মহর্ষি প্রকাশ করিয়াছেন। চলবাদী পূর্বপক্ষীর কথা এই যে, ভাব-পদার্থ দ্বারাই অভাবের নিরূপণ হয়, ভাব না থাকিলে তাহার অভাব নিরূপণ হইতে পারে না, সুতরাং ধ্বংসই অভাব; কারণ, ধ্বংস হইলে সেখানে বাহার ধ্বংস হয়, সেই ভাবপদার্থ পূর্বে বিদ্যমান থাকে। ফল কথা, যাহাকে প্রাগ্ভাব বলা হয়, তাহা অসিদ্ধ। কারণ, পূর্বে অভাবের প্রতিযোগী ভাবপদার্থ না থাকিলে সেখানে অভাবের নিরূপণ হইতে পারে না, সুতরাং সেখানে পূর্বে অব্যবস্থাপন পদার্থের অভাব থাকিতে পারে না, উহা অসিদ্ধ। একমাত্র ধ্বংস নামক অভাবই সিদ্ধ—উহাই স্বীকার্য্য। তাৎপর্য্যটীকাকার এখানে পূর্বপক্ষবাদের এইরূপ অভিসন্ধি বর্ণন করিয়াছেন।



মহর্ষি পূর্বোক্তরূপ পূর্বপক্ষ প্রকাশ করিয়া এই সূত্রেই তাহার উত্তর বলিয়াছেন, 'নাস্তলক্ষণোপপত্তেঃ'। ভাষ্যকারও প্রথমে মহর্ষি-সূত্রোক্ত পূর্বপক্ষের ব্যাখ্যা করিয়া তাহার উত্তর ব্যাখ্যা করিতে মহর্ষির "নাস্তলক্ষণোপপত্তেঃ"—এই অংশকে উদ্ধৃত করিয়া তাহার তাৎপর্য বর্ণন করিয়াছেন। মহর্ষি পূর্বোক্ত পূর্বপক্ষের উত্তরে বলিয়াছেন যে, না, অর্থাৎ অলক্ষিত পদার্থে পূর্বে লক্ষণ ছিল না বলিয়াই যে তাহাতে ঐ লক্ষণের অভাব থাকিতে পারে না, ইহা বলিতে পার না; কারণ, অস্ত্র লক্ষণের সত্তা আছে। তাৎপর্য এই যে, যেখানে লক্ষণের অভাব থাকিবে, সেখানেই যে পূর্বে ঐ লক্ষণ থাকা আবশ্যিক, ইহা নহে। লক্ষিত পদার্থে যে লক্ষণ আছে, অথবা অলক্ষিত পদার্থে যে লক্ষণ পরে জন্মিবে, তাহারই অভাব অলক্ষিত পদার্থে অবশ্যই থাকিতে পারে ও আছে। অভাব পদার্থের নিরূপণ ভাবপদার্থের অধীন নহে, উহা ভাবপদার্থের জ্ঞানের অধীন। যে কোন স্থানে ভাবপদার্থের জ্ঞান হইলেই, অস্ত্র তাহার অভাবের জ্ঞান হইতে পারে। ভবিষ্যৎ ভাবপদার্থের যে কোন প্রমাণের দ্বারা জ্ঞান হইলেও পূর্বে তাহার অভাব জ্ঞান হইয়া থাকে, সেই অভাবের নাম প্রাগ্ভাব। ধ্বংস যেমন প্রত্যক্ষপ্রমাণসিদ্ধ, প্রাগ্ভাবও ঐরূপ প্রত্যক্ষপ্রমাণসিদ্ধ, সুতরাং ধ্বংস স্বীকার করিলে, প্রাগ্ভাবও স্বীকার্য, উহাও লোকপ্রতীতি-সিদ্ধ। সুতরাং অলক্ষিত বস্তাদিতে পূর্বে লক্ষণ না থাকিলেও তাহাতে ঐ লক্ষণের অভাব আছে; তাহা থাকিবার কোন বাধা নাই। ঐ লক্ষণ যদি কোথাও না থাকিত, উহা যদি একেবারে অলীক হইত, তাহা হইলে কুত্রাপি উহার জ্ঞান হইতে না পারার উহার অভাব জ্ঞান হইতে পারিত না, উহার অভাবও অলীক হইত, কিন্তু ঐ লক্ষণ ত অলীক নহে। অস্ত্র, অর্থাৎ সেই লক্ষণবিশিষ্ট বস্তাদিতে উহা বিদ্যমান আছে। সূত্রে "অস্ত্র লক্ষণানাং উপপত্তিঃ" এইরূপ অর্থে "অস্ত্র-লক্ষণোপপত্তি" শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। "উপপত্তি" শব্দের অর্থ এখানে সত্তা বা বিদ্যমানতা।

সূত্রকার মহর্ষি অভাব পদার্থ প্রতিপাদন করিতে নামাত্ততঃ লক্ষিত ও অলক্ষিত পদার্থমাত্তকে উল্লেখ করিলেও ভাষ্যকার দৃষ্টান্তরূপে লক্ষিত ও অলক্ষিত বস্তকে গ্রহণ করিয়া সূত্রার্থ বর্ণন করিয়াছেন। সূত্রের উত্তরপক্ষের তাৎপর্য বর্ণন করিতে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, লক্ষিত ও অলক্ষিত বস্তদ্বয়ো বাক্তি লক্ষিত বস্ত্রে যেমন লক্ষণের সত্তা দেখে, অলক্ষিত বস্ত্রে ঐরূপ লক্ষণের সত্তা দেখে না। ভাষ্যকার এই কথাটির দ্বারা অলক্ষিত বস্ত্রে লক্ষণের অভাব দর্শন করে, এই অর্থই প্রকাশ করিয়াছেন। তাই শেষে তাহার ঐ বিবক্ষিতার্থ স্পষ্ট করিয়াই বলিয়াছেন। ভাষ্যকারের বক্তব্য এই যে, লক্ষিত বস্ত্রগুলিতে লক্ষণের সত্তা দর্শন হওয়ার সেখানেই লক্ষণাভাবের প্রতিযোগিতা যে লক্ষণ, তাহার জ্ঞান হয়। তাহার পরে অলক্ষিত বস্ত্রগুলিতে ঐ লক্ষণের অভাবজ্ঞান হয়। তাহার কালে, ঐ বস্ত্রগুলিকে তখন লক্ষণাবিশিষ্ট বলিয়া বুঝিতে পারে। লক্ষণাভাবরূপ অভাব পদার্থ সেইখানে প্রমের না হইলে "ইহা অলক্ষিত বস্ত্র" এইরূপ বোধ কিছুতেই হইতে পারে না। সার্বজনীন ঐ বোধের অপলাপ করা যায় না। মূলকথা, লক্ষিত বস্ত্রগুলিতে লক্ষণগুলি বিদ্যমান থাকায় এবং সেখানেই তাহার জ্ঞান হওয়ার অলক্ষিত বস্ত্রে ঐ লক্ষণের অভাব উপপন্ন হইতে পারে। যেখানে লক্ষণের অভাব থাকিবে, সেখানেই পূর্বে ঐ লক্ষণের সত্তা থাকা আবশ্যিক



নহে। “কংস” নামক অভাব যেমন প্রত্যক্ষসিদ্ধ, তদ্রূপ “প্রাগভাব” নামক অভাবও প্রত্যক্ষ-  
সিদ্ধ, সুতরাং কংসের জায় প্রাগভাবও স্বীকার্য। মহর্ষি পূর্বপক্ষবাক্য বলিয়াছেন, “অসত্যার্থে  
নাভাবঃ”। ভাষ্যকার পূর্বপক্ষের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন, “যত্র ভূত্বা কিঞ্চিদ ভবতি”। সূত্রোক্ত  
“অসৎ” শব্দের অর্থ এখানে অবিন্যাস। ভাষ্যকারের “ভূত্বা” এই পদটি সূত্রানুসারে অসৎ বাত্ব-  
নিপন্ন, ইহাও বুঝা বাইতে পারে। কিন্তু তাহাতেও যে পদার্থ পূর্বে উৎপন্ন হইয়া, পরে বিনষ্ট হয়,  
তাহারই অভাব অর্থাৎ কংস নামক অভাবই স্বীকার করি, ইহাই পূর্বপক্ষের তাৎপর্য বৃদ্ধিতে  
হইবে। তাৎপর্যটিকার ঐক্যপেই পূর্বপক্ষ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অলঙ্কিত বস্তুরূপিতে  
লক্ষণগুলি উৎপন্ন হইয়া বিনষ্ট হয় নাই, এই কথা বলিতেই ভাষ্যকার পরে বলিয়াছেন, “অলঙ্কিতেষু  
চ বাসঃসু লক্ষণানি ন ভূত্বা ন ভবন্তি”। প্রচলিত ভাষ্য-পুস্তকে এখানে “ভূত্বা ন ভবন্তি” এই-  
রূপ পাঠই আছে। কিন্তু দুইটি নঞ শব্দ ব্যতীত এখানে ভাষ্যকারের বক্তব্য প্রকটিত হয় না।  
ভাষ্যকার প্রথমে বলিয়াছেন, “ভূত্বা ন ভবন্তি”। পরে উহার বিপরীত কথা বলিতে, “ভূত্বা ন  
ভবন্তি”—এইরূপ পূর্বোক্ত পদার্থপ্রতিপাদক বাক্যই বলিতে পারেন না। মহর্ষিও পূর্বপক্ষ  
বলিতে দুইটি “নঞ” শব্দেরই প্রয়োগ করিয়াছেন। সুতরাং ভাবো “লক্ষণানি ন ভূত্বা ন ভবন্তি”  
—এইরূপ পাঠই প্রকৃত বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। অলঙ্কিত বস্ত্রে লক্ষণগুলি উৎপন্নই হয় নাই,  
সুতরাং তাহাতে লক্ষণগুলি উৎপন্ন হইয়া নাই—ইহা নহে, অর্থাৎ তাহাতে লক্ষণগুলি উৎপন্ন  
হইয়া বিনষ্ট হইয়াছে, ইহা নহে, তাহাতে লক্ষণগুলি উৎপন্ন হইয়া বিনষ্ট হয় নাই, সুতরাং তাহাতে  
লক্ষণের অভাব উৎপন্ন হয় না, ইহাই পূর্বপক্ষ ব্যাখ্যায় ভাষ্যকারের বক্তব্য। “লক্ষণানি ভূত্বা  
ন ভবন্তি” এইরূপ পাঠে ভাষ্যকারের ঐ বক্তব্য প্রকটিত হয় না। ৯।

## সূত্র। তৎসিদ্ধেরলক্ষিতেষহেতুঃ ॥১০॥১৩৯॥

অনুবাদ। (পূর্বপক্ষ) তাহাতে অর্থাৎ লক্ষিত পদার্থে সিদ্ধি (বিদ্যমানতা)  
বশতঃ অলঙ্কিত পদার্থে (সেই লক্ষণের অভাব থাকে, ইহা) অহেতু।

ভাষ্য। তেবু বাসঃসু লক্ষিতেষু সিদ্ধির্বিদ্যমানতা যেথাং ভবতি,  
ন তেবামভাবো লক্ষণানাং। যানি চ লক্ষিতেষু বিদ্যন্তে তেবামলক্ষিতে-  
ষ্ভাব ইত্যহেতুঃ। যানি খলু ভবন্তি তেবামভাবো ব্যাহত ইতি।

অনুবাদ। সেই লক্ষিত বস্ত্রসমূহে বাহাদিগের সিদ্ধি—কিনা, বিদ্যমানতা  
আছে, সেই লক্ষণগুলির অভাব নাই। লক্ষিত পদার্থসমূহে যে লক্ষণগুলি  
বিদ্যমান আছে, অলঙ্কিত পদার্থসমূহে তাহাদিগের অভাব, ইহা হেতু হয় না।  
যেহেতু, যেগুলি বিদ্যমান থাকে, তাহাদিগের অভাব ব্যাহত। অর্থাৎ বিদ্যমান  
থাকিলে তাহার অভাব সেখানে থাকিতে পারে না।



টিপনী। পূর্বসূত্রে বলা হইয়াছে যে, লক্ষিত পদার্থে লক্ষণ বিদ্যমান থাকায়, অলক্ষিত পদার্থে তাহার অভাব উপপন্ন হয়। এই সূত্রের দ্বারা আবার পূর্বপক্ষ বলা হইয়াছে যে, লক্ষিত পদার্থে বাহ্য বিদ্যমান আছে, তাহার অভাব থাকিতে পারে না। বাহ্য যেখানে বিদ্যমান আছে, তাহার অভাব সেখানে ব্যাহত অর্থাৎ বিরুদ্ধ, তাব ও অভাব একত্র থাকিতে পারে না। যেখানে লক্ষণ বিদ্যমান নাই, সেই অলক্ষিত পদার্থেও লক্ষণের অভাব উপপন্ন হয় না। কারণ, ভাবপদার্থের দ্বারাই অভাবপদার্থের নিরূপণ হয়, যেখানে ঐ ভাবপদার্থ নাই, সেখানে তাহার অভাব বুঝা যায় না। উল্লেখ্যতঃ এই সূত্রেও ছলসূত্র বলিয়াছেন। তাৎপর্য্যটীকাকার উল্লেখ্যতঃকরের কথা বুঝাইতে বলিয়াছেন যে, যে লক্ষণগুলি বিদ্যমান আছে, সেইগুলিই নাই, ইহা কিরূপে বলা যায়? বাহ্য বিদ্যমান, তাহার অভাব থাকিতে পারে না। এইরূপ বাক্যই মহাবি এই সূত্রের দ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন। সিদ্ধান্ত সম্যক বুঝাইবার জন্ত—মন্দবুদ্ধি শিষ্যদিগকে নিঃসন্দেহ করিবার জন্ত, মহাবি ছলবাদীর পূর্বপক্ষও প্রকাশ করিয়া, তাহার নিরাস করিয়াছেন। সূত্রে “অলক্ষিতেবু” এই বাক্যের পরে “অভাব ইতি” এইরূপ বাক্যের অধ্যাহার মহাবির অভিপ্রেত আছে। তাই ভাষ্যকার ঐরূপ বাক্যের পূরণ করিয়া সূত্রার্থ বর্ণন করিয়াছেন। লক্ষিত পদার্থে লক্ষণ বিদ্যমান থাকায় অলক্ষিত পদার্থে লক্ষণের অভাব উপপন্ন হয়, ইহা মহাবি শিষ্যসম্প্রদায় সমর্থনে হেতুক্রমেই প্রকাশ করিয়াছেন, তাই ছলবাদীর পূর্বপক্ষ প্রকাশ করিতে এখানে “অহেতুঃ” এই কথার দ্বারা পূর্বোক্ত হেতু অসিদ্ধ, সূত্রার্থ উহা হেতুই হয় না, উহা হেতুভাগ—ইহা বলিয়াছেন ॥১০॥

সূত্র। ন লক্ষণাবস্থিতাপেক্ষসিদ্ধেঃ ॥ ১১॥১৪০ ॥

অনুবাদ। (উত্তর) না, অর্থাৎ পূর্বোক্ত পূর্বপক্ষ বলা যায় না, যেহেতু অবস্থিত লক্ষণকে অপেক্ষা করিয়া (লক্ষণাভাবের) সিদ্ধি (জ্ঞান) হয়।

ভাষ্য। ন ক্রমো যানি লক্ষণানি ভবন্তি, তেবামভাব ইতি, কিন্তু কেবুচিন্নলক্ষণাবস্থিতানি, অনবস্থিতানি কেবুচিদপেক্ষমাণো যেষু লক্ষণানাং ভাবং ন পশ্যতি, তানি লক্ষণাভাবেন প্রতিপদ্যত ইতি।

অনুবাদ। যে লক্ষণগুলি আছে, সেগুলির অভাব, ইহা বলিতেছি না, কিন্তু কতকগুলি পদার্থে অবস্থিত কতকগুলি পদার্থে অনবস্থিত লক্ষণগুলিকে অপেক্ষা করতঃ যে পদার্থগুলিতে লক্ষণগুলির সত্তা দেখে না, সেই পদার্থগুলিকে লক্ষণাভাব-বিশিষ্ট বলিয়া বুঝে।

১। “অলক্ষিতে নাকারঃ”, তৎসিদ্ধের লক্ষিতবহেতুরিতি তেজঃ অপোতে হ্রস্বসূত্রে ইতি।—ভাষ্যাত্মিক। যে গেহভাবঃ ন সর্বং নাকারঃ ভবতি, যথা প্রকাসঃ, ন চ তথা লক্ষণাভাব ইতি লাক্ষ্যচ্ছং। তৎসিদ্ধেরিতি তু বাক্যলঃ, যানি লক্ষণানি ভবন্তি তথা তাত্ত্বিক ন ভবন্তীতি হি তস্যাঃ।—তাৎপর্য্যটীকা।

উপনী। পূর্বসূত্রোক্ত ছলবাদীর পূর্বপক্ষ অগ্রাহ্য, ইহা বুঝাইতে মহর্ষি এই সূত্রে বলিয়াছেন যে, পূর্বোক্ত লক্ষণাভাবরূপ অভাবের সিদ্ধি অবস্থিতলক্ষণসাপেক্ষ। ভাষ্যকার মহর্ষির তাৎপর্য বর্ণন করিয়াছেন যে, যে সকল লক্ষণ বিদ্যমান আছে, তাহাদিগের অভাব আছে ইহা পূর্বে বলি নাই। পূর্বোক্ত কথা না বুঝিয়াই, অথবা বুঝিয়াও ছল করিবার জন্য ঐরূপ পূর্বপক্ষ বলা হইয়াছে। যে লক্ষণগুলির অভাব বলিয়াছি, সেগুলি অনেক পদার্থে আছে, অনেক পদার্থে নাই, ঐ অবস্থিত লক্ষণগুলিকে অপেক্ষা করিয়া, অর্থাৎ যে যে পদার্থে ঐ লক্ষণগুলি আছে—তাহাতে ঐ লক্ষণগুলি দেখিয়া, যে সকল পদার্থে ঐ লক্ষণগুলির সত্তা দেখিতে পায় না, সেই পদার্থগুলিকেই ঐ লক্ষণের অভাববিশিষ্ট বলিয়া বুঝিও থাকে—ইহাই পূর্বে বলা হইয়াছে। সুতরাং পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তে পূর্বোক্তপ্রকার পূর্বপক্ষের কোনই হেতু নাই। উদ্যোক্তকর স্পষ্ট করিয়াই মহর্ষির তাৎপর্য বর্ণন করিয়াছেন যে, যেখানে যে লক্ষণগুলি বিদ্যমান আছে, সেখানেই তাহাদিগের অভাব থাকে, ইহা পূর্বে বলা হয় নাই, কিন্তু কোন্ কোন্ পদার্থে ঐ লক্ষণগুলি অবস্থিত আছে, তাহা দেখিয়া যে সকল পদার্থে ঐ লক্ষণগুলি নাই, সেই সকল পদার্থকে ঐ লক্ষণাভাববিশিষ্ট বুঝিও থাকে—ইহাই পূর্বে বলা হইয়াছে। মূলকথা, যে লক্ষণগুলি যেখানে বিদ্যমানই আছে, সেখানেই তাহাদিগের অভাব থাকে না, সেখানেই তাহাদিগের অভাব থাকে—ইহা পূর্বে বলাও হয় নাই। ঐ লক্ষণগুলি যে যে পদার্থে অবস্থিত আছে, তন্নিম্ন পদার্থেই তাহাদিগের অভাব থাকে, ইহাই পূর্বে বলা হইয়াছে। যেখানে ভাবপদার্থ বিদ্যমান নাই, সেখানে উহার অভাব থাকিতে পারে না। কারণ, অভাবের নিরূপণ ভাবপদার্থের অধীন, ভাব না থাকিলে অভাব বুঝা যায় না, এই পূর্বপক্ষও যুক্তিযুক্ত নহে। কারণ, ভাবপদার্থের নিরূপণ ভাবপদার্থের জ্ঞানের অধীন, যে কোন স্থানে ভাবপদার্থের জ্ঞান হইলেই তন্নিম্ন পদার্থে তাহার অভাবের জ্ঞান হয়। যেখানে অভাবের জ্ঞান হইবে, সেখানেই উহার বিপরীত ভাবপদার্থের সত্তা থাকা আবশ্যক নহে, তাহা সম্ভবও নহে। তাৎপর্যটীকাকারের কথামুসারে এ সকল কথা পূর্বে বলা হইয়াছে ॥১১॥

**সূত্র।** প্রাপ্তপত্তেরভাবোপপত্তেশ্চ ॥ ১২॥১৪১ ॥

অনুবাদ। এবং যেহেতু উৎপত্তির পূর্বের অভাবের উপপত্তি হয় [ অর্থাৎ যে বস্তু যেখানে উৎপন্ন হয়, উৎপত্তির পূর্বের সেখানে তাহার অভাবজ্ঞানই হইয়া থাকে, সুতরাং স্বংসের দ্বারা প্রাগভাবও স্বীকার্য ]।

ভাষ্য। অভাবদ্বৈতং খলু ভবতি, প্রাক্ চোৎপত্তেরবিদ্যমানতা, উৎপন্নস্ত চাত্মনো হানাদবিদ্যমানতা। তত্রালঙ্কিতেষু বাসঃস্থ প্রাপ্তপত্তেরবিদ্যমানতালক্ষণো লক্ষণানামভাবো নেতর ইতি।

অনুবাদ। অভাবের দ্বিধ আছে; অর্থাৎ স্বংস ও প্রাগভাব, এই দ্বিবিধ অভাব স্বীকার্য। উৎপত্তির পূর্বের অবিদ্যমানতা (প্রাগভাব) এবং উৎপন্ন বস্তুর



আত্মহান অর্থাৎ বিনাশপ্রযুক্ত অবিদ্যমানতা ( ধ্বংস )। তন্মধ্যে ( পূর্বোক্ত এই দ্বিবিধ অভাবের মধ্যে ) অলঙ্কিত বস্ত্রসমূহে উৎপত্তির পূর্বে অবিদ্যমানতারূপ লক্ষণাতাব অর্থাৎ লক্ষণগুলির প্রাগভাব আছে ; ইতর, অর্থাৎ শেযোক্ত প্রকার লক্ষণাতাব ( লক্ষণধ্বংস ) নাই।

টিপ্পনী। মহর্ষি পূর্বোক্ত দশম সূত্রে চলবাদীর পূর্বপক্ষের উল্লেখপূর্বক একাদশ সূত্রে তাহার খণ্ডন করিয়া, এখন এই সূত্রের দ্বারা পূর্বোক্ত নবম সূত্রোক্ত পূর্বপক্ষের চরম উত্তর বলিয়াছেন। পূর্বোক্ত নবম সূত্রে পূর্বপক্ষ বলা হইয়াছে যে, বস্ত্র বিদ্যমান না থাকিলে, তাহার অভাব থাকিতে পারে না। পূর্বপক্ষবাদীর গৃহ অভিসন্ধি এই যে, যেখানে যে বস্ত্র থাকে, সেখানে তাহার বিনাশের কারণ উপস্থিত হইলে, তাহার বিনাশ বা ধ্বংস নামক যে অভাব জন্মে, তাহাই স্বীকার্য। যেখানে যে বস্ত্র উৎপন্নই হয় নাই, সেখানে তাহার অভাব থাকিতে পারে না। অর্থাৎ যাহাকে প্রাগভাব বলা হয়, তাহা স্বীকার করি না। মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা বলিয়াছেন যে, প্রাগভাব অবশ্য স্বীকার্য। কারণ, কোন বস্তুর উৎপত্তির পূর্বে তাহার অভাব জ্ঞান হয়। উৎপত্তির পূর্বে অবিদ্যমানতা, অর্থাৎ না থাকা এক প্রকার অভাব, উহারই নাম প্রাগভাব, উহা তখন প্রত্যক্ষসিদ্ধ, তখন উহা স্বীকার করা যায় না। উৎপন্ন বস্তুর আত্মতাগ, অর্থাৎ বিনাশ ঘটিলে, তখন তাহার যে অবিদ্যমানতা, তাহাকেই ভাষ্যকার দ্বিতীয় অভাব, অর্থাৎ ধ্বংস নামক অভাব বলিয়াছেন। ভাষ্যকারের ঐ কথা দ্বারা জ্ঞাত অভাবই ধ্বংস, ইহাই কলিতার্থ বৃত্তিতে হইবে। অর্থাৎ যে অভাব জন্মে, তাহারই নাম ধ্বংস, এবং যে অভাব জন্মে না, কিন্তু বিনষ্ট হয়, তাহারই নাম প্রাগভাব, ইহাই ভাষ্যকারের কথার কলিতার্থ বৃত্তিতে হইবে। অলঙ্কিত বস্ত্রগুলিতে লক্ষণগুলি উৎপন্ন হয় নাই, উৎপত্তির পূর্বকাল পর্যন্ত ঐ সকল বস্ত্রে যে লক্ষণাতাব আছে, তাহা প্রাগভাব। লক্ষণ উৎপন্ন না হইলে, তাহার ধ্বংস হইতে পারে না, সুতরাং অলঙ্কিত বস্ত্রগুলিতে লক্ষণের ধ্বংস থাকিতে পারে না। কিন্তু সেই সকল বস্ত্রে লক্ষণের অভাব প্রত্যক্ষসিদ্ধ, সুতরাং তখন তাহাতে লক্ষণের প্রাগভাব অবশ্য স্বীকার্য। লঙ্কিত বস্ত্রে ঐ লক্ষণগুলি বিদ্যমান থাকায়, সেখানেই উহাদিগের জ্ঞান হওয়ার, অলঙ্কিত বস্ত্রে উহাদিগের অভাবজ্ঞান হইতে পারে। কলকথা, ধ্বংসের দ্বারা প্রাগভাবও স্বীকার্য, ভাষ্যকার ও উদ্যোক্তকর এখানে “অভাববৈতং শব্দ ভবতি”—এই কথা বলিয়া অভাব পদার্থকে যে দ্বিবিধ বলিয়াছেন, তাহাতে ধ্বংস ও প্রাগভাব নামে অভাব পদার্থ দুই প্রকার মাত্র, ইহাই বৃত্তিতে হইবে না। তাৎপর্যটীকাকর এখানে বলিয়াছেন যে, যে পূর্বপক্ষবাদী কেবল ধ্বংস নামক এক প্রকার অভাবই স্বীকার করিয়া, পূর্বোক্তরূপ পূর্বপক্ষ বলিয়াছেন, তাহার নিকটে প্রাগভাব নামক দ্বিতীয় প্রকার অভাব সমর্থন করাতেই ভাষ্যকার ও উদ্যোক্তকর “অভাববৈতং” এই কথা বলিয়াছেন। অর্থাৎ ধ্বংস ও প্রাগভাব, এই দুই প্রকার অভাব অসিদ্ধ, কেবল ধ্বংসই সিদ্ধ, এইরূপ পূর্বপক্ষের উত্তরেই প্রাগভাবের সমর্থন করায় “অভাববৈতং” এই কথা বলা হইয়াছে। জ্ঞাত প্রকার অভাবের নিষেধ ঐ কথার উদ্দেশ্য নহে। বস্ত্রভাব, আত্মভাব ও সংসর্গভাব নামে প্রথমতঃ অভাব দ্বিবিধ। যাহাকে ভেদ বলা হয়, তাহার নাম

অন্তোন্তাভাব, উহার কোন প্রকার ভেদ নাই। সংসর্গাভাব ত্রিবিধ: (১) প্রাগভাব, (২) ধ্বংস, (৩) অভ্যস্তাভাব। নব্য নৈয়ায়িকগণ অভাবপদার্থ সংক্ষেপে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। কিন্তু অভাবপদার্থের পূর্বোক্ত প্রকারভেদ তাৎপর্যটীকাকার বাচস্পতি মিশ্র ৭ লিখিয়াছেন। নব্য নৈয়ায়িক রত্ননাথ শিরোমণি প্রাগভাব খণ্ডন করিলেও মহর্ষি গোতমের এই সূত্রে প্রাগভাবের স্বীকার স্পষ্ট পাওয়া যায়। কণাদ-সূত্রেও অল্প প্রসঙ্গে অভাবপদার্থের স্বীকার স্পষ্ট পাওয়া যায়। মহর্ষি গোতম এখানে অভাবপদার্থের সমর্থন করায়, পূর্বোক্ত “নাভাবপ্রামাণ্য” ইত্যাদি সূত্রোক্ত মূল পূর্বপক্ষ নিরস্ত হইয়াছে ॥ ১১ ॥

প্রমাণচতুষ্টয়-পরীক্ষা-প্রকরণ সমাপ্ত ॥ ১ ॥

—o—

ভাষা। “আপ্তোপদেশঃ শব্দ” ইতি প্রমাণভাবে বিশেষণং ক্রবতা নানাপ্রকারঃ শব্দ ইতি জ্ঞাপ্যতে, তস্মিন্ সামান্যেন বিচারঃ—কিং নিত্যোহনিত্য ইতি। বিমর্শহেতুনুযোগে চ বিপ্রতিপত্তেঃ সংশয়ঃ। আকাশগুণঃ শব্দো বিভূর্নিত্যোহভিব্যক্তিদ্বন্দ্বক ইত্যেকো। গন্ধাদিসহবৃত্তি-দ্রব্যোষু সন্নিবিষ্টো গন্ধাদিবদবস্থিতোহভিব্যক্তিদ্বন্দ্বক ইত্যপরে। আকাশ-গুণঃ শব্দ উৎপত্তিনিরোধধর্মকো বুদ্ধিবদিত্যপরে। মহাত্ত্বসংকোভভঃ শব্দোহনান্ত্রিত উৎপত্তিদ্বন্দ্বকো নিরোধধর্মক ইত্যন্যে। অতঃ সংশয়ঃ কিমত্র তদ্ব্যমিতি।

অনুবাদ। “আপ্তোপদেশঃ শব্দঃ” এই সূত্রে প্রমাণভাবে অর্থাৎ শব্দের প্রামাণ্যে বিশেষণ বলিয়া (মহর্ষি) শব্দ নানাপ্রকার, ইহা জ্ঞাপন করিতেছেন। তাহাতে সামান্যতঃ শব্দ কি নিত্য, অথবা অনিত্য, ইহার বিচার অর্থাৎ পরীক্ষা (করিতেছেন)। সংশয়ের হেতুর অনুযোগ (প্রশ্ন) হইলে—বিপ্রতিপত্তিপ্রযুক্ত সংশয় (ইহা বুঝিতে হইবে)। অর্থাৎ শব্দ নিত্য, কি অনিত্য, এইরূপ সংশয়ের হেতু কি? এইরূপ প্রশ্ন হইলে, বিপ্রতিপত্তিপ্রযুক্ত ঐরূপ সংশয় জন্মে—ইহাই তাহার উত্তর বুঝিতে হইবে।

[ শব্দবিষয়ে ঐরূপ সংশয়-প্রয়োজক বিপ্রতিপত্তি প্রদর্শন করিতেছেন ]

(১) শব্দ আকাশের গুণ, বিভূ (সর্বব্যাপী), নিত্য, (উৎপত্তি-বিনাশ শূন্য) অভিব্যক্তিদ্বন্দ্বক অর্থাৎ ব্যক্তক উপস্থিত হইলে শব্দের অভিব্যক্তি হয়, শব্দ উৎপত্তি-ধর্মক নহে, ইহা এক সম্প্রদায় (বুদ্ধমীমাংসক-সম্প্রদায়) বলেন। (২) গন্ধাদির সহবৃত্তি হইয়া অর্থাৎ শব্দ, গন্ধ প্রভৃতি গুণের সহিত মিলিত হইয়া, দ্রব্যে (পৃথিব্যাদি দ্রব্যে) সন্নিবিষ্ট, গন্ধাদির দ্বারা অবস্থিত থাকিয়া অভিব্যক্তিদ্বন্দ্বক, ইহা অপর সম্প্রদায়



( সাংখ্য-সম্প্রদায় ) বলেন । (৩) শব্দ আকাশের গুণ, জ্ঞানের ম্যাদ উৎপত্তি-নিরোধধর্মক, অর্থাৎ উৎপত্তি বিনাশশালী, ইহা অপর সম্প্রদায় ( বৈশেষিক-সম্প্রদায় ) বলেন । (৪) শব্দ মহাভূতের সংকোভ-জন্ম, অনাশ্রিত ( নিরাধার ) উৎপত্তি-ধর্মক, নিরোধধর্মক, অর্থাৎ উৎপত্তি-বিনাশশালী, ইহা অগ্র সম্প্রদায় ( বৌদ্ধ-সম্প্রদায় ) বলেন । অতএব ইহার মধ্যে ( নিত্য ও অনিত্যত্বের মধ্যে ) তদ্ব কি ? অর্থাৎ শব্দ নিত্য, কি অনিত্য ? এইরূপ সংশয় হয় ।

টিপ্পনী । মহর্ষি এই অধ্যায়ের প্রথমার্ধিক শব্দের প্রামাণ্য পরীক্ষা করিয়া, দ্বিতীয়াঙ্কিকের প্রারম্ভে প্রমাণবিভাগের পরীক্ষা করিয়াছেন । কিন্তু শব্দ-পরীক্ষা সমাপ্ত না হওয়ায়, উহা সমাপ্ত করিতেই, এখন শব্দের অনিত্যত্ব পরীক্ষা করিবেন । পরন্তু প্রথমার্ধিকের শেষে মহর্ষি আপ্তব্যক্তি অর্থাৎ বেদকর্তা আপ্তব্যক্তির প্রামাণ্যবশতঃই বেদের প্রামাণ্য বলিয়া-ছেন । কিন্তু যদি শব্দ নিত্য পদার্থই হয়, তাহা হইলে বেদরূপ শব্দাশির কেহ কর্তা থাকিতে পারেন না, তাহার প্রামাণ্যে বেদের প্রামাণ্য বলা যায় না, সুতরাং শব্দের নিত্যত্ব মত বণ্ডন করিয়া, অনিত্যত্ব মতের সংস্থাপনপূর্বক বেদের কর্তা আছেন, বেদ অপৌরুষেয়, নিত্য, ইহা হইতেই পারে না—ইহা সমর্থন করাও মহর্ষির কর্তব্য হইয়াছিল । তাই মহর্ষি বিশেষ বিচার-পূর্বক শব্দের নিত্যত্বপক্ষ বণ্ডন করিয়া, অনিত্যত্বপক্ষের সমর্থন করিয়াছেন । ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, মহর্ষি “আপ্তোদেশঃ শব্দঃ” ( ১।৭ সূত্র )—এই সূত্রে আপ্ত ব্যক্তির উপদেশকে প্রমাণ শব্দ বলিয়াছেন । উপদেশ অর্থাৎ বাক্য নাক্ষকেই প্রমাণ শব্দ বলেন নাই । আপ্তবাক্য হইলেই সেই শব্দের প্রমাণত্ব অর্থাৎ প্রামাণ্য আছে । আপ্তবাক্যরূপ বিশেষণ না থাকিলে শব্দের প্রমাণত্ব ( প্রমাণত্ব ) থাকে না । মহর্ষি শব্দের প্রামাণ্যে ঐ বিশেষণ বলিয়া শব্দ যে নানাপ্রকার, ইহা জানাইয়াছেন । কারণ, শব্দমাত্রই আপ্তবাক্য হইলে মহর্ষি কথিত ঐ বিশেষণ সার্থক হয় না । এবং শব্দমাত্রই যদি এক প্রকারই হয়, তাহাহইলেও শব্দের ভেদ না থাকায় পূর্বোক্ত বিশেষণ সার্থক হয় না । সুতরাং শব্দ যে নানাপ্রকার, ইহা পূর্বোক্ত সূত্রে মহর্ষিকথিত বিশেষণে দ্বারা হুঁচত হইয়াছে । শব্দ বস্তুতে বহু বিশেষ বিচার থাকিলেও সামান্যতঃ শব্দ নিত্য, কি অনিত্য, ইহাই প্রথমতঃ মহর্ষি বিচার করিয়াছেন । “বিচার” শব্দের দ্বারা এখানে পরীক্ষা বুঝিতে হইবে । সংশয় ব্যতীত পরীক্ষা হুঁচ না, শব্দ নিত্য, কি অনিত্য, এইরূপ সংশয়ের হেতু কি ? এইরূপ প্রশ্ন হইলে বিপ্রতিপত্তিই ঐরূপ সংশয়ের হেতু, ইহাই উত্তর বুঝিতে হইবে । তাই ভাষ্যকার এখানে বলিয়াছেন, “বিশর্গহেতুত্বযোগে চ বিপ্রতিপত্তেঃ সংশয়ঃ” । ভাষ্যকারের এই সন্দর্ভকে কেহ কেহ সূত্ররূপে গ্রহণ করিয়াছেন । কোন কোন বুজিত পুস্তকেও ঐ সন্দর্ভ সূত্র-রূপেই উল্লিখিত হইয়াছে । বস্তুতঃ ঐ সন্দর্ভ যে সূত্র, এ বিষয়ে কোন প্রমাণ নাই । তারহুটী-নিবন্ধেও উহা সূত্ররূপে উল্লিখিত হয় নাই । ভাষ্যকারই যে ঐ সন্দর্ভের দ্বারা বিপ্রতিপত্তিকে পূর্বোক্তরূপ সংশয়ের হেতু বলিয়াছেন, ইহা তাৎপর্যটীকাকারের কথার দ্বারাও বুঝা যায় ।

“বিশেষ” শব্দের অর্থ সংশয়। “অনুযোগ” শব্দের অর্থ প্রশ্ন। শব্দ নিত্য, কি অনিত্য?—এইরূপ সংশয়ের হেতু কি? মহাবি প্রথম অধ্যায়ে সংশয়ের যে পঞ্চবিধ হেতু বলিয়াছেন, তন্মধ্যে কোন হেতুবশতঃ এইরূপ সংশয় হয়? এইরূপ প্রশ্ন হইলে তদন্তের বুদ্ধিতে হইবে—“বিপ্রতিপত্তেঃ সংশয়ঃ”।

কোন সম্প্রদায় শব্দকে নিত্য বলিয়াছেন, কোন সম্প্রদায় শব্দকে অনিত্য বলিয়াছেন। সুতরাং শব্দে নিত্যত্বপ্রতিপাদক বাক্য ও অনিত্যত্বপ্রতিপাদক বাক্যরূপ বিপ্রতিপত্তিবাক্য থাকায় তৎপ্রযুক্ত শব্দ কি নিত্য, অথবা অনিত্য? এইরূপ সংশয় জন্মে। ভাষ্যকার ঐ বিপ্রতিপত্তি-বাক্য প্রদর্শন করিতে এখানে চারি সম্প্রদায়ের চারিটি বাক্যের উল্লেখ করিয়াছেন। প্রথমে বুদ্ধ-মীমাংসক-সম্প্রদায়ের বাক্যের উল্লেখ করিয়া, তাঁহাদিগের মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, শব্দ আকাশের গুণ, সর্বব্যাপী, নিত্য; শব্দ উৎপন্ন হয় না,—অভিব্যঞ্জক উপস্থিত হইলে, নিত্য শব্দের অভিব্যক্তি হয়। তাৎপর্যটীকাকার বুদ্ধ-মীমাংসক-সম্প্রদায়ের মত বলিয়া এত মত ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন যে, অভিঘাতপ্রেরিত বায়ু শ্রবণেন্দ্রিয় সমবেত নিত্য শব্দকে অভিব্যক্ত করে। উদ্যোতকর এই মতের সমর্থনে অনুমান বলিয়াছেন যে, শব্দ নিত্য, যেহেতু শব্দের আধার বিনষ্ট হয় না, এবং শব্দ একমাত্র দ্রব্যে সমবেত ও আকাশের গুণ, যেমন আকাশের মহত্ব<sup>১</sup>। এই মতে নিত্য শব্দের অভি-ব্যঞ্জক সংযোগ, বিভাগ ও নাদ। উদ্যোতকরের এই কথায় তাৎ-পর্যটীকাকার বলিয়াছেন যে, ভেরী ও দণ্ডের সংযোগপ্রেরিত বায়ু শ্রবণেন্দ্রিয় প্রাপ্ত হইয়া শব্দের ব্যঞ্জক হয়। এবং বংশের দলহরের বিভাগ-প্রেরিত বায়ু শব্দের ব্যঞ্জক হয়। সংযোগ ও বিভাগ পরস্পর শব্দের ব্যঞ্জক হয়, নাদ সাধাৎ শব্দকে শব্দের ব্যঞ্জক হয়। ভাষ্যকার পরে সাংখ্য-সম্প্রদায়ের বাক্য উল্লেখ করিয়া, তাঁহাদিগের মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, গন্ধ প্রভৃতির আধার পৃথিব্যাদি দ্রব্যে শব্দ থাকে, এবং শব্দ গন্ধাদির জ্ঞান পূর্ব হইতে অবস্থিত থাকিয়াই অভিব্যক্ত হয়। অর্থাৎ গন্ধাদির সহিত পৃথিব্যাদি দ্রব্যে সন্নিবিষ্ট শব্দ গন্ধাদির জ্ঞানই অভিব্যক্ত হয়। উদ্যোতকর এই মত ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন যে, ভূতবিশেষের অভিঘাত শব্দকে অভিব্যক্ত করে। তাৎপর্যটীকাকার ঐ ভূতবিশেষের অভিঘাতের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন, ভেরী-দণ্ডের অভিঘাত। অবশ্য এইরূপ অসঙ্গত অভিঘাতও শব্দের ব্যঞ্জক বুদ্ধিতে হইবে। তাৎপর্যটীকাকার সাংখ্য-মতের ব্যাখ্যায় এখানে বলিয়াছেন যে, পঞ্চতন্মাত্র হইতে উৎপন্ন যে ভূতস্বল্পদ্রবী, তজ্জনিত যে পৃথিবী প্রভৃতি বিকার, তাহাতে গন্ধ প্রভৃতির জ্ঞান শব্দও অবস্থিত থাকে। শ্রবণেন্দ্রিয় অঙ্কুর হইতে উৎপন্ন বলিয়া উহা ব্যাপক, উহা শব্দের আধারেও থাকে, শব্দ ঐ শ্রবণেন্দ্রিয়কে বিকৃত করিয়া অবস্থিত হইয়াই উপলব্ধ হয়। ফলকথা, সাংখ্য-মতে বৈশেষিকমতের জ্ঞান শব্দ উৎপন্ন হইয়া তৃতীয় রূপে বিনষ্ট হইয়া যায় না। উহা গন্ধাদির সহিত মিলিত হইয়া গন্ধাদির জ্ঞানই অভিব্যক্ত

১। একে দাবদ্রুগতে নিত্য শব্দ ইতি অবিনশ্চর্যাদৈকদ্রব্যাকানুগতং, যববিনশ্চর্যাদৈকদ্রব্যাকানু-  
গতং তত্রিত্যং বুদ্ধিঃ, যথাকানুগতং, তথা শব্দতন্মাত্রিত্য ইতি। সাংখ্য-নিত্যঃ সন্নতিবাক্তিবৎ, তত্তাভিব্যঞ্জকঃ  
সংযোগবিভাগনাং ইতি।—জায়বাস্তবিক।



হয়। বৈশেষিক মতে শব্দ আকাশে উৎপন্ন হইয়া আকাশেই বিনষ্ট হয়। বীচি-তরঙ্গের স্থায় এক শব্দ হইতে শব্দান্তর উৎপন্ন হয়, সেই শব্দ হইতে অপর শব্দ উৎপন্ন হয়; এইরূপে শ্রোতার প্রবণদেশে উৎপন্ন শব্দই শ্রোতা প্রবণ করে। মূলকথা, বৈশেষিক মতে শব্দ উৎপত্তি-বিনাশ-শালী, স্তব্ধাংশ অনিত্য। বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ের মতে বস্তুমাত্রই কণিক, অর্থাৎ প্রথম কণে উৎপন্ন হইয়া দ্বিতীয় কণেই বিনষ্ট হয়। স্তব্ধাংশ শব্দও ঐরূপ উৎপত্তিবিনাশশালী বলিয়া অনিত্য। তাঁহাদিগের মতে মহাকূতের<sup>১</sup> সংকোভ অর্থাৎ বিকার-বিশেষ হইলে শব্দ উৎপন্ন হয়। ভাষাকারোক্ত চারিটি মতের মধ্যে প্রথমোক্ত দুই মতে শব্দ অভিব্যক্তিদ্বন্দ্বক, শেষোক্ত দুই মতে শব্দ উৎপত্তিদ্বন্দ্বক। ভাষাকার শব্দের নিত্যত্ব ও অনিত্যত্ব-মত-প্রতিপাদক বিপ্রতিপত্তিবাক্য প্রদর্শন করিয়া শেষে তাঁহার প্রতিপাদ্য বলিয়াছেন যে—অতএব অর্থাৎ এই সকল বিপ্রতিপত্তিবাক্য-প্রযুক্ত শব্দের নিত্যত্বই তব্ব অথবা অনিত্যত্বই তব্ব? অর্থাৎ শব্দ নিত্য, কি অনিত্য?—এইরূপ সংশয় জন্মে। মহর্ষি গোতম বিশেষ বিচারপূর্বক শব্দের অনিত্যত্ব পরীক্ষা করিয়াছেন, কিন্তু সংশয় ব্যতীত পরীক্ষা হয় না, সংশয় পরীক্ষার অঙ্গ, এ জন্য ভাষাকার এখানে প্রথমে সেই সংশয় প্রদর্শন ও তাহার কারণ প্রদর্শন করিয়াছেন। ভাষাকারোক্ত বিপ্রতিপত্তিবাক্য-প্রযুক্ত মধ্যস্থগণের সংশয় হয়—শব্দ কি নিত্য? অথবা অনিত্য?

ভাষ্য। অনিত্যঃ শব্দ ইত্যন্তরং। কথং?—

অনুবাদ। শব্দ অনিত্য, ইহা উত্তর অর্থাৎ শব্দের অনিত্যত্বই উত্তরপক্ষ বা সিদ্ধান্ত। (প্রশ্ন) কি প্রকারে? অর্থাৎ শব্দ যে অনিত্য, ইহা কিরূপে বুঝিব?

সূত্র। আদিমভূতৈন্দ্রিয়কত্বাৎ কৃতকবহুপচারাস্ত ॥

॥১৩॥১৪২ ॥

অনুবাদ। ( উত্তর ) উৎপত্তিমবহেতুক, ইন্দ্রিয়গ্রাহকহেতুক এবং কৃতক অর্থাৎ কার্য বা অনিত্য সৃষ্টি-খাদির স্থায় ব্যবহারহেতুক [ শব্দ অনিত্য ]।

ভাষ্য। আদির্ধোনিঃ কারণং, আদীয়তেহস্মাদিতি। কারণবদনিত্যং দৃষ্টং। সংযোগবিভাগজশ্চ শব্দঃ কারণবস্তাদনিত্য ইতি। কা

১। মূল পঞ্চভূতই অনেক স্থানে মহাকূত নামে কথিত হইলেও পৃথিবী এবং আকাশও কোন কোন স্থলে মহাকূত নামে কথিত হইয়াছে। তাৎপর্যসীকার এক স্থানে ( ২ অঃ,—১ অঃ, ৩৭ শ্লোকের টীকার ) মহাকূতের সংকোভকে বুঝির মূল কারণ বলিয়া, সেখানে পৃথিবীর সংকোভকেই মহাকূতসংকোভ বলিয়াছেন, বুঝা যায়। মহাকূতের সংকোভ জন্ত শব্দ জন্মে—ইহা বৌদ্ধমত বলিয়া তাৎপর্যসীকার লিখিয়াছেন, কিন্তু কোন ব্যাখ্যা করেন নাই। সর্ববর্ণন-সংগ্রহে মাধবাচার্য্য বৌদ্ধমত ব্যাখ্যায় আকাশকেই শব্দের কারণ বলিয়াছেন। শারীরকভাবে আচার্য্য শব্দের বৌদ্ধমতে আকাশও যে অসং নহে—ইহা শেষে বৌদ্ধগ্রন্থের দ্বারাও সমর্থন করিয়াছেন। আকাশরূপ মহাকূতের সংকোভ জন্ত শব্দ জন্মে, ইহাও এখানে ব্যাখ্যা করা যায়। ভাষাকার পাঁচান বৌদ্ধমতেরই উল্লেখ করিয়াছেন, বুঝা যায়।

পুনরিয়মর্থদেশনা? কারণবদ্ধাদিতি উৎপত্তিধর্মকত্বাৎ, অনিত্যঃ শব্দ ইতি ভূহা ন ভবতি, বিনাশধর্মক ইতি ।

সাংশয়িকমেতৎ, কিমুৎপত্তিকারণং সংযোগবিভাগৌ শব্দস্য, আহোষিদ্ভিব্যক্তিকারণমিত্যত আহ—“ঐন্দ্রিয়কত্বাৎ”, ইন্দ্রিয়প্রত্যাসক্তি-গ্রাহ ঐন্দ্রিয়কঃ ।

কিময়ং ব্যঞ্জকেন সমানদেশোহভিব্যজ্যতে রূপাদিবৎ? অথ সংযোগজ্ঞাৎ শব্দাৎ শব্দসম্বন্ধে সতি শ্রোত্রপ্রত্যাসন্নো গৃহ্যত ইতি । সংযোগনিবৃত্তৌ শব্দগ্রহণাম্ ব্যঞ্জকেন সমানদেশস্য গ্রহণং । দারুত্রশচনে দারু-পরশু-সংযোগনিবৃত্তৌ দূরত্বেন শব্দো গৃহ্যতে, ন চ ব্যঞ্জকাভাবে ব্যঙ্গ্যগ্রহণং ভবতি, তন্মাম ব্যঞ্জকঃ সংযোগঃ । উৎপাদকে তু সংযোগে সংযোগজ্ঞাৎ শব্দাৎ শব্দসম্বন্ধে সতি শ্রোত্র-প্রত্যাসন্নস্য গ্রহণমিতি যুক্তং সংযোগনিবৃত্তৌ শব্দস্য গ্রহণমিতি ।

ইতশ্চ শব্দ উৎপাদ্যতে নাভিব্যজ্যতে, “কৃতকবচুপচারাত্” । তীত্রঃ মন্দমিতি কৃতকমুপচর্য্যতে, তীত্রঃ স্ত্রং মন্দং স্ত্রং, তীত্রঃ চুঃখং মন্দং চুঃখমিতি । উপচর্য্যতে চ তীত্রঃ শব্দো মন্দঃ শব্দ ইতি ।

অনুবাদ । “আদি” বলিতে যোনি, কারণ, ইহা হইতে গৃহীত হয়, ( অর্থাৎ যাহা হইতে কার্য্যের আদান বা প্রাপ্তি হয়—এই অর্থে সূত্রে “আদি” শব্দের দ্বারা কারণ বুঝিতে হইবে ) কারণবিশিষ্ট বস্তু অনিত্য দেখা যায় । সংযোগ-জ্ঞাত ও বিভাগ-জ্ঞাত শব্দ কারণবদ্ধহেতুক অনিত্য । ( প্রশ্ন ) এই অর্থব্যাখ্যা কি?—অর্থাৎ “কারণ-বদ্ধাৎ”—এই হেতুবাক্যের এবং “অনিত্যঃ শব্দঃ”—এই প্রতিজ্ঞাবাক্যের অর্থব্যাখ্যা কি? ( উত্তর ) কারণবদ্ধহেতুক—এই কথার দ্বারা ( বুঝিতে হইবে ) উৎপত্তি-ধর্মকবহেতুক । “শব্দ অনিত্য” এই কথার দ্বারা ( বুঝিতে হইবে ) উৎপন্ন হইয়া থাকে না—বিনাশধর্মক [ অর্থাৎ শব্দ উৎপন্ন হইয়া বিনষ্ট হয়,—উৎপন্ন শব্দের বিনাশিই শব্দের অনিত্যতা । শব্দ উৎপন্ন হইয়া বিনষ্ট হয়—ইহাই শব্দ অনিত্য, এই প্রতিজ্ঞা-বাক্যের অর্থ ] ।

ইহা সন্দ্বিদ্ধ, সংযোগ ও বিভাগ কি শব্দের উৎপত্তির কারণ? অথবা অভিব্যক্তির কারণ? এ জ্ঞাত ( মহাবি ) বলিয়াছেন, “ঐন্দ্রিয়কত্বাৎ” ইন্দ্রিয়ের সহিত সন্নিবন্ধের দ্বারা গ্রাহ “ঐন্দ্রিয়ক”, [ অর্থাৎ যে পদার্থ ইন্দ্রিয়-সন্নিবন্ধ হইলে গৃহীত



( প্রত্যক্ষ ) হয়, তাহাকে ঐন্দ্রিয়ক বলে । শব্দ যখন ঐন্দ্রিয়ক পদার্থ, তখন তাহা উৎপন্নই হয়, তাহা উৎপত্তিধর্ম্যক, অভিব্যক্তিধর্ম্যক নহে ] ।

( প্রশ্ন ) এই শব্দ কি রূপাদির শ্যাম ব্যঞ্জকের সহিত সমানদেশস্থ হইয়া অভিব্যক্ত হয় ? অথবা সংযোগজাত শব্দ হইতে শব্দের প্রবাহ হওয়ায় অর্থাৎ বীচি-তরঙ্গের শ্যাম প্রথম শব্দ হইতে দ্বিতীয় শব্দ, দ্বিতীয় শব্দ হইতে তৃতীয় শব্দ—এইরূপে বহু শব্দ উৎপন্ন হওয়ায়, শ্রবণেন্দ্রিয়ের সহিত সন্নিবিষ্ট ( শব্দ ) গৃহীত হয় ? ( উত্তর ) সংযোগের নিবৃত্তি হইলে শব্দের প্রত্যক্ষ হয়, এ জগৎ ব্যঞ্জকের ( ব্যঞ্জক বলিয়া স্বীকৃত সংযোগের ) সহিত সমানদেশস্থ শব্দের প্রত্যক্ষ হয় না । বিশদার্থ এই যে, কাষ্ঠ ছেদনকালে কাষ্ঠ ও কুঠারের সংযোগনিবৃত্তি হইলে দূরস্থ ব্যক্তি কর্তৃক শব্দ গৃহীত ( শ্রুত ) হয় । যেহেতু ব্যঞ্জক না থাকিলে ব্যঙ্গ্যের জ্ঞান হয় না, অতএব সংযোগ ব্যঞ্জক নহে । সংযোগ উৎপাদক হইলে কিন্তু—অর্থাৎ কাষ্ঠ-কুঠারাদির সংযোগকে শব্দের ব্যঞ্জক না বলিয়া, শব্দের উৎপাদক বলিলে, সংযোগজাত শব্দ হইতে শব্দের প্রবাহ হওয়ায় শ্রবণেন্দ্রিয়ের সহিত সন্নিবিষ্ট শব্দের প্রত্যক্ষ হয়, এ জগৎ সংযোগনিবৃত্তি হইলে শব্দের প্রত্যক্ষ যুক্ত । [ অর্থাৎ, সংযোগকে শব্দের ব্যঞ্জক বলিলে শব্দের প্রত্যক্ষরূপ অভিব্যক্তিকালে ঐ সংযোগের সত্তা আবশ্যক হয় । কিন্তু সংযোগ শব্দের উৎপাদক হইলে, ঐ সংযোগ বিনষ্ট হইলেও শব্দের প্রত্যক্ষ হইতে পারে । ]

কার্য পদার্থের শ্যাম ব্যবহার, এই হেতুবশতঃও শব্দ উৎপন্ন হয়, অভিব্যক্ত হয় না । কৃতক অর্থাৎ কার্য বা উৎপন্ন পদার্থ তীত্র, মন্দ, এইরূপে ব্যবহৃত হয় । ( যেমন ) তীত্র সুখ, মন্দ সুখ, তীত্র দুঃখ, মন্দ দুঃখ । ( শব্দও ) তীত্র শব্দ, মন্দ শব্দ, এইরূপে ব্যবহৃত হয় ।

টিপ্পনী । শব্দ নিত্য, কি অনিত্য ? এইরূপ সংশয়ে শব্দের অনিত্যত্বপক্ষেই মহর্ষি গোতমের সিদ্ধান্ত । বৌদ্ধসংস্কৃত-সম্প্রদায় শব্দের নিত্যত্বপক্ষেই সন্ধান করিয়াছেন । মহর্ষি গোতমের সিদ্ধান্তে উহা পূর্ণপক্ষ । মহর্ষি গোতম ঐ পূর্ণপক্ষের নিরাস করিয়া নিজ সিদ্ধান্তের সংস্থাপন করিয়াছেন । ভাষ্যকার “অনিত্যঃ শব্দ ইত্যুক্তরং” এই সন্দর্ভের দ্বারা মহর্ষি গোতমের উক্ত বা সিদ্ধান্ত-প্রকাশ-পূর্বক “কথং” এই বাক্যের দ্বারা প্রশ্ন প্রকাশ করিয়া, তৎক্ষণে মহর্ষি-স্বত্বের অবতারণা করিয়াছেন । মহর্ষি শব্দের অনিত্যত্বসাধনে হেতুবাক্য বলিয়াছেন,—“অ’দিমক্কাং” । মহর্ষি শব্দ অনিত্য—এইরূপে সাধানির্দেশ না করিলেও তাঁহার কথিত হেতুবাক্যের দ্বারা এবং পরবর্তী অন্তঃস্থ সূত্রের দ্বারা শব্দে অনিত্যত্বই যে তাঁহার সাধ্য, ইহা বুঝা যায় । পরে ইহা ব্যক্ত হইবে । সূত্রে “আদিদক্কাং” এই বাক্যে “আদি” শব্দের অর্থ কারণ । তাই ভাষ্যকার প্রশ্নে



“আদিগোনিঃ” এই কথা দ্বারা “আদি” শব্দের অর্থ “গোনি”—ইহা বলিয়া, আবার “কারণঃ” বলিয়া ঐ “গোনি” শব্দের অর্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অর্থাৎ “আদি” শব্দের দ্বারা এখানে “গোনি” বুঝিতে হইবে। “গোনি” শব্দের অর্থ এখানে কারণ। “আদি” শব্দের দ্বারা কারণ অর্থ বিকল্পে বুঝা যায়, ইহা বুঝাইতে ভাষাকার শেষে ইহাও বলিয়াছেন যে, “ইহা হইতে গৃহীত হই” — এইরূপ ব্যুৎপত্তি অনুসারে “আদি” শব্দের দ্বারা কারণ অর্থ বুঝা যায়। আত্মপূর্বক দা-বাত্ত হইতে “আদি” শব্দ সিদ্ধ হয়। আত্মপূর্বক দা-বাত্ত দ্বারা আদান, অর্থাৎ গ্রহণ অর্থ বুঝা যায়। কারণ হইতে কার্যকে গ্রহণ করা বা প্রাপ্ত হওয়া যায়, এই তাৎপর্য্যে ভাষাকার “আদি” শব্দের ঐরূপ ব্যুৎপত্তি নির্দেশপূর্বক “আদি” শব্দের কারণ অর্থ সমর্থন করিতে পারেন। পরন্তু কার্য ও কারণের মধ্যে, কারণ আদি; কার্য শেষ। সুতরাং কারণ অর্থে “আদি” শব্দ প্রযুক্ত হইতে পারে। প্রাচীনগণ কারণ অর্থে “পূর্ব” শব্দ ও কার্য অর্থে শেষ শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন, ইহা আমরা পক্ষান্তরে “পূর্ববৎ” ও “শেষবৎ” অনুমানের ব্যাখ্যায় পাইয়াছি; সুতরাং কারণ অর্থে “পূর্ব” শব্দের দ্বারা “আদি” শব্দও প্রযুক্ত হইতে পারে। “আদি” শব্দের কারণ অর্থ বুঝিলে সুত্রোক্ত “আদিমবৎ” শব্দের দ্বারা বুঝা যায় কারণবৎ। বাহার আদি অর্থাৎ কারণ আছে, তাহা আদিমান অর্থাৎ কারণবিশিষ্ট। সংযোগ ও বিভাগরূপ কারণের দ্বারা শব্দ জন্মে, সুতরাং শব্দ কারণবিশিষ্ট পদার্থ। শব্দ কারণবিশিষ্ট পদার্থ কেন? ইহা বুঝাইতে ভাষাকার “সংযোগবিভাগজন্ত শব্দঃ”—এই কথা বলিয়াছেন। ঐ স্থলে “চ” শব্দের দ্বারা হেতু অর্থ প্রকট হইয়াছে। যেহেতু, শব্দ সংযোগ ও বিভাগরূপ কারণজন্ত, অতএব শব্দ কারণবিশিষ্ট, কারণবিশিষ্ট বলিয়া শব্দ অনিত্য। কারণবিশিষ্ট পদার্থমাত্রই অনিত্য দেখা যায়। যেমন, ঘট-পটাদি অনিত্য পদার্থ। কলকথা, মহর্ষি-সুত্রোক্ত “আদিমবৎ” এই হেতুবাক্যের ব্যাখ্যা “কারণবৎ”। “অনিত্যঃ শব্দঃ”—ইহাই মহর্ষির অভিপ্রেত প্রতিজ্ঞাবাক্য। ভাষাকারোক্ত “কারণবদনিত্যং নৃষ্টং”—এই বাক্যই মহর্ষির অভিপ্রেত উদাহরণবাক্য। পরাগ্রাহ্যমানে পূর্বোক্তরূপ প্রতিজ্ঞাদি পক্ষাবয়বের প্রয়োগ করিয়া শব্দের অনিত্য সাধন করিতে হইবে। প্রথম অধ্যায়ে অবয়ব-প্রকরণে (৩৯ সূত্র-ভাষ্যে) ভাষাকার শব্দের অনিত্য সাধনে পক্ষাবয়ব বাক্য প্রদর্শন করিয়াছেন। সেখানে “উৎপত্তিধ্বংসকল্পঃ” এইরূপ বাক্যকেই হেতুবাক্য বলিয়াছেন। বস্তুতঃ এখানেও ভাষাকারোক্ত “কারণবৎ” এই হেতুবাক্যের ব্যাখ্যা “উৎপত্তিধ্বংসকল্পঃ”। তাই ভাষাকার পরেই তাহার কথিত হেতুবাক্যের উল্লেখ করিয়া তাহার ঐরূপই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এবং “অনিত্যঃ শব্দঃ” এই প্রতিজ্ঞাবাক্যে “অনিত্য” শব্দের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন “ভূত্বা ন ভবতি”। অতএব অর্থ প্রকাশ করিতে যেমন “নাস্তি” এই বাক্য বলা হয়, তদ্রূপ “ন ভবতি” এইরূপ বাক্যও প্রাচীনগণ প্রয়োগ করিতেন। “অস্তি” বা “বিদ্যতে” এইরূপ অর্থে “ভূ-বাত্ত-নিম্পন্ন “ভবতি” এইরূপ বাক্যেরও প্রয়োগ প্রাচীনগণ করিতেন। ইহাও প্রথম অধ্যায়ে অবয়ব-প্রকরণে ভাষাকার ও উদ্যোতকের প্রয়োগের দ্বারা বুঝা যায়। মূলকথা, “ন ভবতি” ইহার ব্যাখ্যা “নাস্তি”। তাহা হইলে “ভূত্বা ন ভবতি” এই কথার দ্বারা এখানে বুঝা যায়, উৎপন্ন হইয়া বিদ্যমান থাকে না। ভাষাকার এই অর্থই পরিস্ফুট



করিয়া বলিতে, তাহার “ভূহা ন ভবতি”—এই পূর্বকথারই ব্যাখ্যারূপে বলিয়াছেন, “বিনাশ-  
ধর্মকঃ”<sup>১</sup>। অর্থাৎ শব্দ অনিত্য, এই কথা দ্বারা বুঝিতে হইবে, শব্দ উৎপন্ন হইয়া বিদ্যমান  
থাকে না; শব্দ বিনাশধর্মক। বাহার উৎপত্তি হয়, তাহাকে বলে উৎপত্তিধর্মক। বাহার  
বিনাশ হয়, তাহাকে বলে বিনাশধর্মক। শব্দ উৎপন্ন হইয়া বিদ্যমান থাকে না, এই কথা  
দ্বারা প্রকটিত হইয়াছে যে, শব্দ উৎপত্তিধর্মক ও বিনাশধর্মক। উৎপন্ন শব্দের অভাব বলিয়া ঐ  
অভাব যে ধ্বংস বা বিনাশ, ইহাও প্রকটিত হইয়াছে। ফলকথা, শব্দ অনিত্য অর্থাৎ শব্দ  
উৎপন্ন হইয়া বিনষ্ট হয়, যেহেতু শব্দ উৎপত্তিধর্মক, ইহাই ভাষ্যকারের ব্যাখ্যাত ফলিতার্থ।  
ভাষ্যকার “কারণব্যাং” এই হেতুবাক্য এবং শব্দ অনিত্য, এই প্রতিজ্ঞা-বাক্যের পূর্বোক্তরূপ  
অর্থদেশনা (অর্থব্যাখ্যা) বলিয়াছেন। উৎপত্তিধর্মক হইলেও ধ্বংসরূপ অভাবপদার্থে  
বিনাশিত্বরূপ অনিত্যতা না থাকায় ব্যক্তির হয়, ইহা পরে আলোচিত হইবে।

মহাবিশ্বের অনিত্যত্বসাধনে যে আদিমত্ব অর্থাৎ উৎপত্তিধর্মকত্বকে হেতু বলিয়াছেন, উহা  
শব্দে সিদ্ধ হওয়া আবশ্যক। শব্দে উৎপত্তিধর্মকত্ব প্রমাণ দ্বারা নিশ্চিত না হইলে, উহার দ্বারা  
শব্দে অনিত্যত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না। নীমাংসক-সম্প্রদায় শব্দের উৎপত্তি স্বীকার করেন নাই।  
তাহাদিগের মতে সংযোগ ও বিভাগের দ্বারা পূর্বস্থিত নিত্য শব্দ অভিব্যক্ত হয়, উৎপন্ন হয় না।  
তাহা হইলে বিপ্রতিপত্তিবশতঃ সংযোগ ও বিভাগ শব্দের উৎপাদক অথবা অভিব্যক্তক, ইহা  
সন্দিগ্ধ হওয়ার শব্দে উৎপত্তিধর্মকত্ব সন্দিগ্ধ। সন্দিগ্ধ পদার্থ সাধ্যসাধক না হওয়ার, তাহা হেতুই  
হয় না। এই জন্যই মহর্ষি আবার বলিয়াছেন, “ঐন্দ্রিয়কত্বাং” এবং “কৃতকবহুপচারং”। বুদ্ধিকার  
বিখনাথ প্রভৃতি নব্যগণ মহর্ষিহস্তোক্ত হেতুত্রয়কেই শব্দের অনিত্যত্বসাধকরূপে ব্যাখ্যা করিয়া-  
ছেন; এবং নরলভাবে তাহাই মহর্ষির অভিপ্রেত বুঝা যায়। কিন্তু ভাষ্যকার মহর্ষির দ্বিতীয় ও  
তৃতীয় হেতুকে তাহার প্রথম হেতুর অর্থাৎ উৎপত্তিধর্মকত্বেরই সমর্থকরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন।  
ভাষ্যকারের কথা এই যে, বাহ্য ঐন্দ্রিয়ের সন্নিবর্তন হইলে বুঝা যায়, তাহাকে বলে ‘ঐন্দ্রিয়ক’। শব্দ  
বখন ঐন্দ্রিয়ক পদার্থ, তখন তাহা অভিব্যক্তিধর্মক হইতে পারে না, তাহা উৎপত্তিধর্মক।  
উদ্যোতকর ইহার বুদ্ধি বলিয়াছেন যে, শব্দকে অভিব্যক্ত পদার্থ বলিলে তাহার সহিত শ্রবণেন্দ্রিয়ের  
সন্নিবর্তন হইতে পারে না। কারণ, শ্রবণেন্দ্রিয় অমূর্ত পদার্থ; সুতরাং তাহা শব্দস্থানে গমন  
কর্ত্তিতে পারে না। শব্দের উৎপত্তি স্বীকার করিলে বোচিতরত্নের দ্বায় শব্দ হইতে শব্দান্তরের

১। ভাষ্যকার প্রথম অধ্যায়ে ৩০ পুত্রভাব্যে অনিত্যতা ব্যাখ্যা করিতে বলিয়াছেন, “তচ্চ ভূহা ন ভবতি জ্ঞানায়  
জহতি নিরুপাত ইত্যনিভাং” সেখানে “তাহা বিদ্যমান থাকিয়া, অর্থাৎ উৎপত্তির পূর্বে যে কোনরূপে বিদ্যমান  
থাকিয়া উৎপন্ন হয় না”, এইরূপই “তচ্চ ভূহা ন ভবতি” এই অংশের অর্থবাদ করা হইয়াছে। অসু খাতু-নিপ্পন্ন “ভূহা”  
এই অংশের দ্বারা ঐক্লপ অর্থ বুঝাইতে পারে এবং “ভূহা ন ভবতি” এই কথা দ্বারা নৈসর্গিকসম্প্রদায়ের  
কার্যবাহক হুত্বিত হইতে পারে। কিন্তু ভাষ্যকারের অন্ত্যস্ত সন্দর্ভের পর্যালোচনার দ্বারা “ভূহা ন ভবতি” এই কথা  
দ্বারা উৎপন্ন হইয়া থাকে না, অর্থাৎ উৎপত্তির পরে বিনষ্ট হয়—এইরূপ অর্থই ভাষ্যকারের বিবক্ষিত বলিয়া বোধ হওয়ার  
এখানে ঐক্লপই অর্থবাদ করা হইল। এইরূপ ব্যাখ্যায় প্রথম অধ্যায়ে পূর্বোক্ত “জ্ঞানায় জহতি ও নিরুপাত”  
এই বাক্যের ভাষ্যকারের প্রথমোক্ত “ভূহা ন ভবতি” এই কথাটির বিবরণ বুঝিতে হইবে।



উৎপত্তিক্রমে শ্রোতার শ্রবণদেশে উৎপন্ন শব্দের সহিত শ্রবণেন্দ্রিয়ের সন্নির্কর্ষ হইতে পারায় ঐ শব্দের প্রত্যক্ষ হইতে পারে। সুতরাং শব্দ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থ বলিয়া, অর্থাৎ শ্রবণেন্দ্রিয়ের দ্বারা শব্দের প্রত্যক্ষ হয় বলিয়া, শব্দ অভিব্যক্তিবিশেষ নহে—শব্দের উৎপত্তি হয়, ইহা ঐ স্বীকার্য। এবং সুখ দুঃখ প্রভৃতি অনিত্য পদার্থে যেমন তীব্রতা ও মন্দতার ব্যবহার হয়, শব্দও ঐরূপ ব্যবহার হইয়া থাকে। অর্থাৎ, যেমন সুখ ও দুঃখে তীব্রতা ও মন্দতার বোধ হয়, তদ্রূপ শব্দও তীব্রতা ও মন্দতার বোধ হওয়ার বুঝা যায়—সুখ দুঃখের জায় শব্দও তীব্রতা ও মন্দতারূপ ধর্ম থাকে। শব্দের উৎপত্তি স্বীকার না করিলে, তাহা নানাজাতীয় হইতে না পারায়, শব্দ তীব্রতা ও মন্দতার উপপত্তি হয় না। পরে ইহা ব্যক্ত হইবে। ফলকথা, শব্দ তীব্র ও মন্দ, এইরূপ ব্যবহার বা বার্থা জ্ঞানের বিষয় হওয়ার বুঝা যায়, শব্দ অভিব্যক্তিবিশেষ নহে—শব্দ উৎপত্তিবিশেষ। উদ্যোতক মহর্ষির দ্বিতীয় হেতুকে প্রথম হেতুর সমর্থকরূপে ব্যাখ্যা করিলেও তৃতীয় হেতুকে শব্দের অনিত্যত্বের সাধকরূপেই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এবং তিনি ইহাও বলিয়াছেন যে, “কৃতকব-চুপচারাং”, এই অংশের দ্বারা শব্দের অনিত্যত্বসাধক সমস্ত হেতুরই সংগ্রহ হইয়াছে। উদ্যোতক ইহা বলিয়া শব্দের অনিত্যত্বসাধক আরও কয়েকটি হেতু বলিয়াছেন<sup>১</sup>।

ভাষ্যকার এখানে শব্দের উৎপত্তিবিশেষকর্তৃ সমর্থন করিতে প্রবৃত্তি করিয়াছেন যে, রূপাদি যেমন তাহার ব্যঞ্জকের সহিত একদেশস্থ হইয়া ব্যঞ্জকের দ্বারা অভিব্যক্ত হয়, শব্দও কি তদ্রূপ অভিব্যক্ত হয়? অথবা কোন সংযোগজাত শব্দ হইতে শব্দের প্রবাহ ক্রিয়ায় শ্রবণদেশে উৎপন্ন শব্দের প্রত্যক্ষ হয়? এতদ্বত্তরে ভাষ্যকার ধ্বনিরূপ শব্দকে উদাহরণরূপে গ্রহণ করিয়া বুঝাইয়াছেন যে, কাঠ ও কুঠারের সংযোগকে শব্দবিশেষের উৎপাদকই বলিতে হইবে। কাঠ ও কুঠারের বিলক্ষণ সংযোগ হইতে প্রথম যে শব্দ উৎপন্ন হয়, তাহা হইতে (তরঙ্গ হইতে অপর তরঙ্গের জায়) অপর শব্দ উৎপন্ন হয়, এইরূপে সেই শব্দ হইতে অপর শব্দ, সেই শব্দ হইতে আবার অপর শব্দ উৎপন্ন হয়। এইরূপে শ্রবণদেশে যে শব্দটি উৎপন্ন হয়, তাহার সহিত শ্রবণেন্দ্রিয়ের প্রত্যাসক্তি, অর্থাৎ সন্নির্কর্ষবিশেষ হওয়ার ঐ শব্দের প্রত্যক্ষ হইতে পারে। পূর্বোক্ত ক্রমে উৎপন্ন শব্দসমষ্টির নাম শব্দসম্মান। নিত্য শব্দ পূর্ব হইতেই অবস্থিত আছে, কাঠ-কুঠারের সংযোগ-বিশেষ তাহাকে অভিব্যক্ত করে, অর্থাৎ তাহার শ্রবণজ্ঞানরূপ অভিব্যক্তির কারণ হয় ইহা বলা যায় না। কারণ, ঐ শব্দের শ্রবণকালে কাঠ-কুঠারের সংযোগ থাকে না। ঐ সংযোগের নিবৃত্তি হইলেই দ্রুত ব্যক্তি তখন ঐ শব্দ শ্রবণ করে। সুতরাং ঐ সংযোগকে ঐ শব্দের ব্যঞ্জক বলা যায় না; উহাকে ঐ শব্দের উৎপাদকই বলিতে হইবে। (প্রথম অধ্যায়ে ৩য় আদিক, ২ম সূত্র-ভাষ্য

১। আর ৫ প্রমাণ, অনিত্য শব্দ: তীব্রত্ববিবর্তন, স্বল্পত্ববিস্তৃতি। কৃতকবচুপচারাংকিতানেন সূত্রেণ সর্ব-নিত্যত্বসাধনবর্ণন-সংগ্রহঃ, কৃতকবচুপচারাংকিতানেন সূত্রেণ সর্ব-নিত্যত্বসাধনবর্ণন-সংগ্রহঃ, কৃতকবচুপচারাংকিতানেন সূত্রেণ সর্ব-নিত্যত্বসাধনবর্ণন-সংগ্রহঃ, কৃতকবচুপচারাংকিতানেন সূত্রেণ সর্ব-নিত্যত্বসাধনবর্ণন-সংগ্রহঃ, কৃতকবচুপচারাংকিতানেন সূত্রেণ সর্ব-নিত্যত্বসাধনবর্ণন-সংগ্রহঃ।—ভাষ্যকারিক।

উদ্যোতক ও বিশ্বনাথ প্রভৃতির বাখ্যামুসারেই প্রথম অধ্যায়ে ৩৬ সূত্র-ভাষ্য টিপণীর শেষে “শব্দে অনিত্যত্বের অধুমান উৎপত্তিবিশেষকর্তৃ চরম হেতু নহে” ইত্যাদি কথা লিখিত হইয়াছে।



টিপ্পনী প্রভৃতি)। ভাষ্যকার ধ্বনিরূপ শব্দস্থলে সংযোগের শব্দব্যঞ্জকতা ধ্বন করিয়া, বর্ণায়ক শব্দ স্থলেও কণ্ঠ তালু প্রভৃতির অভিধাত বর্ণের ব্যঞ্জক হইতে পারে না, ইহা বর্ণের উৎপাদকই বলিতে হইবে—ইহাও জ্ঞাপন করিয়াছেন। যেমন, ধ্বনিরূপ শব্দ উৎপত্তিধর্মক, তদ্রূপ বর্ণায়ক শব্দও উৎপত্তিধর্মক, ধ্বনি উৎপন্ন হয়, কিন্তু বর্ণ নিতা, ইহা হইতে পারে না—ইহা বলিতেই ভাষ্যকার এখানে ধ্বনির উৎপত্তিধর্মকত্ব সমর্থন করিয়াছেন। ধ্বনিকে দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করিয়া ভাষ্যকারোক্ত হেতুর দ্বারা এবং অস্বাভাব্য হেতুর দ্বারা বর্ণায়ক শব্দের উৎপত্তিধর্মকত্ব সমর্থন করিতে হইবে—ইহাই ভাষ্যকারের অভিসন্ধি।

ভাষ্য। ব্যঞ্জকস্য তথাভাবাদ্গ্রহণস্য তীত্রমন্দতারূপব-  
দিতি চেন্ন অভিভবোপপত্তেঃ। সংযোগস্ত ব্যঞ্জকস্ত তীত্রমন্দতয়া  
শব্দগ্রহণস্ত তীত্রমন্দতা ভবতি, ন তু শব্দো ভিদ্যতে, যথা প্রকাশস্ত  
তীত্রমন্দতয়া রূপগ্রহণস্তেতি, তচ্চ নৈবমভিভবোপপত্তেঃ। তত্রো  
ভেরীশব্দো মন্দং তত্রীশব্দমভিভবতি, ন মন্দঃ। ন চ শব্দগ্রহণ-  
মভিভাবকং, শব্দশ্চ ন ভিদ্যতে, শব্দে তু ভিদ্যামানে যুক্তোহভিভবঃ,  
তস্মাদুৎপাদ্যতে শব্দো নাভিব্যজ্যত ইতি।

অনুবাদ। (পূর্বপক্ষ) ব্যঞ্জকের তথাভাব অর্থাৎ তীত্রতা ও মন্দতাবশতঃ  
রূপের স্থায় (রূপজ্ঞানের স্থায়) গ্রহণের অর্থাৎ শব্দজ্ঞানের তীত্রতা ও মন্দতা  
হয়, ইহা যদি বল ? (উত্তর) না, অর্থাৎ তাহা বলা যায় না; যেহেতু, অভিভবের  
উপপত্তি হয়। বিশদার্থ এই যে, (পূর্বপক্ষ) সংযোগরূপ ব্যঞ্জকের তীত্রতা ও  
মন্দতাবশতঃ শব্দজ্ঞানের তীত্রতা ও মন্দতা হয়; কিন্তু শব্দ ভিন্ন নহে। যেমন,  
আলোকের তীত্রতা ও মন্দতাবশতঃ রূপজ্ঞানের তীত্রতা ও মন্দতা হয়। (উত্তর)  
তাহাও নহে; যেহেতু, এইরূপ হইলে, অর্থাৎ পূর্বোক্তপ্রকারে শব্দের উৎপত্তি  
স্বীকার করিয়া শব্দসম্মান স্বীকার করিলে অভিভবের উপপত্তি হয়। [তাৎপর্য্য  
এই যে] তীত্র ভেরীশব্দ মন্দ বীণাশব্দকে অভিভব করে, মন্দ ভেরীশব্দ তীত্র  
বীণা-শব্দকে অভিভব করে না। শব্দের জ্ঞানও অভিভাবক হয় না, (পূর্বপক্ষীর মতে)  
শব্দও ভিন্ন নহে, শব্দ ভিন্ন হইলে কিন্তু,—অর্থাৎ নানাজাতীয় বিভিন্ন শব্দের উৎপত্তি  
স্বীকার করিলেই অভিভব উপপন্ন হয়, অতএব শব্দ উৎপন্ন হয়, অভিভাব্য হয় না।

টিপ্পনী। ভাষ্যকার পূর্বে বলিয়াছেন যে, যেমন অনিত্য স্বরূপ ও দুঃখে তীত্র স্বরূপ, মন্দ স্বরূপ,  
এইরূপ জ্ঞান হওয়ার স্বরূপ ও দুঃখে তীত্রতা ও মন্দতা আছে—ইহা বুঝা যায়, তদ্রূপ তীত্র শব্দ,  
মন্দ শব্দ, এইরূপ বোধ হওয়ার শব্দও তীত্রতা ও মন্দতা আছে, ইহা বুঝা যায়। একই শব্দে



তীব্রতা ও মন্দতারূপ বিকল্প ধর্ম থাকিতে পারে না, সুতরাং বিভিন্ন প্রকার শব্দের উৎপত্তি হয়, ইহা স্বীকার্য্য। শব্দের উৎপত্তি স্বীকার না করিলে কোন শব্দ তীব্র, কোন শব্দ মন্দ, ইহা হইতে পারে না—ইহাই ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য। ভাষ্যকার পূর্বোক্ত তাৎপর্য্যে স্বার্থ বর্ণন করিয়া এখন পূর্বপক্ষ বলিয়াছেন যে, শব্দে বস্তুতঃ তীব্রতা ও মন্দতা নাই। শব্দের বাহ্য ব্যঞ্জক, তাহার তীব্রতা ও মন্দতাবশতঃ শব্দের জ্ঞানই তীব্র ও মন্দ হয়। তাহাতেই শব্দ তীব্রের জ্ঞান ও মন্দের জ্ঞান প্রতীয়মান হইয়া, তীব্র ও মন্দ এইরূপে জ্ঞানের বিষয় হয়। বস্তুতঃ তীব্র ও মন্দ শব্দের ধর্ম নহে, সুতরাং উহার দ্বারা শব্দের ভেদ সিদ্ধ হয় না। যেমন আলোক রূপের ব্যঞ্জক। রূপ পূর্ব হইতেই অবস্থিত আছে, কিন্তু অন্ধকারে তাহা দেখা যায় না। আলোক ঐ রূপের অভিব্যক্তি, অর্থাৎ প্রত্যক্ষের কারণ হওয়ায় তাহাকে রূপের ব্যঞ্জক বলে। ঐ রূপে তীব্রতা ও মন্দতা নাই। কিন্তু আলোক তীব্র হইলে ঐ রূপকে তীব্র বলিয়া বোধ হয়, আলোক মন্দ হইলে, ঐ রূপকে মন্দ বলিয়া বোধ হয়। এখানে ঐ রূপের জ্ঞানই বস্তুতঃ তীব্র ও মন্দ হইয়া থাকে, তাহাতেই রূপকে তীব্র ও মন্দ বলিয়া বোধ হয়, বস্তুতঃ রূপের তীব্রতা ও মন্দতা নাই। এইরূপ, ভেরী ও দণ্ডের সংযোগ ভেরী-শব্দের ব্যঞ্জক, উহার তীব্রতাবশতঃ ঐ ভেরীশব্দের শ্রবণ তীব্র হয়, তাহাতেই ভেরী-শব্দকে তীব্র বলিয়া বোধ হয়। বস্তুতঃ ভেরীশব্দে তীব্রতা-ধর্ম নাই। ভাষ্যকার এই পূর্বপক্ষের নিরাস করিতে বলিয়াছেন—“তচ্চ ন” অর্থাৎ তাহাও বলা যায় না। কেন বলা বাৎ না? ইহা বুঝাইতে বলিয়াছেন, “এবং অভিভবোপপত্তেঃ”। অর্থাৎ পূর্বে যে সিদ্ধান্ত বলিয়াছি, সেই সিদ্ধান্ত (শব্দের উৎপত্তি সিদ্ধান্ত) স্বীকার করিলে, শব্দের অভিভব উপপন্ন হয়। পূর্বপক্ষের সিদ্ধান্তে তাহা উপপন্ন হয় না। ভাষ্যকার পরে তাৎপর্য্য বর্ণন করিয়া ইহার সমর্থন করিয়াছেন যে, ভেরীশব্দ তীব্র, বীণার শব্দ তদপেক্ষার মন্দ; এই জন্ত ভেরীর শব্দ বীণার শব্দকে অভিভূত করে, অর্থাৎ ভেরী বাজাইলে, সেখানে বীণার শব্দ শুনিতে পাওয়া যায় না। ভেরীর শব্দ বস্তুতঃ তীব্র না হইলে, তাহা বীণার শব্দকে অভিভূত করিতে পারে না। ভেরীশব্দের শ্রবণই সেখানে বীণা-শব্দকে অভিভূত করে, ভেরীশব্দের শ্রবণরূপ জ্ঞান তীব্র বলিয়া তাহা বীণাশব্দকে অভিভূত করিতে পারে, ইহা বলা যায় না। তাৎপর্য্যটীকাকার ইহার মত বলিয়াছেন যে, সঙ্গাতীয় পদার্থই সঙ্গাতীয় ভিন্ন পদার্থের অভিভব করিতে পারে। কোন পদার্থ নিজেই নিজের অভিভব করিতে পারে না। বিজাতীয় পদার্থও অভিভব করিতে পারে না। সুতরাং ভেরীশব্দের জ্ঞান তাহার বিজাতীয় বীণাশব্দকে অভিভব করিতে পারে না। ভেরীশব্দকেই বীণাশব্দের অভিভাবক বলিতে হইবে। তাৎপর্য্যটীকাকার ইহাও বলিয়াছেন যে, স্থলে “কৃতকবছপচারায়ং”, এই স্থলে “উপচার” বলিতে প্রয়োগ। তীব্র শব্দ, মন্দ শব্দ—এইরূপ যে প্রয়োগ হয়, তাহার কারণ শব্দের ভেদজ্ঞান। মহর্ষি “উপচার” শব্দের দ্বারা তাহার কারণ শব্দভেদজ্ঞানকেই উপলক্ষ্য করিয়াছেন। তকের শব্দ, সারিকার শব্দ, পুরুষের শব্দ, নারীর শব্দ ইত্যাদি যে বহুবিধ শব্দের শ্রবণ হয়, তাহাতে স্পষ্ট ভেদজ্ঞান হইয়া থাকে। ঐ সকল শব্দের পরস্পর বৈ-অপ্য অসুভবসিদ্ধ। সুতরাং ঐ সকল নানা জাতীয় শব্দ যে পরস্পর ভিন্ন, ইহা স্বীকার্য্য। উদয়নাচার্য্য ও গঙ্গেশ



প্রকৃতি নৈরায়িকগণও এই যুক্তির বিশেষরূপ সমর্থন করিয়া উহার দ্বারা শব্দের ভেদ সিদ্ধ করিয়াছেন। পূর্বপক্ষবাদী শব্দের ভেদ স্বীকার করেন না। সুতরাং তাঁহার মতে তীত্র মন্দ প্রকৃতি বিভিন্ন শব্দ না থাকায়, শব্দের অভিত্তব উপপন্ন হয় না। শব্দের উৎপত্তি স্বীকার করিলে তীত্র মন্দ প্রকৃতি বিভিন্ন শব্দের উৎপত্তি হওয়ার তীত্র শব্দের দ্বারা মন্দ শব্দের অভিত্তব উপপন্ন হয়। ভাষ্যকার এই যুক্তির দ্বারাই বলিয়াছেন, শব্দের উৎপত্তি হয়, নিত্য শব্দের অভিব্যক্তি হয় না।

ভাষ্য। অভিভবানুপপত্তিশ্চ ব্যঞ্জকসমানদেশস্যভিব্যক্তৌ প্রাপ্ত্যভাবাৎ। ব্যঞ্জকেন সমানদেশোহভিব্যক্ত্যাতে শব্দ ইত্যেতদগ্নিন্ পক্ষে নোপপদ্যতেহভিভবঃ। ন হি ভেরীশব্দেন তস্ত্রীশ্বনঃ প্রাপ্ত ইতি।

অপ্রাপ্তেহভিভব ইতি চেৎ? শব্দমাত্রাভিভবপ্রসঙ্গঃ। অথ মন্তোতাসত্যাং প্রাপ্তাবভিভবো ভবতীতি। এবং সতি যথা ভেরীশব্দঃ কঞ্চিত্ত্রীশ্বনমভিভবতি, এবমস্তিকস্থোপাদানমিব দবীয়ঃস্থোপাদানানপি তস্ত্রীশ্বনানভিভবেৎ, অপ্রাপ্তেরবিশেষাৎ। তত্র কচিদেব ভেদ্যাং প্রণাদিতায়াং সর্বলোকেষু সমানকালান্ত্রীশ্বনা ন শ্রায়েরম্মিতি। নানাভূতেষু শব্দসন্তানেষু সংস্থ শ্রোত্রপ্রত্যাসত্তিভাবেন কস্মচিচ্ছব্দস্ত তীত্রেণ মন্দস্তাভিভবো যুক্ত ইতি। কঃ পুনরয়মভিভবো নাম? গ্রাহ-সমানজাতীয়গ্রহণকৃতমগ্রহণমভিভবঃ, যথোক্তা-প্রকাশস্ত গ্রহণার্থস্তাদিত্য-প্রকাশেনেতি।

অনুবাদ। এবং ব্যঞ্জকের সমানদেশস্থ শব্দের অভিব্যক্তি হইলে, অর্থাৎ ঐ সিদ্ধান্তই স্বীকার করিলে প্রাপ্তির অভাববশতঃ (সম্বন্ধাভাবপ্রযুক্ত) অভিভবের উপপত্তি হয় না। বিশদার্থ এই যে, ব্যঞ্জকের সমানদেশস্থ শব্দ অভিব্যক্ত হয়, এই পক্ষে অভিভব উপপন্ন হয় না। যেহেতু, বীণার শব্দ ভেরীর শব্দ কর্তৃক প্রাপ্ত হয় না,—অর্থাৎ ভেরী-শব্দের সহিত বীণাশব্দের সম্বন্ধ হইতে না পারায় ভেরীশব্দ তীত্র হইলেও মন্দ বীণাশব্দকে অভিভব করিতে পারে না।

(পূর্বপক্ষ) অপ্রাপ্তে অভিভব হয়, অর্থাৎ বীণাশব্দ ভেরীশব্দ কর্তৃক অপ্রাপ্ত হইলেও ভেরীশব্দ তাহাকে অভিভব করে, ইহা যদি বল? (উত্তর) শব্দমাত্রের অভিভবের আপত্তি হয়। বিশদার্থ এই যে, যদি মনে কর, প্রাপ্তি না থাকিলেও, অর্থাৎ অভিভাবক ও অভিভাব্য শব্দের পরস্পর সম্বন্ধ না হইলেও অভি-



ভব হয়, এইরূপ হইলে যেমন ভেরী-শব্দ কোন বীণা-শব্দকে অভিভব করে, এইরূপ নিকটস্থোপাদান বীণা-শব্দের দ্বারা, অর্থাৎ যে বীণা-শব্দের উপাদান (বীণাদি) নিকটস্থ, সেই বীণা-শব্দকে যেমন অভিভব করে, তদ্রূপ দূরস্থোপাদান, অর্থাৎ যে সকল বীণা শব্দের উপাদান (বীণাদি) দূরস্থ, এমন বীণাশব্দসমূহকেও অভিভব করুক ? যেহেতু অপ্রাপ্তির বিশেষ নাই। তাহা হইলে, অর্থাৎ দূরস্থ বীণা-শব্দ-সমূহকেও অভিভব করিলে, কোনও ভেরী বাদিত হইলে, অর্থাৎ যে কোন স্থানে যে কেহ একটি ভেরী বাজাইলে সর্বলোকে (ঐ ভেরীশব্দের) সমানকালীন বীণাশব্দসমূহ শ্রুত না হউক ? নানাভূত অর্থাৎ বিভিন্ন শব্দসম্মান হইলে শ্রবণেন্দ্রিয়ের সহিত সন্নিবিষ্ট হওয়ায় (ঐ শব্দসমূহের মধ্যে) কোনও মন্দ শব্দের তীব্র শব্দের দ্বারা অভিভব উপপন্ন হয়। (প্রশ্ন) এই অভিভব কি ? অর্থাৎ অভিভব নামে যে পদার্থ বলা হইতেছে, তাহা কি ? (উত্তর) গ্রহণযোগ্য পদার্থের সজাতীয় পদার্থের জ্ঞানপ্রযুক্ত (গ্রহণযোগ্য অপর সজাতীয় পদার্থের) অগ্রহণ অভিভব। যেমন, গ্রহণযোগ্য উৎসারূপ আলোকের সূর্যালোকের দ্বারা (অভিভব হয়—অর্থাৎ সূর্যালোকের জ্ঞানপ্রযুক্ত আলোকরূপে সূর্যালোকের সজাতীয় উৎসর জ্ঞান না হওয়াই তাহার অভিভব।

টিপ্পনী। শব্দ-নিজাতাবাদী পূর্বপক্ষীর মতে শব্দের অভিভব উপপন্ন হয় না, এ বিষয়ে ভাষ্যকার শেষে আর একটি যুক্তি বলিয়াছেন যে, ভেরীশব্দ বীণার শব্দকে প্রাপ্ত না হওয়ার ভেরী-শব্দ বীণাশব্দকে অভিভূত করিতে পারে না। ভাষ্যকারের কথা এই যে, পূর্বপক্ষবাদী যে পদার্থকে শব্দের ব্যঞ্জক বলিবেন, ঐ ব্যঞ্জকপদার্থের সমানদেশস্থ, অর্থাৎ যে স্থানে ঐ ব্যঞ্জক পদার্থ থাকে, সেই স্থানস্থ শব্দই, ঐ ব্যঞ্জকের দ্বারা অভিভূত হয়—ইহাই স্বীকার করিতে হইবে। তাহা হইলে যেখানে ভেরী ও দণ্ডের সংযোগ হইয়াছে, সেখানেই ঐ সংযোগের দ্বারা ভেরীশব্দ অভিভূত হয়, ইহাই স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু তাহা হইলে, অপর স্থানে অভিভূত বীণা-শব্দের সহিত পূর্বোক্ত ভেরীশব্দের সম্বন্ধ হইতে না পারায়, পূর্বপক্ষবাদীর সিদ্ধান্তে ভেরীশব্দ বীণাশব্দকে অভিভূত করিতে পারে না। পূর্বপক্ষবাদী যদি বলেন যে, ভেরীশব্দ বীণাশব্দকে প্রাপ্ত না হইয়া তাহাকে অভিভব করে, অভিভব করিতে অভিভাব্য ও অভিভাবকের পরস্পর প্রাপ্তি বা সম্বন্ধ অনাবশ্যক। এতদ্বারা ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, তাহা হইলে শব্দমাত্রেরই অভিভব হইয়া পড়ে। কোন এক স্থানে কেহ ভেরী বাজাইলে তাহার নিকটস্থ বীণা-শব্দ যেমন অভিভূত হয়, তদ্রূপ ঐ ভেরী-শব্দের সমানকালীন দূরস্থ—অতিদূরস্থ সমস্ত বীণা-শব্দই অভিভূত হইয়া পড়ে। ইহা স্বীকার করিলে, তৎকালে সর্বত্রই সর্বদেশেই কোন বীণা-শব্দ কেহ শুনিতে পায় না, ইহা স্বীকার করিতে হয়; কিন্তু সত্যের অপলাপ করিয়া পূর্বপক্ষবাদীও ইহা স্বীকার



কল্পিতে পারেন না। সুতরাং যে ভেরী-শব্দ যে বীণা-শব্দকে প্রাপ্ত হইয়াছে, সেই ভেরী-শব্দই সেই বীণাশব্দকে অভিভব করে, ইহাই বলিতে হইবে। কিন্তু পূর্বপক্ষবাদীর মতে ঐ প্রাপ্তি অসম্ভব। ভেরী-শব্দ যেখানে অভিব্যক্ত হয়, বীণাশব্দ সেখানেই অভিব্যক্ত না হওয়ায়, ঐ শব্দ-বয়ের সম্বন্ধ কিছুতেই হইতে পারে না, সুতরাং পূর্বপক্ষবাদীর মতে ভেরী-শব্দ বীণা-শব্দকে অভিভূত করিতে পারে না। শব্দের উৎপত্তি সিদ্ধান্ত স্বীকার করিলে পূর্বোক্ত অভিভবের অহুপপত্তি নাই। কারণ ভেরী ও বগের সংযোগে কত প্রথম যে শব্দের উৎপত্তি হয়, তাহা হইতে, তদ্বৎ হইতে তরঙ্গের তায়, অপর অপর নানা শব্দের উৎপত্তিক্রমে শ্রোতার শ্রবণদেশে যে শব্দটি উৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহার সহিত শ্রবণেন্দ্রিয়ের সন্নির্কর্ষ হওয়ায়, তাহারই প্রত্যক্ষ হয়। প্রথমে অন্তর উৎপন্ন শব্দগুলির সহিত শ্রবণেন্দ্রিয়ের সন্নির্কর্ষ না হওয়ায় সেগুলির প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। প্রথম শব্দ হইতে শব্দান্তরের উৎপত্তিক্রমে অন্তিমীয়ই শ্রোতার শ্রবণদেশে শব্দ উৎপন্ন হওয়ায়, শব্দ-শ্রবণে বিলম্ব অসম্ভব করা যায় না। বীণা বাজাইলে পূর্বোক্ত প্রকারে শ্রোতার শ্রবণদেশে যে শব্দ উৎপন্ন হয়, তাহার সহিত শ্রবণেন্দ্রিয়ের সন্নির্কর্ষ হওয়ায়, ঐ শব্দের শ্রবণ হইয়া থাকে। কিন্তু সেখানে ভেরী বাজাইলে পূর্বোক্তপ্রকারে শ্রোতার শ্রবণদেশে শব্দ উৎপন্ন হইয়া তাহা পূর্বোক্ত বীণা-শব্দকে অভিভূত করে। পূর্বোক্তপ্রকারে উভয় শব্দই শ্রোতার শ্রবণদেশে উৎপন্ন হওয়ায় উভয়ের প্রাপ্তিসম্বন্ধ হয়, ভেরীশব্দ বীণার শব্দকে প্রাপ্ত হয়, এজন্য ঐহলে ভেরীশব্দ বীণার শব্দকে অভিভূত করিতে পারে কোন গ্রহণযোগ্য পদার্থের সজাতীয় পদার্থবিশেষের জ্ঞান হইলে, তৎপ্রযুক্ত ঐ গ্রহণযোগ্য পদার্থের যে অজ্ঞান, তাহাই এখানে অভিভব পদার্থ। যেমন মধ্যাহ্নকালে সূর্যালোকের দ্বারা উকা অভিভূত হইয়া থাকে। অর্থাৎ, তখন সূর্যালোকের জ্ঞানপ্রযুক্ত উকার জ্ঞান হয় না। উকা ও সূর্য, আলোকরূপে সজাতীয় পদার্থ। রাতিকালে উকা দেখা যায়, সুতরাং উহা গ্রাহ বা গ্রহণযোগ্য পদার্থ। মধ্যাহ্নকালে উকার সজাতীয় সুতীত্র সূর্যালোকের দর্শনে উকা দেখা যায় না, উহাই উকার অভিভব। ভাষাকার উপসংহারে প্রমুখপূর্বক অভিভব পদার্থের এইরূপ স্বরূপ বর্ণনা করিয়া জানাইয়াছেন যে, এক শব্দজ্ঞান অপর শব্দের অভিভাবক হইতে পারে না। কারণ, সজাতীয় পদার্থই সজাতীয় পদার্থের অভিভাবক হয়। ভাষাকার সূর্যালোকের দ্বারা উকার অভিভবকে দৃষ্টান্তরূপে উল্লেখ করিয়া ইহা সমর্থন করিয়াছেন। এবং যে পদার্থ গ্রহণ বা জ্ঞানের যোগ্যই নহে—যাহা অতীন্দ্রিয়, তাহারও অভিভব হয় না। বীণার শব্দ গ্রহণযোগ্য, সুতরাং তীব্রভেরী শব্দ তাহাকে অভিভূত করিতে পারে। ভেরী বাদ্যকালে বীণা বাজাইলেও তখন বীণাশব্দ পূর্বোক্ত-প্রকারে শ্রোতার শ্রবণদেশে উৎপন্নই হয় না, সুতরাং তখন বীণাশব্দ শুনা যায় না, ইহাও কল্পনা করা যায় না। কারণ, তখন বীণাশব্দের পূর্বোক্তপ্রকারে উৎপত্তির কোন প্রতিবন্ধক নাই। পরন্তু তৎকালে ভেরীবাদ্য বন্ধ করিলে তখনই বীণার শব্দ শুনা যায়। পূর্বপক্ষবাদী যদি বলেন যে, শব্দমাত্রই ব্যক্তকের সমানদেশে, ইহা স্বীকার করি না, কিন্তু শব্দমাত্রই বিদ্যুৎ, অর্থাৎ সর্বত্র আছে; সুতরাং বীণাশব্দ ও ভেরীশব্দের অপ্রাপ্তি না থাকার পূর্বোক্ত, অভিভবের অহুপপত্তি



নাই। এতদ্বারা উদ্যোতক বলিয়াছেন যে, শব্দমাত্রকেই সর্বব্যাপী বলিলে, যে কোন ব্যঙ্গক উপস্থিত হইলে, সকল শব্দেরই অভিব্যক্তি হইতে পারে। কোন ব্যঙ্গক কোন শব্দকে অভিব্যক্ত করে, ইহার নিয়ম করা যায় না। উদ্যোতক এইরূপে এখানে বহু বিচারপূর্বক পূর্বপক্ষ-বাদীদিগের সমস্ত সমাবানেরই নিরাস করিয়াছেন। ভাষ্যবাস্তিকে সে সকল কথা দ্রষ্টব্য। মূলকথা, শব্দের উৎপত্তি স্বীকার না করিয়া অভিব্যক্তি স্বীকার করিলে, শব্দের অস্তিত্ব উপপর হয় না, এবং শব্দের ভেদ না মানিলে তীব্রতা ও মন্দতা শব্দের ধর্ম হইতে না পারায় তীব্র শব্দ মন্দ শব্দকে অভিব্যক্ত করে, এই কথাও বলা যায় না। ভাষ্যকার এই যুক্তির দ্বারা ও শেষে শব্দে উৎপত্তিধর্মকল্প সমর্থন করিয়াছেন। ভাষ্যকারের মতে মহর্ষি ঐন্দ্রিয়কল্প ও কার্যপদার্থের, জ্ঞান ব্যবহার এই দুই হেতুর দ্বারা তাঁহার প্রথমোক্ত আদিমব্দ, অর্থাৎ উৎপত্তিধর্মকল্পহেতুকেই নিষ্ক করিয় তদ্বারাই শব্দের অনিত্যত্ব সাধন করিয়াছেন ॥ ১৩ ॥

**সূত্র। ন ঘটাব্যবসামান্যনিত্যত্বান্নিত্যেতদ্ব্যপ্যনিত্যব-  
দুপচারাজ্জ ॥ ১৪ ॥ ১৪৩ ॥**

অনুবাদ। (পূর্বপক্ষ) না, অর্থাৎ পূর্বসূত্রোক্ত হেতুত্রয় শব্দের অনিত্যত্বের সাধক হয় না, যেহেতু ঘটাব্যব ও সামান্যের, অর্থাৎ ঘটধ্বংস ও ঘটাদি জ্ঞাতির নিত্যত্ব আছে, এবং নিত্যপদার্থেরও অনিত্যপদার্থের জ্ঞান ব্যবহার হয়।

ভাষ্য। ন খলু আদিমত্বান্নিত্যত্বাৎ শব্দাৎ। কস্মাৎ? ব্যভিচারাত্। আদিমতঃ খলু ঘটাব্যবস্তৃষ্ণনিত্যত্বং। কথমাदिमान्? কারণবিভাগেভ্যো হি ঘটো ন ভবতি। কথমস্ত্য নিত্যত্বং? যোহসৌ কারণবিভাগেভ্যো ন ভবতি, ন তস্তাব্যবস্তাবেন কদাচিমিবর্ত্যত ইতি। যদপৈন্দ্রিয়কল্পাদিত্য, তদপি ব্যভিচরতি, ঐন্দ্রিয়কল্প সামান্যত্বং নিত্যত্বেন। যদপি কৃতকবদুপচারাদিত্য, এতদপি ব্যভিচরতি, নিত্যত্বনিত্যবদুপচারো দৃষ্টঃ, যথাহি ভবতি বৃক্ষস্ত প্রদেশঃ, কন্দলস্ত প্রদেশঃ, এবমাকালস্ত প্রদেশঃ, আত্মনঃ প্রদেশ ইতি ভবতীতি।

অনুবাদ। আদিমব্দ, অর্থাৎ উৎপত্তিধর্মকল্পহেতুক শব্দ অনিত্য নহে, (প্রশ্ন) কেন? (উত্তর) ব্যভিচারবশতঃ। যেহেতু, আদিমান অর্থাৎ উৎপত্তিধর্মক ঘটাব্যবের (ঘটধ্বংসের) নিত্যত্ব দেখা যায়। (প্রশ্ন) আদিমান কিরূপে? অর্থাৎ, ঘটধ্বংস উৎপত্তি-ধর্মক কেন? (উত্তর) যেহেতু কারণের বিভাগপ্রযুক্ত ঘট থাকে না, অর্থাৎ ঘটের কারণের বিভাগ হইলে, তৎকাল ঘটের ধ্বংস জন্মে। (প্রশ্ন)



ইহার (ঘটধ্বংসের) নিত্যত্ব কিরূপে ? অর্থাৎ ঘটধ্বংস উৎপত্তিধর্মক ইহা বুঝিলাম, কিন্তু উহা যে নিত্য, তাহা কিরূপে বুঝিব ? (উত্তর) এই যে (ঘট) কারণের বিভাগ প্রযুক্ত থাকে না, অর্থাৎ কারণের বিভাগ জ্ঞাত যে ঘটের ধ্বংস জন্মে, তাহার অভাব (সেই ঘটের ধ্বংস) ভাব কর্তৃক, অর্থাৎ ঘট কর্তৃক কখনও নিবৃত্ত হয় না [ অর্থাৎ যে ঘটের ধ্বংস হয়, সেই ঘটের কখনও পুনরুৎপত্তি না হওয়ায়, তদ্বারা ঐ ঘট-ধ্বংসের নিবৃত্তি বা ধ্বংস হইতে পারে না, সুতরাং ঘটধ্বংস অবিনাশী বলিয়া উহা নিত্য ]।

“ঐন্দ্রিয়কত্বাৎ” এই যাহাও (বলা হইয়াছে) অর্থাৎ শব্দের অনিত্যত্বসাধনে যে ঐন্দ্রিয়কত্বহেতু বলা হইয়াছে, তাহাও ব্যভিচারী, যেহেতু সামান্য, অর্থাৎ ঘটক, পটক, গোত্র প্রভৃতি জাতি ঐন্দ্রিয়ক এবং নিত্য।

“কৃতকবহুপচারাত্” এই যাহাও (বলা) হইয়াছে [ অর্থাৎ শব্দের অনিত্যত্বসাধনে অনিত্যপদার্থের ন্যায় ব্যবহারকে যে হেতু বলা হইয়াছে, ইহাও ব্যভিচারী। (কারণ) নিত্যপদার্থে ও অনিত্যপদার্থের ন্যায় ব্যবহার দেখা যায়। যেহেতু যেমন বুদ্ধের প্রদেশ, কন্মলের প্রদেশ (এইরূপ ব্যবহার) হয়, এইরূপ আকাশের প্রদেশ, আত্মার প্রদেশ (এইরূপ ব্যবহার) হয় ]।

টিপ্পনী। মহর্ষি পূর্বস্মৃত্তোক্ত হেতুত্রয়ের অব্যভিচারিত্ব বুঝাইবার জন্ত প্রথমে এই সূত্রের দ্বারা পূর্বপক্ষ বলিয়াছেন যে, পূর্বোক্ত হেতুত্রয় অনিত্যত্বের সাধক হয় না, কারণ ঐ হেতুত্রয়ই অনিত্যত্বরূপ সাধ্যধর্মের ব্যভিচারী। প্রথমহেতু—আদিমত্ব, তাহা ঘটধ্বংসে আছে, কিন্তু তাহাতে অনিত্যত্ব নাই, সুতরাং আদিমত্ব অনিত্যত্বের ব্যভিচারী। “আদিমত্ব” বলিতে উৎপত্তিধর্মকত্বই এখানে মহর্ষির বিবক্ষিত। ঘটের অবয়ব কপাল ও কপালিকা নামক দ্রব্য ঘটের সম্বারিকারণ। ঐ কারণদ্বয় পরস্পর সংযুক্ত হইলে ঘট জন্মে, এবং ঐ কারণদ্বয়ের পরস্পর বিভাগ হইলে, ঘট নষ্ট হইয়া যায়। সুতরাং, ঘটধ্বংস কারণবিভাগজ্ঞ হওয়ায় উহা উৎপত্তিধর্মক। এবং যে ঘটের ধ্বংস হয়, সেই ঘটের আর কখনও উপপত্তি না হওয়ায়, সেই ঘটধ্বংসের ধ্বংস হওয়া অসম্ভব। ঘটধ্বংসের ধ্বংস হইলে, সেই ঘটের পুনরুৎপত্তি দেখা বাইত, তাহা বধন দেখা যায় না, বধন বিনষ্ট ঘটের পুনরুৎপত্তি হয় না, হইতে পারে না, ইহা অবশ্য স্বীকার্য, তখন ঘটধ্বংসের ধ্বংস হয় না, উহা অবিনাশী—ইহা অবশ্য স্বীকার্য। তাহা হইলে, ঘটধ্বংসে অবিনাশিত্বরূপ নিত্যত্বই আছে, উহাতে অনিত্যত্ব নাই, সুতরাং প্রথমোক্ত আদিমত্ব, অর্থাৎ উৎপত্তিধর্মকত্বরূপ হেতু ঘটধ্বংসে ব্যভিচারী। ঘটধ্বংসে উৎপত্তিধর্মকত্ব আছে, কিন্তু তাহাতে অনিত্যত্ব নাই। সূত্রে “ঘটাত্মক” শব্দের দ্বারা ঘটের ধ্বংসরূপ অভাবই গৃহীত হইয়াছে, এবং উহার দ্বারা ধ্বংসমাত্রই গ্রহণ করিয়া, ধ্বংসমাত্রই



ব্যভিচার—মহর্ষির বিবক্ষিত বৃত্তিতে হইবে। তাহা “ঘটো ন ভবতি” এখানেও “ন ভবতি” এই বাক্যের দ্বারা ধ্বংসরূপ অভাব বৃত্তিতে হইবে। পরেও “ন ভবতি” এই বাক্যের দ্বারা ধ্বংসরূপ অভাবই কথিত হইয়াছে। প্রাচীনগণ অভাব অর্থ প্রকাশ করিতে “ন ভবতি” এইরূপ বাক্যও প্রয়োগ করিতেন।

মহর্ষির পূর্বসূত্রোক্ত দ্বিতীয় হেতু ঐন্দ্রিয়কৰ্ম্ম। ইন্দ্রিয়সম্বন্ধিগ্ৰাহকই ঐন্দ্রিয়কৰ্ম্ম। মহর্ষি “সামান্তনিত্যত্বাৎ” এই কথার দ্বারা ঘটক, পটক, গোল প্রভৃতি জাতির নিত্যত্ব-সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়া ঐ জাতিতে ঐন্দ্রিয়কৰ্ম্ম হেতুর ব্যভিচার সূচনা করিয়াছেন। ঘটক পটকাদি জাতির প্রত্যক্ষ হয়; উহা ঐন্দ্রিয়ক পদার্থ, কিন্তু উহা নিত্য। ঘটক পটকাদি জাতিপদার্থে ঐন্দ্রিয়কৰ্ম্ম আছে, কিন্তু তাহাতে অনিত্যত্ব নাই—সুতরাং ঐন্দ্রিয়ক পদার্থ হইলেই যে, তাহা অনিত্য হইবে, ইহা বলা যায় না। ঐন্দ্রিয়কৰ্ম্ম অনিত্যত্বের ব্যভিচারী। জ্ঞানচাৰ্য্যগণ ঘটক-পটকাদি পদার্থকে “জাতি” ও “সামান্ত” নামে উল্লেখ করিয়া ঐ জাতিকে নিত্যপদার্থ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এবং ঘটক, পটক, গোল প্রভৃতি জাতি ইন্দ্রিয়গ্ৰাহক, ইন্দ্রিয়সম্বন্ধিগ্ৰাহক হইলে, উহাদিগের প্রত্যক্ষ হয়, ইহাও সিদ্ধান্ত বলিয়াছেন। জ্ঞানচাৰ্য্যগণের সমর্থিত “সামান্ত” নামক ভাবপদার্থও তাহার নিত্যত্বাদি সিদ্ধান্ত, মহর্ষি গোলমের এই সূত্রে পাওয়া যায়।

মহর্ষির তৃতীয় হেতু—অনিত্যপদার্থের জ্ঞান ব্যবহার, নিত্যপদার্থেও হইয়া থাকে, সুতরাং উহাও অনিত্যত্ব-সাধ্যের ব্যভিচারী অনিত্যত্বব্যাধি প্রদেশ, অর্থাৎ অংশ আছে। একক বৃক্ষের প্রদেশ, কল্লের প্রদেশ, এইরূপ ব্যবহার হয়। আত্মা ও আকাশ নিত্যপদার্থ। কিন্তু আকাশের প্রদেশ, আত্মার প্রদেশ, এইরূপ ব্যবহারও হইয়া থাকে। সুতরাং আত্মা ও আকাশে বৃক্ষ ও কল্ল প্রভৃতি অনিত্যত্বব্যাধির জ্ঞান প্রদেশ ব্যবহার থাকায়—অনিত্যপদার্থের জ্ঞান ব্যবহার থাকিলেই যে, সে পদার্থ অনিত্যই হইবে, ইহা বলা যায় না। ফলকথা, উৎপত্তিধর্ম্মক হইয়াও ঘটাদির ধ্বংস বধন অনিত্য নহে, এবং ঐন্দ্রিয়ক হইয়াও ঘটক-পটকাদি জাতি বধন অনিত্য নহে, এবং অনিত্যপদার্থের জ্ঞান ব্যবহৃত্যমান বা জ্ঞানমান হইয়াও আত্মা ও আকাশ বধন অনিত্য নহে, তখন পূর্বসূত্রোক্ত উৎপত্তিধর্ম্মক প্রভৃতি হেতুত্রয় অনিত্যত্বের সাধক হয় না। কারণ, ঐ হেতুত্রয়ই অনিত্যত্বের ব্যভিচারী, ইহাই পূর্বপক্ষ। ১৪।

সূত্র। তত্ত্বভাস্কর্যোর্নানাত্বস্য বিভাগদব্যভিচারঃ।

॥১৫॥১৪৪ ॥

অনুবাদ। (উত্তর) তত্ত্ব ও ভাস্করের অর্থাৎ মুখ্যনিত্যত্ব ও গৌণনিত্যত্বের নানাবিভাগবশতঃ ( ভেদজ্ঞানবশতঃ )—ব্যভিচার নাই [ অর্থাৎ ধ্বংসে যে নিত্যত্ব আছে, তাহা ভাস্কর বা গৌণ,—তাহা মুখ্যনিত্যত্ব নহে। মুখ্যনিত্যত্বের অভাবরূপ অনিত্যত্বই সাধ্য, তাহা ধ্বংসে থাকায় পূর্বোক্ত ব্যভিচার নাই ]।



ভাষ্য । নিত্যমিত্যত্র কিং তাবৎ তত্ত্বং ? অর্থান্তরস্তানুৎপত্তি-  
ধর্মকস্তানুহানানুপপত্তিনিত্যত্বং, তচ্চাভাবে নোপপদ্যতে । ভাস্করস্ত ভবতি,  
বভ্রোস্তানুহানমহাসীং, বদভূস্তা ন ভবতি, ন জাতু তৎ পুনর্ভবতি, তত্র  
নিত্য ইব নিত্যো ঘটাবাব ইত্যয়ং পদার্থ ইতি । তত্র যথাজাতীয়কঃ  
শব্দো ন তথা জাতীয়কং কার্য্যং কিঞ্চিমিত্যং দৃশ্যত ইত্যব্যভিচারঃ ।

অনুবাদ । ( প্রশ্ন ) “নিত্য” এই প্রয়োগে তব্ব কি ? অর্থাৎ নিত্য বলিলে নিত্য-  
পদার্থের তব্ব যে নিত্যই বুঝা যায়, তাহা কি ? ( উত্তর ) অনুৎপত্তিধর্মক পদার্থান্তরের<sup>১</sup>  
অর্থাৎ যে সকল পদার্থের উৎপত্তি হয় না, এমন পদার্থগুলির আত্মবিনাশের  
অনুপপত্তি, অর্থাৎ তাহাদিগের বিনাশ না হওয়া বা অবিনাশিত্ব, নিত্যত্ব । তাহা কিন্তু  
অভাবে ( ধ্বংসে ) উপপন্ন হয় না, অর্থাৎ পূর্বোক্তরূপ মুখ্যনিত্যত্ব ধ্বংসে থাকে না ।  
কিন্তু ভাস্কর, অর্থাৎ গোপানত্যত্ব থাকে । ( সে কিরূপ, তাহা বুঝাইতেছেন ) সেই  
স্থলে ( ধ্বংসস্থলে ) যে বস্তু আত্মাকে ত্যাগ করিয়াছে<sup>২</sup> বাহ্য উৎপন্ন হইয়া নাই,  
অর্থাৎ বাহ্য উৎপত্তির পরে বিনষ্ট হইয়াছে, তাহা আর কখনও উৎপন্ন হয় না,  
তন্নিমিত্ত, অর্থাৎ ধ্বংসের বিনাশ না হওয়ায়, নিত্য সদৃশ ঘটাবাব এই পদার্থ, অর্থাৎ  
ঘটধ্বংস, নিত্য, ইহা ( কথিত হয় ) । সেই পক্ষে, অর্থাৎ ধ্বংসের অবিনাশিত্বরূপ  
নিত্যত্ব পক্ষেও শব্দ যথাজাতীয়, তথাজাতীয় কোনও কার্য্য নিত্য দেখা যায় না, এজন্য  
ব্যভিচার নাই ।

টীপনী । মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা তাঁহার প্রথমোক্ত হেতুতে পূর্বস্বত্রোক্ত ব্যভিচারের  
নিরাস করিয়াছেন । মহর্ষি বলিয়াছেন যে, মুখ্য-নিত্যত্বই নিত্যপদার্থের তব্ব, গোপ-নিত্যত্ব  
নিত্যপদার্থের তব্ব নহে, উৎসাহে বলে ‘ভাস্কর-নিত্যত্ব’ । মুখ্য-নিত্যত্ব ও ভাস্কর-নিত্যত্বের ভেদ-  
বিভাগ থাকার পূর্বোক্ত ব্যভিচার নাই । ভাব্যকার মহর্ষির তাৎপর্য্য বুঝাইতে, নিত্যপদার্থের

১। পদার্থ বিবিধ, উৎপত্তিধর্মক ও অনুৎপত্তিধর্মক । একই পদার্থ উৎপত্তিধর্মক ও অনুৎপত্তিধর্মক হইতে  
পারে না । উৎপত্তিধর্মক পদার্থ হইতে অনুৎপত্তিধর্মক পদার্থ ভিন্ন । ভাব্যকার “অর্থাস্তরস্ত”—এই কথার দ্বারা  
ইহা জ্ঞাপন করিয়াছেন । ধ্বংসপদার্থ উৎপত্তিধর্মক, অতঃপর উহা অনুৎপত্তিধর্মক পদার্থান্তর নহে, বাহ্য  
উৎপত্তিধর্মক, তাহা অনুৎপত্তিধর্মক বলিয়া গ্রহণ করা যাইবে না । কারণ তাহা পদার্থান্তর । বহু পুস্তকেই  
“আত্মান্তরস্ত” এইরূপ পাঠ আছে । ধ্বংসপদার্থ “আত্ম” শব্দের প্রয়োগে “আত্মান্তর” শব্দের দ্বারাও পদার্থান্তর  
বুঝা যাইতে পারে ।

২। ভাষ্যে “আত্মানং অহাসীং” এই কথারই বিবরণ “ত্বা ন ভবতি ।” প্রাগভাবও বিনষ্ট হয়, কিন্তু তাহা  
আত্মলাভ করিয়া আত্মত্যাগ করে না ; কারণ, তাহা উৎপন্ন হইয়া বিনষ্ট হয় না । প্রাগভাবের উৎপত্তি নাই, বিনাশ  
আছে ।

তত্ত্ব, অর্থাৎ মুখ্যানিত্য কি?—এই প্রশ্নপূর্বক তদন্তের বলিয়াছেন যে, যে পদার্থের উৎপত্তি হয় না, বাহা অতুৎপত্তিধর্মক, তাহার আত্মবিনাশ না হওয়া, অর্থাৎ তাহার অবিনাশিত্বই নিত্যত্ব, অর্থাৎ উৎপত্তিশূন্য পদার্থের বিনাশশূন্যতাই নিত্যপদার্থের তত্ত্ব, উহাই মুখ্যানিত্যত্ব। ঘট-ধ্বংসে এই মুখ্যানিত্যত্ব নাই। কারণ ধ্বংসপদার্থের উৎপত্তি হয়, উহা অতুৎপত্তিধর্মক পদার্থ নহে, সুতরাং ধ্বংসের অবিনাশিত্ব মুখ্যানিত্যত্ব হইতে পারে না। কিন্তু ধ্বংসে অবিনাশিত্বরূপ ভক্তনিত্যত্ব থাকায় “ধ্বংস নিত্য” এইরূপ জ্ঞান ও প্রয়োগ হইয়া থাকে। কোন বস্তুর ধ্বংস হইলে সেখানে ঐ বস্তু প্রথমে উৎপন্ন হইয়া আত্মলাভ করিয়াছিল, ঐ বস্তু আত্মত্যাগ করে, অর্থাৎ উৎপন্ন হইয়া বিনষ্ট হইয়া যায়। ঐ বস্তু আর কখনও উৎপন্ন হইতে পারে না, সুতরাং তাহার ধ্বংসের ধ্বংস হইতে না পারায়, ধ্বংস অবিনাশী পদার্থ। আকাশ প্রভৃতি নিত্য-পদার্থও অবিনাশী, সুতরাং ধ্বংসে ঐ আকাশাদি নিত্যপদার্থের অবিনাশিত্বরূপ, সাদৃশ্য থাকায় ঐ সাদৃশ্যবশতঃ “ধ্বংস নিত্য” এইরূপ জ্ঞান ও প্রয়োগ হইয়া থাকে। বস্ত্ততঃ ধ্বংস নিত্যপদার্থ নহে। গগনাদি নিত্যপদার্থের সদৃশ বলিয়াই ধ্বংসকে নিত্য বলা হয়। ধ্বংসের ঐ নিত্যত্ব ভক্তি। ভক্তি শব্দের অর্থ সাদৃশ্য। এক পদার্থে সাদৃশ্য থাকে না; উভয় পদার্থই সাদৃশ্যকে ভজন (অশ্রয়) করে। এজন্য প্রাচীনগণ “উভয়েন ভজ্যতে” এইরূপ ব্যুৎপত্তি অনুসারে “ভক্তি” শব্দের দ্বারাও সাদৃশ্য অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন; এবং ভক্তি অর্থাৎ সাদৃশ্যপ্রযুক্ত বাহা আরোপিত হয়, তাহাকে বলিয়াছেন—“ভক্ত”। উদ্যোতকর বলিয়াছেন যে, প্রাগভাবের উৎপত্তি হয় না এবং ধ্বংসের বিনাশ হয় না; এজন্য প্রাগভাব ও ধ্বংস এই উভয়েই গগনাদি নিত্যপদার্থের সাদৃশ্য থাকায় নিত্যসদৃশ বলিয়া ঐ উভয়কেই নিত্য বলা হয়, বস্ত্ততঃ ঐ উভয় নিত্য নহে। মূলকথা, সূত্রকার মহর্ষি নিত্যপদার্থের তত্ত্ব মুখ্যানিত্যত্ব ও ভক্ত-নিত্যত্বের ভেদ জ্ঞাপন করিয়া শব্দে মুখ্যানিত্যত্বের অভাবরূপ অনিত্যত্বই তাহার অভিমতগাধ্য, ইহা জানাইয়াছেন। ঘটধ্বংসে উৎপত্তিধর্মকত্ব আছে, পূর্বোক্ত মুখ্যানিত্যত্বের অভাবরূপ অনিত্যত্বসাধ্যও আছে, সুতরাং ব্যক্তির নাই, ইহাই মহর্ষির উদ্ভব।

ভাষ্যকার মহর্ষির উদ্ভবের ব্যাখ্যা করিয়া “তত্র যথা জাতীয়কঃ শব্দঃ” ইত্যাদি সন্দর্ভের দ্বারা শব্দের সজাতীয় কোন জন্ত-পদার্থেই কোনরূপ নিত্যত্ব নাই, সুতরাং ব্যক্তির নাই—এইকথা বলিয়া ধ্বংসে হেতুই নাই, সুতরাং তাহাতে বিনাশিত্বরূপ সাধ্য না থাকিলেও ব্যক্তির নাই, শব্দের সজাতীয় ঘটাদি বে সকল জন্ত-ভাব-পদার্থে হেতু আছে, তাহাতে ঐ সাধ্যও আছে, সুতরাং ব্যক্তির নাই—ইহাই প্রকাশ করিয়াছেন, বুঝা যায়। তাহা হইলে উৎপত্তিধর্মকত্বই এখানে ভাষ্যকারের অভিমত হেতু বুঝা যায়। অথবা ভাষ্যকারের বিবক্ষিত উৎপত্তি-পদার্থ ধ্বংসে না থাকায়, ধ্বংসে উৎপত্তিধর্মকত্ব হেতু নাই—ইহাই ভাষ্যকারের গূঢ় বক্তব্য। মূলকথা, যেক্ষণেই হউক, ধ্বংসে হেতু নাই, সুতরাং তাহাতে অবিনাশিত্বরূপ অনিত্যত্বসাধ্য না থাকিলেও



ব্যভিচার নাই, ইহাই পক্ষান্তরে ভাষ্যকারের এখানে নিজের বক্তব্য বুঝিতে পারা যায়। ভাষ্যকারের ঐরূপ তাৎপর্য বুঝিবার পক্ষে বিশেষ কারণ এই যে, ভাষ্যকার প্রথম অধ্যায়ে ( ৩৬ সূত্রভাষ্যে ) শব্দের অনিত্যত্বানুমানের উৎপত্তিধর্মকল্পকেই হেতু বলিয়া, সেখানে বিনাশিত্বরূপ অনিত্যত্বই সাধারণে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। মুখ্যানিত্যত্বের অভাবই অনিত্যত্ব, ইহা বলেন নাই। ধ্বংসে ব্যভিচারেরও কোনরূপ আশঙ্কা করেন নাই। সুতরাং এখানে “তত্র” এই কথা দ্বারা সেই পক্ষে, অর্থাৎ উহার পূর্বোক্ত ধ্বংসের নিত্যত্ব পক্ষ বা ধ্বংসে অনিত্যত্বের অভাবপক্ষকে গ্রহণ করিয়া সে পক্ষেও ঐ হেতুতে ব্যভিচার নাই—ইহা বলিয়াছেন, বুঝা যায়। সুদীপণ প্রথম অধ্যায়ে ৩৬ সূত্রভাষ্য দেখিয়া ভাষ্যকারের তাৎপর্য নির্ণয় করিবেন ॥১৫॥

ভাষ্য। যদিপি সামান্যনিত্যত্বাদিতি, ইন্দ্রিয়প্রত্যাসত্তিগ্রাহমৈন্দ্রিয়ক-  
মিতি—

অনুবাদ। আর যে “সামান্যনিত্যত্বাৎ” এই কথা—ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষের দ্বারা  
গ্রাহ্য ( বস্তু ) “ঐন্দ্রিয়ক” এই কথা—[ এতদ্বস্তুরে মহাবি বলিয়াছেন ]—

সূত্র। সন্তানানুমানবিশেষণাৎ ॥১৬॥১৪৫॥

অনুবাদ। ( উত্তর ) যেহেতু সন্তানের, অর্থাৎ শব্দসন্তানের অনুমানে বিশেষণ  
( বিশেষ বা বৈশিষ্ট্য ) আছে [ অতএব নিত্যপদার্থেও ব্যভিচার নাই। ]

ভাষ্য। নিত্যোপপ্যব্যভিচার ইতি প্রকৃতং। নৈন্দ্রিয়গ্রহণসামর্থ্যাৎ  
শব্দস্তানিত্যত্বং, কিং তর্হি? ইন্দ্রিয়প্রত্যাসত্তিগ্রাহত্বাৎ সন্তানানুমানং,  
তেনানিত্যত্বমিতি।

অনুবাদ। নিত্যপদার্থেও ব্যভিচার নাই, ইহা প্রকৃত, অর্থাৎ প্রকরণলক্ষ।  
ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গ্রহণযোগ্যতাবশতঃ শব্দের অনিত্যত্ব নহে, অর্থাৎ ঐন্দ্রিয়কত্ব হেতুর  
দ্বারা শব্দে অনিত্যত্ব অনুমেয় নহে, ( প্রশ্ন ) তবে কি? ( উত্তর ) ইন্দ্রিয়ের  
সন্নিকর্ষের দ্বারা গ্রাহ্যত্বপ্রযুক্ত সন্তানের ( শব্দসন্তানের ) অনুমান, তৎপ্রযুক্ত  
( শব্দের ) অনিত্যত্ব ( অনুমেয় )।

টিপ্পনী। মহাবি পূর্বোক্ত চতুর্দশ সূত্রে “সামান্যনিত্যত্বাৎ” এই কথা দ্বারা ঘটত্ব-পটত্বাদি  
ভাবের নিত্যত্ব বলিয়া ঐন্দ্রিয়কত্ব-হেতু অনিত্যত্বের ব্যভিচারী, ইহা বলিয়াছেন। ইন্দ্রিয়ের  
সন্নিকর্ষ দ্বারা বাহ্য গ্রাহ্য, তাহাকে বলে—ঐন্দ্রিয়ক। ঘটত্ব-পটত্বাদি ভাবি ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষগ্রাহ্য  
বলিয়া, তাহাতে ঐন্দ্রিয়কত্ব-হেতু আছে, কিন্তু অনিত্যত্বসাধ্য না থাকায় ব্যভিচার প্রদর্শিত হইয়াছে।  
মহাবি এই সূত্রের দ্বারা ঐ ব্যভিচারের নিরাস করিয়াছেন, ইহা প্রকাশ করিবার জন্য ভাষ্যকার  
প্রথমে পূর্বোক্ত ব্যভিচারগ্রাহক দুইটি কথার উল্লেখ করিয়া সূত্রের অবতারণা করিয়াছেন।



স্বার্থ বর্ণন করিতে ভাষ্যকার প্রথমে বলিয়াছেন যে, নিত্যপদার্থেও ব্যভিচার নাই—ইহা প্রকৃত, অর্থাৎ এই সূত্রের পরে নিত্যপদার্থেও ব্যভিচার নাই, ইহাই মহাবির বক্তব্য, তাহাই এখানে মহাবির সাধ্য, ইহা প্রকরণজ্ঞানের দ্বারাই বুঝা যায়। পূর্বোক্ত চতুর্দশ সূত্র হইতে “নিত্যেষপি” এই বাস্যা এবং পঞ্চদশ সূত্র হইতে “অব্যভিচারঃ” এই বাস্যের অনুবৃত্তির দ্বারা এইসূত্রে “নিত্যেষপ্যব্যভিচারঃ”—এই বাস্যের লাভ হওয়ায়, ভাষ্যকার প্রথমে সেই কথাই বলিয়াছেন, এবং ইহার পরবর্তী সূত্রেও ভাষ্যকারের ঐ কথার যোগে অনেকে উহা পরবর্তী সূত্রেরই শেবাংশরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। বস্তুতঃ “নিত্যেষপ্যব্যভিচারঃ” ইহা ভাষ্যকারেরই কথা, এবং এখানে ঐরূপ ভাষ্যপাঠই প্রকৃত। তাৎপর্যপরিণতি প্রভৃতি প্রসঙ্গের দ্বারাও ইহা নির্ণয় করা যায়।

স্বার্থ বর্ণন করিতে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হেতুর দ্বারা শব্দের অনিত্যত্ব অনুমেয় নহে, অর্থাৎ শব্দের অনিত্যত্ব সাধন করিতে সাক্ষাৎসম্বন্ধে ঐন্দ্রিয়কত্বকে হেতু বলা হয় নাই। কিন্তু ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ দ্বারা গ্রাহ্যত্বপ্রযুক্ত শব্দের সন্তানের অনুমান করিয়া তৎপ্রযুক্ত শব্দের অনিত্যত্ব অনুমান করিতে হইবে, ইহাই মহাবির বিবক্ষিত। শব্দের অনিত্যত্বানুমান হইতে শব্দের সন্তানানুমানে বিশেষ আছে, সুতরাং অনিত্যত্বানুমানে ঐন্দ্রিয়কত্বহেতু না হওয়ায়, ঘটস্থ-পটস্থাদি জ্ঞাতিরূপ নিত্যপদার্থেও ব্যভিচার নাই, ইহাই এই সূত্রের দ্বারা মহাবির বলিয়াছেন। উদ্যোতকরণও মহাবির তাৎপর্য বর্ণন করিতে বলিয়াছেন যে, আমরা ঐন্দ্রিয়কত্ব হেতুর দ্বারা শব্দের অনিত্যত্ব সাধন করি না, কিন্তু অভিব্যক্তির নিবেশ করি। শব্দ অভিব্যক্তিবর্ণক নহে, ইহা ঐ হেতুর দ্বারা প্রতিপন্ন হইলে, শব্দে উৎপত্তিবর্ণকত্ব সিদ্ধ বা নিশ্চিত হইবে। সেই হেতুর দ্বারা শব্দে অনিত্যত্ব সিদ্ধ হইবে, ইহাই উদ্যোতকরণের তাৎপর্য। কিন্তু এখানে মহাবির ঐন্দ্রিয়কত্বহেতুর সাধ্য কি? ইহা বিবেচ্য। ঘটস্থ পটস্থাদি জ্ঞাতি ঐন্দ্রিয়ক হইয়াও উৎপত্তিবর্ণক নহে, সুতরাং উৎপত্তিবর্ণকত্বসাধ্য বলা যায় না। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপাদি আলোকাদির দ্বারা অভিব্যক্ত হয়, সুতরাং অভিব্যক্তিবর্ণকত্বসাধ্যও সাধ্য বলা যায় না। ঘটস্থ পটস্থাদি জ্ঞাতিতে ঐন্দ্রিয়কত্ব আছে, কিন্তু তাহার সন্তান না থাকায়, সন্তান ও সাধ্য বলা যায় না, সুতরাং ইন্দ্রিয়-সন্নিকর্ষগ্রাহ্য হেতুর দ্বারা সন্তানসাধ্যক অনুমান করিতে হইবে—ইহাও ভাষ্যকারের তাৎপর্য বুঝা যায় না। সুতরাং মহাবির ঐন্দ্রিয়কত্ব হেতুর সাধ্য কি, এই প্রশ্নের উত্তরে বক্তব্য এই যে, ইন্দ্রিয়-সন্নিকটত্বই সাধ্য। এইজন্যই ভাষ্যকার ঐন্দ্রিয়কত্বের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন ইন্দ্রিয়-সন্নিকর্ষ-গ্রাহ্য। যে পদার্থ ইন্দ্রিয়-সন্নিকর্ষ-গ্রাহ্য, তাহা অবশ্যই ইন্দ্রিয়ের সহিত সন্নিকট হইবে, এই নিয়মে ব্যভিচার নাই। শব্দ বস্তু ইন্দ্রিয়-সন্নিকর্ষ-গ্রাহ্য, তখন শ্রবণেন্দ্রিয়ের সহিত তাহার সন্নিকর্ষ বা সন্ধ বৈশেষ আবশ্যক। জ্ঞানার্চ্য মহাবির সোত্তম শব্দস্থানে শ্রবণেন্দ্রিয়ের গমন স্বীকার করেন নাই। অমূর্ত শ্রবণেন্দ্রিয় অজ্ঞান গমন করিতে পারে না। সুতরাং শব্দই বাচ্য-স্তরঙ্গের দ্বারা উৎপত্তিক্রমে শ্রোতার শ্রবণদেশে উৎপন্ন হয়। শব্দের ঐরূপ উৎপত্তি বা ঐরূপে উৎপন্ন শব্দসদৃশই শব্দসন্তান। এই শব্দসন্তান স্বীকার করিলে শ্রবণেন্দ্রিয়ের সহিত শব্দের সন্নিকর্ষ হইতে পারাও, শব্দ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হইতে পারে। তাহা হইলে সামান্যতঃ ঐন্দ্রিয়কত্ব হেতুর দ্বারা



শব্দে ইন্দ্রিয়সম্বন্ধের অনুমান করিয়া, খেঁবে বিশেষতঃ শব্দ বর্ণন শ্রবণেন্দ্রিয়ের সম্বন্ধার্থী, অতএব শব্দ শ্রবণদেশে উৎপন্ন হয়, এইরূপে শ্রবণদেশে শব্দের উৎপত্তির অনুমান করিলে, শব্দে উৎপত্তিবর্ণন সিন্ধু হইবে, তদ্বারা শব্দের অনিত্যতা সিন্ধু হইবে, ইহাই সূত্রকার ও ভাষ্যকারের তাৎপর্য। পূর্বোক্তরূপে শ্রবণদেশে শব্দের উৎপত্তির অনুমানই ভাষ্যোক্ত সম্বন্ধানুমান। ভাষ্যকার পূর্বোক্তরূপ তাৎপর্যেই ঐ কথা বলিয়াছেন। শব্দ শ্রবণদেশে উৎপন্ন না হইলে, অস্বর্ত্ত বা গতিহীন শ্রবণেন্দ্রিয়ের সহিত তাহার সম্বন্ধ হইতে পারে না, সম্বন্ধ না হইলেও শব্দ শ্রবণেন্দ্রিয়গ্রাহ্য হইতে পারে না, এইরূপ তর্কের দ্বারা অনুগৃহীত হইয়া পূর্বোক্ত বিশেষানুমান শব্দসম্বন্ধ সিন্ধু করিবে। সূত্রে মহর্ষি “বিশেষণ” শব্দের দ্বারা শব্দসম্বন্ধের অনুমানে এইরূপ বিশেষ বা বৈশিষ্ট্য সূচনা করিয়াছেন মনে হয়।

বৃত্তিকার বিশ্বনাথ প্রভৃতি নব্যগণ সূত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, অনুমানে অর্থাৎ ইন্দ্রিয়কল্প-রূপ হেতুতে সম্বন্ধ অর্থাৎ জ্ঞাতির বিশেষবস্তুবশতঃ ব্যক্তির নাই। “সম্বন্ধ” শব্দের অর্থ “জ্ঞাতি”। ঘটক পটবাদি জ্ঞাতিতে ইন্দ্রিয়কল্প থাকিলেও জ্ঞাতি না থাকায়, জ্ঞাতিবিশিষ্ট ইন্দ্রিয়কল্পরূপ হেতু নাই, সূত্রগ্রন্থ ব্যক্তির নাই, ইহাই বৃত্তিকার ও তদ্রূপ বর্ত্তীদিগের বক্তব্য। গবেশের শব্দচিন্তামণির “আলোক” টীকার মৈথিল পঞ্চম নিম্ন শব্দের অনিত্যত্বানুমানে যে হেতুর উল্লেখ করিয়াছেন, তদনুসারে বৃত্তিকার বিশ্বনাথ এখানে ঐরূপ সূত্রার্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, বুঝা যায়। কিন্তু “সম্বন্ধ” শব্দের দ্বারা জ্ঞাতি অর্থ ব্যাখ্যা করিতে বিশ্বনাথ যে কষ্টকরনা করিয়াছেন, তাহা প্রকৃত বলিয়া মনে হয় না। “তন্” শব্দের অর্থ বিস্তার। “সম্বন্ধ” শব্দের দ্বারা সম্যক বিস্তার বা বাহ্য সম্যক বিস্তৃত হয়, এই অর্থ বুঝা যাইতে পারে। তাৎপর্যটীকাকার “সম্বন্ধোক্তি” এইরূপ ব্যুৎপত্তি প্রকাশ করিয়াছেন। এই অর্থে শব্দ হইতে শব্দান্তরের উৎপত্তিক্রমে বিস্তারপ্রাপ্ত শব্দসমষ্টিকেও শব্দসম্বন্ধ বলা যায়। কিন্তু জ্ঞাতি অর্থে “সম্বন্ধ” শব্দের প্রয়োগ প্রসিদ্ধ নাই। মহর্ষি গৌতম জ্ঞাতি বুঝাইতে “সামান্য” ও “জ্ঞাতি” শব্দেরই প্রয়োগ করিয়াছেন। পূর্বোক্ত চতুর্দশ সূত্রে “সামান্য” শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। এই সূত্রে জ্ঞাতি অর্থে অপ্রসিদ্ধ “সম্বন্ধ” শব্দের প্রয়োগ কেন করিবেন, ইহা চিন্তনীয়। ১৩।

ভাষ্য। যদপি নিত্যৈষ্যপ্যানিত্যবদ্রূপচারাদিতি, ন।

অনুবাদ। আর যে ( উক্ত হইয়াছে ) নিত্যপদার্থেও অনিত্যপদার্থের ন্যায় ব্যবহার থাকায় ( ব্যক্তির হয় )—ইহা নহে, অর্থাৎ সে ব্যক্তির নাই।

সূত্র। কারণদ্রব্যস্যা প্রদেশশব্দেনাভিধানাৎ \*

॥ ১৭ ॥ ১৪৩ ॥

১। শব্দোহনিত্যঃ সোমাত্মকঃ সতি বিশেষণগুণাসমানাদিকরণবহিঃসিদ্ধিগ্রহণাত্মকঃ।—আলোক।

২। প্রচলিত অনেক পুস্তকেই উক্ত সূত্রপাঠের শেষভাগে “নিত্যৈষ্যপ্যানিত্যবদ্রূপচারাদিতি”—এইরূপ অতিরিক্ত সূত্রপাঠ

অনুবাদ। (উত্তর) যেহেতু “প্রদেশ” শব্দের দ্বারা কারণ-দ্রব্যের অভিধান হয় [অর্থাৎ জন্মদ্রব্যের সমবায়ি কারণ অবয়বরূপ দ্রব্যকেই তাহার প্রদেশ বলে। নিত্যদ্রব্য আকাশ ও আত্মার কারণদ্রব্যরূপ প্রদেশ নাই, সুতরাং তাহার প্রদেশ ব্যবহার যথার্থ নহে। সুতরাং আত্মা ও আকাশে বৃক্ষাদি অনিত্য পদার্থের স্থায় যথার্থ প্রদেশ-ব্যবহার না হওয়ায়, তাহাতে হেতু না থাকায়, পূর্বোক্ত ব্যভিচার নাই]।

ভাষ্য। এবমাকাশপ্রদেশঃ আত্মপ্রদেশ ইতি। নাত্রাকাশাত্মনোঃ কারণদ্রব্যমভিধীয়তে, যথা কৃতকস্য। কথং হবিদ্যমানমভিধীয়তে? অবিদ্যমানতা চ প্রমাণতোহনুপলব্ধেঃ। কিং তর্হি তত্রাভিধীয়তে? সংযোগস্যাব্যাপ্যবৃত্তিত্বং। পরিচ্ছিন্নেন দ্রব্যেণাকাশস্ত সংল্লাগো নাকাশং ব্যাপ্নোতি, অব্যাপ্য বর্তত ইতি, তদস্ত কৃতকেন দ্রব্যেণ সামান্যং, ন হানিলকরোঃ সংযোগ আশ্রয়ং ব্যাপ্নোতি, সামান্যকৃতা চ ভক্তিরাকাশস্য প্রদেশ ইতি। অনেনাত্মপ্রদেশো ব্যাখ্যাতঃ। সংযোগবচ্চ শব্দবুদ্ধ্যাদীনা-মব্যাপ্যবৃত্তিত্বমিতি। পরোক্ষিতা চ তীব্রমন্দতা শব্দতত্ত্বং ন ভক্তিকৃতেতি।

কস্মাৎ পুনঃ সূত্রকারস্তাশ্মিন্নর্থো সূত্রং ন শ্রীত ইতি। শীলমিদং ভগবতঃ সূত্রকারস্ত বহুধিকরণেষু দ্বৌ পক্ষৌ ন ব্যবস্থাপয়তি, তত্র শাস্ত্রসিদ্ধান্তান্তবধারণং প্রতিপত্তুমর্হতীতি মন্যতে। শাস্ত্রসিদ্ধান্তস্ত স্থায়সমাখ্যাতমনুমতং বহুশাখমনুমানমিতি।

অনুবাদ। “এইরূপ আকাশের প্রদেশ, আত্মার প্রদেশ” এই কথা (উক্ত হইয়াছে) এখানে, অর্থাৎ এই প্রয়োগে (প্রদেশ শব্দের দ্বারা) আকাশ ও আত্মার কারণদ্রব্য অভিহিত হয় না, যেমন কৃতকের, অর্থাৎ যেমন জন্মদ্রব্যের কারণদ্রব্য অভিহিত হয় [অর্থাৎ জন্মদ্রব্য বৃক্ষাদির প্রদেশ বলিলে, সেখানে ঐ “প্রদেশ” শব্দের দ্বারা যেমন ঐ বৃক্ষাদির কারণ শাখাদি অবয়ব দ্রব্য বুঝা যায়, তদ্রূপ আকাশাদি নিত্যদ্রব্যের প্রদেশ বলিলে সেখানে ঐ “প্রদেশ” শব্দের দ্বারা আকাশাদির কারণ-দ্রব্য বুঝা যায় না], যেহেতু অবিদ্যমান, অর্থাৎ যাহা নাই—তাহা কিরূপে অভিহিত হইবে? প্রমাণের দ্বারা উপলব্ধি না হওয়ায় (আকাশাদির প্রদেশের) বিদ্যমানতা নাই। (প্রশ্ন) তাহা হইলে সেই স্থলে “প্রদেশ” শব্দের দ্বারা কি অভিহিত হয়, অর্থাৎ

দেখা যায়। কিন্তু ঐ অংশ সূত্রপাঠ নহে। তাৎপর্যবোধিকা, তাৎপর্যপরিভূক্তি ও ভাষ্যপট্টনিবন্ধানুসারে উল্লিখিত সূত্রপাঠই গৃহীত হইয়াছে। শূন্যকাকরূপ অতিরিক্ত সূত্রপাঠ এখানে আবশ্যক ও সম্ভব নহে।



বদি আকাশাদিৰ প্ৰদেশ না থাকে, তাহা হইলে “আকাশেৰ প্ৰদেশ” “আত্মাৰ প্ৰদেশ” এইৰূপ প্ৰয়োগে “প্ৰদেশ” শব্দেৰ দ্বাৰা কি বুঝা যায় ? ( উত্তৰ ) সংযোগেৰ অব্যাপ্যবৃত্তিহ। পৰিচ্ছিন্ন দ্ৰব্যেৰ সহিত আকাশেৰ সংযোগ আকাশকে ব্যাপ্ত কৰে না, ব্যাপ্ত না কৰিয়া বৰ্ত্তমান হয়। তাহা ইহাৰ ( আকাশেৰ ) জগদ্ৰব্যেৰ সহিত সাদৃশ্য, যেহেতু দুইটি আমলকীৰ সংযোগ আশ্ৰয়েৰে ব্যাপ্ত কৰে না [ অৰ্থাৎ জগদ্ৰব্য আমলকী প্ৰভৃতিৰ পৰস্পৰ সংযোগ হইলে, সেই সংযোগ যেমন সমস্ত আশ্ৰয়েৰে ব্যাপ্ত কৰে না, উহা আশ্ৰয়েৰে ব্যাপ্ত না কৰিয়াই বৰ্ত্তমান হয়, তদ্রূপ আকাশেৰ সহিত ঐ আমলকী প্ৰভৃতি জগদ্ৰব্যেৰ সংযোগ হইলে ঐ সংযোগও আকাশ ব্যাপ্ত কৰে না, সুতৰাং জগদ্ৰব্যেৰ সহিত আকাশেৰ ঐ রূপ সাদৃশ্য আছে। ]

“আকাশেৰ প্ৰদেশ”—এই প্ৰয়োগে “সামান্যকৃত”, অৰ্থাৎ পূৰ্বেবাক্ত সাদৃশ্য-প্ৰযুক্ত ভক্তি, [ অৰ্থাৎ ঐ স্থলে পূৰ্বেবাক্ত সাদৃশ্য-সম্বন্ধ-বশতঃ “প্ৰদেশ” শব্দে গোপী-লক্ষণা বুঝিতে হইবে। ] ইহাৰ দ্বাৰা, অৰ্থাৎ “আকাশেৰ প্ৰদেশ” এই প্ৰয়োগে প্ৰদেশ শব্দেৰ অৰ্থব্যাখ্যাৰ দ্বাৰা আত্মাৰ প্ৰদেশ ব্যাখ্যাত হইল, অৰ্থাৎ “আত্মাৰ প্ৰদেশ” এই প্ৰয়োগেও প্ৰদেশ শব্দেৰ দ্বাৰা পূৰ্বেবাক্তৰূপ লাঞ্জনিক অৰ্থ বুঝিতে হইবে। সংযোগেৰ ত্ৰায় শব্দও জ্ঞানাদিৰ অব্যাপ্যবৃত্তিহ, অৰ্থাৎ সংযোগ যেমন তাহাৰ সমস্ত আশ্ৰয়েৰে ব্যাপ্ত কৰে না, তদ্রূপ শব্দ ও আকাশকে এবং জ্ঞানাদি ও আত্মাকে ব্যাপ্ত কৰে না, উহাৰাও অব্যাপ্যবৃত্তি। তীব্ৰতা ও মন্দতা শব্দেৰ তত্ত্বৰূপে পৰীক্ষিত হইয়াছে ( উহা ) ভক্তিকৃত ( ভাক্ত ) নহে। [ অৰ্থাৎ তীব্ৰত্ব ও মন্দত্ব শব্দেৰ বাস্তবধৰ্ম্ম, উহা শব্দে আৰোপিত ধৰ্ম্ম নহে, ইহা পূৰ্বেবাক্ত ত্ৰয়োদশ সূত্ৰভাষ্যে নিৰ্দ্ধাৰিত হইয়াছে। সুতৰাং আকাশেৰ প্ৰদেশ ব্যবহাৰেৰ ত্ৰায় শব্দে তীব্ৰত্ব মন্দত্ব ব্যবহাৰও ভাক্ত ইহা বলা যাইবে না। ]

( প্ৰশ্ন ) এই অৰ্থে অৰ্থাৎ আকাশাদি নিত্যদ্ৰব্যেৰ প্ৰদেশ নাই—এই সিদ্ধান্ত প্ৰকাশ কৰিতে সূত্ৰকাৰেৰ সূত্ৰ কেন শ্ৰুত হয় না ? অৰ্থাৎ সূত্ৰকাৰ মহৰ্ষি অক্ষপাদ এখানে ঐ সিদ্ধান্তবোধক সূত্ৰ কেন বলেন নাই ? ( উত্তৰ ) বহু প্ৰকৰণে দুইটি পক্ষ ব্যবস্থাপন কৰেন না—ইহা ভগবান্ সূত্ৰকাৰেৰ ( মহৰ্ষি অক্ষপাদেৰ ) স্বভাব। সেই স্থলে ( বোদ্ধা ) শাস্ত্ৰসিদ্ধান্ত হইতে তত্ত্বনিৰ্ণয় লাভ কৰিতে পারে, ইহা ( সূত্ৰকাৰ ) মনে কৰেন। শাস্ত্ৰসিদ্ধান্ত কিন্তু “ত্ৰায়” নামে প্ৰসিদ্ধ ; অনুমত, অৰ্থাৎ প্ৰত্যক্ষ ও শব্দপ্ৰমাণেৰ অবিৰুদ্ধ বহুশাখ—অনুমান।

টিপ্পনী। মহৰ্ষি পূৰ্বেবাক্ত চতুৰ্দশ সূত্ৰে “নিত্যোষপানিনিত্যবহুপচাৰাং” এইকথা বলিয়া



ত্রয়োদশ সূত্রোক্ত তৃতীয় হেতুতে যে ব্যভিচার প্রদর্শন করিয়াছেন, এই সূত্রের দ্বারা তাহার নিরাস করিয়াছেন। তাই ভাষ্যকার এখানে মহর্ষির চতুর্দশ সূত্রোক্ত “নিত্যেত্বপি” ইত্যাদি অংশের উল্লেখপূর্বক “ইতি ন” এই বাক্যের উল্লেখ করিয়া মহর্ষির সূত্রের অবতারণা করিয়াছেন। ভাষ্যকারের ঐ বাক্যের সহিত সূত্রের বোঝনা বুঝিতে হইবে। মহর্ষি তৃতীয় হেতু বলিয়াছেন, অনিত্যপদার্থের জ্ঞান ব্যবহার। অনিত্য সূত্রস্থলে যেমন তীব্রত্ব ও মন্দত্বের ব্যবহার হয়, তদ্রূপ শব্দেও তীব্রত্ব ও মন্দত্বের ব্যবহার হয়, অতএব সূত্রস্থলের জ্ঞান শব্দও অনিত্য। ভাষ্যকার ঐ হেতুর দ্বারা শব্দ উৎপত্তিবিশেষক, অভিযান্ত্রিকশব্দক নহে—ইহাই সিদ্ধ করিয়াছেন। মহর্ষি ঐ হেতুতে ব্যভিচার প্রদর্শন করিতে বলিয়াছেন যে, নিত্যপদার্থেও যখন অনিত্যপদার্থের জ্ঞান ব্যবহার হয়, তখন অনিত্যপদার্থের জ্ঞান ব্যবহার অনিত্য বা উৎপত্তিবিশেষকত্বের সাধক হয় না, উহা ব্যভিচারী। ভাষ্যকার ইহা বুঝাইতে বলিয়াছেন যে, যেমন বুদ্ধের প্রদেশ, কবলের প্রদেশ—এইরূপ প্রয়োগ বা ব্যবহার হয়, এইরূপ “আকাশের প্রদেশ, আত্মার প্রদেশ”—এইরূপও প্রয়োগ বা ব্যবহার হয়, সুতরাং আকাশাদি নিত্যপদার্থেও অনিত্য বুদ্ধাদির জ্ঞান প্রদেশ ব্যবহার হওয়ার পূর্বোক্ত ঐ হেতু ব্যভিচারী। বুদ্ধিকার বিশ্বনাথ প্রভৃতি নব্যগণ এই ব্যভিচারের ব্যাখ্যা করিতে আকাশাদির প্রদেশ ব্যবহার প্রদর্শন করেন নাই। তাঁহারা অন্তরূপ ব্যবহার বা প্রয়োগের উল্লেখপূর্বক মহর্ষির অভিন্নত ব্যভিচার ব্যাখ্যা করিয়া, এই সূত্রের ব্যাখ্যার আকাশাদির প্রদেশ ব্যবহারকে গৌণ বলিয়াছেন। কিন্তু মহর্ষির এই সূত্রের দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায়, তিনি নিত্য দ্রব্যের প্রদেশ ব্যবহারকেই গ্রহণ করিয়া, পূর্বোক্ত চতুর্দশ সূত্রে তাঁহার তৃতীয় হেতুতে ব্যভিচার প্রদর্শন করিয়াছেন। তাই ভাষ্যকারও সেখানে “এইরূপ আকাশের প্রদেশ, আত্মার প্রদেশ”—এটুকু বলিয়া, আকাশাদির প্রদেশ ব্যবহার প্রদর্শন করিয়া, ঐ ব্যভিচার বুঝাইয়াছেন। এবং এখানেও সূত্রার্থবর্ণন করিতে, প্রথমে “আকাশপ্রদেশ”, “আত্মপ্রদেশ” এইরূপ প্রয়োগই প্রদর্শন করিয়া সূত্রার্থ বর্ণনপূর্বক ঐ “প্রদেশ” শব্দের অর্থ বলিয়াছেন।

মহর্ষি পূর্বোক্ত ব্যভিচার নিরাস করিতে এইসূত্রে বলিয়াছেন যে, “প্রদেশ” শব্দের দ্বারা কারণদ্রব্য বুঝা যায়। অর্থাৎ বুদ্ধাদি জন্তুদ্রব্যের সমষ্টি কারণ, যে তাহার অবয়বরূপ দ্রব্য; তাহাই “প্রদেশ” শব্দের মুখ্যার্থ। বুদ্ধের প্রদেশ বলিলে, বুদ্ধের কারণদ্রব্য শাখাদি অবয়ব বুঝা যায়। আকাশ ও আত্মা নিত্যদ্রব্য, তাহার কোন কারণই নাই, সুতরাং আকাশ ও আত্মার প্রদেশ নাই। বাহা নাই—বাহা অবিদ্যমান, তাহা সেখানে প্রদেশ শব্দের দ্বারা বুঝা যাইতে পারে না। সুতরাং আকাশের প্রদেশ, এবং আত্মার প্রদেশ, এইরূপ প্রয়োগে “প্রদেশ” শব্দের দ্বারা তাহার পূর্বোক্তরূপ মুখ্যার্থ বুঝা যায় না। ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, প্রমাণের দ্বারা আকাশ ও আত্মার প্রদেশ উপলব্ধি করা যায় না, সুতরাং উহা নাই। কিন্তু কোন পরিচ্ছিন্ন দ্রব্যের সহিত আকাশের সংযোগ হইলে, ঐ সংযোগ সমস্ত আশ্রয় ব্যাপ্ত করিতে পারে না। যেমন হুইট আমলকীর সংযোগ হইলে ঐ সংযোগ ঐ আমলকীর সর্বাংশ ব্যাপ্ত করিতে পারে না, এজন্ত উহাকে “অব্যাপ্যবৃষ্টি” বলা হয়, তদ্রূপ বিশ্বব্যাপী আত্মাও আকাশের সহিত ঘটাদি



জ্যোতের সংযোগ ও অব্যাপ্যবৃত্তি। ঘটাদি জ্ঞাতজ্যোতের সহিত আকাশাদি নিত্যজ্যোতের ঐক্য নাদৃশ্য আছে। ঐ সাদৃশ্যপ্রযুক্তই ঘটাদি জ্যোতের জ্ঞায় আকাশাদি জ্যোতের প্রদেশ ব্যবহার হয়। আকাশাদির প্রদেশ বলিলে সেখানে ঐ প্রদেশ শব্দের দ্বারা ঘটাদি জ্যোতের সংযোগের জ্ঞায়— ঘটাদি জ্যোতের সহিত আকাশাদি জ্যোতের সংযোগ যে অব্যাপ্যবৃত্তি, ইহাই বুঝা যায়। প্রদেশ শব্দের পূর্বোক্ত মুখ্যার্থ সেখানে বুঝা যায় না, কারণ তাহা সেখানে অলীক। উদ্যোতকর বলিয়াছেন যে, প্রদেশবিশিষ্ট ঘটাদি জ্যোতের জ্ঞায় আকাশাদির সংযোগও অব্যাপ্যবৃত্তি, এ জ্ঞাত আকাশাদি জ্যোত প্রদেশবিশিষ্ট ঘটাদি জ্যোতের সদৃশ। ঐ সাদৃশ্যরূপ “ভক্তি”-বশতঃ ঘটাদি জ্যোত প্রদেশ শব্দের জ্ঞায় আকাশাদি জ্যোতও প্রদেশ শব্দের প্রয়োগ হয়। উদ্যোতকর নাদৃশ্যকেই “ভক্তি” বলিয়া তৎপ্রযুক্ত ঐক্য প্রয়োগকে ভাক্ত বলিয়াছেন। ভাষ্যকার ঐহলে সাদৃশ্যপ্রযুক্ত ভক্তি, এই কথা বলিয়া, ঐ প্রয়োগকে ভাক্ত বলিয়াছেন। ভাষ্যকারের কথায় তিনি সাদৃশ্য-সদ্বন্ধ-প্রযুক্ত গোণীলক্ষণাকেই “ভক্তি” বলিয়াছেন, ইহা বুঝা যায়। প্রথম অধ্যায়েও (২ অ., ১৪ হৃতভাষ্যে) ভাষ্যকারের ঐক্য কথা পাওয়া যায়। লক্ষণার্থে “ভক্তি” শব্দের প্রয়োগ আরও বহুদ্রষ্টব্য দেখা যায়। ভাষ্যকার সাদৃশ্য-সদ্বন্ধ-প্রযুক্ত গোণীলক্ষণা স্থলেই “ভক্তি” শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। সাদৃশ্য-সদ্বন্ধ-বিশেষকেই গোণীলক্ষণা বলিলে, উদ্যোতকরের ব্যাখ্যাত ভক্তিপদার্থও বস্তুতঃ গোণীলক্ষণাই হইবে। মূলকথা আকাশাদির প্রদেশ বলিলে, সেখানে ঐ “প্রদেশ” শব্দ মুখ্য নহে, উহা লাক্ষণিক। ইহার দ্বারা সেখানে আকাশাদির সংযোগের অব্যাপ্যবৃত্তি বুঝা যায়। তাহাতে প্রদেশবিশিষ্ট ঘটাদি জ্ঞাতজ্যোতের সহিত আকাশাদি নিত্যজ্যোতের পূর্বোক্তরূপ সাদৃশ্যই বুঝা যায়। আকাশাদি নিত্যজ্যোতের অবয়ব না থাকায়, তাহাতে অবয়বরূপ প্রদেশ-পদার্থের যথার্থ জ্ঞান হইতে পারে না। তাহাতে অনিত্য-পদার্থের জ্ঞায় যথার্থ প্রদেশজ্ঞান না হওয়ার, পূর্বোক্ত হেতু নাই। কারণ “কৃতকব্জপচারং” এই কথার দ্বারা অনিত্যপদার্থের জ্ঞায় কোন ধর্মের যথার্থ ব্যবহার বা যথার্থ জ্ঞানবিষয়ই হেতু বলা হইয়াছে। আকাশাদি নিত্যপদার্থে ঐ হেতু না থাকায়, ব্যভিচার নাই। আকাশ ও আত্মার প্রদেশ না থাকিলে, আকাশের গুণ শব্দ ও আত্মার গুণ-জ্ঞানাদি ব্যাপ্যবৃত্তি স্বীকার করিতে হয়? এতদ্বত্তরে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, আকাশ ও আত্মা বিখ্যাপী নিত্যপ্রদেশপদার্থ হইলেও যেমন তাহা সংযোগ অব্যাপ্যবৃত্তি, তদ্রূপ শব্দ ও জ্ঞানাদিও অব্যাপ্যবৃত্তি। কোন শব্দই আকাশে নিরবচ্ছিন্ন বর্তমান হয় না, এবং জ্ঞানাদি গুণবিশেষও আত্মাতে নিরবচ্ছিন্ন বর্তমান হয় না। শরীরবচ্ছিন্ন আত্মাতেই জ্ঞানাদি গুণ জন্মে। ফলকথা, সংযোগের জ্ঞায় শব্দ ও জ্ঞানাদিও অব্যাপ্যবৃত্তি হইতে পারে। আপত্তি হইতে পারে যে, আকাশ ও আত্মাতে প্রদেশ ব্যবহার যেমন ভাক্ত বা গোণ বলা হইতেছে, তদ্রূপ শব্দে তীব্র ও মন্দত্বের ব্যবহারও ভাক্ত বলিব। তাহা হইলে অনিত্য স্বধ-রূপের জ্ঞায় শব্দে বাস্তব তীব্র ও মন্দত্ব না থাকায় অনিত্যপদার্থের জ্ঞায় যথার্থ ব্যবহার শব্দেও নাই, স্তূতরাং শব্দে মহাবির অতিমত হেতু না থাকায়, ঐ হেতুর দ্বারা তিনি সাধ্য সাধন করিতে পারেন না। এতদ্বত্তরে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, তীব্র ও মন্দত্ব শব্দের

তৎ, অর্থাৎ উহা শব্দের বাস্তবধর্ম, উহা ভ্রান্ত নহে, ইহা পূর্বে পরীক্ষিত হইয়াছে। অর্থাৎ শব্দে যদি তীত্র ও মন্দত্ব বস্তুতঃ না থাকে, উহা যদি শব্দে আরোপিত ধর্ম হয়, তাহা হইলে তীত্র শব্দ মন্দ শব্দকে অভিব্যক্ত করিতে পারে না। বাহা বস্তুতঃ তীত্র, তাহাই মন্দকে অভিব্যক্ত করিতে পারে। বাহা মন্দ তাহাকে তীত্র বলিয়া ভ্রম করিলেও উহা সেখানে মন্দকে অভিব্যক্ত করিতে পারে না। সুতরাং এক শব্দ যখন অপর শব্দকে অভিব্যক্ত করে—ইহা স্বীকার করিবার উপায় নাই—তখন তীত্র ও মন্দত্ব শব্দের বাস্তবধর্ম বলিয়াই স্বীকার করিতে হইবে। পূর্বোক্ত জ্যোদিশ সূত্রভাষ্যে তীত্র ও মন্দত্ব শব্দের বাস্তবধর্ম, ইহা নির্ণীত হইয়াছে। সুতরাং আকাশে প্রদেশ ব্যবহারের দ্বারা শব্দে তীত্র মন্দত্ব ব্যবহারকে ভ্রান্ত বলা বাইবে না।

আকাশ ও আত্মার প্রদেশ নাই—ইহা মহর্ষি গোতমের সিদ্ধান্ত হইলে, তিনি ঐ সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিতে এখানে কোন সূত্র বলেন নাই কেন? অর্থাৎ “কারণত্রয়ান্ত প্রদেশশব্দেনাভিধানাৎ” এই সূত্রে সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে আকাশাদির নিশ্চয়দেয় কথিত হয় নাই। সাক্ষাৎসম্বন্ধে ঐ অর্থপ্রকাশক সূত্র মহর্ষি এখানে কেন বলেন নাই? ভাব্যকার শেষে এখানে এই প্রশ্নের অবতারণা করিয়া তদন্তরে বলিয়াছেন যে, ভগবান্ সূত্রকারের স্বভাব এই যে, তিনি বহু-প্রকরণেই দুইটা পক্ষ সংস্থাপন করেন না। শব্দের অনিত্যরূপ একটি পক্ষই এখানে মহর্ষি হেতুর দ্বারা সংস্থাপন করিয়াছেন। তাহাতে আকাশাদির নিশ্চয়দেয়রূপ পক্ষ সংস্থাপনীয় হইলেও তিনি তাহা সংস্থাপন করেন নাই। বহু অধিকরণে অর্থাৎ অনেক প্রকরণেই সূত্রকার মহর্ষি পক্ষদ্বয় সংস্থাপন করেন নাই—ইহা তাহার স্বভাব। তাৎপর্য্যটীকাকার বলিয়াছেন যে, আকাশাদির নিশ্চয়দেয় ও শব্দসত্ত্বান সূত্রকার সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে বলিলে, তাহাকে ঐ পক্ষসংস্থাপন করিতে হয়, কিন্তু তাহা তিনি বলেন নাই। মহর্ষি তাহা না বলিলে, তাহার ঐ সিদ্ধান্ত কিরূপে বুঝা যাইবে? এতদন্তরে ভাব্যকার বলিয়াছেন যে, শাস্ত্রসিদ্ধান্ত হইতেই বোদ্ধা ব্যক্তি তত্ত্বনির্ণয় লাভ করিতে পারিবে, ইহা মহর্ষি মনে করেন। অর্থাৎ মহর্ষি তাহা মনে করিয়াই সর্বত্র সকল সিদ্ধান্তের সংস্থাপন করেন নাই। “শাস্ত্রসিদ্ধান্ত” কাহাকে বলে? এতদন্তরে ভাব্যকার বলিয়াছেন যে, ভায়সমাখ্যাত, অর্থাৎ বাহাকে ভায় বলে, সেই অনুমত বহুশাখ অনুমান, অর্থাৎ প্রত্যক্ষ ও আগমের অবিরুদ্ধ অনুমানরূপ ভায়ই “শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত”। বোদ্ধা ব্যক্তি ঐ ভায়ের দ্বারা আকাশাদির নিশ্চয়দেয় বৃত্তিতে পারিবে। ভায় কাহাকে বলে—ইহা ভাব্যকার প্রথম অধ্যায়ে প্রথম সূত্রভাষ্যে বলিয়াছেন। এখানে ঐ ভায়কে “শাস্ত্রসিদ্ধান্ত” নামে উল্লেখ করিয়াছেন। পক্ষদ্বয় বিপক্ষে অস্ব প্রভৃতি পক্ষরূপ, অথবা তদ্ব্যবহায়ে রূপচতুষ্টয়ের সম্পর্তিই অনুমানরূপ বুদ্ধের বহুশাখা<sup>১</sup>। অনুমানের হেতুতে যে পক্ষদ্বয় প্রভৃতি পক্ষধর্ম অথবা উহার মধ্যে চারিটি ধর্ম থাকা আবশ্যক, ইহা প্রথম অধ্যায়ে হেতুভাসপ্রকরণে বলা হইয়াছে। এখানে অনুমানকে বহুশাখ বলিয়া ভাব্যকারও ঐ সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়াছেন। উদ্যোতকর ভাব্যকারোক্ত প্রশ্নের উত্তরে প্রথমে নিজে বলিয়াছেন যে, মহর্ষি এখানে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহার অর্থ পর্যালোচনার দ্বারা ইহা আকাশাদির



নিপ্রদেশক ও শব্দনতান বুঝা যায়, এই জ্ঞানই মহর্ষি উহা প্রকাশ করিতে এখানে কোন সূত্র বলেন নাই। বস্তুতঃ মহর্ষি এখানে স্পষ্টতঃ আকাশের নিপ্রদেশকবোধক কোন সূত্র না বলিলেও চতুর্গ অধ্যায়ের দ্বিতীয়াঙ্ককে ( ১৮ হইতে ২২ সূত্র জটব্য ) আকাশের সর্বব্যাপিত্ব প্রভৃতি ধর্মের স্পষ্ট উল্লেখ করিয়া, ঐ সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়াছেন। সেখানে মহর্ষির সূত্রের দ্বারা আকাশের নিত্যত্বও যে তাঁহার সিদ্ধান্ত, ইহা বুঝিতে পারা যায়। যাহাখানে এ সকল কথা আলোচিত হইবে।

ভাষ্যকার এখানে শেষে যেরূপ প্রশ্ন করিয়া, তাহার যেরূপ উত্তর বলিয়াছেন, তদ্বারা জ্ঞানদর্শনের অন্তর্ভুক্ত ঐরূপ প্রশ্ন হইলে, ঐরূপ উত্তরই সেখানে বুঝিতে হইবে—ইহা ভাষ্যকার প্রকাশ করিয়াছেন। মহর্ষি তাঁহার সকল সিদ্ধান্তই সূত্র দ্বারা বলেন নাই। জ্ঞানের দ্বারা অনেক সিদ্ধান্ত বুঝিয়া লইতে হইবে ও বোঝা ব্যক্তি বুঝিয়া লইতে পারিবে, ইহা মনে করিয়াই মহর্ষি সকল সিদ্ধান্ত সংস্থাপন করিয়া বলেন নাই। সূত্ররাং সূত্রকার মহর্ষির সূত্রের নূনতা বা সিদ্ধান্ত-প্রকাশের নূনতা গ্রহণ করা যায় না। বস্তুতঃ ভাষ্যকার প্রভৃতি জ্ঞানচর্চায়াগণ গোতমের অন্তর্ভুক্ত অনেক সিদ্ধান্তকেই জ্ঞানের দ্বারা গোতমসিদ্ধান্তরূপে নির্ণয় করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।

এখানে আর একটি কথা লক্ষ্য করা অবশ্যক যে, ভাষ্যকার নিজে সূত্ররচনা করিলে, এখানে তিনি ঐরূপ প্রশ্ন করিয়া ঐ রূপ উত্তর দিতেন না। সুরচিত সূত্রের দ্বারাই মহর্ষির নূনতা পরিহার করিতেন। যাহারা জ্ঞানদর্শনের দ্বিতীয় অধ্যায়কে পরবর্ত্তিকালে অস্ত্রের রচিত বলিয়া বিশ্বাস করেন, তাহারা এখানে প্রাচীন ভাষ্যকারের বিশ্বাসকে বিশেষরূপে লক্ষ্য করিবেন। তবে ইহা মনে করিতে পারি যে, ভাষ্যকারের পূর্বে এখানে অস্ত্র কেহ অতিরিক্ত সূত্র কল্পনা করিয়াছিলেন, ভাষ্যকার ঐ অনার্য সূত্রকে পরিত্যাগ করিয়াছেন। তাহাতে সূত্রকারের নূনতার আশঙ্কা হওয়ার পূর্বোক্ত-রূপ প্রশ্নের অবতারণা করিয়া পূর্বোক্তরূপ উত্তর বলিয়াছেন। মহর্ষি বহু প্রকরণেই দুইটি পক্ষ ব্যবস্থাপন করেন নাই, ইহা জ্ঞানদর্শনের অনেক স্থানে দেখিয়া ভাষ্যকার উহা ভগবান্ সূত্রকারের স্বভাব বুঝিয়াছেন, এবং এখানে তাহাই বলিয়া মহর্ষির সূত্র নূনতার পরিহার করিয়াছেন। ভাষ্যকারের এই কথা দ্বারা তাঁহার পূর্বে বা তাঁহার সময়ে অনেক জ্ঞানসূত্র বিলুপ্ত হইয়াছিল, প্রচলিত জ্ঞানসূত্রের মধ্যে অনেকগুলো সূত্রের নূনতা দেখিয়া অনেক সূত্র কল্পিত হইয়াছিল, ভাষ্যকার সেই কল্পিত অনার্য সূত্রগুলিকে পরিত্যাগ করিয়া প্রকৃত জ্ঞান-সূত্রের উদ্ধারপূর্বক তাহার ভাষ্য রচনা করিয়াছেন, ইহা মনে করা বাইতে পারে। স্বধীগণ এখানে ভাষ্যকারের পূর্বোক্তরূপ প্রশ্ন ও উত্তরে বিশেষ মনোযোগ করিয়া এখানে ভাষ্যকারের ঐরূপ প্রশ্নের অবতারণার পূর্বোক্তরূপ কোন কারণ থাকিতে পারে কি না, ইহা চিন্তা করিবেন ॥ ১৭ ॥

ভাষ্য। তথাপি খন্দিদমন্তি, ইদং নাস্তীতি কুত এতৎ প্রতিপত্তব্যমিতি, প্রমাণত উপলব্ধেরনুপলক্ষেতি, অবিদ্যমানস্তর্হি শব্দঃ—

অনুবাদ। পক্ষান্তরে, অর্থাৎ শব্দের নিত্যত্বপক্ষই সিদ্ধান্ত বলিলে, (শব্দনিত্যত্ব-বাদোদিগের নিকটে প্রশ্ন)—এই বস্তু আছে, এই বস্তু নাই, ইহা কোন্ হেতুবশতঃ,

বুঝিবে ? (উত্তর) প্রমাণের দ্বারা উপলব্ধিবশতঃ এবং অনুপলব্ধিবশতঃ,—অর্থাৎ প্রমাণের দ্বারা যে বস্তুর উপলব্ধি হয়, তাহা আছে ; যাহার উপলব্ধি হয় না, তাহা নাই । তাহা হইলে শব্দ অবিদ্যমান ?

সূত্র । প্রাণুচ্চারণাদনুপলব্ধেরাবরণাদনুপলব্ধেচ্চ ॥

॥১৮॥১৪৭॥

অনুবাদ । যেহেতু উচ্চারণের পূর্বের (শব্দের) উপলব্ধি হয় না, এবং আবরণাদির, অর্থাৎ শব্দের কোন আবরণক অথবা শব্দপ্রবণের কোন কারণাভাবের উপলব্ধি হয় না ।

ভাষ্য । প্রাণুচ্চারণান্নাস্তি শব্দঃ, কস্মাৎ ? অনুপলব্ধেঃ । সতোহনুপলব্ধিরাবরণাদিভ্য, এতমোপপদ্যতে, কস্মাৎ ? আবরণাদীনামনুপলব্ধিকারণানামগ্রহণাৎ । অনেকাবৃতঃ শব্দো নোপলভ্যতে, অসম্বন্ধকৃৎশ্চেন্দ্রিয়ব্যবধানাদিত্যেবমাদ্যনুপলব্ধিকারণং ন গৃহ্যত ইতি, সোহয়মনুচ্চারিতো নাস্তীতি ।

উচ্চারণমন্ত্য ব্যঞ্জকং তদভাবাৎ প্রাণুচ্চারণাদনুপলব্ধিরিতি । কিমিদ-  
মুচ্চারণং নামেতি । বিবক্ষাজনিতেন প্রযত্নেন কৌষ্ঠ্যস্ত বায়োঃ প্রেরিতস্ত  
কণ্ঠতাল্লাদিপ্রতিঘাতঃ, যথাস্থানং প্রতিঘাতাধ্বর্গাভিব্যক্তিরিতি । সংযোগ-  
বিশেষো বৈ প্রতিঘাতঃ, প্রতিবিদ্ধঞ্চ সংযোগস্ত ব্যঞ্জকত্বং, তস্মান্ন ব্যঞ্জকা-  
ভাবাদগ্রহণং, অপি স্বভাবাদেবেতি । সোহয়মুচ্চার্যমাণঃ শ্রুতে, শ্রুয়-  
মাণশ্চাত্ত্বা ভবতীত্যনুমীয়তে । উক্তকোচ্চারণান্ন শ্রুতে, স ত্বা ন  
ভবতি, অভাবান্ন শ্রুত ইতি । কথং ? আবরণাদ্যনুপলব্ধেরিত্যুক্তং ।  
তস্মাত্ত্বপত্তি-তিরোভাব-ধ্বঙ্গকঃ শব্দ ইতি ।

অনুবাদ । উচ্চারণের পূর্বের শব্দ নাই । (প্রশ্ন) কেন ? (উত্তর) যেহেতু উপলব্ধি হয় না । বিদ্যমানের, অর্থাৎ উচ্চারণের পূর্বের বিদ্যমান শব্দের আবরণাদি-প্রযুক্ত উপলব্ধি হয় না ; ইহা উপপন্ন হয় না, অর্থাৎ শব্দ উচ্চারণের পূর্বেরও বিদ্যমান থাকে, কিন্তু আবরণাদিপ্রযুক্ত তাহার উপলব্ধি হয় না, এ কথা বলা যায় না । (প্রশ্ন) কেন ? যেহেতু অনুপলব্ধির প্রয়োজক আবরণাদির উপলব্ধি হয় না । বিশদার্থ এই যে, এই পদার্থ কর্তৃক আবৃত শব্দ উপলব্ধ হইতেছে না, এবং ইন্দ্রিয়ের ব্যবধান-



বশতঃ অসম্বন্ধক (ইন্দ্রিয়সম্বন্ধক) শব্দ উপলব্ধ হইতেছে না, ইত্যাদি অনুপলব্ধির প্রযোজক, অর্থাৎ পূর্বোক্তরূপে শব্দের অনুপলব্ধির প্রযোজক কোন আবরণাদি উপলব্ধ হয় না। (অতএব) সেই এই অনুচ্চারিত (শব্দ) নাই।

(পূর্বপক্ষ) উচ্চারণ এই শব্দের ব্যঞ্জক, তাহার অভাববশতঃ উচ্চারণের পূর্বে (শব্দের) উপলব্ধি হয় না। (উত্তর) এই উচ্চারণ কি? অর্থাৎ যে পদার্থের নাম উচ্চারণ, ঐ পদার্থ কি? বিবক্ষাজনিত প্রযত্নের দ্বারা প্রেরিত উদরমধ্যগত বায়ু কর্তৃক কণ্ঠতালু প্রভৃতির প্রতিঘাত (উচ্চারণ)। যথাস্থানে প্রতিঘাতবশতঃ বর্ণের অভিযুক্তি হয় [অর্থাৎ পূর্বোক্তরূপ কণ্ঠতালু প্রভৃতির প্রতিঘাতই উচ্চারণ, এবং পূর্বপক্ষবাদী তাহাকেই বর্ণাত্মকশব্দের ব্যঞ্জক বলিবেন]।

কিন্তু প্রতিঘাত সংযোগবিশেষ, সংযোগের ব্যঞ্জকত্ব প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে, অর্থাৎ সংযোগ শব্দের ব্যঞ্জক হয় না, ইহা পূর্বোক্ত ত্রয়োদশ সূত্রভাষ্যে প্রতিপন্ন করিয়াছি। অতএব ব্যঞ্জকের অভাববশতঃ (শব্দের)—অনুপলব্ধি নহে, কিন্তু (শব্দের) অভাববশতঃই—অনুপলব্ধি। সেই এই শব্দ উচ্চাৰ্য্যমান হইয়া শ্রুত হয় (সূত্রাং) শ্রুতমান শব্দ (পূর্বে) বিজ্ঞমান না থাকিয়া উৎপন্ন হয়, ইহা অনুমিত হয়, এবং উচ্চারণের পরে (শব্দ) শ্রুত হয় না, (সূত্রাং) তাহা (শব্দ) উৎপন্ন হইয়া থাকে না, অর্থাৎ বিনষ্ট হয়, অভাববশতঃ অর্থাৎ উচ্চারণের পরে শব্দের বিনাশবশতঃ (শব্দ) শ্রুত হয় না। (প্রশ্ন) কেন? অর্থাৎ উচ্চারণের পূর্বে ও পরে শব্দের অভাববশতঃই যে, শব্দ শ্রবণ হয় না, ইহা কিরূপে বুঝিব? (উত্তর) যেহেতু আবরণাদির উপলব্ধি হয় না, ইহা উক্ত হইয়াছে। অতএব শব্দ উৎপত্তিশূন্য ও বিনাশশূন্যক।

টিগুনী। মহর্ষি শব্দের অনিত্যত্বসাধনে যে হেতু বলিয়াছেন—তাহাতে পূর্বপক্ষবাদীর প্রদর্শিত ব্যাতিচার নিরাস করিয়া এখন এই সূত্রের দ্বারা শব্দের নিত্যত্বরূপ বিপক্ষের বাধক তর্ক হুচনা করিতে বলিয়াছেন যে, যেহেতু উচ্চারণের পূর্বে শব্দের উপলব্ধি হয় না, এবং আবরণাদিরও উপলব্ধি হয় না। মহর্ষির তাৎপর্য্য এই যে, শব্দ যদি নিত্য হয়, তাহা হইলে উচ্চারণের পূর্বেও উপলব্ধ হউক? শব্দ নিত্য হইলে তাহা অবশ্য উচ্চারণের পূর্বেও বিদ্যমান থাকে। তাহা হইলে, তখন শব্দের শ্রবণ হয় না কেন? পূর্বপক্ষবাদী যদি বলেন যে, উচ্চারণের পূর্বেও শব্দ বিদ্যমান থাকে, ইহা সত্য, কিন্তু তখন কোন পদার্থ কর্তৃক শব্দ আবৃত থাকে, ঐ আবরণরূপ প্রতিবন্ধকবশতঃই তখন শব্দের শ্রবণ হয় না। শব্দ উচ্চারিত হইলে, তখন ঐ আবরণ না থাকায়, শব্দের শ্রবণ হয়। অথবা উচ্চারণের পূর্বে শব্দ থাকিলেও, তখন তাহার সহিত শ্রবণেন্দ্রিয়ের সন্নিবিষ্ট না থাকায়, অথবা তখন শব্দশ্রবণের ঐরূপ কোন কারণবিশেষের



অভাব থাকায় শব্দশ্রবণ হয় না। এতদ্ব্যতীত মহর্ষি বলিয়াছেন যে, আবরণাদির বন্ধন উপলব্ধি হয় না, তখন উহাও নাই। শব্দের উচ্চারণের পূর্বে যদি শব্দের অল্পপলঙ্কির প্রয়োজক পূর্বোক্ত আবরণাদি থাকিত, তাহা হইলে প্রমাণের দ্বারা অবশ্যই তাহার উপলব্ধি হইত। ফলকথা, পূর্বোক্তরূপ বিপক্ষবাদক তর্কের সূচনা করিয়া তদ্বারা মহর্ষি স্বপক্ষের সমর্থন করিয়াছেন, তাঁহার স্বপক্ষস্বাক্ষর হেতুতে ব্যভিচার শব্দ বা অপ্রয়োজক শব্দের নিরাস করিয়াছেন। ভাষ্যকার মহর্ষির তাত্পর্য্য বর্ণন করিতে প্রথমে “অথাপি” এই শব্দের দ্বারা পক্ষান্তর প্রকাশ করিয়া শব্দ-নিত্যবাদাদিগের নিকটে প্রশ্ন করিয়াছেন যে, “এই বস্তু আছে” এবং “এই বস্তু নাই”, ইহা কোন্ হেতুবশতঃ বুঝা যায়? অর্থাৎ বাহ্যার শব্দের নিত্যত্ব করনা করেন, তাঁহার বস্তুর অস্তিত্ব ও নাস্তিত্ব কিসের দ্বারা নির্ণয় করেন? অবশ্য প্রমাণের দ্বারা উপলব্ধি ও অল্পপলঙ্কিবশতঃই বস্তুর অস্তিত্ব ও নাস্তিত্বের নির্ণয় হয়, ইহাই ঐ প্রশ্নের উত্তর বলিতে হইবে। তাই ভাষ্যকার ঐ উত্তরই উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, তাহা হইলে শব্দ অবিদ্যমান, অর্থাৎ প্রমাণের দ্বারা উপলব্ধি না হইলেই যখন বস্তু নাই, ইহা বুঝা যায়, তখন উচ্চারণের পূর্বে শব্দও নাই, ইহা বুঝা যায়। ভাষ্যকার ইহার হেতু বলিতে মহর্ষির সূত্রের উল্লেখ করিয়াছেন। ভাষ্যকারের “অবিদ্যমানত্বিহি শব্দঃ”, এই বাক্যের সহিত সূত্রের যোজনা করিয়া সূত্রার্থ বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ প্রমাণের দ্বারা উপলব্ধি না হইলেই সেই বস্তু অবিদ্যমান, তাহা নাই, ইহা যখন পূর্বপক্ষবাদাদিগেরও অবশ্যস্বীকার্য্য, তখন উচ্চারণের পূর্বে শব্দ বিদ্যমান থাকে না, ইহা তাহাদিগেরও অবশ্যস্বীকার্য্য। কারণ উচ্চারণের পূর্বে শব্দের উপলব্ধি হয় না, শব্দের অল্পপলঙ্কির প্রয়োজক আবরণাদিরও উপলব্ধি হয় না।

ভাষ্যকার মহর্ষির সূত্রার্থ বর্ণন করিয়া শেষে শব্দ নিত্যবাদী মীমাংসক সম্প্রদায়ের স্বপক্ষ-সমর্থক যুক্তির উল্লেখপূর্বক পূর্বপক্ষ বলিয়াছেন যে, শব্দ উচ্চারণের পূর্বেও বিদ্যমান থাকে, কিন্তু তখন উচ্চারণ না থাকায়, বর্ণাস্বক শব্দের অস্তিত্বাভি হয় না। উচ্চারণই বর্ণাস্বক শব্দের ব্যঞ্জক, সুতরাং উচ্চারণের পূর্বে ঐ ব্যঞ্জক না থাকায়, বিদ্যমান শব্দেরও শ্রবণ হয় না। ভাষ্যকার মীমাংসক-সম্প্রদায়ের এই সমাধানের খণ্ডন করিতে প্রথমে উচ্চারণ কাহাকে বলে?—এইরূপ প্রশ্ন করিয়া, তদ্ব্যতীত বলিয়াছেন যে,—কোন শব্দ বলিতে ইচ্ছা হইলে, ঐ বিবক্ষা জন্ম যে প্রশ্ন উৎপন্ন হয়, তাহা কোঠা, অর্থাৎ উন্নয়নযোগ্য বায়ুকে প্রেরণ করে। তখন ঐ বায়ু কর্তৃক কর্ণ তালু প্রভৃতি স্থানের যে প্রতিঘাত হয়, তাহাই উচ্চারণপদার্থ। পূর্বপক্ষবাদী ঐ প্রতিঘাতরূপ উচ্চারণকেই বর্ণাস্বক শব্দের ব্যঞ্জক বলিবেন। কিন্তু পূর্বোক্তরূপ বায়ুবিষয়ের সহিত কর্ণ, তালু প্রভৃতি স্থানের বিলক্ষণ সংযোগই ঐ প্রতিঘাত। ঐ প্রতিঘাত ঐরূপ সংযোগবিশেষ তিন আর কোন পদার্থ হইতে পারে না। তাহা হইলে পূর্বোক্ত প্রতিঘাতরূপ উচ্চারণকে বর্ণের ব্যঞ্জক বলিয়া স্বীকার করার—বস্তুতঃ সংযোগবিশেষকেই বর্ণের ব্যঞ্জক বলিয়া স্বীকার করা হইতেছে। কিন্তু সংযোগ শব্দের ব্যঞ্জক হইতে পারে না; ইহা পূর্বোক্ত ত্রয়োদশ সূত্রতাব্যে বলা হইয়াছে। কর্ণ ও কুঠারের সংযোগ নিবৃত্ত হইলেই যেমন সেখানে ধ্বনিরূপ শব্দের শ্রবণ



হয়, এই শব্দ শ্রবণের অব্যবহিত পূর্বে এই কাঠ-কুঠার-সংযোগ বিদ্যমান না থাকায়, উহা এই শব্দের ব্যঞ্জক, অর্থাৎ শ্রবণরূপ অভিব্যক্তির কারণ হইতে পারে না, এইরূপ কঠ, তালু প্রভৃতি স্থানের সহিত পূর্বোক্ত বায়ুবিশেষের যে বিলক্ষণ সংযোগ, (যাহা উচ্চারণপদার্থ) তাহাও বর্ণাত্মক শব্দশ্রবণের অব্যবহিত পূর্বে না থাকায়, তাহাও এই শব্দের ব্যঞ্জক হইতে পারে না। ফলকথা, পূর্বোক্ত ত্রয়োদশ সূত্রতাবো যে যুক্তির দ্বারা ভাব্যকার কাঠ-কুঠার-সংযোগের ধ্বনি ব্যঞ্জকত্ব খণ্ডন করিয়াছেন, এইরূপ যুক্তির দ্বারা সংযোগ কোনরূপ শব্দেরই ব্যঞ্জক হইতে পারে না,—ইহা সেখানে ভাব্যকার প্রকাশ করিয়াছেন। শব্দের শ্রবণকেই শব্দের অভিব্যক্তি ও উহার কারণবিশেষকেই শব্দের ব্যঞ্জক বলিতে হইবে। শব্দশ্রবণের অব্যবহিত পূর্বে যখন পূর্বোক্ত সংযোগবিশেষরূপ উচ্চারণ থাকে না, তৎকালে পূর্বোৎপন্ন সংযোগবিশেষ বিনষ্ট হইয়া যায়, তখন তাহা এই শব্দশ্রবণের কারণ হইতে না পারায়, এই শব্দের ব্যঞ্জক হইতে পারে না, ইহাই এখানে ভাব্যকারের পূর্বোক্তরূপ যুক্তি।

উদ্যোতকর সূত্রার্থবর্ণন করিতে এখানে বলিয়াছেন যে, যে যুক্তির দ্বারা ঘটাদি-পদার্থ অনিত্য, ইহা উত্তর পক্ষেই সম্ভব, শব্দও সেই যুক্তি থাকায় শব্দও ঘটাদি-পদার্থের ভ্রাম অনিত্য, ইহা স্বীকার্য। ভাব্যকারও পরে সেই যুক্তির উল্লেখ করিয়া মহাবির সিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়াছেন। ভাব্যকার পরে বলিয়াছেন যে, শব্দ উচ্চার্যমান হইলেই শ্রুত হয়, অর্থাৎ উচ্চারণের পূর্বে শ্রুত হয় না, সূত্ররূপে অসম্ভব শব্দ পূর্বে ছিল না। পূর্বে অবিদ্যমান শব্দই কারণবশতঃ পরে উৎপন্ন হয়, ইহা অনুমানের দ্বারা বুঝা যায়, সূত্ররূপে শব্দ উৎপত্তিধর্মক। এবং উচ্চারণের পরেও যে সময়ে শব্দ শ্রবণ হয় না, তখন এই শব্দ নাই, উহা উৎপন্ন হইয়া বিনষ্ট হইয়াছে, ইহাও অনুমানের দ্বারা বুঝা যায়, সূত্ররূপে শব্দ বিনাশধর্মক। তাহা হইলে বুঝা যায়, শব্দ ঘটাদি-পদার্থের ভ্রাম উৎপত্তি-বিনাশ-ধর্মক। কারণ ঘটাদি অনিত্যপদার্থগুলিও উৎপত্তির পূর্বে বিদ্যমান থাকে না, উহা “অভূত্বা ভবতি” অর্থাৎ পূর্বে বিদ্যমান না থাকিয়া উৎপন্ন হয়, এবং উহা “ভূত্বা ন ভবতি” অর্থাৎ উৎপন্ন হইয়া থাকে না, বিনষ্ট হয়। মহাবির উপসংহারে এই সূত্রের দ্বারা, এই শেযোক্ত যুক্তিরও সূচনা করিয়া, শব্দ উৎপত্তিবিনাশ-ধর্মক, অর্থাৎ অনিত্য এই সিদ্ধান্তের সমর্থন করিয়াছেন, তাই ভাব্যকারও শেষে এখানে এই যুক্তির উল্লেখ করিয়া মহাবির সিদ্ধান্তের উপসংহার করিয়াছেন। শব্দ উচ্চার্যমান হইয়াই শ্রুত হয়, এই কথা দ্বারা উচ্চারণের পূর্বে শ্রুত হয় না, ইহাই ভাব্যকার প্রকাশ করিয়াছেন, এবং উহার দ্বারা শব্দ যে উচ্চারণের পূর্বে থাকে না, উচ্চারণের পূর্বে অবিদ্যমান শব্দই উৎপন্ন হয়, ইহা অনুমানসিদ্ধ, এই কথা বলিয়া, ভাব্যকার শব্দের উৎপত্তিধর্মকত্ব সমর্থন করিয়াছেন; এবং উচ্চারণের পরে শব্দ শ্রবণ হয় না, এই কথা বলিয়া, তদ্বারা শব্দ উৎপন্ন হইয়া বিনষ্ট হয়, ইহাও অনুমানসিদ্ধ বলিয়া শব্দের বিনাশধর্মকত্ব সমর্থন করিয়াছেন। ভাব্যকার এখানে পূর্বোক্ত যুক্তির দ্বারা দ্ব্যাক্রমে শব্দের উৎপত্তিধর্মকত্ব ও বিনাশধর্মকত্ব সমর্থন করিয়া উপসংহারে বলিয়াছেন, সূত্ররূপে শব্দ উৎপত্তি-বিনাশ-ধর্মক। উৎপত্তি-বিনাশ-ধর্মকত্বই অনিত্যত্ব, সূত্ররূপে এই কথা দ্বারা মহাবির সমর্থিত সিদ্ধান্তেরই উপসংহার



করা হইয়াছে। ভাষ্যে “শ্রয়মাণশ্চাত্ত্বা ভবতীতামুদীভতে। উচ্চকোচ্চারণায় শ্রয়তে স ভূত্বা ন ভবতি”—এইরূপ পাঠই প্রকৃত বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। কোন পুস্তকে ঐরূপ পাঠই পাওয়া যায়। যদিও ভাষ্যকার সংযোগবিশেষরূপ উচ্চারণ নিবৃত্ত হইলেই শব্দশ্রবণ স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু উচ্চারণের নিবৃত্তি হইলে, তখন হইতে সর্বদা শব্দশ্রবণ হয় না, ইহা স্বীকার্য। উচ্চারণ নিবৃত্ত হইলে যে সময় হইতে আর শব্দশ্রবণ হয় না, সেই সময়কেই ভাষ্যকার এখানে উচ্চারণের উচ্চকাল বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। তৎকালে শব্দশ্রবণ হয় না, ইহা সকলেরই স্বীকার্য। কেন হয় না? এতদ্বত্তরে—তখন শব্দ থাকে না, শব্দ বিনষ্ট হওয়ায়, তখন শব্দের অভাববশতঃই শব্দ শ্রবণ হয় না—ইহাই বলিতে হইবে। কারণ তখন শব্দশ্রবণ না হওয়ার অল্প কোন প্রয়োজক নাই। শব্দের কোন আবরক অথবা শব্দশ্রবণের কোন কারণবিশেষের অভাব তখন প্রমাণের দ্বারা প্রতিপন্ন না হওয়ায়, উহা নাই ॥ ১৮ ॥

ভাষ্য। এবঞ্চ সতি তত্ত্বং পাংশুতিরিবাকিরমিদমাহ—

অনুবাদ। এইরূপ হইলে অর্থাৎ পূর্বোক্ত সিদ্ধান্ত সংস্থাপিত হইলে, তত্বকে যেন ধুলির দ্বারা ব্যাপ্ত করতঃ (জাত্যন্তরবাদী মহর্ষি) এই সূত্রদ্বয় বলিতেছেন—

সূত্র। তদনুপলক্কেরনুপলম্বাদাবরণোপপত্তিঃ ॥

॥ ১৯ ॥ ১৪৮ ॥

অনুবাদ। (পূর্বপক্ষ) সেই অনুপলক্কির, অর্থাৎ পূর্বসূত্রোক্ত আবরণের অনুপলক্কির উপলক্কি না হওয়ায়, আবরণের উপপত্তি, অর্থাৎ আবরণ আছে।

ভাষ্য। যদ্যানুপলম্বাদাবরণং নাস্তি, আবরণানুপলক্কিরপি তদ্যানুপলম্বাদানুপলম্বাদাবরণং নাস্তি, তস্তা অভাবাদপ্রতিষিদ্ধ্যাবরণমিতি।

কথং পুনর্জ্ঞানীতে ভবামাবরণানুপলক্কিরূপলভ্যত ইতি। কিমত্র জ্ঞেয়ং? প্রত্যাক্সবেদনীয়ত্বাৎ সমানং। অয়ং খল্বাবরণমনুপলভমানঃ প্রত্যাক্সমেব সংবেদয়তে নাবরণমুপলভ ইতি, যথা কুডোনারূতস্রাবরণমুপলভমানঃ প্রত্যাক্সমেব সংবেদয়তে। সেয়মাবরণোপলক্কিবদাবরণানুপলক্কিরপি সংবেদ্যেবেতি। এবঞ্চ সত্যপক্ষতবিষয়মুত্তরবাক্যমস্তুতি।

অনুবাদ। যদি অনুপলক্কিবশতঃ আবরণ নাই, তাহা হইলে, অনুপলক্কিবশতঃ আবরণের অনুপলক্কিও নাই। তাহার, অর্থাৎ আবরণের অনুপলক্কির অভাববশতঃ আবরণ অপ্রতিষিদ্ধ, [অর্থাৎ আবরণের অনুপলক্কিকেও যখন উপলক্কি করা যায় না,



তখন অনুপলকি প্রযুক্ত আবরণের অনুপলকি নাই, ইহা স্বীকার্য, তাহা হইলে আবরণের উপলকি স্বীকৃত হওয়ায় আবরণ আছে, ইহা স্বীকার্য । ]

( প্রশ্ন ) আবরণের অনুপলকি উপলকি হয় না, ইহা আপনি কিরূপে জানেন ?  
 ( উত্তর ) এ বিষয়ে জানিব কি ? প্রত্যাক্ষবেদনীয়ত্ববশতঃ, অর্থাৎ মনের দ্বারাই বুঝা যায় বলিয়া, উপলকি ও অনুপলকির জ্ঞান সমান । বিশদার্থ এই যে, এই ব্যক্তি, অর্থাৎ জ্ঞাতা জীব আবরণকে উপলকি না করিয়া, “আমি আবরণ উপলকি করিতেছি না”—এইরূপে মনের দ্বারাই (ঐ অনুপলকিকে) বুঝে, যেমন কুড়োর দ্বারা আবৃত বস্তুর আবরণকে উপলকি করতঃ মনের দ্বারাই (ঐ উপলকিকে) বুঝে । (অতএব) সেই এই আবরণের অনুপলকিও আবরণের উপলকির দ্বারা জ্ঞেয়ই, অর্থাৎ ঐ আবরণের অনুপলকিও মনের দ্বারা বুঝাই যায় । ( সিদ্ধান্তবাদী ভাষ্যকারের উত্তর ) এইরূপ হইলে, অর্থাৎ আবরণের অনুপলকিরও উপলকি স্বীকার করিলে উত্তরবাক্য ( জ্ঞাতৃত্বের বাক্য ) অপহৃত বিষয়, ইহা স্বীকার্য । [ অর্থাৎ তাহা হইলে যে দুই সূত্রের দ্বারা জাতিবাদী পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করিয়াছেন, তাহার উত্থান হয় না, জাতিবাদীর উত্তর বাক্যের বিষয় অপহৃত হয় । কারণ তিনি এখন আবরণের অনুপলকিরও উপলকি স্বীকার করিয়াছেন । ]

উল্লিখিত। অসঙ্গতের বিশেষের নাম “জাতি” । জগৎ ও বিত্তত্ত্বের ইহার প্রয়োগ হয় । মহর্ষি প্রথম অধ্যায়ের শেষে এই জ্ঞতির সামান্য লক্ষণ বলিয়া, পঞ্চম অধ্যায়ের প্রথম অঙ্কিকে ইহার বিশদ বিবরণ করিয়াছেন । জগৎ ও বিত্তত্ত্বের জাতিবাদী প্রকৃততত্ত্বকে হুঁসিদ্ধ জ্ঞতির দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া, প্রতিবাদীকে নিরস্ত করেন । ঐ জ্ঞতির উদ্ধার করিলে, তখন প্রকৃত তত্ত্ব পরিষ্কার হয়, জাতিবাদী নিগৃহীত হন । শব্দনিত্যবাদী পূর্বপক্ষী জগৎ বা বিত্তত্ত্ব করিলে, এখানে কিরূপ “জাতির” দ্বারা মহর্ষির পূর্বোক্ত তত্ত্বকে আচ্ছাদিত করিতে পারেন, কিরূপ জ্ঞতির দ্বারা মহর্ষির পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করিতে পারেন, মহর্ষি এখানে দুই সূত্রের দ্বারা তাহারও উল্লেখ-পূর্বক তৃতীয় সূত্রের দ্বারা তাহার খণ্ডন করিয়াছেন । জগৎ বা বিত্তত্ত্ব করিয়া বাহাতে পূর্বপক্ষ-বাদীরা জ্ঞতির দ্বারা প্রকৃত তত্ত্ব আচ্ছাদিত করিতে না পারেন, প্রকৃততত্ত্ববাদীদিগকে নিগৃহীত করিয়া অন্যতর প্রচার করিতে না পারেন, মহর্ষি এখানে তাহাও করিয়া, নিজ সিদ্ধান্তকে সুদৃঢ় ও সুবাক্ত করিয়াছেন । মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা জাতিবাদীর প্রথম কথা বলিয়াছেন যে, যদি আবরণের উপলকি হয় না বলিয়া, আবরণ নাই—ইহা বলা যায় ( পূর্বসূত্রে তাহাই বলা হইয়াছে ), তাহা হইলে আবরণের অনুপলকিও নাই, ইহা স্বীকার করিতে হইবে । কারণ আবরণের অনুপলকিকেও উপলকি করা যায় না । তাহার অনুপলকিবশতঃ তাহার অভাব স্বীকার করিতে হইলে, আবরণের উপলকি আছে, ইহাই স্বীকৃত হয় । কারণ আবরণের অনুপলকির অভাব,



আবরণের উপলব্ধির অভাবের অভাব, সুতরাং তাহা বস্তুতঃ আবরণের উপলব্ধি। আবরণের উপলব্ধি স্বীকার করিলে, আবরণ আছে—ইহা স্বীকার্য। তাহা হইলে, আবরণ প্রতিলিঙ্গ হয় না। পূর্বসূত্রে যে আবরণের অহুপলব্ধিবশতঃ আবরণ নাই—বলা হইয়াছে, তাহা বলা যায় না।

ভাষ্যকার পূর্বোক্তরূপে সূত্রার্থ বর্ণনপূর্বক জাতিবাদীর কথা ব্যক্ত করিয়া, শেষে নিজে স্বতন্ত্রভাবে জাতিবাদীর উত্তরের দ্বারাই তাহাকে নিরস্ত করিবার জন্য জাতিবাদীকে প্রশ্ন করিয়াছেন যে, আবরণের অহুপলব্ধির যে উপলব্ধি হয় না, ইহা আপনি কিরূপে বুঝেন? এতদ্বারা জাতিবাদীর কথা ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, এবিষয়ে বুঝিব কি? অর্থাৎ উহা বুঝিবার জন্য বিশেষ চিন্তা অনাবশ্যক, কারণ উহা মানস-প্রত্যক্ষসিদ্ধ, মনের দ্বারাই উহা বুঝা যায়। যেমন কুড়োর দ্বারা আশ্রিত বস্তুর ঐ কুড়োরূপ আবরণকে উপলব্ধি করিলে, “আবরণকে উপলব্ধি করিতেছি”, এইরূপে মনের দ্বারাই ঐ উপলব্ধির উপলব্ধি হয়, তদ্রূপ আবরণকে উপলব্ধি না করিলে, “আবরণকে উপলব্ধি করিতেছি না” এইরূপে মনের দ্বারাই ঐ অহুপলব্ধির উপলব্ধি হয়। পূর্বোক্ত উপলব্ধির উপলব্ধি ও অহুপলব্ধির উপলব্ধি এই উভয়ই মানস-প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ, মনের দ্বারা ঐ উভয়কেই সমানভাবে বুঝা যায়, এজন্য ঐ উপলব্ধিও সমান। সুতরাং আবরণের উপলব্ধির দ্বারা আবরণের অহুপলব্ধিও জ্ঞেয় পদার্থ। ভাষ্যকার জাতিবাদীর এই উত্তরের দ্বারাই তাহাকে নিরস্ত করিতে বলিয়াছেন যে, এইরূপ হইলে আর এখন জাত্যন্তরবাক্যের বিষয় থাকিল না। অর্থাৎ আবরণের অহুপলব্ধির উপলব্ধি হয় না, এই বিষয়কে অবলম্বন করিয়াই জাতিবাদী জাত্যন্তর বলিতে পারেন না। “অপদ্রব-বিষয়ং” এই কথার ব্যাখ্যা উক্তোক্তকর বলিয়াছেন, “নাশোপাধি-মত্বাতি”—অর্থাৎ তাহা হইলে, (জাতিবাদীর) এই সূত্রেরও উত্থান হয় না। কারণ আবরণের অহুপলব্ধির উপলব্ধি স্বীকার করিলে ঐ সূত্রের বলা যায় না। ভাষ্যে “উত্তরংকামতি”—এখানে “অন্তি” এই শব্দ স্বীকারার্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। প্রাচীনগণ স্বীকার অর্থ সূচনা করিতে “অন্তি” এইরূপ অব্যয় শব্দেরও প্রয়োগ করিতেন, ইহা কয়েক স্থানে বাংলায়নের প্রয়োগের দ্বারাও বুঝা যায়। বাহা মনের দ্বারাই বুঝা যায়, তাহা প্রত্যেক আত্মাই বুঝিতে পারে। এজন্য তাহাকে প্রত্যাক্ষবেদনীয় বলা বাহিতে পারে। কিন্তু ভাষ্যকার পরে “প্রত্যাক্ষমেব সংবেদয়তে”—এইরূপ প্রয়োগ করার “প্রত্যাক্ষ” এই বাকটি এখানে করণবিত্ত্বার্থে অব্যয়ীভাব সমান, ইহা মনে হয়। “আত্মন” শব্দের অন্তঃকরণ অর্থও কথিত আছে। ঐরূপ সমাস স্বীকার করিলে “প্রত্যাক্ষং” এই বাক্যের দ্বারা “মনসা” অর্থাৎ মনের দ্বারা, এইরূপ অর্থও বুঝা বাহিতে পারে। “সংবেদয়তে” এই স্থলে ভাষ্যকার চুরাদিগণের আত্মনেপদী জ্ঞানার্থক বিদ্য বাতুর প্রয়োগ করিয়াছেন। ভাষ্যকার অন্তঃপ্রণয় “বেদয়তে” এইরূপ প্রয়োগ করিয়াছেন। ১২।

ভাষ্য। অভ্যনুজ্ঞাবাদেন ভূচ্যতে জাতিবাদিনা।



অনুবাদ। স্বীকারবাদের দ্বারাই, অর্থাৎ আবরণের অনুপলঙ্কির সত্তা স্বীকার পক্ষেই জাতিবাদী ( এই সূত্র ) বলিতেছেন।

**সূত্র। অনুপলম্ব্যদপ্যনুপলঙ্কি-সত্তাবান্নাবরণানুপ-  
পত্তিরনুপলম্ব্যৎ ॥ ২০ ॥ ১৪৯ ॥**

অনুবাদ। ( পূর্ববপক্ষ ) অনুপলঙ্কিপ্রযুক্ত আবরণের অনুপপত্তি ( অসত্তা ) নাই, যেহেতু অনুপলঙ্কি থাকিলেও অনুপলঙ্কির ( আবরণের অনুপলঙ্কির ) সত্তা আছে।

ভাস্য। যথাহনুপলভ্যমানাপ্যাবরণানুপলঙ্কিরস্তি, এবমনুপলভ্য-  
মানমপ্যাবরণমস্তীতি। যদ্যপ্যনুজানাতি ভবাননুপলভ্যমানাপ্যাবরণানুপ-  
লঙ্কিরস্তীতি, অভ্যনুজ্ঞায় চ বদতি, নাস্ত্যাবরণমনুপলম্ব্যাদিত্যেতন্নিম্নপ্য-  
ভ্যনুজ্ঞাবাদে প্রতিপত্তিনিয়মো নোপপদ্যত ইতি।

অনুবাদ। যেমন অনুপলভ্যমান হইয়াও আবরণের অনুপলঙ্কি আছে, এইরূপ অনুপলভ্যমান হইয়াও আবরণ আছে। যদিও আপনি অনুপলভ্যমান হইয়াও আবরণের অনুপলঙ্কি আছে, ইহা স্বীকার করেন, এবং স্বীকার করিয়া অনুপলঙ্কি-প্রযুক্ত আবরণ নাই, ইহা বলেন, এই স্বীকারবাদেও প্রতিপত্তির নিয়ম অর্থাৎ অনুপলঙ্কি থাকিলেই অভাব থাকে, এইরূপ জ্ঞাননিয়ম উপপন্ন হয় না।

টিপ্পনী। জাতিবাদী পূর্বসূত্রের দ্বারাই আবরণের সত্তা সমর্থন করিয়া পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করিয়াছেন, আবার এই সূত্র বলা কেন? এই সূত্র নিরর্থক, এতজ্ঞতরে ভাষ্যকাণ্ড প্রথমে বলিয়াছেন যে, অভ্যনুজ্ঞাবাদ অর্থাৎ স্বীকারবাদ অবলম্বন করিয়াই জাতিবাদী এই সূত্র বলিয়াছেন। অর্থাৎ পূর্বসূত্রে আবরণের অনুপলঙ্কি অস্বীকার করিয়া, ঐ হেতুর অসিদ্ধি দেখাইয়াছেন। আবরণের অনুপলঙ্কির অনুপলঙ্কিবশতঃ আবরণের উপলঙ্কি সমর্থন করিয়া তদ্বারা আবরণের সত্তা সমর্থন করিয়াছেন। এই সূত্রে বলিয়াছেন যে, যদি আবরণের অনুপলঙ্কির অনুপলঙ্কি সত্ত্বও তাহার অস্তিত্ব স্বীকার কর, তাহা হইলে, আবরণের অনুপলঙ্কিবশতঃ আবরণ নাই, ইহা বলিতে পার না। কারণ অনুপলভ্যমান বস্তুরও অস্তিত্ব স্বীকার করিলে, অনুপলভ্যমান আবরণের অস্তিত্ব কেন স্বীকার করিবে না? আবরণের অনুপলঙ্কি উপলভ্যমান না হইলেও উহা আছে, ইহা স্বীকার করিয়া, আবার যদি বল, উপলভ্যমান না হওয়ায় আবরণ নাই, তাহা হইলে জ্ঞানের নিয়ম উপপন্ন হয় না। অর্থাৎ যাহা উপলব্ধ হয়, তাহা আছে, যাহা উপলব্ধ হয় না, তাহা নাই— এইরূপে জ্ঞানের যে নিয়ম, তাহা থাকে না। অনুপলভ্যমান বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করিলে

অনুপলক্ষির দ্বারা বস্তুর অভাব সিদ্ধ হয় না ; কারণ, এই অনুপলক্ষি অভাবের ব্যভিচারী হওয়ায়, উহা অভাবের সাধক হয় না। ফলস্বরূপ, পূর্বোক্তরূপে এই সূত্রের দ্বারা জাতিবাদী অনুপলক্ষির ব্যভিচারিত্ব প্রদর্শন করিয়া উহার দ্বারা আবরণের অভাব সিদ্ধ হয় না, ইহাই স্থচনা করিয়াছেন। হুই সূত্রের দ্বারা চরমে পূর্বোক্তরূপ ব্যভিচার প্রদর্শনই জাতিবাদীর এখানে উদ্দেশ্য। জাতিবাদী নিজের আবরণের অনুপলক্ষির উপলক্ষি স্বীকার না করিলেও তাহার অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া চরমে অনুপলক্ষির অনৈকান্তিকতাই প্রদর্শন করিয়াছেন। ভাষ্যার্থিক প্রভৃতি অনেক গ্রন্থেই সূত্রে “অনুপলক্ষিসম্ভাবৎ”, এইরূপ পাঠ দেখা যায়। ভাষ্যকারের ব্যাখ্যার দ্বারা এইরূপ পাঠ তাহারও সম্ভব, ইহা মনে আসে। কিন্তু ভাষ্যহীনবদ্ধ ও তাৎপর্যটীকায় “অনুপলক্ষিসম্ভাবৎ” এইরূপ পাঠই উদ্ধৃত হওয়ার তাহাই গৃহীত হইয়াছে। সূত্রে “অনুপলক্ষাদপি” এখানে “অপি” শব্দটি স্বীকারদ্যোতক। “অনুপলক্ষাদপি” ইহার ব্যাখ্যা অনুপলক্ষ্যেহপি। সূত্রে এইরূপ বিভক্তি-ব্যত্যয় অনেক স্থলে দেখা যায়। প্রথম অধ্যায়ের ৪০ সূত্র ও টিপ্পনী দ্রষ্টব্য। ২০।

### সূত্র। অনুপলক্ষাত্মকত্বাদনুপলক্ষেরহেতুঃ ॥২১॥১৫০॥

অনুবাদ। (উত্তর) অনুপলক্ষির (আবরণের অনুপলক্ষির) অনুপলক্ষাত্মকব-  
বশতঃ, অর্থাৎ উহা আবরণের উপলক্ষির অভাব রূপ বলিয়া (“তদনুপলক্ষেরনুপলক্ষাৎ”  
ইত্যাদি সূত্রে আবরণের উপপত্তিতে যে হেতু বলা হইয়াছে, তাহা) অহেতু।

ভাষ্য। বহুপলভ্যতে তদন্তি, যমোপলভ্যতে তন্মাস্তীতি। অনুপ-  
লক্ষাত্মকমসদৃশিত্যে ব্যবস্থিতং। উপলক্ষ্যভাবশ্চানুপলক্ষিরিতি, সেয়মভাবত্বা-  
মোপলভ্যতে। সচ্চ খল্লাবরণং, তন্ত্রোপলক্ষ্য ভবিতব্যং, ন চোপলভ্যতে,  
তন্মাস্তীতি। তত্র বহুভুতং “নাবরণানুপপত্তিরনুপলক্ষা” দিত্যযুক্তমিতি।

অনুবাদ। যাহা উপলব্ধ হয়, তাহা আছে, যাহা উপলব্ধ হয় না, তাহা নাই।  
অনুপলক্ষাত্মক, অর্থাৎ উপলক্ষির অভাব অসৎ, ইহা ব্যবস্থিত (স্বীকৃত)। উপলক্ষির  
অভাবই অনুপলক্ষি। সেই এই অনুপলক্ষি অভাববশতঃ উপলব্ধ হয় না। কিন্তু  
আবরণ সংপদার্থই, (কারণ থাকিলে) তাহার উপলক্ষি হইবে, কিন্তু (তাহা)  
উপলব্ধ হয় না, অতএব নাই। তাহা হইলে, যে বলা হইয়াছে—“অনুপলক্ষিবশতঃ  
আবরণের অনুপপত্তি নাই”—ইহা অযুক্ত।

টিপ্পনী। মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা পূর্বোক্ত জাতিবাদীর পূর্বপক্ষের নিরাস করিয়াছেন।  
জাতিবাদীর প্রথম কথা এই যে, আবরণের অনুপলক্ষির যখন উপলক্ষি হয় না, তখন আবরণের  
অনুপলক্ষির অভাব, অর্থাৎ আবরণের উপলক্ষি স্বীকার করিতে হইবে। তাহা হইলে আবরণের



সহ্যই স্বীকৃত হয়। কারণ আবরণ না থাকিলে, তাহার উপলব্ধি থাকিতে পারে না,—নির্বিষয়ক উপলব্ধি হয় না। মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা বলিয়াছেন যে, আবরণের সহ্য সমর্থনে জ্ঞতিবাদী যে হেতু বলিগাছেন, তাহা হেতু হয় না, উহা অহেতু। কারণ অহুপলব্ধি উপলব্ধির অভাব-স্বরূপ। মহর্ষির তাৎপর্য্য বর্ণন করিতে তাৎপর্য্যটীকাকার বলিয়াছেন যে, অহুপলব্ধি উপলব্ধির অভাব, সুতরাং তাহার উপলব্ধি হইতে পারে না, যাহা অহুপলব্ধি, তাহার উপলব্ধি হইলে, তাহার অহুপলব্ধি স্বীকার করা যায় না, ইহাই জ্ঞতিবাদী মনে করেন। জ্ঞতিবাদী তাহার ঐ যুক্তি অবলম্বন করিয়াই আবরণের অহুপলব্ধির উপলব্ধি হয় না,—ইহা বলিয়াছেন। কিন্তু অহুপলব্ধি ভাবপদার্থ-বিষয়ক প্রমাণের বিষয় না হইলেও, অভাব-বিষয়ক প্রমাণের বিষয় হইয়া থাকে। অহুপলব্ধির উপলব্ধি হইতে পারে না, ইহা নিযুক্তিক। উপলব্ধির অভাবরূপ অহুপলব্ধি মনের দ্বারাই বুঝা যায়, উহা নানসংপ্রত্যক্ষসিদ্ধ। ফলকথা, অভাববোধক প্রমাণের দ্বারা অহুপলব্ধিরূপ অভাবপদার্থের উপলব্ধি হইতে পারে ও হইয়া থাকে। তাহাতে অহুপলব্ধির স্বরূপহানির কোনই যুক্তি নাই। সুতরাং আবরণের অহুপলব্ধির উপলব্ধি হয় না, এই হেতু অসিদ্ধ হওয়ার উহা অহেতু। আবরণের অহুপলব্ধির বন্ধন মনের দ্বারাই উপলব্ধি হয়, তখন আবরণের অহুপলব্ধির অহুপলব্ধি নাই, সুতরাং জ্ঞতিবাদীর ঐ হেতু অসিদ্ধ। তাৎপর্য্যটীকাকার এইভাবে ভাবেরও ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, অহুপলব্ধি অভাবপদার্থ বলিয়া, ভাব-বিষয়ক প্রমাণের দ্বারা উপলব্ধ হয় না, কিন্তু অভাব-বিষয়ক প্রমাণের দ্বারা অবশ্যই উপলব্ধ হয়, অহুপলব্ধি বস্তু, অর্থাৎ উপলব্ধির অভাবরূপ বস্তু অভাব-বিষয়ক প্রমাণগম্য বলিয়া, তাহাকে “অসং”, অর্থাৎ অভাব বলে। অভাববস্তুবশতঃ উহা উপলব্ধ হয় না, অর্থাৎ ভাব-বিষয়ক প্রমাণের দ্বারা উপলব্ধ হয় না। তাৎপর্য্যটীকাকার অধ্যাহারাদি স্বীকার করিয়া, পূর্কোক্তরূপে ভাব্য ব্যাখ্যা করিলেও ভাব্য-সন্দর্ভের দ্বারা সংলভ্যভাবে ভাব্যকারের কথা বুঝা যায় যে, অহুপলব্ধি অভাবপদার্থ বলিয়া, তাহার উপলব্ধি হয় না। যাহা উপলব্ধির অভাবস্বরূপ তাহা “অসং” বলিয়া স্বীকৃত, সুতরাং তাহা উপলব্ধির বিষয়ই হয় না। কিন্তু আবরণ অভাবপদার্থ নহে। যাহা অসং অর্থাৎ অভাব, তাহা আবরণ হইতে পারে না, তাহা শব্দকে আবৃত করিতে পারে না। সুতরাং আবরণ থাকিলে ভাবপদার্থ বলিয়া উহা উপলব্ধির বিষয় হইবেই। কিন্তু শব্দের উচ্চারণের পূর্বে শব্দের কোন আবরণ উপলব্ধ হয় না, তখন কোন আবরণ থাকিলে অবশ্যই কোন প্রমাণের দ্বারা তাহার উপলব্ধি হইত, বরন উপলব্ধি হয় না, তখন উহা নাই—ইহা স্বীকার্য্য। তাহা হইলে অহুপলব্ধি বস্তুতঃ আবরণের অহুপলব্ধি নাই—এই যাহা বলা হইয়াছে, তাহা অযুক্ত। কারণ যাহা উপলব্ধ হয়, তাহা আছে, যাহা উপলব্ধ হয় না, তাহা নাই—এই নিয়ম অব্যাহত আছে। অর্থাৎ উপলব্ধির যোগ্য পদার্থ উপলব্ধ না হইলে সেখানে তাহার অভাব থাকিবে, এই নিয়মের ব্যতিকার নাই। অহুপলব্ধিকে উপলব্ধির যোগ্য না বলিলে আবরণের অহুপলব্ধির অহুপলব্ধিবশতঃ আবরণের অহুপলব্ধির অভাব সিদ্ধ হইতে পারে না। সুতরাং জ্ঞতিবাদী সিদ্ধান্তীয় অহুপলব্ধি হেতুতে যে ব্যতিকার প্রদর্শন করিয়াছেন তাহাও নাই। উপলব্ধির যোগ্য পদার্থের

অনুপলব্ধি হইলেই সেখানে তাহার অভাব থাকে, এইরূপ নিয়মে জাতিবাদী পুরোক্তরূপ ব্যভিচার বলিতে পারেন না। কারণ তাঁহার মতে আবরণের অনুপলব্ধি উপলব্ধির যোগ্যই নহে। অবশ্য ভাষ্যকার প্রভৃতি স্তায়চার্য্যগণের মতে অনুপলব্ধি অভাবপদার্থ বলিয়া উপলব্ধ হয় না, উহা উপলব্ধির অযোগ্য, ইহা সিদ্ধান্ত নহে। ভাষ্যকার ঐরূপ কথা বলিলে অসিদ্ধান্ত বলা হয়। এই জ্ঞানই মনে হয়, তাৎপর্য্যটীকাকার পুরোক্তরূপে ভাষ্যব্যাখ্যা ও সূত্রার্থ বর্ণন করিয়াছেন। কিন্তু ভাষ্যকারের সন্দর্ভের দ্বারা বুঝা যায়, তিনি জাতিবাদীর মত স্বীকার করিয়াই তাঁহাকে নিরস্ত করিয়াছেন, এবং সূত্রকারেরও ঐরূপ তাৎপর্য্য বর্ণন করিয়াছেন। অর্থাৎ অনুপলব্ধি অভাবপদার্থ বা অনন্ত বলিয়া তাহার উপলব্ধি হয় না, তাহা উপলব্ধির অযোগ্য, ইহা স্বীকার করিলেও আবরণ যখন ভাবপদার্থ, তখন তাহাকে উপলব্ধির অযোগ্য বলা বাইবে না, জাতিবাদীও তাহা বলিতে পারিবেন না। সূত্রায় আবরণের অনুপলব্ধিবশতঃ তাহার অভাব অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। উপলব্ধির যোগ্য পদার্থের অনুপলব্ধি থাকিলে সেখানে তাহার অভাব থাকে, এইরূপ নিয়মে জাতিবাদী ব্যভিচার প্রদর্শন করিতে পারিবেন না। কলকথা, জাতিবাদীর মত স্বীকার করিয়াই ভাষ্যকা উচ্চারণের পূর্বে শব্দের কোন আবরণ নাই, ইহা প্রতিপন্ন করিয়া তখন শব্দ থাকে না, শব্দের অভাববশতঃই তখন শব্দের উপলব্ধি হয় না, শব্দ নিত্য হইলে তখনও শব্দের উপলব্ধি হইত, যখন উচ্চারণের পূর্বে শব্দের উপলব্ধি হয় না, তখন সেই সময়ে শব্দ জন্মে নাই, শব্দ উৎপত্তিব্যর্থক, অতএব শব্দ অনিত্য—এই মূল সিদ্ধান্তের সমর্থন করিয়াছেন। সুযোগ্য এখানে ভাষ্যকারের সন্দর্ভে মনোযোগ করিয়া তাঁহার তাৎপর্য্য চিন্তা করিবেন ২১।

ভাষ্য। অথ শব্দস্য নিত্যত্বং প্রতিজানানঃ কস্মাক্ষেতোঃ প্রতিজনীতে ?

অনুবাদ। (প্রশ্ন) শব্দের নিত্যত্ব প্রতিজ্ঞাকারী কোন্ হেতুপ্রযুক্ত (শব্দের নিত্যত্ব) প্রতিজ্ঞা করেন ?

সূত্র। অস্পর্শত্বাৎ ॥২২॥১৫১॥

অনুবাদ। (উত্তর) বেহেতু অস্পর্শত্ব আছে (অতএব শব্দ নিত্য)।

ভাষ্য। অস্পর্শমাকাশং নিত্যং দৃষ্টমিতি, তথা চ শব্দ ইতি।

অনুবাদ। স্পর্শশূন্য আকাশ নিত্য দেখা যায়, শব্দও তদ্রূপ, [অর্থাৎ যাহা যাহা স্পর্শশূন্য, সে সমস্তই নিত্য, যেমন আকাশ, শব্দও আকাশের ত্যায় স্পর্শশূন্য, অতএব শব্দ নিত্য]।

টীকানী। শব্দের নিত্যত্ব ও অনিত্যত্ববোধক বিপ্রতিপত্তিপ্রযুক্ত সংশয় হওয়ার, শব্দের অনিত্যত্ব পরীক্ষিত হইয়াছে। কিন্তু বাহ্যরা “শব্দ নিত্য” এইরূপ প্রতিজ্ঞা করেন, তাহাদিগের হেতু কি ? তাহার হেতুর দ্বারা শব্দের নিত্যত্ব সাধন না করিলে, বিপ্রতিপত্তি হইতে পারে না, সুতরাং বিপ্রতিপত্তির মূল পরপক্ষের অর্থাৎ শব্দের নিত্যত্ব পক্ষের হেতু অবশ্য জিজ্ঞাস্য, এবং



শব্দের অনিত্যত্বপক্ষের সমর্থন করিতে হইলে, পরপক্ষের হেতুরও দোষ প্রদর্শন করা আবশ্যিক। এজন্য মহর্ষি স্বপক্ষের সাধন বলিয়া এখন পরপক্ষের হেতুর উল্লেখপূর্বক তাহার নিরাকরণ করিতেছেন। ভাষ্যকারও পূর্বোক্ত প্রশ্নের অবতারণা করিয়া মহর্ষির সূত্রের দ্বারা ঐ প্রশ্নের উত্তর জ্ঞাপন করিয়াছেন। “অনিত্যঃ শব্দঃ” এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া শব্দনিত্যবাদী “অস্পর্শত্বাৎ” এইরূপ হেতুবাক্য প্রয়োগ করেন। ঐ হেতুবাক্যের দ্বারা বুঝা যায়, অস্পর্শত্ব-জ্ঞাপক অর্থাৎ শব্দে স্পর্শ নাই; এজন্য বুঝা যায় শব্দ নিত্য। আকাশে স্পর্শ নাই, আকাশ নিত্য।—এই দৃষ্টান্তে স্পর্শশূন্যতা নিত্যত্বের ব্যাপ্য, অর্থাৎ স্পর্শশূন্য হইলেই সে পদার্থ নিত্য, এইরূপ ব্যাপ্তি নিশ্চয় হওয়ায়—অস্পর্শত্ব হেতুর দ্বারা শব্দে নিত্যের সিদ্ধ হয়, ইহাই পূর্বপক্ষবাদীর কথা। ২২।

ভাষ্য। সৌহরমুভয়তঃ সব্যভিচারঃ, স্পর্শবাৎশচানুনিত্যঃ, অস্পর্শক কৰ্ম্মানিত্যং দৃষ্টং। অস্পর্শত্বাদিত্যেতস্মৈ সাধ্যসাধৰ্ম্ম্যোণোদাহরণঃ—

সূত্র। ন কৰ্ম্মানিত্যত্বাৎ ॥২৩॥১৫২॥

অনুবাদ। সেই ইহা, অর্থাৎ পূর্বোক্ত অস্পর্শত্ব হেতু উভয়তঃ (দ্বিবিধ উদাহরণেই) সব্যভিচার। (কারণ) স্পর্শবান্ হইয়াও পরমানু নিত্য, স্পর্শশূন্য হইয়াও কৰ্ম্ম অনিত্য দেখা যায়। “অস্পর্শত্বাৎ” এই হেতুবাক্যের সাধ্যসাধৰ্ম্ম্য-প্রযুক্ত উদাহরণ নাই, যেহেতু কৰ্ম্ম অনিত্য।

ভাষ্য। সাধ্যবৈধৰ্ম্ম্যোণোদাহরণঃ—

সূত্র। নানুনিত্যত্বাৎ ॥২৪॥১৫৩॥

অনুবাদ। সাধ্যবৈধৰ্ম্ম্যপ্রযুক্ত উদাহরণ নাই, যেহেতু পরমানু নিত্য।

ভাষ্য। উভয়স্থিানুদাহরণে ব্যভিচারাম হেতুঃ।

অনুবাদ। উভয় উদাহরণে, অর্থাৎ দ্বিবিধ দৃষ্টান্তে ব্যভিচারবশতঃ (পূর্বোক্ত অস্পর্শত্ব) হেতু নহে।

টিপ্পনী। মহর্ষি পূর্বোক্ত দুই সূত্রের দ্বারা দেখাইয়াছেন যে, শব্দের নিত্যত্বানুসারে পূর্ব-পক্ষবাদীর পরিগৃহীত অস্পর্শত্বহেতু দ্বিবিধ দৃষ্টান্তেই ব্যভিচারী, সুতরাং উহা সব্যভিচার নামক হেতুভাঙ্গ, উহা হেতুই নহে। বাহা বাহা স্পর্শশূন্য, সে সমস্তই নিত্য, ইহা বলা যায় না; কারণ, কৰ্ম্ম স্পর্শশূন্য হইয়াও নিত্য নহে। অস্পর্শত্ব কৰ্ম্মে আছে, তাহাতে নিত্যত্ব সাধ্য না থাকায় অস্পর্শত্ব নিত্যত্বের ব্যভিচারী। এবং যেখানে যেখানে অস্পর্শত্ব নাই, অর্থাৎ বাহা বাহা স্পর্শবান্, সে সমস্তই নিত্য নহে, ইহাও বলা যায় না, কারণ পরমানু স্পর্শবান্ হইয়াও নিত্য।



ভাষ্যকার প্রথমে মহাবির এই বক্তব্য প্রকাশ করিয়াই স্বত্রের অবতারণা করিয়াছেন, এবং শেষে বিবিধ দৃষ্টান্তে ব্যক্তিদ্রবণতঃ শব্দের নিত্যবাহুমানো অস্পর্শত্ব হেতু হয় না, এই কথা বলিয়া মহাবির ছই স্বত্রের মূল প্রতিপাদ্য প্রকাশ করিয়াছেন। "অস্পর্শত্বাৎ" এই হেতুবাক্য বলিলে উদাহরণবাক্য বলিতে হইবে। উদাহরণবাক্য বিবিধ, সাধর্মেয়াদাহরণ ও বৈধর্মেয়াদাহরণ। কিন্তু ঐ হেতুবাক্যের সম্বন্ধে বিবিধ উদাহরণবাক্যই নাই। কারণ, বাদীর গৃহীত অস্পর্শত্বহেতু ঐ স্থলে বিবিধ দৃষ্টান্তেই ব্যক্তিদ্রা। মহাবির ছই স্বত্রে "নঞ" শব্দের দ্বারা বখাক্রমে পূর্কোক্ত বিবিধ উদাহরণবাক্যের অভাবই প্রকাশ করিয়াছেন, ইহা বুঝাইতেই ভাষ্যকার স্বত্রের পূর্ক দ্বাক্রমে "সাধ্যসাধর্মেয়াদাহরণঃ" এবং "সাধ্যবৈধর্মেয়াদাহরণঃ" এই দুইটি বাক্যের পূরণ করিয়াছেন। ভাষ্যকারের ঐ বাক্যের সহিত স্বত্রস্থ "নঞ" শব্দের বোগ করিয়া স্বত্রার্থ বুক্তিতে হইবে।

পূর্কপক্ষবাদীর পূর্কোক্ত অল্পমানে নিত্যত্ব সাধ্য, অস্পর্শত্ব হেতু। যেখানে যেখানে নিত্যত্ব সাধ্য নাই, সে সমস্ত স্থানেই অস্পর্শত্ব হেতু নাই, অর্থাৎ অনিত্য পদার্থ নাইই স্পর্শবান, যেমন ঘট, এইরূপে বৈধর্মেয়াদাহরণবাক্য বলিলে, মহাবির পূর্কস্বত্রোক্ত কর্মেই ব্যক্তিদ্রা প্রদর্শিত হইতে পারে। তথাপি মহাবির স্বত্রোক্তরের দ্বারা পরমাণুতে ব্যক্তিদ্রা প্রদর্শন করা বুঝা যায়, যেখানে যেখানে অস্পর্শত্ব হেতু নাই, সে সমস্ত স্থানে নিত্যত্বসাধ্য নাই, অর্থাৎ স্পর্শবান পদার্থনাই অনিত্য, যেমন ঘট, এইরূপ বৈধর্মেয়াদাহরণবাক্যই এখানে মহাবির বুক্তিত্ব, তদনুসারেই মহাবির স্বত্রোক্তরের দ্বারা পরমাণুতে ব্যক্তিদ্রা প্রদর্শন করিয়াছেন। যেহলে হেতু ও সাধ্য সমব্যাপ্ত, অর্থাৎ হেতুবিশিষ্ট সমস্ত স্থানেই যেমন সাধ্য আছে, তদ্রূপ সাধ্যযুক্ত সমস্ত স্থানেও হেতু আছে, এইরূপ স্থলে বাহা বাহা হেতুশূত্র, সে সমস্তই সাধ্যশূত্র, এইরূপেও বৈধর্মেয়াদাহরণবাক্য বলা যায়। তাই ভাষ্যকার প্রথম অধ্যায়ে অবয়ব-প্রকরণে শব্দের অনিত্যবাহুমানো ঐরূপে বৈধর্মেয়াদাহরণবাক্য প্রদর্শন করিয়াছেন। উদ্যোতকর ও বাচস্পতি মিশ্র সেখানে ভাষ্যকারের কথা গ্রহণ না করিলেও মহাবির উদাহরণবাক্যের লক্ষণ স্বত্রের দ্বারা বিশেষতঃ এখানে "নাগুনিত্যত্বাৎ" এই স্বত্রের দ্বারা ভাষ্যকারের প্রদর্শিত বৈধর্মেয়াদাহরণবাক্য যে মহাবির সম্বন্ধ, ইহা আমরা বুঝিতে পারি। পরন্তু তাৎপর্যাটীকাকারও এখানে মহাবির পরমাণুতে ব্যক্তিদ্রা প্রদর্শন করিয়াছেন কেন? এক কর্মেই বিবিধ উদাহরণে ব্যক্তিদ্রা বুঝা যাইতে পারে, এই প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছেন যে, কার্যত্ব ও অনিত্যত্বের দ্বারা পূর্কপক্ষবাদীর গৃহীত নিত্যত্ব ও অস্পর্শত্ব, সমব্যাপ্ত নহে, ইহা বুঝাইতেই মহাবির পরমাণুতে ব্যক্তিদ্রা প্রদর্শন করিয়াছেন<sup>১</sup>। সুতরাং বুঝা যায়, যেখানে হেতু ও সাধ্য সমব্যাপ্ত (যেমন অনিত্যত্বসাধ্য কার্যত্বহেতু) সেখানে বাহা বাহা হেতুশূত্র সে সমস্ত সাধ্যশূত্র ঐরূপেও বৈধর্মেয়াদাহরণবাক্য হইতে পারে এবং তাহা মহাবির সম্বন্ধ, ইহা এখানে তাৎপর্যাটীকাকারও স্বীকার করিয়াছেন। তাহা হইলে ভাষ্যকার প্রথম অধ্যায়ে অবয়ব-প্রকরণে মহাবির মতানুসারেই বৈধর্মেয়াদাহরণবাক্য বলিয়াছেন, সুতরাং উদ্যোতকর ও বাচস্পতি মিশ্র

১। অস্পর্শত্ব কর্মবিধেয়ভেদে ব্যক্তিদ্রা লক্ষ্যে নিত্যবাহুমান ব্যক্তিদ্রারোচনায় কৃতকল্পানিত্যত্বসং সমব্যাপ্তিকল্প-নিরাকরণার্থং ব্রটব্যং।—তাৎপর্যাটীকা।



ভাষ্যকারের ঐ বাক্যকে উপেক্ষা করিতে পারেন না, ইহাও আমরা বলিতে পারি। এ বিবরণ অজ্ঞাত কথা প্রথম অধ্যায়ে বধ্যমতি বলিয়াছি ( ১ম খণ্ড ২৭৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য )। মূলকথা, পূর্বপক্ষবাদী নিত্যত্বসাধ্য ও অস্পর্শহেতুকে সমব্যাপ্ত বলিলে স্পর্শবান্ ( হেতুশূন্য ) পদার্থমাত্রই অনিত্য ( সাধ্যশূন্য )—ইহা বলিতে হয়, কিন্তু স্পর্শবান্ পরমাণু অনিত্য না হওয়ার পূর্বপক্ষবাদী তাগও বলিতে পারেন না, সুতরাং কোনরূপেই ঐ স্থলে বৈধব্যাখ্যানদ্বারা বলা যায় না, ইহাই মহর্ষি পরমাণুতে ব্যক্তির প্রদর্শন করিয়া জানাইয়াছেন ৷২০২৪৥

ভাষ্য। অয়ং তর্হি হেতুঃ ?

অনুবাদ। তাহা হইলে ইহা হেতু ? [ অর্থাৎ শব্দের নিত্যত্বানুমানে অস্পর্শ হেতু না হওয়ায়, উহা ত্যাগ করিয়া এই হেতু বলিব ? ]

সূত্র। সম্প্রদানাৎ ॥২৫॥১৫৪॥

অনুবাদ। যেহেতু ( শব্দে ) সম্প্রদান অর্থাৎ সম্প্রদীয়মানর আছে, ( অতএব শব্দ অবস্থিত )।

ভাষ্য। সম্প্রদীয়মানমবস্থিতং দৃষ্টং, সম্প্রদীয়তে চ শব্দ আচার্য্যো-  
ণাস্তেবাসিনে, তস্মাদবস্থিত ইতি।

অনুবাদ। সম্প্রদীয়মান ( বস্তু ) অবস্থিত দেখা যায়, শব্দও আচার্য্য কর্তৃক  
অন্তেবাসীকে সম্প্রদত্ত হয়, অতএব ( শব্দ ) অবস্থিত।

টিপ্পনী। মহর্ষি শব্দনিত্যবাদীঃ পূর্বেক্ত হেতুতে ব্যক্তির প্রদর্শন করিয়া এই হস্তের  
দ্বারা পূর্বপক্ষবাদীর অত্র হেতুর উল্লেখপূর্বক তাহারও নিরাকরণ করিয়াছেন। এই হস্তে  
“সম্প্রদান” শব্দের দ্বারা সম্প্রদীয়মানকে হেতুরূপে গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু কোন নিত্যপদার্থে  
সম্প্রদীয়মানর নাই, দৃষ্টান্তের অভাববশতঃ সম্প্রদীয়মানর হেতু নিত্যত্বসাধের বিফল। এজন্ত  
ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, সম্প্রদীয়মান বস্তু অবস্থিত দেখা যায়। অর্থাৎ অবস্থিতত্বই এখানে  
সম্প্রদীয়মানর হেতুর সাধ্য। যে বস্তুর সম্প্রদান করা হয়, তাহা সম্প্রদানের পূর্ব হইতেই  
অবস্থিত থাকে। সম্প্রদীয়মান বনাদি ইহার দৃষ্টান্ত। আচার্য্য যে শিষ্যকে বিদ্যাদান করেন, তাহা  
বস্তুতঃ শব্দেরই সম্প্রদান। শব্দে সম্প্রদীয়মানর হেতু থাকার শব্দ সম্প্রদানের পূর্বেও, অর্থাৎ  
উচ্চারণের পূর্বেও অবস্থিত থাকে, ইহা সিদ্ধ হয়। তাহা হইলে শব্দের অনিত্যত্ব সাধনে যে  
সকল হেতু বলা হইয়াছে, তদ্বারা শব্দের অনিত্যত্ব সিদ্ধ হয় না। উচ্চারণের পূর্বেও শব্দ থাকে,  
ইহা স্বীকার করিতে হইলে, শব্দের অনিত্যত্ববাদীর নিজ সিদ্ধান্ত ত্যাগ করিয়া শব্দের নিত্যত্ব  
সিদ্ধান্তই স্বীকার করিতে হইবে। এই অভিসন্ধিতেই শব্দনিত্যবাদী সম্প্রদীয়মানর হেতু  
দ্বারা শব্দের অবস্থিতত্ব সাধন করিয়াছেন ৷২৫৥

**সূত্র । তদন্তরালানুপলব্ধেরহেতুঃ ॥২৬॥১৫৫॥**

অনুবাদ । ( উত্তর ) সেই উভয়ের অর্থাৎ গুরু ও শিষ্যের অন্তরালে (শব্দের) অনুপলব্ধিবশতঃ ( পূর্বসূত্রোক্ত হেতু ) অহেতু, অর্থাৎ উহা অসিদ্ধ বলিয়া হেতু হয় না, উহা হেতুভাস ।

ভাষ্য । যেন সম্প্রদীয়তে ঘটয়ৈ চ, তয়োঃ অন্তরালে হবস্থানমস্ম্য কেন লিঙ্গেনোপলভ্যতে ? সম্প্রদীয়মানো হবস্থিতঃ সম্প্রদাতুরপৈতি সম্প্রদানঞ্চ প্রাপ্তোত্তীত্যবজ্জনীয়মেতৎ ।

অনুবাদ । যিনি সম্প্রদান করেন, এবং যাহাকে সম্প্রদান করা হয়, সেই উভয়ের, অর্থাৎ গুরু ও শিষ্যের অন্তরালে এই শব্দের অবস্থান কোন্ হেতুর দ্বারা বুঝা যায় ? অবশ্য সম্প্রদীয়মান পদার্থ অবস্থিত থাকিয়া সম্প্রদাতা হইতে অপগত হয় এবং সম্প্রদানকে ( দানীয় ব্যক্তিকে ) প্রাপ্ত হয়, ইহা অবজ্জনীয় অর্থাৎ ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য ।

টিপ্পনী । মহর্ষি এই হত্রের দ্বারা পূর্বোক্ত হেতু অসিদ্ধ বলিয়া উহাকে অহেতু বলিয়াছেন । মহাবির কথ্য এই যে, গুরু শিষ্যকে শব্দ সম্প্রদান করেন, ইহা অসিদ্ধ । গুরু শিষ্যকে শব্দ সম্প্রদান করিলে ঐ গুরু ও শিষ্যের মধ্যে পূর্বেও ঐ শব্দকে উপলব্ধি করা যাইত । অতঃ সম্প্রদান-স্থলে দাতা ও গ্রহীতার মধ্যে পূর্বেও দেয় বস্তুর প্রত্যক্ষ হয় । গুরু ও শিষ্যের মধ্যে শব্দ-সম্প্রদানের পূর্বে যখন দেয় শব্দের উপলব্ধি হয় না, তখন পূর্বপক্ষবাদী শব্দের সম্প্রদান সিদ্ধ করিতে পারেন না । শব্দে সম্প্রদীয়মানত্ব অসিদ্ধ হইলে, উহা হেতু হয় না । সুতরাং গুরু ও শিষ্যের অন্তরালে শব্দ অবস্থিত থাকে, ইহা বুঝিবার কোন হেতু নাই । তাই ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, কোন্ হেতুর দ্বারা গুরু-শিষ্যের অন্তরালে শব্দের অবস্থান বুঝা যায় ? অর্থাৎ উহা বুঝিবার হেতু নাই । সম্প্রদীয়মান পদার্থ পূর্বে হইতেই অবস্থিত থাকিয়া সম্প্রদাতার নিকট হইতে সম্প্রদান-ব্যক্তিকে প্রাপ্ত হয়, ইহা অবশ্যস্বীকার্য্য । কিন্তু শব্দের যে সম্প্রদান হয়, ইহার সাধক হেতু নাই । পরন্তু পূর্বোক্ত রূপ বাধকই আছে । ২৬ ॥

**সূত্র । অধ্যাপনাদপ্রতিষেধঃ ॥২৭॥১৫৬॥**

অনুবাদ । ( পূর্বপক্ষবাদীর উত্তর )—অধ্যাপনাপ্রযুক্ত—অর্থাৎ যেহেতু গুরু শিষ্যকে শব্দের অধ্যাপনা করেন, অতএব ( শব্দে সম্প্রদীয়মানত্ব হেতুর ) প্রতিষেধ নাই অর্থাৎ শব্দে সম্প্রদীয়মানত্ব আছে ।

ভাষ্য । অধ্যাপনং লিঙ্গং, অসতি সম্প্রদানেহধ্যাপনং ন স্মাদিতি ।



অনুবাদ । অধ্যাপনা লিঙ্গ, অর্থাৎ শব্দের অধ্যাপনাই তাহার সম্প্রদায়মানত্বের  
সাধক, সম্প্রদান না থাকিলে অধ্যাপন থাকে না ।

টিপ্পনী । মহর্ষি এই হস্তের দ্বারা পূর্বপক্ষবাদীর উত্তর বলিয়াছেন যে, শব্দের বখন অধ্যাপন  
আছে, অর্থাৎ শব্দের অধ্যাপনা বখন সর্বসিদ্ধ, গুরু শিষ্যকে শব্দের অধ্যাপনা করেন, ইহা বখন  
সকলেই স্বীকার করেন, তখন উহার দ্বারাই শব্দের সম্প্রদান সিদ্ধ হয় । শব্দের সম্প্রদায়মানত্বে  
অধ্যাপনাই লিঙ্গ । উদ্যোতকর ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, গুরু ও শিষ্যের অন্তরালে শব্দ অবস্থিত  
থাকে, ইহাতে অধ্যাপনাই লিঙ্গ বা অনুমান্যক হেতু । ধর্ম্মকোদবিৎ আচার্য্য শিষ্যকে বেখানে  
বাণপ্রয়োগ শিক্ষা প্রদান করেন, সেখানে ঐ বাণ সেই গুরু ও শিষ্যের অন্তরালে অবস্থিত থাকে ।  
এই দৃষ্টান্তে শব্দের অধ্যাপনাবলেও শব্দ গুরু ও শিষ্যের অন্তরালে অবস্থিত থাকে, ইহা অনুমান-  
সিদ্ধ । সুতরাং গুরু ও শিষ্যের অন্তরালে শব্দের অবস্থান প্রত্যক্ষের দ্বারা উপলব্ধ না হইলেও  
অনুমানের দ্বারা উহার উপলব্ধি হওয়ার, উহা স্বীকার্য্য । ভাষ্যকার কিন্তু “অসত্তি সম্প্রদানে-  
অধ্যাপনং ন সত্যং”—এই কথা দ্বারা অধ্যাপনাকে এখানে সম্প্রদানের লিঙ্গরূপেই ব্যাখ্যা করিয়া  
শব্দে সম্প্রদায়মানত্ব সিদ্ধ বলিয়াছেন, বুঝা যায় । শব্দে সম্প্রদায়মানত্ব সিদ্ধ হইলে, তদ্বারা  
শব্দের অবস্থিতত্ব রূপ সাধ্য সিদ্ধ হইবে—ইহাই পূর্বপক্ষবাদীর বক্তব্য । ভাষ্যকার যে এখানে  
অধ্যাপনাকে সম্প্রদানেরই লিঙ্গরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, ইহা পরবর্তী হস্তভাষ্যের দ্বারা সুস্পষ্টই  
বুঝা যায় । গুরু শিষ্যকে শব্দ-সম্প্রদান করিয়া, গ্রহণ করাইয়া থাকেন, উহাই শব্দের অধ্যাপনা,—  
উহা শব্দের সম্প্রদান ব্যতীত হইতে পারে না, সুতরাং অধ্যাপনা শব্দের সম্প্রদানের লিঙ্গ—ইহাই  
এখানে ভাষ্যকারের কথা । ২৭ ।

সূত্র । উভয়োঃ পক্ষয়োঃ ততঃ স্তাধ্যাপনাদ-  
প্রতিষেধঃ ॥ ২৮ ॥ ১৫৭ ॥

অনুবাদ । ( সিদ্ধান্তবাদীর উত্তর ) উভয়পক্ষে অধ্যাপনা বশতঃ অর্থাৎ শব্দের  
নিত্যত্ব ও অনিত্যত্ব এই উভয়পক্ষেই অধ্যাপনা হইতে পারায় ( অধ্যাপনা প্রযুক্ত )  
অন্তত্বের, অর্থাৎ শব্দের অনিত্যত্ব পক্ষের প্রতিষেধ হয় না ।

ভাষ্য । সমানমধ্যাপনমুভয়োঃ পক্ষয়োঃ সংশয়ানিবৃত্তেঃ । কি-  
মাচার্য্যাস্তঃ শব্দোহস্তেবাসিনমাপদ্যতে তদধ্যাপনং, আহোপিশ্মৃত্যোপদেশব-  
দগৃহীতস্থানুকরণমধ্যাপনমিতি । এবমধ্যাপনমলিঙ্গং সম্প্রদানশ্চেতি ।

অনুবাদ । অধ্যাপন উভয়পক্ষে সমান, যেহেতু সংশয়নিবৃত্তি হয় না । ( সে  
কিরূপ সংশয়, তাহা বলিতেছেন ) কি আচার্য্যাস্ত শব্দ অস্তেবাসীকে প্রাপ্ত হয়, তাহা



অধ্যাপন ? অথবা নৃত্যের উপদেশের জায় গৃহীতের অনুরূপ অধ্যাপন ? এইরূপ হইলে, অর্থাৎ অধ্যাপন উভয় পক্ষেই সমান হইলে, অধ্যাপন সম্প্রদানের লিঙ্গ হয় না ।

টিপ্পনী । দিক্‌স্বামী মহাশি এই স্বত্বের দ্বারা পূর্বপক্ষবাদীর পূর্বস্বত্বোক্ত উভয়ের নিরাস করিতে বলিয়াছেন যে, উভয়পক্ষেই যখন অধ্যাপনা হইতে পারে, তখন অধ্যাপনা-প্রযুক্ত অস্তর-পক্ষের, অর্থাৎ শব্দের অনিত্যত্বপক্ষের নিবেদন হয় না । বৃত্তিকার বিধনাত্মক স্বার্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, অস্তরপক্ষের অর্থাৎ অনিত্যত্ব-সাধকের অধ্যাপনা-প্রযুক্ত যে প্রতিবেদন, তাহা সম্ভব হয় না । কারণ, অধ্যাপনা উভয়পক্ষেই সমান । বৃত্তিকার “সমানত্বাৎ” এই বাক্যের অধ্যাহার স্বীকার করিয়া ঐরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন । ভাষ্যকারও অধ্যাপনা উভয়পক্ষে সমান, ইহা বলিয়াছেন । “উভয়োঃ পক্ষয়োঃ অধ্যাপনাৎ”—এইরূপে স্বার্থ ব্যাখ্যা করিলে, উভয়পক্ষেই অধ্যাপনা হয়, এই কথা বারি অধ্যাপনা উভয়পক্ষেই সমান, এই অর্থ বুঝা যাইতে পারে । সুতরাং ভাষ্যকার ঐরূপেই স্বার্থ বুঝিয়া অধ্যাপনা উভয়পক্ষে সমান, এই কথা বলিয়াছেন, বুঝা যায় । অধ্যাপনা-প্রযুক্ত উভয় পক্ষের কোন পক্ষেরই প্রতিবেদন হয় না, এইরূপে স্বার্থ ব্যাখ্যা করিলে, স্বত্বে “অস্তরত্ব” এই বাক্য ব্যর্থ হয় । ভাষ্যকার উভয়পক্ষে অধ্যাপনার সমানত্ব বুঝাইতে অধ্যাপনার স্বরূপবিষয়ে সংশয় প্রদর্শন করিয়াছেন যে, আচার্য্যে যে শব্দ অবস্থিত থাকে, সেই শব্দই শিষ্যকে প্রাপ্ত হয় ? তাহাই অধ্যাপনা ? অথবা নৃত্যের উপদেশস্থলে শিষ্য যেমন শিককস্থ নৃত্যক্রিয়াকেই লাভ করে না, সেই নৃত্যক্রিয়াকে অনুরূপ করে, অর্থাৎ তৎসদৃশ নৃত্যক্রিয়া করে, এইরূপ শব্দের অধ্যাপনা-স্থলে শিষ্য আচার্য্যের উচ্চারিত শব্দের অনুরূপ করে—ইহাই অধ্যাপনা ? পূর্বপক্ষবাদী যখন শেখোক্ত প্রকার অধ্যাপনার স্বরূপ নিরাস করিয়া পূর্বোক্তরূপ সংশয় নিবৃত্তি করিতে পারেন না, তখন অধ্যাপনা উভয়পক্ষেই সমান হওয়ার উহা সম্প্রদানের লিঙ্গ হয় না । কারণ, যদি আচার্য্যই শব্দই আচার্য্য কর্তৃক সম্প্রদত্ত হইয়া শিষ্যকর্তৃক প্রাপ্ত না হয়, যদি শিষ্য নৃত্যের উপদেশের জায় গৃহীত শব্দের অনুরূপই করে, তাহা হইলে শেখোক্ত-প্রকার অধ্যাপনা-স্থলে শব্দের সম্প্রদান হয় না, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য ; সুতরাং অধ্যাপনা সম্প্রদানের সাধক হয় না । শব্দের সম্প্রদান ব্যতীতও যখন শেখোক্ত প্রকার অধ্যাপনা হইতে পারে, তখন অধ্যাপনা হেতুর দ্বারা শব্দের সম্প্রদায়মানত্ব সিদ্ধ হয় না । তাহা না হইলে শব্দের অবস্থিতত্ব সিদ্ধ না হওয়ার শব্দের নিত্যত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না, সুতরাং শব্দের অনিত্যত্বরূপ অস্তর পক্ষের নিবেদন হয় না—ইহাই ভাষ্যকারের চরম বক্তব্য । শব্দের অনিত্যত্ববাদী ভাষ্যকারের মতে আচার্য্যই শব্দই শিষ্যকে প্রাপ্ত হয় না, শিষ্য নৃত্যোপদেশের জায় গৃহীত শব্দের অনুরূপই করে, ইহাই দিক্‌স্বামী, তথাপি পূর্বপক্ষবাদীদিগের সম্মত অধ্যাপনার স্বরূপেরও উল্লেখ করিয়া ভাষ্যকার ঐ বিষয়ে সংশয় স্বীকার করিয়াও পূর্বপক্ষবাদীকে নিবৃত্ত করিয়াছেন । ভাষ্যকারের বিবক্ষা এই যে, শব্দ উচ্চারণের পূর্বেও অবস্থিত থাকে, আচার্য্যই শব্দই শিষ্যকে প্রাপ্ত হয়, এই পক্ষ সিদ্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত যখন উহা উভয়বাদিসম্মত হইবে না, তরূপ আমাদিগের পক্ষও উভয়বাদিসম্মত না হওয়ার, বিপ্রতিপত্তিবশতঃ ঐ উভয়পক্ষ সন্দিগ্ধ । সুতরাং



যে পক্ষে অধ্যাপনাতলে শব্দের সম্প্রদান হয় না, সেই পক্ষ স্বীকার করিলে, তখন অধ্যাপনার দ্বারা শব্দের সম্প্রদান সিদ্ধ হইতে পারে না, তখন পূর্বোক্তরূপে সন্ধিগতরূপ অধ্যাপনা সম্প্রদানের লিঙ্গ হয় না। পূর্বপক্ষবাদী যদি প্রমাণের দ্বারা অধ্যাপনার প্রথমোক্ত স্বরূপই সিদ্ধ করিতে পারেন, তাহা হইলে তিনি অধ্যাপনার দ্বারা শব্দের সম্প্রদান সিদ্ধ করিতে পারেন, কিন্তু তাহার সম্বন্ধ অধ্যাপনার স্বরূপ এখনও সিদ্ধ হয় নাই। তিনি উহা সিদ্ধ করিতেই সম্প্রদায়মানত্ব হেতুর উল্লেখ করিয়া তাহা সিদ্ধ করিতেই অধ্যাপনা হেতুর উল্লেখ করিয়াছেন। বস্তুতঃ শব্দ-নিত্যতাবাদীর মতে শব্দের সম্প্রদান হইতেই পারে না। নিত্যপদার্থের সম্প্রদান হয় না। পরন্তু শব্দে কাহারই স্বত্ব না থাকায় উহার সম্প্রদান অসম্ভব। বহু লোকে একই নিত্যশব্দের সম্প্রদান করে, ইহা হইতে পারে না। যে শব্দ একবার প্রদত্ত হইয়াছে, তাহারই পুনঃ পুনঃ দানও অসম্ভব।

ভাষ্যকার উত্তরপক্ষে অধ্যাপনার ফলেই অধ্যাপনার অভ্যেদোপচারবশতঃ ঐ ফলকেই অধ্যাপনা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ঐরূপ অভ্যেদোপচার অনেক স্থলেই দেখা যায়। বস্তুতঃ ভাষ্যোক্ত শিষ্যের শব্দপ্রাপ্তি অথবা গৃহীত শব্দের অনুকরণরূপ ফলের অনুকূল অধ্যাপকের ব্যাপারবিশেষই অধ্যাপনা। কোন কোন পুস্তকে এই সূত্রটি ভাষ্যরূপেই উল্লিখিত দেখা যায়, কিন্তু এইটি মহর্ষির সিদ্ধান্ত সূত্র। ইহার দ্বারা মহর্ষি পূর্বস্বত্রোক্ত উক্তরের নিরাস করিয়াছেন। স্মারসূচীনিবন্ধেও ইহা সূত্রমণ্যেই গৃহীত হইয়াছে। ২৮।

ভাষ্য। অয়ং তর্হি হেতুঃ ?

অনুবাদ। তাহা হইলে (শব্দের অবস্থিতবস্তুধনে সম্প্রদায়মানত্ব হেতু না হইলে) ইহা হেতু ( বলিব ? )।

সূত্র। অভ্যাসাৎ ॥ ২৯ ॥ ১৫৮ ॥

অনুবাদ। (পূর্বপক্ষ) যেহেতু অভ্যাস, অর্থাৎ অভ্যস্তমানত্ব আছে— (অতএব শব্দ অবস্থিত)।

ভাষ্য। অভ্যস্তমানমবস্থিতং দৃষ্টং। পঞ্চকৃৎসং পশ্যতীতি রূপমবস্থিতং পুনঃ পুনর্দৃশ্যতে। ভবতি চ শব্দেহভ্যাসঃ,—দশকৃৎসোহধীতোহনুবাকো বিংশতিকৃৎসোহধীত ইতি। তস্মাদবস্থিতস্য পুনঃ পুনরুচ্চারণমভ্যাস ইতি।

অনুবাদ। অভ্যস্তমান অর্থাৎ যাহা অভ্যাস করা যায়, তাহা অবস্থিত দেখা যায়। (দৃষ্টান্ত) “পাঁচ বার দর্শন করিতেছে”—এই স্থলে অবস্থিত রূপ পুনঃ পুনঃ দৃষ্ট হয়। শব্দেও অভ্যাস আছে, (যেমন) দশ বার অনুবাক (বেদের অংশবিশেষ)

অধীত হইয়াছে, বিংশতিবার অধীত হইয়াছে। অতএব অবস্থিত শব্দের পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ—অভ্যাস।

টিপ্পনী। মহর্ষি পূর্বপক্ষবাদীর গৃহীত সম্প্রদায়মানত্ব হেতুর অসিদ্ধি সমর্থন করিয়া এখন এই সূত্রের দ্বারা অভ্যাস, অর্থাৎ অভ্যস্তমানত্ব হেতুর উল্লেখপূর্বক তদ্বারা পূর্ববৎ শব্দের অবস্থিতত্ব সিদ্ধি প্রকাশ করিয়াছেন। অনিত্য পদার্থেও অভ্যস্তমানত্ব থাকায় উহা নিত্যত্বের সাধন হয় না, একজ্ঞ এখানেও—অবস্থিতত্বই সূত্রোক্ত অভ্যস্তমানত্ব হেতুর সাধ্য বৃত্তিতে হইবে। তাই, ভাষ্যকার প্রথমেই বলিয়াছেন, “অভ্যস্তমানকে অবস্থিত দেখা যায়।” পাঁচবার রূপদর্শন করিতেছে, এইরূপ প্রয়োগ সর্বসম্মত। তাই ভাষ্যকার ঐ প্রয়োগের উল্লেখপূর্বক রূপকে দৃষ্টান্তরূপে প্রকাশ করিয়াছেন। অবস্থিত একই রূপের পাঁচ বার দর্শন হয়। রূপের ঐ পুনঃ পুনঃ দৃষ্টমানত্বই ঐ স্থলে অভ্যস্তমানত্ব। উহা অবস্থিতরূপেই থাকে, স্তত্রাং রূপদৃষ্টান্তে অভ্যস্তমানত্ব হেতুতে অবস্থিতত্বসাধ্যের ব্যাপ্তি নিশ্চয় হওয়ায় ঐ হেতুর দ্বারা শব্দেও অবস্থিতত্ব সিদ্ধ হয়। কারণ “দশ বার অধ্যয়ন করিয়াছে”, “বিংশতি বার অধ্যয়ন করিয়াছে”—ইত্যাদি প্রয়োগের দ্বারা একই শব্দের পুনঃ পুনঃ উচ্চারণরূপ অভ্যাস সিদ্ধ আছে। স্তত্রাং শব্দে অভ্যস্তমানত্ব থাকায়, রূপের দ্বার শব্দও অবস্থিত, ইহা অহুমানের দ্বারা সিদ্ধ হয়। শব্দনিত্যবাদী মীমাংসক সম্প্রদায়ের কথা এই যে, যদি উচ্চারণভেদে শব্দের ভেদ হয়, তাহা হইলে একই শব্দের একবারই উচ্চারণ হয়, কোন শব্দেরই পুনঃ পুনঃ উচ্চারণরূপ অভ্যাস সম্ভবই হয় না। কারণ প্রথমে যে শব্দ উচ্চারিত হয়, তাহা দ্বিতীয় উচ্চারণকালে থাকে না; পরন্তু শব্দান্তরেই দ্বিতীয় উচ্চারণ হয়। তাহা হইলে কোন শব্দেরই পুনরুচ্চারণ না হওয়ায়, শব্দের অভ্যাস হইতে পারে না। শব্দের অভ্যাস সর্বসম্মত; উহা অবীকার করা যায় না। স্তত্রাং ইহা অবজ্ঞ স্বীকার্য যে, যে শব্দ উচ্চারিত হয়, তাহা উচ্চারণের পরেও থাকে, সেই শব্দেরই পুনরুচ্চারণ হয়। একই শব্দের পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ হইলেই তাহার অভ্যাস উপপন্ন হয়। কারণ পুনঃ পুনঃ উচ্চারণই শব্দের অভ্যাস। উচ্চারণভেদে শব্দের ভেদ হইলে কোন শব্দেরই পুনরুচ্চারণ না হওয়ায় ঐ অভ্যাস উপপন্ন হয় না। একই শব্দ সূচিরকাল পর্যন্ত অবস্থিত থাকিলে সূচিরকাল পর্যন্ত তাহার অভ্যাস হইতে পারে। অভ্যাসের অনুরোধে শব্দের সূচিরকাল স্থায়িত্ব স্বীকার করিতে হইলে, শব্দের নিত্যত্বই স্বীকার করিতে হইবে,—ইহাই শব্দনিত্যবাদীদিগের শেষ কথা। ২৯।

**সূত্র।** নাশ্তত্বেহপ্যভ্যাসস্তোপচারাৎ ॥৩০॥১৫৯॥

অনুবাদ। (উত্তর) না, অর্থাৎ অভ্যাসের দ্বারা শব্দের অবস্থিতত্ব বা অভেদ সিদ্ধ হয় না, যেহেতু অন্তত্ব, অর্থাৎ ভেদ থাকিলেও অভ্যাসের প্রয়োগ আছে।

ভাব্য। অগ্ন্যশ্ব চাপ্যভ্যাসাভিধানং ভবতি, দ্বিনৃত্যত্ব ভবান্, ত্রিনৃত্যত্ব ভবানিতি, দ্বিরনৃত্যৎ, ত্রিরনৃত্যৎ, দ্বিরমিহোত্রং জুহোতি, দ্বিভুঙক্তে, এবং ব্যভিচারাত্।



অনুবাদ । ভিন্ন পদার্থেরও অভ্যাসের কথন হয় । ( যেমন )—আপনি দুইবার নৃত্য করুন, আপনি তিনবার নৃত্য করুন, দুইবার নৃত্য করিয়াছিল, তিনবার নৃত্য করিয়াছিল, দুইবার অগ্নিহোত্র হোম করিতেছে, দুইবার ভোজন করিতেছে, এইরূপ হইলে, ব্যভিচারবশতঃ ( অভ্যাস অভেদসাধক হয় না ) ।

টিপনী । মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা পূর্বস্বত্রোক্ত হেতুতে ব্যভিচার প্রদর্শন করিয়া পূর্বোক্ত পূর্বপক্ষের নিরাস করিয়াছেন । ভাব্যকার নৃত্যাদি বিভিন্ন ক্রিয়াস্থলে অভ্যাসের প্রয়োগ দেখাইয়া সেই ব্যভিচার বুঝাইয়াছেন । শেষে “এবং ব্যভিচারং” এই কথা বলিয়া মহর্ষির চরম হেতু প্রকাশ করিয়াছেন । মহর্ষির কথা এই যে, বৈকল্প প্রয়োগের দ্বারা শব্দের অভ্যাস বুঝা যায়, ঐরূপ প্রয়োগ নৃত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়াস্থলেও হইয়া থাকে । “দুইবার নৃত্য করিতেছে”—এইরূপ প্রয়োগের দ্বারা নৃত্যের যে অভ্যাস বুঝা যায়, তাহা একই নৃত্যক্রিয়ার পুনরুৎপাদন নহে । নৃত্য হোম ও ভোজনাদি ক্রিয়ার অভ্যাস-স্থলে ঐ সকল সঙ্গতীয় ক্রিয়া ভিন্ন, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য । কারণ যে নৃত্য বা ভোজনাদি ক্রিয়া প্রথম অহুষ্ঠিত হয়, সেই ক্রিয়ারই পুনরুৎপাদন হয় না, হইতে পারে না । ঐ সকল স্থলে সঙ্গতীয় ক্রিয়ার অনুষ্ঠানবশতঃই “দুইবার নৃত্য করিতেছে”—ইত্যাদিরূপে অভ্যাসের প্রয়োগ হয় । সুতরাং অভ্যাস বা অভ্যস্তমানের ভিন্ন পদার্থেরও থাকার উহা শব্দের অভেদসাধক হয় না । নৃত্যাদি ক্রিয়ার দ্বারা সঙ্গতীয় শব্দের পুনরুৎপাদনবশতঃই শব্দের অভ্যাস কথিত হয় । এবং যে নৃত্যাদি ক্রিয়া প্রথম অহুষ্ঠিত হয়, তাহা বিনষ্ট হইয়া যায়, তাহা অবস্থিত না থাকিলেও তাহাতে পূর্বোক্তরূপে অভ্যাসের প্রয়োগ হওয়ার, বাহ্য অভ্যস্তমান—তাহা অবস্থিত, ইহা বলা যায় না, সুতরাং অভ্যস্তমানের হেতুর দ্বারা, শব্দের অবস্থিতত্বও নিদ্ধ করা যায় না । ভাষ্যের প্রথমে “অনবস্থানেহপি”—এইরূপ পাঠই প্রচলিত পুস্তকে দেখা যায় । ঐ পাঠে অভ্যস্তমানের হেতুর দ্বারা অবস্থান বা অবস্থিতত্ব নিদ্ধ হয় না, ইহা প্রকটিত হয় । কিন্তু স্বত্রকার “অন্তহেহপি”—এইরূপ বাক্য প্রয়োগ করায় ভাষ্যে “অন্তস্ত চাপি” এইরূপ পাঠান্তরই গৃহীত হইয়াছে । ৩০১

ভাব্য । প্রতিষিদ্ধহেতাবন্যাশব্দস্ত প্রয়োগঃ প্রতিষিধ্যতে—

অনুবাদ । প্রতিষিদ্ধ হেতুবাক্যে অর্থাৎ যে বাক্যের দ্বারা পূর্বপক্ষবাদীর হেতুর ব্যভিচার প্রদর্শিত হইয়াছে, সেই বাক্যে, (চলবাদী) “অন্ত” শব্দের প্রয়োগ প্রতিবেদন করিতেছেন—

সূত্র । অন্তদন্তস্মাদনন্তদ্বাদনন্তাদিত্যন্ততাভাবঃ ॥

॥ ৩১ ॥ ১৬০ ॥

অনুবাদ । ( পূর্বপক্ষ ) অন্ত অর্থাৎ যে পদার্থকে অন্ত বলা হয় তাহা অন্ত

হইতে, অর্থাৎ অন্য বলিয়া কথিত সেই পদার্থ হইতে অনন্যত্ব ( অভিন্নত্ব ) বশতঃ অনন্য, অতএব অন্তত্বের অভাব, অর্থাৎ জগতে অন্যত্ব অলীক ।

ভাষ্য । যদিদমন্ত্যদিতি মন্যাসে, তৎ স্বাত্মানোহনন্যত্বাদন্তম্ ভবতি, এবমন্ত্যত্যা অভাবঃ । তত্র যদুক্তং “মন্ত্যেহপ্যভ্যাসস্তোপচারা” দিত্যেত-  
দযুক্তমিতি ।

অনুবাদ । যাহাকে “ইহা অন্য” এইরূপ মনে কর, তাহা নিজ হইতে অনন্যত্ব-  
বশতঃ অন্য হয় না । এইরূপ হইলে অর্থাৎ পদার্থমাত্রই নিজ হইতে অনন্য বলিয়া  
অন্য না হইলে, অন্তত্বের অভাব অর্থাৎ জগতে অন্যত্বা বলিয়া কিছু নাই, উহা অলীক ।  
তাহা হইলে, “অন্যত্ব থাকিলেও অভ্যাসের উপচারবশতঃ” এই বাহ্য বলা হইয়াছে,  
ইহা অযুক্ত ।

টীকানী । মহর্ষি এই শব্দের দ্বারা তাহার পূর্বোক্ত কথার ছলবাদীর বাক্‌ছল প্রদর্শন  
করিয়াছেন । মহর্ষির সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে জল্প বা বিতণ্ডা করিবার প্রতিবাদী এখানে ত্রিকূপ ছল  
করিতে পারেন, তাহার উল্লেখপূর্বক নিরাস করাও আবশ্যক মনে করিয়া মহর্ষি এই শব্দের দ্বারা  
বাক্‌ছল প্রকাশ করিয়াছেন যে—অন্ততা নাই, অর্থাৎ জগতে অন্য বলা যায় এমন কিছুই নাই ।  
কারণ, যাহাকে অন্য বলিবে, তাহা সেই পদার্থ হইতে অভিন্ন হওয়ার অনন্ত । যট যে ঘট  
হইতে ভিন্ন নহে—অভিন্ন, স্ততরাং অনন্ত, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য । এইরূপে সকল পদার্থই যদি  
অনন্ত হয়, তাহা হইলে কাহাকেই আর অন্য বলা যায় না, অন্য কিছুই নাই ; অন্তত্ব অলীক ।  
স্ততরাং, উত্তরবাদী পূর্বশব্দে যে “অন্ত” শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহা করিতে পারেন না ।  
“অন্তত্বেন্দি” এই কথা উত্তরবাদী বলিতেই পারেন না । বাহ্য অনন্ত তাহা যে অন্য হইতে পারে না,  
ইহা উত্তরবাদীও স্বীকার করেন । পদার্থমাত্রই নিজ হইতে অনন্ত হওয়ার, অন্য হইতে পারে না ।  
স্ততরাং অন্তত্ব কিছুতেই না থাকায়, উহা অলীক ॥৩১॥

ভাষ্য । শব্দপ্রয়োগঃ প্রতিবেদনতঃ শব্দান্তরপ্রয়োগঃ প্রতিষিধ্যতে—

অনুবাদ । শব্দপ্রয়োগ-প্রতিবেদকারীর শব্দান্তর প্রয়োগ প্রতিষেধ করিতেছেন—

সূত্র । তদভাবে নাস্ত্যানন্ত্যতা তয়োৱিতরেতরা-  
পেক্ষসিদ্ধেঃ ॥৩২॥১৬১॥

অনুবাদ । ( উত্তর ) তাহার ( অন্তত্বের ) অভাবে অনন্ততা নাই, অর্থাৎ অন্যতা  
না থাকিলে অনন্ততাও থাকে না, যেহেতু সেই উভয়ের মধ্যে, অর্থাৎ “অন্ত” শব্দ ও  
“অনন্ত” শব্দের মধ্যে ইতরের ( অনন্ত শব্দের ) ইতর্য্যাপেক্ষ অর্থাৎ অন্তশব্দ্যাপেক্ষ  
সিদ্ধি ।



ভাষ্য । অন্তঃশ্রাদানন্ততামুপপাদয়তি ভবান্, উপপাদ্য চান্যৎ প্রত্যাচক্কে, অনন্তদিতি চ শব্দমনুজানতি, প্রযুক্তে চানন্তদিত্যেতৎ সমাসপদং, অন্তশব্দোহয়ং প্রতিষেধেন সহ সমস্ততে, যদি চাত্তোত্তরং পদং নাস্তি, কস্তায়ং প্রতিষেধেন সহ সমাসঃ ? তস্মাত্তয়োরন্তানন্তশব্দয়োৱিতরোহ-  
নন্তশব্দ ইতরমন্তশব্দমপেক্ষমাণঃ সিধ্যতীতি । তত্র যদুক্তমন্ততায়  
অভাব ইত্যেতদযুক্তমিতি ।

অনুবাদ । আপনি অন্ত হইতে অনন্ততা উপপাদন করিতেছেন, উপপাদন করিয়াই অন্তকে প্রত্যাখ্যান করিতেছেন ; “অনন্ত” এই শব্দকেও স্বীকার করিতেছেন, “অনন্ত” এই সমাস পদ প্রয়োগও করিতেছেন । ( “অনন্ত” এই বাক্যে ) এই “অন্ত” শব্দ প্রতিষেধের সহিত, অর্থাৎ নঞ শব্দের সহিত সমস্ত হইয়াছে । কিন্তু যদি এই স্থলে উত্তরপদ ( অন্ত শব্দ ) না থাকে ( তাহা হইলে ) প্রতিষেধের সহিত কাহার এই সমাস হইয়াছে ? অতএব সেই “অন্ত” শব্দ ও “অনন্ত” শব্দের মধ্যে ইতর অনন্ত শব্দ ইতর অন্ত শব্দকে অপেক্ষা করতঃ সিদ্ধ হয় । [ অর্থাৎ অন্ত না থাকিলে অনন্ত থাকে না, এবং “অন্ত” শব্দ না থাকিলে “অনন্ত” এই সমাসও সিদ্ধ হয় না, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য ] । তাহা হইলে “অন্যতর অভাব”—এই বাহা বলা হইয়াছে, ইহা অযুক্ত ।

টিপ্পনী । পূর্বস্বত্রোক্ত বাক্যে নিরাস করিতে এই স্বত্রের দ্বারা মহাবি বলিয়াছেন যে,— অন্তত্ব না থাকিলে ছলবাদীর বীকৃত অনন্তত্বও থাকে না । কারণ, বাহা অন্ত নহে, তাহাকেই বলে অনন্ত । তাহা হইলে অনন্ত বুঝিতে অন্ত বুঝা আবশ্যক । যদি অন্ত বলিয়া কোন পদার্থই না থাকে, তাহা হইলে “অন্ত” এইরূপ জ্ঞান হইতে না পারায়, “অনন্ত” এইরূপ জ্ঞানও হইতে পারে না । অনন্তত্বের জ্ঞান হইতে না পারিলে, উদ্যোগ সিদ্ধ হয় না । ভাষ্যকার মহাবির তাৎপর্য্য বুঝাইতে প্রথমে বলিয়াছেন যে, ছলবাদী অন্ত হইতে অনন্তত্ব উপপাদন করিয়াই অন্তকে অপলাপ করিতেছেন । ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য এই যে, বাহাকে অন্ত বলা হয়, তাহা

১ । প্রাচীনযপ প্রতিষেধার্থক “নঞ” শব্দ বলিতে “প্রতিষেধ” শব্দেরও প্রয়োগ করিতেন ।

২ । প্রচলিত ভাষ্যপুস্তকে “অন্তঃশ্রাদানন্ততামুপপাদয়তি ভবান্” এইরূপ পাঠ আছে । কিন্তু পূর্বস্বত্রে ছলবাদী “অন্তত্বানন্তত্বাৎ” এই কথা বলিয়া অন্ত হইতে অনন্তত্বের উপপাদন করিয়াই অন্ততর অভাব বলিয়া, অন্তকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন । ইতরঃ প্রচলিত পাঠ সুহীত হয় নাই ।

ঐ অস্ত্র হইতে অনস্ত্র, স্ত্রুতরাং তাহা অস্ত্র হইতে পারে না, এই কথা বলিয়া ছলবাদী অস্ত্র কিছুই নাই; কারণ, সকল পদার্থই অনস্ত্র—এই কথা বলিয়াছেন (পূর্বসূত্রে “অস্ত্রাদিনস্ত্রাদিনস্ত্রং”—এই কথার দ্বারা অস্ত্র হইতে অনস্ত্রও আছে বলিয়া, অস্ত্রতা নাই—এই কথা বলা হইয়াছে); স্ত্রুতরাং অস্ত্রকে মানিয়া লইয়াই অনস্ত্র সমর্থন করিয়া—সেই হেতুবশতঃ অস্ত্রকে অপলাপ করা হইয়াছে। অস্ত্র না মানিলে ছলবাদী পূর্বোক্তরূপে অনস্ত্র সমর্থন করিতে পারেন না। নিজের হেতু সমর্থন করিতে অস্ত্রকে স্বীকার করিয়া, ঐ অস্ত্র নাই—ইহা কিছুতেই বলা যায় না। ছলবাদী যদি বলেন যে, আমি নিজে অস্ত্র বলিয়া কিছু স্বীকার করি না। তোমরা যাহাকে অস্ত্র বল, সেই পদার্থ অনস্ত্র বলিয়া তাহাকে অস্ত্র বলা যায় না, ইহাই আমার বক্তব্য, আমি কাহাকেও অস্ত্র বলি না। এই অস্ত্র ভাষ্যকার শেষে বলিয়াছেন যে, তুমি “অনস্ত্র” শব্দ স্বীকার করিতেছ, “অনস্ত্র” এই সমাসপদ প্রয়োগ করিতেছ, স্ত্রুতরাং “অস্ত্র” শব্দও তোমার অবশ্য স্বীকার্য। কারণ নঞ-শব্দের সহিত (ন অস্ত্রং অনস্ত্রং) অস্ত্র শব্দের সমাসে “অনস্ত্র” এই শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে। “অস্ত্র” শব্দ না থাকিলে ঐ সমাস অসম্ভব। “অস্ত্র” শব্দ স্বীকার করিলে তাহার অর্থও স্বীকার করিতে হইবে। নিরর্থক শব্দের সমাস হইতে পারে না। “অস্ত্র” শব্দের অর্থ স্বীকার করিলে অস্ত্র নাই, অস্ত্রতা নাই, ইহা বলা যাইবে না। ফলকথা, “অস্ত্র” না বুঝিলে যেমন “অনস্ত্র” বুঝা যায় না, অস্ত্রকে বুঝিয়াই অনস্ত্র বুঝিতে হয়, স্ত্রুতরাং অস্ত্র ন। থাকিলে অনস্ত্রতাও থাকে না, তদ্রূপ “অস্ত্র” শব্দ না থাকিলে “অনস্ত্র” শব্দ সিদ্ধ হয় না; অস্ত্র শব্দকে অপেক্ষা করিয়াই “অনস্ত্র শব্দ” সিদ্ধ হয়। ছলবাদী যখন “অনস্ত্র” এই সমাস শব্দের প্রয়োগ করেন, তখন “অস্ত্র” শব্দ তাহার অবশ্য স্বীকার্য। ভাষ্যকার সূত্রে “তয়োঃ” এই স্থলে “তৎ” শব্দের দ্বারা “অস্ত্র” ও “অনস্ত্র” এই শব্দদ্বয়কেই গ্রহণ করিয়া উহার মধ্যে ইতর “অনস্ত্র” শব্দ ইতর “অস্ত্র” শব্দকে অপেক্ষা করিয়া সিদ্ধ হয়, এইরূপেই সূত্রার্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। “অস্ত্র” শব্দ “অনস্ত্র” শব্দকে অপেক্ষা না করায়, সূত্রে “ইতরৈতরাপেক্ষ-সিদ্ধি”—শব্দের দ্বারা এখানে পরস্পরাপেক্ষ সিদ্ধি অর্থের ব্যাখ্যা করা যায় না। তাৎপর্যটীকাকার সূত্রের “তয়োঃ” এই স্থলে “তৎ” শব্দের দ্বারা অস্ত্র ও অনস্ত্রপদার্থকে গ্রহণ করিয়া সূত্রার্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু ছলবাদী যদি বলেন যে, অনস্ত্র বুঝিতে অস্ত্র বুঝা আবশ্যক নহে। যখন অস্ত্র কিছুই নাই—সমস্তই অনস্ত্র, তখন অস্ত্র নহে এইরূপে অনস্ত্রের জ্ঞান হইতে পারে না, অস্ত্র-জ্ঞান ব্যতীতই অনস্ত্রজ্ঞান হইয়া থাকে, তাহা তইগে ছলবাদীর স্বীকৃত ও প্রযুক্ত “অনস্ত্র” শব্দকে অবলম্বন করিয়াই তাহাকে “অস্ত্র” শব্দ মানাইয়া ঐ অস্ত্র পদার্থ মানাইতে হইবে, তাহাতে ছলবাদী নিজের কথাতেই নিরত হইবেন। এই অস্ত্রই ভাষ্যকার পূর্বোক্তরূপে সূত্রার্থ ব্যাখ্যা করিয়া মহর্ষির বিবক্ষিত চরম বক্তব্যই প্রকাশ করিয়াছেন। বক্তব্যঃ যাহাকে অস্ত্র বলা হয়, তাহা ঐ অস্ত্র স্বরূপ হইতে অনস্ত্র বা অস্ত্র হইলেও অপর পদার্থ হইতেও অনস্ত্র হইতে পারে না। যাহা নীল, তাহা নীল হইতে অনন্য হইলেও পীত হইতেও অনস্ত্র নহে, বক্তব্যঃ তাহা পীত হইতে অস্ত্রই। স্ত্রুতরাং সকল পদার্থই অনস্ত্র বলিয়া অস্ত্র কিছুই নাই, ছলবাদীর এই বাক্যলম্ব অপ্রাশ,



ইহাই মহৰি বিবক্ষিত প্ৰকৃত উত্তৰ—ইহাই পৰমার্থ। তাহা হইলে সিদ্ধান্তবাদী মহৰি যে “নাক্ষেপিক” ইত্যাদি সূত্ৰ বলিয়াছেন, তাহা অযুক্ত হয় নাই। ৩৫।

ভাষ্য। অস্ত, তহীদানীং শব্দস্ত নিত্যত্বং ?

অনুবাদ। তাহা হইলে এখন শব্দের নিত্য হউক ?

সূত্ৰ। বিনাশকাৰণাৰূপলন্ধেঃ ॥৩৩॥১৬২॥ \*

অনুবাদ। (পূৰ্বপক্ষ) যেহেতু বিনাশের, অৰ্থাৎ শব্দধ্বংসের কাৰণের উপলব্ধি হয় না।

ভাষ্য। যদনিত্যং তস্ত বিনাশঃ কাৰণান্তবতি, যথা লোকেষু কাৰণ-  
দ্রব্যবিভাগাৎ। শব্দশ্চেদনিত্যন্তস্ত বিনাশো যস্মাৎ কাৰণান্তবতি,  
তদুপলভ্যেত, ন চোপলভ্যেত, তস্মান্নিত্য ইতি।

অনুবাদ। যাহা অনিত্য, কাৰণবশতঃ তাহার বিনাশ হয়। যেমন কাৰণ-  
দ্রব্যের বিভাগবশতঃ লোষ্ট্রের বিনাশ হয়। শব্দ যদি অনিত্য হয়, ( তাহা হইলে )  
যে কাৰণবশতঃ তাহার বিনাশ হয়, তাহা উপলব্ধ হউক ? কিন্তু উপলব্ধ হয় না,  
অতএব ( শব্দ ) অনিত্য।

টিপ্পনী। মহৰি শব্দনিত্যবাদী পূৰ্বপক্ষীর পূৰ্বোক্ত হেতুত্বের দোষপ্ৰদৰ্শন করিয়া এখন  
এই সূত্ৰদ্বারা পূৰ্বপক্ষবাদের চরম হেতু সূচনা করতঃ পুনৰ্বার পূৰ্বপক্ষ সমর্থন করিয়াছেন।  
ভাষ্যকার “অস্ত তর্হি” ইত্যাদি সন্দর্ভের দ্বারা পূৰ্বপক্ষবাদের সাধ্যের উল্লেখপূৰ্বক সূত্ৰের  
অবতারণা করিয়াছেন। পূৰ্বপক্ষবাদের কথা এই যে, যদি পূৰ্বোক্ত কোন হেতু দ্বারা  
শব্দের নিত্য সিদ্ধ না হয়, তাহা হইলে, ইদানীং অস্ত হেতু দ্বারা শব্দের নিত্য সিদ্ধ করিব।  
সেই হেতু অবিনাশিতাবৎ। শব্দ বৎন ভাবপদার্থ, এবং অবিনাশী, তখন শব্দ অনিত্য হইতে  
পারে না, উহা নিত্য, ইহাই পূৰ্বপক্ষবাদের বক্তব্য। শব্দ ভাবপদার্থ—ইহা সর্বসম্মত। কিন্তু  
শব্দ অবিনাশী, ইহা কিরূপে বুঝিব ? শব্দের অবিনাশিত্ব সিদ্ধ না হইলে, তাহাতে অবিনাশি-  
তাবৎরূপ হেতু সিদ্ধ হইতে পারে না। তাই মহৰি এই সূত্ৰের দ্বারা শব্দের অবিনাশিত্বসাধনে  
পূৰ্বপক্ষবাদের হেতু বলিয়াছেন যে, শব্দের বিনাশকাৰণের উপলব্ধি হয় না। ভাষ্যকার ইহা  
বুঝাইতে বলিয়াছেন যে, যাহা অনিত্য, তাহার বিনাশ হইয়া থাকে। যেমন লোষ্ট্র অনিত্য পদার্থ,

\* জায়হট্টনিবন্ধে “বিনাশকাৰণাৰূপলন্ধেঃ” এইরূপ “চ”কাৰহীন সূত্ৰপাঠ দেখা যায়। কিন্তু উদ্যোতক  
প্ৰত্নত্বির উদ্ধৃত সূত্ৰপাঠে পুঙ্খলপে “চ” লক্ষ্য নাই। “চ” শব্দের কোন প্ৰয়োজন বা অৰ্থসংকতিও এখানে বুঝা যায়  
না। একান্ত অচলিত, সূত্ৰপাঠই গৃহীত হইয়াছে।

ঐ লোষ্টের কারণত্ব লোষ্টের অবয়ব বা অংশ, তাহার বিভাগ হইলে, ঐ লোষ্টের অসমবায়িকারণসংযোগের বিনাশরূপ কারণ-জন্ত ঐ লোষ্টের বিনাশ হয়। বার্তিকের ব্যাখ্যায় তাৎপর্য-টীকাকার বলিয়াছেন যে, “বিভাগ” শব্দের দ্বারা এখানে অসমবায়িকারণসংযোগের বিনাশই লক্ষিত হইয়াছে। কারণ, লোষ্ট ঐ সংযোগজন্ত। অসমবায়িকারণসংযোগের নাশ-জন্তই লোষ্টের নাশ হয়। মূলকথা, লোষ্টবিনাশের জন্ত শব্দবিনাশের কোন কারণ থাকিলে অবশ্য তাহার উপলক্ষি হইত, তাহার উপলক্ষি না হওয়ায় তাহা নাই। শব্দের বিনাশকারণ না থাকিলে শব্দের বিনাশ হইতে পারে না, সুতরাং শব্দ অবিনাশী, ইহা স্বীকার্য। তাহা হইলে অবিনাশিতাবত্ব হেতুর দ্বারা শব্দের নিত্যত্ব সিদ্ধ হইবে। শব্দে অবিনাশিতাবত্বরূপ নিত্যত্বের উপলক্ষি হওয়ার নিত্যবাস্ত্বোপলক্ষি হেতুর উল্লেখপূর্বক সৎপ্রতিপক্ষ দোষেরও উদ্ভাবন করা যাইবে না। ৩৩।

মূত্র। অশ্রবণকারণানুপলক্ষেঃ সততশ্রবণ প্রসঙ্গঃ ॥

॥৩৪॥১৬৩॥

অনুবাদ। (উত্তর) অশ্রবণের কারণের অনুপলক্ষিবশতঃ (শব্দের) সতত শ্রবণের আপত্তি হয়।

ভাষ্য। যথা বিনাশকারণানুপলক্ষের বিনাশপ্রসঙ্গ এবমশ্রবণকারণানুপলক্ষেঃ সততঃ শ্রবণপ্রসঙ্গঃ। ব্যঞ্জকাভাবাদশ্রবণমিতি চেৎ? প্রতিষিদ্ধং ব্যঞ্জকং। অথ বিদ্যমানস্য নির্নিমিত্তমশ্রবণমিতি, অবিদ্যমানস্য নির্নিমিত্তো বিনাশ ইতি সমানশ্চ দৃষ্টবিরোধো নির্নিমিত্তমন্তরেণ বিনাশে চাশ্রবণে চেতি।

অনুবাদ। যেমন বিনাশকারণের অনুপলক্ষিবশতঃ (শব্দের) অবিনাশপ্রসঙ্গ, এইরূপ অশ্রবণের কারণের অনুপলক্ষিবশতঃ (শব্দের) সতত শ্রবণপ্রসঙ্গ হয়। (পূর্ববপক্ষ) ব্যঞ্জকের অভাববশতঃ অশ্রবণ, ইহা যদি বল? (উত্তর) ব্যঞ্জক প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে, অর্থাৎ উচ্চারণ শব্দের ব্যঞ্জক হইতে পারে না; উচ্চারণের ব্যঞ্জকত্ব পূর্ববই খণ্ডিত হইয়াছে। আর যদি বিদ্যমান শব্দের অশ্রবণ নির্নিমিত্ত, ইহা বল? তাহা হইলে অবিদ্যমান শব্দের বিনাশ নির্নিমিত্ত—ইহা বলিব। নির্নিমিত্ত ব্যতীত (শব্দের) বিনাশ ও অশ্রবণে দৃষ্ট বিরোধ সমান।

টিপ্পনী। মহর্ষি পূর্বপক্ষবাদীর কথার উত্তরে এই সূত্রের দ্বারা বলিয়াছেন যে, যদি শব্দের বিনাশের কোন কারণ প্রত্যক্ষ না হওয়ায়, শব্দের বিনাশকারণ নাই, শব্দ অবিনাশী, ইহা বল, তাহা হইলে, উচ্চারণের পূর্বে এবং পরে সর্বদা শব্দ শ্রবণ হউক? কারণ, শব্দের অশ্রবণেরও কোন কারণ বা প্রয়োজক প্রত্যক্ষ করা যায় না। সুতরাং শব্দের অশ্রবণের কোন প্রয়োজক



না থাকায়, অশ্রবণ হইতে পারে না। সর্জনদাই শব্দ শ্রবণ হইতে পারে। পূর্বপক্ষবাদী উচ্চারণকে শব্দের ব্যঞ্জক বলিয়া এই আপত্তির নিরাস করিয়াছেন। তাই ভাষ্যকার ঐ কথাই উল্লেখ করিয়া এখানে বলিয়াছেন যে, ব্যঞ্জক খণ্ডিত হইয়াছে; অর্থাৎ উচ্চারণ যে, শব্দের ব্যঞ্জক হইতে পারে না, ইহা পূর্বেই প্রতিপন্ন করিয়াছি। ভাষ্যকার শেষে ইহাও বলিয়াছেন যে, যদি পূর্বপক্ষবাদী উচ্চারণের পূর্বে এবং পরে যে শব্দের শ্রবণ হয় না, ঐ অশ্রবণের কোন নিমিত্ত বা প্রয়োজক নাই—ইহা বলেন, তাহা হইলে অবিদ্যমান অনিত্য শব্দের বিনাশেও কোন নিমিত্ত বা কারণ নাই, বিনা কারণেই শব্দের বিনাশ হয়, ইহা বলিতে পারি। বিনা কারণে কাহারও বিনাশ দেখা যায় না, উহা স্বীকার করিলে দৃষ্টবিরোধদোষ হয়, ইহা বলিলে বিনা কারণে বিদ্যমান শব্দের অশ্রবণ হয়, এই পক্ষেও দৃষ্টবিরোধদোষ অপরিহার্য। সুতরাং দৃষ্টবিরোধদোষ উভয় পক্ষেই সমান হওয়ায় পূর্বপক্ষবাদী কেবল শব্দের অশ্রবণকেই নিমিত্ত বলিয়া পুরোক্ত আপত্তি নিরাস করিয়া, স্বপক্ষ সমর্থন করিতে পারেন না। ৩৪।

**সূত্র। উপলভ্যমানে চানুপলঙ্কের সম্ভাদনপদেশঃ ॥**

**॥ ৩৫ ॥ ১৬৪ ॥**

অনুবাদ। (উক্তর) এবং উপলভ্যমান হইলে, অর্থাৎ শব্দের বিনাশকারণ প্রত্যক্ষ না হইলেও অনুমান দ্বারা উপলভ্যমান হইলে, অনুপলঙ্কিত অসম্ভাবশতঃ (পূর্বপক্ষবাদীর হেতু) অনপদেশ, অর্থাৎ উহা অসিদ্ধ বলিয়া হেত্বাভাস।

ভাষ্য। অনুমানাচ্চোপলভ্যমানে শব্দস্ত বিনাশকারণে বিনাশকারণানুপলঙ্কের সম্ভাদিত্যনপদেশঃ। যথা যস্মাদ্বিষাণী তস্মাদশ্ব ইতি। কিমনুমানমিতি চেৎ? সম্ভানোপপত্তিঃ। উপপাদিতঃ শব্দ-সম্ভানঃ, সংযোগবিভাগজাং শব্দাং শব্দান্তরং, ততোহপ্যন্তঃ ততোহপ্যন্ত্যদিতি। তত্র কার্যঃ শব্দঃ কারণশব্দং নিরূপয়তি। প্রতিঘাতিদ্রব্য-সংযোগস্তন্ত্যস্ত শব্দস্ত নিরোধকঃ। দৃষ্টং হি তিরঃপ্রতিকূড়্যমন্তিকশ্চেনাপ্যশ্রবণং শব্দস্ত, শ্রবণং দূরস্থেনাপ্যসতি ব্যবধান ইতি।

ঘণ্টায়ামভিহুমানায়াং তারস্তারতরো মন্দো মন্দতর ইতি ক্রতি-ভেদাঙ্গানাশব্দসম্ভানোহবিচ্ছেদেন শ্রুয়তে, তত্র নিত্যে শব্দে ঘণ্টাস্থমন্ত্য-গতং বাহবস্থিতং সম্ভানবৃত্তি বাহুব্যক্তিকারণং বাচ্যং, যেন ক্রতিসম্ভানো ভবতীতি, শব্দভেদে চাসতি ক্রতিভেদ উপপাদয়িতব্য ইতি। অনিত্যে

তু শব্দে ঘণ্টাস্থং সন্তানবৃত্তিসংযোগসহকারিনিমিত্তান্তরং সংস্কারভূতং পটুমন্দমনুবর্ততে, তস্তানুবৃত্তা শব্দসন্তানানুবৃত্তিঃ। পটুমন্দভাবাচ্চ তীভ্রমন্দতা শব্দস্ত, তৎকৃতশ্চ প্রতিভেদ ইতি।

অনুবাদ। এবং অনুমান-প্রমাণ-জ্ঞান শব্দের বিনাশকারণ উপলভ্যমান হইলে, বিনাশকারণের অনুপলব্ধির অসম্ভাবনাতঃ (পূর্বোক্ত হেতু) অনপদেশ (হেতুভাস)। যেমন, “যেহেতু শূদ্রবিশিষ্ট, অতএব অশ্ব।” (প্রশ্ন) অনুমান কি—ইহা যদি বল ? অর্থাৎ যে অনুমান দ্বারা বিনাশকারণ উপলব্ধ হয়, সেই অনুমান (অনুমিত্তির সাধন) কি ? ইহা যদি বল ? (উত্তর) সন্তানের উপপত্তি। শব্দসন্তান উপপাদিত হইয়াছে। (সে কিরূপ, তাহা বলিতেছেন) সংযোগ ও বিভাগজাত শব্দ হইতে শব্দান্তর (জন্মে), সেই শব্দান্তর হইতেও অন্য শব্দ, সেই শব্দ হইতেও অন্য শব্দ (জন্মে)। তন্মধ্যে কার্য্য-শব্দ (দ্বিতীয় শব্দ) কারণ-শব্দকে (প্রথম শব্দকে) নিরুদ্ধ অর্থাৎ বিনষ্ট করে। প্রতিঘাতি দ্রব্যসংযোগ কিন্তু, অর্থাৎ কুড্যাদি দ্রব্যের সহিত আকাশের সংযোগ চরম শব্দের বিনাশক। যেহেতু বক্র কুডা ব্যবধানে নিকটস্থ ব্যক্তি কর্তৃকও শব্দের অশ্রবণ দেখা যায়, ব্যবধান না থাকিলে দূরস্থ ব্যক্তি কর্তৃকও শব্দের শ্রবণ দেখা যায়।

পরন্তু, ঘণ্টা অভিহিতমান হইলে অর্থাৎ ঘণ্টাতে অভিঘাত (শব্দজনক সংযোগ) করিলে তখন তার, তারতর, মন্দ, মন্দতর, এই প্রকারে প্রতিভেদবশতঃ অবিচ্ছেদে নানা শব্দসন্তান প্রসূত হয়। সেই স্থলে শব্দ নিত্য হইলে, অর্থাৎ শব্দের নিত্যরূপকে ঘণ্টাস্থ অথবা অন্তস্থ, অবস্থিত অথবা সন্তানবৃত্তি, অর্থাৎ যাহা ঘণ্টা বা অন্ত্রে পূর্বে হইতেই আছে, অথবা শব্দের প্রতিসন্তানকালে তাহার স্থায় সন্তান বা প্রবাহরূপে বর্তমান থাকে, এমন অভিব্যক্তিকারণ (শব্দশ্রবণের কারণ) বলিতে হইবে, যদ্বারা (নিত্যশব্দের) প্রতিসন্তান হয়। এবং শব্দের ভেদ না থাকিলে (শব্দের) প্রতিভেদ উপপাদন করিতে হইবে। [অর্থাৎ শব্দের নিত্যরূপকে পূর্বোক্তরূপ প্রতিলেখাদি উপপন্ন হয় না] শব্দ অনিত্য হইলে, কিন্তু ঘণ্টাস্থ সন্তানবৃত্তি সংযোগসহকারী, পটু, মন্দ সংস্কাররূপ, অর্থাৎ তাদৃশ বেগরূপ নিমিত্তান্তর অনুবর্তন করে, তাহার অনুবৃত্তিবশতঃ শব্দসন্তানের অনুবৃত্তি হয়। (পূর্বোক্ত বেগের) পটু ও মন্দবশতঃই শব্দের তীভ্রতা ও মন্দতা হয়, এবং তৎপ্রযুক্তই, অর্থাৎ শব্দের তীভ্রতা ও মন্দতা প্রযুক্তই প্রতিভেদ হয়।



উল্লিখিত। পূর্বপক্ষবাদী বলিয়াছেন যে, শব্দের বিনাশের কারণের অল্পলক্ষ্যবশতঃ উহা নাই, সুতরাং শব্দ অবিনাশী, অতএব নিত্য। ইহাতে জিজ্ঞাস্য এই যে, শব্দের বিনাশকারণের অল্পলক্ষ্য বলিতে কি তাহার প্রত্যক্ষ না হওয়া ? অথবা কোনরূপ জ্ঞান না হওয়া ? প্রথম পক্ষে পূর্বসূত্রে শব্দের সত্যত্বের আপত্তি বলা হইয়াছে। কিন্তু উহা প্রকৃত উত্তর নহে, উহার নাম প্রতিবাদী। কারণ, তুল্য হায়ে শব্দের সত্যত্বের আপত্তি হইলেও শব্দের বিনাশকারণের অল্পলক্ষ্যবশতঃ শব্দের অবিনাশিত্ব সিদ্ধ হইলে, শব্দের যে নিত্যত্ব সিদ্ধ হইবে, তাহার নিরাস উহার দ্বারা হয় না। এ অস্ত্র মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা পূর্বোক্ত পূর্বপক্ষের প্রকৃত উত্তর বলিয়াছেন। মহর্ষির কথা এই যে, যদি কোন প্রমাণের দ্বারাই শব্দের বিনাশ কারণের উপলক্ষ্য না হইত, তাহা হইলে শব্দের বিনাশকারণের অল্পলক্ষ্য সিদ্ধ হইত, এবং তদ্বারা শব্দের অবিনাশিত্ব সিদ্ধ হইত। কিন্তু শব্দের বিনাশকারণ প্রত্যক্ষ না হইলেও অনুমান দ্বারা উপলক্ষ্য হওয়ায়, শব্দের বিনাশকারণের অজ্ঞানরূপ অল্পলক্ষ্য নাই, উহা অসিদ্ধ, সুতরাং উহা অনপদেশ অর্থাৎ হেতুভাস। বৈশেষিক সূত্রকার মহর্ষি কণাদ হেতুভাসকে “অনপদেশ” নামে উল্লেখ করিয়া “যদ্বাচিযাগী তদ্বাদখঃ” (৩।১।১৬) এই সূত্রের দ্বারা হেতুভাসের উদাহরণ প্রকাশ করিয়াছেন। সূত্রাসূত্রকার মহর্ষি গোতমও এই সূত্রে কণাদপ্রযুক্ত “অনপদেশ” শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন, এবং ভাষ্যকারও “যদ্বাচিযাগী তদ্বাদখঃ” এই কণাদসূত্রের উদ্ধারপূর্বক দৃষ্টান্ত দ্বারা মহর্ষির কথা বুঝাইয়াছেন— ইহা বুঝা যায়। “বিবাণ” শব্দের অর্থ শূন্য, অথের শূন্য নাই, শূন্য ও অথের পরস্পর বিরুদ্ধ, সুতরাং শূন্য হেতুর দ্বারা অথের অনুমান করা যায় না। অথের অনুমানে শূন্যকে হেতুরূপে গ্রহণ করিলে, উহা যেমন বিরুদ্ধ বলিয়া হেতুভাস, তদ্রূপ শব্দের বিনাশকারণের অনুমানের দ্বারা উপলক্ষ্য হওয়ায়, উহার অল্পলক্ষ্য অসিদ্ধ বলিয়া হেতুভাস। এবং উষ্ট্র বা গর্দভাদি শূন্যহীন পক্ষতে শূন্য হেতুর দ্বারা অথের অনুমান করিতে গেলে, ঐ স্থলে শূন্য যেমন বিরুদ্ধ, তদ্রূপ অসিদ্ধও হইবে। কারণ, গর্দভাদি পক্ষতে শূন্য নাই। এইরূপ শব্দের বিনাশকারণের অল্পলক্ষ্যরূপ হেতুও অসীক বলিয়া অসিদ্ধ, সুতরাং উহা হেতুই হয় না; উহা অনপদেশ, অর্থাৎ হেতুভাস। বাহ্য হেতুভাস, তদ্বারা কোন সাধাসিদ্ধি হইতে পারে না, সুতরাং উহার দ্বারা পূর্বপক্ষবাদীর সাধাসিদ্ধির সম্ভাবনা নাই। কোন হেতুর দ্বারা শব্দের বিনাশকারণের অনুমান হয় ? এতদ্বত্তরে ভাষ্যকার তাহার পূর্বসমর্থিত শব্দসম্বন্ধের উল্লেখ করিয়াছেন। সংযোগ ও বিভাগ হইতে প্রথম যে শব্দ জন্মে, তাহা হইতে দ্বিতীয় ক্ষণে শব্দান্তর জন্মে, তাহা হইতে পরক্ষণেই আবার শব্দান্তর জন্মে, এইরূপে ক্রমিক উৎপন্ন শব্দসমূহই শব্দসম্বন্ধ। ঐ শব্দসম্বন্ধ পূর্বে সমর্থিত হওয়ায় শব্দ যে উৎপন্ন পদার্থ, ইহা সমর্থিত হইয়াছে। উৎপন্ন ভাবপদার্থ-মাত্রই বিনাশী, সুতরাং তাহার বিনাশের কারণ আছে। শব্দ উৎপন্ন ভাব পদার্থ বলিয়া, তাহা অবশ্য বিনাশী, সুতরাং তাহার বিনাশের কারণ অবশ্যই স্বীকার্য। এইরূপে শব্দসম্বন্ধ শব্দের বিনাশকারণের অনুমান হওয়ায় ভাষ্যকার তাহাকে শব্দের বিনাশকারণের অনুমান (অনুমিতির প্রয়োজক) বলিয়াছেন। শব্দের বিনাশের কারণ কি ? এতদ্বত্তরে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে,



প্রথম শব্দ যে পরকণ্ঠে দ্বিতীয় শব্দ উৎপন্ন করে, ঐ দ্বিতীয় শব্দ পরকণ্ঠেই তাহার কারণ প্রথম শব্দকে বিনষ্ট করে। তাহা হইলে কার্য্যশব্দই কারণশব্দের বিনাশের কারণ, এবং ঐ সকল শব্দ দুই কণ মাত্র অবস্থান করিয়া তৃতীয় কণে বিনষ্ট হয়,—ইহা ভাব্যকারের সিদ্ধান্ত, বুঝা যায়। নব্য নৈয়ায়িকগণও ঐরূপ সিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়াছেন। কিন্তু শব্দ হইতে শব্দান্তরের উৎপত্তিক্রমে অনন্ত কাল শব্দের উৎপত্তি হয় না, তাহা হইলে অতি দূরস্থ ব্যক্তিরও শ্রবণ-প্রদেশে শব্দের উৎপত্তি হইত, সে ব্যক্তিও ঐ শব্দ শ্রবণ করিতে পারিত। সুতরাং যে শব্দ আর শব্দান্তর উৎপন্ন করে না, এমন চরম শব্দ অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। তাহা হইলে ঐ চরম শব্দের কার্য্য কোন শব্দ না থাকায়, উহার বিনাশের কারণ কি, তাহা বলিতে হইবে। ভাষ্যকার এ জন্ত বলিয়াছেন যে, কুড়া প্রভৃতি যে প্রতিঘাতি দ্রব্য, তাহার সহিত আকাশের সংযোগ চরম শব্দকে বিনষ্ট করে। তাৎপর্য্যটীকাকার ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য বর্ণন করিতে বলিয়াছেন যে, ঘনতর দ্রব্যের (কুড়াদির) সহিত সংযুক্ত আকাশ শব্দের সমবারি কারণ হয় না। সুতরাং সেই স্থলে শব্দরূপ অসমবারিকারণ থাকিলেও তাহা শব্দান্তর জন্মায় না। প্রতিঘাতিদ্রব্যসংযোগই চরম শব্দকে বিনষ্ট করে। এইরূপ অজ্ঞাতও চরম শব্দের বিনাশকারণ বুঝিয়া লইতে হইবে। বক্তা কুড়া ব্যবধানে নিকটস্থ ব্যক্তিও শব্দ শ্রবণ করে না, ব্যবধান না থাকিলে দূরস্থ ব্যক্তিও শব্দ শ্রবণ করে, এট যুক্তির উল্লেখ করিয়া ভাষ্যকার কুড়াদি দ্রব্যের সহিত আকাশের সংযোগ যে চরম শব্দকে বিনষ্ট করে, উহা হইতে শব্দান্তর উৎপন্ন হইতে না পারায়, দূরস্থ ব্যক্তি শব্দ শ্রবণ করিতে পারে না, ইহা সমর্থন করিয়াছেন। নব্য নৈয়ায়িকগণ বলিয়াছেন যে, যে শব্দ আর শব্দান্তর জন্মায় না, এমন চরম শব্দ যখন অবশ্য স্বীকার করিতেই হইবে, তখন ঐ চরম শব্দ ক্ষণিক, অর্থাৎ একক্ষণমাত্রস্থায়ী, ইহাই স্বীকার্য্য, এবং শব্দরূপ অসমবারিকারণ কার্য্যকাল পর্য্যন্ত স্থায়ী হইয়াই শব্দান্তরের কারণ হয়। যে শব্দ দ্বিতীয় কণে থাকে না, তাহা শব্দের অসমবারিকারণ হয় না, ইহাও স্বীকার্য্য। তাহা হইলে চরম শব্দ একক্ষণমাত্রস্থায়ী বলিয়া, উহা শব্দান্তররূপ কার্য্যের উৎপত্তিকালে (দ্বিতীয় কণে) না থাকায়, শব্দান্তর জন্মাইতে পারে না।

ভাষ্যকার, শব্দের বিনাশকারণ অমুমানসিদ্ধ, সুতরাং উহার অনুপলব্ধি নাই—ইহা সমর্থন করিয়া, সূত্রকারের অভিপ্রায় বর্ণনপূর্ব্বক শেষে শব্দের অনিত্যত্বকে নিজে আর একটি যুক্তি বলিয়াছেন যে, ঘণ্টায় অভিঘাত করিলে, তখন যে তীব্র, তীব্রতর, মন্দ, মন্দতর, নানাবিধ শব্দের অবিচ্ছেদে শ্রবণ হয়, ঐ স্থলে ঐরূপ শ্রুতিভেদ বা শ্রবণভেদবশতঃ শ্রবণশব্দগুলি নানা, ইহা স্বীকার্য্য। কারণ, তীব্রাদি ভেদে শব্দের ভেদ না থাকিলে, ঐরূপ শ্রুতিভেদ হইতে পারে না। একই শব্দ তীব্রত্বাদি নানা বিকল্প ধর্ম্মবিশিষ্ট হইতে পারে না। শব্দনিত্যত্ববাদী তীব্রত্বাদি ধর্ম্মভেদে শব্দরূপ ধর্ম্মীর ভেদ স্বীকার না করিয়া, তীব্রত্বাদিরূপে শব্দের শ্রুতিভেদ স্বীকার করিলে, অবিচ্ছেদে উৎপন্ন শ্রুতিসমূহরূপ শ্রুতিসম্মান কিসের দ্বারা উৎপন্ন হয়, অর্থাৎ তাহার দ্বতে ঐ স্থলে নিত্য শব্দের ঐরূপে অভিযুক্তির কারণ কোথায় কিরূপে থাকে, তাহা বলিতে হইবে। পূর্ব্বোক্ত স্থলে শব্দের অভিযুক্তির কারণ কি ঘণ্টাতেই থাকে? অথবা অজ্ঞাত থাকে?



এবং উহা ঘণ্টা বা অন্ত্র কি শব্দশ্রবণের পূর্ব হইতেই অবস্থিত থাকে ? অথবা অবচ্ছেদে উপন্ন শব্দশ্রবণসমূহরূপ শ্রুতিসম্মান কালে ঐ সম্মানের দ্বার প্রবাহরূপে বর্তমান থাকে ? শব্দনিত্যবাদীর ইহা বলব্য এবং তীত্রাদি ভেদে শব্দের ভেদ না থাকিলে, ঐরূপে শ্রুতিভেদ কেন হয় ? ইহাও বলিতে হইবে। ভাষ্যকারের বিবক্ষা এই যে, শব্দের নিত্যত্ব পক্ষে এ সমস্ত উপপন্ন হয় না, শব্দের অভিযান্ত্রিক কারণ কোথায় কিরূপে থাকে, তাহাও বলা যায় না ; কারণ, ঘণ্টায় অভিধাত করিলে, তখন যে নিত্য শব্দের অভিযান্ত্রিক হইবে, তাহার কারণ ঘণ্টাতেই থাকে, অথবা অন্ত্র কোন স্থানে থাকে, ইহাই বলিতে হইবে। এবং উহা ঘণ্টা বা অন্ত্র অবস্থিতই থাকে, অথবা সম্মানবৃত্তি, ইহাই বলিতে হইবে। কিন্তু ইহার কোন পক্ষই যখন বলা যাইবে না, তখন শব্দের অভিযান্ত্রিক উপপন্ন হইতে পারে না। ভাষ্যকারের নিগূঢ় যুক্তি প্রকাশ করিতে উদ্যোতকর বলিয়াছেন যে, নিত্যশব্দের অভিযান্ত্রিক কারণ যদি ঘণ্টাহু এবং অবস্থিত হয়, তাহা হইলে তীত্রাদিরূপে শ্রুতিভেদ হইতে পারে না। কারণ, এ পক্ষে যে অভিযান্ত্রিক পূর্ব হইতেই ঘণ্টাতে আছে, তাহা একইরূপে শব্দের অভিযান্ত্রিক কারণ হইবে। যাহা প্রথমে তীত্ররূপে শব্দের অভিযান্ত্রিক জন্মাইরাছে, তাহাই আবার অন্ত্ররূপে ঐ শব্দের অভিযান্ত্রিক জন্মাইতে পারে না। যদি বল, শব্দের অভিযান্ত্রিক কারণ ঘণ্টাহু হইলেও অবস্থিত নহে, কিন্তু “সম্মান-বৃত্তি” অর্থাৎ উহাও শব্দের শ্রুতিসম্মানের দ্বার তৎকালে নানাবিধ হইয়া বর্তমান থাকে। সম্মান-রূপে বর্তমান অভিযান্ত্রিকের নানা প্রকারতাবশতঃ শব্দের শ্রবণরূপ অভিযান্ত্রিকও নানা প্রকারতা হইয়া থাকে। এ পক্ষে উদ্যোতকর বলিয়াছেন যে, তাহা হইলে একই সময়ে তীত্র মন্দ প্রকৃতি নানাবিধ শব্দের শ্রবণ হইতে পারে। কারণ শব্দের অভিযান্ত্রিকগুলি সম্মানরূপে বর্তমান হইলে, উহার অন্তর্গত প্রথম অভিযান্ত্রিক উপস্থিত হইলেই ঐ অভিযান্ত্রিক সম্মান উপস্থিত হওয়ার, সেই প্রথম অভিযান্ত্রিকের দ্বারাই তীত্রাদি সর্ববিধ শব্দশ্রবণ কেন হইবে না ? যে অভিযান্ত্রিক প্রবাহ নানাবিধ শব্দের অভিযান্ত্রিক কারণ, তাহা ত প্রথম শব্দশ্রবণবলেই উপস্থিত হইয়াছে। তীত্রাদি-ভেদে শব্দগুলি নানা, কিন্তু নিত্য ; ইহা বলিলেও একই সময়ে সেই সমস্ত শব্দগুলিরই শ্রবণ কেন হয় না ? এবং শব্দের অভিযান্ত্রিক ঘণ্টাহু হইলে, উহা শ্রবণমেশে বর্তমান শব্দকে কিরূপে অভিযান্ত্রিক করিবে ?—ইহাও বলব্য। যদি বল, শব্দের অভিযান্ত্রিক কারণ ঘণ্টাহু নহে, কিন্তু অন্ত্রহু, এপক্ষেও উহা অবস্থিত অথবা সম্মানবৃত্তি—ইহা বলিতে হইবে। উত্তরণক্ষেই পূর্ববৎ দোষ অপরিহার্য। পরন্তু পূর্বোক্ত হলে শব্দের অভিযান্ত্রিক কারণ ঘণ্টাহু না হইলে এক ঘণ্টার অভিধাত করিলে, তখন নিকটস্থ অন্ত্রস্থ ঘণ্টাতেও শব্দের অভিযান্ত্রিক আপত্তি হয়। কারণ, শব্দের অভিযান্ত্রিক কারণ যদি সেখানে ঐ ঘণ্টাতে না থাকিলেও তাহাতে শব্দের অভিযান্ত্রিক কারণ হয়, তাহা হইলে অন্ত্রস্থ ঘণ্টার উহা না থাকিলেও তাহাতে শব্দের অভিযান্ত্রিক কেন জন্মাইবে না ? তীত্রাদি ভেদে শব্দের ভেদ না থাকিলে শ্রুতিভেদ উপপন্ন হয় না, ইহাতে শব্দনিত্যবাদীর একটি কথা এই যে, তীত্রাদি শব্দের ধর্ম নহে, উহা নাসের ধর্ম। এতদ্বত্বের উদ্যোতকর বলিয়াছেন যে, “তীত্র শব্দ” “মন্দ শব্দ” এই প্রকারে শব্দেই তীত্রাদি ধর্মের



বোধ হওয়ার উহা শব্দেরই ধর্ম বলিতে হইবে। সাক্ষরজনীন ঐরূপ বোধকে ভ্রম বলা যায় না। কারণ, ঐ স্থলে ঐরূপ ভ্রমের কোন নিমিত্ত নাই। নিমিত্ত ব্যতীত ঐরূপ ভ্রম হইতে পারে না। ভাষ্যকার পূর্ববর্তী ত্রয়োদশ সূত্রভাষ্যে তীত্রাদি বে শব্দের বাস্তবধর্ম, এ বিষয়ে যুক্তির উল্লেখ করিয়াছেন।

প্রশ্ন হইতে পারে যে, শব্দের অনিত্যত্বপক্ষে তীত্রাদিরূপে নানা শব্দের প্রতিভেদ কিরূপে উপপন্ন হয়? ঐ পক্ষেও শব্দের বাহ্য উৎপত্তির কারণ, তাহা কি ঘটায় অথবা অক্সহ এবং উহা কি অবস্থিত অথবা সম্ভাব্যবৃত্তি?—ইহা বলিতে হইবে। তাই শেষে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, ঘটায় অভিধাত করিলে, তখন ঐ ঘটায় অভিধাতরূপ সংযোগের সহকারিরূপে তীত্র ও মন্দ বেগ নামক বে সংস্কার জন্মে এবং তখন হইতে ঐ ঘটায় যে বেগরূপ সংস্কারের অনুবৃত্তি হয়, উহাই ঐ স্থলে নানা শব্দসম্ভাব্যের নিমিত্তান্তর। উহার অনুবৃত্তিবশতঃই ঐ শব্দসম্ভাব্যের অনুবৃত্তি হয়। ঐ বেগরূপ সংস্কার বাহ্য ঐ স্থলে শব্দসম্ভাব্যের নিমিত্তান্তর, তাহা ঘটায় ও সত্যবৃত্তি। ঐ সংস্কারের তীত্রতা ও মন্দতাবশতঃই ঐ স্থলে উৎপন্ন শব্দের তীত্রতা ও মন্দতা হয়, এবং শব্দে ঐ তীত্রতা ও মন্দতারূপ বাস্তব ধর্ম থাকতেই শব্দের পূর্বোক্তরূপ প্রতিভেদ উপপন্ন হয়। শব্দ নিত্য হইলে বেগরূপ সংস্কার তাহার কারণ হওয়া অসম্ভব। নিত্যপদার্থের কোন কারণ থাকিতে পারে না। সুতরাং শব্দের নিত্যত্বপক্ষে তাহার তীত্রাদি ধর্মের কোন প্রয়োজক না থাকায় শব্দের পূর্বোক্তরূপ প্রতিভেদ হইতে পারে না ॥৩৫॥

ভাষ্য। ন বৈ নিমিত্তান্তরং সংস্কার উপলভ্যাতে, অনুপলব্ধেনাস্তীতি।

অনুবাদ। (পূর্বপক্ষ) নিমিত্তান্তরং সংস্কার উপলব্ধ হয় না, অনুপলব্ধিবশতঃ (ঐ সংস্কার) নাই।

সূত্র। পাণিনিমিত্তপ্রশ্নোচ্ছদাভাবে নানুপলব্ধিঃ ॥

॥৩৬॥১৬৫॥

অনুবাদ। (উত্তর) হস্তকৃত্য প্রশ্নে (সংযোগবিশেষ) বশতঃ শব্দাভাব হওয়ার (সংস্কারের) অনুপলব্ধি নাই।

ভাষ্য। পাণিকর্মণা পাণিঘণ্টাপ্রশ্নেষো ভবতি, তস্মিংশ্চ সতি শব্দ-সম্ভাব্যো নোৎপদ্যাতে, অতঃ অবগানুপপত্তিঃ। তত্র প্রতিঘাতিদ্রব্য-সংযোগঃ শব্দস্য নিমিত্তান্তরং সংস্কারভূতং নিরুণঙ্কীত্যনুযীয়তে। তস্ম চ নিরোধোচ্ছদসম্ভাব্যো নোৎপদ্যাতে। অনুৎপত্তৌ প্রতিবিচ্ছেদঃ। যথা প্রতিঘাতিদ্রব্যসংযোগাদিবোঃ ক্রিয়াহেতৌ সংস্কারে নিরুদ্ধে গমনাভাব



ইতি । কম্পসন্তানস্ত স্পর্শনেন্দ্রিয়গ্রাহ্যস্ত চোপরমঃ । কাংস্তপাত্ৰাদিসু  
পাণিসংশ্লেষো লিঙ্গং সংস্কারসন্তানস্তেতি । তস্মাৎনিমিত্তাস্তরস্ত সংস্কার-  
ভূতস্ত নানুপলব্ধিরিতি ।

অনুবাদ । হস্তক্রিয়ার দ্বারা হস্ত ও ঘণ্টার প্রস্লেষ ( সংযোগবিশেষ ) হয়, তাহা  
হইলে শব্দসন্তান উৎপন্ন হয় না, অতএব শ্রবণের অনুপপত্তি, অর্থাৎ ঘণ্টাদিতে হস্ত-  
প্রস্লেষবশতঃ তখন আর শব্দ উৎপন্ন না হওয়ায়, শব্দশ্রবণ হয় না । সেই স্থলে  
প্রতিঘাতিদ্রব্যসংযোগ, অর্থাৎ হস্তাদির সহিত ঘণ্টাদির সংযোগবিশেষ শব্দের  
সংস্কাররূপ (বেগরূপ) নিমিত্তাস্তরকে বিনষ্ট করে, ইহা অনুমিত হয় । সেই সংস্কারের  
নিরোধবশতঃ শব্দসন্তান উৎপন্ন হয় না, উৎপত্তি না হওয়ায় শ্রবণবিচ্ছেদ হয় ।  
যেমন প্রতিঘাতি দ্রব্যের সহিত সংযোগবশতঃ বাণের ক্রিয়াহেতু সংস্কার (বেগ) বিনষ্ট  
হইলে (বাণের) গমনাতাব হয় । দৃগিন্দ্রিয়গ্রাহ্য কম্পসন্তানেরও নিবৃত্তি হয় । কাংস্ত-  
পাত্ৰ প্রভৃতিতে হস্তসংশ্লেষ সংস্কারসন্তানের লিঙ্গ, অর্থাৎ অনুমাপক । অতএব  
সংস্কাররূপ নিমিত্তাস্তরের অনুপলব্ধি নাই ।

টীকণী । ভাষ্যকার পূর্বহুক্তভাবে বলিয়াছেন যে, ঘণ্টাদি দ্রব্যে বেগরূপ সংস্কার শব্দের  
নিমিত্তাস্তর থাকায়, ঐ বেগের তীব্রত্বাবশতঃ শব্দের তীব্রত্বাদি হয় । তৎপ্রযুক্তই শব্দের প্রতি-  
ভেদ হয় । ইহাতে পরে পূর্বপক্ষ বলিয়াছেন যে, সংস্কাররূপ নিমিত্তাস্তরের উপলব্ধি না হওয়ায়,  
অর্থাৎ কোন প্রমাণের দ্বারাই ঐ সংস্কারের জ্ঞান না হওয়ায়, উহা নাই । এই পূর্বপক্ষের উত্তর-  
হুক্তরূপে ভাষ্যকার এই সূত্রের অবতারণা করিয়া, ইহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, হস্তক্রিয়ার দ্বারা  
হস্ত ও ঘণ্টার প্রস্লেষ হইলে, অর্থাৎ শব্দায়মান ঘণ্টাকে হস্ত দ্বারা চাপিয়া ধরিলে, তখন আর শব্দোৎ-  
পত্তি না হওয়ার শব্দ শ্রবণ হয় না । সুতরাং ঐ স্থলে হস্তরূপ প্রতিঘাতি দ্রব্যের সহিত ঘণ্টার  
সংযোগবিশেষ ঘণ্টাৎ বেগরূপ সংস্কারকে বিনষ্ট করে, ইহা অনুমান দ্বারা বুঝা যায় । বেগরূপ  
সংস্কার শব্দসন্তানের নিমিত্ত কারণ, তাহার বিনাশে তখন আর শব্দসন্তান উৎপন্ন হইতে পারে না,  
সুতরাং তখন শব্দশ্রবণ হয় না । যেমন প্রতিমান্ বাণের গতিক্রিয়ার নিমিত্তকারণ বেগরূপ  
সংস্কার কোন প্রতিঘাতি দ্রব্য সংযোগবশতঃ বিনষ্ট হইলে তখন আর ঐ বাণের গতি থাকে না,  
উহার কম্পনক্রিয়াসমষ্টও নিবৃত্ত হয়, এইরূপ অজ্ঞাতও ক্রিয়ার নিমিত্তকারণ সংস্কারের বিনাশে  
কম্পাদি ক্রিয়ার নিবৃত্তি হয়, তদ্রূপ শব্দের নিমিত্তকারণাস্তর বেগরূপ সংস্কারের নাশ হওয়ায়  
কারণের অভাবে শব্দরূপ কার্য্য জন্মিতে পারে না, এই জ্ঞানই তখন ঘণ্টাদিতে শব্দসন্তান উৎপন্ন না  
হওয়ায়, শব্দশ্রবণ হয় না । শব্দায়মান কাংস্তপাত্ৰ প্রভৃতিতেও হস্ত দ্বারা চাপিয়া ধরিলে তখন  
আর শব্দশ্রবণ হয় না, সুতরাং তাহাতেও শব্দের নিমিত্তকারণ বেগরূপ সংস্কার বিনষ্ট হওয়াতেই  
তখন শব্দ উৎপন্ন হয় না, ইহা বুঝা যায় । ঘণ্টাদিতে বেগরূপ সংস্কার না থাকিলে হস্তপ্রস্লেষ



দ্বারা সেখানে কাহার বিনাশ হইবে? এবং ঐ সংস্কার সেখানে শব্দের নিমিত্তকারণ না হইলে, উহার অভাবে শব্দের অনুৎপত্তিই বা হইবে কেন? সুতরাং অসুমান-প্রমাণ দ্বারা ঘটাদিতে শব্দের নিমিত্ত কারণান্তর বেগরূপ সংস্কার সিদ্ধ হওয়ার উহার অনুপলব্ধি নাই। অসুমান-প্রমাণের দ্বারা বাহার উপলব্ধি হয়, তাহার অনুপলব্ধি বলা যায় না। সুতরাং অনুপলব্ধিবশতঃ শব্দের সংস্কাররূপ নিমিত্তান্তর নাই, এই পূর্বপক্ষ নিরস্ত হইয়াছে। বেগরূপ সংস্কার সিদ্ধ হইলে ঐ বেগের তীব্রবাদি-বশতঃ তৎকালশব্দের তীব্রবাদি ও তৎপ্রযুক্তশব্দের তীব্রবাদিরূপে প্রতিভেদও উপপন্ন হইয়াছে।

ভাষ্যকার ও ব্যক্তিকার পূর্বোক্ত তাৎপৰ্য্যে এই সূত্রের ব্যাখ্যা করিলেও, মহাবির পূর্বসূত্রে কিন্তু বেগরূপ সংস্কারের কোন কথাই নাই। পূর্বসূত্রভাবের শেষে ভাষ্যকার নিজে বেগরূপ সংস্কারকে শব্দের নিমিত্তকারণ বলিয়া, নিজ যুক্তির সমর্থন করিয়াছেন। মহাবির পূর্ব সূত্রার্থানুসারে এই সূত্র দ্বারা সরলভাবে তাহার বক্তব্য বুঝা যায় যে, ঘটাদিতে হস্তপ্রলম্ববশতঃ শব্দের অভাব উপলব্ধ হওয়াট, শব্দের বিনাশকারণের অপ্রত্যক্ষও নাই। অর্থাৎ পূর্বপক্ষবাদী যদি বলেন যে, শব্দের বিনাশকারণ প্রত্যক্ষ করা যায় না, এতদ্বারা মহাবির এই সূত্রের দ্বারা বলিয়াছেন যে, ঘটাদিতে হস্তপ্রলম্ব বা প্রতিবাতি দ্রব্যসংযোগ শব্দের বিনাশকারণ—ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ, সুতরাং শব্দের বিনাশকারণের সর্বত্র অপ্রত্যক্ষও নাই। ভাষ্যকারও প্রতিবাতি দ্রব্যসংযোগকে চরম শব্দের বিনাশকারণ বলিয়াছেন। যে কোন শব্দের বিনাশকারণ প্রত্যক্ষসিদ্ধ বলিয়া প্রতিপন্ন হইলেও শব্দের বিনাশকারণের অপ্রত্যক্ষরূপ অনুপলব্ধি অসিদ্ধ হইবে। সুতরাং পূর্বপক্ষবাদী ঐ হেতুর দ্বারা শব্দমাত্রের অবিনাশিদ্ধ সিদ্ধ করিতে পারিবেন না। ব্যক্তিকার বিশ্বনাথও প্রথমে এই সূত্রের এইরূপ বখাশ্রুতার্থ ব্যাখ্যার উল্লেখ করিয়াছেন। পরে ভাষ্যকারোক্ত ব্যাখ্যাও বলিয়াছেন। ৩৬।

**সূত্র। বিনাশকারণানুপলব্ধেচ্চাবস্থানে তন্নিত্যত্ব-  
প্রসঙ্গঃ ॥ ৩৭ ॥ ১৬৩ ॥**

অনুবাদ। (উত্তর) এবং বিনাশকারণের অনুপলব্ধিবশতঃ অবস্থান হইলে, অর্থাৎ যে পদার্থের বিনাশকারণ প্রত্যক্ষ হয় না, তাহা অবস্থিত থাকে; সুতরাং নিত্য—ইহা বলিলে, তাহাদিগের অর্থাৎ শব্দশ্রবণরূপ অভিব্যক্তিসমূহেরও নিত্যত্বের আপত্তি হয়।

ভাষ্য। যদি যস্ত বিনাশকারণং নোপলভ্যতে তদবতিষ্ঠতে, অবস্থানাক্ষ তস্ত নিত্যত্বং প্রসজ্যতে, এবং যানি ধ্বনিমানি শব্দশ্রবণানি শব্দাভিব্যক্তয় ইতি মতং, ন তেবাং বিনাশকারণং ভবতোপপাদ্যতে, অনুপপাদনাদবস্থানমবস্থানাং তেবাং নিত্যত্বং প্রসজ্যত ইতি। অথ নৈবং, ন তর্হি বিনাশকারণানুপলব্ধেঃ শব্দস্তাবস্থানান্নিত্যত্বমিতি।

অনুবাদ। যদি যাহার বিনাশকারণ প্রত্যক্ষ না হয়, তাহা অবস্থান করে, এবং



অবস্থানবশতঃ তাহাৰ নিত্যৰ প্ৰসক্ত হয়, এইৰূপ হইলে, এই যে শব্দশ্ৰবণসমূহই শব্দেৰ অভিব্যক্তি, ইহা (আপনাৰ) মত, তাহাদিগেৰ অৰ্থাৎ ঐ শব্দশ্ৰবণসমূহেৰ বিনাশ-কাৰণ আপনি উপপাদন কৰিতেছেন না, উপপাদনেৰ অভাববশতঃ অবস্থান, অবস্থান-বশতঃ তাহাদিগেৰ ( শব্দশ্ৰবণসমূহেৰ ) নিত্যৰ প্ৰসক্ত হয়। আৰ যদি এইৰূপ না হয়, অৰ্থাৎ যাহাৰ বিনাশকাৰণ প্ৰত্যক্ষ হয় না, তাহা অবস্থান কৰে; অবস্থানবশতঃ তাহা নিত্য, এইৰূপ নিয়ম যদি স্বীকৃত না হয়, তাহা হইলে বিনাশকাৰণেৰ অপ্ৰত্যক্ষ বশতঃ অবস্থান-প্ৰযুক্ত শব্দেৰ নিত্যৰ হয় না।

টিপ্পনী। পূৰ্বপক্ষবাদী যদি বলেন যে, শব্দেৰ বিনাশকাৰণ প্ৰত্যক্ষ কৰা যায় না, এজন্ত শব্দেৰ অবস্থিত্ব অৰ্থাৎ স্থিৰত্ব নিছক হওৱাৰ, শব্দেৰ নিত্যত্বই সিদ্ধ হয়। বিনাশকাৰণেৰ অনুপলব্ধি বলিতে, তাহাৰ অপ্ৰত্যক্ষই আনাৰ অভিমত। মহৰ্ষি এই পক্ষে এই সূত্ৰেৰ দ্বাৰা পূৰ্বপক্ষবাদীৰ কথিত হেতুতে ব্যক্তিকারূপ দোষও প্ৰদৰ্শন কৰিছে। ভাষ্যকাৰ ও বাৰ্ত্তিককাৰেৰ ব্যাখ্যাশ্বাসেৰে মহৰ্ষিৰ কথা এই যে, যদি বিনাশকাৰণ প্ৰত্যক্ষ না হইলেই তৎপ্ৰযুক্ত শব্দেৰ নিত্যৰ সিদ্ধ হয়, তাহা হইলে যে শব্দশ্ৰবণকে পূৰ্বপক্ষবাদীও অনিত্য বলেন, তাহাৰও নিত্যত্বাপত্তি হয়। কাৰণ শব্দশ্ৰবণেৰও বিনাশকাৰণ প্ৰত্যক্ষ কৰা যায় না। সুতৰাং বিনাশকাৰণেৰ অপ্ৰত্যক্ষ দ্বাৰা কাহাৰও নিত্যৰ সিদ্ধ হইতে পাৰে না। শব্দশ্ৰবণে ব্যক্তিকারূপতঃ উহা নিত্যত্বেৰ সাধক না হওৱাৰ, উহাৰ দ্বাৰা শব্দেৰ নিত্যৰ সিদ্ধ হইতে পাৰে না। যদি শব্দশ্ৰবণৰূপ শব্দাভিব্যক্তিৰ বিনাশকাৰণ প্ৰত্যক্ষ না হইলেও তাহা অনিত্য হয়, তাহা হইলে শব্দও অনিত্য হইতে পাৰে। অহুমান দ্বাৰা শব্দশ্ৰবণেৰ বিনাশকাৰণ উপলব্ধ হয়, ইহা বলিলে শব্দত্বলৈও বিনাশকাৰণেৰ অহুমান দ্বাৰা উপলব্ধি হওৱাৰ, বিনাশকাৰণেৰ অজ্ঞানৰূপ অহুপলব্ধি দেখানে অসিদ্ধ, ইহা পূৰ্বেই বলা হইয়াছে। বৃত্তিকাৰ বিখ্যাত প্ৰকৃতি অনেকে এই সূত্ৰেৰ ব্যাখ্যা না কৰায়, তাহাদিগেৰ মতে এইটি সূত্ৰ নহে—ইহা বুঝা যায়। কিন্তু ভাষ্যকাৰ, বাৰ্ত্তিককাৰ ও বাচস্পতি মিশ্ৰ এইটিকে সূত্ৰ বলিয়াই গ্ৰহণ কৰিয়াছেন। ভাৰতচীনিবন্ধেও এইটি সূত্ৰমধ্যে গৃহীত হইয়াছে। তৃতীয় অধ্যায়েও (২আঃ, ২০শৃ.) মহৰ্ষিৰ এইৰূপ একটি সূত্ৰ দেখা যায়। ভাষ্যকাৰ প্ৰকৃতি এই সূত্ৰে “তৎ” শব্দেৰ দ্বাৰা শব্দশ্ৰবণকেই মহৰ্ষিৰ বুদ্ধিৰূপে গ্ৰহণ কৰিয়া তাহাৰ নিত্যত্বাপত্তি ব্যাখ্যা কৰিয়াছেন। কিন্তু তাহাৰ পূৰ্বসূত্ৰব্যাখ্যাৰ যে বেগৰূপ সংস্কাৰকে মহৰ্ষিৰ বুদ্ধিৰ বলিয়া গ্ৰহণ কৰিয়াছেন, তাহাকেই—এই সূত্ৰে “তৎ” শব্দেৰ দ্বাৰা গ্ৰহণ না কৰিয়া, পূৰ্বে অহুত শব্দশ্ৰবণকেই কেন গ্ৰহণ কৰিয়াছেন, ইহা চিন্তনীয়। পূৰ্বপক্ষবাদী যদি বলেন যে, হস্তপ্ৰস্বেষ বেগেৰ বিনাশকাৰণ নহে, উহাৰ বিনাশ-কাৰণ প্ৰত্যক্ষনিছক না হওৱাৰ, উহা বস্তুদ্বিতে অবস্থিতই থাকে, উহাৰ বিনাশ হয় না। এতদ্বত্বেৰে মহৰ্ষি এই সূত্ৰেৰ দ্বাৰা ঐ বেগৰূপ সংস্কাৰেৰ নিত্যত্বাপত্তি বলিয়াছেন, এইৰূপ ব্যাখ্যাও ভাষ্যকাৰ প্ৰকৃতিৰ মতে হইতে পাৰে। বেগৰূপ সংস্কাৰেৰ বিনাশকাৰণ অহুমাননিছক; উহাৰ অনুপলব্ধি নাই, ইহা বলিলে শব্দশ্ৰবণেৰও বিনাশকাৰণেৰ অনুপলব্ধি নাই, ইহাও বলা যাইবে ॥ ৩৭ ॥

ভাষ্য । কম্পসমানাশ্রয়ত্বানুদাত্ত্য পাণিপ্রলোবাৎ কম্পবৎ কারণোপ-  
রমানভাবঃ । বৈয়ধিকরণ্যে হি প্রতিঘাতিদ্রব্যপ্রলোবাৎ সমানাধিকরণস্থৈ-  
বোপরমঃ স্যাদিতি ।

অনুবাদ । (পূর্বপক্ষ) কম্পের সমানাশ্রয়, অর্থাৎ যে আধারে কম্প জন্মে, সেই  
আধারস্থ অনুদাদের, অর্থাৎ স্বনিরূপ শব্দের হস্তপ্রলোববশতঃ কম্পের ত্রায় কারণের  
নিবৃত্তিবশতঃ অভাব হয় । যেহেতু বৈয়ধিকরণ্য হইলে, অর্থাৎ ঐ শব্দ যদি হস্তপ্রলোবের  
অধিকরণ ঘণ্টাদি দ্রব্যে না থাকে, উহা যদি আকাশে থাকে, তাহা হইলে প্রতিঘাতি  
দ্রব্যের প্রলোববশতঃ সমানাধিকরণেরই নিবৃত্তি হইতে পারে, অর্থাৎ হস্তাদি দ্রব্যের  
প্রলোব বা সংযোগবিশেষের দ্বারা তাহার অধিকরণ ঘণ্টাদিগত সংস্কারেরই বিনাশ  
হইতে পারে, আকাশস্থ শব্দের বিনাশ হইতে পারে না ।

সূত্র । অস্পর্শত্বাদপ্রতিষেধঃ ॥৩৮॥১৬৭ ॥

অনুবাদ । (উত্তর) —অস্পর্শবশতঃ, অর্থাৎ শব্দাশ্রয়দ্রব্য স্পর্শশূন্য বলিয়া  
প্রতিষেধ নাই । [ অর্থাৎ শব্দের আকাশগুণের প্রতিষেধ করা যায় না । ]

ভাষ্য । যদিদমাকাশগুণঃ শব্দ ইতি প্রতিষিধ্যতে, অয়মনুপপন্নঃ  
প্রতিষেধঃ, অস্পর্শত্বাচ্ছব্দাশ্রয়স্ত । রূপাদিসমানদেশস্তাগ্রহণে শব্দ-  
সন্তানোপপত্তেরস্পর্শ-ব্যাপি-দ্রব্যাত্মকঃ শব্দ ইতি জ্ঞায়তে, ন কম্পসমানা-  
শ্রয় ইতি ।

অনুবাদ । এই যে আকাশের গুণ শব্দ, ইহা প্রতিষিদ্ধ হইতেছে, এই প্রতিষেধ  
উপপন্ন হয় না । যেহেতু শব্দাশ্রয়ের স্পর্শশূন্যতা আছে । রূপাদির সমানদেশের  
—অর্থাৎ রূপ, রস, গন্ধ ও স্পর্শের সহিত একাধারস্থ শব্দের জ্ঞান না হওয়ায়, শব্দ-  
সন্তানের উপপত্তিবশতঃ শব্দ স্পর্শশূন্য ব্যাপকদ্রব্যাত্মক—ইহা বুঝা যায় । কম্পের  
সমানাশ্রয় অর্থাৎ শব্দ, কম্পাধার ঘণ্টাদি দ্রব্যস্থ—ইহা বুঝা যায় না ।

টিপ্পনী । ভাষ্যকার এখানে সাংখ্যমতানুসারে পূর্বপক্ষের অবতারণা করিয়া তদন্তরে এই  
পক্ষের অবতারণা করিয়াছেন । সাংখ্যসম্প্রদায়ের কথা এই যে, ঘণ্টার অভিঘাত করিলে ঐ  
ঘণ্টাতে বেগরূপ সংস্কার ও কম্প জন্মে । পরে ঐ ঘণ্টাকে হস্ত দ্বারা চাপিয়া ধরিলে, তখন  
কম্প ও বেগের ত্রয় শব্দেরও নিবৃত্তি হয় । সুতরাং ঐ শব্দ কম্প ও সংস্কারের ত্রয়  
ঘণ্টাশ্রিত, উহা আকাশশ্রিত বা আকাশের গুণ নহে । শব্দ আকাশশ্রিত হইলে হস্তপ্রলোবের  
দ্বারা শব্দের নিবৃত্তি হইতে পারে না । হস্তপ্রলোবের সমানাধিকরণ ঘণ্টাস্থ বেগরূপ সংস্কারেরই



নিবৃত্তি হইতে পারে। কারণ শব্দশ্রবণ আকাশে হস্তপ্রস্বেষ নাই। এক আধারে হস্তপ্রস্বেষ অত্র আধারের বক্তকেও বিনষ্ট করে, ইহা বলিলে শব্দায়মান বহু বণ্টার মধ্যে যে কোন এক বণ্টার হস্তপ্রস্বেষ দ্বারা সকল বণ্টার শব্দনিবৃত্তি হইতে পারে। সুতরাং শব্দ, কল্প ও বেগরূপ সংস্কারের সমানশ্রয়, অর্থাৎ বণ্টাদি দ্রব্যহ, উহা আকাশাশ্রিত নহে। ভাষ্যকার প্রথমে এই পূর্বপক্ষের উল্লেখ করিয়া তদন্তরে সূত্রব্যাখ্যায় বলিয়াছেন যে, শব্দ আকাশের গুণ, ইহা প্রতিবেশ করা যায় না। কারণ, শব্দশ্রবণ দ্রব্য, স্পর্শশূন্য। শব্দ রূপাদি গুণের সহিত বণ্টাদি একত্রব্যোই থাকে—ইহা বলিলে শব্দের জ্ঞান হইতে পারে না। শব্দসত্ত্বান স্বীকার করিলেই শ্রোতার শ্রবণেন্দ্রিয়ের সহিত শব্দের সম্বন্ধ হওয়ার শব্দের শ্রবণরূপ জ্ঞান হইতে পারে। সুতরাং শব্দ স্পর্শশূন্য বিশ্বব্যাপী কোন দ্রব্যাস্রিত, অর্থাৎ আকাশাশ্রিত, ইহা বুঝা যায়। উহা কল্পাশ্রয়বণ্টাদিদ্রব্যাস্রিত নহে। ভাষ্যকার এইরূপে সূত্রকারের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাৎপর্যটীকাকার এই তাৎপর্যের বিশদবর্ণন করিতে বলিয়াছেন যে, ইন্দ্রিয়-গুলি বিবরণসম্বন্ধ হইয়াই প্রত্যক্ষ জন্মায়। শব্দ বণ্টাদি দ্রব্যহ হইলে শ্রবণেন্দ্রিয়ের সহিত তাহার সম্বন্ধ হইতে পারে না। কারণ শ্রবণেন্দ্রিয়ের উপাধি কর্ণশব্দলী বণ্টাকে প্রাপ্ত হয় না, বণ্টাও তাহাকে প্রাপ্ত হয় না। অতএব বিশ্বব্যাপী স্পর্শশূন্য আকাশই শব্দের আধার বলিতে হইবে। আকাশে পূর্বোক্ত প্রকারে তরঙ্গ হইতে তরঙ্গের জার শব্দসত্ত্বান উৎপন্ন হইলে শ্রোতার শ্রবণদেশে উৎপন্ন শব্দের সহিত শ্রবণেন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ হওয়ার তাহার শ্রবণ হইতে পারে। শ্রবণেন্দ্রিয় বস্তুতঃ আকাশপদার্থ। সুতরাং তাহাতে শব্দ উৎপন্ন হইলে, তাহার সহিত শব্দের সম্বন্ধ হইবেই। শব্দ স্পর্শবিশিষ্ট বণ্টাদির গুণ হইলে পূর্বোক্তপ্রকারে শব্দসত্ত্বানের উপপত্তি হয় না, সুতরাং শব্দকে রূপাদির সহিত একদেশহ বলিলে তাহার শ্রবণ হইতে পারে না। রূপ, রস, গন্ধ ও স্পর্শের আধার বণ্টাদি দ্রব্যে পূর্বোক্তপ্রকারে শব্দসত্ত্বান জন্মিতে পারে না। বণ্টাহ হস্তপ্রস্বেষ আকাশহ শব্দের বিনাশক হয় কিরূপে? এতদন্তরে উদ্যোতকর বলিয়াছেন যে, হস্তপ্রস্বেষ শব্দের বিনাশক নহে, উহা শব্দের নিমিত্তকারণ বেগরূপ সংস্কারকে বিনষ্ট করার কারণের অভাবে সেখানে অত্র শব্দের উৎপত্তি হয় না, তাই শব্দশ্রবণ হয় না। ভাষ্যকারও এ কথা পূর্বে বলিয়াছেন। সুতরাং সাংখ্য-সম্প্রদায়ের বুদ্ধিও খণ্ডিত হইয়াছে। ৩৮।

ভাষ্য। প্রতিদ্রব্যং রূপাদিভিঃ সহ সন্নিবিষ্টঃ শব্দঃ সমানদেশো ব্যজ্যত ইতি নোপপদ্যতে। কথং?

অনুবাদ। প্রতি দ্রব্যে রূপাদির সহিত সন্নিবিষ্ট, সমানদেশ, অর্থাৎ রূপাদির সহিত একাধারস্থ শব্দ অভিব্যক্ত হয়, ইহা উপপন্ন হয় না। (প্রশ্ন) কেন?

সূত্র। বিভক্ত্যন্তরোপপত্তেশ্চ সমাসে ॥৩৯॥১৬৮॥

অনুবাদ। (উত্তর) যেহেতু সমাসে অর্থাৎ রূপাদি সমুদায়ে (শব্দের) বিভক্ত্যন্তরের উপপত্তি, অর্থাৎ বিবিধ বিভাগের সত্তা ও সম্বন্ধের উপপত্তি আছে।



ভাষ্য । সম্ভানোপপত্ত্যেচতি চার্ধঃ । তদ্ব্যাখ্যাং । যদি রূপাদয়ঃ শব্দাশ্চ প্রতিদ্রব্যং সমস্তাঃ সমুদিতান্ত্বিন্ সমাসে সমুদায়ে যো যথা-জাতীয়কঃ সন্নিবিষ্টস্তস্মৈ তথাজাতীয়শ্চৈব গ্রহণেন ভবিতব্যং—শব্দে রূপাদিবৎ । তত্র যোহয়ং বিভাগ একদ্রব্যে নানারূপা ভিন্নশ্রুতয়ো বিধর্মাণঃ শব্দা অভিব্যক্ত্যমানাঃ শ্রুয়ন্তে, যচ্চ বিভাগান্তরং সরূপাঃ সমান-শ্রুতয়ঃ সধর্মাণঃ শব্দাস্তীত্রমন্দধর্মতয়া ভিন্নাঃ শ্রুয়ন্তে, তদুভয়ং নোপ-পদ্যতে, নানাভূতানামুৎপদ্যমানানাময়ং ধর্মো নৈকস্মৈ ব্যক্ত্যমানশ্চেতি । অস্তি চায়ং বিভাগো বিভাগান্তরক্, তেন বিভাগোপপত্তের্নশ্যামহে, ন প্রতিদ্রব্যং রূপাদিভিঃ সহ শব্দঃ সন্নিবিষ্টো ব্যক্ত্যত ইতি ।

অনুবাদ । সম্ভানের উপপত্তিবশতঃ, ইহা “চ” শব্দের অর্থ ( অর্থাৎ সূত্রস্থ “চ” শব্দের দ্বারা শব্দসম্ভানের উপপত্তিরূপ হেতুস্তর মহমির বিবক্ষিত ) । তাহা ( সম্ভানের উপপত্তি ) ব্যাখ্যাত হইয়াছে, অর্থাৎ পূর্বে তাহার ব্যাখ্যা করিয়াছি । যদি রূপাদি এবং শব্দসমূহ প্রতিদ্রব্যে সমস্ত ( অর্থাৎ ) সমুদিত হয় ( তাহা হইলে ) সেই “সমাসে” ( অর্থাৎ ) সমুদায়ে ( রূপাদির মধ্যে ) যথা-জাতীয় বাহা সন্নিবিষ্ট, তথা-জাতীয় তাহারই জ্ঞান হইবে—শব্দবিষয়ে রূপাদির দ্বারা জ্ঞান হইবে, ( অর্থাৎ যেমন প্রতিদ্রব্যে একজাতীয় একটিমাত্র রূপাদিরই জ্ঞান হয়, তদ্রূপ প্রতিদ্রব্যে একজাতীয় একটিমাত্র শব্দেরই জ্ঞান হইবে ) । তাহা হইলে অর্থাৎ রূপাদির দ্বারা প্রতিদ্রব্যে একজাতীয় একটিমাত্র শব্দেরই জ্ঞান স্বীকার করিলে, (১) একদ্রব্যে নানারূপ, ভিন্ন-শ্রুতি, বিরুদ্ধধর্মবিশিষ্ট, শব্দসমূহ অভিব্যক্ত্যমান হইয়া শ্রুত হয় এই যে বিভাগ, এবং (২) সরূপ, সমানশ্রুতি, সমানধর্মবিশিষ্ট, তীত্রধর্মতা ও মন্দধর্মতাবশতঃ ভিন্ন, শব্দসমূহ শ্রুত হয়—এই যে বিভাগান্তর, সেই উভয় অর্থাৎ শব্দের পূর্বোক্তরূপ বিভাগদ্বয় উপপন্ন হয় না । ( কারণ ) ইহা অর্থাৎ পূর্বোক্তরূপ বিভাগদ্বয় উৎপদ্যমান নানাভূত শব্দসমূহের ধর্ম, অভিব্যক্ত্যমান একমাত্রের ধর্ম নহে । কিন্তু এই বিভাগ ও বিভাগান্তর আছে, অর্থাৎ উহা অবশ্য স্বীকার্য, সুতরাং বিভাগের উপপত্তিবশতঃ প্রতিদ্রব্যে রূপাদির সহিত সন্নিবিষ্ট থাকিয়া শব্দ অভিব্যক্ত হয় না, ইহা আমরা বুঝি ।

টিপ্পনী । সাংখ্য-সম্প্রদায়ের মত এই যে, বীণা, বেণু ও শখাদি দ্রব্যগুলি রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দের সমাস, অর্থাৎ সমুদায় । রূপ রসাদি ঐকল দ্রব্য হইতে পৃথক্ কোন পদার্থ নহে । শব্দ ঐ সমাসে, অর্থাৎ রূপ-রসাদির সমুদায়ভূত প্রত্যেক দ্রব্যে রূপাদির সহিত সন্নিবিষ্ট থাকিয়াই



অভিব্যক্ত হয়। আকাশে শব্দসম্মান উৎপন্ন হয় না। তাৎপর্য্যটীকাকার এইরূপ সাংখ্যমতের বর্ণনা-  
 পূর্বক স্বত্রার্থ বর্ণন করিয়াছেন যে, সাংখ্যসম্মত পূর্কোক্ত সমানে অর্থাৎ রূপাদি সমুদায়ে অবস্থিত  
 থাকিয়াই শব্দ অভিব্যক্ত হয় না। কারণ, যদি শব্দ ঐ সমুদায়ে অবস্থিত থাকিয়াই অভিব্যক্ত হয়,  
 তাহা হইলে বড়্জ, ধৈবত, গাক্ষারাদি ভেদে শব্দের যে বিভাগ আছে, এবং বড়্জ প্রভৃতি একজাতীয়  
 শব্দেরও যে, তীক্ষ্ণ-মন্দাদিরূপ বিভাগান্তর আছে, তাহা উপপন্ন হয় না। কারণ, পূর্কোক্ত সমুদায়-  
 গত এবং নানাজাতীয় গন্ধাদির বীণা প্রভৃতি একই দ্রব্যে প্রতিজ্ঞপ্ত ভেদ দেখা যায় না, অতএব  
 পূর্কোক্ত বিভক্ত্যন্তরের সম্ভাবনাতঃ শব্দ পূর্কোক্ত সমুদায়ে অবস্থিত থাকিয়াই অভিব্যক্ত হয় না।  
 কিন্তু শব্দ আকাশে উৎপন্ন হইয়া থাকে, উহা আকাশের গুণ। ভাব্যকারও প্রথমে পূর্কোক্ত মতের  
 উল্লেখপূর্বক শব্দ প্রতিদ্রব্যে রূপাদির সহিত সন্নিবিষ্ট থাকিয়া অভিব্যক্ত হয়, ইহা উপপন্ন হয় না—  
 এই কথা বলিয়া শব্দ কেন ঐরূপ নহে, ইহার হেতু বলিতে এই সূত্রের অবতারণা করিয়াছেন।  
 এবং সূত্রোক্ত “বিভক্ত্যন্তরে”র ব্যাখ্যা করিয়া উপসংহারে সূত্রকারের সাধ্যের উল্লেখ করিয়াছেন।  
 শব্দ প্রতিদ্রব্যে রূপাদির সহিত সন্নিবিষ্ট থাকিয়া পূর্কোক্তরূপ সমুদায়ে অভিব্যক্ত হয় না, ইহাই  
 সূত্রকারের সাধ্য। সূত্রকার তাহার হেতু বলিগাছেন,—বিভক্ত্যন্তরের উপপত্তি। “চ” শব্দের  
 দ্বারা শব্দসম্মানের উপপত্তিরূপ হেতুস্বরূপ সমুচিত হইয়াছে। “বিভাগন্ত বিভক্ত্যন্তরক্”,  
 এইরূপ বাক্যে একশেষবশতঃ এই “বিভক্ত্যন্তর” শব্দ সিল্প হইয়াছে। ভাব্যকার প্রথমে বড়্জ,  
 ধৈবত, গাক্ষারাদি নানাজাতীয় শব্দের বিভাগ বলিয়া, পরে বড়্জ প্রভৃতি সজাতীয় শব্দেরও বিভাগ-  
 রূপ বিভক্ত্যন্তর বা বিভাগান্তরের উল্লেখপূর্বক সূত্রকারের তাৎপর্য্য বর্ণন করিয়াছেন যে, শব্দ  
 রূপাদির সমানে, অর্থাৎ সমুদায়ে অবস্থিত থাকিয়া অভিব্যক্ত হয়, ইহা বলিলে পূর্কোক্তরূপ  
 বিভাগদ্বয় উপপন্ন হয় না। নানা শব্দের উৎপত্তি হইলেই ঐরূপ বিভাগ উপপন্ন হয়। একই শব্দ  
 অভিব্যক্তমান হইলে ঐরূপ বিভাগ উপপন্ন হয় না। কারণ, গন্ধবিশিষ্ট প্রত্যেক দ্রব্যে যে গন্ধের  
 উপলব্ধি হয়, তাহা প্রতি দ্রব্যে এক। যে দ্রব্যে যে জাতীয় গন্ধ সন্নিবিষ্ট থাকে, সেই দ্রব্যে  
 তজ্জাতীয় সেই এক গন্ধেরই জ্ঞান হয়। শব্দ ঐ গন্ধাদির আধারে অবস্থিত থাকিয়া গন্ধাদির  
 দ্বারা অভিব্যক্ত হইলে প্রতিদ্রব্যে একরূপ একটি শব্দেরই জ্ঞান হইত, একদ্রব্যে একজাতীয়  
 নানাশব্দ এবং নানাজাতীয় নানাশব্দের জ্ঞান হইত না। সুতরাং শব্দের পূর্কোক্তরূপ দ্বিবিধ  
 বিভাগ থাকায় বুঝা যায়—শব্দ পূর্কোক্ত রূপাদি সমুদায়ে অবস্থিত থাকিয়া রূপাদির দ্বারা  
 অভিব্যক্ত হয় না। শব্দ আকাশে উৎপন্ন হয়। তরঙ্গ হইতে তরঙ্গের দ্বারা আকাশে সজাতীয়  
 বিভাজ্য নানাবিধ নানাশব্দের উৎপত্তি হওয়ায়, শব্দের পূর্কোক্তরূপ বিভাগদ্বয় উপপন্ন হয়।  
 এবং পূর্কোক্তরূপ শব্দসম্মান স্বীকৃত হওয়ায়, শব্দ প্রবণদেশে উৎপন্ন হইয়া প্রত্যেক হইতে  
 পারে। সুতরাং প্রবণেন্দ্রিয়রূপ আকাশে শব্দের উৎপত্তি স্বীকার করিলে, শব্দ, রূপাদি সমুদায়ে  
 অবস্থিত থাকিয়া অভিব্যক্ত হয়, একথা আর বলা বাইবে না। একান্ত মহাবিশি সূত্রে “চ” শব্দের দ্বারা  
 তাহার সাধ্য সমর্থনে শব্দসম্মানের সম্ভারূপ হেতুস্বরূপ সূচনা করিয়াছেন। সূত্রে “বিভক্ত্যন্তর”  
 শব্দের অর্থ পূর্কোক্ত বিভাগ ও বিভাগান্তর। “উপপত্তি” শব্দের অর্থ সম্ভা। “সমাগ” শব্দের

অর্থ পূর্ববর্ণিত সমুদায়। ভাষ্যে “সমস্ত” বলিয়া “সমুদিত” শব্দের দ্বারা এবং “সমাস” বলিয়া “সমুদায়” শব্দের দ্বারা “সমস্ত” ও “সমাস” শব্দেরই অর্থ ব্যাখ্যা হইয়াছে।—রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ একাধারে সমুদিত থাকে। উহাদিগের সমুদায়ই বৌদ্বাদি দ্রব্য। এই সমুদারে শব্দ ও রূপাদির দ্বার্য অবস্থিত থাকে, ইহাই এখানে পূর্বপক্ষীর সিদ্ধান্ত। ভাষ্যকার প্রকৃতি প্রাচীনগণ এই সিদ্ধান্তকেই পূর্বপক্ষরূপে গ্রহণ করিয়া তত্বতরে এই সূত্রের অবতারণা করিয়াছেন। বৃত্তিকার বিঘ্ননাথ এখানে ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে শব্দ “সমাসে” অর্থাৎ স্পর্শাদি সমুদারে স্পর্শাদির সহিত একত্র থাকে না। কারণ, শব্দের তীব্র-মন্দাদি বিভাগান্তর আছে। এবং ইহা দ্বারা দ্রব্যো তীব্র-মন্দাদি নানা জাতীয় নানা শব্দের উৎপত্তি হয়। কিন্তু অগ্নিসংযোগ ব্যতীত গন্ধাদির পরিবর্তন হয় না। বৃত্তিকার এই কথার দ্বারা শব্দ যে স্পর্শবিশিষ্ট কোন পদার্থের গুণ নহে, এই সাধের সাধক অনুমান স্থচনা করিয়াছেন<sup>১</sup>। মূলকথা, পূর্বোক্ত নানা যুক্তির দ্বারা শব্দ-সম্বন্ধ সিদ্ধ হওয়ার শব্দ অনিত্য ইহা সিদ্ধ হইয়াছে। এবং শব্দ আকাশের গুণ, ইহাও সিদ্ধ হইয়াছে। ৩৯।

শব্দানিত্যত্ব প্রকরণ সমাপ্ত।

—০—

ভাষ্য। বিবিধশ্চায়াং শব্দো বর্ণাত্মকো ধ্বনিমাত্রশ্চ। তত্র বর্ণাত্মনি তাবৎ—

অনুবাদ। এই শব্দ অর্থাৎ পূর্বোক্তরূপ বিচারের দ্বারা অনিত্যরূপে পরীক্ষিত শব্দ বিবিধ,—(১) বর্ণাত্মক ও (২) ধ্বনিরূপ। তন্মধ্যে বর্ণাত্মক শব্দে—

সূত্র। বিকারাদেশোপদেশাৎ সংশয়ঃ ॥৪০॥১৬৯॥

অনুবাদ। (বর্ণের) বিকারও আদেশের উপদেশবশতঃ—সংশয় হয়।

ভাষ্য। দধ্যাত্রেতি কেচিদিকার ইত্বং হিহা বহুমাপদ্যত ইতি বিকারং মন্যন্তে। কেচিদিকারস্ত প্রয়োগে বিষয়কৃতে যদিকারঃ স্থানং জহাতি, তত্র যকারস্ত প্রয়োগং ক্রবতে। সংহিতায়াং বিষয়ে ইকারো ন প্রযুজ্যতে, তস্ত স্থানে যকারঃ প্রযুজ্যতে, স আদেশ ইতি। উভয়মিদ-মুপদিশ্যতে। তত্র ন জায়তে কিং তত্ত্বমিতি।

অনুবাদ। “দধ্যাত্র” এই প্রয়োগে কেহ কেহ ইকার ইত্ব ত্যাগ করিয়া বহু প্রাপ্ত হয়, ইহা বলিয়া বিকার মানেন। কেহ কেহ ইকারের প্রয়োগ বিষয়কৃত হইলে, অর্থাৎ

১। শব্দো ন স্পর্শবিশেষগুণঃ, অগ্নিসংযোগাসমবায়িকারণত্বভাবে নতি অকারণগুণপূর্বকপ্রত্যকত্বং ইত্থৎ—সিদ্ধান্ত-সুভাবণী।



সন্ধির পূর্বে যে স্থলে ইকারের প্রয়োগ হয়, সেই স্থলে ইকার যে স্থান ত্যাগ করে, সেই স্থানে যকারের প্রয়োগ বলেন। সংহিতা-বিষয়ে অর্থাৎ সন্ধি হইলে সেই স্থলে ইকার প্রযুক্ত হয় না, তাহার স্থানে যকার প্রযুক্ত হয়, তাহা আদেশ। এই উভয় অর্থাৎ পূর্বোক্তরূপ বিকার ও আদেশ উপদিষ্ট (মতভেদে কথিত) আছে। তন্নিমিত্ত অর্থাৎ পূর্বোক্ত উভয়েরই উপদেশ থাকায় তত্ত্ব কি?—ইহা বুঝা যায় না, অর্থাৎ বিকারের উপদেশই তত্ত্ব? অথবা আদেশের উপদেশই তত্ত্ব?—এ বিষয়ে সংশয় হয়।

উপনী। মহাবি বর্ণ ও ধ্বনিকরূপ দ্বিবিধ শব্দের অনিত্যত্ব পরীক্ষা করিয়া, এখন বর্ণাত্মক শব্দের নিরীক্ষার পক্ষ পরীক্ষা করিতে প্রথমে এই সূত্রের দ্বারা সংশয় জ্ঞাপন করিয়াছেন। দধি+অত্র, এই প্রয়োগে সন্ধি হইলে, “দধ্যত্র” এইরূপ প্রয়োগ হয়। এখানে ইকারই ইকারত্ব ত্যাগ করিয়া যকারত্ব লাভ করে, অর্থাৎ দুই যেমন দধিরূপে এবং সূবর্ণ যেমন কুণ্ডলরূপে পরিণত হয়, তদ্রূপ পূর্বোক্ত প্রয়োগে ইকারই যকাররূপে পরিণত হয়। ইকার প্রকৃতি, যকার তাহার পরিণাম বা বিকার। ইহা এক সম্ভাব্যের মত। কেহ কেহ বলেন যে, পূর্বোক্ত স্থলে সন্ধিবিষয়ে ইকারের প্রয়োগ হয় না, ইকারের স্থানে যকারের প্রয়োগ হয়। ঐ স্থলে ইকার স্থানী, যকার আদেশ। যকার ইকারের বিকার নহে। এইরূপে সন্ধিস্থলে বর্ণের বিকার ও আদেশ—এই উভয় পক্ষেরই উপদেশ (ব্যাখ্যা) থাকায় বিপ্রতিপত্তিবশতঃ সন্ধিস্থলে বর্ণগুলি বিকার? অথবা আদেশ?—এইরূপ সংশয় হয়। পরীক্ষা ব্যতীত ঐ সংশয় নিবৃত্তি হয় না, এজন্য মহাবি পরীক্ষার মূল সংশয় জ্ঞাপন করিয়া বর্ণের আদেশ পক্ষের পরীক্ষা করিয়াছেন। তাৎপর্যটীকাকার বলিয়াছেন যে, পূর্বে সাংখ্যমত নিরত হইয়াছে। এখন যদি সেই সাংখ্যই বলেন যে, মুক্তিকা ও সূবর্ণাদির দ্বারা বর্ণগুলি পরিণামি নিন্য, এজন্য ভাষ্যকার “দ্বিবিধশ্চারণ শব্দঃ” ইত্যাদি সম্বন্ধে দ্বারা তদ্বিধের পরীক্ষারস্ত করিলেন। ধ্বনিকরূপ শব্দে বিকারের উপদেশ না থাকায়, তাহার পরিণামি নিত্যতার আপত্তি করা যায় না। বর্ণাত্মক শব্দেও সন্দেহ থাকায়, তাহাকে পরিণামি নিত্য বলিয়া অবধারণ করা যায় না। কারণ, “ইকো বর্ণচি” এই পাণিনিহৃত্তে সন্ধিতে “ইকে”র স্থানে “বর্ণে”র বিধান থাকায় কেহ কেহ ঐ হৃত্তকে বর্ণের বিকারোপদেশ বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। কেহ কেহ আদেশোপদেশ বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। ব্যাখ্যাকারদিগের বিপ্রতিপত্তিবশতঃ সংশয় হয়। সূত্ররূপ পরীক্ষা ব্যতীত প্রকৃত তত্ত্বের অবধারণ করা যায় না ॥ ৪০ ॥

ভাষ্য। আদেশোপদেশস্তত্ত্বং।

বিকারোপদেশে হ্রস্বয়স্যগ্রহণাদ্বিকারাননুমানং। সত্যদ্বয়ে কিঞ্চিমিবর্ততে কিঞ্চিছুপজায়ত ইতি শক্যেত বিকারোহনুমানাভূং। ন চান্বরো গৃহ্যতে, তস্মাদ্বিকারো নাস্তীতি।

ভিন্নকরণযোশ্চ বর্ণয়োঃপ্রয়োগে প্রয়োগোপপত্তিঃ ।  
 বিবৃতকরণ ইকার, ঈবৎ স্পৃষ্টকরণো যকারঃ, তাবিমৌ পৃথক্করণাখ্যেন  
 প্রযত্নেনোচ্চারণীয়ৌ, তয়োরেকস্মাপ্রয়োগেহ্যন্ত প্রয়োগ উপপন্ন ইতি ।  
 অবিকারে চাবিশেষঃ । যত্রেমাবিকারযকারৌ ন বিকারভূতৌ,  
 “যততে” “যচ্ছতি,” “প্রায়ংস্ত” ইতি, “ইকার” “ইদ”মিতি চ,—যত্র  
 চ বিকারভূতৌ, “ইক্ট্যা” “দধ্যাহরে”তি, উভয়ত্র প্রযোক্তুরবিশেষৌ যত্নঃ  
 শ্রোতৃশ্চ অতিরিত্যাদেশোপপত্তিঃ । প্রযুক্ত্যমানাগ্রহণাচ্চ । ন খলু  
 ইকারঃ প্রযুক্ত্যমানো যকারতামাপদ্যমানো গৃহ্যতে, কিং তর্হি ? ইকারস্ত  
 প্রয়োগে যকারঃ প্রযুক্ত্যতে, তস্মাদবিকার ইতি ।

অনুবাদ । আদেশের উপদেশ তদ্ব । যেহেতু বিকারের উপদেশে অর্থাৎ  
 বর্ণের বিকারব্যাখ্যা-পক্ষে অন্য়ের জ্ঞান না হওয়ায় বিকারের অনুমান হয় না ।  
 বিশদার্থ এই যে, ( যকারাদি বর্ণে, ইকারাদি বর্ণের ) অন্য় থাকিলে কিছু নিবৃত্ত হয়,  
 কিছু জন্মে, এ জন্ম বিকার অনুমান করিতে পারা যায় । কিন্তু অন্য় গৃহীত ( জ্ঞাত )  
 হয় না, অতএব বিকার নাই ।

এবং বাহার করণ, অর্থাৎ উচ্চারণ-জনক আভ্যন্তর-প্রযত্ন ‘ভিন্ন’ এমন বর্ণবয়ের  
 ( একের ) অপ্রয়োগে ( অপরের ) প্রয়োগের উপপত্তি হয় । বিশদার্থ এই যে, ইকার  
 বিবৃতকরণ, যকার ঈবৎ স্পৃষ্টকরণ, সেই এই ইকার ও যকার ভিন্নরূপ করণনামক  
 প্রযত্নের দ্বারা উচ্চারণীয়, সেই উভয়ের একটির ( ইকারের ) অপ্রয়োগে অন্য়টির  
 ( যকারের ) প্রয়োগ উপপন্ন হয় ।

পরন্তু, অবিকারেও বিশেষ নাই । বিশদার্থ এই যে, যে স্থলে এই ইকার ও  
 যকার বিকারভূত নহে ( যথা ) “যততে” “যচ্ছতি” “প্রায়ংস্ত,” এবং “ইকারঃ”  
 “ইদং” এবং যে স্থলে ইকার ও যকার বিকারভূত, ( যথা ) “ইক্ট্যা” “দধ্যাহর,”—  
 উভয়ত্র অর্থাৎ পূর্বোক্ত উভয় স্থলেই প্রয়োগকারীর বত্ন নির্বিবশেষ, শ্রোতারও  
 শ্রবণ, নির্বিবশেষ, এ জন্ম আদেশের উপপত্তি হয় ।

এবং যেহেতু প্রযুক্ত্যমানের জ্ঞান হয় না । বিশদার্থ এই যে, প্রযুক্ত্যমান  
 ইকার যকারহ প্রাপ্ত হইয়া গৃহীত হয় না, ( প্রশ্ন ) তবে কি ? ( উত্তর ) ইকারের  
 প্রয়োগে যকার প্রযুক্ত হয়, অতএব বিকার নাই



টিপ্পন। বর্ণের বিকার ও আদেশ, এই উভয়ের উপদেশ থাকায়, তন্মধ্যে কোন উপদেশ তব—অর্থাৎ বর্ণার্থ, ইহা বুঝা যায় না, এই কথা বলিয়া ভাষ্যকার মহর্ষি স্মৃতোক্ত সংশয় ব্যাখ্যা করিয়া, এখানেই “আদেশের উপদেশ তব” এই কথার দ্বারা মহর্ষির সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়াছেন। মহর্ষি পরে বিচারপূর্বক তাহার নিজ সিদ্ধান্তের সমর্থন করিলেও, ভাষ্যকার এখানে ঐ সিদ্ধান্ত সমর্থন করিতে নিজে কয়েকটি যুক্তির উল্লেখ করিয়াছেন। ভাষ্যকারের প্রথম যুক্তি এই যে, “দ্ব্যত্র” এই প্রয়োগে সন্ধিবশতঃ ইকারের স্থানে যে বকারের আদেশ হইয়াছে, ঐ বকারকে ঐ স্থলে ইকারের বিকার বলিয়া অনুমান করা যায় না। কারণ, বিকারস্থলে বাহার বিকার, দেই স্থলে ইকারের বিকার বলিয়া অনুমান করা যায় না। অর্থাৎ বিকার-পদার্থে প্রকৃতি-পদার্থের কোন ধর্মের নিবৃত্তি ও কোন ধর্মের উৎপত্তি হয়। যেমন, স্ববর্ণের বিকার কুণ্ডল। স্ববর্ণ কুণ্ডলের প্রকৃতি। স্ববর্ণজাতীয় অক্ষরবর্ণগুলি পূর্বে যে আকারে থাকে, কুণ্ডলে তাহার নিবৃত্তি হয়, এবং অন্তরূপ আকারের উৎপত্তি হয়। কুণ্ডল স্ববর্ণ হইতে সর্বথা বিভিন্ন হইয়া যায় না। কুণ্ডলে স্ববর্ণের পূর্বোক্তরূপ অক্ষর প্রত্যক্ষ হয়, এ জন্ত সেখানে কুণ্ডলকে স্ববর্ণের বিকার বলিয়া অনুমান করা যায়। বকার ইকারের বিকার হইলে, কুণ্ডলে স্ববর্ণের জায় বকারে ইকারের পূর্বোক্ত অক্ষর থাকিত এবং তাহা বুঝা যাইত। অর্থাৎ বকারে ইকারের কোন ধর্মের নিবৃত্তি ও কোন ধর্মের উৎপত্তি হইলে, বকার ইকার হইতে সর্বথা বিভিন্ন বুঝা যাইত না। কিন্তু যখন “দ্ব্যত্র” এই প্রয়োগে বকারে ইকারের অক্ষর বুঝা যায় না, বকারকে ইকার হইতে সর্বথা বিভিন্ন বলিয়াই বুঝা যায়, তখন ঐ বকারকে ইকারের বিকার বলিয়া অনুমান করা যায় না। অর্থাৎ বকারে ইকারের বিকারস্ববোধক অক্ষর না থাকায়, বকারে ইকারের বিকারের অনুমানক হেতু নাই। এবং বকার যদি ইকারের বিকার হয়, তাহা হইলে বকার ইকারের অক্ষরবিশিষ্ট হউক? এইরূপ প্রতিকূল তর্ক উপস্থিত হওয়ায়, বকারে ইকারের বিকারবাহুমান হইতেও পারে না। অতঃপর এনাগের দ্বারাও বকারে ইকারের বিকার সিদ্ধ হয় না। সুতরাং বর্ণবিকার নিশ্চয় হওয়ায়, উহা নাই।

ভাষ্যকারের দ্বিতীয় যুক্তি এই যে, ইকার ও বকারের “করণ” অর্থাৎ উচ্চারণানুকূল আভ্যন্তর-প্রযত্ন ভিন্ন। ইকার স্বরবর্ণ, সুতরাং তাহার করণ “বিবৃত্ত”। বকার অঙ্কবর্ণ, সুতরাং তাহার করণ “ঈবৎ স্পৃষ্ট”। পূর্বোক্ত বিভিন্ন করণ নামক প্রযত্নের দ্বারা ইকার ও বকারের উচ্চারণ হওয়ায়,

১। করণ উচ্চারণানুকূল প্রযত্ন বিধি,—বাহু ও আভ্যন্তর। বাহু প্রযত্ন একাদশ প্রকার ও আভ্যন্তর প্রযত্ন চারি প্রকার কথিত হইয়াছে। এবং ঐ প্রযত্ন “করণ” নামে অভিহিত হইয়াছে। ঐ আভ্যন্তর-প্রযত্নরূপ করণ “স্পৃষ্ট,” “ঈবৎ স্পৃষ্ট,” “সংবৃত্ত” ও “বিবৃত্ত” নামে চতুর্বিধ। স্বরবর্ণের করণকে “বিবৃত্ত” এবং অঙ্কবর্ণের করণকে “ঈবৎ স্পৃষ্ট” বলা হইয়াছে। মহাত্ম্যকার পতঞ্জলি বলিয়াছেন, “স্পৃষ্টঃ করণং স্পর্শান্যং। ঈবৎস্পৃষ্টমঙ্করান্যং। বিবৃত্তমুদ্যানং ..... অঙ্গাঙ্গক বিবৃত্তং” (১।১।১০।) মাজুনী : সিন্ধুস্রবুজির “ভাস” গ্রন্থে এবং কানিকা-বৃত্তিকায়া “পদমন্ত্ররীতে” ইহাবিধের বিবৃত্ত ব্যাখ্যা আছে। “তত্র বর্ণ-ধনাব্যুৎপন্নানামে বদা স্থান-করণ-প্রযত্নঃ পরম্পরং স্পৃশন্তি তদা সা স্পৃষ্টতা। ঈবৎস্পৃষ্টা স্পৃশন্তি তদা সা ঈবৎ স্পৃষ্টতা। সংবৃত্তা স্পৃশন্তি সা সংবৃত্ততা। বিবৃত্তা স্পৃশন্তি সা বিবৃত্ততা। এতে চত্বার আভ্যন্তরঃ প্রযত্নাঃ। ... তত্র স্পৃষ্টকরণাঃ স্পর্শাঃ। কানিকা সংবৃত্তাঃ স্পর্শাঃ। স্পৃষ্টতাঙ্গণঃ। করণং



ইকারের প্রয়োগ না হইলেও বকারের প্রয়োগ উপপন্ন হয়। তাৎপর্য এই যে, যদি বকার ইকারের বিকার হইত, তাহা হইলে প্রয়োগকারী বকারের প্রয়োগের ভুল ইকারকে গ্রহণ করিতে এই ইকারের উচ্চারণের অন্তর্কূল "বিবৃত-করণ"কেই পূর্বে গ্রহণ করিত, কিন্তু বকার প্রয়োগ করিতে ইকারের উচ্চারণজনক "বিবৃত-করণ"কে অপেক্ষা না করিয়া বকারের উচ্চারণজনক "ঈৎ-স্পষ্টকরণ"কেই গ্রহণ করে, সুতরাং বকার ইকারের বিকার নহে।

ভাষ্যকারের তৃতীয় যুক্তি এই যে, যে স্থলে ইকার ও বকার বর্ণবিকারবাদের মতেও বিকার নহে, সেই স্থলে উহার উচ্চারণজনক প্রবত্ত ও উহার জ্ঞাপক শ্রবণে কোন বিশেষ নাই। যেমন, "যম্" ধাতু-নিম্পন্ন "বচ্ছতি" ও প্রায়ত্ত্ব এবং "বত" ধাতু-নিম্পন্ন "বততে" এই প্রয়োগে বকার ইকারের বিকার নহে। উহা "যম্" ও "বত" ধাতুরই বকার। এবং "ইকারঃ" এবং "ইদং" এই প্রয়োগে ইকার বকারের বিকার নহে। এবং যজ্ ধাতুর উত্তর জিৎ প্রত্যয়-যোগে "ইটি" শব্দ সিদ্ধ হয়। ইটি শব্দের উত্তর তৃতীয়ার এক বচনে "ইষ্টা" এইরূপ পদ সিদ্ধ হয়। ঐ "ইষ্টা"—এই পদের প্রথমস্থ ইকার বর্ণবিকারবাদের মতে যজ্ ধাতুর বকারের বিকার। এবং উহার শেষস্থ বকার "ইটি" শব্দের শেষস্থ ইকারের বিকার। এবং "দধ্যাহর" এইরূপ প্রয়োগে বকার ইকারের বিকার। কিন্তু ঐ উত্তর স্থলেই বকার ও ইকারের উচ্চারণজনক প্রবত্ত ও শ্রোতার শ্রবণে কোন বিশেষ নাই। "ইষ্টা" এই স্থলে বিকারভূত ইকার এবং "ইদং" এই স্থলে অবিকারভূত ইকার এবং "বচ্ছতি" ইত্যাদি স্থলে অবিকারভূত বকার ও "ইষ্টা", "দধ্যাহর" ইত্যাদি স্থলে বিকারভূত বকার একরূপ প্রবত্তের দ্বারা উচ্চারিত হয় এবং একরূপেই শ্রুত হয়। ইকার বকারের বিকার এবং বকার ইকারের বিকার হইলে অবশ্য সেই বিকারভূত ইকার ও বকারের উচ্চারণজনক যজ্ ও শ্রবণে অবিকারভূত ইকার ও বকারের উচ্চারণ-জনক যজ্ ও শ্রবণ হইতে বিশেষ থাকিত। সুতরাং বর্ণবিকারপক্ষে প্রমাণ নাই। তাহা "ইদং ব্যাহরতি" এইরূপ পাঠই বহু পুস্তকে দেখা যায়। কিন্তু "ইষ্টা দধ্যাহরেতি" এইরূপ প্রকৃত পাঠ বিকৃত হইয়া "ইদং ব্যাহরতি" এই পাঠ হইয়াছে, মনে হয়। কোন পুস্তকে "ইষ্টা দধ্যাহরেতি" এইরূপ পাঠ পাওয়ায়, উহাই প্রকৃত বলিয়া গৃহীত হইয়াছে।

ভাষ্যকারের চতুর্থ যুক্তি এই যে, দধি+অত্র এই বাক্যে প্রযুক্ত্যমান ইকার "দধ্যাহ" এই প্রয়োগে বকারই প্রাপ্ত হয়, ইহা বুঝা যায় না। হৃদ্র যেমন কালে দধিভাবাপন্ন দেখা যায়, তজ্জপ ঐ স্থলে ইকারকে বকারভাবাপন্ন বুঝা যায় না; সুতরাং প্রমাণাত্ত্বাৎশতঃ বর্ণবিকার নাই।

ভাষ্য। অবিকারে চ ন শব্দান্বাখ্যানলোপঃ। ন বিজ্রিয়ন্তে বর্ণা ইতি। ন চৈতস্মিন্ পক্ষে শব্দান্বাখ্যানস্থাসম্ভবো যেন বর্ণবিকারঃ

কৃতিক্কারণ-প্রকারঃ। স্পষ্টতান্বয়ঃ করণঃ যেহাং তে স্পষ্টকরণাঃ। এবং স্পষ্টকরণা অপ্রাপ্তাঃ। অপ্রাপ্তা বরনবাঃ। বিবৃত করণনুযায়ী অপ্রাপ্তাঃ। অপ্রাপ্তা বরনবাঃ। উদাহঃ শব্দসহাঃ। জ্ঞান (১৮৮২ম স্বতঃ)।



প্রতিপদ্যেদমহীতি । ন খলু বর্ণস্ত বর্ণান্তরং কার্যং, ন হি ইকারাদ্যকার উৎপাদ্যতে, যকারাচ্চ ইকারঃ । পৃথক্স্থানপ্রযত্নোৎপাদ্যা হীমে বর্ণা-  
স্তেষামন্যোহন্যস্ত স্থানে প্রযুক্ত্যত ইতি যুক্তং । এতাবচ্চৈতৎ, পরিণামো  
বা বিকারঃ স্তাৎ কার্যাকারণ-ভাবো বা, উভয়ঞ্চ নাস্তি, তস্মান্ন সন্তি  
বর্ণবিকারাঃ ।

বর্ণসমুদায়বিকারানুপপত্তিবচ্চ বর্ণবিকারানুপপত্তিঃ । অস্তে-  
ভূঃ, ক্রবো বচিরিতি, যথাবর্ণ-সমুদায়স্ত ধাতুলক্ষণস্ত কচিদবিময়ে বর্ণান্তর-  
সমুদায়ো ন পরিণামো ন কার্যং, শব্দান্তরস্ত স্থানে শব্দান্তরং প্রযুক্ত্যতে,  
তথা বর্ণস্ত বর্ণান্তরমিতি ।

অনুবাদ । বিকার না হইলেও শব্দানুশাসনের লোপ নাই । বিশদার্থ এই যে, বর্ণ-  
গুলি বিকৃত হয় না, এই পক্ষে শব্দানুশাসনের অর্থাৎ “ইকো বর্ণচি” ইত্যাদি পাণিনীয়  
সূত্রের অসম্ভব নাই, যে জন্য বর্ণবিকার স্বীকার করিব । বর্ণান্তর বর্ণের কার্য নহে,  
যেহেতু ইকার হইতে যকার উৎপন্ন হয় না, এবং যকার হইতে ইকার উৎপন্ন হয় না ।  
কারণ, এই সকল বর্ণ পৃথক্ স্থান ও প্রযত্নের দ্বারা উৎপাদ্য, সেই সকল  
বর্ণের মধ্যে অন্য বর্ণ অপর বর্ণের স্থানে প্রযুক্ত হয়,—ইহা যুক্ত ।  
পরিণামই বিকার হইবে, অথবা কার্যাকারণভাব বিকার হইবে, ইহা (বিকার-  
বস্ত) এতাবন্মাত্র, অর্থাৎ পরিণাম অথবা কার্যাকারণভাব ব্যতীত বিকার-  
পদার্থ আর কিছুই হইতে পারে না, কিন্তু উভয় নাই, অর্থাৎ বর্ণের পরিণামও নাই ;  
এক বর্ণের সহিত বর্ণান্তরের কার্যাকারণভাবও নাই, অতএব বর্ণবিকার নাই ।

এবং বর্ণসমষ্টির বিকারের অনুপপত্তির ন্যায় বর্ণের বিকারের অনুপপত্তি ।  
বিশদার্থ এই যে, অস্ ধাতুর স্থানে ভূ ধাতুর আদেশ হয়, ক্র ধাতুর স্থানে বচ্ ধাতুর  
আদেশ হয়, এই সূত্রবশতঃ যেমন কোন স্থলে ধাতু-স্বরূপ বর্ণসমষ্টির ( অস্, ক্র, )  
সম্বন্ধে বর্ণান্তরসমষ্টি ( ভূ, বচ্, ) পরিণাম নহে, কার্য নহে, ( কিন্তু ) শব্দান্তরের  
স্থানে শব্দান্তর প্রযুক্ত হয়, তদ্রূপ বর্ণের স্থানে বর্ণান্তর প্রযুক্ত হয়, অর্থাৎ  
ইকারের স্থানে যে যকার হয়, তাহা ইকারের পরিণামও নহে, ইকারের কার্যও  
নহে, কিন্তু ইকারের স্থানে সন্ধিতে যকারের প্রয়োগ হইয়া থাকে, উহাকে বলে,—  
“আদেশ ।”



টিপ্পনী। ভাষ্যকারের পূর্বোক্ত কথার প্রতিবাদ হইতে পারে যে, বর্ণের বিকার নিশ্চয় হইবে কেন ? “ইকো বণ্টি” ইত্যাদি পাণিনি-সূত্রই উহাতে প্রমাণ আছে। অচ্ পরে থাকিলে ইকের স্থানে বণ্ হয়, ইহা পাণিনি বলিয়াছেন। তদ্বারা ইকারের বিকার বকার, ইহা বুঝা যায়। বর্ণের বিকার না হইলে, পাণিনির ঐ শব্দাভ্যাসান, অর্থাৎ শব্দানুশাসনসূত্র সম্ভব হয় না। এতদ্বারা ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, বর্ণের বিকার নাই, এই পক্ষে পাণিনির ঐ সূত্র অসম্ভব হয় না, সুতরাং বর্ণবিকার স্বীকারের কোন কারণ নাই। ইকার হইতে বকার উৎপন্ন হয় না, বকার হইতেও ইকার উৎপন্ন হয় না ; সুতরাং যকারাদি কোন বর্ণ ইকারাদি অপূর্ণ বর্ণের কার্য্য নহে। ঐ সকল বর্ণ পৃথক স্থান ও পৃথক প্রযুক্তের দ্বারা জন্মে। ইকার ও বকারের স্থান (তালু) এক হইলেও উচ্চারণানুকূল প্রযুক্ত পৃথক্। মূলকথা, পূর্বোক্ত পাণিনি-সূত্র ইকারের প্রয়োগ-প্রসঙ্গে সন্ধিতে বকারের প্রয়োগ বিধান করিয়াছে। বকারকে ইকারের বিকাররূপে বিধান করে নাই। সুতরাং পাণিনি-সূত্রের দ্বারা বর্ণবিকারপক্ষ প্রতিপন্ন হয় না। বর্ণের আদেশপক্ষই পাণিনির অভিপ্রেত, বুঝা যায়।

কেহ বলিতে পারেন যে, বর্ণের পরিণামরূপ বিকার উপপন্ন না হইলেও ঐ বিকার কোনও অতিরিক্ত পদার্থ বলিব ? সেই বিকারবশতঃ বর্ণ নিভা হইবে ? এতদ্বারা ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, পরিণাম অথবা কার্য্যকারণভাব এই উভয় ভিন্ন বিকার উপপন্ন হয় না। পরিণামকেই বিকার-পদার্থ বলিতে হইবে, অথবা কার্য্যকারণভাবকেই বিকার-পদার্থ বলিতে হইবে, উহা ছাড়া বিকার-পদার্থ আর কিছুই হইতে পারে না। কিন্তু বর্ণবলে ঐ উভয়ই না থাকায়, বর্ণবিকার নাই, ইহা স্বীকার্য্য। তাৎপর্য্যটীকাকার এখানে বলিয়াছেন যে, পরিণামকে বিকার বলা যায় না। ছদ্ম বা তাহার অবয়ব দ্বিরূপে পরিণত হয় না—তাহা হইতেই পারে না। মৈয়াদিক ভাষ্যকার তাহা বলিতে পারেন না। সুতরাং ভাষ্যকার উহা আপাততঃ বলিয়াছেন অথবা মতান্তরানুসারে বলিয়াছেন। কার্য্যকারণভাবই বিকার, এই পক্ষই বাস্তব। কিন্তু বর্ণে উহা নাই। কারণ, যকারোপস্থিত অব্যবহিত পূর্বে ইকার থাকে না। সুতরাং বকার ইকারের কার্য্য হইতে না পারায়, কার্য্যকারণভাবরূপ বিকার অসম্ভব। অতএব ইকারের প্রয়োগ-প্রসঙ্গে সন্ধিতে ইকার স্থানে বকার প্রয়োগ হইবে, ইহাই পাণিনি-সূত্রের অর্থ।

ভাষ্যকার শেষে স্বপক্ষ-সমর্থনে আর একটি যুক্তি বলিয়াছেন যে, “অন্” ধাতুর স্থানে “ভূ” ধাতু ও “ক্র” ধাতুর স্থানে “বচ্” ধাতুর আদেশের বিধান ও পাণিনি-সূত্রে আছে। সেখানে “অন্”, “ক্র” “ভূ”, “বচ্” এই ধাতুগুলি একটিনাত্র বর্ণ নহে। উহা বর্ণসমুদায়। সুতরাং কোন স্থলে “অন্” ধাতু স্থানে ভূ ধাতু এবং “ক্র” ধাতু স্থানে বচ্ ধাতু যেমন তাহার পরিণামও নহে, তাহার কার্য্যও নহে, কিন্তু “অন্” ও “ক্র” ধাতুরূপ শব্দান্তরের স্থানে “ভূ” ও “বচ্” ধাতুরূপ শব্দান্তর প্রযুক্ত হয়—ইহা বর্ণবিকারবাদীরও স্বীকার্য্য, তজ্জন ইকাররূপ বর্ণস্থানে বকাররূপ বর্ণান্তর প্রযুক্ত হয়, ইহাই স্বীকার্য্য। তাৎপর্য্যটীকাকার ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য বর্ণন করিয়াছেন যে, একটি বর্ণই বাস্তব পদার্থ বলিয়া কদাচিৎ তাহার বিকার বলা যায়। কিন্তু জ্ঞানের সমাকুর মাত্র যে বর্ণসমুদায় (অন্, ক্র প্রভৃতি) তাগর বিকার কখনও সম্ভব হয় না। কারণ, তাহা বাস্তব কোন একটি



বর্ণনাই। স্বতরাং সেই স্থলে আদেশপক্ষই অর্থাৎ অনু ও ক্র দ্বারা স্থানে ক্র ও বচ দ্বারা  
প্রয়োগই স্বীকার করিতে হইবে। তাহা হইলে এক বর্ণের ঐ আদেশপক্ষই স্বীকার্য। যে  
আদেশপক্ষ অন্তর স্বীকৃতই আছে, তাহাই সর্বত্র স্বীকার করা উচিত। ইত্যাদি এক বর্ণ  
বিকারের নূতন করণা উচিত নহে ১৪০।

ভাষ্য। ইতচ্চ ন সন্তি বর্ণবিকারাঃ।

অনুবাদ। এই হেতুবশতঃও বর্ণবিকার নাই।

সূত্র। প্রকৃতিবিরুদ্ধো বিকারবিরুদ্ধো ॥৪১॥১৭॥\*

অনুবাদ। ( উত্তর ) যেহেতু প্রকৃতির বুদ্ধি থাকিলে বিকারের বুদ্ধি হয়।

ভাষ্য। প্রকৃত্যানুবিধানং বিকারেষু দৃষ্টং, যকারে হ্রস্বদীর্ঘানুবিধানং  
নাস্তি, যেন বিকারত্বমনুমীয়ত ইতি।

অনুবাদ। বিকারসমূহে প্রকৃতির অনুবিধান দেখা যায়। যকারে হ্রস্ব ও দীর্ঘের  
অনুবিধান নাই, যদ্বারা বিকারত্ব অনুমিত হয়।

টিপ্পনী। মহর্ষি পূর্বসূত্রের দ্বারা বিপ্রতিপত্তিমূলক সংশয় জ্ঞাপন করিয়া এই সূত্রের দ্বারা  
বর্ণের বিকার নাই, এই পক্ষের সমর্থন করিতে প্রথমে হেতু বলিয়াছেন যে, বিকারস্থলে প্রকৃতির  
বুদ্ধি থাকিলে বিকারের বুদ্ধি হয়। ভাষ্যকার পূর্বসূত্রজাত্যে বর্ণবিকারের অভাবপক্ষে কয়েকটি হেতু  
বলিয়া এখন মহর্ষি-কথিত হেতুও ব্যাখ্যা করিতে এখানে "ইতচ্চ" ইত্যাদি সন্দর্ভের দ্বারা মহর্ষির  
সাধ্য-নির্দেশপূর্বক সূত্রের অবতারণা করিয়াছেন। ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য এই যে, পূর্বোক্ত হেতু-  
গুলির জ্ঞান মহর্ষি-সূত্রোক্ত এই হেতুর দ্বারাও বর্ণবিকার নাই, ইহা প্রতিপন্ন হয়। সূত্রার্থ বর্ণন  
করিতে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, বিকারমাত্রই প্রকৃতির অনুবিধান দেখা যায় এবং শুদ্ধারা  
বিকারত্বের অনুমান করা যায়। প্রকৃতির উৎকর্ষ ও অপকর্ষে বিকারের উৎকর্ষ ও অপকর্ষই  
এখানে বিকারে প্রকৃতির অনুবিধান। স্বর্ণাদি প্রকৃতি-দ্রব্যের বুদ্ধি বা উৎকর্ষে কুণ্ডলাদি  
বিকার-দ্রব্যের উৎকর্ষ দেখা যায়। এক তোলা স্বর্ণজাত কুণ্ডল হইতে দুই তোলা স্বর্ণজাত  
কুণ্ডল বড় হইয়া থাকে, ইহা প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ। বর্ণবিকারবাদী হ্রস্ব ইকার ও দীর্ঘ ঈকার, এই  
উভয়কেই যকারের প্রকৃতি বলিবেন। এবং হ্রস্ব ইকার হইতে দীর্ঘ ঈকারের মাধ্যমিক্যবশতঃ  
উৎকর্ষও স্বীকার করিবেন। তাহা হইলে হ্রস্ব ইকার-জাত যকার হইতে দীর্ঘ ঈকার-জাত  
যকারের বুদ্ধি বা উৎকর্ষ হওয়া উচিত। কিন্তু হ্রস্ব ইকার ও দীর্ঘ ঈকার-জাত যকারের কোনট

\* জাতিসূচীনিবন্ধে ".....বিকারবিরুদ্ধো", এইরূপ 'চ'কারান্ত সূত্রপাঠ দেখা যায়। কিন্তু উদ্ভোতকর প্রকৃতির  
উদ্ভূত সূত্রপাঠে 'চ'কার না থাকায় এবং এখানে চকারের অর্থসিদ্ধি বা অযোগ্যতার দ্বারা না হওয়ায়, প্রচলিত সূত্রপাঠই  
সুস্থ হইয়াছে।

বৈষম্য না থাকায়, বন্ধারা বিকারত্বের অনুমান হইবে, সেই হ্রস্ব ইকার ও দীর্ঘ ঈকাররূপ প্রকৃতির অনুবিধান যকারণে নাই, সুতরাং যকারণে ইকারের বিকারত্ব সিদ্ধ হয় না। প্রকৃতির অনুবিধান বিকারত্বের ব্যাপক অর্থাৎ বিকারমাত্রেরই উহা থাকে। যকারণে ঐ ব্যাপকপদার্থের অভাবপ্রযুক্ত তাহার ব্যাপ্য বিকারত্বের অভাবও সিদ্ধ হয়। ৪১।

**সূত্র ।** ন্যূনসমাধিকোপলন্ধে বর্জিকারানামহেতুঃ ॥

॥৪২॥১৭১॥

অনুবাদ। ( বর্ণবিকারবাদী পূর্বপক্ষীর উত্তর ) বিকারের ন্যূনত্ব, সমত্ব ও আধিক্যের উপলব্ধি হওয়ায় ( পূর্বসূত্রোক্ত হেতু ) অহেতু, অর্থাৎ হেতু নহে—  
হেত্বাভাস।

ভাষ্য। দ্রব্যবিকারান্যূনাঃ সমা অধিকাশ্চ গৃহ্যন্তে ; তদ্বদয়ং বিকারো  
ন্যূনঃ স্যাদিতি।

অনুবাদ। দ্রব্যরূপ বিকারগুলি ন্যূন, সমান ও অধিক গৃহীত ( দৃষ্ট ) হয়,  
তদ্রূপ এই বিকার, অর্থাৎ বর্ণবিকারও ন্যূন হইতে পারে।

টীকা-নী। মহাবি এই সূত্রের দ্বারা বর্ণবিকারবাদী পূর্বপক্ষীর উত্তর বলিয়াছেন যে, বিকারের  
অর্থাৎ দ্রব্যরূপ বিকারের প্রকৃতি হইতে কোন স্থলে ন্যূনত্বও দেখা যায়, সমত্বও দেখা যায় এবং  
আধিক্যও দেখা যায়। যেমন, তুলসিগুৰুপ প্রকৃতির দ্বারা তদপেক্ষায় ন্যূন পরিমাণ সূত্র জন্মে।  
এবং সুবর্ণাদি প্রকৃতির দ্বারা তাহার সমপরিমাণ কুণ্ডলাদি জন্মে। এবং কুঁজ বটবীজ দ্বারা  
তদপেক্ষায় অধিক পরিমাণ বটবৃক্ষ জন্মে। তাহা হইলে দ্রব্যবিকারের দ্বারা বর্ণবিকারও ন্যূন হইতে  
পারে। তাৎপৰ্য্য এই যে, দীর্ঘ ঈকার স্থানে যে যকার হয়, তাহা হ্রস্ব ইকার-জাত যকার অপেক্ষায়  
অধিক না হইতে পারে। অর্থাৎ দ্রব্যবিকারস্থলে বিকারে পূর্বোক্তরূপ প্রকৃতির অনুবিধান  
দেখি না, সুতরাং বর্ণবিকার স্থলেও উহা না থাকিতে পারে। সুতরাং পূর্বসূত্রে যে হেতু বলা  
হইয়াছে, তাহা হেতু হয় না, তাহা ঐ স্থলে হেত্বাভাস। সূত্রে “ন্যূন” “সম” ও “অধিক” শব্দ দ্বারা  
ভাবপ্রধান নির্দেশবশতঃ ন্যূনত্ব, সমত্ব ও আধিক্য বুঝিতে হইবে। ৪২।

**সূত্র ।** দ্বিবিধস্থাপি হেতোরভাবাদসাধনং দৃষ্টান্তঃ ॥

॥৪৩॥১৭২॥

অনুবাদ। ( সিদ্ধান্তবাদী মহাবির উত্তর ) দ্বিবিধ হেতুরই অভাববশতঃ দৃষ্টান্ত  
অর্থাৎ হেতুশূন্য কেবল দৃষ্টান্ত, সাধন ( সাধ্যসাধক ) হয় না।



ভাষা। অত্র নোদাহরণসাধন্যাক্ষেতুরস্তি, ন বৈধর্ম্যাৎ। অনুপ-  
সংস্কৃতশ্চ হেতুনা দৃষ্টান্তো ন সাধক ইতি। প্রতিদৃষ্টান্তে চানিয়মঃ  
প্রসজ্যেত। যথাহনডুহঃ স্থানেহস্থো বোচুং নিযুক্তো ন তদ্বিকারো  
ভবতি, এবমিবর্ণস্তা স্থানে যকারঃ প্রযুক্তো ন বিকার ইতি। ন চাত্ত নিয়ম-  
হেতুরস্তি, দৃষ্টান্তঃ সাধকো ন প্রতিদৃষ্টান্ত ইতি।

অনুবাদ। এখানে অর্থাৎ পূর্বপক্ষবাদীর সাধ্যসাধনে উদাহরণের সাধন্যা-  
প্রযুক্ত হেতু নাই, উদাহরণ বৈধর্ম্যা প্রযুক্ত হেতু নাই, অর্থাৎ সাধন্যা হেতু ও বৈধর্ম্যা  
হেতু, এই দ্বিবিধ হেতু না থাকায়, হেতুই নাই। হেতুর দ্বারা অনুপসংস্কৃত দৃষ্টান্ত,  
অর্থাৎ যে দৃষ্টান্তে হেতুর উপসংহার ( নিশ্চয় ) নাই, এমন দৃষ্টান্ত সাধক হয় না।  
প্রতিদৃষ্টান্তেও অনিয়ম প্রসক্ত হয়। বিশদার্থ এই যে, যেমন বুকের স্থানে বহন  
করিবার নিমিত্ত নিযুক্ত অশ্ব তাহার ( বুকের ) বিকার হয় না, এইরূপ ই-বর্ণের স্থানে  
প্রযুক্ত যকার ( ই-বর্ণের ) বিকার হয় না। দৃষ্টান্ত সাধক হয়, প্রতিদৃষ্টান্ত  
সাধক হয় না, ইহাতে নিয়ম হেতুও, অর্থাৎ ঐরূপ নিয়মের হেতুও নাই।

টিপ্পনী। মহর্ষি পূর্বপক্ষবাদীর কথার উত্তরে একপক্ষে এই স্বত্তের দ্বারা বলিয়াছেন যে,  
দ্বিবিধ হেতুই না থাকায়, কেবল দৃষ্টান্ত সাধ্যসাধক হয় না। অর্থাৎ পূর্বপক্ষবাদী যদি ভ্রব্য-  
বিকারের ন্যূনত্ব, সমত্ব ও আধিক্য দেখাইয়া তাহার সাধ্যসাধন করেন, তাহা হইলে তাহার সাধ্য-  
সাধক হেতু কি?—তাগা বলিতে হইবে। হেতু দ্বিবিধ, সাধন্যা হেতু ও বৈধর্ম্যা হেতু। ( প্রথম  
অধ্যায় অব্যব-প্রকরণ ত্রুটব্য ) পূর্বপক্ষবাদী কোন প্রকার হেতুই বলেন নাই। কেবল ভ্রব্য  
বিকারস্থলে বিকারের ন্যূনত্বাদির উপলব্ধি হয় বলিয়া, তাহার স্বপক্ষে দৃষ্টান্ত মাত্র দেখাইয়াছেন।  
কিন্তু হেতু না থাকিলে কেবল দৃষ্টান্ত সাধ্যসাধক হয় না। ভাষ্যকার স্বার্থা বর্ণন করিয়া শেষে  
পূর্বপক্ষবাদীকে নিরস্ত করিতে আরও একটি কথা বলিয়াছেন যে, প্রতি দৃষ্টান্তেও অনিয়মের  
প্রসক্তি হয়। অর্থাৎ হেতু না থাকিলেও দৃষ্টান্ত সাধ্যসাধক হয়, কিন্তু প্রতি দৃষ্টান্তে সাধ্যসাধক  
হয় না, এইরূপ নিয়মের কোন হেতু না থাকায়, ঐরূপ নিয়ম নাই—ইহা অবশ্য বলা যায়। তাহা  
হইলে ই-বর্ণের স্থানে প্রযুক্ত যকার ই-বর্ণের বিকার হয় না, যেমন বহন করিবার নিমিত্ত বুকের স্থানে  
নিযুক্ত অশ্ব ঐ বুকের বিকার হয় না, এইরূপে অশ্বকে প্রতি দৃষ্টান্তরূপে উল্লেখ করিয়া তদ্বারা  
যকার ই-বর্ণের বিকার নহে, এই পক্ষও সিদ্ধ করা যায়। যদি হেতুশূন্য দৃষ্টান্তমাত্রও পূর্বপক্ষবাদীর  
সাধ্যসাধক হয়, তাহা হইলে হেতুশূন্য প্রতি দৃষ্টান্তও সিদ্ধান্তবাদীর সাধ্যসাধক কেন হইবে  
না? সুতরাং পূর্বপক্ষবাদীকে তাহার সাধ্যসাধনে হেতু বলিতে হইবে। পূর্বপক্ষবাদী কোন  
প্রকার হেতু না বলিয়া কেবল দৃষ্টান্ত বলিলে, সে দৃষ্টান্ত অসাধন, অর্থাৎ তাহার সাধ্যসাধক

হয় না। প্রচলিত ভাষা-পুস্তকে এই সূত্রটি ভাষা মধ্যেই উল্লিখিত দেখা যায়। উদ্যোক্তকর ও বিশ্বনাথ প্রকৃতিও ইহাকে সূত্ররূপে উল্লেখ করেন নাই। কিন্তু শ্রীমদ্ বাচস্পতি-মিশ্র "ভাষ্যপর্যটিকা" গ্রন্থে ইহাকে সূত্র বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। "জ্ঞানসূত্ৰীনিবন্ধে"ও এইটিকে সূত্র মধ্যে উল্লেখ করিয়াছেন। ৪৩।

ভাষ্য। দ্রব্যবিকারোদাহরণঃ—

সূত্র। নাতুল্য প্রকৃतीনাং বিকারবিকম্পাং ॥

॥৪৪॥১৭৩॥

অনুবাদ। ( সিদ্ধান্তবাদী মহাবির উত্তরাস্তর ) দ্রব্যবিকাররূপ উদাহরণও নাই। যেহেতু, অতুল্য ( দ্রব্যরূপ ) প্রকৃতিসমূহের বিকার বিকল্প, অর্থাৎ বিকারের বৈষম্য আছে।

ভাষ্য। অতুল্যানাং দ্রব্যানাং প্রকৃতিভাবো বিকল্পতে। বিকারাশ্চ প্রকৃতিরনুবিধীয়ন্তে। ন দ্বিবর্ণমনুবিধীয়তে যকারঃ। তস্মাদনুদাহরণং দ্রব্যবিকার ইতি।

অনুবাদ। অতুল্য দ্রব্যসমূহের প্রকৃতিভাব বিবিধ প্রকার, অর্থাৎ বিলক্ষণ হয়। বিকারসমূহও ( তাহার ) প্রকৃতিসমূহকে অনুবিধান করে, অর্থাৎ প্রকৃতির ভেদানুসারে তাহার বিকারেরও ভেদ হয়। কিন্তু যকার ইবর্ণকে অনুবিধান করে না। অতএব দ্রব্যবিকার উদাহরণ হয় না।

টিপ্পনী। পূর্বপক্ষবাদী যদি বলেন যে, আমি স্বপক্ষসাধনের জন্য দ্রব্যবিকারের নূনত্বাদির উপলব্ধির কথা বলি নাই। সুতরাং আমার পক্ষে কোন প্রকার হেতু না থাকায়, কেবল দৃষ্টান্ত সাধ্যসাধক হয় না, এইরূপ উত্তর সম্ভব হয় না। আমার কথা না বুঝিয়াই ঐরূপ উত্তর বলা হইয়াছে। আমার কথা এই যে, দ্রব্যবিকারের নূনত্বাদির উপলব্ধি হওয়ায়, সিদ্ধান্তবাদীর প্রথমোক্ত হেতু অহেতু, অর্থাৎ ব্যভিচারী। বিকারমাত্রেই প্রকৃতির অনুবিধান দেখা যায়, ইহা স্বীকার করা যায় না। কারণ, দ্রব্যবিকারে বিকারত্ব আছে; তাহাতে প্রকৃতি অপেক্ষায় নূনত্ব ও আধিক্য থাকায় প্রকৃতির অনুবিধান নাই। অর্থাৎ প্রকৃতির হ্রাস ও বৃদ্ধি অনুসারে বিকারের হ্রাস ও বৃদ্ধি হয়, এইরূপ নিবন্ধ নাই। সুতরাং সিদ্ধান্তবাদীর হেতু ব্যভিচারী। এই ব্যভিচাররূপ দোষের উদ্ভাবনই আমি করিয়াছি। স্বপক্ষসাধন করি নাই। মহর্ষি এই পক্ষান্তরে এই সূত্রের দ্বারা বলিয়াছেন যে, না, অর্থাৎ পূর্বপক্ষবাদী যদি দ্রব্যবিকারকে উদাহরণরূপে প্রকাশ করিয়া, আমার হেতুতে ব্যভিচার প্রদর্শন করেন, তাহা হইলে বলিব, ঐ দ্রব্যবিকার তাহার পক্ষে উদাহরণ হয় না। ভাব্যাকার প্রথমে "দ্রব্যবিকারোদাহরণঃ"—এই বাক্যের পূরণ করিয়া, সূত্রকারের এই বক্তব্য প্রকাশ করিয়া



ছেন। ভাব্যকারের ঐ বাক্যের সহিত সূত্রের প্রথম “নঞ” শব্দের যোগ করিয়া সূত্রার্থ ব্যাখ্যা করিতে হইবে।

দ্রব্যবিকার পূর্বোক্তরূপে মহাবিশ্ব হেতুতে ব্যভিচার প্রদর্শন করিতে উদ্যত হইয়া না। মহাবিশ্ব হেতু বলিয়াছেন যে, অতুলা প্রকৃতিসমূহের বিকারের বৈষম্য আছে। দ্রব্যবিকারস্থলে প্রকৃতি ভূলা না হইলে, তাহার বিকারের বৈষম্য সর্বত্রই হয়, ইহা বুঝাইতে ভাব্যকার সূত্রার্থ বর্ণনায় অতুলা দ্রব্যরূপ প্রকৃতির প্রকৃতিভাবকেই বিবিধ প্রকার বলিয়াছেন। মহাবিশ্ব তাৎপর্য এই যে, প্রকৃতির বুদ্ধি থাকিলে বিকারের বুদ্ধি হয়, এই কথাই দ্বারা বিকারমাত্রই প্রকৃতির অনুবিধান করে, অর্থাৎ প্রকৃতির ভেদকে অনুবিধান করে, ইহাই বিবক্ষিত। প্রকৃতির ভেদ থাকিলে বিকারের ভেদ অবশ্যই হইবে, ইহাই বিকারে প্রকৃতিভেদের অনুবিধান। বটবৃক্ষাদি দ্রব্যরূপ বিকারেও পূর্বোক্তরূপ প্রকৃতির অনুবিধান আছে। প্রকৃতি অপেক্ষায় বিকারের ন্যূনত্ব, আধিক্য বা সমত্ব হইলেও প্রকৃতির ভেদে বিকারের ভেদ সর্বত্রই হয়, ঐরূপ নিয়মে কুত্রাপি ব্যভিচার নাই। বট-বীজ ও নারিকেল বীজ এই উভয় প্রকৃতি হইতে এক বটবৃক্ষ বা নারিকেলবৃক্ষ কখনই জন্মে না। বটবীজ হইতে বটবৃক্ষই জন্মিয়া থাকে, নারিকেলবৃক্ষ কখনই জন্মে না। এবং নারিকেল বীজ হইতে নারিকেলবৃক্ষই জন্মিয়া থাকে, বটবৃক্ষ কখনই জন্মে না। সুতরাং বিকারমাত্রই যে প্রকৃতির অনুবিধান অর্থাৎ প্রকৃতির ভেদে ভেদ আছে, এই নিয়মে কুত্রাপি ব্যভিচার বলা যায় না। পূর্বপক্ষবাদী বটবৃক্ষাদি দ্রব্যরূপ বিকারকে উদাহরণরূপে গ্রহণ করিয়াও ঐ নিয়মে ব্যভিচার দেখাইতে পারেন না। এখন যদি বিকার মাত্রই প্রকৃতির অনুবিধান করে, অর্থাৎ প্রকৃতি ভিন্ন হইলে তাহার বিকারের ভেদ অবশ্য হইবে, এই নিয়ম অব্যভিচারী হয়, তাহা হইলে দ্ব্যকারকে ই-বর্ণের বিকার বলা যায় না। কারণ, তাহা হইলে হ্রস্ব ইকার ও দীর্ঘ ইকাররূপ দুইটি অতুলা প্রকৃতির ভেদে ঐ দ্ব্যকাররূপ বিকারের ভেদ হইত। কিন্তু হ্রস্ব ইকার-জাত দ্ব্যকার হইতে দীর্ঘ ইকার জাত দ্ব্যকারের কোনই ভেদ বা বৈষম্য না থাকায়, ঐ দ্ব্যকার ই-বর্ণের বিকার নহে—ইহা সিদ্ধ হয়। তাই ভাব্যকার বলিয়াছেন, “দ্ব্যকার ই-বর্ণকে অনুবিধান করে না।” তাৎপর্যটাকার উহার ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন, “ই-বর্ণভেদকে অনুবিধান করে না।” প্রকৃতিঃ অনুবিধানের ব্যাখ্যাত্তেও পূর্বে তিনি প্রকৃতিভেদের অনুবিধান বলিয়াছেন। ভাব্যে “বিকারাস্ত প্রকৃতির অনুবিদীয়ন্তে” এইরূপ পাত্রে প্রকৃত বৃথা যায়। ভাব্য “অনুবিদীয়ন্তে” এবং “অনুবিদীয়তে” এই দুই স্থলে “দিবাদিগণীর আত্মনেপদৌ” “বী” ধাতুরই কর্তৃবাচ্য প্রয়োগ বুঝিতে হইবে। ৪৪।

সূত্র। দ্রব্যবিকারবৈষম্যবদ্বর্ণবিকারবিকল্পঃ।

॥৪৫॥১৭৪ ॥

অনুবাদ। (পূর্বপক্ষবাদীর উত্তর) দ্রব্যবিকারের বৈষম্যের ন্যায় বর্ণবিকারের বিকল্প হয়।

ভাষ্য। যথা দ্রব্যভাবেন তুল্যায়াঃ প্রকৃতের্বিকারবৈষম্যং, এবং  
বর্ণভাবেন তুল্যায়াঃ প্রকৃতের্বিকারবিকল্প ইতি।

অমুবাদ। যেমন দ্রব্যস্বরূপে তুল্য প্রকৃতির বিকারের বৈষম্য হয়, এইরূপ বর্ণস্বরূপে তুল্যপ্রকৃতির বিকারের বিকল্প হয়।

টিপ্পনী। পূৰ্বপক্ষবাদীর কথা এই যে, বটবীজাদি ও সুবর্ণাদি প্রকৃতি-দ্রব্যগুলি সমস্তই  
দ্রব্যপদার্থ, সুতরাং উহারা সমস্তই দ্রব্যস্বরূপে তুল্য। কিন্তু দ্রব্যস্বরূপে উহার তুল্য  
প্রকৃতি হইলেও উহাদিগের বিকারদ্রব্যের যখন বৈষম্য দেখা যায়, তখন বিকার-পদার্থ  
সকল অবশ্যই প্রকৃতিভেদের অমুবিধান করে, ইহা বলা যায় না। কারণ, তাহা হইলে, ঐ  
সকল তুল্য প্রকৃতিসমূহ বিকারের বৈষম্য না হইয়া নামাই হইত। দ্রব্যস্বরূপে তুল্য ঐ  
সকল প্রকৃতির যখন বিকারের বৈষম্য দেখা যায়, তখন উহার জায় বর্ণস্বরূপে তুল্য  
বর্ণরূপ প্রকৃতিরও বিকারের বৈষম্য হইবে। প্রকৃতির সাম্য থাকিলেও যখন বিকারের  
বৈষম্য দেখা যায়, তখন তাহার জায় বর্ণের দীর্ঘতাদিবশতঃ বৈষম্য থাকিলে, বিকারের বৈষম্য  
অবশ্যই হইবে। তাৎপর্য্যটীকাকার এইরূপেই পূৰ্বপক্ষবাদীর তাৎপর্য্য বর্ণন করিয়াছেন।  
তাহার ব্যাখ্যামুগারে পূৰ্বপক্ষবাদী—ত্ব ইকার-জাত বকার ও দীর্ঘ ঐকার-জাত বকারের বৈষম্য  
স্বীকার করিয়াই সিদ্ধান্তবাদীর কথার উত্তর বলিয়াছেন ইহা মনে হয়। অতথাপি তিনি দীর্ঘত্ব  
ও ত্ববশতঃ বর্ণের বৈষম্যহলে বিকারের বৈষম্য হইবে, এ কথা কিরূপে বলিবেন, ইহা  
সুদীর্ঘ চিন্তা করিবেন। কিন্তু ত্ব ইকার-জাত বকার হইতে দীর্ঘ ঐকার-জাত বকারের  
বৈষম্য প্রমাণ সিদ্ধ না হওয়ার, কেবল সমস্ত-রক্ষার পূৰ্বপক্ষবাদী উহা স্বীকার করিতে পারেন না।  
সিদ্ধান্তবাদীও উহা স্বীকার করিয়া নিবৃত্ত হইবেন না। প. ৬ সূত্রকার প্রথমে “বৈষম্য” শব্দের  
প্রয়োগ করিয়া, পরে “বিকল্প” শব্দেরই প্রয়োগ করিয়াছেন। তিনি “বর্ণবিকারবৈষম্যং” এইরূপ  
কথা বলেন নাই, এ সকল কথাও প্রণিধান করা আবশ্যিক। তাৎপর্য্যটীকাকার এখানে “বিকল্প”  
শব্দের দ্বারা বৈষম্য অর্থই ব্যাখ্যা করিয়াছেন, বুঝা যায়। কিন্তু “বিকল্প” শব্দের দ্বারা বিবিধ কল্প  
বা নানা প্রকারতা, এইরূপ অর্থ এখানে বুঝিতে পারি। প্রথম অধ্যায়ের শেষ সূত্রে ভাষ্যকারও  
“বিকল্প” শব্দের ঐরূপ অর্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাহা হইলে “বর্ণবিকারবিকল্পঃ”  
এই কথার দ্বারা বর্ণবিকারের নানা-প্রকারতা অর্থাৎ বর্ণবিকারের সাম্য ও বৈষম্য উভয়ই  
হয়, ইহা বুঝিতে পারি। তাহা হইলে এই সূত্রের দ্বারা পূৰ্বপক্ষবাদীর তাৎপর্য্য বুঝিতে  
পারি যে, যেমন দ্রব্যস্বরূপে তুল্য হইলেও—বটবীজাদি ও সুবর্ণাদি দ্রব্যরূপ প্রকৃতির  
বিকার-দ্রব্যের বৈষম্য হয়, প্রকৃতির তুল্যতাবশতঃ বিকারের তুল্যতা বা সাম্য হয় না,—তরূপ  
বর্ণস্বরূপে তুল্য ইকারাদি বর্ণের বিকার বকারাদি বর্ণের বিকল্প (নানা-প্রকারতা) হইয়া  
থাকে। অর্থাৎ বর্ণস্বরূপে তুল্য ই উ ঋ ঌ প্রভৃতি বর্ণের বিকার ব বর র প্রভৃতি বর্ণের বৈষম্য



হয়। এবং হ্রস্ব ইকার ও দীর্ঘ ঈকারের বিকার যকারের সাম্যই হয়। হ্রস্ব ইকার ও দীর্ঘ ঈকার বর্ণস্বরূপে ও ইবর্ণস্বরূপে তুল্য। হ্রস্ব ও দীর্ঘস্বতঃ ঐ উভয়ের বৈষম্য থাকিলেও তাহার বিকার যকারের বৈষম্যের আপত্তি করা যায় না। কারণ, তাহা হইলে দ্রব্যস্বরূপে তুল্য প্রকৃতির বিকারগুলির সর্বত্র তুল্যতা বা সাম্যেরও আপত্তি করা যায়। সুতরাং দ্রব্যস্বরূপে তুল্য নানা দ্রব্যের বিকারগুলির যেমন বৈষম্য হইতেছে, তজ্জপ বর্ণস্বরূপে তুল্য ইকারাদি বর্ণের বিকারগুলির বৈষম্যের দ্বায় কোন স্থলে সাম্যও হইতে পারে। বর্ণবিকারের এই সাম্য ও বৈষম্য-রূপ বিকল্পের কোন বাধক নাই। কারণ, প্রকৃতির সাম্য সত্ত্বেও যদি কোন স্থলে বিকারের বৈষম্য হইতে পারে, তাহা হইলে স্থলবিশেষে বিকারের সাম্য কেন হইতে পারিবে না? মূলকথা, হ্রস্ব ইকার ও দীর্ঘ ঈকারের যেমন হ্রস্ব ও দীর্ঘস্বরূপে ভেদ আছে, তজ্জপ বর্ণ ও ইবর্ণস্বরূপে অভেদও আছে। যে কোনরূপে প্রকৃতিদ্বয়ের ভেদ থাকিলেই যে তাহার বিকারদ্বয়ের সর্বত্র বৈষম্যই হইবে, ইহা স্বীকার করি না। বিকারে ঐরূপ প্রকৃতিভেদের অনুবিধান মানি না, ইহাই পূর্ণপক্ষাবারী তাৎপর্য্য মনে হয়। সুধীগণ সূত্রকারের গূঢ় তাৎপর্য্য চিন্তা করিবেন ॥৪৫॥

### সূত্র । ন বিকারধর্ম্যানুপপত্তেঃ ॥৪৬॥১৭৫ ॥

অনুবাদ। ( সিদ্ধান্তবাদী মহাবীর উত্তর ) না, অর্থাৎ যকার ইবর্ণের বিকার নহে, যেহেতু ( যকারে ) বিকার-ধর্ম্মের উপপত্তি ( সত্তা ) নাই।

ভাষ্য। অয়ং বিকারধর্ম্মো দ্রব্যসামান্যে, যদাত্মকং দ্রব্যং হ্রদ্বা স্তবর্ণং বা, তস্মাত্তানোহন্যয়ে পূর্ব্বো ব্যূহো নিবর্ত্ততে ব্যূহান্তরঙ্গোপজায়তে তং বিকারমাচক্ষতে, ন বর্ণসামান্যে কশ্চিচ্ছব্দাত্মাহন্যরী, য ইত্বং জহাতি, যত্বংপদ্যাতে। তত্র যথা সতি দ্রব্যভাবে বিকারবৈষম্যে নান্ননডুহোহন্যো বিকারো বিকারধর্ম্মানুপপত্তেঃ, এবমিবর্ণস্ত ন যকারো বিকারো বিকার-ধর্ম্মানুপপত্তেরিতি।

অনুবাদ। দ্রব্যমাত্রে ইহা বিকার-ধর্ম্ম। ( সে কিরূপ, তাহা বলিতেছেন ) মুক্তিকাই হউক, অথবা স্তবর্ণই হউক, দ্রব্য অর্থাৎ প্রকৃতি-দ্রব্য যৎস্বরূপ হইবে, ( বিকারদ্রব্যে ) সেই স্বরূপের অন্তর হইলে, পূর্ব্বব্যূহ ( আকারবিশেষ ) নিবৃত্ত হয়, এবং ব্যূহান্তর ( অন্তরূপ আকার ) জন্মে, তাহাকে ( পশুন্তগণ ) বিকার বলেন। ( কিন্তু ) বর্ণমাত্রে কোনও শব্দ-স্বরূপ অন্তরবিশিষ্ট নাই, যাহা ইত্ব ত্যাগ করে, এবং যত্ব প্রাপ্ত হয়। তাহা হইলে, দ্রব্যত্ব থাকিলে বিকারের বৈষম্য হইলে অর্থাৎ দ্রব্যমাত্রে দ্রব্যস্বরূপে সাম্যসত্ত্বেও বিকারের বৈষম্য হয়, ইহা স্বীকার

করিলেও যেমন বিকারধর্মের অসম্ভাবশতঃ অশ্ব বৃষের বিকার নহে, এইরূপ বিকার-ধর্মের অসম্ভাবশতঃ যকার ই-বর্ণের বিকার নহে।

টিপ্পনী। পূর্বপক্ষবাদীর পূর্বসূত্রোক্ত উত্তরখণ্ডনে সন্যাসীন যুক্তি থাকিলেও মহর্ষি তাহার উল্লেখ গ্রহণগোচর না করিয়া, এখন এই সূত্রের দ্বারা বর্ণের অবিকার পক্ষে মূল যুক্তিরই উল্লেখ করিয়াছেন। মহর্ষি বলিয়াছেন যে, যকার ই-বর্ণের বিকার হইতে পারে না। কারণ, বকারে বিকারধর্ম নাই। ভাষ্যকার মহর্ষির তাৎপর্য বুঝাইতে বলিয়াছেন যে, যুক্তিকাই হউক, আর স্ববর্ণই হউক, প্রকৃতি-দ্রব্য স্বরূপ, তাহার বিকারদ্রব্যে ঐ স্বরূপের অদ্বয় থাকে। অর্থাৎ যুক্তিকার বিকার যুক্তিকারিত, এবং স্ববর্ণের বিকার স্ববর্ণায়িত হইয়া থাকে। যুক্তিকা ও স্ববর্ণের পূর্বে যে ব্যূহ, অর্থাৎ আকৃতিবিশেষ থাকে, তাহার বিনাশ হয় এবং তাহার বিকার ঘটাদি দ্রব্য ও কুণ্ডলাদি দ্রব্যে অন্তরূপ আকারের উৎপত্তি হয়। বিকারপ্রাপ্ত দ্রব্যমাত্রেরই ইহা ধর্ম। উহাকেই বিকার বলে। পূর্বোক্তরূপ বিকারধর্ম না থাকিলে, কাহাকেও বিকার বলা যায় না। সর্বসম্ভব বিকারদ্রব্যে যাহা বিকারধর্ম, ঐরূপ বিকারধর্ম বর্ণনামাত্র নাই। কারণ, ইকারের স্থানে যে বকারের প্রয়োগ হয়—ঐ বকারে ইকারের অদ্বয় নাই। ইকার ইচ্ছা ত্যাগ করিয়া যত্ব প্রাপ্ত হয়—এ বিষয়ে কোন প্রশ্ন নাই। তাহা হইলে যেমন স্ববর্ণের বিকার কুণ্ডলকে স্ববর্ণায়িত বুঝা যায়, তদ্রূপ বকারকে ইকারায়িত বুঝা যাইত। পূর্বপক্ষবাদী দ্রব্যস্বরূপে তুল্য হইলেও স্ববর্ণ দি প্রকৃতিদ্রব্যের বিকার কুণ্ডলাদি দ্রব্যের যে বৈষম্য বলিয়াছেন, তাহা স্বীকার করিলেও সকল দ্রব্যই সকল দ্রব্যের বিকার হয় না। অশ্ব বৃষের বিকার হয় না। কেন হয় না? এতদ্ব্যতীত অশ্ব বিকারধর্ম নাই, ইহাই বলিতে হইবে; পূর্বপক্ষবাদীও তাহাই বলিবেন। তাহা হইলে ঐ দৃষ্টান্তে বিকারধর্ম না থাকায়, যকার ই-বর্ণের বিকার নহে, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। মূলকথা, বর্ণবিকার নাশন করিতে হইলে, দ্রব্যবিকারকেই দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু দ্রব্যবিকার হলে বিকারধর্ম যেরূপ দেখা যায়, ঐরূপ বিকারধর্ম কোন বর্ণেই না থাকায় বর্ণবিকার প্রশ্নসিদ্ধ হয় না। ৪৬।

ভাষ্য। ইতশ্চ ন সন্তি বর্ণবিকারাঃ—

অনুবাদ। এই হেতুবশতঃও বর্ণবিকার নাই—

সূত্র। বিকারপ্রাপ্তানামপুনরাপত্তেঃ ॥৪৭॥১৭৬॥

অনুবাদ। যেহেতু বিকারপ্রাপ্ত পদার্থগুলির পুনরাপত্তি অর্থাৎ পুনর্বিকার প্রকৃতিভাব-প্রাপ্তি হয় না।

ভাষ্য। অনুপপন্ন পুনরাপত্তিঃ। কথং? পুনরাপত্তেরননুমানা-  
দিত্তি। ইকারো যকারত্বমাপন্নঃ পুনরিকারো ভবতি, ন পুনরিকারস্ত  
স্থানে যকারস্ত প্রয়োগোহপ্রয়োগশ্চেত্যত্রানুমানং নাস্তি।



অনুবাদ । পুনরাপত্তি উপপন্ন হয় না, অর্থাৎ বর্ণের বিকার স্বীকার করিলে বর্ণের যে পুনরাপত্তি, তাহা উপপন্ন হয় না । ( প্রশ্ন ) কেন ? ( উত্তর ) যেহেতু পুনরাপত্তির অনুমান নাই, অর্থাৎ বিকারপ্রাপ্ত দধ্যাদি দ্রব্যের পুনরাপত্তি বিষয়ে কোন প্রমাণ নাই । ইকার বকারস্থ প্রাপ্ত হইয়া পুনর্ব্যার ইকার হয় । ইকারের স্থানে বকারের প্রয়োগ এবং অপ্ৰয়োগ, এবিধে অনুমান নাই, ইহা কিন্তু নহে, অর্থাৎ ঐ বিষয়ে প্রমাণ আছে ।

টিপ্পনী । মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা বর্ণের অবিকারপক্ষে আর একটি যুক্তি বলিয়াছেন যে, যে সকল পদার্থ বিকারপ্রাপ্ত, অর্থাৎ দধ্যাদি দ্রব্য, তাহাদিগের পুনরাপত্তি নাই । পুনরাপত্তি বলিতে এখানে পুনর্ব্যার প্রকৃতিভাব-প্রাপ্তি । দ্রবের বিকার দধি পুনর্ব্যার হুঙ্ক হয় না । সুতরাং বিকারপ্রাপ্ত পদার্থগুলির পুনরাপত্তি হয় না, ইহা স্বীকার্য্য । বর্ণের কিন্তু পুনরাপত্তি আছে । কারণ, ইকার বকারস্থ প্রাপ্ত হইয়া আবার ইকারস্থ প্রাপ্ত হয় । সুতরাং বকার ইকারের বিকার নহে, ইহা বুঝা যায় । ভাষ্যকার মহর্ষিঃ তাৎপর্য্য বুঝাইতে প্রথমে বলিয়াছেন যে, বর্ণের যে পুনরাপত্তি, তাহা বর্ণবিকার পক্ষে উপপন্ন হয় না । কারণ, বিকারপ্রাপ্ত পদার্থগুলির পুনরাপত্তি হয়, এবিধে কোন প্রমাণ নাই । দ্রবের বিকার দধি পুনর্ব্যার হুঙ্ক হইয়াছে, ইহা দেখা যায় না । ভাষ্যকার “অননুমানাৎ” এই বাক্যের দ্বারা প্রমাণসামান্যতাবকেই প্রকাশ করিয়াছেন । দধ্যাদি বিকার দ্রব্যের পুনর্ব্যার প্রকৃতিভাবপ্রাপ্তিরূপ পুনরাপত্তি বিষয়ে যেমন প্রমাণ নাই—তজপ ইকারের স্থানে বকারের প্রয়োগ ও অপ্ৰয়োগ-বিষয়ে অনুমান নাই, অর্থাৎ প্রমাণ নাই, ইহা বলা যায় না । ভাষ্যকার এই কথার দ্বারা বর্ণের পুনরাপত্তি-বিষয়ে প্রমাণ আছে, ইহাই বলিয়া বর্ণের বিকার স্বীকার করিলে বর্ণের প্রমাণবিহীন পুনরাপত্তি উপপন্ন হয় না, ইহা সমর্থন করিয়াছেন । ভাষ্যকারের গূঢ় তাৎপর্য্য এই যে, দধি+অজ্ঞ, এইরূপ বাক্যের দ্বিগুণ হইলে ব্যাকরণসূত্রানুসারে যেমন ইকারের স্থানে বকারের প্রয়োগ হয়, তজপ দ্বিগুণ নাই হইলে একপক্ষে ইকারের স্থানে বকারের অপ্ৰয়োগও হয় । অর্থাৎ “দধিজ্ঞ” এবং “দধি অজ্ঞ” এই দ্বিবিধ প্রয়োগই হইয়া থাকে । সুতরাং ইকার বকারস্থ প্রাপ্ত হইয়া পুনর্ব্যার ইকারস্থ প্রাপ্তও হয়, ইহা প্রমাণবিহীন । কিন্তু বকার ইকারের বিকার হইলে, ঐরূপ পুনরাপত্তি হইতে পারে না । কারণ, বিকারপ্রাপ্ত পদার্থের ঐরূপ পুনরাপত্তি হয় না ।

**সূত্র ।** সূবর্ণাদীনাং পুনরাপত্তেরহেতুঃ ॥৪৮॥১৭৭॥

অনুবাদ । ( পূর্ববাক্যবাদীর উত্তর )—সূবর্ণ প্রভৃতির পুনরাপত্তি হওয়ায় ( পূর্বসূত্রোক্ত হেতু ) অহেতু অর্থাৎ উহা হেতুভাস ।

ভাষ্য । অননুমানাদিতি ন, ইদং অননুমানং, সূবর্ণং কুণ্ডলত্বং হি স্মা রুচকত্বমাপদ্যতে, রুচকত্বং হি স্মা পুনঃ কুণ্ডলত্বমাপদ্যতে, এবমিকারোহপি বকারত্বমাপন্নঃ পুনরিকারো ভবতীতি ।

অনুবাদ । “অননুমানাৎ” এই কথা বলা যায় না । যেহেতু ইহা অনুমান আছে, ( সে কিরূপ, তাহা বলিতেছেন )—সুবর্ণ কুণ্ডলত্ব ত্যাগ করিয়া রুচকত্ব প্রাপ্ত হয়, রুচকত্ব ত্যাগ করিয়া পুনর্ব্বার কুণ্ডলত্ব প্রাপ্ত হয়, এইরূপ ইকারও যকারও প্রাপ্ত হইয়া পুনর্ব্বার ইকার হয় ।

টিপ্পনী । মর্শ্বি এই সূত্রের দ্বারা পূর্ব্বপক্ষবাদীর উত্তর বলিয়াছেন যে, পূর্ব্বসূত্রে বিকার-প্রাপ্ত পদার্থের পুনরাপত্তি নাই, এই যে হেতু বলা হইয়াছে, উহা অহেতু । কারণ, বিকারপ্রাপ্ত সুবর্ণাদি দ্রব্যের পুনরাপত্তি দেখা যায় । ভাষ্যকার ইহার ব্যাখ্যা করিতে পূর্ব্বসূত্র-ভাব্যোক্ত “অননুমানাৎ” এই কথার অম্ববাদ করিয়া বলিয়াছেন যে, উহা বলা যায় না । অর্থাৎ বিকার-প্রাপ্ত পদার্থের পুনরাপত্তি বিষয়ে অনুমান না থাকায়—বর্ণবিকারপক্ষে বর্ণের পুনরাপত্তি উপপন্ন হয় না, এই দ্বারা বলা হইয়াছে, তাহা বলা যায় না । কারণ, বিকারপ্রাপ্ত পদার্থের পুনরাপত্তি বিষয়ে অনুমান আছে । ভাষ্যকার ঐ অনুমান প্রদর্শন করিতে পরেই বলিয়াছেন যে, সুবর্ণ কুণ্ডলত্ব ত্যাগ করিয়া রুচকত্ব প্রাপ্ত হয়, রুচকত্ব ত্যাগ করিয়া পুনর্ব্বার কুণ্ডলত্ব প্রাপ্ত হয় । অর্থাৎ সুবর্ণ বিকারপ্রাপ্ত হইয়া কুণ্ডল হয় ; আবার ঐ কুণ্ডল বিকারপ্রাপ্ত হইয়া রুচক ( অথের আভরণ বিশেষ ) হয় । আবার ঐ রুচক বিকারপ্রাপ্ত হইয়া কুণ্ডল হইয়া থাকে । সুতরাং বিকারপ্রাপ্ত কুণ্ডলাদি সুবর্ণের পুনর্ব্বার প্রকৃতিভাবপ্রাপ্তিরূপ পুনরাপত্তি প্রমাণসিদ্ধ । তাহা হইলে ঐ দৃষ্টান্তে ইকারাদি বর্ণেরও পুনরাপত্তি সিদ্ধ হইবে । কুণ্ডলাদি সুবর্ণকে দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করিয়া বিকার-প্রাপ্ত বর্ণের পুনরাপত্তি সমর্থন করা যাইবে ॥ ৪৮ ॥

ভাষ্য । ব্যাভিচারাদননুমানং । যথা পয়ো দধিভাবমাপন্নং পুনঃ পয়ো ভবতি, কিমেবং বর্ণানাং পুনরাপত্তিঃ ? অথ সুবর্ণবৎ পুনরাপত্তিরিতি ।

অনুবাদ । ( উত্তর ) ব্যাভিচারবশতঃ অনুমান নাই । ( ব্যাভিচার বুঝাইতে ভাষ্যকার বলিতেছেন ) যেমন দুগ্ধ দধিহ প্রাপ্ত হইয়া পুনর্ব্বার দুগ্ধ হয়, এইরূপ বর্ণসমূহের পুনরাপত্তি কি ? অথবা সুবর্ণের দ্বায় পুনরাপত্তি ? [ অর্থাৎ দুগ্ধ যখন দধিহ প্রাপ্ত হইয়া পুনর্ব্বার দুগ্ধ হয় না, তখন দুগ্ধকে দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করিয়া বর্ণের পুনরাপত্তির অনুমান করা যায় না । সুতরাং পূর্ব্বোক্তরূপ অনুমানে দুগ্ধে ব্যাভিচার অবশ্য-স্বীকার্য্য । ]

ভাষ্য । সুবর্ণোদাহরণোপপত্তিঃ—

সূত্র । ন তদ্বিকারাণাং সুবর্ণভাবাব্যতিরেকাৎ ॥

॥৪৯॥১৭৮॥

অনুবাদ । ( উত্তর ) সুবর্ণরূপ উদাহরণের উপপত্তিও নাই, যেহেতু সেই সুবর্ণের বিকারগুলির ( কুণ্ডলাদির ) সুবর্ণত্বের ব্যতিরেক ( অভাব ) নাই ।



ভাষ্য। অবস্থিতং স্বর্ণং হীয়মানেনোপজায়মানেন চ ধর্ম্মেণ ধর্ম্মি ভবতি, নৈবং কশ্চিচ্ছব্দাত্মা হীয়মানেন ইত্থেন উপজায়মানেন যত্থেন ধর্ম্মী গৃহ্যতে। তস্মাৎ স্বর্ণোদাহরণং নোপপদ্যতে ইতি।

অনুবাদ। স্বর্ণ অবস্থিত থাকিয়াই ত্যজ্যমান ও জায়মান ধর্ম্মবিশিষ্ট ধর্ম্মী (কুণ্ডলাদি) হয়। এইরূপ, অর্থাৎ স্বর্ণের ন্যায় কোন শব্দ-স্বরূপ ত্যজ্যমান ইন্দ্র ও জায়মান যদ্ব-বিশিষ্ট ধর্ম্মীরূপে গৃহীত হয় না, অর্থাৎ প্রমাণ দ্বারা বুঝা যায় না। অতএব স্বর্ণরূপ উদাহরণ (দৃষ্টান্ত) উপপন্ন হয় না।

টিপ্পনী। ভাষ্যকার পূর্বপক্ষবাদীর কথার উত্তরে শেষে এখানে বলিয়াছেন যে, ব্যাভিচারবশতঃ অনুমান হইতে পারে না। এই ব্যাভিচার প্রকাশ করিতে পূর্বপক্ষবাদীকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন যে, যেমন ছদ্ম দণ্ডিত প্রাপ্ত হইয়া পুনর্বার ছদ্ম হয়, এইরূপ বর্ণসমূহের পুনরাপত্তি হয় কি? অর্থাৎ পূর্বপক্ষবাদী যেমন স্বর্ণকে দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করিয়া, পূর্বোক্তরূপ অনুমান বলিয়াছেন, তরূপ ছদ্মকে দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করিয়া, ঐরূপ অনুমান বলিতে পারেন কি? তাহা কিছুতেই পারেন না। কারণ, ছদ্ম দণ্ডিত প্রাপ্ত হইয়া পুনর্বার ছদ্ম হয় না। স্বর্ণের পুনরাপত্তি হইবেও তদ্বৎ পুনরাপত্তি হয় না। সুতরাং ছদ্মে ব্যাভিচারবশতঃ বিকারপ্রাপ্ত পদার্থমাত্রের পুনরাপত্তির অনুমান হইতে পারে না। পূর্বপক্ষবাদী যদি বলেন যে, আমি স্বর্ণাদির পুনরাপত্তি দেখাইয়া তদৃষ্টান্তে বিকারপ্রাপ্ত পদার্থমাত্রের অথবা ইকারাদি বর্ণের পুনরাপত্তির অনুমান করি নাই। পূর্বপক্ষবাদীর হেতুতে দোষ প্রদর্শনই আমি করিয়াছি। অর্থাৎ বিকারপ্রাপ্ত পদার্থ হইলেই তাহার পুনরাপত্তি হয় না, এই নিয়মে ব্যাভিচার প্রদর্শনের জরুরি আমি স্বর্ণাদির পুনরাপত্তি দেখাইয়াছি। বিকারপ্রাপ্ত স্বর্ণের দ্বারা বিকারপ্রাপ্ত বর্ণেরও পুনরাপত্তি হইতে পারে, ইহাই আমার চরম বক্তব্য। ভাষ্যকার শেষে এই দ্বিতীয় পক্ষের উল্লেখপূর্বক উহা খণ্ডন করিতে “স্বর্ণোদাহরণোপপত্তিষ্ঠ”, এই বাক্যের পূরণ করিয়া, স্বত্বের অবতারণা করিয়াছেন। ভাষ্যকারের ঐ বাক্যের সহিত স্বত্বের প্রথমতঃ “নঞ” শব্দের যোগ করিয়া স্বার্থ ব্যাখ্যা করিতে হইবে। ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য এই যে, পূর্বপক্ষবাদী পূর্বোক্তরূপ অনুমান দ্বারা ইকারাদি বর্ণের পুনরাপত্তি সমর্থন করিতে পারেন না। কারণ, ব্যাভিচারবশতঃ ঐরূপ অনুমান হইতেই পারে না—ইহা সহজেই বুঝা যায়। তাই মহর্ষি ঐ পক্ষের উপেক্ষা করিয়া দ্বিতীয় পক্ষের উত্তরে বলিয়াছেন যে, স্বর্ণরূপ উদাহরণও উপপন্ন হয় না। কারণ, স্বর্ণের বিকার কুণ্ডলাদির স্বর্ণব্ধের অভাব নাই, অর্থাৎ উহা স্বর্ণই থাকে। মহর্ষির

১। বহু পুস্তকেই স্বত্বের প্রথমে “নঞ” শব্দের উল্লেখ নাই এবং ভাষ্যকারের পূর্বোক্ত বাক্যের শেষেই “নঞ” শব্দের উল্লেখ আছে। কিন্তু ভারতবর্ষিক ও ভারতবর্ষানিবন্ধে স্বত্বের প্রথমেই “নঞ” শব্দ থাকায় এবং উহাই সমীচীন মনে হওয়ায়, ঐরূপই স্বত্বপাঠ গৃহীত হইয়াছে।

তাৎপর্য বর্ণন করিতে ভাষাকার বলিয়াছেন যে, স্ববর্ণ অবস্থিত থাকিয়াই কুণ্ডলাদিক্রম ধর্মী হইয়া থাকে। উহা পূর্ববর্তী আকার-বিশেষ-ত্যাগ করায়, ঐ আকার-বিশেষ-উহার ত্যজ্যমান ধর্মী। কুণ্ডলাদিতে যে আকার-বিশেষ জন্মে, তাহা উহার জায়মান ধর্মী। অর্থাৎ ঐ স্থলে স্ববর্ণরূপে স্ববর্ণই কুণ্ডলাদির প্রকৃতি। উহা বিকারপ্রাপ্ত হইলেও, উহা অবস্থিতই থাকে, অর্থাৎ স্ববর্ণের বিকার-স্থলে প্রকৃতির উচ্ছেদ হয় না। কিন্তু বর্ণের মধ্যে এমন কোন বর্ণ নাই, যাহা কেবল ইকারত্ব ত্যাগ করিয়া যকারত্ব প্রাপ্ত ধর্মিক্রমে প্রতীত হয়। ইকার যদি স্ববর্ণের জায় বিকারপ্রাপ্ত হইয়া, কুণ্ডলের জায় যকার হইত, তাহা হইলে ঐ যকারে (কুণ্ডলে স্ববর্ণের জায়) ইকার অবস্থিতই থাকিত, উহাতে অস্ত্র আকারে ইকার জ্ঞানের বিষয় হইত, ঐ স্থলে ইকাররূপ প্রকৃতির উচ্ছেদ হইত না। ফলকথা, যকারকে ইকারের বিকার বলিতে হইলে, ঐ স্থলে প্রকৃতির উচ্ছেদ অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে, সুতরাং যকারকে হৃদয়ের জায় বিকার-প্রাপ্ত বলিতে হইবে। কিন্তু তাহা হইলে, ইকারের পুনরাপত্তি হইতে পারে না। কারণ, হৃদয়ের জায় বিকারপ্রাপ্ত পদার্থের পুনরাপত্তি হয় না। ইকারকে স্ববর্ণের জায় বিকারপ্রাপ্ত ও বলা যায় না। কারণ, ঐরূপ বিকার-স্থলে প্রকৃতির উচ্ছেদ হয় না। সুতরাং বর্ণবিকার সমর্থন করিতে পূর্বপক্ষবাদীর স্ববর্ণরূপ উদাহরণও উপপন্ন হয় না। বেক্রম বিকারস্থলে প্রকৃতির উচ্ছেদ হয়, তাদৃশ বিকারপ্রাপ্ত পদার্থমাত্রেরই পুনরাপত্তি হয় না; এইরূপ নিয়মে ব্যাভিচার নাই—ইহাই মহাবির চরম তাৎপর্য।

ভাষ্য। বর্ণত্বাব্যতিরেকাদ্বর্ণবিকারানামপ্রতিষেধঃ।

বর্ণবিকারো অপি বর্ণত্বং ন ব্যভিচারন্তি, যথা স্ববর্ণবিকারঃ স্ববর্ণত্বমিতি। সামান্যবতো ধর্ম্যযোগো ন সামান্যস্য। কুণ্ডলরূচকৌ স্ববর্ণস্ত ধর্ম্যো, ন স্ববর্ণত্বস্ত, এবমিকারযকারো কস্ত বর্ণাত্মনো ধর্ম্যো? বর্ণত্বং সামান্যং, ন তস্মৈ ধর্ম্যো ভবিতুমহঁতঃ। ন চ নিবর্তমানো ধর্ম্য উপজায়মানস্ত প্রকৃতিঃ, তত্র নিবর্তমান ইকারো ন যকারস্তোপজায়মানস্ত প্রকৃতিরিতি।

অনুবাদ। (পূর্বপক্ষ) বর্ণবিকারগুলির বর্ণত্বের অভাব না থাকায়, প্রতিষেধ নাই। বিশদার্থ এই যে, যেমন স্ববর্ণের বিকার (কুণ্ডলাদি) স্ববর্ণত্বকে ব্যভিচার করে না, তদ্রূপ বর্ণবিকারগুলিও (যকারাদি বর্ণগুলিও) বর্ণত্বকে ব্যভিচার করে না। অর্থাৎ স্ববর্ণের বিকার কুণ্ডলাদিতে যেমন স্ববর্ণত্ব থাকে, তদ্রূপ ইকারাদির বিকার যকারাদি বর্ণেও বর্ণত্ব থাকে। (উত্তর) সামান্য-ধর্ম্য-বিশিষ্টের (স্ববর্ণের) ধর্ম্যযোগ আছে, সামান্য-ধর্ম্যের (স্ববর্ণত্বের) ধর্ম্যযোগ নাই। বিশদার্থ এই যে, কুণ্ডল ও রূচক স্ববর্ণের ধর্ম্য; স্ববর্ণত্বের ধর্ম্য নহে, এইরূপ, অর্থাৎ কুণ্ডল ও রূচকের জায়



ইকার ও যকার কোন বর্ণস্বরূপের ধর্ম্য হইবে? অর্থাৎ উহা কোন বর্ণেরই ধর্ম্য হইতে পারে না। বর্ণের সামান্য ধর্ম্য, এই ইকার ও যকার তাহার ( বর্ণের ) ধর্ম্য হইতে পারে না। নিবর্তমান ধর্ম্যও জায়মান পদার্থের প্রকৃতি হয় না, তাহা হইলে নিবর্তমান ইকার জায়মান যকারের প্রকৃতি হয় না।

উল্লিখিত। সিদ্ধান্তবাদী মহাবির পূর্বোক্ত কথা প্রতিনিবৃত্ত করিতে পূর্বপক্ষবাদী এখানে বাধা বলিতে পারেন, ভাষাকার এখানে তাহার উল্লেখপূর্বক খণ্ডন করিয়াছেন। পূর্বপক্ষবাদীর কথা এই যে, বর্ণবিকার সমর্থন করিতে স্ববর্ণরূপ উদাহরণ উপপন্ন হয় না—এই যে প্রতিবেদ, তাহা হয় না অর্থাৎ স্ববর্ণরূপ উদাহরণ উপপন্ন হয়। কারণ, স্ববর্ণের বিকার কুণ্ডলাদিতে যেমন স্ববর্ণের অভাব নাই, উহা যেমন স্ববর্ণই থাকে, তদ্রূপ বর্ণবিকার যকারদি বর্ণগুলিতেও বর্ণের অভাব নাই, উহা বর্ণই থাকে। সুতরাং স্ববর্ণের জায় বর্ণের বিকার বলা হইতে পারে। এতদ্বারা ভাষাকার বলিয়াছেন যে, স্ববর্ণ স্ববর্ণমাত্রের সামান্য ধর্ম্য। স্ববর্ণ এই সামান্যবান অর্থাৎ স্ববর্ণরূপ সামান্যধর্ম্যবিশিষ্ট ধর্ম্য। স্ববর্ণের বিকার কুণ্ডল ও কচক (অযান্তর) স্ববর্ণেরই ধর্ম্য, স্ববর্ণের ধর্ম্য নহে। কারণ, স্ববর্ণই কুণ্ডল ও কচকের প্রকৃতি বা উপাদানকারণ। স্ববর্ণজাতীয় অবয়ব-বিশেষেই কুণ্ডলাদি অবয়বী দ্রব্য সমবায়-সম্বন্ধে থাকে। কিন্তু ইকার ও যকার কোন বর্ণের ধর্ম্য নহে, উহা বর্ণমাত্রের সামান্যধর্ম্য—বর্ণেরও ধর্ম্য নহে। যেমন, কুণ্ডল ও কচকের উৎপত্তির পূর্বে তাহার উপাদান-কারণ স্ববর্ণ অবস্থিত থাকে, তাহা হইতে কুণ্ডল ও কচকের উৎপত্তি হয়, তদ্রূপ ইকার ও যকারের উৎপত্তির পূর্বে এমন কোন বর্ণ অবস্থিত থাকে না, বাহা হইতে ইকার ও যকারের উৎপত্তি হওয়ায়, উহা ইকার ও যকারের উপাদান বলিয়া ধর্ম্য হইবে। যকারোৎপত্তির পূর্বে অবস্থিত ইকারকেও এই যকারের প্রকৃতি বলা যায় না কারণ, যকারোৎপত্তি হইলে ইকার থাকে না, উহা নিবৃত্ত হয়। বাহা নিবর্তমান, তাহা জায়মানের প্রকৃতি হইতে পারে না। তাৎপর্যটীকাকার তাৎপর্য বর্ণন করিয়াছেন যে, নিবর্তমান ইকার জায়মান যকারের ধর্ম্য হয় না। কারণ, ধর্ম্য ও ধর্ম্যীর এককালীনরূপ থাকা আবশ্যিক। ফলকথা, যকারদি বর্ণে বর্ণ থাকিলেও কুণ্ডলাদি যেমন স্ববর্ণের ধর্ম্য, তদ্রূপ যকারদি বর্ণ কোন বর্ণের ও বর্ণমাত্রের সামান্য ধর্ম্য—বর্ণের ধর্ম্য হইতে না পারায়, স্ববর্ণবিকারের জায় উহাকে বিকার বলা যায় না। বর্ণবিকার সমর্থন করিতে স্ববর্ণরূপ উদাহরণ উপপন্ন হয় না। ভাষ্যোক্ত “বর্ণস্বাভাবিতেরকাত” ইত্যাদি এবং “সামান্যবস্তো ধর্ম্যযোগঃ” ইত্যাদি দুইটি সন্দর্ভ জায়বার্তিকাদি কোন কোন গ্রন্থে সূত্ররূপেই উল্লিখিত হইয়াছে, বুঝা যায়। কিন্তু “তাৎপর্যটীকা” ও “জায়হট্টানিবন্ধে” উহা সূত্ররূপে উল্লিখিত হয় নাই। বৃত্তিকার বিদ্যনাথও এই সন্দর্ভবস্তের বৃত্তি করেন নাই। সুতরাং উহা ভাবামুখেই গৃহীত হইয়াছে। ১৪২।

ভাষ্য। ইতচ্চ বর্ণবিকারানুপপত্তিঃ—

অনুবাদ। এই হেতুবশতঃও বর্ণবিকারের উপপত্তি হয় না।



সূত্র । নিত্যত্বেহবিকারাদনিত্যত্বে চানবস্থানাং ॥

॥৫০॥১৭৯॥

অনুবাদ । ( উত্তর ) যেহেতু ( বর্ণের ) নিত্যত্ব থাকিলে বিকার হয় না, এবং অনিত্যত্ব থাকিলে অবস্থান হয় না [ অর্থাৎ বর্ণকে নিত্য বলিলে, তাহার বিনাশ হইতে না পারায়, বিকার হইতে পারে না। অনিত্য বলিলেও বিকারকাল পর্য্যন্ত বর্ণের অবস্থান বা স্থিতি না থাকায় বিকার হইতে পারে না। ]

ভাষ্য । নিত্য বর্ণা ইত্যেতস্মিন্ পক্ষে ইকারযকারৌ বর্ণাবিত্যভয়ো-  
নিত্যত্বাদ্বিকারানুপপত্তিঃ । নিত্যত্বেহবিনাশিত্বাৎ কঃ কস্ত বিকার ইতি ।  
অথানিত্য বর্ণা ইতি পক্ষঃ, এবমপ্যনবস্থানাং বর্ণানাং । কিমিদমনবস্থানাং  
বর্ণানাং ? উৎপদ্য নিরোধঃ । উৎপদ্য নিরুদ্ধে ইকারে যকার উৎপদ্যতে,  
যকারে চোৎপদ্য নিরুদ্ধে ইকার উৎপদ্যতে, কঃ কস্ত বিকারঃ ?  
তদেতদবগৃহ্য সন্ধানে সন্ধায় চাবগ্রহে বেদিতব্যমিতি ।

অনুবাদ । বর্ণসমূহ নিত্য, এই পক্ষে ইকার ও যকার বর্ণ, এ জন্ম উভয়ের ( ঐ  
বর্ণদ্বয়ের ) নিত্যত্ববশতঃ বিকারের উপপত্তি হয় না। ( কারণ, ) নিত্যত্ব থাকিলে  
অবিনাশিত্ববশতঃ কে কাহার বিকার হইবে? যদি বর্ণসমূহ অনিত্য, ইহা পক্ষ হয়,  
অর্থাৎ বর্ণবিকারবাদী যদি বর্ণের অনিত্যত্ব-সিদ্ধান্তই গ্রহণ করেন, এইরূপ হইলেও  
বর্ণসমূহের অনবস্থান হয়। ( প্রশ্ন ) বর্ণসমূহের এই অনবস্থান কি? ( উত্তর )  
উৎপত্তির অনন্তর বিনাশ। ইকার উৎপন্ন হইয়া বিনষ্ট হইলে যকার উৎপন্ন হয়, এবং  
যকার উৎপন্ন হইয়া বিনষ্ট হইলে ইকার উৎপন্ন হয়, ( সূত্রাং ) কে কাহার বিকার  
হইবে? সেই ইহা, অর্থাৎ বর্ণের উৎপত্তির অনন্তর বিনাশরূপ অনবস্থান, অবগ্রহের  
( সন্ধি-বিশ্লেষের ) অনন্তর সন্ধি হইলে এবং সন্ধির অনন্তর অবগ্রহ হইলে বুঝিবে।

টিপ্পনী । বহুবিধ বর্ণের অবিকার-পক্ষে এই সূত্রের দ্বারা আর একটি বিশেষ যুক্তি বলিয়াছেন  
যে, বর্ণবিকারবাদী যদি বর্ণকে নিত্য বলেন, তাহা হইলে বর্ণের বিকার বলিতে পারেন না।  
কারণ, ইকার ও যকাররূপ বর্ণ নিত্য হইলে, উহার বিনাশ অসম্ভব বিনাশ ব্যতীতও বিকার  
হইতে পারে না। ইকার ও যকার অবিনাশী হইলে কে কাহার বিকার হইবে? আর  
বর্ণবিকারবাদী যদি বর্ণকে অনিত্য বলিয়াই স্বীকার করেন, তাহা হইলেও তিনি বর্ণের বিকার  
বলিতে পারেন না। কারণ, বর্ণ অনিত্য হইলে, বিকারের অব্যবহিত পূর্ব কাল পর্য্যন্ত বর্ণের  
অবস্থান না হওয়ায়, বিকার হইতে পারে না। সূত্রাং বর্ণের নিত্যত্ব ও অনিত্যত্ব, এই উত্তর



পক্ষেই যখন বর্ণের বিকার সম্ভব নহে, তখন বর্ণবিকার প্রামাণনিক নহে, উহা উপপন্নই হয় না। বর্ণমূলের অনবস্থান কি? এই প্রশ্নের উত্তরে উৎপত্তির অনন্তর বর্ণের বিনাশকে বর্ণের অনবস্থান বলিয়া ভাষ্যকার উহা বুকাইয়াছেন যে, ইকার উৎপন্ন হইয়া বিনষ্ট হইলে বকার উৎপন্ন হয়, এবং বকারও উৎপন্ন হইয়া বিনষ্ট হইলে, ইকার উৎপন্ন হয়—ইহাই ইকার ও বকারের অনবস্থান। বর্ণের অনিত্যত্বপক্ষে উহা অবশ্য সৌকার্য্য। সুতরাং বকারের উৎপত্তির অব্যবহিত পূর্বকালে ইকার না থাকায়, বকার ইকারের বিকার হইতে পারে না। এইরূপ কোন বর্ণই ত্রুই ক্ষণের অধিককাল অবস্থান না করায়, কোন বিকারের প্রকৃতি হইতে পারে না। দধি+অত্র, এইরূপ প্রয়োগে কোন সময়ে বকারের উৎপত্তির অনন্তর বিনাশ হয়, ইহা বলিতে ভাষ্যকার শেষে বলিয়াছেন যে, সন্ধিবিচ্ছেদপূর্বক সন্ধি করিলে এবং সন্ধি করিয়া পরে আবার সন্ধিবিচ্ছেদ করিলে উহা বুঝিবে। অর্থাৎ প্রথমে “দধি+অত্র” এইরূপ উচ্চারণ করিয়া পরে “দধাত্র” এইরূপ উচ্চারণ করে। এবং প্রথমে “দধাত্র” এইরূপ সন্ধি করিয়াও পরে “দধি+অত্র” এইরূপ অবগ্রহ করে। ভাষ্যে “অবগ্রহ” শব্দের অর্থ সন্ধির অভাব বা সন্ধিবিচ্ছেদ<sup>১</sup>। ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য পরে (৫০ সূত্রভাষ্যে) পরিস্ফুট হইবে ॥৫০॥

ভাষ্য। নিত্যপক্ষে তু তাবৎ সমাধিঃ—

অনুবাদ। নিত্য পক্ষেই সমাধান ( বলিতেছেন ), অর্থাৎ মহম্বি এই সূত্রের দ্বারা প্রথমে বর্ণ নিত্য, এই পক্ষেই জাতিবাদী পূর্বপক্ষীর বর্ণবিকার সমাধান বলিয়াছেন।

সূত্র। নিত্যানামতীন্দ্রিয়ত্বাৎ তদ্ব্যবিকম্পাচ্চ বর্ণবিকারানামপ্রতিষেধঃ ॥৫১॥১৮০॥

অনুবাদ। নিত্য পদার্থের অতীন্দ্রিয়ত্ববশতঃ এবং সেই নিত্য পদার্থের ধর্ম্মের বিকল্প অর্থাৎ বিবিধ-প্রকারতাবশতঃ বর্ণবিকারের প্রতিষেধ নাই। [ অর্থাৎ নিত্য পদার্থের মধ্যে যেমন অনেকগুলি অতীন্দ্রিয় আছে এবং অনেকগুলি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যও আছে, তদ্রূপ অন্যান্য নিত্য পদার্থ বিকারশূন্য হইলেও বর্ণরূপ নিত্য পদার্থকে বিকারী বলা যায়। সুতরাং বর্ণের নিত্যত্বপক্ষেও তাহার বিকারের প্রতিষেধ হইতে পারে না। ]

ভাষ্য। নিত্য। বর্ণা ন বিক্রিয়ন্ত ইতি বিপ্রতিষেধঃ। যথা নিত্যত্বে সতি কিঞ্চিদতীন্দ্রিয়মিন্দ্রিয়গ্রাহ্যশ্চ বর্ণাঃ, এবং নিত্যত্বে সতি কিঞ্চিন্ন বিক্রিয়তে, বর্ণাস্তু বিক্রিয়ন্ত ইতি।

১। অপ্রগ্রহোৎসাহিতা। দধি অত্রোক্তাকারি বধারোক্তাকারিত্বাৎ, বধারোক্তি বা। সম্ভার দধি অত্রোক্তবস্তুত্ব ইত্যর্থঃ।—তাৎপর্য্যটিকা।

বিরোধাদহেতুত্বধর্মবিকল্পঃ । নিত্যং নোপজায়তে নাপৈতি, অনুপজনাপায়ধর্মকং নিত্যং, অনিত্যং পুনরুপজনাপায়যুক্তং, ন চান্তরোগোপজনাপায়ৌ বিকারঃ সম্ভবতি । তদ্বাদি বর্ণা বিক্রিয়ন্তে নিত্যত্বমেবাং নিবর্ততে । অথ নিত্য। বিকারধর্মত্বমেবাং নিবর্ততে । সোহয়ং বিরুদ্ধো হেত্বাভাসো ধর্মবিকল্প ইতি ।

অনুবাদ । নিত্য বর্ণগুলি বিকৃত হয় না, এইরূপ প্রতিষেধ হয় না । ( কারণ ) যেমন নিত্য থাকিলে অর্থাৎ নিত্য হইলেও কোন বস্তু ( পরমাণু প্রভৃতি ) অতীন্দ্রিয়, এবং বর্ণগুলি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, এইরূপ নিত্য থাকিলে অর্থাৎ নিত্য হইলেও কোন বস্তু ( পরমাণু প্রভৃতি ) বিকৃত হয় না, কিন্তু বর্ণগুলি বিকৃত হয় ।

[ জাতিবাদীর এই সমাধানের খণ্ডন ]

বিরোধবশতঃ তদ্ব্যবহিকল্প ( জাতিবাদীর কথিত নিত্য পদার্থের ধর্ম-বিকল্প ) হেতু হয় না, অর্থাৎ ইহা বিরুদ্ধ নামক হেত্বাভাস । বিশদার্থ এই যে, নিত্য বস্তু জন্মে না, অপায়প্রাপ্ত ( বিনষ্ট ) হয় না, নিত্য বস্তু উৎপত্তি-বিনাশ-ধর্মবিশিষ্ট নহে । অনিত্য বস্তুই উৎপত্তি-বিনাশ-বিশিষ্ট । উৎপত্তি ও বিনাশ ব্যতীতও বিকার সম্ভব হয় না । সুতরাং বর্ণগুলি যদি বিকৃত হয়, তাহা হইলে এই বর্ণগুলির নিত্য নিবৃত্ত হয় । যদি ( বর্ণগুলি ) নিত্য হয়, তাহা হইলে এই বর্ণগুলির বিকারধর্মই নিবৃত্ত হয় । ( সুতরাং ) সেই এই ধর্মবিকল্প ( জাতিবাদীর কথিত হেতু ) বিরুদ্ধ হেত্বাভাস ।

টিপ্পনী । মহর্ষি পূর্বস্থলে বলিয়াছেন যে, বর্ণকে নিত্য বলিলেও তাহার বিকার হইতে পারে না, অনিত্য বলিলেও তাহার বিকার হইতে পারে না । মহর্ষির ঐ কথা উত্তরে পূর্বপক্ষ-বাদী কিরূপে জাতি নামক অন্তরুর বলিতে পারেন—ইহাও এখানে মহর্ষি বলিয়া, তাহার খণ্ডন করিয়াছেন । প্রথমে এই স্থলের দ্বারা বর্ণের নিত্যরূপকে জাতিবাদীর সমাধান বলিয়াছেন যে—বর্ণবিকারের প্রতিষেধ করা যায় না অর্থাৎ বর্ণ নিত্য হইলে তাহার বিকার হইতে পারে না—এই যে প্রতিষেধ, তাহা হয় না । কারণ, নিত্য পদার্থের নানাবিধ ধর্মরূপ ধর্মবিকল্প আছে । নিত্য পদার্থের মধ্যে পরমাণু প্রভৃতিতে অতীন্দ্রিয়ত্ব আছে, এবং গোত্র প্রভৃতিতে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যত্ব আছে, এবং বর্ণের নিত্য পক্ষে ঐ বর্ণরূপ নিত্য পদার্থেও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যত্ব আছে । তাহা হইলে নিত্য পদার্থ মাত্রই যে একরূপ, ইহা বলা যায় না । এইরূপ হইলে নিত্য পদার্থের মধ্যে পরমাণু প্রভৃতি অন্ত্যস্ত নিত্য পদার্থগুলি বিকারপ্রাপ্ত না হইলেও—বর্ণরূপ নিত্য পদার্থ বিকারপ্রাপ্ত হয়, ইহা বলা যাইতে পারে । যেনন, নিত্য পদার্থের মধ্যে অতীন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, এই দুই



প্রকারই আছে, তদ্রূপ নিত্য পদার্থের মধ্যে বিকারশূন্য ও বিকারপ্রাপ্ত—এই দুই প্রকারও থাকিতে পারে। সুতরাং বর্ণগুলি নিত্য হইলে বিকারপ্রাপ্ত হয় না—এইরূপ প্রতিষেধ করা যায় না। তাহা “বিপ্রতিষেধ” শব্দের দ্বারা পূর্ণোক্তরূপ প্রতিষেধের অভাবই কথিত হইয়াছে।

ভাব্যকার জাতিবাদের সমাধানের ব্যাখ্যা করিয়া শেষে উহা খণ্ডন করিতে বলিয়াছেন যে, জাতিবাদের কথিত হেতু “ধর্মবিকল্প”, বিরুদ্ধ নামক হেতুভাস, উহা হেতুই হয় না। অর্থাৎ জাতিবাদী যে বর্ণের বিকারিত্ব ও নিত্যত্ব, এই দুইটি ধর্ম স্বীকার করিয়া নিত্য বর্ণেরও বিকার সমর্থন করিতেছেন, তাহার স্বীকৃত ঐ ধর্মদ্বয় পরস্পর বিরুদ্ধ হওয়ার, উহা তাহার সাধ্যসাধক হয় না। কারণ, নিত্য পদার্থের উৎপত্তি ও বিনাশ নাই। উৎপত্তি ও বিনাশ না হইলে বিকার হইতেই পারে না। বিকার প্রাপ্ত হইলেই সেই পদার্থ জন্ম ও বিনাশী হইবে। সুতরাং বিকার-প্রাপ্ত পদার্থে নিত্যত্ব থাকিতে পারে না। বর্ণগুলিকে নিত্য বলিলে তাহার উৎপত্তি বিনাশ না থাকায়, বিকার হইতে পারে না। বর্ণগুলি বিকারপ্রাপ্ত বলিলে তাহার উৎপত্তি ও বিনাশ হওয়ার নিত্যত্ব থাকে না। কলকথা, বর্ণকে বিকারী বলিলে তাহার অনিত্যত্বই স্বীকার করিতে হইবে। তাহা হইলে বর্ণের নিত্যত্ব-সিদ্ধান্ত স্বীকার করিয়া, তাহার বিকারিত্ব স্বীকার করিতে গেলে ঐ বিকারিত্ব নিত্যত্ব-সিদ্ধান্তের ব্যাঘাতক হয়। এবং বর্ণের বিকারিত্ব স্বীকার করিয়া তাহার নিত্যত্ব স্বীকার করিতে গেলে, উহা বর্ণের বিকারিত্বের ব্যাঘাতক হয়। সুতরাং বিকারিত্ব ও নিত্যরূপ ধর্মদ্বয় পরস্পর বিরুদ্ধ হওয়ার, উহা সাধ্যসাধক হয় না। উহা বিরুদ্ধ নামক হেতুভাস। নিত্য পদার্থে অতীন্দ্রিয়ত্ব ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যত্ব, এই দুই ধর্ম থাকিতে পারে। কারণ, ঐ ধর্মদ্বয়ের সহিত নিত্যত্বের কোন বিরোধ নাই। অর্থাৎ নিত্যত্ব থাকিলেও কোন পদার্থে অতীন্দ্রিয়ত্ব এবং কোন পদার্থে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যত্ব থাকিবার বাধা নাই। কলকথা, জাতিবাদী বর্ণের নিত্যত্ব পক্ষে বর্ণবিকার সমর্থন করিতে যে উত্তর বলিয়াছেন, উহা “জাতি” নামক অসঙ্গত। মহাবি-বর্ণিত চতুর্বিংশতি প্রকার “জাতি”র মধ্যে উহার নাম “বিকল্পনমা জাতি। ৫ম অঃ, ১ম আঃ—৪ সূত্র ব্রটব্য ৥৫১৥

ভাব্য। অনিত্যপক্ষে সমাধিঃ—

অনুবাদ। অনিত্য পক্ষে অর্থাৎ বর্ণ অনিত্য, এই পক্ষে (মহাবি জাতিবাদী পূর্বপক্ষীর) সমাধান (বলিতেছেন)—

সূত্র। অনবস্থায়িত্বে চ বর্ণোপলব্ধিবৎ তদ্বিকারোপ-  
পত্তিঃ ॥৫২॥১৮১॥

অনুবাদ। অনবস্থায়িত্ব থাকিলেও অর্থাৎ অনিত্য বর্ণ অবস্থায়ী হইলেও বর্ণের উপলব্ধির স্থায় তাহার (বর্ণের) বিকারের উপপত্তি হয়।

ভাষা। যথাহ্নবস্থায়িনাং বর্ণানাং শ্রবণং ভবতি, এবমেবাং বিকারো ভবতীতি।

অসম্বন্ধাদসমর্থ্যার্থপ্রতিপাদিকা বর্ণোপলব্ধি বিকারেণ সম্বন্ধা-  
দসমর্থ্য, যা গৃহমাণা বর্ণবিকারমর্থমনুমাপয়েদিতি। তত্র যাদৃগিদং যথা  
গন্ধগুণা পৃথিব্যেবাং শব্দস্থাদিগুণাপীতি, তাদৃগেতদভবতীতি। ন চ  
বর্ণোপলব্ধিবর্ণনিবৃত্তৌ বর্ণান্তরপ্রয়োগস্ত নিবর্তিকা। যোহযমিবর্ণ-  
নিবৃত্তৌ যকারস্ত প্রয়োগো যদ্যয়ং বর্ণোপলব্ধা নিবর্ততে, তদা তত্রোপ-  
লভ্যমান ইবর্ণো যত্বমাপদ্যত ইতি গৃহ্যেত। তস্মাদ্বর্ণোপলব্ধিরহেতুর্বর্ণ-  
বিকারশ্চেতি।

অনুবাদ। যেমন অস্থায়ী বর্ণসমূহের শ্রবণ হয়, অর্থাৎ যেমন বর্ণের অনিত্যত্ব  
পক্ষে বর্ণগুলি শ্রবণকাল পর্য্যন্ত স্থায়ী না হইলেও তাহার শ্রবণরূপ উপলব্ধি হয়,  
এইরূপ এই বর্ণগুলির বিকার হয়।

[ জাতিবাদীর এই সমাধানের খণ্ডন ]

অর্থপ্রতিপাদিকা বর্ণোপলব্ধি, অর্থাৎ জাতিবাদী যাহাকে বর্ণবিকাররূপ পদার্থের  
সাধকরূপে গ্রহণ করিয়াছেন, সেই বর্ণোপলব্ধি ( বর্ণশ্রবণ ), সম্বন্ধের অভাববশতঃ,  
অর্থাৎ বর্ণবিকাররূপ সাধ্যের ব্যাপ্তি-সম্বন্ধ না থাকায় ( বর্ণবিকাররূপ সাধ্যসাধনে )  
অসমর্থ। যে বর্ণোপলব্ধি জ্ঞায়মান হইয়া বর্ণবিকাররূপ পদার্থকে অনুমান করাইবে,  
সেই বর্ণোপলব্ধি বিকারের সহিত, সম্বন্ধবশতঃ ( বর্ণবিকাররূপ সাধ্যসাধনে )  
অসমর্থ নহে। তাহা হইলে, “যেমন পৃথিবী গন্ধ-রূপ-গুণবিশিষ্ট, এইরূপ শব্দ  
স্থখাদিগুণবিশিষ্টও”—ইহা অর্থাৎ এই বাক্য যেরূপ, ইহা অর্থাৎ জাতিবাদীর  
পূর্বোক্তরূপ সমাধান সেইরূপ হয়। বর্ণের উপলব্ধি, বর্ণনিবৃত্তি হইলে বর্ণান্তরের  
প্রয়োগের নিবর্তকও নহে। বিশদার্থ এই যে, ইবর্ণের নিবৃত্তি হইলে এই যে যকারের  
প্রয়োগ, ইহা যদি বর্ণের উপলব্ধির দ্বারা নিবৃত্ত হয়, তাহা হইলে সেই স্থলে উপলভ্য-  
মান ইবর্ণ যকারস্থ প্রাপ্ত হয়, ইহা বুঝা যাউক ? অতএব বর্ণের উপলব্ধি বর্ণবিকারের  
হেতু অর্থাৎ সাধক হয় না।

টিপ্পনী। মহর্ষি বর্ণের নিত্যত্ব-পক্ষে জাতিবাদীর সমাধান বলিয়া, এই সূত্রের দ্বারা বর্ণের  
অনিত্যত্ব-পক্ষে জাতিবাদীর সমাধান বলিয়াছেন যে, বর্ণ অনিত্যত্ববশতঃ বহুকণস্থায়ী না হইলেও



যেমন বর্ণের শ্রবণরূপ উপলব্ধি হয়, তজ্জপ বর্ণের বিকার হয়। ভাষাকার স্বত্বাধীন করিয়া শেষে এখানেও জাতিবাদীর এই সমাধানের খণ্ডন করিয়াছেন। ভাষাকারের গূঢ় তাৎপর্য্য এই যে, জাতিবাদী বর্ণের বিকার-সাধনে 'বর্ণোপলব্ধি' এই কথার দ্বারা বর্ণের উপলব্ধিকে দৃষ্টান্ত বলিয়াছেন। কিন্তু কান হেতু বলেন নাই। হেতু ব্যতীত কেবল দৃষ্টান্ত দ্বারা কোন সাধ্য-সিদ্ধি হয় না। জাতিবাদী যদি ঐ বর্ণোপলব্ধিকেই বর্ণবিকাররূপ সাধ্যসাধনে হেতু বলেন, তাহা হইলে উহাতে বর্ণবিকাররূপ সাধ্য পদার্থের ব্যাপ্তিরূপ সম্বন্ধ থাকি আবশ্যিক। কারণ, ব্যাপ্তি না থাকিলে তাহা সাধ্যসাধক হেতু হয় না। সাধ্যের ব্যাপ্তিবিশিষ্ট বলিয়া গৃহ্যমান অর্থাৎ জ্ঞায়মান হইলেই তাহা সাধ্যসাধক হয়। জাতিবাদীর মতে যে বর্ণোপলব্ধি বর্ণবিকাররূপ সাধ্যের ব্যাপ্তিবিশিষ্টরূপে গৃহ্যমান হইয়া বর্ণবিকাের সাধন করিবে, তাহা ঐ বর্ণবিকাের সহিত ব্যাপ্তিরূপ সম্বন্ধপ্রযুক্তই বর্ণবিকার-সাধনে অসমর্থ হয় না, অর্থাৎ বর্ণবিকার সাধন করিতে পারে। কিন্তু বর্ণের উপলব্ধি হইলেই তাহার বিকার হইবে, এইরূপ নিয়ম না থাকায় বর্ণোপলব্ধিতে বর্ণবিকাের ব্যাপ্তিরূপ সম্বন্ধ নাই। সুতরাং উহা বর্ণবিকার সাধন করিতে অসমর্থ, উহা বর্ণবিকাররূপ সাধ্যসাধক হেতু হয় না। হেতু না হইলে কেবল ঐ বর্ণোপলব্ধিকে দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করিয়া বর্ণবিকার সাধন করা যায় না। সুতরাং "বর্ণের উপলব্ধির দ্বারা বর্ণের বিকার হয়"—এই কথা বলিয়া বর্ণের অনিত্যত্বকে জাতিবাদী যে উত্তর বলিয়াছেন, উহা জাতি নামক অসহজর। ব্যাপ্তির অপেক্ষা না করিয়া অর্থাৎ পৃথিবীতে শব্দাদি গুণের ব্যাপ্তি না থাকিলেও "পৃথিবী যেমন গন্ধ-রূপ-গুণ-বিশিষ্ট, তজ্জপ শব্দও সুগন্ধি রূপ-গুণ-বিশিষ্ট" এইরূপ কথা যেমন হয়, জাতিবাদীর পূর্বোক্ত কথাও তজ্জপ হইগাছে। মহর্ষি-কথিত চতুর্বিংশতি প্রকার জাতির মধ্যে উহা "সাধ্যসাধনা" জাতি। (৫।১২. স্বত্র দ্রষ্টব্য)। পূর্বপক্ষবাদী যদি বলেন যে, বর্ণোপলব্ধিতে বর্ণবিকাররূপ সাধ্যের ব্যাপ্তি না থাকিলেও উহা বর্ণের নিবৃত্তি হইলে বর্ণান্ত। প্রয়োগরূপ আদেশ-পক্ষের নিবর্তক, অর্থাৎ অভাবসাধক হওয়ায় পরিণেবে বর্ণবিকারপক্ষেরই সাধক হয়। অর্থাৎ বর্ণের নিবৃত্তি হইলে সেই বর্ণের উপলব্ধি হইতে পারে না। বাহা নিবৃত্ত বা বিনষ্ট, তাহার উপলব্ধি অর্থাৎ সেই বর্ণের শ্রবণ হওয়া অসম্ভব। কিন্তু যখন বর্ণের শ্রবণরূপ উপলব্ধি হয়, তখন বর্ণের নিবৃত্তি হয় না—ইহা স্বীকার্য্য। সুতরাং বর্ণের নিবৃত্তি হইলে বর্ণান্তরের প্রয়োগ হয়—ইহা বলাই যায় না। সুতরাং বর্ণের উপলব্ধিরূপ হেতু দ্বারা বর্ণের নিবৃত্তি হইলে বর্ণান্তর-প্রয়োগরূপ আদেশ-পক্ষের অভাবই সিদ্ধ হয়। তাহা হইলে পরিণেমে উহা দ্বারা বর্ণের বিকার-পক্ষই সিদ্ধ হইবে। এতদ্ব্যতীত ভাষাকার শেষে বলিয়াছেন যে, বর্ণোপলব্ধি বর্ণনিবৃত্তি হইলে বর্ণান্তর-প্রয়োগের নিবর্তক, অর্থাৎ অভাবসাধক হয় না। কারণ, "দধ্যত্র" এই প্রয়োগে "ই"কারের উপলব্ধি হয় না—ইহা সকলেরই স্বীকার্য্য। যদি ঐ স্থলে ইকারের নিবৃত্তি না হইত, তাহা হইলে ঐ স্থলে ইকারই বকারস্থ প্রাপ্ত হইয়া উপলভ্যমান হয়, ইহা বুঝা দায়িত। কিন্তু ঐ স্থলে বকারস্থপ্রাপ্ত ইকারের উপলব্ধি হয় না। সুবর্ণের বিকার কুণ্ডল দেখিলে আকারবিশেষপ্রাপ্ত সুবর্ণকেই দেখা যায় এবং সেইরূপ বুঝা যায়। কিন্তু "দধ্যত্র" এই প্রয়োগে "ই"কারের শ্রবণ না হওয়ায়, ঐ প্রয়োগে ইকারের নিবৃত্তি হয়—ইহা



স্বীকার্য। স্তম্ভরাং বর্ণোপলব্ধির দ্বারা বর্ণনিবৃত্তির অভাব সিদ্ধ করিয়া সিদ্ধান্তবাদীর সম্মত আদেশপদের অভাব সিদ্ধ করা যায় না ॥ ৫২ ॥

**সূত্র।** বিকারধর্মিত্বে নিত্যত্বাভাবাৎ কালান্তরে  
বিকারোপপত্তেশ্চা প্রতিষেধঃ ॥৫৩॥১৮২॥

অনুবাদ। ( সিদ্ধান্তবাদী মহর্ষির উত্তর ) বিকারধর্মিত্ব থাকিলে নিত্যত্ব না থাকায় এবং কালান্তরে বিকারের উপপত্তি হওয়ায়, অর্থাৎ বিকারী কোন পদার্থই নিত্য হইতে পারে না এবং বিকার কালান্তরেই হইয়া থাকে, এজন্য ( জাতিবাদীর পূর্বোক্ত ) প্রতিষেধ হয় না।

ভাষ্য। তদ্ব্যবিকল্পাদিত্যে ন যুক্তঃ প্রতিষেধঃ। ন খলু বিকার-  
ধর্মকং কিঞ্চিন্নিত্যমুপলভ্যত ইতি। বর্ণোপলব্ধিবাদিত্যে ন যুক্তঃ প্রতিষেধঃ।  
অবগ্রহে হি দধি অত্রৈতি প্রযুক্ত্য চিরং স্থিত্বা ততঃ সংহিতায়াং  
প্রযুক্ত্তে দধ্যাত্রৈতি। চিরনিবৃত্তে চায়মিবর্ণে যকারঃ প্রযুক্ত্যমানঃ কস্য  
বিকার ইতি প্রতীয়তে? কারণাভাবাৎ কার্য্যভাব ইত্যনুযোগঃ প্রসজ্যত  
ইতি।

অনুবাদ। “তদ্ব্যবিকল্পাৎ” এই কথাটির দ্বারা প্রতিষেধযুক্ত নহে। যেহেতু,  
বিকারধর্মবিশিষ্ট কোন বস্তু নিত্য উপলব্ধ হয় না। “বর্ণোপলব্ধিবৎ”—এই কথাটির  
দ্বারাও প্রতিষেধযুক্ত নহে। যেহেতু, অবগ্রহে অর্থাৎ সন্ধি না হইলে “দধি অত্র”  
এইরূপ প্রয়োগ করিয়া বহুক্ষণ থাকিয়া তদনন্তর সন্ধি হইলে “দধ্যত্র” এইরূপ প্রয়োগ  
করে। কিন্তু ইবর্ণ, অর্থাৎ দধি শব্দের ইকার বহুক্ষণ বিনষ্ট হইলে প্রযুক্ত্যমান এই  
যকার কাহার বিকার, ইহা বুঝা যায়? কারণের অভাবপ্রযুক্ত কার্য্যের অভাব  
হয়, এজন্য অনুযোগ ( পূর্বোক্তরূপ প্রশ্ন ) প্রসজ্যত হয়।

টিপ্পনী। মহর্ষি দুই সূত্রের দ্বারা উত্তরপক্ষে জাতিবাদীর সমাধান বলিয়া এই সূত্রের দ্বারা  
ঐ সমাধানের খণ্ডন করিয়াছেন। ভাষ্যকার নিজে পূর্বোক্ত দুই সূত্রের তাহেই জাতিবাদীর  
পূর্বোক্ত সমাধানের খণ্ডন করিয়া, সূত্র দ্বারা তাহাই সমর্থন করিতে এই সূত্রের অবতারণা করিয়া-  
ছেন। সূত্র ব্যাখ্যায় ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, পূর্বোক্ত প্রথম সূত্রে “তদ্ব্যবিকল্পাৎ” এই  
কথা বলিয়া এবং দ্বিতীয় সূত্রে “বর্ণোপলব্ধিবৎ” এই কথা বলিয়া জাতিবাদী যে প্রতিষেধ  
করিয়াছেন, তাহা হয় না, অর্থাৎ জাতিবাদী ঐ কথা বলিয়া সিদ্ধান্তবাদীর যুক্তির প্রতিষেধ করিতে



পারেন না। কারণ, অস্তিত্ব নিত্যপদার্থ অবিকারী হইলেও বর্ণরূপ নিত্যপদার্থের বিকার হইতে পারে, একথা কিছুতেই বলা যায় না। বিকারার্থী বা বিকারী পদার্থ হইলেই তাহা অনিত্য হইবে, ঐরূপ পদার্থ কখনই নিত্য হইতে পারে না। কারণ, উৎপত্তি ও বিনাশ ব্যতীত বিকার হইতেই পারে না। সাংখ্যসম্মত পরিশ্রমিনিত্য প্রকৃতি বা ঐরূপ কোন পদার্থ মহর্ষি গৌতম স্বীকার করেন নাই। তাই এখানে বলিয়াছেন, “বিকারধর্মিষে নিত্যবাতাবাৎ”।

বর্ণ অনিত্য হইলেও তাহার উপলব্ধির দ্বারা তাহার বিকার হইতে পারে, এই সমাধানের উত্তরে মহর্ষি বলিয়াছেন, “কালান্তরে বিকারোপপত্তেঃ”। অর্থাৎ কালান্তরে বিকার হইয়া থাকে। ভাব্যকার মহর্ষির কথা বুঝাইতে প্রকৃত স্থলের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, সন্ধির পূর্বে “দধি+অত্র” এইরূপ প্রয়োগ করিয়া অনেকক্ষণ পরে সন্ধি করিয়া, “দধ্যত্র” এইরূপ প্রয়োগ করিয়া থাকে। ঐ স্থলে যকারকে “দধি” শব্দের ইকারের বিকার বলিলে ঐ ইকারকে যকারের প্রকৃতিরূপ কারণ বলিতেই হইবে। কিন্তু পূর্বোক্ত দধি শব্দের ইকার বিনষ্ট হইলেই ঐ স্থানে যকারের প্রয়োগ হইয়া থাকে। বর্ণকে অনিত্য স্বীকার করিলে ঐ পক্ষে ইকারাদি বর্ণ দুইরূপ মাত্র অবস্থান কবে, অর্থাৎ উৎপত্তির তৃতীয় ক্ষণেই বর্ণের বিনাশ হয়, এই সিদ্ধান্তও স্বীকার করিতে হইবে। তাহা হইলে “দধি” শব্দের উচ্চারণের অনেকক্ষণ পরে সন্ধি করিয়া “দধ্যত্র” এইরূপ প্রয়োগ করিলে, তখন ঐ যকারের প্রকৃতি ইকার না থাকায় উহা বহুক্ষণ পূর্বে বিনষ্ট হওয়ার, ঐ যকার কাহার বিকার হইবে? এইরূপ অঙ্গযোগ বা প্রশ্ন উপস্থিত হয়। বর্ণবিকারবাদী ঐ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন না। কারণ, বর্ণের অনিত্যত্বক্ষে বর্ণবিকারবাদীর মতেও পূর্বোক্ত স্থলে ইকাররূপ কারণের অভাববশতঃ যকাররূপ বিকার হইতে পারে না। উহা ইকারের বিকার হইতে না পারিলে, আর কাহারই বিকার হইতে পারে না। ফলকথা, বিকার হইতে যে কাল পর্যন্ত প্রকৃতির থাকা আবশ্যিক, সে কাল পর্যন্ত বর্ণ থাকে না। দুই ক্ষণমাত্র স্থায়িবর্ণ বধন কালান্তরে অর্থাৎ বিকারের কালে থাকে না, তখন বর্ণের বিকার হইতে পারে না। বর্ণোৎপত্তির দ্বিতীয় ক্ষণেই তাহার বিকার সম্ভব হয় না। দধি+অত্র, এইরূপ বাক্যোচ্চারণের অনেকক্ষণ পরে “দধ্যত্র” এইরূপ প্রয়োগ হওয়ার, বর্ণবিকারবাদীকে কালবিলম্বে কালান্তরেই ঐ স্থলে বর্ণবিকার বলিতে হইবে। কিন্তু তখন কারণের অভাবে যকার কাহার বিকার হইবে? কাহারই বিকার হইতে পারে না। বর্ণের উপলব্ধি কালান্তরে হয় না। শ্রোতার শ্রবণদেশে যে শব্দ উৎপন্ন হয়, তাহার সহিত তৎকালেই শ্রবণেন্দ্রিয়ের সন্নির্কর্ষ (সম্বাদ) সম্ভব হওয়ার, দ্বিতীয় ক্ষণেই শ্রবণদেশোৎপন্ন বর্ণের শ্রবণরূপ উপলব্ধি হইতে পারে ও হইয়া থাকে। সুতরাং পূর্বপক্ষবাদী বর্ণের উপলব্ধিকে বর্ণবিকারের দৃষ্টান্তরূপে উল্লেখ করিতে পারেন না। ফলকথা, বর্ণের নিত্যত্ব ও অনিত্যত্ব এই উভয় মতেই বর্ণের বিকার উপপন্ন হয় না [৫৩]

ভাব্য। ইতচ্চ বর্ণবিকারানুপপত্তিঃ—

অনুবাদ। এই হেতুবশতঃও বর্ণবিকারের উপপত্তি নাই।



## সূত্র । প্রকৃতিনিয়মাৎ ॥৫৪॥১৮-৩॥ \*

অনুবাদ । যেহেতু প্রকৃতির নিয়ম নাই, অর্থাৎ বর্ণবিকারের প্রকৃতির নিয়ম না থাকায়, বর্ণবিকার উপপন্ন হয় না ।

ভাষ্য । ইকার-স্থানে যকারঃ শ্রুতং, যকার-স্থানে খন্ডিকারো বিধীয়তে, “বিধ্যতি” । তদ্ব্যদি স্মাৎ প্রকৃতিবিকারভাবে বর্ণানাং, তস্মৈ প্রকৃতিনিয়মঃ স্মাৎ ? দৃষ্টৌ বিকারধর্মিত্তে প্রকৃতিনিয়ম ইতি ।

অনুবাদ । ইকারের স্থানে যকার শ্রুত হয়, যকারের স্থানেও ইকার বিহিত হয়, ( যেমন ) “বিধ্যতি” । [ অর্থাৎ ব্যধ্-ধাতু হইতে ‘বিধ্যতি’ এইরূপ যে পদ হয়, তাহাতে “ব্যধ্” ধাতুর যকারের স্থানে ইকার হইয়া থাকে ], কিন্তু যদি বর্ণের প্রকৃতি বিকারভাব থাকে, ( তাহা হইলে ) সেই বিকারের প্রকৃতি নিয়ম থাকুক ? বিকার-ধর্মিত্ব থাকিলে প্রকৃতি নিয়ম দেখা যায় ।

টীকানী । মহর্ষি বর্ণের অবিকার-পক্ষে এই সূত্রের দ্বারা সর্বশেষে আর একটি যুক্তি বলিয়াছেন যে, প্রকৃতির নিয়ম না থাকায় বর্ণবিকার উপপন্ন হয় না । তাৎপর্য্য এই যে, বিকার-স্থলে সর্বত্রই প্রকৃতির নিয়ম থাকে । যে প্রকৃতি সে প্রকৃতিই থাকে, যে বিকৃতি সে বিকৃতিই থাকে । বিকার বা বিকৃতি কখনই প্রকৃতি হয় না । ছুন্দের বিকার দধি কখনও ছুন্দের প্রকৃতি হয় না । কিন্তু বর্ণের মধ্যে ইকারের স্থানে যেমন যকার হয়, তদ্রূপ “বিধ্যতি” ইত্যাদি প্রয়োগ-স্থলে যকারের স্থানেও ইকার হয় । তাহা হইলে বর্ণবিকারবাদীর মতে যকার যেমন ইকারের বিকার হয়, তদ্রূপ কোন স্থলে ইকারের প্রকৃতিও হয়, ইহা স্বীকার্য্য । কিন্তু বিকারস্থলে সর্বত্র যখন প্রকৃতির নিয়ম থাকে, ছদ্ম যখন দধির পক্ষে প্রকৃতিই হয়, বিকৃতি হয় না, তখন ঐ নিয়মানু-সারে বর্ণবিকারস্থলেও প্রকৃতির নিয়ম থাকা আবশ্যক, সে নিয়ম যখন নাই, তখন বর্ণের বিকার স্বীকার করা যায় না । “দধ্যত্ব” ইত্যাদি বাক্যে ইকারের স্থানে যকারের প্রয়োগরূপ আদেশ-পক্ষই স্বীকার্য্য । ৫৪ ।

## সূত্র । অনিয়মে নিয়মান্নানিয়মঃ ॥৫৫॥১৮-৪॥

অনুবাদ । ( পূর্বপক্ষ ) অনিয়মে নিয়ম থাকায়, অনিয়ম নাই [ অর্থাৎ পূর্বসূত্রে প্রকৃতির যে অনিয়ম বলা হইয়াছে, তাহা বলা যায় না ; কারণ, উহাকে নিয়মই বলিতে হইবে—উহা অনিয়ম নহে ] ।

\* প্রচলিত পুস্তকে উক্ত সূত্রপাঠের পরে “বর্ণবিকারানাং” এইরূপ অতিরিক্ত পাঠ আছে । কিন্তু ভাষ্যটী-  
নিকটে “প্রকৃতিনিয়মাৎ” এই পদ্যুত্তরই সূত্রপাঠে গৃহীত হইয়াছে ।



ভাষ্য । যোহয়ং প্রকৃতিরনিয়ম উক্তঃ, স নিয়তো যথাবিষয়ং ব্যবস্থিতো নিয়তত্বান্নিয়ম ইতি ভবতি । এবং সত্যনিয়মো নাস্তি, তত্র যদুক্তং ‘প্রকৃত্যানিয়মা’দিত্যেতদযুক্তমিতি ।

অনুবাদ । এই যে প্রকৃতির অনিয়ম বলা হইয়াছে, তাহা নিয়ত ( অর্থাৎ ) যথা-বিষয়ে ব্যবস্থিত, নিয়তত্ববশতঃ নিয়ম, ইহা হয় । এইরূপ হইলে, অর্থাৎ উহা নিয়ম হইলে অনিয়ম নাই, তাহা হইলে “প্রকৃত্যানিয়মাৎ” এই বাহা বলা হইয়াছে, ইহা অযুক্ত ।

টীকণী । মহর্ষির পূর্বসূত্রোক্ত কথায় প্রতিবাদী কিরূপে বাক্‌ছল করিতে পারেন, মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা তাহা বলিয়া পরবর্তী সূত্রের দ্বারা তাহার নিরাস করিয়াছেন । ছলবাদীর কথা এই যে, পূর্বসূত্রে প্রকৃতির যে অনিয়ম বলা হইয়াছে, তাহা বলা যায় না । কারণ, বাহাকে অনিয়ম বলিবে, তাহা বধন নিয়ত অর্থাৎ তাহা বধন যথাবিষয়ে ব্যবস্থিত, তখন তাহাকে নিয়মই বলিতে হইবে । বাহা নিজে নিয়ত, তাহা নিয়মই হয়, সুতরাং তাহা অনিয়ম হইতে পারে না, বাহা বস্ততঃ নিয়ম, তাহাকে অনিয়ম বলা যায় না । তাহা হইলে অনিয়ম বলিয়া কোন বাস্তব পদার্থই নাই । সুতরাং সিদ্ধান্তবাদী যে, প্রকৃতির অনিয়ম বলিয়াছেন, তাহা অযুক্ত । ৫৫।

সূত্র । নিয়মানিয়মবিরোধাদনিয়মে নিয়মাচ্চা-  
প্রতিষেধঃ ॥৫৬॥১৮৫॥

অনুবাদ । ( উত্তর ) নিয়ম ও অনিয়মের বিরোধবশতঃ এবং অনিয়মে নিয়ম-বশতঃ প্রতিষেধ হয় না, অর্থাৎ ছলবাদী পূর্বোক্তরূপ প্রতিষেধ করিতে পারেন না ।

ভাষ্য । নিয়ম ইত্যত্রার্থাভ্যনুজ্ঞা, অনিয়ম ইতি তস্ম প্রতিষেধঃ । অনুজ্ঞাতনিষিদ্ধয়োঃচ ব্যাঘাতাদনর্থাস্তরত্বং ন ভবতি, অনিয়মশ্চ নিয়তত্বান্নিয়মো ন ভবতীতি, নাত্রার্থস্ত তথাভাবঃ প্রতিষিধ্যতে, কিং তর্হি ? তথাভূতস্তার্থস্ত নিয়মশব্দেনাভিধায়মানস্ত নিয়তত্বান্নিয়মশব্দ এবোপপদ্যতে । সোহয়ং নিয়মাদনিয়মে প্রতিষেধো ন ভবতীতি ।

অনুবাদ । “নিয়ম” এই প্রয়োগে অর্থের (নিয়ম-পদার্থের) স্বীকার হয়, “অনিয়ম” এই প্রয়োগে তাহার প্রতিষেধ হয় । স্বীকৃত ও নিষিদ্ধ পদার্থের বিরোধবশতঃ অভিন্নপদার্থতা হয় না । এবং অনিয়ম নিয়তত্ববশতঃ নিয়ম হয় না । ( কারণ ) ইহাতে অর্থাৎ অনিয়মে নিয়ম আছে—এইরূপ বাক্যে অর্থের তথাভাব অর্থাৎ



অনিয়ম-পদার্থের অনিয়মত্ব—প্রতিষিদ্ধ হয় না। (প্রশ্ন) তবে কি? (উত্তর) নিয়ম শব্দের দ্বারা অভিধায়মান তথাভূত পদার্থের অর্থাৎ নিয়ম-পদার্থের সম্বন্ধে নিয়তবশতঃ নিয়ম শব্দই উপপন্ন হয়। (অতএব) অনিয়মে নিয়মবশতঃ সেই এই প্রতিষেধ (ছলবাদীর পূর্বোক্ত প্রতিষেধ) হয় না।

টীকন। ছলবাদীর পূর্বোক্ত কথার উত্তরে অর্থাৎ ছলবাদীর পূর্বোক্ত উত্তর যে বাক্যল, ইহা বুঝাইতে মহর্ষি এই হরের দ্বারা বলিয়াছেন যে, পূর্বোক্ত প্রতিষেধ হয় না, অর্থাৎ অনিয়মে নিয়ম থাকার অনিয়ম নাই, বাহ্যকে অনিয়ম বলা হয়, তাহা নিয়ত বলিয়া নিয়মই হয়, এইরূপ ছলবাদীর যে প্রতিষেধ তাহা অযুক্ত। কারণ, নিয়ম ও অনিয়ম বিরুদ্ধ পদার্থ। “নিয়ম”-শব্দের দ্বারা নিয়ম-পদার্থের স্বীকার এবং “অনিয়ম”-শব্দের দ্বারা ঐ নিয়মের প্রতিষেধ, অর্থাৎ অভাব বলা হয়। সুতরাং নিয়ম ও অনিয়ম পরস্পর বিরুদ্ধপদার্থ হওয়ার, উহা একই পদার্থ হইতে পারে না। বাহা অনিয়ম-পদার্থ, তাহা নিয়ম-পদার্থ হইতে পারে না। সুতরাং “নিয়ম”-শব্দের দ্বারা “অনিয়ম”-শব্দ থাকার উহার প্রতিপাদ্য অনিয়ম বা নিয়মের অভাব অবশ্য স্বীকার্য, উহা নিয়ম হইতে না পারার, উহাকে অনিয়মরূপ পৃথক পদার্থই স্বীকার করিতে হইবে। ছলবাদীর কথা এই যে, অনিয়ম যখন নিয়ত, অর্থাৎ যথাবিবয়ে ব্যবস্থিত, তখন উহা বস্তুতঃ নিয়ম-পদার্থ, অনিয়ম-পদার্থই নাই। মহর্ষি এতদুত্তরে প্রথমে নিয়ম ও অনিয়মের বিরোধ বলিয়া “অনিয়মে নিয়মাত্ত” এই কথার দ্বারা আরও বলিয়াছেন যে, অনিয়মে নিয়ম থাকার অনিয়ম-পদার্থ স্বীকারই করিতে হয়। কারণ, অনিয়ম-পদার্থই না থাকিলে তাহাতে নিয়ম থাকিবে কিরূপে? তাহা নিয়ত বা ব্যবস্থিত হইবে কিরূপে? বাহার অস্তিত্বই নাই তাহাকে কি নিয়ত বলা যায়? ভাষ্যকার মহর্ষির শেবোক্ত হেতুর ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন যে, “অনিয়মে নিয়ম আছে” এইরূপ কথা বলিলে অনিয়মের অনিয়মত্ব নাই, উহা নিয়ত বলিয়া নিয়ম-পদার্থ—ইহা প্রতিপন্ন হয় না। বাহা অনিয়ম-পদার্থ তাহা নিয়ত বলিয়া নিয়ম-পদার্থ হয় না, অনিয়ম-পদার্থ বুঝাইতে নিয়ম-শব্দের প্রয়োগ হয় না। কিন্তু “নিয়ম” শব্দের দ্বারা অভিধায়মান যে নিয়ম পদার্থ, তাহা বুঝাইতে নিয়মশব্দই উপপন্ন হয়। সুতরাং “অনিয়মে নিয়ম আছে” এইরূপ বাক্যে ঐ নিয়ম বুঝাইতে “নিয়ম” শব্দেরই প্রয়োগ হইয়া থাকে। কিন্তু উহার দ্বারা অনিয়ম পদার্থই নাই—ইহা বুঝা যায় না; অনিয়মের তথাভাব অর্থাৎ অনিয়মত্ব প্রতিষিদ্ধ হইয়া, উহাতে নিয়মত্ব প্রতিপন্ন হয় না। সুতরাং অনিয়মে নিয়ম আছে বলিয়া অনিয়ম-পদার্থে যে প্রতিষেধ তাহা অযুক্ত। ৫৬।

ভাষ্য। ন চেয়ং বর্ণবিকারোপপত্তিঃ পরিণামাৎ কার্য্যকারণভাবান্না, কিং তর্হি?

অনুবাদ। পরন্তু এই বর্ণবিকারের উপপত্তি পরিণামবশতঃ অথবা কার্য্যকারণ-ভাববশতঃ হয় না। (প্রশ্ন) তবে কি?



## মূত্র । গুণান্তরাপত্ত্যুপমর্দ-হ্রাস-বৃদ্ধি-লেশ- শ্লেষেভ্যস্ত বিকারোপপত্তের্বর্ণবিকারাঃ ॥৫৭॥১৮-৬॥

অনুবাদ । ( উত্তর ) গুণান্তরপ্রাপ্তি, উপমর্দ, হ্রাস, বৃদ্ধি, লেশ ও শ্লেষ-  
প্রযুক্তই বিকারের উপপত্তি হওয়ায় বর্ণবিকার হয়, অর্থাৎ বর্ণবিকার কথিত হয় ।

ভাষ্য । স্বাত্মাদেশভাবাদপ্রয়োগে প্রয়োগে বিকারশব্দার্থঃ,  
স ভিন্যতে, গুণান্তরাপত্তিঃ, উদান্তস্থানুদান্ত ইত্যেবমাদিঃ । উপমর্দো  
নাম একরূপনিবৃত্তৌ রূপান্তরোপজনঃ । হ্রাসো দীর্ঘস্থ হ্রস্বঃ, বৃদ্ধির্দীর্ঘস্থ  
দীর্ঘঃ, তয়োর্ব্বা প্লুতঃ । লেশো লাঘবঃ, “স্ত” ইত্যন্তের্ব্বিকারঃ । শ্লেষ  
আগমঃ প্রকৃতেঃ প্রত্যয়স্থ বা । এতএব বিশেষ্য বিকারা ইতি । এত  
এবাদেশাঃ, এতে চৈবিকারা উপপদ্যন্তে, তর্হি বর্ণবিকারা ইতি ।

অনুবাদ । স্থানিভাব ও আদেশভাববশতঃ অপ্রয়োগে প্রয়োগ অর্থাৎ একশব্দের  
প্রয়োগ না করিয়া তাহার স্থানে শব্দান্তরের প্রয়োগরূপ আদেশ “বিকার” শব্দের  
অর্থ । তাহা অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত বিকারপদার্থ ভিন্ন ( নানাপ্রকার ) হয় । ( যথা, )  
“গুণান্তরাপত্তি” অর্থাৎ কোন ধর্ম্মীর ধর্ম্মান্তরপ্রাপ্তি, ( যেমন ) উদান্ত স্বরের  
স্থানে অনুদাত্ত স্বর ইত্যাদি । “উপমর্দ” বলিতে এক ধর্ম্মীর নিবৃত্তি হইলে অন্য  
ধর্ম্মীর উৎপত্তি । “হ্রাস” দীর্ঘের স্থানে হ্রস্ব । “বৃদ্ধি” হ্রস্বের স্থানে দীর্ঘ, অথবা  
সেই দীর্ঘ ও হ্রস্বের স্থানে প্লুত । “লেশ” লাঘব, “স্তঃ” এই প্রয়োগে অস্ ধাতুর  
বিকার । “শ্লেষ” প্রকৃতি অথবা প্রত্যয়ের স্থানে আগম । এইগুলিই অর্থাৎ  
পূর্ব্বোক্ত “গুণান্তরাপত্তি” প্রভৃতিই বিশেষ বিকার । এইগুলিই আদেশ, এইগুলি  
যদি বিকার উপপন্ন হয়, তাহা হইলে বর্ণবিকার উপপন্ন হয় ।

টীকানী । মহর্ষি বর্ণবিকারপদের নিরাস করিয়া শেবে শব্দের আদেশপক্ষে বর্ণবিকার ব্যবহারের  
উপপাদন করিতে এই সূত্রটি বলিয়াছেন । মহর্ষির তাৎপর্য্য বর্ণন করিতে ভাষ্যকার প্রথমে  
বলিয়াছেন যে, পরিণামবশতঃ অথবা কার্য্যকারণভাববশতঃ বর্ণবিকারের উপপত্তি হয় না ।  
অর্থাৎ ইকারাদি বর্ণই বকারাদিরূপে পরিণত বা বিকারপ্রাপ্ত হয়, অথবা ইকারাদি বর্ণ বকারাদি  
বর্ণকে উৎপন্ন করে, উহাদিগের কার্য্যকারণভাব আছে, ইহা বলা যায় না । কারণ, বর্ণের এইরূপ  
পরিণাম অথবা ঐরূপ কার্য্যকারণভাব প্রমাণনীয় না হওয়ায়, উহা নাই । তবে কিরূপে বর্ণবিকারের  
উপপত্তি হয় ? সূত্রিকাল হইতে বর্ণবিকার কথিত হইতেছে কেন ? এতদ্বত্তরে ভাষ্যকার মহর্ষি-  
সূত্রের অবতারণা করিয়া সূত্রার্থ বর্ণন করিতে প্রথমে বলিয়াছেন যে, স্থানিভাব ও আদেশভাব-



বসন্তঃ এক শব্দের প্রয়োগ না করিয়া, তাহার স্থানে শব্দান্তরের যে প্রয়োগ হয়, তাহাই বর্ণবিকার, এই বাক্যে “বিকার” শব্দের অর্থ। অর্থাৎ ব্যাকরণশাস্ত্রের বিধানানুসারে এক শব্দের স্থানে শব্দান্তরের প্রয়োগরূপ আদেশ হওয়ার, শব্দের স্থানিতাব ও আদেশতাব আছে। সুতরাং এক শব্দের স্থানে শব্দান্তরের যে প্রয়োগ হয়, অর্থাৎ ইকারাদি বর্ণের প্রয়োগ না করিয়া, তাহার স্থানে যকারাদি বর্ণের যে প্রয়োগ হয়, উহাই বর্ণবিকার বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। অর্থাৎ উহাই বর্ণবিকারের সামান্য লক্ষণ। “গুণান্তরাপত্তি” প্রভৃতি বিশেষ বিকার। “গুণান্তরাপত্তি” বলিতে ধর্ম্মান্তর প্রাপ্তি। ধর্ম্মীর নিবৃত্তি হইবে না, কিন্তু তাহার ধর্ম্মান্তরপ্রাপ্তি হইলে উহাকে বলা হইয়াছে—“গুণান্তরাপত্তি”। যেমন উদাত্তস্বরের স্থানে অমৃদাত্তস্বরের বিধান থাকায়, সেখানে স্বরের অনৃদাত্তরূপ ধর্ম্মান্তরপ্রাপ্তি হয়। এক ধর্ম্মীর নিবৃত্তি হইলে, সেই স্থানে অল্প ধর্ম্মীর উৎপত্তিকে “উপমর্দ” বলে। যেমন অন্ ধাতুর স্থানে তু ধাতুর আদেশ বিহিত থাকায়, ঐ স্থলে অন্ ধাতুরূপ ধর্ম্মীর নিবৃত্তি ও তু ধাতুরূপ ধর্ম্মীর উৎপত্তি হয়। দীর্ঘের স্থানে হ্রস্ব বিধান থাকায়, উহাকে “হ্রাস” বলে। এবং হ্রস্বের স্থানে দীর্ঘেরও এবং হ্রস্ব ও দীর্ঘের স্থানে দ্রুতের বিধান থাকায়, উহাকে “বৃদ্ধি” বলে। “লেশ” বলিতে লাবব, অর্থাৎ শব্দের অংশবিশেষের নিবৃত্তি ও অংশবিশেষের অবস্থান। যেমন, “অন্” ধাতু-নিষ্পন্ন “স্তঃ” এই প্রয়োগে অন্ ধাতুর অকারের লোপ বিধান থাকায়, অকারের লোপ হইলে, “স”কার মাত্রের অবস্থান হয়। এখানে “অন্” ধাতু-রূপ শব্দের অপ্ৰয়োগে সকার মাত্রের প্রয়োগ হওয়ার, পূর্কোক্ত বিকারলক্ষণের বাধা হয় নাই, তাই ভাষ্যকার পূর্কোক্ত “লেশ”র উদাহরণ বলিতে অন্ ধাতুর বিকার বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। প্রকৃতি বা প্রত্যয়ের স্থানে যে আগম হয়, তাহার নাম “স্নেব”। পূর্কোক্ত গুণান্তরাপত্তি প্রভৃতি ছয় প্রকার বিশেষ বিকার। বসন্তঃ ঐগুলি আদেশ। ঐরূপ আদেশবিশেষ প্রযুক্তই বিকারের উপপত্তি হওয়ার, বর্ণবিকার কথিত হইয়া থাকে। অর্থাৎ গুণান্তরাপত্তি প্রভৃতিতেই বিকার বলিয়া বর্ণের বিকার বলা হইয়া থাকে। ঐগুলিকে যদি বিকার বলা যায়, তাহা হইলে বর্ণ বিকার উপপন্ন হয়। পূর্কপক্ষবাদীর অতিমত বর্ণবিকার কোনরূপেই উপপন্ন হয় না ৷৫৭৥

শব্দপরিণাম-প্রকরণ সম গু ।



সূত্র । তে বিভক্ত্যন্তাঃ পদং ॥৫৮॥১৮৭॥

অনুবাদ । সেই বর্ণসমূহ বিভক্ত্যন্ত হইয়া পদ হয় ।

ভাষ্য । যথাদর্শনং বিকৃতা বর্ণা বিভক্ত্যন্তাঃ পদসংজ্ঞা ভবন্তি । বিভক্তির্ব্যয়ী, নামিক্যাখ্যাতিকী চ । ব্রাহ্মণঃ পচতীত্বাদাহরণং । উপসর্গ-নিপাতান্তর্হি ন পদসংজ্ঞাঃ ? লক্ষণান্তরং বাচ্যমিতি । শিষ্যতে চ খলু নামিক্যা



বিভক্তেরব্যয়াল্লোপস্তয়োঃ পদসংজ্ঞার্থমিতি । পদেনার্থসম্প্রত্যয় ইতি  
প্রয়োজনং । নামপদকাধিকৃত্য পরীক্ষা গৌরিতি, পদং খন্দিদমুদাহরণং ।

অনুবাদ । যথাদর্শন অর্থাৎ যথাপ্রমাণ বিকৃত বর্ণসমূহ বিভক্ত্যন্ত হইয়া পদ-  
সংজ্ঞ হয় । বিভক্তি দ্বিবিধ, নামিকী ও আখ্যাতিকী : “ত্রাক্ষণঃ,” “পচতি” ইহা  
উদাহরণ । ( পূর্বপক্ষ ) তাহা হইলে অর্থাৎ পদের পূর্বোক্তরূপ লক্ষণ হইলে  
উপসর্গ ও নিপাত পদসংজ্ঞ হয় না ? ( পদের ) লক্ষণান্তর বক্তব্য । ( উত্তর ) সেই  
উপসর্গ ও নিপাতের পদসংজ্ঞার নিমিত্ত অব্যয় শব্দের উত্তর নামিকী বিভক্তির ( স্ত্র, ঔ,  
জস প্রভৃতি বিভক্তির ) লোপ শিষ্টই অর্থাৎ ব্যাকরণ-সূত্রের দ্বারা বিহিতই  
আছে । পদের দ্বারা অর্থের সম্প্রত্যয় ( যথার্থ-বোধ ) হয়, ইহা প্রয়োজন, অর্থাৎ  
ঐ জন্ত পদের নিরূপণ করা আবশ্যিক । এবং “গৌঃ” এই নাম পদকে আশ্রয় করিয়া  
( পদার্থের ) পরীক্ষা ( করিয়াছেন ) এই পদই অর্থাৎ “গৌঃ” এই নাম পদই  
( পদার্থপরীক্ষায় ) উদাহরণ ।

টিপ্পনী । মহর্ষি শব্দের প্রামাণ্য পরীক্ষা করিতে শব্দের অনিত্যত্বপক্ষের সমর্থনপূর্বক  
এবং বর্ণবিকার-পক্ষের খণ্ডন করিয়া বর্ণের আদেশপক্ষের সমর্থন দ্বারাও বর্ণের অনিত্যতা সমর্থন  
করিয়া, এই সূত্রের দ্বারা শব্দ প্রামাণ্যের উপযোগী পদ নিরূপণ করিয়াছেন । মহর্ষি বলিয়াছেন  
যে, পূর্বোক্ত বর্ণসমূহ বিভক্ত্যন্ত হইলে তাহাকে পদ বলে । মহর্ষি পূর্বসূত্রে ণ্যাস্তরাপত্তি  
প্রভৃতি বশতঃ বর্ণের আদেশরূপ বিকার স্বীকার করিয়াছেন । যে, পূর্বপক্ষবাদীর সম্মত বর্ণের  
প্রকৃতিবিকারভাব প্রমাণবোধিত বলিয়া মহর্ষি তাহা স্বীকার করেন নাই । তাই ভাব্যকার সূত্রার্থ  
বর্ণনার প্রথমে সূত্রোক্ত “তৎ” শব্দের অর্থ ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন, “যথাদর্শনং বিকৃতাঃ” । এখানে  
“দর্শন” শব্দের অর্থ প্রমাণ । যেহেতু প্রমাণ আছে তদনুসারে বিকৃত অর্থাৎ ণ্যাস্তরাপত্তি প্রভৃতি  
বশতঃ আদেশরূপে বিকৃত, ইহাই ভাব্যকারের ঐ কথাই তাৎপর্যার্থ্য । তাৎপর্যটীকার  
অভিসন্ধি বর্ণন করিতে বলিয়াছেন যে, বাহারা বর্ণব্যয় বর্ণাতিরিক্ত ফোটনামক পদ স্বীকার করেন,  
তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া মহর্ষি গৌতম এই সূত্রের দ্বারা বলিয়াছেন যে, পূর্বোক্ত বর্ণসমূহই পদ,  
উহা হইতে ভিন্ন “ফোট” নামক পদ নাই, উহা স্বীকার করা নিশ্চয়োজন । বর্ণসমূহের মধ্যে পূর্ব  
পূর্ব বর্ণের যথাক্রমে শ্রবণ ভজ যে সংস্কার জন্মে, তদ্বারা শেষে সকল বর্ণবিষয়ক বা পদবিষয়ক  
সমূহালম্বন স্মৃতি জন্মে । সুতরাং বর্ণসমূহরূপ পদের জ্ঞান পদার্থজ্ঞানের পূর্বে থাকিতে পারে না,  
এজন্য “ফোট” নামক অতিরিক্ত পদ স্বীকার্য—এই মত গ্রাহ্য নহে । তাৎপর্যটীকার  
পাতভ্রলম্বত ফোটবাদের সমর্থন করিয়া শেষে গৌতমসিদ্ধান্ত সমর্থন করিতে পূর্বোক্তরূপ

১। ণ্যাস্তরাপত্তাদিভিরাদেশরূপে বিকৃতাঃ, “যথাদর্শনং” যথাপ্রমাণ, ন তু প্রকৃতিবিকারভাবেন, তত  
প্রমাণবোধিতবাদিভার্থ্য :—তাৎপর্যটীকা ।



বিশেষ বিচার দ্বারা ফোটিবাদের নিরাস করিয়াছেন। মহর্ষি গোতম ফোটিবাদের নিরাস করিতে এই সূত্র বলিয়াছেন, ইহা তাৎপর্যটীকাকারের ব্যাখ্যাকৌশল বলা গেলেও মহর্ষি গোতম যে, ফোটিবাদী ছিলেন না, ইহা এই সূত্রের দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায়। সাংখ্যসূত্রেও (পঞ্চম অধ্যায়ে) ফোটিবাদের খণ্ডন দেখা যায়। নীমাংসাচার্য্য ভট্ট কুমারিল ও শাস্ত্রদীপিকাকার পার্শ্বনাথ নিম্ন এবং শারীরকভাষ্যকার আচার্য্য শঙ্কর এবং জরনৈয়ায়িক জয়ন্ত ভট্ট প্রভৃতি বিশেষ বিচারপূর্বক পাতঞ্জলসম্মত ফোটিবাদের নিরাস করিয়াছেন।

নব্য নৈয়ায়িকগণ বিভক্ত্যন্ত হইলে তাহাকে বাক্য বলিয়াছেন—পদ বলেন নাই। উহাদিগের মতে বিভক্তিগুলিও পদ। শক্তি বা লক্ষণাবশতঃ যে শব্দ দ্বারা কোন অর্থ বুঝা যায়, তাহাই পদ। স্তত্রাং প্রকৃতির দ্বারা সার্থক প্রত্যয়গুলিও পদ। তাহাদিগের অর্থও পদার্থ। অন্যথা প্রকৃতিপদার্থের সহিত তাহাদিগের অর্থের অদ্বয়বোধ হইতে পারে না। কারণ, পদার্থের সহিতই অপর পদার্থের অদ্বয়বোধ হইয়া থাকে। ত্রায়াচার্য্য মহর্ষি গোতমের এই সূত্রের দ্বারা কিন্তু নব্য নৈয়ায়িকদিগের সমর্থিত পুরোক্ত সিদ্ধান্ত সরলভাবে বুঝা যায় না। নব্য নৈয়ায়িক বৃত্তিকার বিখনাথ শেষে নব্যমতানুসারেও এই সূত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছেন<sup>১</sup>। কিরূপে ব্যাখ্যা মহর্ষির অভিमत বলিয়া মনে হয় না। ত্রায়মঞ্জরীকার জয়ন্ত ভট্টও পদার্থনিরূপণপ্রসঙ্গে গোতমমত সমর্থন করিতে বিভক্ত্যন্ত বর্ণনামুহুর্তেই পদ বলিয়াছেন<sup>২</sup>। ভাষ্যকার বাংলায়নও ঐ প্রাচীন মতকেই গ্রহণ করিয়া উহার স্পষ্ট ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ভাষ্যকার বলিয়াছেন, বিভক্তি দ্বিবিধ, “নামিকী” ও “আখ্যাতিকী”। “ব্রাহ্মণ” প্রভৃতি নামের উত্তর যে স্ব ও জন্ প্রভৃতি বিভক্তির প্রয়োগ হয়, তাহাকে বলে —“নামিকী” বিভক্তি। “পচ্” প্রভৃতি ধাতুর উত্তর যে তি তন্ অস্তি প্রভৃতি আখ্যাত বিভক্তির প্রয়োগ হয়, তাহাকে বলে, “আখ্যাতিকী” বিভক্তি। উহার মধ্যে যে কোন বিভক্তি বাহার অস্তে প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহাকে পদ বলে। ঐ বিভক্তির লোপ হইলেও তাহা পদ হইবে। বাহার অস্তে বিভক্তির প্রয়োগ বিহিত আছে, তাহাই “বিভক্ত্যন্ত” শব্দের দ্বারা এখানে বুঝিতে হইবে। ঐরূপ বর্ণাই পদ। বৃত্তিকার বলিয়াছেন, “বর্ণাঃ” এই বাক্যে বহুবচনের দ্বারা বহু অর্থ বিবক্ষিত নহে। উপসর্গ ও নিপাত নামক শব্দের উত্তর বিভক্তির প্রয়োগ না হওয়ায়, উহা সূত্রোক্ত পদ হইতে পারে না, স্তত্রাং উহাদিগের পদত্ব-সিদ্ধির জন্ত পদের লক্ষণান্তর বলা আবশ্যক। ভাষ্যকার এই পূর্বপক্ষের অবতারণা করিয়া তদন্তরে বলিয়াছেন যে, উপসর্গ ও নিপাত অব্যয় শব্দ। উহাদিগের পদ সংজ্ঞার জন্ত উহাদিগের উত্তরে স্ব ও জন্ প্রভৃতি নামিকী বিভক্তির প্রয়োগ বিধান ও অব্যয়ের উত্তর বিভক্তির লোপ বিধান হইয়াছে। স্তত্রাং সূত্রকারোক্ত পদ-

১। অথবা বিভক্তিবৃত্তিঃ, অন্তঃসম্বন্ধঃ, তেন বৃত্তিমতঃ পদমসিতি।—বিখনাথবৃত্তি।

২। ন জাতিঃ পদস্তার্থো ভবিতুমর্হতি, পদং হি বিভক্ত্যন্তো বর্ণনমুদ্যো ন প্রাতিপদিকমাত্রঃ।



লক্ষণ উপসর্গ ও নিপাতের অব্যাহত আছে।<sup>১</sup> এখানে পদনিক্রমণের প্রয়োজন কি? এইরূপ প্রশ্ন অবশ্যই হইতে পারে, এজন্য ভাষ্যকার শেষে বলিয়াছেন যে, পদের দ্বারা পদার্থের বার্থ বোধ হইয়া থাকে, ইহা প্রয়োজন। এবং “গোঃ” এই নাম পদকে আশ্রয় করিয়া মহর্ষি ইহার পরে পদার্থের পরীক্ষা করিয়াছেন। পদার্থ পরীক্ষার মহর্ষি “গোঃ” এই নাম পদকেই উদাহরণরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য এই যে, মহর্ষি শব্দের প্রামাণ্য পরীক্ষা করিতেই পূর্বোক্তরূপ নানা বিচার করিয়াছেন। পদের দ্বারা পদার্থের বার্থ বোধ হয় বলিয়াই, ঐ পদরূপ শব্দ প্রমাণ হইয়া থাকে। সুতরাং বার্থ শব্দবোধের সাধন পদ কাহাকে বলে, তাহা বলা আবশ্যক। পরন্তু মহর্ষি ইহার পরে পদার্থ কি—তাহাও বলিয়াছেন। তিনি পদার্থপরীক্ষার “গোঃ” এই নাম পদকেই উদাহরণরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। বাক্যে নাম পদেরই বাহুল্য থাকে, আখ্যাতিক বিভক্ত্যন্ত পদের ভেদে বাক্যের ভেদ হয়। সুতরাং নাম পদের বাহুল্যবশতঃ মহর্ষি নামপদকে অবলম্বন করিয়াই পদার্থ পরীক্ষা করিয়াছেন। সর্বপ্রকার পদার্থ পরীক্ষা তিনি করেন নাই। কিন্তু তাহা হইলেও সামান্ততঃ পদমাত্রের লক্ষণ মহর্ষির বক্তব্য। পদ কি তাহা না বলিলে কোন পদেরই অর্থ পরীক্ষা করা যায় না। পদের লক্ষণ না বুঝিলে পদার্থ নিক্রমণ বুঝা যায় না। তাই মহর্ষি পদার্থ নিক্রমণ করিতে এই প্রকরণের প্রারম্ভেই এই সূত্রের দ্বারা পদ নিক্রমণ করিয়াছেন। পরবর্তী সূত্রসমূহের সহিত এই সূত্রের পূর্বোক্তরূপ সম্বন্ধ থাকায়, এই সূত্রটি এই প্রকরণেরই অন্তর্গত হইয়াছে। এই সূত্রোক্ত লক্ষণানুসারে মহর্ষি “গোঃ” এই নাম পদকে আশ্রয় করিয়া ঐ (বিভক্ত্যন্ত) পদেরই অর্থ নিক্রমণ করিয়াছেন। সুতরাং পদনিক্রমণের পরে মহর্ষির পদার্থ নিক্রমণ অসম্ভব হয় নাই, ইহাও ভাষ্যকারের চরম বক্তব্য ॥৫৮॥

ভাষ্য। তদর্থ—

সূত্র। ব্যক্ত্যাকৃতি-জাতিসন্নিধাবুপচারাত্ সংশয়ঃ ॥

॥৫৯॥১৮-৮॥

অনুবাদ। “তদর্থ” অর্থাৎ পূর্বোক্ত “গোঃ” এই পদের অর্থবিষয়ে ব্যক্তি আকৃতি ও জাতির সন্নিধি থাকায় উপচার (প্রয়োগ) বশতঃ অর্থাৎ অবিনাশাবিশিষ্ট হইয়া বর্তমান ব্যক্তি, আকৃতি ও জাতিতে “গোঃ” এই পদের প্রয়োগ হওয়ায় (এই সমস্তই পদার্থ? অথবা উহার মধ্যে যে কোন একটি পদার্থ? এইরূপ) সংশয় হয়।

১। নব্য নৈয়ায়িক জগদীশ তর্কালঙ্কার উপসর্গ সার্থক হইলে, তাহাকে নিপাতই বলিয়াছেন। এবং নিপাতের পরে বিভক্তির প্রয়োগও তিনি দ্বীকার করেন নাই। উহার মতে কেবল নাম ও বাচ্যরূপ প্রকৃতির পরেই বিভক্তি প্রয়োগ হয়। ভাষ্যকার প্রাচীন শাস্ত্রিক-মতকেই গ্রহণ করিয়াছেন, বুঝা যায়। জগদীশ তর্কালঙ্কারের সিদ্ধান্ত কোন ব্যাকরণ-শাস্ত্রগ্রন্থে কথিত আছে কি না, ইহা অনুসন্ধান। শব্দশাস্ত্রের কাশিকার প্রকৃতি-লক্ষণ-ব্যাখ্যা জটী।

ভাষ্য । অবিনাভাববৃত্তিঃ সন্নিধিঃ । অবিনাভাবেন বর্তমানাস্থ ব্যক্ত্যা-  
কৃতি-জাতিবু “গো”রিতি প্রযুক্ত্যতে । তত্র ন জ্ঞায়তে কিমন্যতমঃ পদার্থ  
উত্তেতৎ সর্বমিতি ।

অনুবাদ । অবিনাভাববিশিষ্ট হইয়া বৃত্তি (বর্তমানতা) “সন্নিধি”, (অর্থাৎ সূত্রোক্ত  
“সন্নিধি” শব্দের অর্থ অবিনাভাববিশিষ্ট হইয়া বর্তমানতা) অবিনাভাববিশিষ্ট  
হইয়া বর্তমান ব্যক্তি আকৃতি ও জাতিতে অর্থাৎ গো ব্যক্তি, গোর আকৃতি ও গোর  
জাতি এই পদার্থত্রয় বুঝাইতে “গোঃ” এই পদ প্রযুক্ত হইয়া থাকে । তন্মধ্যে কি  
অন্যতম অর্থাৎ ঐ তিনটির যে কোন একটি পদার্থ ? অথবা এই সমস্তই পদার্থ ? ইহা  
জানা যায় না, অর্থাৎ ঐরূপ সংশয় হয় ।

টিপ্পনী । মহর্ষি “গোঃ” এই নাম পদের অর্থ পরীক্ষা করিতে প্রথমে এই সূত্রের দ্বারা ঐ  
পদার্থবিষয়ে সংশয় প্রদর্শন করিয়াছেন । গো নামক দ্রব্য-পদার্থকে গো-ব্যক্তি বলে । ঐ গোর  
অবয়ব-সংস্থানকে তাহার আকৃতি বলে । গো নামের অসাধারণ ধর্ম গোত্বকে উহার জাতি  
বলে । গো ব্যতীত অন্য কোথায়ও গোর আকৃতি ও গোত্ব থাকে না, গোত্ব না থাকিলেও গো  
এবং তাহার আকৃতি থাকে না । এইরূপে গো-ব্যক্তি গোর আকৃতি ও গোত্ব-জাতি এই তিনটির  
অবিনাভাবসম্বন্ধ বুঝা যায় । ঐ তিনটি পদার্থের মধ্যে কোনটি অপর দুইটিকে ছাড়িয়া অন্যত্র  
থাকে না, এজন্য উহার অবিনাভাবসম্বন্ধবিশিষ্ট হইয়া বর্তমান । সূত্রে ইহা প্রকাশ করিতেই  
“সন্নিধি” শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে । ভাষ্যকার প্রথমে সূত্রোক্ত “সন্নিধি” শব্দের অর্থ ব্যাখ্যা করিয়া  
সূত্রকার মহর্ষির তাৎপর্যানুসারে সূত্রার্থ বর্ণন করিয়াছেন যে, অবিনাভাববিশিষ্ট হইয়া বর্তমান  
ব্যক্তি আকৃতি ও জাতিতে অর্থাৎ ঐ পদার্থত্রয় বুঝাইতে “গোঃ” এই পদেরপ্রয়োগ হইয়া থাকে ।  
সুতরাং উহার মধ্যে গো-ব্যক্তি অথবা গোর আকৃতি অথবা গোত্ব-জাতিই “গোঃ” এই পদের অর্থ ?  
অথবা ঐ তিনটিই “গোঃ” এই পদের অর্থ ?—এইরূপ সংশয় হয় । ভাষ্যকারের তাৎপর্য বুঝা যায়,  
যে ব্যক্তি আকৃতি ও জাতির মধ্যে যে কোন একটিকে পদার্থ বলিয়া স্বীকার করিলেও অপর দুইটির  
বোধের কোন বাধা নাই । কারণ, ঐ তিনটি পদার্থই পরস্পর অবিনাভাবসম্বন্ধবিশিষ্ট । উহার  
যে কোন একটির বোধ হইলে, সেই সঙ্গে অপর দুইটির বোধ অবশ্যস্বাভাবী । পরন্তু কেবল ব্যক্তি  
অথবা কেবল আকৃতি অথবা কেবল জাতিই পদার্থ—উহাতেই পদের শক্তি, এইরূপ মতভেদও  
আছে । মহর্ষির সূত্রেও পরে ঐরূপ মতভেদের বীজ পাওয়া যাইবে । এবং ব্যক্তি আকৃতি ও  
জাতি এই পদার্থত্রয় বুঝাইতেই “গোঃ” এই পদের প্রয়োগ হয় । ঐ পদের দ্বারা পূর্বোক্ত তিনটি  
পদার্থই বুঝা যায় । সুতরাং ঐ তিনটিই পদার্থ, ইহাও সিদ্ধান্ত আছে । তাহা হইলে পূর্বোক্তরূপ  
যুক্তিমূলক বিপ্রতিপত্তিবশতঃ মধ্যস্থগণের পূর্বোক্তরূপ সংশয় হইতে পারে ।

এই সূত্রটি সর্বসম্মত নহে । কেহ কেহ ইহাকে ভাষ্যকারেরই বাক্য বলিয়াছেন । কিন্তু  
ভাষ্যতথ্যলোক ও ভাষ্যহট্টানিবন্ধে এইটি সূত্ররূপেই গ্রহীত হইয়াছে । তাহাতে সূত্রের প্রথমে



“তদর্থে” এই অংশ নাই। ভাষ্যকার প্রথমে “তদর্থে” এই বাক্যের পূরণ করিয়া স্বত্বের অবতারণা করিয়াছেন। বৃত্তিকার বিখ্যাত ও তাঁহার এই বিশ্বাস প্রকাশ করিয়াছেন ৫২।

ভাষ্য। শব্দস্য প্রয়োগসামর্থ্যাৎ পদার্থাবধারণং, তস্মাৎ,—

অনুবাদ। শব্দের প্রয়োগ-সামর্থ্যবশতঃ পদার্থ নিশ্চয় হয়, অতএব—

সূত্র। যাশব্দ-সমূহ-ত্যাগ-পরিগ্রহ-সংখ্যা-ব্রহ্মপ-  
চয়-বর্ণ-সমাসানুবন্ধানাং ব্যক্তাবুপচারাদব্যক্তিঃ ॥

॥৩০॥১৮৯॥

অনুবাদ। ( পূর্বপক্ষ ) “যা”শব্দ, সমূহ, ত্যাগ, পরিগ্রহ, সংখ্যা, বুদ্ধি, অপচয়, বর্ণ, সমাস, ও অনুবন্ধের ব্যক্তিতে উপচার অর্থাৎ প্রয়োগ হওয়ার ব্যক্তি, ( পদার্থ ) [ অর্থাৎ গো-ব্যক্তিই গোঃ এই পদের অর্থ; কারণ, সুত্রোক্ত “যা” শব্দ প্রভৃতির গো-ব্যক্তিতেই প্রয়োগ হইয়া থাকে ]।

ভাষ্য। ব্যক্তিঃ পদার্থঃ, কস্মাৎ ? “যা”শব্দপ্রভৃতীনাং ব্যক্তাবুপচারাৎ । উপচারঃ প্রয়োগঃ । যা গোঁস্তিষ্ঠতি, যা গোঁনিবধ্নেতি, মেদং বাক্যং জাতে-  
রভিধায়কমভেদাৎ, ভেদান্তু দ্রব্যাবিধায়কং । গবাং সমূহ ইতি ভেদাদ্দ্রব্য-  
বিধানং ন জাতেরভেদাৎ । বৈদ্যায় গাং দদাতীতি দ্রব্যস্য ত্যাগো ন জাতে-  
রমূর্ত্তহাৎ প্রতিক্রমানুক্রমানুপপত্তেচ্চ । পরিগ্রহঃ স্বত্বেনাভিসম্বন্ধঃ,  
কৌণ্ডিন্যস্য গোঁর্জ্ঞানস্য গোঁরিতি, দ্রব্যবিধানে দ্রব্যভেদাৎ সম্বন্ধভেদ  
ইতু্যপপন্নং, অভিমা তু জাতিরিতি । সংখ্যা—দশ গাবো বিংশতির্গাব  
ইতি, ভিন্নং দ্রব্যং সংখ্যায়তে ন জাতিরভেদাদিতি । বুদ্ধিঃ কারণবতো  
দ্রব্যস্বাবয়বোপচয়ঃ, অবরুদ্ধত গোঁরিতি, নিরবয়বো তু জাতিরিতি । এতেনাপ-  
চয়ো ব্যাখ্যাতে । বর্ণঃ—শুভ্রা গোঁঃ কপিলা গোঁরিতি, দ্রব্যস্য গুণযোগো  
ন সামান্যস্য । সমাসঃ—গোহিতং গোস্থখমিতি, দ্রব্যস্য স্থখাদিযোগো  
ন জাতেরিতি । অনুবন্ধঃ—দরূপপ্রজননসন্তানো গোঁর্গাং জনয়তীতি,  
তদ্বৎপতিধর্ম্মহাদ্রব্যে যুক্তং, ন জাতৌ বিপর্যয়াদিতি । দ্রব্যং ব্যক্তি-  
রিতি হি নার্থান্তরং ।

অনুবাদ। ব্যক্তি পদার্থ,—অর্থাৎ গো-ব্যক্তিই “গোঃ” এই পদের অর্থ।  
( প্রশ্ন ) কেন ? ( উত্তর ) যেহেতু—“যা”শব্দ প্রভৃতির ব্যক্তিতে উপচার আছে ।

উপচার বলিতে প্রয়োগ। ( ভাষ্যকার সূত্রার্থ বর্ণন করিয়া যথাক্রমে সূত্রোক্ত “বা” শব্দ প্রভৃতির প্রয়োগ প্রদর্শনপূর্বক সূত্রোক্তমতের প্রতিপাদন করিতেছেন। )

(১) “যে গো অবস্থান করিতেছে”, “যে গো নিমগ্ন আছে”, এই বাক্য অভেদ-বশতঃ অর্থাৎ গোত্ব জাতির ভেদ না থাকায়, জাতির বোধক নহে, কিন্তু ভেদবশতঃ অর্থাৎ গো-ব্যক্তিরূপ দ্রব্যের ভেদ থাকায় দ্রব্যের বোধক। (২) “গোর সমূহ” এই বাক্যে ভেদবশতঃ ( গো শব্দের দ্বারা ) দ্রব্যের বোধ হয়, অভেদবশতঃ জাতির ( গোত্বের ) বোধ হয় না। (৩) “বৈদ্যকে ( পণ্ডিতকে ) গো দান করিতেছে”—এই স্থলে দ্রব্যের ( গোর ) ত্যাগ ( দান ) হয়, অমূর্ত্ত্ববশতঃ এবং প্রতিক্রম ও অনুক্রমের অনুপপত্তিবশতঃ জাতির ( গোত্বের ) ত্যাগ হয় না। (৪) স্বত্বের সহিত সম্বন্ধ পরিগ্রহ, অর্থাৎ সূত্রোক্ত “পরিগ্রহ” শব্দের অর্থ স্বত্বসম্বন্ধ, (যথা) “কৌণ্ডিন্যের (কুণ্ডিন ঋষির পুত্রের) গো”, “ব্রাহ্মণের গো”, এই স্থলে ( গো শব্দের দ্বারা ) দ্রব্যের বোধ হইলে দ্রব্যের ভেদবশতঃ সম্বন্ধের ( স্বত্ব ) ভেদ, ইহা উপপন্ন হয়, কিন্তু জাতি অভিন্ন, অর্থাৎ গোত্ব জাতির ভেদ না থাকায়, তাহাতে স্বত্ব-সম্বন্ধের ভেদ হইতে পারে না। (৫) সংখ্যা—(যথা) “দশটি গো ; বিংশতিটি গো”। ভিন্ন অর্থাৎ ভেদবিশিষ্ট দ্রব্য ( গো-ব্যক্তি ) সংখ্যাত হয়, অভেদবশতঃ জাতি ( গোত্ব ) সংখ্যাত হয় না। (৬) কারণ-বিশিষ্ট দ্রব্যের অবয়বের উপচয় বুদ্ধি। (যথা) “গো বুদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। জাতি কিন্তু নিরবয়ব, অর্থাৎ গোত্ব জাতির অবয়ব না থাকায় তাহার পূর্বোক্তরূপ বুদ্ধি হইতে পারে না। (৭) ইহার দ্বারা অর্থাৎ সূত্রোক্ত বুদ্ধির ব্যাখ্যার দ্বারা (সূত্রোক্ত) অপচয় ব্যাখ্যাত হইল, অর্থাৎ গোত্ব জাতির অবয়ব না থাকায়, তাহার অপচয়ও ( হ্রাসও ) হইতে পারে না। বর্ণ (যথা) “শুভ্র গো,” “কপিল গো”। দ্রব্যের গুণসম্বন্ধ আছে, জাতির ( গুণসম্বন্ধ ) নাই। (৯) সমাস—(যথা) গোহিত, গোসুখ,—দ্রব্যের হুখাদি সম্বন্ধ আছে, জাতির ( হুখাদি সম্বন্ধ ) নাই। (১০) সরূপ-প্রজনন-সম্ভান অর্থাৎ সমানরূপ পদার্থের উৎপাদনরূপ সম্ভান “অনুবদ্ধ”। (যথা) “গো গোকে প্রজনন করে”। তাহা অর্থাৎ পূর্বোক্তরূপ প্রজনন উৎপত্তিধর্ম্মকত্ববশতঃ ( গো প্রভৃতি দ্রব্যের উৎপত্তিধর্ম্ম থাকায় ) দ্রব্যে যুক্ত হয়, বিপর্যায়বশতঃ অর্থাৎ উৎপত্তি ধর্ম্মকত্ব না থাকায়, জাতিতে যুক্ত হয় না।

দ্রব্য, ব্যক্তি, ইহা পদার্থান্তর নহে, অর্থাৎ গো নামক দ্রব্যকেই গো ব্যক্তি বলে, দ্রব্য ও ব্যক্তি একই পদার্থ।



উপলব্ধি। মহর্ষি “গোঃ” এই নাম পদকে গ্রহণ করিয়া পদার্থ পরীক্ষা করিতে পূর্বস্বত্বের দ্বারা সংশয় প্রশ্রয় করিয়া এই স্বত্বের দ্বারা ব্যক্তিই পদার্থ—এই পূর্বপক্ষের সমর্থন করিয়াছেন। যে পদের যে অর্থে প্রয়োগ হইয়া থাকে, ঐ প্রয়োগসামর্থ্যবশতঃ সেই অর্থই সেই পদের অর্থ বলিয়া অবধারণ করা যায়। ভাষ্যকার প্রথমে এই কথা বলিয়া “তদ্বাং” এই কথার দ্বারা পূর্বোক্ত ঐ হেতু প্রকাশ করিয়া মহর্ষির স্বত্বের অবতারণা করিয়াছেন। স্বত্রে “ব্যক্তিঃ” এই পদের পরে “পদার্থঃ” এই পদের অধ্যাহার মহর্ষির অভিপ্রেত। তাই ভাষ্যকার প্রথমে “ব্যক্তিঃ পদার্থঃ” এই কথা বলিয়া মহর্ষির বক্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। ভাষ্যকারের প্রথমোক্ত “তদ্বাং” এই পদের সহিত “ব্যক্তিঃ পদার্থঃ” এই বাক্যের যোগ করিয়া স্বত্বার্থ বুঝিতে হইবে।

মহর্ষি ‘ব্যক্তিই পদার্থ’ এই পক্ষ সমর্থন করিতে হেতু বলিয়াছেন যে, “বা” শব্দ প্রভৃতির ব্যক্তিতে উপচার হয়। ‘উপচার’ শব্দের অর্থ এখানে প্রয়োগ। “যং” শব্দের ত্রীনিবে প্রথমার একবচনে “বা” এইরূপ পদ সিদ্ধ হয়। “বা গৌত্তিষ্ঠতি” “বা গো নির্বধা” এইরূপ প্রয়োগে গো-ব্যক্তিতেই ঐ “বা” শব্দের প্রয়োগ হইয়া থাকে। কারণ, গোত্র জাতির ভেদ নাই। একই গোত্র সমস্ত গো-ব্যক্তিতে থাকে। তাহা হইলে “বা” এই শব্দের দ্বারা গোত্র জাতির বিশেষ প্রকাশ করা যায় না। গোত্র জাতি যখন অভিন্ন এক, তখন “যে গোত্র” এইরূপ কথা বলা যায় না। গো-ব্যক্তির ভেদ থাকায় “বা গোঃ” এই প্রয়োগে “বা” শব্দের দ্বারা ঐ গোর বিশেষ প্রকাশ করা যাইতে পারে। সুতরাং “বা গোঃ” এই প্রয়োগে “গোঃ” এই পদের দ্বারা গো নামক দ্রব্যই বুঝা যায়। “বা গৌর্গচ্ছতি” ইত্যাদি বাক্যে “বা” শব্দের গো ব্যক্তিতেই প্রয়োগ উপপন্ন হওয়ায়, ঐ বাক্যস্থ “গোঃ” এই পদের দ্বারা গো নামক দ্রব্যই বুঝা যায়, এই তাৎপর্যে ভাষ্যকার ঐ “বাক্যকে” দ্রব্যের বোধক বলিয়াছেন। এইরূপ “গবাং সমুঃ” এইরূপ বাক্যে গো নামক দ্রব্যেই সমূহের প্রয়োগ হওয়ায়, গো শব্দের দ্বারা গো নামক দ্রব্য অর্থাৎ গো-ব্যক্তিই বুঝা যায়। গোত্র জাতির ভেদ না থাকায়, তাহার সমুহ হইতে পারে না। সুতরাং ঐ বাক্যে গো শব্দের দ্বারা গোত্র জাতি বুঝা যায় না। এইরূপ “বৈব্যাকে (পণ্ডিতকে) গো দান করিতেছে” এই বাক্যে গো ব্যক্তিতেই দানের প্রয়োগ হওয়ায়, “গো” শব্দের গো-ব্যক্তিই অর্থাৎ গো নামক দ্রব্যই অর্থ, ইহা বুঝা যায়। গোত্র জাতি উহার অর্থ হইলে তাহার তাগ (দান) হইতে পারে না। কারণ, গোত্র জাতি অমূর্ত পদার্থ, অমূর্ত পদার্থের দান হইতে পারে না। প্রতিবাদী যদি বলেন যে, অমূর্তপদার্থ বলিয়া স্বতন্ত্রভাবে গোত্র জাতির দান হইতে না পারিলেও মূর্ত পদার্থ গোর সহিত গোত্র জাতির দান হইতে পারে। অর্থাৎ “গাং দদাতি” এইবাক্যে গোত্র জাতি গো শব্দের বাচ্যার্থ হইলেও কেবল গোত্র জাতির দান অসম্ভব বলিয়া, গো-ব্যক্তির সহিত গোত্রের দানই বুঝা যায়। গোত্র জাতির দান স্থলে বক্তব্যঃ গো ব্যক্তিরও দান হইয়া থাকে। ভাষ্যকার এই ভক্ত শেষে আর একটি হেতু বলিয়াছেন যে, প্রতিক্রম ও অহুক্রমের উপপত্তি হয় না। বৈবদান স্থলে দাতার যে প্রতিক্রম ও গ্রহীতার যে অহুক্রম, অর্থাৎ দাতার দান করিতে দেয় পদার্থে বাহা বাহা কর্তব্য এবং গ্রহীতার বাহা বাহা কর্তব্য, সে সমস্ত গোত্র জাতিতে উপপন্ন না হওয়ায়, গোত্রের দান হইতে পারে



না। গোত্র জাতিই গো শব্দের ব্যাচ্যর্থ হইলে “গাং দদাতি” এই বাক্যে যখন গোত্রের দান বৃত্তিতেই হইবে, তখন দাতা ও গ্রহীতার দান ও গ্রহণের সমস্ত অস্থান গোত্র জাতিতে হওয়া আবশ্যক। কিন্তু জলপ্রাচ্যাদি ব্যাপার গোত্র জাতিতে সম্ভব না হওয়ায়, গোত্রের দান হইতে পারে না। দাতার কোন কোন অস্থান গোত্র জাতিতে সম্ভব হইলেও তাহার বথাক্রমে কর্তব্য সমস্ত অস্থান গোত্র জাতিতে সম্ভব হয় না। ভাষ্যকার “প্রতিক্রম” শব্দের দ্বারা দাতার কর্তব্য প্রত্যেক ক্রম অর্থাৎ ক্রমিক সমস্ত অস্থান বা ব্যাপারকেই প্রকাশ করিয়াছেন, ইহা বুঝা যাইতে পারে। “অনুক্রম” শব্দের দ্বারা এখানে গণ্য্য কর্তব্য গ্রহীতার অস্থান বুঝা যাইতে পারে। অথবা প্রতিক্রমের যে অনুক্রম অর্থাৎ দাতার সমস্ত কর্তব্যের যে বথাক্রমে অস্থান, তাহা গোত্র জাতিতে উপপন্ন হয় না, ইহাও ভাষ্যকারের বিবক্ষিত হইতে পারে। সুবীণ ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য নির্ণয় করিবেন। উদ্যোতকর প্রভৃতি কেহই এখানে ভাষ্যার্থ ব্যাখ্যা করেন নাই। মূলকথা, গোত্র জাতির দান হইতে পারে না। সুতরাং “গাং দদাতি” এইরূপ বাক্যে “গো” শব্দের দ্বারা গো জব্যই বুঝা যায়, গোত্র জাতি বুঝা যায় না। এইরূপ, গোত্র জাতি ভিত্তির বলিয়া “কোণ্ডিন্যার গো”, “ব্রাহ্মণের গো” ইত্যাদি প্রয়োগে যে স্বত্ব সম্বন্ধের ভেদ বুঝা যায়, তাহা গোত্র জাতিতে সম্ভব হয় না। গো-ব্যক্তির ভেদ থাকায়, গো-ব্যক্তির স্বত্বভেদ সম্ভব হয়। সুতরাং এইরূপ প্রয়োগে “গো” শব্দের দ্বারা গো-জব্যই বুঝা যায়, গোত্র জাতি বুঝা যায় না। এইরূপ, সংখ্যা বৃদ্ধি ও হ্রাস, গো ব্যক্তিরই দর্শ, উহা গোত্র জাতিতে উপপন্ন হয় না। সুতরাং “দশটি গো” “গো বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে”; “গো কীল হইয়াছে” ইত্যাদি প্রয়োগে গো শব্দের দ্বারা গো জব্যই বুঝা যায়। এইরূপ, গোত্র জাতির গুণাদিবর্ণনা থাকায় “গুরু গো” “কপিল গো” এইরূপ প্রয়োগে গো শব্দের দ্বারা গো জব্যই বুঝা যায়, গোত্র জাতি বুঝা যায় না। এবং হিত ও অুখাদি শব্দের সহিত গো শব্দের সমাস হইলে “গোহিত” “গোমুখ” ইত্যাদি প্রয়োগ হয়। এই স্থলে গো-শব্দের দ্বারা গো জব্যই বুঝা যায়। গোত্র-জাতি বুঝা যায় না। কারণ, গোত্র জাতির হিত ও অুখাদি সম্বন্ধ নাই। গো শব্দের গোত্র জাতি অর্থ হইলে “গোহিত” “গোমুখ” এইরূপ সমাস হইতে পারে না। এবং “গো গোকৈ প্রজনন করে”—এইরূপ প্রয়োগে গো-শব্দের দ্বারা গো জব্যই বুঝা যায়। কারণ, গোত্র জাতি নিত্য, তাহার উৎপত্তি না থাকায়, প্রজনন হইতে পারে না। সমানরূপ জব্যের প্রজননরূপ সম্ভান (অনুবন্ধ) গো জব্যই সম্ভব হয়, নিত্য গোত্র জাতিতে সম্ভব হয় না। ভাষ্যকার বথাক্রমে সূত্রোক্ত “বা” শব্দ প্রভৃতির প্রয়োগ প্রদর্শন করিয়া, গো-জব্যই যে “গৌঃ” এই পদের অর্থ, ইহা প্রতিপাদন করিয়াছেন। আপত্তি হইতে পারে যে, “দা” শব্দ প্রভৃতির জব্যেই প্রয়োগ হওয়ায়, জব্যই “গৌঃ” এই পদের অর্থ, ইহা প্রতিপন্ন হইতে পারে, ব্যক্তিই পদার্থ, ইহা প্রতিপন্ন হইবে কেন? মহর্ষি তাহা কিরূপে বলিয়াছেন? এজন্ত ভাষ্যকার শেষে বলিয়াছেন যে, জব্য ও ব্যক্তি পদার্থান্তর নহে। অর্থাৎ বাহ্যকে জব্য বলে, তাহাকে ব্যক্তিও বলে। গো-জব্য ও গো-ব্যক্তি একই পদার্থ। সুতরাং “দা” শব্দ প্রভৃতির প্রয়োগবশতঃ—গো-জব্যই “গৌঃ” এই পদের অর্থ—ইহা প্রতিপন্ন হইলে, গো-ব্যক্তিই “গৌঃ” এই পদের অর্থ, ইহা প্রতিপন্ন হয়। ৬০।



ভাষ্য । অস্ত্ৰ প্ৰতিষেধঃ —

অনুবাদ । ইহাৰ অৰ্থাৎ ব্যক্তিই পদাৰ্থ, এই পক্ষৰ প্ৰতিষেধ (কৰিতেছেন) ।—

**সূত্ৰ । ন তদনবস্থানাং ॥৩১॥১৯০॥**

অনুবাদ । ( উত্তৰ ) না, অৰ্থাৎ ব্যক্তিই পদাৰ্থ নহে, যেহেতু সেই ব্যক্তিৰ অবস্থান অৰ্থাৎ ব্যবস্থা বা নিয়ম নাই ।

ভাষ্য । ন ব্যক্তিঃ পদাৰ্থঃ, কস্মাৎ ? অনবস্থানাং । “বা”শব্দ-প্ৰভৃতিভিৰ্যো বিশেষ্যতে স গো-শব্দার্থো বা গোপ্তিষ্ঠতি, বা গোৰ্নিৰ্ম্ময়েতি ন দ্ৰব্যমাত্ৰমবিশিষ্টং জ্ঞাত্য। বিনাহিভীযতে, কিং তৰ্হি ? জ্ঞাতিবিশিষ্টং, তস্মান্ন ব্যক্তিঃ পদাৰ্থঃ । এবং সমূহাদিবু দ্ৰষ্টব্যং ।

অনুবাদ । ব্যক্তি পদাৰ্থ নহে, ( প্ৰশ্ন ) কেন ? ( উত্তৰ ) যেহেতু ( ব্যক্তিৰ ) অবস্থান অৰ্থাৎ ব্যবস্থা বা নিয়ম নাই । “বা”শব্দ প্ৰভৃতিৰ দ্বাৰা বাহাকে বিশিষ্ট করা হয়, তাহা (গো-বিশিষ্ট) গো-শব্দেৰ অৰ্থ । “যে গো অবস্থান কৰিতেছে”, “যে গো নিৰ্দ্ধাৰ আছে” এইৰূপ প্ৰয়োগে জ্ঞাতি ব্যতীত, অৰ্থাৎ গো-জ্ঞাতিকে পৰিত্যাগ কৰিয়া অবশিষ্ট দ্ৰব্যমাত্ৰ ( গো-ব্যক্তি মাত্ৰ ) অভিহিত হয় না । ( প্ৰশ্ন ) তবে কি ? ( উত্তৰ ) জ্ঞাতিবিশিষ্ট, অৰ্থাৎ গো-বিশিষ্ট দ্ৰব্য অভিহিত হয় । অতএব ব্যক্তি পদাৰ্থ নহে । এইৰূপ সমূহাদিতে অৰ্থাৎ “গবাং সমূহঃ” ইত্যাদি প্ৰয়োগে বুঝিবে ।

টিপ্পনী । মহৰ্ষি এই সূত্ৰেৰ দ্বাৰা পূৰ্ব্বসূত্ৰোক্ত মতেৰ প্ৰতিষেধ কৰিতে বলিৱাছেন যে, ব্যক্তি পদাৰ্থ নহে । কাৰণ, ব্যক্তিৰ অবস্থান বা ব্যবস্থা নাই । অৰ্থাৎ ব্যক্তি অনাংখ্য ; কোন ব্যক্তি “গোঃ” এই পদেৰ অৰ্থ, ইহা পূৰ্ব্বোক্ত মতে বলা যায় না । উদ্যোতকৰ বলিৱাছেন যে, গো শব্দেৰ দ্বাৰা শুদ্ধ ব্যক্তিমাত্ৰ বুঝা যায় না । যদি গো শব্দ ব্যক্তি মাত্ৰেৰ বাচক হইত, তাহা হইলে যে কোন ব্যক্তি উহাৰ দ্বাৰা বুঝা যাইত—ইহাই সূত্ৰাৰ্থ । ভাষ্যকাৰ সূত্ৰকাণ্ডেৰ তাৎপৰ্য্য বৰ্ণন কৰিতে বলিৱাছেন যে, “বা” শব্দ প্ৰভৃতিৰ দ্বাৰা গো-বিশিষ্ট দ্ৰব্যকেই বিশিষ্ট করা হয়, অতঃপৰি উহাই গো শব্দেৰ অৰ্থ বলিতে হইবে । যে কোন দ্ৰব্য বা ব্যক্তি গো শব্দেৰ অৰ্থ নহে । “বা গোপ্তিষ্ঠতি” ইত্যাদি প্ৰয়োগে গো-না বুঝিৱা অবশিষ্ট দ্ৰব্য মাত্ৰ অৰ্থাৎ গো-ব্যক্তি মাত্ৰ “গোঃ” এই পদেৰ দ্বাৰা বুঝা যায় না । গো-ব্যক্তিৰ জ্ঞাতিবিশিষ্ট দ্ৰব্যই উহাৰ দ্বাৰা বুঝা যায় । তাহা হইলে গো-জ্ঞাতিই “গোঃ” এই পদেৰ অৰ্থ, ইহা বলিলে কোন অসুগুপপত্তি নাই । সৰ্ব্বত্রই যখন “গোঃ” এই পদেৰ দ্বাৰা গো-না বুঝিৱা শুদ্ধ গো-ব্যক্তি বুঝা যায় না, তখন গো-ই “গোঃ” এই পদেৰ অৰ্থ, গো-ব্যক্তি ঐ পদেৰ অৰ্থ নহে । ভাষ্যকাৰ এই তাৎপৰ্য্যই

শেষে বলিয়াছেন, “তদ্ব্যক্তিঃ পদার্থঃ”। এইরূপ “গবাং সমুহঃ” ইত্যাদি প্রয়োগেও গো-ব্যক্তি গো শব্দের অর্থ নহে। কারণ, গো-ব্যক্তিকে না বুঝিয়া শুধু গো-ব্যক্তির বোধ সেই সমস্ত স্থলেও হয় না। সুতরাং অসংখ্য গো-ব্যক্তিকে গো শব্দের অর্থ না বলিয়া, এক গো-ব্যক্তিকেই গো শব্দের অর্থ বলা উচিত, ইহাই ভাষ্যকারের চরম তাৎপর্য। পরে ইহা পরিষ্কৃত হইবে ৷৬১৷

ভাষ্য। যদি ন ব্যক্তিঃ পদার্থঃ, কথং তর্হি ব্যক্তাবুপচারঃ? নিমিত্তা-  
দতদভাবেহপি তদুপচারঃ দৃশ্যতে খলু—

অনুবাদ। যদি ব্যক্তি পদার্থ না হয়, তাহা হইলে ব্যক্তিতে উপচার (প্রয়োগ) হয় কেন? (উত্তর) নিমিত্তবশতঃ তদভাবে না থাকিলেও, অর্থাৎ গো প্রভৃতি ব্যক্তির গবাদি-শব্দ-বাচ্য না থাকিলেও তদুপচার অর্থাৎ গো প্রভৃতি ব্যক্তিতে সেই গবাদি শব্দের প্রয়োগ হয়। যেহেতু দেখা যায়—

সূত্র। সহচরণ-স্থান-তাদর্থা-বৃত্ত-মান-ধারণ-সামীপ্য-  
যোগ-সাধনাধিপত্যেভ্যো ব্রাহ্মণ-মঞ্চ-কট-রাজ-সত্ত্ব-  
চন্দন-গঙ্গা-শাটকান্ন-পুরুষেষতদভাবেহপি তদুপচারঃ  
॥৬২॥১১১॥

অনুবাদ। সহচরণ—স্থান, তাদর্থা, বৃত্ত, মান, ধারণ, সামীপ্য, যোগ, সাধন, ও আধিপত্য-প্রযুক্ত (যথাক্রমে) ব্রাহ্মণ, মঞ্চ, কট, রাজা, সত্ত্ব, চন্দন, গঙ্গা, শাটক, অন্ন ও পুরুষে তদভাবে না থাকিলেও, অর্থাৎ সেই সেই (যষ্টিকা প্রভৃতি) শব্দের বাচ্য না থাকিলেও তদুপচার অর্থাৎ সেই সেই শব্দের প্রয়োগ হয়।

ভাষ্য। “অতদভাবেহপি তদুপচারঃ” ইত্যতচ্ছন্দস্ত তেন শব্দেনাভিধান-  
মিতি। সহচরণাৎ—যষ্টিকাং ভোজয়েতি যষ্টিকাসহচরিতো ব্রাহ্মণোহভি-  
ধীয়ত ইতি। স্থানাৎ—মঞ্চাঃ ক্রোশন্তীতি মঞ্চস্থাঃ পুরুষা অভিধীয়ন্তে।  
তাদর্থাৎ—কটার্থেষু বীরণেষু ব্যহমানেষু কটং করোতীতি ভবতি। বৃত্তাৎ  
—যমো রাজা কুবেরো রাজেতি তদ্বদবর্তত ইতি। মানাৎ—আঢ়কেন  
মিতাঃ সত্ত্ববঃ আঢ়কসত্ত্বব ইতি। ধারণাৎ—তুলায়াং ধৃতং চন্দনং  
তুলাচন্দনমিতি। সামীপ্যাৎ—গঙ্গায়াং গাবশ্চরন্তীতি দেশোহভিধীয়তে  
সম্বিকৃষ্টঃ। যোগাৎ—কৃষ্ণেন রাগেণ যুক্তঃ শাটকঃ কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে।  
সাধনাৎ—অন্নং প্রাণা ইতি। আধিপত্যাৎ—অয়ং পুরুষঃ কুলং, অয়ং



গোত্রমিতি । তত্রায়ং সহচরণাদ্বোগাদ্বা জাতিশব্দে। ব্যক্তৌ  
প্রযুক্ত্য ইতি ।

অনুবাদ । “তস্তাব না থাকিলেও তদুপচার হয়”—এই কথার দ্বারা ( বুঝিতে  
হইবে ) “অতচ্ছব্দে”র অর্থাৎ যাহা সেই শব্দের বাচ্য নহে, এমন পদার্থের সেই  
শব্দের দ্বারা কথন ।

(১) সহচরণপ্রযুক্ত “যষ্টিকাকে ভোজন করাও”, এই প্রয়োগে ( যষ্টিকা শব্দের  
দ্বারা ) যষ্টিকা-সহচরিত ব্রাহ্মণ অভিহিত হয় । (২) স্থানপ্রযুক্ত “মঞ্চগণ রোদন  
করিতেছে”, এই প্রয়োগে ( মঞ্চ শব্দের দ্বারা ) মঞ্চস্থ পুরুষগণ অভিহিত হয় ।  
(৩) তাদর্শ্যপ্রযুক্ত কটার্থ বীরণসমূহ ( বেণা ) ব্যুহমান ( বিরচ্যমান )  
হইলে “কট করিতেছে” এইরূপ প্রয়োগ হয় । (৪) বৃত্ত অর্থাৎ আচরণ  
প্রযুক্ত “রাজা যম” “রাজা কুবের” এইরূপ প্রয়োগে ( রাজা ) তবৎ অর্থাৎ  
যম ও কুবেরের স্থায় বর্তমান, ইহা বুঝা যায় । (৫) পরিমাণ-প্রযুক্ত  
আটকপরিমিত সন্তু ( এই অর্থে ) “আটকসন্তু” এইরূপ প্রয়োগ হয় ।  
(৬) ধারণপ্রযুক্ত তুলাতে ধৃত চন্দন ( এই অর্থে ) “তুলাচন্দন” এইরূপ প্রয়োগ হয় ।  
(৭) সমীপ্যপ্রযুক্ত “গঙ্গায় গোসমূহ চরণ করিতেছে” এই প্রয়োগে ( গঙ্গা শব্দের  
দ্বারা ) সন্নিকট দেশ অর্থাৎ গঙ্গাতীর অভিহিত হয় । (৮) যোগপ্রযুক্ত কৃষ্ণবর্ণের  
দ্বারা যুক্ত শাটক ( বস্ত্র ) কৃষ্ণ, ইহা কথিত হয় । (৯) সাধনপ্রযুক্ত “অন্ন প্রাণ”  
ইহা কথিত হয় । (১০) আধিপত্যপ্রযুক্ত “এই পুরুষ কুল,” “এই পুরুষ গোত্র”,  
ইহা কথিত হয় । তন্মধ্যে অর্থাৎ পূর্বোক্ত সহচরণ প্রভৃতি দশটি নিমিত্তের মধ্যে  
সহচরণ অথবা যোগপ্রযুক্ত এই জাতি শব্দ, অর্থাৎ গোত্র-জাতির বাচক “গো” শব্দ  
ব্যক্তিতে ( গো-ব্যক্তি অর্থে ) প্রযুক্ত হয় ।

টিপ্পনী । ব্যক্তি পদার্থ নহে—অর্থাৎ গো-ব্যক্তি “গোঃ” এই পদের অর্থ নহে, ইহা পূর্বসূত্রে  
বলা হইয়াছে । ইহাতে অবশ্যই প্রশ্ন হইবে যে, তাহা হইলে “বা গোস্তিষ্ঠতি” ইত্যাদি প্রয়োগে  
গো-ব্যক্তিতে “গোঃ” এই পদের প্রয়োগ হয় কেন ? “গোঃ” এই পদের দ্বারা গো-ব্যক্তির যে বোধ  
হইয়া থাকে, ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে । কিন্তু গো-ব্যক্তি ঐ পদের অর্থ না হইলে, সে  
বোধ কিরূপে হইবে ? মহর্ষি পূর্বোক্ত মতে এই প্রশ্নের উত্তর দিতে এই সূত্রটি বলিয়াছেন । ভাব্যাকার  
প্রথমে পূর্বোক্তরূপ প্রশ্নের অবতারণা করিয়া মহর্ষির সূত্রোক্ত উত্তরের উল্লেখপূর্বক সূত্রের  
অবতারণা করিয়াছেন । সূত্রের “অতদ্বাবেহপি তদুপচারঃ” এই অংশের উল্লেখ করিয়া ভাব্যাকার  
প্রথমে উত্তর ব্যাখ্যা করিয়াছেন, “অতচ্ছব্দঃ হেন শব্দেনাভিধানং” । সেই শব্দ বাহার বাচক,  
এই অর্থে বহুব্রীহি সমাসে “তচ্ছব্দ” বলিতে বুঝা যায়, সেই শব্দের বাচ্য । সুতরাং “অতচ্ছব্দ”



শব্দের দ্বারা বাহা সেই শব্দের বাচ্য নহে—ইহা বুঝা যায়। বাহা “অতচ্ছদ” অর্থাৎ সেই শব্দের বাচ্য নহে—সেই পদার্থের সেই শব্দের দ্বারা যে কথন, তাহাই স্বত্রোক্ত “তদ্ভাব না থাকিলেও তদুপচার” এই কথার অর্থ। নিমিত্তবিশেষ প্রযুক্তই ঐরূপ উপচার হইয়া থাকে। নহবি সহচরণ প্রভৃতি দশটি নিমিত্তের উল্লেখ করিয়া তৎপ্রযুক্ত যথাক্রমে ব্রাহ্মণ প্রভৃতি দশটি পদার্থে পূর্বোক্তরূপ উপচার দেখাইয়া পূর্বোক্ত মতের সমর্থন করিয়াছেন। ভাষ্যকারও “গৌঃ” এই পদের গৌ-বাক্তিতে উপচার সমর্থন করিতে “দৃশ্যতে খলু” এই কথা বলিয়া স্বত্রকারোক্ত উপচারের ব্যাখ্যা করিয়া সহচরণাদি নিমিত্তবশতঃ উপচার প্রদর্শন করিয়াছেন। “দৃশ্যতে খলু” এই বাক্যে “খলু” শব্দটি হেতুর্থ।

“সহচরণ” বলিতে সাহচর্য্য বা নিয়তসম্বন্ধ। যষ্টির সহিত নিমিত্তিত ব্রাহ্মণবিশেষের ঐ সাহচর্য্য থাকায়, ঐ সহচরণরূপ নিমিত্তবশতঃ “যষ্টিকাকে ভোজন করাত”, এইরূপ বাক্যে যষ্টিকা শব্দের দ্বারা যষ্টিধারী ঐ ব্রাহ্মণবিশেষ কথিত হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণবিশেষ যষ্টিকা শব্দের বাচ্য নহে, কিন্তু সহচরণরূপ নিমিত্তবশতঃ পূর্বোক্ত স্থলে “যষ্টিকা”-সহচরিত ব্রাহ্মণবিশেষ অর্থে যষ্টিকা শব্দের প্রয়োগ হইয়া থাকে। যষ্টিকা শব্দের উহা লক্ষ্যার্থ। এইরূপ, মঞ্চস্থ পুরষগণ মঞ্চে অবস্থান করায়, ঐ স্থানরূপ নিমিত্তবশতঃ মঞ্চস্থ পুরুষে মঞ্চ শব্দের প্রয়োগ হয়। কট প্রস্তুত করিতে যে সকল বীরণ (বেণী) গ্রহণ করে, সেগুলিকে কটার্ণ বীরণ বলে। ঐ বীরণগুলিকে যে সময়ে বাহমান অর্থাৎ কটজ্ঞানক সংযোগবিশিষ্ট করিতে থাকে, তখন কট নিম্পন্ন না হইলেও “কট করিতেছে” এইরূপ প্রয়োগ হয়। ঐ স্থলে কট নির্কর্ত্ত্য কর্মকারক। কিন্তু উহা তখন নিম্পন্ন না হওয়ার ক্রিয়ার নিমিত্ত হইতে না পারায়, কর্মকারক হইতে পারে না। সুতরাং ঐ স্থলে পূর্বসিদ্ধ বীরণই কটের তানর্থ্যবশতঃ কট শব্দের প্রয়োগ হয়, অর্থাৎ কটার্ণ বীরণকেই তানর্থ্যরূপ নিমিত্তবশতঃ কট বলা হয়, ইহা বুঝিতে হইবে। ঐ স্থলে বাহমান ঐ বীরণই “কট” শব্দের লাক্ষণিক অর্থ। এইরূপ, কোন রাজার ঘরের ভায় বৃত্ত (আচরণ) থাকিলে, ঐ বৃত্তরূপ নিমিত্তবশতঃ ঐ রাজাকে বন বলা হয়। কুশেরের ভায় বৃত্ত থাকিলে তন্নিমিত্ত রাজাকে কুশের বলা হয়। আটক পরিমাণবিশেষ। ঐ আটকপরিমিত সক্তকে আটকনক্ত বলে। এখানে পরিমাণরূপ নিমিত্তবশতঃ সক্ততে আটক শব্দের প্রয়োগ হয়। চন্দনের গুরুত্ববিশেষের নির্দ্ধারণ করিতে যে চন্দন তুলাতে যুত হয়, তাহাকে তুলাচন্দন বলা হয়। এখানে ধারণরূপ নিমিত্তবশতঃ চন্দনে তুলা শব্দের প্রয়োগ হয়। এইরূপ, সানীপ্যরূপ নিমিত্তবশতঃ “গজায় গোসমুহ চরণ করিতেছে” এইরূপ বাক্যে গঙ্গাসানীপবর্তী গঙ্গাতীরে গঙ্গা শব্দের প্রয়োগ হইয়া থাকে। এইরূপ, কৃষ্ণবর্ণের যোগ থাকিলে ঐ যোগরূপ নিমিত্তবশতঃ শাটক<sup>১</sup> থাকে। এইরূপ, কৃষ্ণ শাটক বলা হইয়া থাকে। “কৃষ্ণ” শব্দের কৃষ্ণবর্ণ ও কৃষ্ণ-বর্ণবিশিষ্ট অর্থাৎ বস্ত্রকে কৃষ্ণ শাটক বলা হইয়া থাকে। “কৃষ্ণ” শব্দের কৃষ্ণবর্ণ ও কৃষ্ণ-বর্ণবিশিষ্ট

১। মুদ্রিত ভায়পট্টানিবন্ধে “শাটক” এইরূপ পাঠ দেখা যায়। কোন পুস্তকে “শকট” এইরূপ পাঠও দেখা যায়। কিন্তু বহু পুস্তকেই “শাটক” এইরূপ পাঠ আছে। পুংলিঙ্গ “শাটক” শব্দের অর্থ বস্ত্র। বহুসংখ্যক এই পাঠই সঙ্গত বোধ হওয়ায়, গৃহীত হইয়াছে।



এই উভয় অর্থই অভিধানে কথিত আছে। কিন্তু তদ্বাচ্যে লাদববশতঃ কৃষ্ণবর্ণ অর্থই কৃষ্ণ শব্দের বাচ্যার্থ। ইহা পরবর্তী নৈয়ায়িকগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। কৃষ্ণ শব্দের কৃষ্ণবর্ণ-বিশিষ্ট এই অর্থ লাক্ষণিক। পরবর্তী নৈয়ায়িকগণের সমর্থিত এই সিদ্ধান্ত মহর্ষির এই সূত্রের দ্বারাও বুঝা যায়। মহর্ষি কৃষ্ণবর্ণ-বিশিষ্ট বস্ত্রে “কৃষ্ণ” শব্দের উপচার বলিয়াছেন। এইরূপ অন্ন প্রাণের সাধন, প্রাণ অন্নসাধ্য, ঐ সাধনরূপ নিমিত্তবশতঃ প্রাণকে অন্ন বলা হয়। বেদ বলিয়াছেন, “অন্নং প্রাণাঃ।” এখানে প্রাণ “অন্ন” শব্দের বাচ্য না হইলেও তাহাতে অন্ন শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। এইরূপ কোন পুরুষ কুলের আধিপতি হইলে, ঐ আধিপত্যরূপ নিমিত্ত-বশতঃ এই পুরুষ কুল, এই পুরুষ গোত্র, এইরূপ কথিত হইয়া থাকে। এখানে কুল বা গোত্রের আধিপত্যনিবন্ধন ঐ পুরুষকেই কুল ও গোত্র বলা হয়। ভাষ্যকার সূত্রোক্ত সহচরণ প্রভৃতি দশটি নিমিত্ত বশতঃ ব্রাহ্মণাদি দশটি পদার্থে “ষটিকা” প্রভৃতি শব্দের উপচার বা প্রয়োগ প্রদর্শন করিয়া প্রকৃতস্থলেও গো-ব্যক্তিতে “গোঃ” এই জাতিবাচক পদের ঐরূপ উপচার হয়, ইহা বুঝাইতে শেষে বলিয়াছেন যে, “গোঃ” এই পদের গো-ব্যক্তি অর্থ না হইলেও গো-ব্যক্তিতে গোষ জাতির সহচরণ অথবা যোগরূপ নিমিত্তবশতঃ গো-ব্যক্তিতে ঐ পদের প্রয়োগ হয়। অর্থাৎ পূর্বোক্তরূপ উপচারবশতঃই “গোঃ” এই পদের দ্বারা গো-ব্যক্তিও বুঝা যায়। সুতরাং গো-ব্যক্তিকে “গোঃ” এই পদের অর্থ বা বাচ্য বলিয়া স্বীকার করা অনাবশ্যক। এখানে শক্তির দ্বারা জাতির বোধ এবং লক্ষণার দ্বারা ব্যক্তির বোধ হয়, অর্থাৎ ‘গোঃ’ এই পদের গোষজাতিই বাচ্যার্থ গো-ব্যক্তি লক্ষ্যার্থ—এই সিদ্ধান্তই এই সূত্রের দ্বারা প্রকটিত হইয়াছে, বুঝা যায়। পূর্বসূত্রে শুদ্ধ ব্যক্তি পদার্থ নহে, কিন্তু জাতিবিশিষ্ট ব্যক্তিই পদার্থ, ইহা মহর্ষির বক্তব্য হইলে—এই সূত্রে ব্যক্তির বোধ-নির্দাহের জন্য নিমিত্তবশতঃ উপচার প্রদর্শন মহর্ষি করিতেন না। ভাষ্যকারও এখানে ‘গোঃ’ এই পদকে জাতিবাচক বলিয়া সহচরণ বা যোগরূপ নিমিত্তবশতঃই গো-ব্যক্তি অর্থে উহার প্রয়োগ বলিয়াছেন। সুতরাং “গোঃ” এই পদের দ্বারা যে গোষজাতিবিশিষ্ট গোকে বুঝা যায়, তাহাতে গোষজাতিই ঐ পদের বাচ্যার্থ, গো-ব্যক্তি উহার লক্ষ্যার্থ, ইহাই বুঝিতে পারা যায়। দীর্ঘাংসকপ্রবর নগুন মিশ্র এই মতই সমর্থন করিয়া গিয়াছেন<sup>১</sup>। মহর্ষি গোভেদের নিজমত পরে ব্যক্ত হইবে ৷৬২৷

ভাষ্য। যদি গৌরিত্যস্য পদস্য ন ব্যক্তিরর্থোহস্ত তর্হি—

সূত্র। আকৃতিস্তুদপেক্ষত্বাৎ সত্ত্বব্যবস্থানসিদ্ধেঃ ॥

॥৬৩॥১৯২॥

১। “জাতেরস্তিব্যক্তিতে ন হি কশ্চিদ্বিবক্ষতি।

নিত্যত্বাৎ লক্ষণীয়ায়। ব্যক্তেপ্তেহি বিশেষণে।

—বগুনকারিকা (শব্দশক্তিগ্রন্থাদিকার শক্তিবিচার ত্রষ্টব্য)।



অনুবাদ। যদি “গোঃ” এই পদের ব্যক্তি অর্থ না হয়, তাহা হইলে আকৃতি পদার্থ হউক? যেহেতু সত্ত্বের (গবাদিপ্রাণীর) ব্যবস্থিতত্ব-জ্ঞানের অর্থাৎ “ইহা গো”, “ইহা অশ্ব” এইরূপ জ্ঞানের তদপেক্ষতা (আকৃতি-সাপেক্ষতা) আছে।

ভাষ্য। আকৃতিঃ পদার্থঃ। কস্মাৎ? তদপেক্ষত্বাৎ সত্ত্বব্যবস্থান-সিদ্ধেঃ। সত্ত্বব্যবস্থানং তদব্যবস্থানঞ্চ নিয়তো বাহ আকৃতিঃ। তস্মাৎ গৃহমাণায়াং সত্ত্বব্যবস্থানং সিধ্যতি, অয়ং গৌরয়মশ্ব ইতি, নাগৃহ-মাণায়াং। যস্মাৎ গ্রহণাৎ সত্ত্বব্যবস্থানং সিধ্যতি তং শব্দোহভিধাতু-মহতি, সোহস্ত্যর্থ ইতি।

অনুবাদ। আকৃতি পদার্থ। (প্রশ্ন) কেন? (উত্তর) যেহেতু সত্ত্বের (গো প্রভৃতির) ব্যবস্থান-সিদ্ধির (ব্যবস্থিতত্ব-জ্ঞানের) তদপেক্ষত্ব অর্থাৎ আকৃতি-সাপেক্ষত্ব আছে। বিশদার্থ এই যে, সত্ত্বের অর্থাৎ গো প্রভৃতি প্রাণীর অবয়বগুলির এবং তাহার অবয়বগুলির নিয়ত বাহ (বিলক্ষণ-সংযোগ-বিশেষ) আকৃতি। সেই আকৃতি জ্ঞায়মান হইলে, “ইহা গো”, “ইহা অশ্ব”—এইরূপে সত্ত্ব-ব্যবস্থান সিদ্ধ হয়, জ্ঞায়মান না হইলে সিদ্ধ হয় না, অর্থাৎ আকৃতি না বুঝিলে “ইহা গো”, “ইহা অশ্ব” এইরূপে গো প্রভৃতি সত্ত্বের জ্ঞান হইতে পারে না। (সুতরাং) যাহার জ্ঞানবশতঃ সত্ত্ব ব্যবস্থান সিদ্ধ হয়, শব্দ তাহাকে (পূর্বোক্ত আকৃতিকে) অভিহিত করিতে (বুঝাইতে) পারে, অর্থাৎ শব্দ সেই আকৃতিরই বোধক হয়। (সুতরাং) তাহা অর্থাৎ ঐ আকৃতিই ইহার (শব্দের) অর্থ।

টিপ্পনী। যাহারা গো-ব্যক্তিকেই “গোঃ” এই পদের বাচ্যার্থ বলেন, তাহাদিগের মতের উল্লেখপূর্বক খণ্ডন করিয়া মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা যাহারা গোর আকৃতিকেই “গোঃ” এই পদের বাচ্যার্থ বলেন, তাহাদিগের মতের উল্লেখপূর্বক সমর্থন করিয়াছেন। ভাষ্যকার “অন্ত তর্হি” এই বাক্যের উল্লেখপূর্বক মহর্ষির সূত্রের অবতারণা করিয়াছেন। ভাষ্যকারের ঐ বাক্যের সহিত সূত্রের “আকৃতিঃ” এই পদের যোগ করিয়া সূত্রার্থ বুঝিতে হইবে। সূত্রে “আকৃতিঃ” এই পদের পরে “পদার্থঃ” এই পদের অধ্যাহার সূত্রকারের অভিপ্রেত আছে। তাই ভাষ্যকার সূত্রভাষ্যের প্রথমে “আকৃতিঃ পদার্থঃ” এই কথা বলিয়া, তাহাই প্রকাশ করিয়াছেন। তাহা হইলে, “অন্ত তর্হি আকৃতিঃ পদার্থঃ” এইরূপ বাক্যই সূত্রকারের বিবক্ষিত, ইহা ভাষ্যকারের বাক্যের দ্বারা বুঝা যায়। আকৃতিই পদার্থ কেন? ইহা সমর্থন করিতে মহর্ষি হেতু বলিয়াছেন যে, সত্ত্ব ব্যবস্থানের সিদ্ধি আকৃতিকে অপেক্ষা করে। “সত্ত্ব” বলিতে এখানে গো, অশ্ব প্রভৃতি প্রাণীই মহর্ষির অভিপ্রেত বুঝা যায়। গো অশ্ব নহে, অশ্বও গো নহে। গো, অশ্ব প্রভৃতি বিভিন্ন পদার্থরূপেই ব্যবস্থিত আছে। তাহাদিগের ঐরূপে ব্যবস্থিতত্বই সত্ত্বব্যবস্থান।



উহার সিদ্ধি আকৃতিসাপেক্ষ। অর্থাৎ গো প্রভৃতির বিলক্ষণ আকৃতি না বুঝিলে তাহাদিগের পূর্বোক্তরূপ ব্যবস্থিতব্য বুঝা যায় না। গোর আকৃতি দেখিলেই “ইহা গো” এইরূপ জ্ঞান হয়। এইরূপ অশ্বের আকৃতি দেখিলেই “ইহা অশ্ব” এইরূপ জ্ঞান হয়। যে ব্যক্তি গো ও অশ্বের বিলক্ষণ আকৃতিভেদ জানে না, সে কিছুতেই “ইহা গো”, “ইহা অশ্ব” এইরূপে গো এবং অশ্বের পূর্বোক্তরূপ ব্যবস্থিতব্য বুঝিতে পারে না। তাহার পক্ষে “এইটি গো” এইটী “অশ্ব” এইরূপ বোধ অসম্ভব। গো প্রভৃতির যে অবয়ব এবং সেই অবয়বের যে অবয়ব উহাদিগের পরস্পর বিলক্ষণ সংযোগকে আকৃতি বলে। গোর অবয়ব ও তাহার অবয়বগুলি এবং উহাদিগের ব্যুৎ অর্থাৎ বিলক্ষণ-সংযোগ অশ্বের অবয়ব ও তাহার অবয়ব এবং উহাদিগের বিলক্ষণ-সংযোগ হইতে বিভিন্ন, গোর অবয়ব প্রভৃতি অখাদিতে থাকে না, গো ব্যক্তিতেই থাকে। সুতরাং পূর্বোক্তরূপ অবয়বব্যুৎ নিয়ত বা ব্যবস্থিত। ঐ নিয়ত ব্যুৎকেই আকৃতি বলে এবং সংস্থান বলে। ঐ আকৃতি না বুঝিলে যখন “ইহা গো”, ইহা অশ্ব” এইরূপ বোধ হয় না, তখন পূর্বোক্তরূপ আকৃতিই পদার্থ। অর্থাৎ বিচার্যস্থলে গোর আকৃতিই “গোঃ” এই পদের বাচ্যার্থ। “গোঃ” এই পদ শ্রবণ করিলে, প্রথমে গোর আকৃতিই বুঝা যায়। কারণ, তাহা না বুঝিলে গো-পদার্থের পূর্বোক্তরূপ জ্ঞান হইতে পারে না। সুতরাং গোর আকৃতিকেই “গোঃ” এই পদের বাচ্যার্থ বলা উচিত। ৬১।

ভাষ্য। নৈতদুপপদ্যতে, যস্ত জাত্যা যোগস্তদত্র জাতিবিশিষ্টমভিধীয়তে গৌরিতি। ন চাবয়বব্যুৎ জাত্যা যোগঃ, কস্ত তর্হি? নিয়তাবয়বব্যুৎ দ্রব্যস্ত, তস্মান্নাকৃতিঃ পদার্থঃ। অস্ত তর্হি জাতিঃ পদার্থঃ—

অনুবাদ। ইহা অর্থাৎ আকৃতিই পদার্থ, এই পূর্বোক্ত মত উপপন্ন হয় না। (কারণ) জাতির সহিত যাহার সম্বন্ধ আছে, সেই জাতিবিশিষ্ট (গো দ্রব্য) এই স্থলে “গোঃ” এই পদের দ্বারা অভিহিত হয়। কিন্তু অবয়বব্যুৎ অর্থাৎ পূর্বোক্ত বিলক্ষণ-সংযোগরূপ সংস্থান বা আকৃতির জাতির সহিত সম্বন্ধ নাই। (প্রশ্ন) তাহা হইলে কাহার জাতির সহিত সম্বন্ধ আছে? (উত্তর) নিয়তাবয়বব্যুৎ অর্থাৎ যাহার পূর্বোক্তরূপ নিয়ত অবয়বব্যুৎ আছে, এমন দ্রব্যের (গোর) জাতির সহিত সম্বন্ধ আছে। অতএব আকৃতি পদার্থ নহে।

তাহা হইলে অর্থাৎ আকৃতিতে জাতি না থাকায়, আকৃতি পদার্থ না হইলে এবং পূর্বোক্ত যুক্তিতে ব্যক্তিও পদার্থ না হইলে জাতি পদার্থ হউক?

সূত্র। ব্যক্ত্যাকৃতিযুক্তেইপ্যপ্রসঙ্গাৎ প্রোক্ষণাদীনাং ঘৃদগবকে জাতিঃ ॥৬৪॥১৯৩॥

অনুবাদ। জাতি পদার্থ, অর্থাৎ গোর জাতিই “গোঃ” এই পদের বাচ্যার্থ।



যেহেতু ব্যক্তি ও আকৃতি যুক্ত হইলেও মৃদগবকে অর্থাৎ মৃত্তিকানিশ্চিত গোরুতে প্রোক্ষণাদির (বৈধ গোদানার্থ জলপ্রোক্ষণ ও দানাদির) প্রসঙ্গ (প্রয়োগ) নাই।

ভাষ্য। জাতিঃ পদার্থঃ;—কস্মাৎ? ব্যক্ত্যাকৃতিযুক্তেহপি মৃদগবকে প্রোক্ষণাদীনামপ্রসঙ্গাদিতি। ‘গাং প্রোক্ষ’ ‘গামানয়’ ‘গাং দেহীতি’ নৈতানি মৃদগবকে প্রযুক্তান্তে,—কস্মাৎ? জাতেরভাবাৎ। অস্তি হি তত্র ব্যক্তিঃ, অস্ত্যাকৃতিঃ, যদভাবান্ত্রাসংপ্রত্যয়ঃ স পদার্থ ইতি।

অনুবাদ। জাতি পদার্থ, অর্থাৎ গোর জাতিই “গোঃ” এই পদের বাচ্যার্থ। (প্রশ্ন) কেন? (উত্তর) যেহেতু ব্যক্তি ও আকৃতিযুক্ত হইলেও মৃদগবকে অর্থাৎ মৃত্তিকানিশ্চিত গোরুতে ব্যক্তি ও আকৃতি থাকিলেও তাহাতে প্রোক্ষণাদির প্রয়োগ নাই। বিশদার্থ এই যে, “গোকে প্রোক্ষণ কর”,—“গোকে আনয়ন কর”, “গোকে দান কর”। এই বাক্যগুলি মৃত্তিকানিশ্চিত গোরুতে প্রযুক্ত হয় না। (প্রশ্ন) কেন? (উত্তর) যেহেতু (তাহাতে) জাতি (গোর) নাই। তাহাতে ব্যক্তি আছেই, আকৃতিও আছে, (কিন্তু) যাহার অভাববশতঃ (“গোঃ” এই পদের দ্বারা) তদ্বিষয়ে, অর্থাৎ মৃত্তিকানিশ্চিত গোবিষয়ে সংপ্রত্যয় (যথার্থ জ্ঞান) হয় না, তাহা (গোহজাতি) পদার্থ, অর্থাৎ “গোঃ” এই পদের বাচ্যার্থ।

টিপ্পন। মহর্ষি পূর্বসূত্রের দ্বারা আকৃতিই পদার্থ,—এই মতের সমর্থন করিয়া, এই সূত্রের দ্বারা ঐ মতের ঋণপূর্বক জাতিই পদার্থ, এই মতের সমর্থন করিয়াছেন। জাতিই পদার্থ, ব্যক্তি ও আকৃতিকে পদার্থ বলা যায় না, এই মতবাদীদিগের একটি যুক্তির উল্লেখ করিতে মহর্ষি এই সূত্রে বলিয়াছেন যে, মৃত্তিকানিশ্চিত গো, ব্যক্তি ও আকৃতিযুক্ত হইলেও তাহাতে প্রোক্ষণাদির প্রয়োগ না হওয়ায়, ব্যক্তি ও আকৃতিকে পদার্থ বলা যায় না, সুতরাং জাতিই পদার্থ। এই মতবাদীদিগের বিবক্ষা এই যে, যদি জাতিকে ত্যাগ করিয়া, ব্যক্তি অথবা আকৃতিকেই পদার্থ বলা হয়, তাহা হইলে মৃত্তিকানিশ্চিত গো-ব্যক্তিও গো শব্দের বাচ্যার্থ হইতে পারে। কারণ, তাহাতে গোর না থাকিলেও গোর আকৃতি আছে, তাহাও গো নামে কথিত ব্যক্তি। মৃত্তিকানিশ্চিত গোকে “মৃদগবক” বলে। উহাতে যে আকৃতি আছে, তদ্বারা উহা গো বলিয়া কথিত হওয়ায়, ঐ আকৃতিকে গোর আকৃতি বলা যায়। গো-বিশিষ্ট গোর আকৃতিবিশেষকে গো শব্দের বাচ্যার্থ বলিলে, সেই পদার্থবোধে বিশেষভাবে গোশব্দেরও বোধ হওয়ায়, গোহজাতিরও পদার্থ স্বীকৃত হয়। কিন্তু আকৃতির পদার্থবাদী বখন তাহা স্বীকার করেন না, তখন মৃত্তিকানিশ্চিত গো-ব্যক্তির আকৃতিও তাহার মতে গো শব্দের বাচ্যার্থ হইয়া পড়ে। কিন্তু ইহা স্বীকার করা যায় না। কারণ, বৈধ গোদান



করিতে কেহ মাটির গোক দান করে না। “গোকে প্রোক্ষণ কর,” “গো আনয়ন কর,” “গো দান কর”—এই সমস্ত বাক্য মাটির গোষ্ঠতে প্রযুক্ত হয় না। কেন প্রযুক্ত হয় না? এতদ্ব্যতীত বলিতেই হইবে যে, উহাতে গোষ্ঠ জাতি নাই। গোষ্ঠ জাতি না থাকিতেই মৃদগবকে গোষ্ঠকের মুখ্য প্রয়োগ হয় না; “গোঃ” এই পদের সংকেত বা শক্তিপ্রযুক্ত ঐ পদের দ্বারা মৃদগবক বিষয়ে সম্প্রত্যয় অর্গাৎ বার্থ শব্দবোধ হয় না, গোষ্ঠবিশিষ্ট গো-বিশেষেই বার্থ শব্দবোধ হয়। সুতরাং গোষ্ঠজাতিই “গোঃ” এই পদের বাচ্যার্থ। আকৃতি ঐ পদের বাচ্যার্থ নহে। গোষ্ঠ-জাতিকে ত্যাগ করিয়া আকৃতিকে “গোঃ” এই পদের বাচ্যার্থ বলিলে, মৃদগবকেও ঐ পদের মুখ্য প্রয়োগ হইত। বৈধ গোদান করিতে ঐ মৃদগবকেরও প্রোক্ষণাদিপূর্বক দান হইত, তাহাতেও গোদানের কলসিদ্ধি হইত, কিন্তু ইহা কেহই স্বীকার করেন না। মহর্ষি যে “গোঃ” এই নামপদকেই আশ্রয় করিয়া পদার্থ পরীক্ষা করিয়াছেন, ইহা এই হুত্রে “মৃদগবক” শব্দের প্রয়োগে স্পষ্ট বুঝা যায়। তাই ভাষ্যকারও পদার্থপরীক্ষারস্ত্রে “পদং পৃথিবীমুদাহরণং” এই কথা বলিয়া, উহাই প্রকাশ করিয়াছেন।

আকৃতি পদার্থ নহে, জাতিই পদার্থ, এই মত সমর্থনে মহর্ষি মুখ্য যুক্তির উল্লেখ করেন নাই। গোষ্ঠবিশিষ্ট প্রকৃত গোর আকৃতিই গো শব্দের বাচ্যার্থ বলিলে মৃদগবকে তাহা না থাকায়, পূর্বোক্ত দোষের সম্ভাবনা নাই। এইরূপ অনেক কথা বলিয়া মহর্ষিপ্রোক্ত যুক্তিকে গ্রহণ না করিলে ঐ বিষয়ে মুখ্য যুক্তি বলা আবশ্যক। তাই ভাষ্যকার প্রথমে আকৃতিই পদার্থ, এই মতের ব্যাখ্যা করিয়া, পরে মুখ্য যুক্তির উল্লেখপূর্বক ঐ মতের অল্পপপত্তি প্রদর্শন করিয়া হুত্রে অস্তিত্ব কবিরাজে। ভাষ্যকার প্রথমে বলিয়াছেন যে, আকৃতিই পদার্থ, এই মত উপপন্ন হয় না। কারণ, “গোঃ” এই পদের দ্বারা যাহা গোষ্ঠজাতিবিশিষ্ট, তাহা বুঝা যায়। গোর আকৃতিতে গোষ্ঠ জাতি নাই; উহা গোষ্ঠবিশিষ্ট নহে। নিরন্ত অবয়ববাহুরূপ আকৃতিবিশিষ্ট দ্রব্য অর্থাৎ গো-ব্যক্তিই গোষ্ঠজাতিবিশিষ্ট। তাহা হইলে “গোঃ” এই পদের দ্বারা গোর আকৃতির বোধ না হওয়ার, আকৃতিকে পদার্থ বলা যায় না। “গোঃ” এই পদের দ্বারা যখন গোষ্ঠবিশিষ্ট পদার্থ বুঝা যায়, তখন ঐ গোর আকৃতি গোষ্ঠবিশিষ্ট না হওয়ার, উহা ঐ পদের অর্থ হইতে পারে না। গোষ্ঠবিশিষ্ট দ্রব্যরূপ গো-ব্যক্তি “গোঃ” এই পদের দ্বারা বুঝা গেলেও ঐ ব্যক্তিকেও “গোঃ” এই পদের বাচ্যার্থ বলা যায় না। কারণ, গো-ব্যক্তি অসংখ্য। যে কোন গো-ব্যক্তিকে পদার্থ বলিলে তন্নির গো-ব্যক্তির বোধ হইতে পারে না। অনন্ত গো-ব্যক্তিকে পদার্থ বলিলে অনন্ত পদার্থে “গোঃ” এই পদের শক্তি কল্পনায় মহাগোরব হয়। পরন্ত সমস্ত গো-ব্যক্তির জ্ঞান না থাকিলে তাহাতে “গোঃ” এই পদের শক্তিজ্ঞানও সম্ভব হয় না। সুতরাং সমস্ত গো-ব্যক্তিগত এক গোষ্ঠজাতিই “গোঃ” এই পদের বাচ্যার্থ, উহাকেই পদার্থ বলিব। গোষ্ঠ-বিশিষ্ট গো-ব্যক্তি ঐ পদের লক্ষ্যার্থ। লক্ষ্যপ্রযুক্তই “গোঃ” এই পদের দ্বারা গো-ব্যক্তির বোধ হইয়া থাকে। ব্যক্তি পদার্থ নহে, এই মত হত্বকার ও ভাষ্যকার পূর্বেই সমর্থন করিয়াছেন। এখানে ভাষ্যকার পূর্বোক্ত ত্রয়পধ্যে আকৃতিই পদার্থ এই মতের অল্পপপত্তি সমর্থনপূর্বক “অন্ত



তাই জাতিঃ পদার্থঃ" এই বাক্যের দ্বারা পরিশেষে জাতিই পদার্থ, এই মতের উল্লেখ করিয়া ঐ মত সমর্থনে সূত্রের অবতারণা করিয়াছেন। সূত্রে "জাতিঃ" এই পদের পরে "পদার্থঃ" এই পদের অধ্যাহার মহর্ষির অভিপ্রেত আছে। তাই ভাষ্যকার সূত্রার্থ বর্ণনায় প্রথমে বলিয়াছেন, "জাতিঃ পদার্থঃ"। ৬৪।

সূত্র। নাকৃতিব্যক্ত্যপেক্ষত্বাজ্জাত্যভিব্যক্তেঃ ॥

॥৩৫॥১৯৪॥

অনুবাদ। না, অর্থাৎ কেবল জাতিই পদার্থ নহে, যেহেতু জাতির অভিব্যক্তির অর্থাৎ "গৌঃ" এই পদের দ্বারা যে গোদজাতিবিষয়ক শাব্দবোধ হয়, তাহার আকৃতি ও ব্যক্তি-সাপেক্ষতা আছে, অর্থাৎ গোর আকৃতি ও গো-ব্যক্তি না বুঝিয়া কেবল গোদ-জাতিবিষয়ে ঐ শাব্দবোধ হয় না।

ভাষ্য। জাতেরভিব্যক্তিরাকৃতিব্যক্তী অপেক্ষতে, নাগৃহমাণায়ানাকৃতো ব্যক্তৌ চ জাতিমাত্রঃ শুদ্ধঃ গৃহ্যতে। তস্মান্ন জাতিঃ পদার্থ ইতি।

অনুবাদ। জাতির অভিব্যক্তি অর্থাৎ "গৌঃ" এই পদের দ্বারা জাতি-বিষয়ক শাব্দবোধ আকৃতি ও ব্যক্তিকে অপেক্ষা করে। বিশদার্থ এই যে, আকৃতি ও ব্যক্তি জ্ঞায়মান না হইলে শুদ্ধ জাতি মাত্র (গৌঃ এই পদের দ্বারা) গৃহীত অর্থাৎ শাব্দ-বোধের বিষয় হয় না। অতএব জাতি অর্থাৎ শুদ্ধ জাতি মাত্র পদার্থ নহে।

টিপ্পনী। মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা পূর্বসূত্রোক্ত মতের খণ্ডন করিতে বলিয়াছেন যে, কেবল জাতিই পদার্থ, ইহা বলা যায় না। কারণ, "গৌঃ" এই পদের দ্বারা গোর আকৃতি ও গো-ব্যক্তিকে না বুঝিয়া কেবল গোদ জাতিমাত্র কেহ বুঝে না। গোর আকৃতি ও গো-ব্যক্তির সহিত গোদ জাতিকে বুঝিয়া থাকে। সুতরাং ঐ স্থলে গোদ-জাতি-বিষয়ক শাব্দবোধ গোর আকৃতি ও গো-ব্যক্তিকে অপেক্ষা করায়, গোদ জাতিমাত্রই "গৌঃ" এই পদের অর্থ, ইহা বলা যায় না। যদি গোদ জাতিমাত্রই "গৌঃ" এই পদের বাচ্যার্থ হইত, তাহা হইলে "গৌঃ" এই পদের দ্বারা কেবল গোদমাত্রেরও বোধ হইতে পারিত। গোদ-জাতি নিত্য বলিয়া "গৌর্নিত্যা" এইরূপ মুখ্য প্রয়োগও হইতে পারিত। বস্তুতঃ ঐরূপ মুখ্য প্রয়োগ স্বীকার করা যায় না। সুতরাং "গৌঃ" এই পদের দ্বারা কুত্রাপি গোদ-জাতি মাত্রের বোধ না হওয়ার এবং সর্বত্র ঐ পদ জন্ত গোদ জাতির শাব্দবোধ আকৃতি ও ব্যক্তি-বিষয়ক হওয়ার, কেবল গোদ জাতিমাত্র "গৌঃ" এই পদের বাচ্যার্থ নহে। সূত্রে "আকৃতিব্যক্ত্যপেক্ষত্বাৎ"—এই স্থলে "আকৃতি" শব্দ অপেক্ষায় "ব্যক্তি" শব্দের অগ্রসরত্ববশতঃ দ্বন্দ্ব সমালে "ব্যক্ত্যাকৃতি" এইরূপ প্রয়োগই হইতে পারে। মহর্ষি "আকৃতি ব্যক্তি" এইরূপ প্রয়োগ করিয়াছেন কেন? এতদ্বত্তরে উদ্যোতকর বলিয়াছেন যে, আকৃতির



প্রাধান্যবশতঃ সমাসে "আকৃতি" শব্দের পূর্বনিপাত হইয়াছে। আকৃতি ও ব্যক্তির মধ্যে ব্যক্তির দ্বারা বিশেষিত হইয়াই আকৃতি, জ্ঞাতির সাধক হয়। অর্থাৎ ইহা "গৌর আকৃতি" এইরূপে আকৃতির জ্ঞান হইলে তদ্বারা গৌর-জ্ঞাতির জ্ঞান হওয়ায় জ্ঞাতিবোধক আকৃতির জ্ঞানে গৌ-ব্যক্তি বিশেষণ হইয়া থাকে, আকৃতি বিশেষ্য হইয়া থাকে। বিশেষ্যভবনতঃ আকৃতিই ঐ স্থলে প্রধান, তাই সমাসে এখানে আকৃতি শব্দের পূর্বনিপাত হইয়াছে। অন্ততঃ মহর্ষি "ব্যক্ত্যাকৃতি" এইরূপ প্রয়োগই করিয়াছেন ৷৬৫৷

ভাষ্য। ন বৈ পদার্থেন ন ভবিতুং শক্যং—কঃ ধ্বনিদানীং পদার্থ ইতি।

অনুবাদ। (প্রশ্ন) পদার্থ হইতে পারে না—ইহা নহে, এখন পদার্থ কি?

সূত্র। ব্যক্ত্যাকৃতি-জাতয়ন্তু পদার্থঃ ॥৬৬॥১৯৫॥

অনুবাদ। (উত্তর) ব্যক্তি, আকৃতি ও জ্ঞাতিই অর্থাৎ এই তিনটিই পদার্থ।

ভাষ্য। তু শব্দো বিশেষণার্থঃ। কিং বিশিষ্যতে? প্রধানাদ্ভাবস্তা-  
নিয়মেন পদার্থত্বমিতি। যদাহি ভেদবিবক্ষা বিশেষগতিশ্চ তদা ব্যক্তিঃ  
প্রাধান্যমস্তু জাত্যাকৃতি। যদা তু ভেদোহবিবক্ষিতঃ সামান্যগতিশ্চ, তদা  
জ্ঞাতিঃ প্রাধান্যমস্তু ব্যক্ত্যাকৃতি। তদেতদবহনং প্রয়োগেন। আকৃতেস্ত  
প্রধানভাব উৎপ্রেক্ষিতব্যঃ।

অনুবাদ। "তু" শব্দটি বিশেষণার্থ, অর্থাৎ বিশেষণ বা বিশিষ্টতাবোধের জন্যই  
সূত্রে তু শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। (প্রশ্ন) কি বিশিষ্ট হইয়াছে? অর্থাৎ সূত্রে "তু"  
শব্দ দ্বারা কাহাকে কোন্ বিশেষণ দ্বারা বিশিষ্ট বলা হইয়াছে? (উত্তর) প্রধানাদ্ভা-  
বের অর্থাৎ প্রাধান্য ও অপ্রাধান্যের অনিয়মের দ্বারা পদার্থের বিশিষ্ট হইয়াছে।  
(সে কিরূপ, তাহা বলিতেছেন) যে সময়ে ভেদবিবক্ষা ও বিশেষগতি অর্থাৎ ভেদ-  
বিবক্ষাবশতঃ ব্যক্তিবিশেষরূপ অর্থের বোধ হয়, তখন ব্যক্তিই প্রধান, জ্ঞাতি ও  
আকৃতি অঙ্গ অর্থাৎ অপ্রধান। যে সময়ে কিন্তু ভেদ বিবক্ষিত নহে এবং সামান্য  
বোধ হয়, তখন জ্ঞাতিই প্রধান, ব্যক্তি ও আকৃতি অঙ্গ। সেই ইহা অর্থাৎ ব্যক্তি ও  
জ্ঞাতি রূপ পদার্থদ্বয়ের প্রাধান্য ও অপ্রাধান্য প্রয়োগ সমূহে বহু আছে। আকৃতির  
প্রাধান্য কিন্তু উৎপ্রেক্ষা করিবে, অর্থাৎ সন্ধানপূর্বক উদাহরণস্থল দেখিয়া নিজে  
বুঝিয়া লইবে।

টিপ্পনী। মহর্ষি "গৌঃ" এই নাম পদকে উদাহরণরূপে গ্রহণ করিয়া পদার্থ-পরীক্ষারস্তে  
ব্যক্তি, আকৃতি ও জ্ঞাতির মধ্যে যে কোন একটিই পদার্থ অথবা ঐ সমস্তই পদার্থ?—এইরূপ সংশয়



প্রদর্শন করিয়া যথাক্রমে ব্যক্তি, আকৃতি ও জাতির পদার্থ মতের সমর্থনপূর্বক তাহার খণ্ডন করিয়াছেন। এখন অবশ্যই প্রশ্ন হইবে যে, যদি ব্যক্তি আকৃতি ও জাতির মধ্যে কেহই পদার্থ না হয়, তাহা হইলে পদার্থ কি? পদার্থ কেহই হইতে পারে না, ইহা ত বলা যাইবে না। এখন “গোঃ” এইরূপ পদ শ্রবণ করিলে তৎক্ষণাৎ শব্দবোধ হইয়া থাকে, তখন অবশ্যই ঐ পদের বাচ্যার্থ আছে, সে বাচ্যার্থ কি? এতদ্বারা মহর্ষি এই সিদ্ধান্তসূত্রের দ্বারা তাহার সিদ্ধান্ত পদার্থ বলিয়াছেন। ভাষাকার প্রথমে পূর্বোক্তরূপ প্রশ্ন প্রকাশ করিয়া মহর্ষির সিদ্ধান্তসূত্রের অবতারণা করিয়াছেন। মহর্ষি সিদ্ধান্ত বলিয়াছেন যে, ব্যক্তি, আকৃতি ও জাতি এই তিনটিই অর্থাৎ ঐ সমস্তই পদার্থ। তাৎপর্যাত্মককার মহর্ষির তাৎপর্য বর্ণন করিয়াছেন যে,—গো শব্দ উচ্চারণ করিলে বাহার ঐ শব্দের শক্তিজ্ঞান আছে, তাহার এক সময়েই গো-ব্যক্তি, গোর আকৃতি ও গো-জাতিবিষয়ে একটি শব্দবোধ হইয়া থাকে। ঐ স্থলে ব্যক্তি, আকৃতি ও জাতির মধ্যে প্রথমে কোন একটির বোধের পরে লক্ষণা প্রযুক্ত অপর অর্থের বোধ হয় না। একই শব্দবোধ গো-ব্যক্তি গোর আকৃতি ও গো-জাতিবিষয়ক হওয়ায়, ঐ স্থলে ঐ তিনটিই পদার্থ, ইহা বুঝা যায়। শব্দশক্তি-প্রকাশিকা গ্রন্থে জগদীশ তর্কালঙ্কার প্রাচীন নৈয়ায়িক-সম্প্রদায়ের মত বলিয়াছেন যে, ব্যক্তি আকৃতি ও জাতি এই তিনটিই “গো” প্রভৃতি পদের অর্থ। ঐ তিনটি পদার্থেই গো প্রভৃতি পদের এক শক্তি, ভিন্ন ভিন্ন শক্তি (সঙ্কেত) নহে, ইহা হুচনার জন্মই মহর্ষি এই সূত্রে “পদার্থঃ” এই স্থলে এক বচনের প্রয়োগ করিয়াছেন। ব্যক্তি, আকৃতি ও জাতিরূপ পদার্থে গো-প্রভৃতি পদের ভিন্ন ভিন্ন সঙ্কেত থাকিলে কোন সময়ে উহার মধ্যে একমাত্র সঙ্কেতজ্ঞান জন্ম গো পদের দ্বারা কেবল ব্যক্তি অথবা কেবল আকৃতি অথবা কেবল জাতিরও বোধ হইতে পারে। কিন্তু সেরূপ বোধ কাহারও হয় না। পরন্তু গো শব্দের দ্বারা কেবল গো-জাতির বোধ হইলে, “গো-নিষ্ঠা” এইরূপ মুখ্য প্রয়োগ হইতে পারে। কারণ, গো-জাতি নিষ্ঠা। এবং গো শব্দের দ্বারা কেবল গোর আকৃতির বোধ হইলে, “গো-গুণঃ” এইরূপও মুখ্য প্রয়োগ হইতে পারে। কারণ, গোর অবয়বসংযোগ-বিশেষরূপ আকৃতি গুণপদার্থ। সুতরাং গোশব্দের দ্বারা সর্বত্র গো-জাতি এবং গোর আকৃতিবিশিষ্ট গো-ব্যক্তিরই বোধ হইয়া থাকে, ঐ ব্যক্তি আকৃতি ও জাতিরূপ পদার্থত্রয়েই গো শব্দের এক শক্তি, ইহাই স্বীকার্য। বৃত্তিকার বিখ্যাতও এই সূত্র ব্যাখ্যায় পূর্বোক্তরূপ কথাই বলিয়াছেন। জগদীশ তর্কালঙ্কার নব্য সম্প্রদায়ের মত বলিয়াছেন যে, গো-জাতি ও গো-ব্যক্তি এই উভয়েই গো শব্দের এক শক্তি, ইহা হুচনার জন্মই মহর্ষি এই সূত্রে “পদার্থঃ” এই স্থলে একবচন প্রয়োগ করিয়াছেন। গো-শব্দের দ্বারা গোর আকৃতিরও বোধ হওয়ায়, ঐ আকৃতিতেও গো শব্দের শক্তি আছে, কিন্তু তাহা পৃথক শক্তি। ফলকথা, গো শব্দের শক্তি বা সঙ্কেত দুইটি, গো-জাতি ও গো-ব্যক্তি-একটি, এবং গোর আকৃতিতে একটি। যেখানে গোর আকৃতিতে শক্তির জ্ঞান না হওয়ায়, ঐ আকৃতির বোধ হয় না, সেখানে কেবল “গো-বিশিষ্ট গো” এইরূপই শব্দবোধ হয়। ঐ বোধ সেখানে গো-জাতি ও গো-ব্যক্তি-এক শক্তির জ্ঞান জন্মই হইয়া থাকে, সুতরাং সেখানে লক্ষণা স্বীকারের কোন প্রয়োজন নাই।



জগদীশ তর্কালঙ্কার নিজে এই মত স্বীকার করেন নাই। তাঁহার মতে জাতি ও আকৃতিবিশিষ্ট গো-ব্যক্তিতে গো শব্দের একই শক্তি। জাতি ও আকৃতি এই উভয়ই ঐ শক্তির অবচ্ছেদক। নব্য নৈয়ায়িক গদাধর ভট্টাচার্য্যও “শক্তিবাদ” গ্রহে জাতি ও আকৃতিবিশিষ্ট গো-ব্যক্তিতে গো শব্দের এক শক্তি সিদ্ধান্ত বলিয়া, সেখানে মহর্ষির এই সূত্রের উদ্ধারপূর্ব্বক ঐ সিদ্ধান্ত যে মহর্ষি গোতমেরও অমুমত, ইহা বলিয়াছেন। ( শক্তিবাদ শেখভাগ দ্রষ্টব্য )। কিন্তু গদাধর ভট্টাচার্য্য জগদীশের ভাষ্য আকৃতিকে গো শব্দের শক্তির অবচ্ছেদক স্বীকার করেন নাই, কেবল গোত্র জাতিকেই ঐ শক্তির অবচ্ছেদক বলিয়াছেন। কারণ, আকৃতি অবয়ব-সংযোগ-বিশেষ, উহা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে গো-ব্যক্তিতে থাকে না, গোত্র জাতি সাক্ষাৎ সম্বন্ধেই গো-ব্যক্তিতে থাকে। জগদীশ তর্কালঙ্কার প্রথমে যে সাম্প্রদায়িক মতের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা প্রথমে বলিয়াছি, ঐ মতের সহিত গদাধরের মতের সাম্য দেখা যায়। সূত্রগ্রন্থ গদাধর ভট্টাচার্য্য জগদীশোক্ত সাম্প্রদায়িক মতেরই সমর্থন করিয়াছেন, বুঝা যায়। জরনৈয়ায়িক জয়ন্ত ভট্টও “জায়মঞ্জরী” গ্রন্থে বহুবিচারপূর্ব্বক পূর্ব্বোক্তরূপ মতেরই সমর্থন করিয়াছেন, বুঝা যায়। জগদীশ প্রকৃতির পূর্ব্ববর্ত্তী নব্য নৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমণি “গো” শব্দ দ্বারা “গোত্র-বিশিষ্ট গো” এইরূপ শব্দবোধ স্বীকার করিলেও এবং গোত্র-বিশিষ্ট গো-ব্যক্তিতে গো শব্দের শক্তি স্বীকার করিয়া, গোত্র জাতিকে ঐ শক্তির অবচ্ছেদক স্বীকার করিলেও গোত্র-জাতিতে গো শব্দের শক্তি স্বীকার করেন নাই। অর্থাৎ বাহ্য শব্দ্যতাবচ্ছেদক নামে স্বীকৃত হইয়াছে, সেই গোত্রাদি পদার্থে গো প্রকৃতি শব্দের শক্তি স্বীকার করা তিনি আবশ্যক মনে করেন নাই। তিনি “গুণটিগুনী” এবং “প্রত্যক্ষচিন্তামণি”র দীর্ঘিতিতে ঐ মতধ্বংস করিয়াছেন। কিন্তু গদাধর ভট্টাচার্য্য “শক্তিবাদ” গ্রন্থে রঘুনাথের ঐ সিদ্ধান্তের দোষ প্রদর্শন করিয়াছেন। জগদীশ তর্কালঙ্কারের গুরুপাদ “জায়রহস্ত” গ্রন্থে মহর্ষির এই সূত্রোক্ত “আকৃতি” শব্দের অর্থ বলিয়াছেন—জাতি ও ব্যক্তির সম্বন্ধ। তাঁহার মতে এই সূত্রে আকৃতি বলিতে সংস্থান বা অবয়ব-সংযোগবিশেষ নহে। তাঁহার যুক্তি এই যে, গো-শব্দ দ্বারা যখন সমবায়-সম্বন্ধে গোত্র-বিশিষ্ট, এইরূপ বোধ হইয়া থাকে, তখন ঐ সমবায়সম্বন্ধ ও গো-শব্দের বাচ্যার্থ, উহাতেও গো-শব্দের শক্তি অবশ্য স্বীকার্য্য। নচেৎ ঐ স্থলে গো-শব্দের দ্বারা সমবায়-সম্বন্ধের বোধ হইতে পারে না। এইরূপ অন্তর্ভুক্ত ও জাতি ও ব্যক্তির সম্বন্ধ বোধ হওয়ায়, উহাও অবশ্যই পদার্থ। মহর্ষি সূত্রে “আকৃতি” শব্দের দ্বারা ঐ সম্বন্ধকেই গ্রহণ করিয়াছেন। যে সম্বন্ধ অবশ্যই পদার্থ হইবে, তাহাকে পদার্থ মধ্যে উল্লেখ না করিলে, মহর্ষির ন্যূনতা হয়। সূত্রগ্রন্থে মহর্ষি “আকৃতি” শব্দের দ্বারা ঐ সম্বন্ধকেও পদার্থ বলিয়াছেন। কোম কোম স্থলে গো-শব্দের দ্বারা যে গোত্র ও সংস্থানরূপ আকৃতিবিশিষ্ট গো-ব্যক্তির বোধ হয়, তাহা ঐরূপে শক্তিভ্রম বা লক্ষণাবশতঃই হইয়া থাকে। “জায়রহস্ত”-কার জগদীশের গুরুপাদ এইরূপ বলিলেও সূত্রকার মহর্ষি গোতম তাঁহার এই সূত্রোক্ত আকৃতির লক্ষণ বলিতে পরে ( ৬৮ সূত্রে ) অবয়ব-সংযোগবিশেষরূপ সংস্থানকেই আকৃতি বলিয়াছেন। ভাষ্যকার প্রকৃতি জ্ঞানার্চ্যগণও আকৃতির ঐরূপ ব্যাখ্যাই করিয়াছেন। জাতি ও ব্যক্তির সম্বন্ধের বোধও সকলেই



স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু তাহাতে “গো” প্রভৃতি শব্দের শক্তি স্বীকার অনাবশ্যক, ইহা নব্য নৈয়্যিকগণও সমর্থন করিয়াছেন। জগদীশ তর্কালঙ্কার “শব্দশক্তিপ্রকাশিকা” গ্রন্থে শেষে তাঁহার গুরুপাদের মত বলিয়া পূর্বোক্ত মতের উল্লেখ করিলেও, তিনিও ঐ মত গ্রহণ করেন নাই। মূলকথা, মহর্ষি গোতমের সূত্রের দ্বারা জাতি এবং সংস্থানরূপ আকৃতি এবং ব্যক্তি এই পদার্থত্রয়েই গো প্রভৃতি শব্দের একই শক্তি, ঐ শক্তিজ্ঞান অস্ত “গোত্র ও আকৃতিবিশিষ্ট গো” ইত্যাদি প্রকারই শব্দবোধ হয়, ইহা বুঝা যায়। প্রাচীন ও নব্য ভাষাচার্যগণের মধ্যে অনেকেই এই সিদ্ধান্ত সমর্থন করিলেও বাহায়া ইহা স্বীকার না করিয়া অস্তরূপ মতের সৃষ্টি করিয়াছেন, স্বমত-রক্ষার্থ ভ্রান্তসূত্রের অস্তরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাদিগের ঐ মত বস্তুতঃ ভ্রান্তসূত্রের বিকৃত হইলে তাহা গোঁতমীয় মত বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। মীমাংসা দর্শনকার মহর্ষি জৈমিনির মত ব্যাখ্যায় ভাষাকার শরর স্বামী এবং বাট্টিককার ভট্ট কুমারিল জাটিকেই আকৃতি বলিয়াছেন। তাহারা জাতি ও আকৃতিকে ভিন্নপদার্থ বলিয়া স্বীকার করেন নাই। “বদ্য ব্যক্তিরাক্রিয়তে” অর্থাৎ বাহার দ্বারা সামান্যতঃ ব্যক্তিমান্ত্রের বোধ হয়, এইরূপ ব্যুৎপত্তি অনুসারে তাহারা আকৃতি শব্দেরও জাতি অর্থ বলিয়াছেন। কিন্তু মহর্ষি গোতম জাতি হইতে আকৃতির ভেদ স্বীকার করিয়া তাহার পৃথক্ উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি আকৃতির লক্ষণসূত্রে জাতিব্যঞ্জক অবয়ব-সংযোগবিশেষ বা সংস্থানকেই আকৃতি বলিয়াছেন। বস্তুতঃ জাতি অর্থে “আকৃতি” শব্দের মুখ্য প্রয়োগ দেখা যায় না। অবয়ব-সংযোগবিশেষ বা সংস্থানই “আকৃতি” শব্দের দ্বারা কথিত হইয়া থাকে।

বৃত্তিকার বিখ্যাত বলিয়াছেন যে, জাতি, আকৃতি ও ব্যক্তি, এই তিনটিই পদার্থ, উহার মধ্যে যে কোন একটি মাত্র পদার্থ নহে, ইহাই এই সূত্রে “তু” শব্দের দ্বারা সূচিত হইয়াছে। কিন্তু ভাষ্যকার বাংলায়ন, বাট্টিককার, উদ্যোতকর এবং ভ্রান্তসংগ্রহীকার জরদ্ব ভট্ট বলিয়াছেন যে, এই সূত্রে “তু” শব্দটি বিশেষণার্থ। ব্যক্তি, আকৃতি ও জাতিতে যে পদার্থ আছে, তাহাতে প্রাধান্য ও অপ্রাধান্যের নিয়ম নাই, ঐ পদার্থও ব্যক্তি প্রভৃতির প্রাধান্য ও অপ্রাধান্যের অনিয়ম-বিশিষ্ট। ঐ অনিয়মরূপ বিশেষণ সূচনা করিতেই সূত্রে “তু” শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। অর্থাৎ কোন স্থলে ব্যক্তি প্রধান, কোন স্থলে জাতি প্রধান, কোন স্থলে আকৃতি প্রধান পদার্থ হইয়া থাকে, উহাদিগের প্রাধান্য ও অপ্রাধান্যের নিয়ম নাই। ভাষ্যকার এই অনিয়ম বুঝাইতে বলিয়াছেন যে, যেখানে ভেদবিবক্ষা ও বিশেষগতি অর্থাৎ ভেদবিবক্ষামূলক ব্যক্তিবিশেষরূপ অর্থের বোধ হয়, সেখানে পূর্বোক্ত পদার্থত্রয়ের মধ্যে ব্যক্তিই প্রধান হইবে। জাতি ও আকৃতি অপ্রধান পদার্থ হইবে। যেখানে ভেদবিবক্ষা নাই এবং তজ্জন্ত সামান্য গতি অর্থাৎ জাতিরূপে ব্যক্তি-সামান্যেরই বোধ হইয়া থাকে, সেখানে জাতিই প্রধান পদার্থ, ব্যক্তি ও আকৃতি অপ্রধান পদার্থ। ভাষ্যকার এইরূপে পদার্থত্রয়ের মধ্যে কোন স্থলে ব্যক্তির ও কোন স্থলে জাতির প্রাধান্য নানা প্রযোগে বহুতর আছে, অর্থাৎ উহার উদাহরণ বহুপ্রযোগে বহু বহু পাওয়া যায়, ইহা বলিয়া শেষে বলিয়াছেন যে, আকৃতির প্রাধান্য অনুসন্ধানপূর্বক বুঝিবে, অর্থাৎ উহার উদাহরণ বহু নাই, বাহা আছে, তাহা অনুসন্ধান করিয়া বুঝিতে হইবে। উদ্যোতকর ও জরদ্ব ভট্ট



ব্যক্তি, জাতি ও আকৃতির প্রাধান্তের উদাহরণ বলিয়াছেন। “গৌর্গচ্ছতি”, “গৌর্গচ্ছতি”, “গাং মুক্” ইত্যাদি প্রয়োগে গো শব্দের দ্বারা গো মাত্রেয় বোধ হয় না। বক্তার ভেদবিবক্ষাবশতঃ এই স্থলে গো শব্দের দ্বারা গো ব্যক্তিবিশেষরই বোধ হইয়া থাকে, হতরাং এই স্থলে ব্যক্তিই প্রধান পদার্থ। উদ্যোতকর বলিয়াছেন যে, “গৌর্গচ্ছতি” ইত্যাদি প্রয়োগে গোত্র জাতি ও গোত্র আকৃতিতে গমনাদি ক্রিয়া অসম্ভব বলিয়া, বাহাতে উহা সম্ভব, সেই গো-ব্যক্তিবিশেষ এই স্থলে পদার্থ। কিন্তু এই স্থলে জাতি ও আকৃতি যে পদার্থই নহে, ইহা উদ্যোতকরের সিদ্ধান্ত, বুঝা যায় না। কারণ, তিনিও পূর্বে ব্যক্তির প্রাধান্তস্থলে জাতি ও আকৃতির অপ্রাধান্য বলিয়াছেন। জাতি ও আকৃতি অপ্রধান হইলে, তাহারও পদার্থ স্বীকৃত হয়। “গৌর্গচ্ছতি” ইত্যাদি প্রয়োগে জাতি ও আকৃতি-বিশিষ্ট গো-ব্যক্তিবিশেষ গো শব্দের অর্থ হইলে বিশেষণভাবে জাতি ও আকৃতি ও শব্দবোধের বিষয় হইয়া পদার্থ হইতে পারে, বিশেষ্যবশতঃ ব্যক্তিকেই এই স্থলে প্রধান পদার্থ বলা যাইতে পারে। পূর্বোক্ত স্থলে গো শব্দের দ্বারা সকল গো-ব্যক্তির বোধ না হইয়া, গো-বিশেষের বোধ হইলেও ভাব্যকার প্রভৃতি এই বিশেষার্থকে ও গো শব্দের বাচ্যার্থ বলিতেন, ইহা বুঝা যায়। এই স্থলে লক্ষণা স্বীকার করিলে উহাকে পদের মুখ্যার্থ নিরূপণে উদাহরণ বলা যায় না। মহর্ষি পদের মুখ্যার্থ বা বাচ্যার্থরূপ পদার্থই এই হত্রের দ্বারা বলিয়াছেন। বক্তৃতঃ পূর্বোক্ত স্থলে বক্তার তাৎপর্য্যানুসারে গো শব্দের দ্বারা গোত্ররূপে গো-বিশেষের বোধ হইলে, এই অর্থে লক্ষণা স্বীকারের প্রয়োজন নাই। কারণ, গোত্ররূপে গো-বিশেষেও গো শব্দের শক্তি আছে। বক্তার তাৎপর্য্যানুসারে লক্ষণা ব্যতীতও যে বিশেষার্থের বোধ হইয়া থাকে, ইহা “পক্ষমূলী” ইত্যাদি প্রয়োগে নব্য নৈয়ায়িক জগদীশ তর্কালঙ্কার ও স্বীকার করিয়াছেন। ( শব্দশক্তিপ্রকাশিকার দ্বিগুণমান-প্রকরণ দ্রষ্টব্য )।

“গৌর্গচ্ছতি” ( অর্থাৎ গো মাত্রেয়কেই চরণ দ্বারা স্পর্শ করিবে না ) এইরূপ প্রয়োগে গোত্রবিশিষ্ট গো মাত্রেয়ই চরণ দ্বারা স্পর্শ নিবেদ্য বিবক্ষিত। হতরাং এই স্থলে গোত্রগত ভেদ-বিবক্ষা নাই। এই স্থলে “গোঃ” এই পদের দ্বারা গোত্ররূপে গো-সামান্যকেই প্রকাশ করায়, গোত্র-জাতিই প্রধান পদার্থ। প্রথমে গোত্র জাতির বোধ ব্যতীত তদ্রূপে গো-সামান্যের বোধ হইতে পারে না এবং গোত্র জাতিই এই স্থলে অসংখ্য বিভিন্ন গো ব্যক্তির একরূপে একই বোধের নির্বাহক, এজন্য এই স্থলে গোত্র জাতিরূপ পদার্থেরই প্রাধান্ত বলা হইয়াছে। এইরূপ ব্যক্তি ও জাতির প্রাধান্ত বহু প্রয়োগেই আছে। উদাহরণ উদাহরণ সুলভ। আকৃতির প্রাধান্তের উদাহরণ বলিতে উদ্যোতকর ও জয়ন্ত ভট্ট “পিতৃকন্যো গাবঃ ক্রিরস্তাং” এই প্রয়োগের উল্লেখ করিয়াছেন। বৈদিক কণ্ঠ-বিশেষে পিতৃকের দ্বারা (তৎসূচুর্গনির্মিত পিতৃলির দ্বারা) গো নিষ্ঠাণের বিধি পূর্বোক্ত বাক্যের দ্বারা বলা হইয়াছে। পিতৃকনির্মিত গো-ব্যক্তিতে গোত্র জাতি নাই, হতরাং জাতি এই স্থলে গো শব্দের অর্থ নহে। ব্যক্তি ও আকৃতি এই দুইটি মাত্রই পদার্থ হইবে। তদ্বোধে আকৃতি প্রধান, ব্যক্তি অপ্রধান। জয়ন্ত ভট্টের কথাতে ইহা স্পষ্ট বুঝা যায়। পিতৃকের দ্বারা গোত্র আকৃতির

১। কঠিৎ প্রয়োগে জাতঃ প্রাধান্তঃ ব্যক্তিরূপবৎ, বধা,—“গৌর্গচ্ছতি”-তে, বর্ণগবীষ্ম প্রতিবেদ্যে বসতে। কঠিৎপ্রয়োগে: প্রাধান্তঃ, জাতেরসমত্বাৎ। বধা, গাং মুক্, গাং বগানেতি, নিয়তাং কাকিৎব্যক্তিমুখিত



অসদৃশ আকৃতি করিতে হইবে, এইরূপ বিবিধাবশতঃই ঐ স্থলে গো শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। সুতরাং ঐ স্থলে গো শব্দের পূর্বোক্তরূপ আকৃতি অর্থই প্রধান। কিন্তু তাদৃশ আকৃতিরূপ অর্থে গো শব্দের শক্তি না থাকিলে, উহা ঐ স্থলে গো শব্দের বাচ্যার্থ হইতে পারে না, ইহা চিন্তনীয়। কারণ, মহর্ষি যে আকৃতিবিশেষকে পদের বাচ্যার্থ মধ্যে উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা যদি গো শব্দ স্থলে প্রকৃত গোঁর অবয়ব-সংযোগ-বিশেষই হয়, তাহা হইলে উহা পিষ্টকাদিনির্মিত গো-ব্যক্তিতে থাকিতেই পারে না। কিন্তু উদ্যোতকর প্রভৃতির কথার দ্বারা পিষ্টকাদিনির্মিত গো-ব্যক্তিতেও গোঁর আকৃতি আছে, ইহা সরলভাবে বুঝা যায়। শক্তিবাদ গ্রহে নব্য নৈরায়িক গদাধর ভট্টাচার্য্যও “পিষ্টকমযো গাবঃ” এই প্রয়োগে কেবল আকৃতিবিশিষ্ট গো-ব্যক্তিতে গো পদের তাৎপর্য্য বলিয়া ঐরূপ অর্থে ঐ স্থলে গো পদের লক্ষণা বলিয়াছেন<sup>১</sup>; গোঁকে ত্যাগ করিয়া কেবল আকৃতিবিশিষ্ট গো-ব্যক্তিতে গো পদের শক্তি স্বীকার না করায়, গদাধর ভট্টাচার্য্য ঐ স্থলে পূর্বোক্ত অর্থে গো পদের লক্ষণা বলিয়াছেন। পিষ্টকনির্মিত গো-ব্যক্তিতে গোঁর আকৃতি না থাকিলে গদাধর ভট্টাচার্য্য তাহাকে আকৃতিবিশিষ্ট কিরূপে বলিয়াছেন, ইহাও চিন্তনীয়। মুক্তবোধ ব্যাকরণের চাঁকাকার নব্য রাম তর্কবাগীশ কিন্তু “পদার্থ-নিরূপণ” প্রবন্ধে “পিষ্টকমযো গাবঃ”, এই প্রয়োগে গোঁর আকৃতির সদৃশ আকৃতি অর্থেই “গো” শব্দের লক্ষণা বলিয়াছেন<sup>২</sup>। পিষ্টকনির্মিত গো-ব্যক্তিতে গোঁ-বিশিষ্ট গোঁর অবয়ব-সংযোগ-বিশেষরূপ আকৃতি নাই, কিন্তু তাহার অসদৃশ পিষ্টকসংযোগ-বিশেষরূপ আকৃতি আছে। ঐ অসদৃশ আকৃতি গো শব্দের বাচ্যার্থ নহে। সুতরাং পূর্বোক্ত স্থলে ঐ অসদৃশ আকৃতি গো শব্দের লাক্ষণিক অর্থ, ইহা রাম তর্কবাগীশের যুক্তিসিদ্ধ সিদ্ধান্ত বুঝা যায়। পিষ্টকাদিনির্মিত গো-ব্যক্তিতেও গোঁর আকৃতি আছে, ইহা বলিতে হইলে, আকৃতির লক্ষণ কি, তাহা বুঝিতে হইবে। (পরবর্তী ৬৮ সূত্র দ্রষ্টব্য)। ৬৬।

ভাষ্য। কথং পুনঃপ্রায়তে নানা ব্যক্ত্যাকৃতিজাতয় ইতি, লক্ষণ-ভেদাৎ, তত্র তাবৎ—

অনুবাদ। (প্রশ্ন) ব্যক্তি, আকৃতি ও জাতি নানা অর্থাৎ ভিন্ন পদার্থ, ইহা কিরূপে বুঝা যায়? (উত্তর) লক্ষণভেদবশতঃ, অর্থাৎ উহাদিগের লক্ষণের ভেদ থাকতেই উহাদিগকে বিভিন্ন পদার্থ বলিয়া বুঝা যায়। তন্মধ্যে—

সূত্র। ব্যক্তিগুণবিশেষাশ্রয়ো মূর্তিঃ ॥৬৭॥১৯৬॥

প্রযুক্তিতে। কতিয়াক্রমেঃ প্রযোজ্যং বক্তব্যভাবো জাতিভেদাৎ। যথা, “পিষ্টকমযো গাবঃ ক্রিয়ন্তা”মিতি, সন্নিবেশ-চিকীর্ষয়া প্রয়োগ ইতি।—স্বায়মঙ্গলী, ৩২৪ পৃঃ।

১। যত্র কেবল আকৃতিবিশিষ্টে পদার্থবিশেষতঃপার্থ্যং যথা—“পিষ্টকমযো গাবঃ” ইত্যাদৌ তত্র শুদ্ধগোঁরাদিবিহীন-পদার্থে অবিশিষ্ট ইব লক্ষণৈব।—শক্তিবাদ।

২। “পিষ্টকমযো গাবঃ” ইত্যাদৌ স্তু ধ্বন্যকৃতিসদৃশাকৃতি লক্ষণা, পিষ্টকমযোঃপ্রত্যয়ভাবাৎ।—পদার্থনিরূপণ।



অনুবাদ। গুণবিশেষের অৰ্থাৎ রূপাদি কতকগুলি গুণের আশ্রয় মূৰ্ত্তি (দ্রব্যবিশেষ) ব্যক্তি।

ভাষ্য। ব্যজ্যত ইতি ব্যক্তিরিন্দ্রিয়গ্রাহেতি, ন সৰ্বং দ্রব্যং ব্যক্তিঃ। বো গুণবিশেষাণাং স্পর্শাস্তানাং গুরুত্ব-ঘনত্ব-দ্রবত্ব-সংস্কারাণামব্যাপিনঃ পরিমাণস্তাশ্রয়ো বধাসম্ভবং তদ্রব্যং, মূৰ্ত্তির্মূৰ্চ্ছিতাবয়বত্বাদিতি।

অনুবাদ। ব্যক্ত অৰ্থাৎ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা জ্ঞাত হয়, এজন্য ব্যক্তি ইন্দ্রিয়গ্রাহ, সুতরাং সমস্ত দ্রব্য ব্যক্তি নহে। যাহা স্পর্শাস্ত অৰ্থাৎ রূপ, রস, গন্ধ ও স্পর্শ এবং গুরুত্ব, ঘনত্ব, দ্রবত্ব, সংস্কার এবং অব্যাপক পরিমাণ—এই সমস্ত গুণবিশেষের বধাসম্ভব আশ্রয়, সেই দ্রব্য ব্যক্তি। মূৰ্চ্ছিতাবয়বত্ববশতঃ অৰ্থাৎ ঐরূপ দ্রব্যের অবয়বসমূহ মূৰ্চ্ছিত (পরস্পর সংযুক্ত) এজন্য (উহাকে বলে) মূৰ্ত্তি।

টিপ্পনী। মহর্ষি বধাক্রমে তিন হস্তের দ্বারা পূর্বসূত্রোক্ত ব্যক্তি, আকৃতি ও জাতিরূপ পদার্থত্রয়ের লক্ষণ বলিয়াছেন। কারণ, লক্ষণের ভেদ থাকতেই উহাদিগকে ভিন্ন পদার্থ বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে। সুতরাং ঐ লক্ষণভেদ জ্ঞাপন করিয়া উহাদিগের ভেদজ্ঞাপন করা আবশ্যক। প্রথমোক্ত ব্যক্তি-পদার্থের লক্ষণ বলিতে মহর্ষি বলিয়াছেন যে, গুণবিশেষের আশ্রয় যে মূৰ্ত্তি, অৰ্থাৎ আকৃতিবিশিষ্ট দ্রব্যবিশেষ, তাহাই ব্যক্তি। ভাষ্যকার সূত্রোক্ত “গুণবিশেষ” শব্দের দ্বারা রূপরসাদি কতকগুলি গুণবিশেষকেই গ্রহণ করিয়া, উহাদিগের বধাসম্ভব আধার দ্রব্যবিশেষকেই ব্যক্তি বলিয়াছেন। গুরুত্ব প্রভৃতি কতিপয় গুণ সামান্য গুণ নামে কথিত হইলেও অত্যন্তগুণ হইতে বিশিষ্ট বলিয়া সেইরূপ তাৎপৰ্য্যে ঐগুলিও হস্তে “গুণবিশেষ” শব্দের দ্বারা কথিত হইয়াছে। সৰ্বব্যাপী দ্রব্য আকাশাদির পরিমাণ সূত্রোক্ত গুণবিশেষের মধ্যে কথিত হয় নাই, ইহা বুঝাইতে ভাষ্যকার অব্যাপক পরিমাণের উল্লেখ করিয়াছেন। ভাষ্যকারের মতে আকাশাদি দ্রব্য এই সূত্রোক্ত ব্যক্তিপদার্থ নহে। তাই ভাষ্যকার সূত্রার্ণ বর্ণন করিতে প্রথমে “ব্যজ্যতে” এই ব্যাখ্যার দ্বারা এই “ব্যক্তি” শব্দের ব্যুৎপত্তি স্থানা করিয়া ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য দ্রব্যকেই ব্যক্তি বলিয়া, পরে সমস্ত দ্রব্য ব্যক্তি নহে, ইহা স্পষ্ট বলিয়াছেন। ভাষ্যকারের তাৎপৰ্য্য এই যে, পূর্বসূত্রোক্ত ব্যক্তি, আকৃতি ও জাতি এই পদার্থত্রয়ের বেধানে সমাবেশ আছে, তদ্ব্যতীত ঐস্থলে ব্যক্তিপদার্থ কি, ইহা নির্ধারণ করিতেই মহর্ষি এই লক্ষণ বলিয়াছেন। আকাশাদি দ্রব্যে আকৃতি না থাকায়, ঐরূপ আকৃতিশূন্য ব্যক্তি মহর্ষির লক্ষ্য নহে। তাই মহর্ষি এই “ব্যক্তি” শব্দের সমানার্থক “মূৰ্ত্তি” শব্দের পৃথক্ উল্লেখ করিয়া উহা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। মূৰ্চ্ছিতাবয়ব হইতে এই “মূৰ্ত্তি” শব্দটী লিঙ্ক হইয়াছে। যে দ্রব্যের অবয়বগুলি মূৰ্চ্ছিত অৰ্থাৎ পরস্পর সংযুক্ত ঐরূপ দ্রব্যকে “মূৰ্ত্তি” বলে। আকাশাদি দ্রব্যের অবয়ব না থাকায়, তাহা মূৰ্ত্তি-দ্রব্য

হইতে পারে না। সুত্রে “মুষ্টি” শব্দের উল্লেখ থাকায়, ভাষ্যকার হ্রস্বাক্ত “গুণবিশেষ” শব্দের দ্বারা ও রূপাদি কতকগুলি গুণেরই ব্যাখ্যা করিয়া, পূর্বোক্তরূপ দ্রব্যবিশেষকেই মহাবির অতিমত ব্যক্তি বলিয়াছেন। আকাশাদি দ্রব্যে ভাষ্যকারোক্ত গুণবিশেষের মধ্যে কোন গুণই নাই। উদ্যোতকর ভাষ্যকারের ব্যাখ্যা অস্বীকার করিয়া সদন্ত দ্রব্য, রূপাদি গুণ ও কর্ণপদার্থকেই হ্রস্বাক্তের অতিমত ব্যক্তিপদার্থ বলিয়াছেন। তিনি হ্রস্বাক্ত “গুণ” শব্দের দ্বারা রূপাদি গুণ-পদার্থ এবং “বিশেষ” শব্দের দ্বারা উৎক্ষেপনাদি কর্ণপদার্থ এবং “আশ্রয়” শব্দের দ্বারা ঐ গুণ ও কর্ণের আশ্রয় দ্রব্যপদার্থকে গ্রহণ করিয়া, বস্তু সনাস দ্বারা পূর্বোক্ত দ্রব্যাদি পদার্থ-ত্রয়কেই ব্যক্তি বলিয়াছেন। তাঁহার কথা এই যে, আকৃতি ও জাতি ভিন্ন সদন্ত ব্যক্তিপদার্থের লক্ষণই মহাবির বক্তব্য। সুতরাং মহাবি তাহাই বলিয়াছেন। ব্যক্তিপদার্থ-বিশেষের লক্ষণ বলিলে, মহাবির ব্যক্তিলক্ষণ-কথনে নানতা হয়। উদ্যোতকরের চরম ব্যাখ্যায় “মূর্ছতে” এইরূপ ব্যুৎপত্তিসিদ্ধ “মুষ্টি” শব্দের দ্বারা সমবার-সদ্ব্যবস্থিতি, এইরূপ অর্থ বুঝিতে হইবে। “মূর্ছ” শব্দের অর্থ এখানে সদ্ব্যবস্থা, তাহা এখানে সমবার-সদ্ব্যবস্থিতি অভিপ্রেত। পূর্বোক্ত দ্রব্য, গুণ ও কর্ণ, শব্দের অর্থ এখানে সদ্ব্যবস্থা, তাহা এখানে সমবার-সদ্ব্যবস্থিতি অভিপ্রেত। পূর্বোক্ত দ্রব্য, গুণ ও কর্ণ, এই তিনটি পদার্থই সমবার-সদ্ব্যবস্থার অঙ্গযোগী হইয়া থাকে। ঐ অর্থে ঐ পদার্থত্রয়কে মুষ্টি বলা যায়। উদ্যোতকর ভাষ্যকারের ব্যাখ্যা অস্বীকার করিয়া, কষ্টকরতা দ্বারা যে ব্যাখ্যাস্তর করিয়াছেন, তাহাই মহাবির অভিপ্রেত বলিয়া মনে হয় না। ভাষ্যকারের ব্যাখ্যাই এখানে দরলভাবে বুঝা যায়। ৩৭।

## মূত্র। আকৃতিজ্জাতিলিঙ্গাখ্যা ॥৩৮॥১১৭॥

অনুবাদ। “জাতিলিঙ্গাখ্যা” অর্থাৎ বাহ্যর দ্বারা জাতি বা জাতির লিঙ্গ (অবয়ব-বিশেষ) — আখ্যাত হয়, তাহা আকৃতি।

ভাষ্য। যন্না জাতিজ্জাতিলিঙ্গানি চ প্রখ্যায়ন্তে, তানাকৃতিং বিদ্যাৎ। সা চ নাস্তা সত্ত্বাবয়বানাং তদবয়বানাঞ্চ নিয়তাদব্যুহাদিতি। নিয়তাবয়ব-ব্যুহাঃ খলু সত্ত্বাবয়বা জাতিলিঙ্গং, শিরসা পাদেন গামমুনিঘন্তি। নিয়তে চ সত্ত্বাবয়বানাং ব্যুহে সতি গোস্তং প্রখ্যায়ত ইতি। অনাকৃতিব্যাক্সায়াং জাতৌ যুৎসুবর্ণং রজতমিত্যেবমাদিঙ্গাকৃতিনিবর্ততে, জহাতি পদার্থত্বমিতি।

অনুবাদ। যাহা দ্বারা জাতি বা জাতির লিঙ্গ প্রখ্যাত হয়, তাহাকে আকৃতি বলিয়া জানিবে। সেই আকৃতি সত্ত্বের (গো প্রভৃতি দ্রব্যের) অবয়বসমূহের এবং তাহাদিগের অবয়বসমূহের নিয়ত ব্যুহ (বিলক্ষণ-সংযোগ) হইতে ভিন্ন নহে, অর্থাৎ পূর্বোক্ত সেই সেই অবয়বগুলির পরস্পর বিলক্ষণ-সংযোগই আকৃতি-পদার্থ নিয়তাবয়বব্যুহ সত্ত্বাবয়বসমূহই অর্থাৎ বাহ্যতে অবয়ববিশেষের বিলক্ষণ-সংযোগ



নিয়ত আছে, এমন অবয়ববিশেষই জাতির লিঙ্গ (অনুমানক) হয়। মন্তকের দ্বারা চরণের দ্বারা গোকে অনুমান করে। সত্ত্বের অর্থাৎ গোর অবয়বসমূহের নিয়ত ব্যুহ (পরস্পর বিলক্ষণ-সংযোগ) থাকিলে গোহ প্রখ্যাত হয়। জাতি আকৃতিব্যাপ্য না হইলে অর্থাৎ যেখানে আকৃতির দ্বারা জাতির বোধ হয় না, সেই স্থলে “মৃত্তিকা”, “সুবর্ণ”, “রক্ত” ইত্যাদি পদসমূহে আকৃতি নিবৃত্ত হয়, পদার্থের ত্যাগ করে, অর্থাৎ এই সকল স্থলে আকৃতি পদার্থ নহে, কেবল ব্যক্তি ও জাতিই পদার্থ।

উপন্য। আকৃতির লক্ষণ বলিতে মহর্ষি বলিয়াছেন, “জাতিলিঙ্গাখ্যা”। আকৃতিবিশেষের দ্বারা গোবাদি জাতিবিশেষের জ্ঞান হইয়া থাকে, আকৃতি জাতির ব্যঙ্গক হয়, এজন্য আকৃতিকে জাতিলিঙ্গ বলা যায়। ‘জাতিলিঙ্গ’ এইটি বাহার আখ্যা অর্থাৎ সংজ্ঞা, তাহাকে আকৃতি বলে, এইরূপ অর্গ মহর্ষির সূত্রে বাহার পরপক্ষে বুঝা যায়। বৃত্তিকার বিখ্যাত ঐক্যই সূত্রার্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু ভাব্যকার ও বার্তিককার সূত্রে “জাতিলিঙ্গ” এই স্থলে স্বন্দ সমাগ আশ্রয় করিয়া বাহার দ্বারা জাতি ও লিঙ্গ অর্থাৎ জাতির লিঙ্গ আখ্যাত হয়, তাহা আকৃতি— এইরূপ সূত্রার্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। গবাদি প্রাণীর হস্তপাদাদি অবয়বের পরস্পর বিলক্ষণ-সংযোগরূপ আকৃতির দ্বারা গোবাদি জাতি আখ্যাত হয়। এবং ঐ হস্তপাদাদি অবয়বসমূহের যে সকল অবয়ব, তাহাদিগের পরস্পর বিলক্ষণ-সংযোগরূপ আকৃতির দ্বারা জাতির লিঙ্গ মন্তকাদি অবয়ববিশেষ আখ্যাত হয়। মন্তকাদি কোন অবয়ববিশেষের নাসিকাদি কোন অবয়ব-বিশেষের বিলক্ষণ-সংযোগ দেখিলে সর্বত্র সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে গোবাদি জাতির জ্ঞান হয় না। উদাহরণ দ্বারা মন্তকাদি স্থল অবয়ব-বিশেষের জ্ঞান হইলে, তদ্বারা গুরে গোবাদি জাতির জ্ঞান হইয়া থাকে, এই অভিপ্রায়ে ভাব্যকার ও বার্তিককার মন্তকাদি অবয়বের অবয়ব-সংযোগ-বিশেষকে জাতি-ব্যঙ্গক না বলিয়া, জাতিলিঙ্গের ব্যঙ্গক আকৃতি বলিয়াছেন। তাত্পর্য্যটীকাকার বলিয়াছেন যে, মন্তক ও চরণাদি অবয়বের ব্যুহ অর্থাৎ বিলক্ষণ-সংযোগরূপ আকৃতি মহাব্যাদি জাতিকে প্রকাশ করে। এবং নাসিকা, ললাট, চিবুক প্রভৃতি মন্তকাবয়বসমূহের পরস্পর বিলক্ষণ-সংযোগ-রূপ আকৃতি মহাব্যাদি জাতির লিঙ্গ মন্তককে প্রকাশ করে। গবাদি প্রাণীর মন্তকাদি অবয়ব অর্থাৎ উদাহরণের পরস্পর বিলক্ষণ-সংযোগরূপ আকৃতিই যে জাতির লিঙ্গ হয়, ইহা বুঝাইতে ভাব্যকার ও বলিয়াছেন যে, মন্তকের দ্বারা, চরণের দ্বারা গোকে অনুমান করে। অর্থাৎ গোর মন্তকাদি অবয়বের বিলক্ষণ-সংযোগ দেখিলে তদ্বারা “ইহা গো” এইরূপে গোহজাতির অনুমান হইয়া থাকে। তাত্পর্য্যটীকাকার এখানে বলিয়াছেন যে, যদিও ঐরূপ স্থলে গোহজাতির প্রত্যক্ষই হইয়া থাকে, উহা আকৃতির দ্বারা অনুমানের নহে, তথাপি যিনি গোহজাতির প্রত্যক্ষ স্বীকার করেন না, তাঁহাকে লজ্জা করিয়াই ভাব্যকার এখানে গোহজাতির অনুমান বলিয়াছেন। গো নামক সত্ত্বের (ব্রহ্মের) মন্তকাদি অবয়বসমূহের ব্যুহ (পরস্পর বিলক্ষণ-সংযোগ)

নিম্নত, অর্থাৎ তাহা গো নামে কথিত দ্রব্যেই থাকে, অখাদিতে থাকে না ; সুতরাং উহা দেখিলে সেই দ্রব্যে গোব প্রখ্যাত হয়, অর্থাৎ সেই দ্রব্যে "ইহাতে গোব আছে," "ইহা গো" এইরূপ কথিত হইয়া থাকে। ভাষ্যকার এইরূপ কথার দ্বারা পরে গোর আকৃতিতে সূত্রকারোক্ত আকৃতির লক্ষণ বুঝাইয়াছেন। মহর্ষি মুক্তিকানির্দ্ভিত গো-ব্যক্তিতেও আকৃতিবিশিষ্ট বলিয়াছেন, ইহা অরণ্য করা আবশ্যক। পিষ্টকনির্দ্ভিত গো-ব্যক্তিতেও গোর আকৃতি আছে, ইহাও অনেক গ্রন্থকার লিখিয়াছেন। মুক্তিকানির্দ্ভিত গো-ব্যক্তিও গো বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। তাহাতে যে আকৃতিবিশেষ আছে, তদ্বারাও "ইহা গো" এইরূপে তাহাতে গোব আখ্যাত হয়। তাহার মন্তকাদির কোন অবয়ব-বিশেষ দেখিলেও তদ্বারা "ইহা গোর মন্তক" এইরূপে জাতিবিধ মন্তকাদি আখ্যাত হইয়া থাকে। অখাদির আকৃতির দ্বারা তাহাতে গোবানি আখ্যাত হয় না। সুতরাং বাহার দ্বারা জাতি বা জাতিলিঙ্গ আখ্যাত অর্থাৎ কথিত হয়, তাহা আকৃতি, এইরূপে সূত্রার্থ ব্যাখ্যা করিলে মুক্তিকানির্দ্ভিত গো নামে কথিত দ্রব্যেও গোর আকৃতি আছে, ইহা বলা যাইতে পারে। সুশীর্ণগ সূত্রকারোক্ত আকৃতির লক্ষণ চিত্রা করিবেন।

ভাষ্যকার শেষে বলিয়াছেন যে, মুক্তিকা, সূর্য ও রজতাদি দ্রব্যে আকৃতির দ্বারা জাতি বুঝা যায় না। মুক্তিকার প্রকৃতি জাতি আকৃতিব্যবস্থা নহে। সুতরাং আকৃতি মুক্তিকাদি পদ্বের অর্থ হইবে না। জাতি ও ব্যক্তি, এই দুইটি মাত্রই সেখানে পদার্থ হইবে। ভাষ্যকারের তাৎপর্য বুঝা যায় যে, মহর্ষি আকৃতিমাত্রকেই পূর্লোক পদার্থত্রয়ের মধ্যে বলেন নাই। যে আকৃতি জাতি বা জাতিলিঙ্গের ব্যঞ্জক, সেই আকৃতিবিশেষকেই তিনি পদার্থ বলিয়াছেন, ইহা এই আকৃতি-লক্ষণ-সূত্রের দ্বারা বুঝা যায়। আকৃতিমাত্রই ঐরূপ নহে। সুতরাং সমস্ত জাতিই আকৃতি-ব্যবস্থা নহে। তাৎপর্যটিকার ইহা বুঝাইতে বলিয়াছেন যে, মুক্তিকা, সূর্য ও রজতাদি দ্রব্যের বিশেষ বিশেষ রূপের দ্বারা এই সেই জাতির বোধ হওয়ায়, ঐ সকল জাতি রূপবিশেষব্যবস্থা, আকৃতি-ব্যবস্থা নহে। ব্রাহ্মণ্যাদি জাতি যোনিব্যবস্থা। দ্বুত-তৈলাদির সেই সেই জাতিবিশেষ গন্ধ-ব্যবস্থা নহে। তৈলজ জাতি নাই। তাহাতে "তৈল" শব্দের গোপ প্রয়োগ হইয়া থাকে। মূলকথা, সমস্ত জাতিই আকৃতিব্যবস্থা নহে, এবং সেইরূপ স্থলে কেবল ব্যক্তি ও জাতিই পদার্থ হইবে, সর্বত্রই যে ব্যক্তি, আকৃতি ও জাতি, এই তিনটিই পদার্থ, ইহা নহে ; মহর্ষি তাহা বলেন নাই— ইহাই ভাষ্যকারের চরম কথা তাৎপর্য। পরন্তু মহর্ষি যে "গোঃ" এই নাম পদকেই উদাহরণরূপে গ্রহণ করিয়া পদার্থ পরীক্ষা করিয়াছেন, এ কথাও ভাষ্যকার পূর্বে বলিয়াছেন। সুতরাং যেখানে ব্যক্তি, আকৃতি ও জাতি, এই পদার্থত্রয়েরই সমাবেশ আছে, সেইরূপ স্থলেই মহর্ষি পূর্লোক তিনটিকে পদার্থ বলিয়াছেন, ইহাও বলা যাইতে পারে। পূর্লোক ব্যক্তি, আকৃতি ও জাতি সর্বত্রই নাই, সুতরাং সর্বত্রই ঐ তিনটিকে মহর্ষি পদার্থ বলিতে পারেন না। পিষ্টকানির্দ্ভিত গো-ব্যক্তিতে গোব জাতি না থাকায়, সেখানে কেবল ব্যক্তি ও আকৃতিই "গো" শব্দের অর্থ— ইহাও অসম্ভব ত্রুটি প্রকৃতি স্পষ্ট বলিয়াছেন। কিন্তু পিষ্টকানির্দ্ভিত গো-ব্যক্তিতে "গো" শব্দের



মুখ্যপ্রয়োগ স্বীকার করা যায় না। যেখানে গো শব্দের মুখ্য প্রয়োগ হইয়া থাকে, সেখানে ব্যক্তি, আকৃতি ও জাতি, এই তিনটিই পদার্থ হইবে। ১৩৮।

**সূত্র। সমান প্রসবাত্মিকা জাতিঃ ॥ ৩৯ ॥ ১৯৮ ॥**

অনুবাদ। “সমান প্রসবাত্মিকা” অর্থাৎ যাহা সমান বুদ্ধি উৎপন্ন করে, এইরূপ পদার্থ-বিশেষ জাতি।

ভাষ্য। যা সমানাং বুদ্ধিঃ প্রসূতে ভিন্নেবধিকরণেব, যয়া বহুনীতরে-  
তরতো ন ব্যাবর্ত্তন্তে, যৌহর্থেহনেকত্র প্রত্যয়ানুবৃত্তিনিমিত্তং, তৎ  
সামান্যং। যচ্চ কেমাক্ষিদভেদং কুতশ্চিদভেদং করোতি, তৎ সামান্য-  
বিশেষো জাতিরिति।

ইতি বাৎস্তায়নীয়ে চায়ভাষ্যে দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ।

অনুবাদ। যাহা বিভিন্ন অধিকরণ-সমূহে সমান বুদ্ধি উৎপন্ন করে, যাহার দ্বারা  
বহু পদার্থ পরস্পর ব্যাবৃত্ত হয় না, অর্থাৎ বিজাতীয় বিভিন্ন বলিয়া প্রভীত হয় না,  
যে পদার্থ অনেক পদার্থে প্রত্যয়ানুবৃত্তির অর্থাৎ একাকার জ্ঞানের নিমিত্ত, তাহা  
সামান্য। এবং যে পদার্থ কোন পদার্থ-সমূহের অভেদ ও কোন পদার্থ-সমূহ হইতে  
ভেদ করে, অর্থাৎ ঐরূপ অভেদ ও ভেদের সাধক হয়, সেই সামান্য বিশেষ, জাতি।

বাৎস্তায়ন-প্রণীত চায়ভাষ্যে দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

—c—

টীকণী। বহুবি বখাক্রমে তাহার পূর্বেকৃত ব্যক্তি ও আকৃতির লক্ষণ বলিয়া, এই সূত্রের দ্বারা  
জাতির লক্ষণ বলিয়াছেন। গোত্র প্রভৃতি জাতি তাহার সমস্ত আশ্রয়ে সমান বুদ্ধি প্রসব করে, এ জাত  
জাতিকে বলা হইয়াছে—“সমানপ্রসবাত্মিকা”। ভাষ্যকার স্বার্থার্থ বর্ণন করিতে প্রথমে সূত্রকারের  
ব্যাক্যার্থ ব্যাখ্যা করিয়া, পরে ঐ কথাটাই ব্যাখ্যা করিতে বলিয়াছেন যে, যে পদার্থ দ্বারা বহু পদার্থ  
পরস্পর ব্যাবৃত্ত হয় না। গো-পদার্থগুলি পরস্পর ভিন্ন হইলেও সমস্ত গো-পদার্থে এমন কোন সামান্য  
ধর্ম আছে, তাহা সমস্ত গো-পদার্থে এক। ঐ সামান্য ধর্মের জ্ঞানবশতঃ তজ্জপে সমস্ত গো-পদার্থকে  
অভিন্ন বলিয়াই বুঝা যায়। ঘটাদি বিজাতীয় পদার্থে পূর্বেকৃত গোগত সামান্যধর্ম না থাকায়, তাহা-  
দিগকে গো হইতে বিজাতীয় ভিন্ন বলিয়াই বুঝা যায়। পূর্বেকৃত সকল গোগত সামান্য ধর্মের নাম  
গোত্র। উহা “সামান্য” নামে ও “জাতি” নামে কথিত হইয়াছে। গোত্র জাতির দ্বারা ঘটত্র পটত্র  
প্রভৃতি সামান্য ধর্ম ও পূর্বেকৃত রূপ সমান বুদ্ধি উৎপন্ন করে, উহাদিগের দ্বারাও উহাদিগের আশ্রয়  
ঘটাদি পদার্থ পরস্পর ব্যাবৃত্ত হয় না। স্তম্ভরাং ঘটবাদি সামান্য ধর্ম ও জাতি। মূলকথা, গোমাত্রেরই  
যে, “ইহা গো” এই রূপ সমানবুদ্ধি বা একাকার বুদ্ধি আছে, তাহা সকল গোগত এক গোত্ররূপ

সামান্য ধর্মের দ্বারা ইহা থাকে। গোমাত্রের একই গোত্রের প্রত্যেক হওয়ার, তাহাতে “ইহা গো” এইরূপ একাকার প্রত্যয় জ্ঞান জন্মে। সকল গো-পদার্থে ঐরূপ একটি সামান্য ধর্ম না থাকিলে এবং তাহার প্রত্যয় না হইলে, গোমাত্রের পূর্কোক্ত রূপ একাকার প্রত্যয় হইতে পারে না। মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা পূর্কোক্তভাবে জ্ঞাপনার্থে প্রমাণ সূচনা করিয়াই জ্ঞাতির লক্ষণ সূচনা করিয়াছেন। যে পদার্থ সমান বুদ্ধি উৎপন্ন করে, তাহাই জ্ঞাতি—ইহা মহর্ষির বিবক্ষিত নহে, বাহ্য জ্ঞাতি তাহা অবশ্য বিভিন্ন অধিকরণ সমূহে সমানবুদ্ধি উৎপন্ন করে—ইহাই মহর্ষির বিবক্ষিত। বাহ্য জ্ঞাতি গোমাত্রের জ্ঞাতিকে প্রত্যক্ষসিদ্ধ বলিয়া, স্বীকার করেন নাই, তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া ভাব্যকার শেষে অমুমান প্রমাণ দ্বারা গোমাত্রের জ্ঞাতির সাধন করিতে বলিয়াছেন যে, যে পদার্থ অনেক পদার্থে অমুদৃত প্রত্যয়ের নিমিত্ত হয়, তাহা সামান্য। অর্থাৎ সমস্ত গো-পদার্থে “ইহা গো” এইরূপ যে একাকার জ্ঞান জন্মে (বাহ্যকে প্রত্যক্ষাবুত্তি বা অমুদৃত প্রত্যয় বলে) তাহার অবশ্যই কোন নিমিত্ত-বিশেষ আছে। পূর্কোক্ত স্থলে গোত্র নামক একটি সামান্য ধর্মই সেই নিমিত্তবিশেষ। পূর্কোক্ত অমুদৃতবুদ্ধিই উহার সাধক, সুতরাং উহা স্বীকার্য।

এই জ্ঞাপনার্থসম্বন্ধে বৈশেষিক শাস্ত্রে বিশেষ বিচার হইয়াছে। বাহ্য নিত্য এবং অনেক পদার্থে সমবায় সংঘে বর্তমান, তাহা জ্ঞাতি, ইহাই জ্ঞাতির লক্ষণ। বৈশেষিক শাস্ত্রে এই জ্ঞাতিকে সামান্য ও বিশেষ, এই দুই প্রকারে বিভক্ত করা হইয়াছে। দ্রব্য, গুণ ও কর্ম, এই তিন পদার্থে “সত্তা” নামে যে জ্ঞাতি স্বীকৃত হইয়াছে, তাহা কেবল ঐ জ্ঞাতিবিশিষ্ট ঐ পদার্থত্রয়ের অমুদৃতেরই হেতু হওয়ার সামান্য বা পরা জ্ঞাতি। সত্তা তির দ্রব্যের প্রভৃতি যে সকল জ্ঞাতি, তাহা নিজের আশ্রয়ের অমুদৃতের দ্বারা বিজাতীয় পদার্থসমূহ হইতে ব্যুৎপত্তিরও হেতু হওয়ার, বিশেষ জ্ঞাতি বা অপরা জ্ঞাতি। ভাব্যকার বৈশেষিকের সিদ্ধান্তানুসারে প্রথমে সামান্য জ্ঞাতির প্রমাণ ও লক্ষণ সূচনা করিয়া, পরে বাহ্য কোন পদার্থসমূহের অভেদ ও কোন পদার্থসমূহ হইতে ভেদ করে, এই কবার দ্বারা বিশেষ জ্ঞাতির লক্ষণ সূচনা করিয়াছেন। এ বিষয়ে বৈশেষিকের সিদ্ধান্তই জ্ঞাতের সিদ্ধান্ত। মহর্ষি গৌতম এই জ্ঞাতি-পদার্থ সম্বন্ধে আর কোন আলোচনা করা এখানে আবশ্যক মনে করেন নাই। কণাদসূত্র, প্রশস্তপাদভাষ্য ও ভাষ্যকল্পলীতে এ বিষয়ে সকল কথা পাওয়া যাইবে। তদ্বারা ভাব্যকারের কথাগুলিও সম্যক বুঝা যাইবে। বাহ্যভাষ্যে জ্ঞাতিবিষয়ে বৌদ্ধদত্ত ও জ্ঞান বৈশেষিকার্চ্যাপ্রণেয় সমালোচনাদি বিদ্যুত হইল না। ৬২।

ভাষ্যদর্শনের এই দ্বিতীয় অধ্যায়ে সংশয় ও প্রমাণ পদার্থ পরীক্ষিত হইয়াছে। সকল পদার্থের পরীক্ষাই সংশয়পূর্বক, এ জন্ত পরীক্ষারম্ভে এই অধ্যায়ে প্রথমে ৭ সূত্রের দ্বারা সংশয় পরীক্ষা হইয়াছে। উহার নাম (১) সংশয়-পরীক্ষা-প্রকরণ। তাহার পরে ১০ সূত্র (২) প্রমাণ-সামান্য-পরীক্ষা-প্রকরণ। তাহার পরে ১২ সূত্র (৩) প্রত্যয়-পরীক্ষা-প্রকরণ। তাহার পরে ৪ সূত্র (৪) অবয়ব-পরীক্ষা-প্রকরণ। তাহার পরে ২ সূত্র (৫) অমুমান-পরীক্ষা-প্রকরণ। তাহার পরে ৫ সূত্র (৬) বর্তমান-পরীক্ষা-প্রকরণ। তাহার পরে ৫ সূত্র (৭) উপমান-পরীক্ষা-প্রকরণ। তাহার পরে ৮ সূত্র (৮) শব্দ-সামান্য-পরীক্ষা-প্রকরণ। তাহার পরে ১২ সূত্রে (৯) শব্দ-বিশেষ-



পরীক্ষা-প্রকরণ। এই ২টি প্রকরণে ৬৮ হজে দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম আর্থিক সমাপ্ত হইয়াছে।

পরে দ্বিতীয়াহিকের প্রারম্ভে ১২ হজ (১) প্রমাণচতুষ্টয়-পরীক্ষা-প্রকরণ। তাহার পরে ২৭ হজ (২) শব্দানিত্য-প্রকরণ। তাহার পরে ১৮ হজ (৩) শব্দ-পরিণাম-প্রকরণ। তাহার পরে ১২ হজ (৪) পদার্থ-নিরূপণ-প্রকরণ। এই ৪টি প্রকরণে ৬২ হজে দ্বিতীয়াহিক সমাপ্ত হইয়াছে।

১৩ প্রকরণ ও ১৩৭ হজে দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

— ০ —

## শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠাক	অঙ্ক	পৃষ্ঠ
২	৪১ স্বত্র )	৪১ স্বত্র )
	শব্দক্রম	শব্দক্রম
	পাঠক্রম	পাঠক্রম
৩৮	উদ্যোতক	উদ্যোতক
১৫	পরিষ্কট	পরিষ্কট
২২	বিপ্রতিপত্তাব্যবহা	বিপ্রতিপত্তাব্যবহা
৩৫	নানরো (	নানরো
৪৫	পূর্বকাল পূর্ববর্তিতা	পূর্বকাল বর্তিতা
৪৮	অর্থ২	[ অর্থ২
৬০	( ৪ অঃ,	( ৫ অঃ,
৭০	দর্শনব্যাং	দর্শনব্যাং
৮০	তদবগ্রহণং	তদবগ্রহণং
৯৬	প্রমাণাস্তরা	প্রমাণাস্তরা
১০৮	মতবিশেষের জ্ঞ	মতবিশেষের খণ্ডনের জ্ঞ
	কচিত্ত	কচিত্ত
১০৯	দৃষ্টান্ত	দৃষ্টান্ত
১২২	বলা হইবে না	বলা যাইবে না
১২৩	পরিবর্তা	পরিবর্তা
১৩৫	তন্মূলক	তন্মূলক
১৩৬	পূর্বোক্ত ব্যাখ্যাত	পূর্বোক্ত ব্যাখ্যাত,
১৩৭	সম্ভাব্য	সম্ভাব্য
১৬৭	ইত্যহু	ইত্যহু
১৬৮	দ্রব্য	দ্রব্য
১৭১	ভাষ্যকার	ভাষ্যকার
১৭৪	তাহার	তাহা
১৭৮	ভক্তি নামা	ভক্তি নামা
১৮১	দত্তেদে নৈক	দত্তেদে নৈক
১৮৪	ভূতভৌতিক	ভূতভৌতিক



পৃষ্ঠাঙ্ক	অঙ্ক	শুদ্ধ
১৮৯	দ্বিত্বশ্রয়ভূতে	দ্বিত্বশ্রয়ভূতে
১৯৫	পরভাগে	পরভাগের
১৯৯	নাগনা	নাগনা
২০৪	অসংখ্যাতি	অসংখ্যাতি
২০৬	কোন প্রকারের	কোন প্রকারের
২১৫	নদী পুরো	নদী পুরো
	নদী পুরঃ	নদী পুরঃ
২২১	ক্ষুটএব	ক্ষুটএব
২০২	অব্যভিচার	অব্যভিচার
২০৭	স্বক্রিয়া ব্যাখ্যা	স্বক্রিয়ার ব্যাখ্যা
	উদয়নের	উদয়নের
২৪১	আকস্মিক	আকস্মিক
২৪৫	প্রতিপত্তা	প্রতিপত্তা
২৪৮	করিয়াই	করিয়া
২৫২	সহচরজ্ঞান	সহচরজ্ঞান
২৬০	বিষয় কারণ	বিষয় কারণ,
২৬৪	সমূহের	সমূহের
২৭০	ভাব্যকারে	ভাব্যকারের
	। সূত্র বিবরণ ।	। সূত্রবিবরণ ।
২৮২	সপ্রবৃত্তিনিমিত্তকত্বই	সপ্রবৃত্তিনিমিত্তকত্বই
	বিশিষ্টকত্বের	বিশিষ্টকত্বের
২৮৪	শব্দবোধ	শব্দবোধ
২৮৭	ব্যাপ্যব্যাপক ভাব দ্বারা	ব্যাপ্যব্যাপক ভাব
২৮৮	কিং তহি	কিং তর্হি ?
	সম্প্রত্যয়ঃ	সম্প্রত্যয়ঃ
২৯৯	শব্দে নার্থঃ	শব্দেনার্থঃ
	কণ্ঠাদি	কণ্ঠাদি,
	গ্রহীত	গ্রহীত
৩০৩	জ্ঞাতিবিশেষ	জ্ঞাতিবিশেষে
৩০৪	"জ্ঞাতি বিশেষে" শব্দের	"জ্ঞাতিবিশেষ" শব্দের ।
৩০৬	কদাচিত্ত্বক	কদাচিত্ত্বক

পৃষ্ঠাঙ্ক	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৩০৯	পট্টাদিরূপে	পট্টাদিরূপে
৩১০	"তদপ্রামাণ্যং"	"তদপ্রামাণ্যং"
৩১৭	কর্মকর্তা ও	কর্ম, কর্তা ও
	"ঐশ" শব্দ	"ঐশ" শব্দের
৩১৯	লৌকিক হইতে অর্থাৎ	লৌকিক হইতে
৩২৬	অভ্যাস উক্ত,	অভ্যাস উক্তঃ,
৩৩০	আরণ্যক	আরণ্যক
৩৩১	মৈত্র উপ	মৈত্রী উপ
৩৩২	ভবন্তস্তং	ভবন্তস্তং
৩৩৩	সীমাংশাশাঙ্কে	সীমাংশাশাঙ্কে
	বিবিধাক্যের	বিবিধাক্যের
৩৩৪	তাণ্ডো	তাণ্ডা
	অগ্রে বপাকেই অর্থাৎ	অগ্রে বপাকেই
৩৩৫	তত্তার্থবাদ	তত্তার্থবাদ
৩৩৬	বিহিত আছে	বিহিত আছে
৩৩৯	অনুচবন	অনুচবন
৩৪১	হুই, হুই	হুই, হুই
৩৪২	বিশেষ উপপন্ন	বিশেষ উপপন্ন
৩৪৩	নির্কির্শেবে অভ্যাস	নির্কির্শেবে অভ্যাস
৩৪৪	নামোপ্য ও সাদৃশ্য	নামোপ্য ও সাদৃশ্য,
৩৪৮	উদ্ধৃত	উদ্ধৃত
৩৫৫	স্বস্ত্যয়ন	স্বস্ত্যয়ন
৩৫৬	ইন্ডের নিকট	ইন্ডের নিকটে
	শাজ	শাজ ।
৩৬০	করিতেছেন	করিয়াছেন
৩৬২	মিত্রঃ বাহুরথোবকগণন	মিত্রঃ বরুণময়িমাহুরথো
৩৬৪	কে অগ্নি ঈষ প্রভৃতির	ঈষকে অগ্নি প্রভৃতির
৩৭১	প্রমাণরূপ গ্রহণ	প্রমাণরূপে গ্রহণ
৩৯৩	উপপন্ন হয় না	উপপন্ন হয় না
৩৯৬	সমর্পন করিতেই	সমর্পন করিতেই
৩৯৯	সংযোগ	সংযোগ



পূর্বাঙ্ক	শুদ্ধ	অশুদ্ধ
৪০৭	অভিভূত	অভিভূত
৪১১	কাণ্ড্যপদার্থের, জ্ঞান ব্যবহার	কাণ্ড্যপদার্থের জ্ঞান ব্যবহার,
৪১২	বে হেতু বলা হইয়াছে কখনও উপপত্তি	বে হেতু বলা হইয়াছে ] কখনও উৎপত্তি
৪১২	"প্রদেশ" শব্দের দ্বারা	( "প্রদেশ" শব্দের দ্বারা )
৪২৭	ভাষ্য । তথাপি	ভাষ্য । অথাপি
৪৩৭	তথাপি মহর্ষির প্রদর্শন করা	তথাপি মহর্ষি প্রদর্শন করার
৪৬৬	বিবৃতি	বিবৃতি
৪৭৪	প্রথম বিকার মাত্রই	প্রথমস্থ বিকার মাত্রই
	ভাষ্য	ভাষ্যে
৪৭৪	পদ	পদ
৪৭২	ব্যাক্তিচার	ব্যাক্তিচার
৪৮০	ব্যাক্তিচার	ব্যাক্তিচার
৪৮৮	৫।১২	৫।১।২
৪৯০	অনিয়মে অনিয়মপদার্থে	অনিয়মে অনিয়মপদার্থের
৪৯৬	যে, পূর্বপক্ষবাদীর অভিসন্ধি	পূর্বপক্ষবাদীর অভিসন্ধি
৪৯৮	অনুসন্ধান	অনুসন্ধান
৫০১	( স্বত্বে )	( স্বত্বের )
৫০৬	তত্ত্বপচার	তত্ত্বপচার,
৫১০	বিলক্ষণ সংযোগ	বিলক্ষণ সংযোগ,
৫১৪	প্রাধান	প্রাধান
	অপ্রাধান	অপ্রাধান,
৫২০	যন্ত তন্	যন্ত তন্
৫২১	আকৃতি পদার্থ	আকৃতি পদার্থ ।
৫২২	স্থলে	স্থলে

### পরিশিষ্ট

১২০ পৃষ্ঠার ভাষ্যে—“কারণভাবং ক্রবতে”, এই স্থলে কারণভাবং ক্রবতো—এইরূপ সমীচীন পাঠ কোন পুস্তকে পাওয়া যায় এবং উহাই প্রকৃত পাঠ, বুঝা যায় । ঐ পাঠে পুরোক্ত ঐ ভাষ্যের গোণে পরবর্তী (২০শ) সূত্রের অনুবাদ এইরূপ হইবে,—

ইন্দ্রিয়ানুসঙ্গিকবৈ বিদ্যমান থাকিলে, প্রত্যক্ষের উৎপত্তির দর্শনবশতাই ( প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়ানুসঙ্গিকবৈ ) কারণভবদ্বার ( মতে ) দিক, দেশ, কাল ও আকাশেও এইরূপ প্রসঙ্গ অর্থাৎ প্রত্যেক কারণের আপত্তি হয় ।







5 cat  
28/11/17 N.E

Philosophy - Nyaya

Nyaya - Philosophy

*"A book that is shut is but a block"*

CENTRAL ARCHAEOLOGICAL LIBRARY

GOVT. OF INDIA  
Department of Archaeology  
NEW DELHI.

Please help us to keep the book  
clean and moving.